ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট

ল্যারি কলিন্স ও দোমিনিক লাপিয়ের

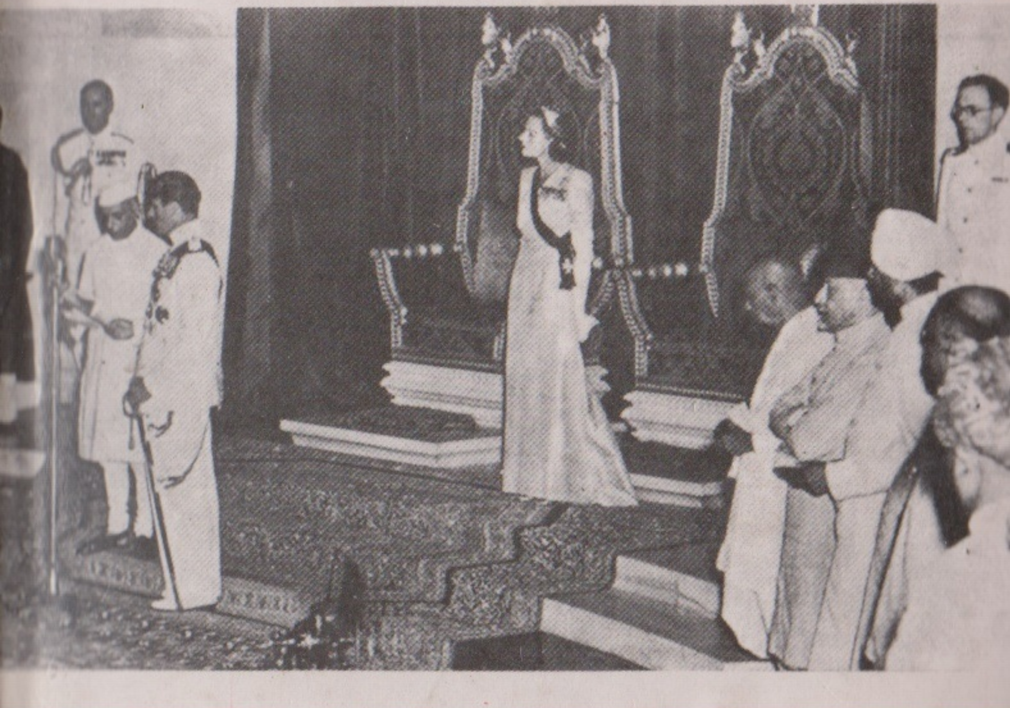

ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট

ল্যারি কলিন্স ও দোমিনিক লাপিয়ের

অনুবাদ

রবিশেখর সেনগুপ্ত

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

www.pathagar.com

প্রকাশক ঃ শমিত সরকার
এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা-৭৩

প্রথম সংস্করণ ঃ শ্রীপঞ্চমী ১৩৯৭

মূল্য ঃ ১৫০ টাকা

© Larry Collins and
Dominique Lapierre 1975
Bengali Translation © M. C. Sarkar
& Sons Private Ltd. 1991

I S B N 81-7157-031-3

মুদ্রক ঃ তপন প্রিন্টিং,
৪০/১/এ, আর. এন. দাশ রোড, কলিকাতা-৩১।

www.pathagar.com

প্রস্তাবনা

বোম্বাই উপসাগরের ছোট ছোট ঢেউগুলি যেন তাদের বুকের মধ্যে সযত্নে লালন করছে ছোট্ট উঁচু ভূখণ্ডটা। ভূখণ্ডের উপর গর্বোদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে রুক্ষ এবড়ো-খেবড়ো গাঢ় হলুদ পাথরের আকাশছোঁওয়া গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়ার খিলান। উর্মিমালার মৃদু আঘাতে তিরতির করে কাঁপছে তীরের সবুজ শ্যাওলা আর উদ্ভিদ আবর্জনাস্তূপ। খিলান থেকে সাগরবেলা পর্যন্ত গড়িয়ে গেছে সিমেন্ট বাঁধানো ঢালু গড়ানে পথ। তাকে বেড় দিয়ে রেখেছে এই শ্যাওলা আর অন্য জলজ আবর্জনা। একটা বিচিত্র জীবনের জগৎ যেন জড়িয়ে আছে ওই বিশাল কন্‌ক্রীট খিলানের ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশে। কত বিচিত্র জীবিকার মানুষ তারা। সাপুড়ে, জ্যোতিষী, ভিখারী আর ভবঘুরে। নেশায় বুঁদ হয়ে একপাশে পড়ে আছে উচ্ছৃঙ্খল হিপি কিংবা দরিদ্র মৃতপ্রায় কিছু লোক। এই বহুজাতিক ব্যস্ত শহরের প্রান্তিক মানুষ ওরা। শুয়ে বসে থাকা এই মানুষগুলোর মধ্যে একজনও অলস চোখে খিলানের মাথার দিকে চোখ তুলে তাকায় না। ওরা কেউ জানে না কি লেখা আছে ওই খিলানের মাথায়। অথচ কী স্পষ্ট ওই খোদাই করা লেখাগুলো! '১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের দোসরা ডিসেম্বর তারিখে মহানুভব সম্রাট পঞ্চম জর্জ এবং সম্রাজ্ঞী মেরীর ভারতভূমিতে পদার্পণের স্মারকরূপে প্রতিষ্ঠিত হল এই স্মারকখিলান।'

তবে বলা যায় যে, গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়ার এই স্মারক খিলানটিই একদা ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের বিজয়প্রতীক। তখন বংশানুক্রমে ব্রিটেনবাসীরা সগৌরবে এই বিজয়স্তম্ভের আকাশছোঁয়া শীর্ষদেশের দিকে তাকিয়ে থাকতো। জাহাজের ডেক-এ দাঁড়িয়ে এই সুমহান কীর্তিস্তম্ভের দিকে চেয়ে থাকার সময় স্কটল্যাণ্ড ও মিডল্যাণ্ডের গ্রামগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসা এইসব যুবকদের চোখ ধাঁধিয়ে যেত। তাদের মনে হতো বুঝি সার্থক হল এই কিংবদন্তীর দেশে আসা। তখন বিজয়তোরণ পেরিয়ে দলে দলে মানুষ এই উপমহাদেশে এসেছে। এসেছে সৈনিক, এসেছে অ্যাড্‌ভেঞ্চারপ্রিয় দুঃসাহসী যুবক, এসেছে বণিক, এসেছে শাসনকর্তা, পরিচালক। এই সুমহান দ্বারপথ পেরিয়ে ওরা সবাই এসেছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অধিকার ও স্বার্থ (প্যাক্‌স্ ব্রিটানিকা) রক্ষা করার সংকল্প নিয়ে। এই বিজিত ভূখণ্ডে এসে ওরা যেমন সম্পদ শোষণ করেছে, তেমনি শ্বেতকায় জাতির দম্ভের বোঝা কাঁধে নিয়ে শাসকের ভূমিকা পালন করেছে। সেদিন ওদের অবিচলিত বিশ্বাস ছিল যে, ওরাই এই গ্রহের শাসক হয়ে জন্মেছে এবং বিধাতার অমোঘ বিধানে ওদের এই শ্বেতকায় প্রভুত্বের কখনও পতন হবে না।

হায়, এসবই এখন যেন সুদূর অতীতের গালগল্প। গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়া এখন শুধুই একটা পাথরের ইমারত যেমন পাথরের ইমারত এককালের গরিমাদৃপ্ত নিনেভ আর টায়ার সাম্রাজ্য। ইতিহাসের এক ভুলে যাওয়া অধ্যায় এই গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়া, যার কীর্তিখ্যাতি সিকি শতাব্দী আগেই লুপ্ত হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নিবেদন

এক বৃহৎ প্রেক্ষাপটে অনেক ঘটনার সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই গ্রন্থ। ভারতে এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ হয় ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দে এবং এক বছরের মধ্যেই এর চৌদ্দটি সংস্করণ হয়। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, সেদিন দেশের ইংরিজি জানা পাঠকের মধ্যে এই গ্রন্থ বিপুল সাড়া তুলেছিল। গ্রন্থের লেখকদ্বয়ের একজন হলেন দোমিনিক লাপিয়ের। বাংলাভাষী পাঠকের কাছে লাপিয়ের ইতোমধ্যেই সুপরিচিত হয়েছেন তাঁর 'আনন্দ নগর' উপন্যাসের সুবাদে। অন্যজনও অপরিচিত নন। অন্তত ইংরিজি জানা পাঠকের কাছে 'ইজ প্যারিস বার্নিং?' এবং 'ও জেরুজালেম!' গ্রন্থদুটির যুগ্ম লেখকরূপে ল্যারি কলিন্সও সুখ্যাত। এঁদের দুজনের যৌথ প্রয়াসের তৃতীয় ফসল 'ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট।' দীর্ঘ তিন বছরের নিরলস অধ্যবসায় ও গবেষণার পর এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বিস্তর তথ্য পরিবেশন করেছেন লেখকদ্বয়। ৬০০ পাতার বইটির মধ্যে আয়াসসাধ্য অনেক চড়াই-উৎরাই আছে। তবুও কোথাও উপলব্যথিত হয় না এর ধারা। এমনকি কোনক্রমে শেষ করে 'বাঁচা গেল!' বলবেনও না কোন পাঠক। একের পর এক দৃশ্যগুলি পাঠকের চোখের ওপর দিয়ে অবলীলায় চলে গেছে। কত রঙ তাদের! অন্তত ৫০০ চরিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন লেখকদ্বয়। সবাই ইতিহাসের চরিত্র নন। সাধারণ চরিত্রও আছে। কিন্তু কোন চরিত্রই যেন আলোকবৃত্তের বাইরে পড়ে না। পাঠককে প্রায় ৬০০০ মাইল পরিভ্রমণ করিয়েছেন লেখকদ্বয়। কখনও রুক্ষ কঠিন খাইবার গিরিপথ, কখনও মাদ্রাজের সেন্ট জর্জ গির্জা। কখনও শহরের বস্তি, কখনও ইংল্যান্ডের শান্ত নিরিবিলি গ্রাম। তবুও পাঠকের যাত্রাপথ অনভ্যস্ত হয় নি কোথাও।

প্রত্যাশিতভাবেই এই গ্রন্থের মুখ্য চরিত্র দুটি। রিয়্যার এড্‌মিরাল লুই মাউন্টব্যাটেন এবং মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। অন্যরা পার্শ্বচরিত্র। তবে যেমন দাপটের সঙ্গে লুই মাউন্টব্যাটেন বিরাজমান তেমনটি গান্ধীজী নন। মাউন্ট-ব্যাটেনের চোখে তিনি যেমন 'ছোট্ট বিষণ্ণ পাখি', আমাদের চোখেও তাই-ই। বলাবাহুল্য, এ কোন স্বেচ্ছাচারী চরিত্রায়ন নয়। তৎকালীন রাজনৈতিক আকাশে মোহনদাস গান্ধীর ভূমিকা বাস্তবিকই অসহায় এবং বিষণ্ণ। দেশভাগ যখন 'সেট্‌ল্‌ড্‌ ফ্যাক্ট', দ্বি-জাতিতত্ব যখন সাধারণ মানুষের কাছে পরিত্রাণ পাবার একমাত্র বাস্তবসত্য পথ, তখন গান্ধীজীর ভূমিকা নীরব অসহায় দর্শক ছাড়া আর কী হতে পারে? তাঁর বেদনা যে এই অনিবার্যতা তিনি ঠেকাতে পারেননি। কিন্তু তার চেয়েও বড় বেদনা যে দেশের মানুষ তাঁর ইচ্ছামতন চলেনি। সবাই এসে একে সরে গেছে তাঁর আদর্শ থেকে। বেঁচে থাকতেই তিনি একলা থেকে গেলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

চৌদ্দই আগস্ট মধ্যরাতে জওহরলাল যখন 'ট্রাইস্ট উইথ ডেসটিনি'র কথা বললেন তখন দেশের সাধারণ এবং ছিন্নমূল মানুষ অনেক সান্ত্বনা পেয়েছিলেন। কিন্তু আগামীদিনে সে সান্ত্বনা টেকে নি। অনেক মত ও পথ, সামাজিক, রাজ-নৈতিক অনেক টানাপোড়েনের সংঘাতে বিবর্ণ হয়ে গেছে সেই সান্ত্বনা।

www.pathagar.com

চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক মুদ্রণপ্রমাদ ঘটে গেছে। সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। ৪৩৭ পাতায় ভুল করে দিগম্বর গড়সে ছাপা হয়েছে। এটি পড়তে হবে দিগম্বর বাড়্গে।

গান্ধীজীর জীবনাবসান হয়েছিল ৩০শে জানুয়ারি ১৯৪৮ সনে। রোগশয্যায় শুয়ে দেহ রাখেন নি তিনি। গান্ধীজী নিহত হয়েছিলেন। প্রায় ইচ্ছামৃত্যুই বলা যায় কারণ তিনি কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেন নি। কিন্তু এই আত্মত্যাগ সত্ত্বেও গান্ধীজী দধীচি হলেন না। তাঁর অস্থি দিয়ে কোন বজ্র আজও নির্মিত হলো না। এ আমাদেরই পাপ।

তাঁর পুণ্যস্মৃতিতে নিবেদিত হলো এই অনুবাদগ্রন্থটি।

১লা জানুয়ারি, ১৯৯১

রবিশেখর সেনগুপ্ত
অনুবাদক

www.pathagar.com

সূচীপত্র

যে জাতি শাসক হয়ে জন্মেছে ... ১
একলা চলো রে ... ১৮
ঈশ্বরই ভারতের ভাগ্যদেবতা ... ৩১
মুমূর্ষু রাজতন্ত্রের বিদায় সংগীত—দি লাস্ট ট্যাটু ... ৭২
এক বৃদ্ধ এবং তাঁর ভাঙাচোরা স্বপ্ন ... ৯৫
একটা ছোট্ট দামী শহর ... ১৪৪
সুরম্য প্রাসাদভবন ও বাঘ, হাতি ও হীরাজহরতের দীপ্তি ... ১৫৬
গ্রহনক্ষত্রের বিচারে একটা অভিশপ্ত দিন ... ১৭৪
একটি জটিল ঐতিহাসিক বিচ্ছেদ ... ২০০
'আমরা চিরকাল সহোদর হয়ে থাকবো' ... ২৩৮
পৃথিবী তখন ঘুমিয়ে ছিল ... ২৭৫
'কি মিষ্টি এই মুক্তির সকাল' ... ৩০৯
'ওরা আর মানুষ নেই' ... ৩৩৫
ইতিহাসের বৃহত্তম জনপরিযান (মাইগ্রেশন) ... ৩৭৫
'কাশ্মীর শুধু কাশ্মীর !' ... ৪১০
পুণার দুই ব্রাহ্মণ ... ৪২৬
ধ্বনিত হলো 'গান্ধী মুর্দাবাদ' ... ৪৪৭
মদনলালের প্রতিহিংসা ... ৪৭৭
'পুলিসের হাতে ধরা পড়ার আগেই গান্ধীকে পেতে হবে আমাদের' ... ৪৯৩
যেন দ্বিতীয়বার ক্রুশবিদ্ধ হলেন যীশু ... ৫১৭
উপাদানপঞ্জী ... ৫৫২

www.pathagar.com

ঈশ্বরের অমোঘ বিধানেই ভারতবর্ষকে শাসন করার দায়িত্বভার ইংরেজ জাতির কাঁধে অর্পিত হয়েছে।'

রুডিয়ার্ড কীপলিঙ্

'ভারতবর্ষ হাতছাড়া হলে আমাদের চূড়ান্ত অনিষ্ট হবে। মৃত্যুর শামিল হবে এই ক্ষতি। চাই কি, একটা অখ্যাত শক্তিতে পরিণত হয়ে যাব আমরা ধীরে ধীরে।'

লন্ডনের হাউস অফ কমন্স্ সভায়
উইন্স্টন্ চার্চিলের প্রদত্ত ভাষণ
২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১

অনেক বছর আগে ভাগ্যের সঙ্গে বোঝাপড়া করার শপথ নিয়েছিলাম আমরা। আজ সেই শপথ পালনের সময় এসেছে...যখন মধ্যরাতের ঘণ্টা বাজবে, ঘুমিয়ে থাকবে সারা পৃথিবী, তখন স্বাধীন ভারত জেগে উঠবে। কোন জাতির জীবনে এমন মুহূর্ত কদাচিৎ আসে যখন জীর্ণ পুরাতনের খোলস ভেঙে আমরা বেরিয়ে আসি এবং নতুনের দিকে পা বাড়াই ; যখন একটা যুগের শেষ হয় এবং একটা জাতির কুণ্ঠিত হৃদয়মন দীর্ঘদিনের পীড়ন থেকে মুক্ত হয়ে নির্ভীক হয়ে ওঠে......'

ভারতীয় সংবিধান পরিষদে
জওহরলাল নেহরুর প্রদত্ত ভাষণ
নয়া দিল্লি
১৪ আগস্ট, ১৯৪৭

www.pathagar.com

যে জাতি শাসক হয়ে জন্মেছে

লণ্ডন, ১লা জানুয়ারি, ১৯৪৭

সেবার শীতটা এক মহান জাতির জীবনে যেন এক ঘোর দুর্দিন হয়ে এল। কনকনে একটা বিষণ্ণ ঠাণ্ডা ভাব যেন কুয়াশার মতন লণ্ডনের বুকের ওপর ঝুলে আছে। ইংল্যাণ্ডের রাজধানী শহরে এমন নিরানন্দ নববর্ষের সকাল দৈবাৎ এসেছে। কদাচিৎ একটা সংসারে হয়ত দাড়ি কামানোর গরম জল পাওয়া যাচ্ছে। পাওয়া যাচ্ছে বেসিনের গামলা ধোবার জল। সকালটা এত ঠাণ্ডা যে শোবার ঘরের মধ্যেই সেই হাড় কাঁপানো শীতে জড়সড় হয়ে বসে শহরের অধিবাসীরা বছরের প্রথম দিনটাকে স্বাগত জানালো। শহরের অল্প কয়েকজন ভাগ্যবানেরই কপালে সেই সকালে খোয়ারি ভাঙার পানীয়র তলানি জুটেছে। নতুন বছরের সকালে তারাই ভাগ্যবান যারা কাল রাত্রের উৎসবে আট পাউণ্ড দাম দিয়ে এক বোতল হুইস্কি কিনতে পেরেছিল।

শহরের পথঘাট প্রায় জনমানবহীন। ক্বচিৎ ফুটপাত ধরে হেঁটে চলেছে গুটিকয় মানুষ। কেমন নিরানন্দ ভাব তাদের। তাপ্পিমারা জরাজীর্ণ পোশাকে শরীরটাকে কোনরকমে মুড়ে পথ চলেছে তারা। দৈবাৎ একটা দুটো মোটরগাড়ি দুষ্প্রাপ্য পেট্রল পুড়িয়ে পলাতক অপরাধীর মতন হুটহাট করে রাজপথ দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে। একটা অদ্ভুত কটু গন্ধ ভুরভুর করছে সারা শহরে। যুদ্ধোত্তর লণ্ডনের একটা বিশেষ অবদান এটা। হাজার হাজার বিধ্বস্ত ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ থেকে এই পোড়া গন্ধটা শরতের কুয়াশার মতন বাতাসে ভর করে শহরের বুকের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে।

তবুও এই দুঃখী অসুখী শহরটা হলো একটা বিজয়ী ব্রিটিশ জাতির রাজধানী শহর। ঠিক সতেরো মাস আগে এই শতাব্দীর সবচেয়ে মারাত্মক, ভয়ংকর লড়াইটা এরা জিতে নিয়েছিল। সেদিনই তাদের সাহস ও বীরত্ব সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে এই জাতির মানমর্যাদা অনেক বাড়িয়ে দেয়। তো এতবড় জয়ের যোগ্য মাসুল দিতে হয়েছে বৈকি জাতটাকে। অনেক বড় মাসুল। ভেতরে ভেতরে ক্ষয় হয়ে গেছে জাতটা। বড় বড় শিল্প রুগ্ন হয়েছে, রাজকোষ প্রায় বাড়ন্ত। একদা উদ্ধত দাম্ভিক পাউণ্ড স্টার্লিঙের এখন খাবি খাওয়া অবস্থা। শরীরে মার্কিন এবং ক্যানাডিয়ান ডলারের উত্তেজক ইঞ্জেকশন নিয়ে প্রাণটাকে জিয়ন্ত রেখেছে কোনক্রমে। নইলে যুদ্ধ পরবর্তী যুগের স্ফীতকায় ঋণের দায় ঘাড়ে নেবার ক্ষমতা তার হতো না। প্রায় রোজই একটা না একটা কারখানা বন্ধ হচ্ছে। দেশের বিশ লাখের ওপর মানুষ বেকার। এক যুগ আগে যত কয়লা উঠতো তার অর্ধেকও এখন খনি থেকে ওঠে না। ফলে রোজই কোথাও না কোথাও বিদ্যুৎ ছাঁটাই হচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

লণ্ডনবাসীর জীবনে এই নেই নেই-র হাহাকার চলছে গত সাতটা নববর্ষ থেকে। নিত্য ব্যবহার্য প্রায় প্রতিটি জিনিসই রেশনের আওতার মধ্যে আনা হয়েছে। খাদ্য, জ্বালানি, পানীয়, বিদ্যুৎ, জামাকাপড়, জুতো সবই কড়া রেশন ব্যবস্থায় বিলি-বন্টন হচ্ছে। 'স্টার্ভ অ্যাণ্ড শিভার', অর্থাৎ অনাহারে এবং শীতে কাঁপতে কাঁপতে মরো, ইদানীং এটাই হয়ে উঠেছে মানুষগুলোর কথার বুলি। অথচ কয়েকটা মাস আগে এরাই বুড়ো আঙুল উঁচিয়ে এবং দু আঙুলে 'ভি' চিহ্ন দেখিয়ে হিটলারের মতন অমন দুর্ধর্ষ মানুষটাকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিল।

www.pathagar.com

এবারের বড়দিনে আস্ত টার্কি কিনতে পেরেছিল প্রতি পনেরোয় একটা পরিবার। ক্রিশমাস ঈভের দিন বাচ্চারা তাদের পুঁজি খালি করেও সামান্য একটা খেলনা কিনতে পারেনি। খেলনার ওপর শতকরা একশভাগ ট্যাক্স চড়িয়েছে সরকার। লন্ডনের দোকানগুলোর কাঁচের শো-কেসে ঝোলানো 'নো' বোর্ড। আলু, কাঠ, কয়লা, সিগারেট, মাংস—সব বাড়ন্ত। একটা চরম বাস্তব অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে জাতটা। উপরন্তু দেশের সবচেয়ে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদের একটা নির্মম মন্তব্যও স্তম্ভিত করে দিয়েছে মানুষগুলোকে। দিন কয়েক আগেই জন মেনার্ড কীন্‌স্‌ জাতির উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, 'আমরা এখন গরিব হয়ে গেছি, তাই গরিবের মতন বাঁচা শিখতে হবে আমাদের।'

অবশ্য নতুন বছরের এই হাড়কাঁপানো শীতের সকালে এক কাপ চা খাবার মতন গরম জলের সংস্থান না থাকলেও গেরস্থর ভাঁড়ারে অন্য একটা দামী রত্ন গচ্ছিত ছিল। সেটা ওদের একটা অধিকার বা 'প্রিভিলেজ'। ইংরেজ হবার দরুন নীল-হলুদ রঙের একটা ছাড়পত্র (ডকুমেন্ট) পাবার এই 'প্রিভিলেজ' ওদের জন্মগত অধিকার। এই ছাড়পত্রটির নাম ব্রিটিশ পাসপোর্ট। এটি হাতে নিয়ে ওরা এই গ্রহের অন্তত এক-চতুর্থাংশ ভূখণ্ডে বুক ফুলিয়ে প্রবেশাধিকার সাব্যস্ত করতে পারে। ইংরেজ ছাড়া পৃথিবীর আর কোন জাতির এই অধিকার নেই। দেশ, রাষ্ট্র, কলোনি, আশ্রিত রাজ্য (protectorates) নিয়ে এই যে বিশাল সাম্রাজ্য বা ব্রিটিশ এম্পায়ার, সেটি তখনও অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের পয়লা জানুয়ারীর সকালেও সর্বৈব অখণ্ড ও অক্ষুণ্ণ ছিল। এই মহাজাতি সম্মেলনের আশ্রিত প্রজার সংখ্যা পাঁচশ ষাট মিলিয়ন। সাম্রাজ্যের আশ্রিত প্রজার মধ্যে আছে ভারতীয়, চৈনিক, প্রাক দ্রাবিড় আদিবাসী, মালয়েশীয়ান, অস্ট্রেলিয়া, ও কানাডাবাসী, আছে বুশমেন, হটেনটট্‌ সবাই। এরা সবাই তখনও ইংরেজের আশ্রিত প্রজা। অন্তত কনকনে ঠাণ্ডায় জবুথবু ইংরেজরা তখনও দাবি করতে পারতো যে এইসব ভূখণ্ডে যে কোন জায়গায় গিয়ে তারা দিব্যি বাস করতে পারে। হয়ত এর কোনটায় বসতি নেই, কোনটায় কাঁটাগাছ ভরা, কোনটা অত্যন্ত দুর্গম, কোনটা বা ঘনবসতিপূর্ণ। কিন্তু তখনও সব মিলিয়েই এই বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবং এটাই তার প্রধান গর্ব। তাই মধ্য লন্ডনের বিশাল 'বিগ্‌ বেন্‌' ঘড়ির ঘন্টা যখন সূর্যোদয়ের সময় বেজে উঠেছিল, তখন আত্মাভিমানী সব ইংরেজই ধরে নিয়েছিল যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কোথাও না কোথাও ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা উড়ছে।

বস্তুত এত বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকার বোধহয় কোন সীজার বা শার্লেমেঁ'য় (Charlemagne) আয়ত্ব করতে পারেননি কোনদিন। তিন শতাব্দী ধরে বিশ্বমানচিত্রের গায়ে সাম্রাজ্যবাদী অধিকারের লাল দাগগুলো দেখে কত ইংরেজ কিশোরের বুক গর্বে ফুলে উঠেছে। উদ্দীপ্ত হয়েছে তাদের এ্যাডভেঞ্চারের নেশা। চনমন করে উঠেছে ব্রিটিশ বণিকের লোভ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের আশা স্ফীত হয়েছে। শুধু কি সেইটুকু! অধিকৃত এই বিশাল অঞ্চলগুলো থেকে অবিচ্ছিন্ন স্রোতের মতন যেমন কাঁচা মাল এসেছে, তেমনি তৈরি জিনিসের নিরাপদ বাজারও করে দিয়েছে এইসব অঞ্চল। পুঞ্জিভূত হয়েছে অপরিমিত স্বর্ণসম্পদ। কারখানার কালো ধোঁয়া এবং অভিযানের রক্তে যত লাল হয়েছে এই সাম্রাজ্য, ততই বলবান হয়েছে এই ছোট্ট দ্বীপের পাঁচ কোটিরও কম মানুষ এবং রাজধানী লন্ডন শহরে বসে সসাগরা ধরণী শাসন করে চলেছে তারা।

www.pathagar.com

প্রায় পরিত্যক্ত রাজপথ দিয়ে তখন একটা কালো রঙের অস্টিন গাড়ি প্রায় মুখ লুকিয়ে পথ চলছিল। গাড়িটা চলেছে শহরের কেন্দ্রস্থলের দিকে। বাকিংহাম প্যালেস পেরিয়ে ম্যালের (Mall) দিকে ঘোরার সময় গাড়ির একমাত্র আরোহী অলস চোখে বাইরে তাকালেন। চোখের সামনে দিয়ে ঠাটবাটের সরণিগুলো দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে। চেয়ে থাকতে থাকতে কত পুরনো কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল তাঁর। এই বুল্যেভাড দিয়েই কত বিজয়োৎসবের মিছিল গেছে আগে। সবচেয়ে জমজমাট হয়েছিল মহারানী ভিক্টোরিয়ার হীরকজয়ন্তী উৎসবের সেই মিছিল। ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে ১৮৯৭ সালের ২২শে জুন তারিখের সেই মচ্ছবে মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজকীয় শকটখানা খট্‌খট্‌ শব্দ তুলে এই রাজপথ দিয়েই চলেছিল। সেই মহোৎসবে যে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে অংশ নেয় প্রায় অর্ধেক পৃথিবীর মানুষ। ভারত থেকে এসেছিল গুর্খা, শিখ, পাঠান, আফ্রিকার গোল্ডকোস্ট থেকে হুসাস্‌, সুদানের ফুজিউজি, হংকং থেকে চৈনিক, বোর্নিওর হেড্‌ হান্টার আদিবাসী ইত্যাদি। আর ছিল অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও কানাডার সৈন্যবাহিনী। পালা করে সেই রাজকীয় কুচকাওয়াজে অংশ নিয়ে তারা গর্ব বোধ করেছিল। গর্ব বোধ করেছিল ইংরেজরাও যারা সেদিন এই সমারোহপূর্ণ কুচকাওয়াজ দেখেছিল। তাদের মনে হয়েছিল বুঝি এই ঘনঘটা এক অসাধারণ স্বপ্ন সার্থক করতে চলেছে। কিন্তু তাদের এবং পরবর্তী প্রজন্মের মানুষগুলোর মনে সেদিন যে স্বপ্নজাল রচিত হয়েছিল, সেটাই বুঝি আজ ভেঙেচুরে যেতে চলেছে। বোঝাই যাচ্ছিল যে সাম্রাজ্যবাদের দিন শেষ হতে চলেছে এবং ইতিহাসের সেই অমোঘ নির্দেশটি পালন করতে চলেছেন ওই কালো অস্টিন গাড়ির একমাত্র আরোহী। তাই শুধু হতভাগ্য আরোহীই নন, কতশত বর্ণাঢ্য বিজয়াভিযানের মিছিল প্রত্যক্ষ করেছে যে রাজপথ সেও আজ নীরব দ্রষ্টা জাতির এই অবরোহণেরও।

গাড়ির পিছনের নরম গদির মধ্যে প্রায় ডুবে বসেছিলেন মানুষটি। তবে এখুনি তাঁর চোখের তারায় যে ছবিটা তিরতির করে কাঁপছে সেটা এই রাজপথ বা শহরের নয়। এখন তাঁর চোখের তারায় নাচছে সুইজারল্যাণ্ডের রোদ্রকরোজ্জ্বল সকালের গড়ানো স্কি মাঠের ছবিটা। সেখানেই ছুটি কাটাচ্ছিলেন তিনি। হঠাৎ জরুরী তলব এল। শেষ হয়ে গেল সুইজরল্যাণ্ডের অবসর-বিনোদনের কাল। লটবহর নিয়ে সোজা চলে এলেন জুরিখ্‌ এবং সেখান থেকে রয়্যাল এয়ার ফোর্সের এয়ারক্র্যাফ্‌ট চড়ে এসে নামলেন নর্থহোল্ট এয়ারপোর্টে।

গাড়ি এবার পার্লামেন্ট স্ট্রীট ছেড়ে একটা সরু রাস্তায় পড়লো এবং সরাসরি যে বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালো সেটা বোধহয় ইদানীংকালের সবচেয়ে চেনা দরজা। বাড়ির দরজার গায়ে নম্বর লেখা 'দশ' এবং সরু রাস্তার নাম ডাউনিং স্ট্রীট। গত ছ'বছর ধরে সারা পৃথিবীর চোখে একজন মানুষেরই ছবি নিবিড় করে ধরা ছিল এই বাড়ির সঙ্গে। মানুষটাব মুখে সিগার এবং হাতে ছড়ি। ইংরিজি অক্ষর 'ভি'-এর মতন দুটো আঙুল তুলে তিনি কালো হামবুর্গ গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়াতেন। প্রায় কিংবদন্তীর মানুষ হয়ে উঠেছিলেন উইন্সটন চার্চিল। এই বাড়িতে থেকেই দুটো যুদ্ধ করেছেন চার্চিল। একটা করেছেন অক্ষ (axis) শক্তিকে হারাতে অন্যটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বাঁচাতে। কিন্তু পয়লা জানুয়ারী সকালে ওই দশ নম্বর বাড়ির মধ্যে যিনি উদ্‌গ্রীব অপেক্ষায় বসে ছিলেন তিনি অন্যজন। তিনি সোশ্যালিস্ট প্রধানমন্ত্রী ক্লীমেন্ট এ্যাটলী। নেহাতই সাদামাটা চেহারার অপেক্ষাকৃত হীনপ্রভ এই মানুষটি

www.pathagar.com

সম্বন্ধেই অহংকারী চার্চিল একদা বলেছিলেন, 'বিনয়ের অবতার।'

ক্লীমেন্ট এ্যাটলী এবং তাঁর লেবার পার্টি ক্ষমতায় এসেছেন একটা অংগীকারে আবদ্ধ হয়ে ; একটা প্রকাশ্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই পার্টি ক্ষমতায় এসেছে। তারা কথা দিয়েছে যে জাতির গা থেকে সাম্রাজ্যবাদী খোলসটি তারা ধীরে ধীরে খুলে দেবে। বস্তুত, সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থিমোচনের (dismemberment) কাজটি শুরু হতে চলেছিল ভারতবর্ষ নামক সেই বিশাল ঘনবসতিপূর্ণ ভূখন্ড থেকে। উত্তরে খাইবার গিরিপথ থেকে শুরু করে দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ইংরেজ শাসিত অংশে স্বাধিকার দেবার প্রতিশ্রুতিটাই পালন করতে চলেছিল তারা। ব্রিটিশ রাজ নামক একদা সেই লজ্জাকর প্রতিষ্ঠানটি ছিল সাম্রাজ্য বিস্তারের একটা ওজর এবং একে বাঁচিয়ে রাখাই ছিল ব্রিটিশ জাতির সর্বক্ষণের দায়। এই লজ্জাকর দায় থেকে জাতিকে মুক্তি দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এ্যাটলী সরকার এবং সেটিই পালন করতে চলেছে তারা। বিখ্যাত বেংগল ল্যানসার (অশ্বারোহী সৈনিক), মহারাজার সিল্কের জোব্বা, রোমাঞ্চকর বাঘ শিকার, সবুজ পোলোমাঠ, মাথার পাগড়ি, হুইস্কির ছোট পেগ, সোনার চাঁদোয়া ঢাকা হাতীর হাওদা, ভুখা সাধু, বদমেজাজী মেমসাহেব—প্রায় গল্পকথার সামিল এই ভারতবর্ষটাই এতদিন সাম্রাজ্যবাদের স্বপ্ন সার্থক করে এসেছে। আজ তাই সেই স্বপ্নসৌধটি ভেঙে দিতে সাম্রাজ্যবাদী স্বপ্নের সূতিকাগার দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে আসছেন রীয়ার এড্‌মিরাল লুই মাউন্টব্যাটেন।

লুই ফ্রান্সিস এ্যালবার্ট ভিক্টর নিকোলাস মাউন্টব্যাটেন একজন উচ্চপদস্থ নৌ সেনাপতি। ছেচল্লিশ বছরের এই মানুষটিই একদা ছিলেন ভাইকাউন্ট অব বর্মা। তৎকালীন ইংল্যান্ডের সর্বাধিক যোগ্য এই রাজকর্মচারী যেমন গুণে তেমনি শরীরের মাপেও রীতিমত বড়সড়-চেহারার। মাথায় ছ'ফুটের বেশি লম্বা এই মানুষটার নিয়মিত ব্যায়াম করা শরীরের কোথাও বাড়তি মেদ নেই। গত ছ'বছর ধরে মাথার ওপরে বিপুল দায়িত্বের বোঝা থাকা সত্ত্বেও, খবরের কাগজে নিয়মিত ছাপা হওয়া তাঁর অতি চেনা মুখে এতটুকু ক্লান্তি বা দুশ্চিন্তার ছাপ পড়তে দেখেনি কেউ। বরং মুখশ্রীতে কোন বিষণ্নতা না থাকায় টানটান বাঁধুনির মুখের আদলটি এমন সুস্থির ও স্বাস্থ্যবান যেন তা সর্বকালের আদর্শ মনে হয়। দুই কটা চোখের ভীষণ দৃষ্টি, মাথার ওপর থাক থাক করে সাজানো ঘন কালো চুলের রাশ—সব মিলিয়ে মনে হয় সময় যেন ষড় করে পাঁচ বছর বয়স কমিয়ে দিয়েছে মানুষটার। অন্তত সেই জানুয়ারির সকালে মানুষটার সেই চেহারাই চোখের ওপর ভাসছিল যেন।

মাউন্টব্যাটেন ভাল করেই জানেন আজ কেন তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুপ্রিম এ্যালায়েড কম্যান্ডার বা প্রধান সেনানায়কের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবার পর থেকেই প্রায়ই তাঁকে ডাউনিং স্ট্রীটের বাড়িতে আসতে হয়েছে। তিনি এসেছেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির প্রধান পরামর্শদাতা হয়ে। গতবারের আলোচনার সময়ই প্রধানমন্ত্রীর কৌতূহল এমন এক অঞ্চলের ওপর সীমাবদ্ধ হয়েছিল যা আদৌ মাউন্টব্যাটেনের কর্তৃত্বের মধ্যে ছিল না। অঞ্চলটা ভারতবর্ষ এবং তাই আভাসটি পাওয়ামাত্রই মাউন্টব্যাটেনের মনে এক ম্লান, বিষণ্ণ উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। তবে কি? হ্যাঁ তাই। উদ্বেগের পূর্বানুমান যথার্থ। এ্যাটলী এবার তাঁকেই ভারতবর্ষের বড়লাট বাহাদুর পদে মনোনীত করতে চাইছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এই বড়লাট বা ভাইসরয় পদটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই পদে বসেই ধারাবাহিক-

www.pathagar.com

ভাবে ইংরেজ রাজপুরুষরা এতদিন ধরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত প্রায় এক-পঞ্চমাংশ প্রজাদের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে শাসন করে এসেছেন। তবে দুর্ভাগ্যবশত মাউন্টব্যাটেনের কাজটি একটু অন্যরকম হতে চলেছে। এবার হাতে রাজদণ্ড নয়। উনি শাসক হয়ে আসবেন না। ওদের মুক্তিপত্র হাতে নিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে বসতে চলেছেন তিনি। বাস্তবিক, ইংলিশম্যান হিসেবে এর চেয়ে বেদনাদায়ক কাজ আর কি হতে পারে? তাঁর হাত দিয়েই কি ঘটবে এই খেলা ভাঙার খেলা?

অবশ্য মাউন্টব্যাটেন নিজেও এই সিদ্ধান্তের অন্যথা চাননি। ইংরেজদের ভারত ছাড়ার সময় যে হয়ে এসেছে এ-ব্যাপারে তাঁর নিজেরও কোনো সংশয় ছিল না। কিন্তু এটি পালন করার দায় তাঁকে কেন দেওয়া হচ্ছে? এত দীর্ঘদিনের এই সম্পর্ক ছিন্ন করার ঐতিহাসিক কাজটি তাঁর হাত দিয়ে কেন হবে? স্বভাবতই মাউন্ট-ব্যাটেনের মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল এই প্রস্তাব শুনে। ফলে এ্যাটলীকে বিরত করতে একটার পর একটা ছোট বড় নানা দাবি পেশ করেছিলেন মাউন্টব্যাটেন। একাধিক সেক্রেটারি চাই যাঁরা তাঁর সর্বক্ষণের সংগী হবেন। চাই তাঁর নিজস্ব অধি-কারের একটা এয়ারক্র্যাফ্ট্—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাঁর নিজস্ব দখলে যে ইয়র্ক এম. ডব্লু. ১০২ এয়ারক্র্যাফ্ট্টা ছিল, সেটাই তাঁর দরকার। কিন্তু কি আশ্চর্য! এ্যাটলী তাঁর সব দাবিই মেনে নিয়েছেন। তবুও আজ শেষ চেষ্টা করতে এসেছেন মাউন্টব্যাটেন। এখনও তাঁর ক্ষীণ আশা যে হয়ত অবুঝ হবেন না এ্যাটলী। অন্তত তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করবেন এবং এই লজ্জাকর দায়িত্বভার থেকে তাঁকে রেহাই দেবেন তিনি।

বিবর্ণ মুখে যে মানুষটি তখন অধীরভাবে মাউন্টব্যাটেনের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন, তাঁর চেহারাতেই ফুটে উঠেছে এই নিষ্প্রাণ শহরটার অবিকল আদল। মানুষটার যেমন তেমন করে ছাঁটা গোঁফ এবং পরনের বেঢপ টুইডের স্যুটটা দেখে মনে হয় না যে ইস্ত্রির সযত্ন ছোঁয়া পেয়েছে কখনও। তাঁর অধীর অপেক্ষার মধ্যেই ফুটে উঠেছিল এই উদাসীন ভাবটা। তবে লেবার পার্টির প্রাইম মিনিস্টার হয়ে মাউন্টব্যাটেনের মতন এমন ঝকমকে চেহারার বুদ্ধিদীপ্ত রাজপুরুষকে এ কাজের জন্য কেন বাছলেন, কেন তাঁর হাত দিয়েই পার্টির দেওয়া প্রথম প্রতিশ্রুতিটি পালন করাতে চাইলেন, সেটাই প্রথম দর্শনে ভয়ানক অসংগত মনে হচ্ছিল সেদিন।

সাধারণ মানুষের কাছে মাউন্টব্যাটেনের যে ভাবমূর্তি ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ছিলেন আসল মানুষটি। তাঁর নৌ সেনানায়কের পোশাকের সামরিক অলংকরণগুলোই এর প্রমাণ। সাধারণ মানুষ ভাবতো মানুষটি বোধহয় এ্যাস্ট্যাব-লিশমেন্টের ধামাধরা। আবার কর্তৃপক্ষ মনে করতো সস্ত্রীক মাউন্টব্যাটেন ধুরন্ধর সমাজবাদী। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ভূখণ্ডে মানুষটার ক্ষমতা এবং সেখানকার রাজ-নৈতিক জ্ঞান এত গভীর ছিল যা তৎকালীন ইংল্যান্ডের কোন রাজনৈতিক নেতারই তেমন ছিল না। বলতে কি, কেউই তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না এই বিষয়ে। এই সব অঞ্চলের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সব খুঁটিনাটিই তাঁর নখদর্পণে ছিল। ফলে এখানকার রাজনৈতিক আন্দোলনগুলো সাফল্যের সংগেই তিনি সামাল দিতে পেরে-ছিলেন। ইন্দোচায়নার হো চি মীন, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ, ব্রহ্মদেশের আউং সাং, মালয়ের চীনা কমিউনিস্ট, সিংগাপুরের বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকারী —এদের সকলের সংগেই বনিবনা করে চলেছিলেন মাউন্টব্যাটেন। তিনি বুঝেছিলেন যে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এরাই হবে এশিয়ার রাষ্ট্রনায়ক। প্রতিনিধিত্ব করবে

www.pathagar.com

এশিয়া ভূখণ্ডের। তাই কর্তৃপক্ষ চাইলেও এদের সঙ্গে বিরোধে যাননি তিনি। তিনি বুঝতে পারছিলেন এবার তাঁকে ভারতে পাঠানো হচ্ছে ওখানকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনটি সামাল দেবার জন্য। তিনি জানতেন যে ভারতবর্ষের এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সবচেয়ে পুরনো এবং এর প্রকৃতিও কিছুটা অন্যরকম। পাঁচশ বছর ধরে যে উদ্দীপ্ত আন্দোলন সারা ভারত তোলপাড় করেছে, সেই প্রতিবাদী নেতৃত্বই এ্যাটলীর লেবার পার্টিকে এমন একটা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে। হয় সময় থাকতে ব্রিটেন ভারত ছাড়ুক নয়ত ইতিহাসের-অমোঘ নির্দেশে এবং বিপ্লবীদের তাড়নায় তাকে ভারত ছাড়া হতেই হবে।

এই কথাটা বোঝাতেই কি মাউন্টব্যাটেনকে ডেকে পাঠিয়েছিন পি. এম.? তার আগে এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক চেহারার একটা সঠিক ধারণা করে দিতে চাইলেন প্রধানমন্ত্রী। ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তখন সত্যিই জটিল। একটা করে দিন যাচ্ছে আর মনে হচ্ছে যে সঙ্কট আরও ঘনীভূত হলো। মনে হচ্ছে তখনই একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। অথচ ইতিহাসের এটাই সবচেয়ে বড় অসঙ্গতি যে এই চরম সংকটময় মুহূর্তে ব্রিটেন যখন স্বরাজ দেবার জন্য তৈরি, তখন ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সে তা পারছিল না। ভারতের মাটিতে ব্রিটেনের পক্ষে যা হতে পারতো প্রীতিকর এক অভিজ্ঞতা, তা হয়ে উঠলো বিষবৎ। ভয় ও আতঙ্কের এক বীভৎস দুঃস্বপ্ন। এতকাল কলোনি শাসনের মানদণ্ডে ভারত শাসন করে এসেছে ব্রিটেন। হুমকি দিয়ে, চোখ রাঙিয়ে সে শাসন করেছে। ফলে তেমন রক্তপাত ঘটেনি তখনও। কিন্তু দেশটা ছেড়ে যাবার সময় চিত্রটা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিপরীত। না জানি কত রক্তক্ষয় হবে বিদায় বেলায়! তাঁর আশঙ্কা, দেশ জুড়ে হিংসার এই তাণ্ডবের চেহারাটা এমন অতিকায় হবে যা গত সাড়ে তিনশ' বছরে কখনও হয়নি।

কিন্তু এই সর্বনাশা হিংসার উৎসটা কোথায়? মুখোমুখি নিঃশব্দে বসে আছেন দুজন। খানিক পরে নীরবতা ভেঙে পি. এম. আবার শুরু করলেন বলতে। হ্যাঁ, এর মূলে রয়েছে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘকালের রেষারেষি। একদিকে তিরিশ কোটি হিন্দু, অন্যদিকে দশ কোটি মুসলমান। এই সাম্প্রদায়িক, ধর্মীয় বিরোধ আজকের ঘটনা নয়। এই ধারা চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। একে উসকানি দিয়েছে ইংরেজের তৈরি দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য। অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে ডিভাইড অ্যান্ড রুল পদ্ধতিতে এতদিন এই বিভেদটা জিইয়ে রেখেছিল ইংরেজ। এখন নিজেরাই এর ফাঁদে ধরা পড়ে গেছে। দশ কোটি মুসলমানের নেতারা দাবি করছে ইস্লামিক রাষ্ট্র তাদের চাই-ই। শুধু দাবি নয়। তারা হুমকি দিয়েছে এ দাবি মানা না হলে এশিয়ার ইতিহাস গৃহযুদ্ধের রক্তে লাল হয়ে যাবে।

পাশাপাশি হিন্দু শিবিরের চেহারাটা একেবারে অন্যরকম। তিরিশ কোটি হিন্দুর কর্তাব্যক্তি নেতারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল যেমন ভাবে হ'ক দেশবিভাগ তারা প্রতিরোধ করবেই। স্বদেশের অঙ্গহানিতে দেশমাতার অবমাননা হয়। দেশমাতৃকা অপবিত্র হন। সুতরাং যে কোনো মূল্যে এই দেশভাগ তারা রুখবে। আপাতত এই দুই বিপরীত সংকল্পের টানাপোড়েনের ফাঁদেই আটকে পড়েছে শাসক ইংরেজ। তার পায়ের তলার নরম মাটির মধ্যে সে এমনভাবে প্রবিষ্ট হচ্ছে যে কিছুতেই উদ্ধার হতে পারছে না। ভারতের বর্তমান বড়লাট ফিল্ডমার্শাল সার আর্চিবল্ড ওয়াভেল একজন সৎসাহসী সংগ্রামী সেনাপুরুষ। স্বজাতির এই সঙ্কট সময়ে

www.pathagar.com

তিনিও নিশ্চিত জীবনযাপন করতে পারছেন না। তিনি সুপারিশ করেছেন যে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যবন্ধনের চেষ্টা বিফল হলে, সরকার নির্দ্বিধায় ঘোষণা করে বলুক, 'স্বইচ্ছায়, উপযুক্ত সময়ে এবং আমাদের স্বার্থেই আমরা ভারত ছেড়ে যাব। তবে আমাদের এই কর্মসূচিতে কোনরকম বাধা সৃষ্টির চেষ্টা হলে তা হবে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার সামিল। তখন সর্বশক্তি প্রয়োগ ক'রে আমরা তার বোঝাপড়া করবো।' একটু চুপ করে রইলেন এ্যাটলী, তারপর স্বীকার করলেন যে এইভাবেই ব্রিটেন ও ভারতবর্ষ মুখোমুখি সংঘাতের দিকে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে। অথচ অবস্থাটা তো এভাবে চলতে দেওয়া যায় না! ওয়াভেল খুবই মার্জিতরুচির ও অল্পকথার মানুষ এবং সবচেয়ে বেদনাদায়ক হলো যে স্বভাবগম্ভীর মুখচোরা এই মানুষটি বহুভাষী ভারতীয়দের সঙ্গে প্রকৃত বন্ধুত্বও করতে পারেননি। তাই মরিয়া হয়ে ব্রিটিশ সরকার একটি নতুন মুখের তল্লাশ করতে চাইছে যে নতুন কোন প্রস্তাব নিয়ে সঙ্কটটাকে এড়াতে পারবে। প্রতিদিন সকালে ভারতবর্ষের কোন না কোন অঞ্চল থেকে বর্বর হত্যাকাণ্ডের খবর নিয়ে তাড়া তাড়া টেলিগ্রাম এসে পৌঁচচ্ছে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসে। সুতরাং দেশ ও জাতির স্বার্থে মাউন্টব্যাটেনের পবিত্র কর্তব্য হবে তাঁর উপরে দেওয়া দায়িত্বটা গ্রহণ করা।*

এ্যাটলীর কথাগুলো শুনতে শুনতেই ভাবী অমঙ্গলের ইসারা দেখতে পেলেন মাউন্টব্যাটেন। তাঁর মন ভারী হয়ে উঠলো দুশ্চিন্তায়। এটা যে সম্পূর্ণ 'হতাশ এবং অবাস্তব প্রস্তাব', সে ব্যাপারে তাঁর মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব রইলো না। তিনি নিশ্চিত বুঝতে পারছিলেন যে এই পথে এগোলে কোনদিনই সুফল আসবে না। ওয়াভেলকে তিনি জানেন। তাঁর কাজের ধারার প্রশংসাও করেছেন তিনি। ওয়াভেলের বাস্তব-বুদ্ধি সম্বন্ধেও চিন্তান্বিত হবার কারণ আগে ঘটেনি। বরং এর আগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুপ্রিম কমাণ্ডার হিসাবে যতবার দিল্লি এসেছেন এবং এই অঞ্চলের রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন, তখনও মনে হয়নি যে ওয়াভেল আকাশ-

---

*মাউন্টব্যাটেন সম্ভবত জানতেন না যে, তাঁকে ভারতবর্ষে পাঠাবার প্রস্তাব দেন এ্যাটলীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর সরকারের অর্থমন্ত্রী স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্। সেই ডিসেম্বরেই লণ্ডন শহরে স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ এবং জওহরলাল নেহেরুর অতি ঘনিষ্ঠ বামপন্থী কংগ্রেস নেতা স্পষ্টবাদী ভি. কে. কৃষ্ণমেননের মধ্যে এক গোপন বৈঠক হয়েছিল। কৃষ্ণমেননই তখন কংগ্রেস দল এবং জওহরলালের মনের কথাটি ক্রিপ্‌স্‌কে বুঝিয়ে দেন। তিনি বলেছিলেন যে, যতদিন লর্ড ওয়াভেল বড়লাট থাকবেন, ততদিন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার কোন রকম উন্নতি হবে না। কৃষ্ণমেনন আভাসে-ইঙ্গিতে তাঁকে বুঝিয়ে দেন, ওয়াভেলের বদলে জওহরলাল এবং তাঁর কংগ্রেস দল যে মানুষটিকে মনে মনে চাইছেন, তিনি হলেন রবার্ট লুই মাউন্টব্যাটেন। ক্রিপ্‌স্ রাজি হন এ প্রস্তাবটি মি. এ্যাটলীকে বলতে। তবে তাঁরা দুজনেই স্বীকার করেন যে রাজনৈতিক স্বার্থেই এই নিয়োগের পূর্বইতিহাস মুসলমান নেতাদের কাছে গোপন রাখা হবে। অতএব এতবড় রাজনৈতিক সিদ্ধান্তটি এতকাল গোপন রাখাই হয়েছিল। ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর মৃত্যুর ঠিক এক বছর আগে কৃষ্ণমেনন নিজেই স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্-এর সঙ্গে তাঁর আলোচনার অনুপুঙ্খ বিবরণ দেবার সময় নতুন দিল্লির এক রাজনৈতিক প্রতিবেদকের কাছে হাটে হাঁড়ি ভাঙেন!

www.pathagar.com

চারী বিহংগ। সুতরাং যেখানে তিনি অক্ষম হলেন সেখানে মাউন্টব্যাটেনই বা কতটুকু সফল হতে পারবেন? তবে একথাও তিনি বুঝেছেন যে চাইলেই তিনি নিষ্কৃতি পাবেন না। প্রায় ধরে-বেঁধেই তাঁর ঘাড়ে দায়িত্বটা চাপিয়ে দিতে চাইছেন এ্যাটলীর সরকার। কিন্তু কেন? ওঁরা কি বুঝে ফেলেছেন যে মাউন্টব্যাটেন কৃতকার্য হবেন না? অর্থাৎ এতদিন ধরে তিলতিল করে যে সুনামের সৌধ তিনি গড়েছেন তা এবার চুরচুর করে ভেঙে যাবে! পাহাড়প্রমাণ ত্রুটির ভার সইতে পারবে না তাঁর তৈরি গজদন্ত মিনার! তাই যদি হয় তবে বিনা শর্তে এই নিয়োগ তিনি মেনে নেবেন না। মনে মনে দৃঢ় হলেন মাউন্টব্যাটেন। তাঁর মনে হলো হয়ত এমন কিছু রাজনৈতিক শর্ত আরোপ করা যায়, যেগুলি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এ্যাট্লীর মেনে নেওয়া কঠিন হবে। মাউন্টব্যাটেন মনে মনে স্থির করেছেন আজ সেই শর্তের কথাই প্রধানমন্ত্রীকে জানাবেন। ওয়াভেলের সঙ্গে আলাপের সময়ই তাঁর মনে হয়েছিল যে তেমন শর্ত আরোপের অবকাশ আছে। কিন্তু কী সেই শর্ত? প্রধানমন্ত্রী নিঃশব্দে চেয়ে ছিলেন মাউন্টব্যাটেনের দিকে। নৈঃশব্দ ভেঙে মাউন্টব্যাটেন শুরু করলেন তাঁর কথা। তিনি প্রথমেই বললেন যে, ব্রিটেনকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করতে হবে কবে তারা ওদেশ ছেড়ে চলে যাবে। নড়েচড়ে বসলেন এ্যাট্লী। এর কি কোন দরকার আছে? আছে। এইরকম একটা ঘোষণাই ভারতবর্ষের সন্দিগ্ধ বুদ্ধিজীবীদের কিছুটা আশ্বস্ত করতে পারে। যখনই তারা বুঝবে যে একটা বিশেষ দিনক্ষণ দেখে বিদেশী ইংরেজ শাসক রাজপাট ছেড়ে চলে যাবে, তখনই তারা নেতাদের আলোচনায় বসতে পরামর্শ দেবে। [১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর লন্ডন ভিজিটের সময় লর্ড ওয়াভেলও নাকি দেশত্যাগের একটা সময়সীমা বেঁধে দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন।]

মাউন্টব্যাটেন এবার তাঁর দ্বিতীয় শর্তের কথা বললেন। এ এমন এক শর্ত যা তাঁর আগের কোন বড়লাটও দুঃসাহস করে জানাননি। মাউন্টব্যাটেন বললেন যে দেশ শাসন করার পূর্ণ স্বাধিকার তাঁকে দিতে হবে। শুধু তাই নয়, এই ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারও হবে তাঁর একান্ত। এ ব্যাপারে লন্ডন থেকে প্রতিনিয়ত হস্তক্ষেপ বা হুঁশিয়ারি তিনি মেনে নেবেন না। এ্যাট্লী সরকার তাঁকে লক্ষ্যবস্তু চিনিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু পথ নির্ণয় করবেন তিনি। ক্যাপ্টেন যখন তিনি তখন জাহাজ চালাবার দায়িত্বও তাঁর।

মাউন্টব্যাটেনের দাবির বহর শুনে এ্যাট্লী স্তম্ভিত। বলে কি মানুষটা? মাউন্টব্যাটেনের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই আপনি হিজ্ ম্যাজেস্টিস্ সরকারের চেয়েও বেশি ক্ষমতা (প্লেনিপোটেনশ্যারি পাওয়ার্স) চাইছেন না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। আমি ঠিক তাই চাইছি। নইলে প্রত্যেক পদক্ষেপে ক্যাবিনেটের মতামত নিয়ে কাজ করতে হলে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠবে।' বললেন মাউন্টব্যাটেন।

স্তম্ভিত এ্যাট্লী চুপ করে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। মাউন্টব্যাটেনও চুপ। একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঝুলে আছে ঘরের মধ্যে। তবে মাউন্টব্যাটেন তখন আত্মতুষ্ট। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে তাঁর এমন শ্বাসরোধকারী দাবির কথা শুনে প্রধানমন্ত্রী স্তব্ধ হয়ে গেছেন। তাই দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে তাঁর মুখে। মাউন্টব্যাটেন নিশ্চিত জানতেন যে তাঁর দাবি প্রধানমন্ত্রী মানতে পারবেন না। সুতরাং এ্যাট্লী নিজেই প্রস্তাবটা ফিরিয়ে নেবেন এবং মাউন্টব্যাটেনও এ-যাত্রায় রেহাই

www.pathagar.com

পাবেন। কিন্তু তা হলো না। অনেকক্ষণ চিন্তার পর খুশী মনেই মাউন্টব্যাটেনের সব দাবিই মেনে নিলেন প্রধানমন্ত্রী এবং ঠিক এক ঘণ্টা পরে দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটের গেট পেরিয়ে চিন্তাভারগ্রস্ত যে মানুষটি পরাভূত সৈনিকের মতন মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেলেন তিনি স্বয়ং মাউন্টব্যাটেন। ব্রিটেনের লেবার পার্টির সরকার তাঁর হাত দিয়েই দেশবাসীর বড় সাধের সাম্রাজ্যবাদী স্বপ্নসৌধটি ধূলিসাং করতে চাইছে। তিনিই হতে চলেছেন ভারতের শেষ বড়লাটরূপী নিষ্ঠুর ঘাতক।

গাড়িতে উঠেই বিমর্ষ মাউন্টব্যাটেনের মন একটা অদ্ভুত চিন্তাভারে আচ্ছন্ন হলো। তাঁর মনে হচ্ছিল সত্তর বছর আগে এইরকম এক মুহূর্তে তার প্র-পিতামহী ভারতের মহারানীরূপে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। দিল্লী শহরের বাইরে খোলা আকাশের নীচে এক জমজমাট ও বর্ণময় পরিবেশে তাঁর অভিষেক হয়েছিল। ভারতের দেশীয় রাজন্যবর্গ যাঁরা নিমন্ত্রিত হয়েছিল, তারা সবাই কামনা করেছিল যেন সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরীয়ার এই সার্বভৌম অধিকার চিরকাল অটুট থাকে। কিন্তু হায়! আজ এ কি পরিণতি হতে চলেছে! সত্তর বছর পরে নতুন বছরের প্রথম দিনটিতে সেই চিরকালীন অধিকার খর্ব হতে চলেছে মহারানী ভিক্টোরিয়ার উত্তরপুরুষের হাত দিয়েই। ঘটতে চলেছে সেই নিধনযজ্ঞ যার ফলে চিরকালের মতন শেষ হয়ে যাবে ব্রিটিশের সার্বভৌম অধিকারের গৌরব।

প্রায়ই দেখা গেছে যে, ইতিহাসের অনেক বড়সড় এবং বিখ্যাত ঘটনার সূচনাটি হয় অতি তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর। ব্রিটেনের উপনিবেশ গড়ার যে কাহিনী তারও সূত্রপাত হয়েছিল সামান্য ঘটনা থেকে। হয়ত গল্পকথা মনে হবে, কিন্তু সামান্য পাঁচ সিলিং দাম বাড়ার ঘটনা থেকেই শুরু হয়েছিল সেই ঐতিহাসিক অভিযান। তখন ওলন্দাজ বণিকরা আন্তর্জাতিক মসলার বাজার নিয়ন্ত্রণ করতো। হঠাৎ এক পাউন্ড গোলমরিচের দাম পাঁচ সিলিং বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিবাদেই চব্বিশজন ব্রিটিশ বণিক একটা কোম্পানি খোলার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৫৯৯ খ্রীঃ ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখের সন্ধ্যা নাগাদ লন্ডনের লীডেনহল্ স্ট্রীটের এক ভাঙাচোরা বাড়িতে তারা একটা সভা করলো। সিদ্ধান্ত হলো যে ১২৫ জন শেয়ার হোল্ডার এবং ৭২ হাজার পাউন্ড শেয়ার ক্যাপিটাল নিয়ে তারা একটা কোম্পানি খুলবে। এই বাণিজ্য সংস্থার একটাই লক্ষ্য হবে। সেটি হলো লক্ষ্মীর আরাধনা। অর্থাৎ টাকায় টাকা লাভ। সেই-ই শুরু। নেহাতই অনাড়ম্বর শুরু। তারপর একটু একটু করে বড় হয়েছে কোম্পানি। বদল হয়েছে তার কাঠামোর। এইভাবেই কখন সবার অজান্তে বণিকের হাতের মানদণ্ড রাজদণ্ড হয়ে উঠেছে তা কেউ খেয়াল করেনি। হঠাৎ একদিন দেখা গেল 'ব্রিটিশ রাজ' নামক এক ঔপনিবেশিক শক্তি সবার অলক্ষ্যে জন্ম নিয়েছে বণিক সংস্থার সূতিকাগারে।

একশ পঁচিশজন শেয়ার হোল্ডার নিয়ে তৈরি এই কোম্পানি রাজসনদ পেল ১৫৯৯ খ্রীঃ ১৫ ডিসেম্বর তারিখে। সম্রাজ্ঞী প্রথম এলিজাবেথের সই করা এই ফরমান (রয়্যাল চার্টার) হাতে নিয়ে কোম্পানির কর্ণধাররা এক বিরাট ভূখণ্ড জুড়ে বাণিজ্য করার অধিকার পেল প্রথম পনেরো বছরের জন্যে। এই ঘটনার ঠিক আট মাস পরে 'হেক্টর' নামে পঁচিশ টনের এক বাণিজ্য জাহাজ ১৬০০ খ্রীঃ ২৪শে আগস্ট তারিখে বোম্বাইয়ের উত্তরে অবস্থিত ছোট্ট সুরাট বন্দরে নোঙর করলো। অর্থাৎ সেদিনই ব্রিটিশরা প্রথম ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিয়েছিল। ভারতের মাটিতে ইং-

www.pathagar.com

রেজদের এই পদার্পণ সেদিন খুবই সাদামাটা নিরীহ হলেও জাহাজের ক্যাপ্টেন উইলিয়ম হকিন্সের মনোভাবটা খুব সাধু বা নিরীহ ছিল না। লোকটার আদত ছিল দস্যুবৃত্তির। দেশ আবিষ্কারের চেয়ে লুটের নেশা বেশি ছিল তার। ফলে বন্দরে নেমেই গ্রামে গঞ্জে ঢুকে পায়রার ডিমের আকারের চুনি পান্না খুঁজে বেড়াতে লাগলো সে। তার ধারণা, দেশটার সর্বত্র থরে থরে ছড়িয়ে আছে মরিচ, আদা, দারুচিনি গাছ। এইসব গাছের পাতার আকার এত বিশাল যে অদের ছায়ায় আশ্রয় নিতে পারে এক আস্ত পরিবার। তাছাড়া সে শুনেছিল যে এদেশের হাতীদের অণ্ডকোষ থেকে নিঃসৃত শুক্ররস এক চুমুক পান করলে নাকি চিরযৌবন লাভ করা যায়।

কিন্তু সুরাট থেকে আগ্রা যাবার পথে স্বপ্নের এই ভারতবর্ষ চোখে পড়লো না হকিন্সের। তবে যাত্রার সবটাই নিষ্ফল হলো না। খানিকটা লোকসান পুষিয়ে দিলেন স্বয়ং বাদশা। যাত্রার সব ধকল নিমেষে অন্তর্হিত হলো যেদিন মোগল বাদশার কৃপা দর্শন পেল সে। মোগল সম্রাটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উইলিয়ম হকিন্সের তখন মনে হচ্ছিল এ'র পাশে ইংল্যাণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের রাজসভা কত ম্যাড়মেড়ে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের পাশে রানী এলিজাবেথকে সামান্য এক জমিদারনী ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। রাজকীয় বৈভব, আড়ম্বর দেখে স্তম্ভিত হকিন্সের মনে হচ্ছিল সাত কোটি মানুষের এই দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজসভা বোধহয় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ। ধনে, মানে, ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠ এই বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের চতুর্থ নৃপতি জাহাঙ্গীরকেই বলা যায় ভারতের সর্বশেষ চক্রবর্তী সম্রাট।

ক্যাপ্টেন উইলিয়ম হকিন্সই সম্ভবত প্রথম ইংরেজ যাকে বাদশাহ জাহাঙ্গীর উপযুক্ত মর্যাদা দেন। রাজসভায় হকিন্সের আপ্যায়নের ঘটা দেখে ইস্ট ইণ্ডিয়া ট্রেডিং কোম্পানির একশ' পঁচিশজন শেয়ার হোল্ডারের মাথা ঘুরে গিয়েছিল। সম্ভ্রান্ত রাজপরিবারের একজন মান্য অতিথি হওয়া ছাড়াও হকিন্সের কপালে আর একটা লোভনীয় সওগাত জোটে। সম্রাটের হারেমের অন্যতম সেরা সুন্দরী এক আর্মেনিয়ান যুবতীকে তার ভোগের জন্যে দান করেন জাহাঙ্গীর। তবে শেয়ার হোল্ডারদের বুকে ঈর্ষার কাঁটাটি বেঁধার আগেই একটা সুযোগও জুটিয়ে দিল হকিন্স। সুন্দরী নারীর সংগে শুধু অবাধ সংগলাভ নয়, উইলিয়ম হকিন্সের আগ্রায় আসার ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া ট্রেডিং কোম্পানির সৌভাগ্যের দ্বারটিও খুলে গেল এই সঙ্গে। শুধু হকিন্সই নয়, রাজানুগ্রহ পেল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিও। বাদশাহ জাহাংগীর যে ফরমানটি জারি করলেন তার ফলে বোম্বাইয়ের উত্তরে সুরাট বন্দরে কারবারের অনুমতি পেল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। সে এক অকল্পনীয় সাফল্য। মাসে দুবার টেম্‌স্‌ নদীর জেটি ভরে যেতে লাগলো ভারত থেকে কোম্পানির পাঠানো কাঁচা পণ্যে। সুগন্ধী মসলা, গঁদ, চিনি, র (raw) সিল্ক, অতিসূক্ষ্ম সুতিবস্ত্র মসলিন ইত্যাদি যা এল সেগুলিই তৈরি পণ্য হয়ে ফিরে যেতে লাগলো ভারতবর্ষের খোলা বাজারে। সে এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ। বন্যার মতন লাভের টাকা ঘরে আসতে লাগলো। লভ্যাংশের পরিমাণ কোথাও কোথাও বেড়ে দাঁড়ালো শতকরা ২০০ ভাগ। কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারদের কপাল খুলে গেল এক ধাক্কায়।

তা সেদিন ভারতবর্ষের মাটিতে ইংরেজদের মেনে নিয়েছিল ভারতবর্ষের তামাম মানুষ। গরিবগুরবো থেকে শুরু করে রাজারাজড়া সবাই। এই মানিয়ে নেওয়ার পিছনে ইংরেজের পাটোয়ারি বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। স্পানিয়ার্ডরা দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার নামে উপনিবেশ তৈরি করতে চেয়েছিল বলে

www.pathagar.com

অপবাদ কুড়োয়। ধড়িবাজ ইংরেজরা সে পথে গেল না। ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিয়েই তারা সাড়ম্বরে বলতে লাগলো যে তারা বিদেশী বণিক। এদেশে এসেছে লক্ষ্মীর আরাধনা করতে। তাদের আরাধ্য দেবতা 'ধর্ম' নয়। তাদের আরাধ্য দেবতা 'ধন' (Mammon God)। সুতরাং রাজ্য জয় নয়, লক্ষ্মীর বরপুত্র হতেই তারা এদেশে এসেছে। তাদের নীতি হলো বাণিজ্য করা, ভূম্যাধিকার করা তাদের নীতি নয়। ফলে কোম্পানির প্রশাসকরা যে কথা তখন সগৌরবে ঘোষণা করতো, তার অর্থ হলো 'ট্রেড নট টেরিটরি।'

কিন্তু বাণিজ্য প্রসারের সংগে সংগেই বদল হতে লাগলো রাজনৈতিক পটভূমি। বাণিজ্যের স্বার্থে স্থানীয় রাজনীতির সংগে অনিবার্যভাবে জড়িয়ে পড়তে লাগলো ইংরেজরা। বহুক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবাদের অংশীদারও হতে হলো তাদের। কোথাও বা মধ্যস্থতা করে বিবাদও মিটিয়ে ফেলতে হলো তাদের। মোটকথা, এইভাবে কখন যে দেশজয়ের অভিযান শুরু হয়ে গিয়েছিল সে কথা ঘূণাক্ষরেও টের পায়নি তারা। তাদের অজান্তে নেহাত হেলাফেলায়, তারা একটু একটু করে ভূম্যাধিকার করতে লাগলো। এরই ফল হলো ১৭৫৭ খ্রীঃ ২৩শে জুন তারিখের সেই সৈন্যাভিযান। সেই বর্ষণসিক্ত বেলায় দাম্ভিক দুঃসাহসী জেনারেল রবার্ট ক্লাইভেই নেতৃত্বে মাত্র নয়শ' পদাতিক ইংরেজ সৈনিক আর দুহাজার ভারতীয় সেপাই বাংলার নবাব সিরাজের সেনাবাহিনীকে হারিয়ে দিল পলাশীর আমবাগানে। ক্লাইভের এই অপ্রত্যাশীত বিজয়ের সংগে সংগেই ভারতে ইংরেজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং সকলের অলক্ষ্যে বণিকের মানদণ্ড হয়ে ওঠে রাজদণ্ড। এই বণিকেরাই অবশেষে পথ চিনিয়ে নিয়ে আসে সাম্রাজ্য নির্মাতাদের এবং উম্বোধন হয় নতুন এক কূট নীতির 'টেরিটরি নট্ ট্রেড।'

এই ঘটনার পরবর্তী একশ' বছরের ইতিহাস হলো ধারাবাহিক রাজ্যজয়ের ইতিহাস। অবশ্য রাজধানী লণ্ডনের গোপন নির্দেশ ছিল অন্যরকম। তার নির্দেশ ছিল রাজ্যবিস্তারের অভিপ্রায়টি সযত্নে এড়িয়ে চলা। কিন্তু উচ্চাভিলাষী ইংরেজ শাসনকর্তারা জেনেশুনেই বিপরীত নীতি অনুসরণ করে চলছিল। ফলে একশ' বছর পুরোবার আগেই বিদেশী সওদাগর কোম্পানি তার বেনিয়া খোলস বদল করে পরে নিল শাসকের পরিচ্ছদ। কোম্পানির কর্মচারীরা আয়-ব্যয়ের জাবেদা খাতা ফেলে হয়ে উঠলো সমরনায়ক বা শাসনকর্তা। না চাইলেও ওপরপড়া হয়ে মোগল বাদশাহের জায়গায় ভারতবাসীর ভালমন্দের অভিভাবক হয়ে উঠলো তারা।

তবে উত্তরাধিকারসূত্রে ভারতবাসীর অভিভাবকত্ব পেলেও ব্রিটিশ রাজশক্তির মনের বাসনা ছিল অন্যরকম। তারা জানতো যে কোনো দিন, না চাইতেই পাওয়া এই কর্তৃত্ব, এই দখলদারি তারা ছেড়ে যাবে। কিন্তু কবে? ১৮১৮ সালেই মার্কুইস অব হেস্টিংস মন্তব্য করেছিলেন, 'এমন একটা সময় আসবে, হয়ত তা বহুদূরবর্তী নয়, যখন সুস্থ সবল ন্যায়নীতিবোধ দ্বারা চালিত হয়ে প্রায় না চাইতেই পাওয়া এই দেশের শাসন অনায়াসে ছেড়ে যাবে ইংল্যাণ্ড।' কিন্তু এই মন্তব্য সত্ত্বেও ইংরেজের সাম্রাজ্য খোয়া যায়নি, বরং তা আরও বিস্তৃত হয়েছে এবং কর্তৃত্ব ত্যাগ করার যে সময়টা হেস্টিংস সাহেব অদূরবর্তী ভেবেছিলেন সেটা আরও পিছিয়ে গেছে। অবশ্য এই সময়টিতে ব্রিটিশের শাসন এ দেশে বড় মাপের হিতসাধনও করেছিল। ব্রিটিশ আইন, ব্রিটিশ শিক্ষাকাঠামো এবং প্রশাসনের প্রায় হুবহু নকল এ দেশে আমদানি করে যথেষ্ট উপকার করেছিল তারা। সবথেকে কল্যাণ করেছিল ইংরিজি ভাষাটা শিখিয়ে।

www.pathagar.com

ইংরেজের এই দানে সমৃদ্ধ হয়ে ভারতবাসী যেমন একদিকে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল তেমনি জাতির বিপ্লবী চেতনা যথার্থ নিষ্ক্রমণ-পথ খুঁজে পেয়েছিল এই ভাষা শিখে।

জাতির বিপ্লবী চেতনার প্রথম বহিঃপ্রকাশ হয় ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময়। এই বর্বর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রথম প্রত্যক্ষ ফলটি হাতে হাতেই পেল ইংরেজ। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল ব্রিটেন। শাসন ব্যবস্থা প্রায় রাতারাতি পাল্টে ফেলল তারা। ইস্ট ইণ্ডিয়া ট্রেডিং কোম্পানি নামে অমন লোভনীয় সাধের কারবারটি এক কথায় উঠিয়ে দিল তারা এবং তিরিশ কোটি ভারতীয়র ভালমন্দর দায়িত্বভার তুলে দিল ৩৯ বছরের সেই প্রায় গোলাকার স্থূলাংগী সম্রাজ্ঞীর হাতে যিনি নাকি সারা পৃথিবীকে ইংরেজের পায়ের তলায় লুটিয়ে দেবার দৈবী প্রত্যাদেশ পেয়ে দেহধারণ করেছিলেন। মহারানী ভিক্টোরিয়াই সেই থেকে তিরিশ কোটি ভারতীয়র অভিভাবক হলেন এবং তাঁর পছন্দ করা রাজপ্রতিনিধি দিয়েই ভারতের শাসনকাজ চালাতে লাগলেন। বলা বাহুল্য, এইসব সর্বেসর্বা রাজপ্রতিনিধিরাই হলেন পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ মানুষের ভাগ্যবিধাতা, হলেন ভাইসরয় বা বড়লাটবাহাদুর।

এই বদল থেকেই যে কালপর্ব শুরু হলো বিশ্বের ইতিহাসে তা এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সূচনা হলো ভিক্টোরিয়ান এরা বা ভিক্টোরিয়ার যুগ, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভারতে ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক সম্পর্ক ও অভিজ্ঞতা। এই যুগের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য বা দর্শনটি বোধহয় তৎকালীন ইংল্যাণ্ডে একজনই যথার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। মানুষটির নাম রুডিয়ার্ড কিপলিং। স্বঘোষিত এই কবি শিরোমণি (পোয়েট লরিএট) যে আত্মম্ভরি জ্ঞানটি জগতের কাছে তখন বলে বেড়াতেন সেটাই ছিল ভিক্টোরীয় যুগের উপলব্ধ ধর্ম। কিপলিং সাহেব বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াতেন যে, একমাত্র কুলীন ইংরেজরাই অসভ্য (without law) এবং অন্ত্যজ কুলোদ্ভবদের (lesser breeds) শাসন করার দায় নিতে পারে। তাই ঈশ্বরের অমোঘ বিধানেই ইংরেজ জাতি এই দায়টি মাথা পেতে নিয়েছে। শেষমেশ দলবদ্ধভাবে এই গুরুদায় অর্পিত হলো দু'হাজার আই. সি. এস. অফিসার এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত দশহাজার ইংরেজ অফিসারের ওপর। সবচেয়ে মজার কথা হলো যে, তিরিশ কোটি ভারতীয় জনসাধারণের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হলো মাত্র ষাট হাজার গোরা সৈন্য এবং দু'লক্ষ ভারতীয় সৈন্য। এরাই হলো এদেশের মানুষের ভাগ্যবিধাতা। মোটকথা ১৮৫৭ খ্রীঃ পর ভারতে ইংরেজ শাসনের চেহারাটা ঠিক কেমন ছিল তার হদিস পেতে এই পরিসংখ্যান ছাড়া অন্যকিছুর ওপর নির্ভর করা যায় না।

শাসনকাজে নিযুক্ত এইসব ইংরেজদের কাছে ভারতবর্ষ নামক দেশটা ছিল স্বপ্নের দেশের মতন। যেন ছবিতে আঁকা রোমান্টিক দেশ—অনেকটা কিপ্‌লিংয়ের রূপকথার গল্পের মতন। তা কেমন সেই দেশ? রোমাঞ্চকর সেই দৃশ্যপটের দুটো একটা নমুনা দিচ্ছি। মাথায় পালকের হ্যাট পরা ইংরেজবাবু ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে চলেছে; পিছনে চলেছে উষ্ণীষধারী ভারতীয় সেপাইরা। কখনও বা দাক্ষিণাত্যের ঝলসান গরমে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটরা আইঢাই করছে; অথবা গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শহর সিমলার শীতল পরিবেশে উদ্দাম বলনাচের আসরে হারিয়ে যাচ্ছে তারা। কখনও কলকাতার বেংগল ক্লাবের সযত্ন রক্ষিত মাঠে তারা ক্রিকেট খেলার অনুশীলন করছে: কিংবা রাজস্থানের শুকনো মাঠে তাপদগ্ধ হয়েও পোলো খেলার উত্তেজনায় মেতে উঠেছে। আসামের গহন বনে যখন বাঘ শিকার করতে মেতে উঠেছে তারা,

www.pathagar.com

তখন জঙ্গলের মধ্যে তাঁবুর ঘরে বসে কালো নেকটাই পরা যুবক ইংরেজ টেবিলে হয়ত ডিনার খাচ্ছে এবং ক্ষুধার্ত নেকড়ের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে তাঁবুর চারধারে; কিংবা টকটকে লাল কুর্তা পরা ইংরেজ রক্ষীরা সীমান্তপ্রদেশের দুর্ধর্ষ পাঠান বিদ্রোহীদের পিছু পিছু ধাওয়া করে চলেছে পাহাড়ে, উপত্যকায়। বস্তুত এই রোমান্টিক ভারতবর্ষ যেন এদের রক্তে নাচন ধরিয়ে দিয়েছিল। এরা জানতো এদের জন্যেই গড়ে উঠেছে ভারতবর্ষ। তাই 'শুধু ইওরোপীয়দের' জন্যে নির্দিষ্ট ক্লাবের বারান্দায় বসে এরা পরম নিশ্চিন্তে হুইস্কি পান করতে করতে নানারকম সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতো। এইসব ইংরেজরা প্রধানত আসতো ইংল্যাণ্ডের উচ্চ-মধ্যবিত্ত-দের পরিবার থেকে, যাদের কুলগৌরব আছে কিন্তু ধনগৌরব নেই। এদের কেউ অ্যাংলিকান চার্চভক্ত পাদরিদের বংশধর, কেউ বা মূর্ছিত বংশগৌরবের উত্তরাধিকারী কোনো জমিদারের প্রতিভাবান মধ্যম পুত্র, কেউ স্কুলমাস্টারের ছেলে, কেউ বা গ্রীকলাতিন সাহিত্যের অধ্যাপকের ছেলে, কিংবা আগের প্রজন্মে ভারতে বসবাসকারী ইংরেজ পরিবারের বংশধর। যেমন খেলার মাঠে তেমনি ইটন, হ্যারো, চার্টারহাউস বা হেলীবারির (Haileybury) পাবলিক স্কুলের ক্লাসরুমে কঠোর নিয়মানুবর্তিতায় শিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে এরা সাম্রাজ্য চালাবার যোগ্য হয়ে উঠতো। শুধু শাসক হওয়া নয়, পৌরুষদৃপ্ত খেলাধুলা বা শিকারে অভ্যস্ত হওয়া নয়, এইসব যুবকেরা একাধারে হোরেশ বা হোমারের কাব্যরসের কুশল অনুরাগীও হতো। তাই বোধহয় জেম্‌স্ স্টুয়ার্ট মিল মন্তব্য করেছিলেন যে তৎকালীন 'ভারতবর্ষ ছিল ব্রিটেনের উচ্চবিত্তশ্রেণীর মানুষের মুক্তবায়ুর খেলাধুলা এবং অবকাশ যাপনের এক বিপুল ক্ষেত্র।'

অ্যাড্‌ভেঞ্চার এবং চ্যালেঞ্জ, অর্থাৎ দুঃসাহসের ডানায় ভর দিয়ে স্পর্ধার মুখোমুখি হবার সব প্রলোভন ছড়িয়ে ছিল এই দেশটার বিস্তীর্ণ পরিবেশে। ইংল্যাণ্ডের মাটিতে শুধু পায়ে পায়ে প্রতিবন্ধ। ওইটুকু দ্বীপে মনের আশ মিটিয়ে অ্যাড্‌ভেঞ্চার করার সুযোগ কতটুকু? এখানে এসে ওরা মুক্ত বিহঙ্গ হয়ে উঠতো। অন্ধ পাখা বন্ধ করতে হতো না তাদের। যে বয়সে বোম্বাইয়ের জাহাজঘাটে ওরা নামতো সেটা উনিশ বা কুড়ি বছর। তখনও ওদের মুখে ভাল করে গোঁফদাড়ির রেখা ওঠেনি। তারপর একটানা তিরিশ-চল্লিশ বছর ভারত প্রবাসের পর যেদিন তারা ফিরে যেত সেদিন তাদের ভাঙা শরীরের খাঁজে খাঁজে লুকনো থাকতো কত অ্যাড্‌ভেঞ্চার! বাঘের থাবা খাওয়া কারো মুখখানা হয়ত ক্ষতবিক্ষত, গুলি খাওয়া কারো শরীরটা হয়ত ঝরঝরে হয়ে গেছে। জ্বরব্যাধির প্রকোপে কেউ হয়ত জীর্ণ হয়ে গেছে। পোলো খেলতে গিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে কেউ বা কোমর ভেঙেছে। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে কিংবা প্রচুর মদ্যপানের দরুন কারো মুখখানা থেকে সেই ছেলেবেলার লাবণ্য সরে গিয়ে বীভৎস হয়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও একটা গর্ববোধ প্রচ্ছন্ন থাকতো ওদের মুখেচোখে আর কথার বোলচালে। রোমান্টিক ভারতবর্ষে একটানা তিরিশ-চল্লিশ বছর অর্থাৎ জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা কাটানোর গর্ব।

অ্যাড্‌ভেঞ্চারের শুরু হতো বোম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশন থেকে। বিশৃঙ্খল মানুষের এক নাট্যশালা যেন সেই স্টেশন চত্বর। স্টেশনের লাল ইঁটের নিও-গথিক স্থাপত্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে প্রথম দেখতে পেত বিচিত্র ভারতবর্ষের মুখখানা। এটাই হতো তার প্রথম আবিষ্কার। হ্যাঁ, এখানেই তাকে জীবনের সিংহভাগ কাটাতে হবে এই বিচিত্র মানুষের মধ্যে। এই সোরগোল আর চীৎকার হাঙ্গামার মধ্যে। সারা

www.pathagar.com

প্ল্যাটফর্ম জুড়ে চলেছে এই তাণ্ডব। এ ওকে ধাক্কা দিয়ে পথ করে নিচ্ছে, গায়ে পড়ে ঝগড়া করছে, ঠেলাঠেলি করছে। বাক্স পেঁটরা, থলি, পোঁটলা মাড়িয়ে ছুটোছুটি করছে। সব মিলিয়ে এক তাণ্ডবের পরিবেশ যেন। সবাই অতি ব্যস্ত। কারও প্রতি কারও এতটুকু দরদ নেই। সবচেয়ে ন্যক্কারজনক হলো স্টেশনচত্বরের পরিবেশ। শুকনো পেচ্ছাবের চড়া গন্ধ আর খাড়া রোদের উত্তাপ যেন বিহ্বল করে দিচ্ছে তাকে। ময়লা ধুতি পরা পুরুষরা টানতে টানতে নিয়ে চলেছে বৌদের। তাদের মাথায় এক মুখ ঘোমটা। প্রায় অন্ধের মতন মল পরা খালি পায়ে ঝমর ঝমর শব্দ করে তারা বরদের পিছু পিছু হাঁটছে। শুধু কি ওরা! আছে পাগড়ি পরা শিখ সোলজার, শুকনো রোগা চেহারার কৌপিনসার সাধুবাবা, বিকলাঙ্গ ভিখিরী। সব মিলিয়ে প্রথম অভিজ্ঞতাটাই এমন, যেন এরা সবাই তাড়া করে আসছে তার দিকে। তখন হাতে নিয়োগপত্র নিয়ে একজন লেফ্টানেন্ট বা একজন আই. সি. এস. অফিসারের বিহ্বলতা কাটানোর একমাত্র নিরাপদ জায়গা হলো ফ্রন্টিয়ার মেল বা হায়দ্রাবাদ এক্সপ্রেস ট্রেনের গাঢ় সবুজ কামরাগুলো। বিলাসবহুল আর বড়সড় এই কামরায় ঢুকেই তার স্বস্তি ফিরে আসে যেন। তার মনে হয় অতি চেনা এক পরিবেশেই ফিরে এল সে। কামরার জানলায় ঝুলছে ভারি কাপড়ের পর্দা, ব্রাউন রঙের পুরু গদি মোড়া সীট্, কামরার পাশেই ধপধপে সাদা চাদর বিছানো ডাইনিং কার,রুপোর পাত্রে বরফ দেওয়া ঠাণ্ডা শ্যাম্পেনের বোতল, আর কি মনোরম শীতল কামরার অভ্যন্তর! কিছুক্ষণের জন্যে এই পরিবেশটাই তাকে মোহাচ্ছন্ন করে দেয়। তার মনে হয় এই ইন্দ্রপুরীর মধ্যে কোন ছলনা নেই। নেই উৎকট বীভৎস কোনো ভারতীয় দৈন্যপীড়িত মুখ। একমাত্র ভারতীয় যে মুখখানি সে এখন দেখবে, তা হলো ধোপদুরস্ত পোশাক পরা একজন টিকিট কালেক্টরের। সদ্য নিয়োগপত্র পাওয়া একজন খাঁটি ইংরেজ অফিসারের এটাই হতো প্রথম পাঠ। সে শিখে নিত যে শাসন করতে এলেও ভারতে তারা আলাদাই থাকবে।

এদেশের মাটিতে পা দিয়েই ইংরেজদের শুরু হয়ে যেত রূঢ় কঠিন শিক্ষানবিসির কাল। তাকে পাঠানো হতো পাণ্ডববর্জিত কোনো অঞ্চলে। হয়ত সেখানে পৌঁছবার পাকা সড়কও নেই। কাঁচা মাটির রাস্তা, কখনও বা ঘন বনের মধ্য দিয়ে চলে গেছে সে পথ। গন্তব্যস্থানে পৌঁছে আবার স্তম্ভিত হতো সে। স্কটল্যাণ্ডের চেয়েও বড় একটা বিশাল অঞ্চলে মাত্র কয়েকঘর ইওরোপীয়ান বাস করে। এতবড় অঞ্চলটার প্রায় দশলক্ষাধিক মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসতো সে কয়েক বছরের মধ্যে। চব্বিশ-পঁচিশ বছরে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই এতগুলো মানুষের ভালমন্দ দায়-অদায়ের রক্ষাকর্তা বনে যেতে হতো তাকে।

এই কঠিন শিক্ষানবিসির কালটা সফলভাবে উত্তীর্ণ হবার পরই অফিসারটিকে যোগ্য মনে করা হতো। তখন এই অপরিচিত ঊষর মরুদেশে যে শ্যামল দ্বীপভূমিগুলি আছে, অর্থাৎ যেখান থেকে ব্রিটিশ অ্যারিস্টক্র্যাসি সাব্যস্ত হয়, সেই ঘিরে রাখা আলাদা অংশটুকুর মধ্যে তার প্রবেশাধিকার মিলতো। এই ঘিরে রাখা স্বতন্ত্র জায়গার নাম ক্যান্টনমেন্ট এবং ব্রিটিশ রাজের রত্নদ্বীপ হলো এই ক্যান্টনমেন্টগুলো যার প্রতিটি অংশ বিদেশী। এইরকম ক্যান্টনমেন্ট প্রায় সব শহরেরই পুচ্ছযুক্ত করে রাখা হতো, যাতে পরিবেষ্টিত অংশটুকুর মধ্যে ব্রিটিশ আভিজাত্যের ধুয়াটি বার বার শোনানো যায়। পরিবেষ্টিত অংশের বিলাসী জীবনযাত্রার কোনো কিছুই বাইরে থেকে জানা যেত না। চকচকে বাঁধানো রাস্তাঘাট, বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ, পাথরের

www.pathagar.com

তৈরি খ্রীষ্ট ভজনালয়, কাঠের তৈরি ক্লাবঘর এবং সঙ্গে লাগানো গ্রাস্ কোর্ট লন্‌। হঠাৎ ঢুকে পড়লে মনে হবে বুঝি ডর্সেট বা সারের মতন কোনো কাউন্টিতে এ পড়েছে সে। সাহেবদের বিকেলটা কাটতো টেনিস খেলে। কখনও বা শীতের দুপুরে ফ্ল্যানেলের প্যান্ট আর সাদা সার্ট পরে তারা ক্রিকেটও খেলতো। তারপর সূর্যাস্ত হতো এবং সেই পরম কাঙ্ক্ষিত মুহূর্তে সাদা উর্দি পরা খানসামারা ট্রের ওপর বসিয়ে নিয়ে আসতো সেই সন্ধ্যার প্রথম হুইস্কির পানপাত্রটি।

তখন বোম্বাই, কলকাতা, লাহোর, দিল্লি বা সিমলার মতন ভারতের প্রধান শহরগুলোয় পার্টি এবং খানাপিনা লেগেই থাকতো। রীতিমত জমজমাট হতো সেই সব খানাপিনার আসর। সামর্থ্য অনুযায়ী সব ইংরেজ পরিবারকেই 'একটা বল নাচের ঘর এবং অন্তত আশি ফুট লম্বা ড্রয়িংরুমের ব্যবস্থা রাখতে হতো।' ভারতে বসবাসকারী তৎকালীন একজন সম্ভ্রান্ত বিদেশিনী লিখেছেন, 'তখনও অপ্রীতিকর 'বুফে' (buffets) প্রথা চালু হয়নি। তাই হাতে প্লেট নিয়ে টেবিল থেকে পছন্দমতন ভোজ্যবস্তু তুলে মনের মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে খানা খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। সেকালের একটা সাধারণ মানের পার্টিতেও বিস্তর খানাপিনার আয়োজন করতে হতো। গড়ে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশজন নিমন্ত্রিতদের নিয়ে খানাপিনা হতো। প্রত্যেক নিমন্ত্রিতের দেখাশোনার জন্যে একজন করে ভৃত্য নিযুক্ত থাকতো। সাধারণত কোনো দোকানদার বা কারবারি মানুষ কিংবা কোনো ভারতীয় সেইসব পার্টিতে নিমন্ত্রিত হতো না। এ ধরনের সমাবেশে সবচেয়ে প্রাধান্য পেত সরকারী পদমর্যাদা এবং কৌলীন্য। কোনক্রমে সেটি ক্ষুণ্ণ হলে অথবা নজর এড়িয়ে গেলে মহাপাতক হতো গৃহস্বামীর। একজন আই. সি. এস. জয়েন্ট সেক্রেটারীর গৃহিণীর পাশে পদমর্যাদায় অকুলীন কোন সেনাবাহিনীর অফিসারের গৃহিণীর আসন নির্দিষ্ট থাকলে, ডিনার টেবিলে যে শীতল স্রোত বয়ে যেত তাতে হিম হয়ে যেত গৃহস্বামীর শরীর।'

ভিক্টোরীয়যুগের ভারতবর্ষে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যবাদের এইসব গোঁড়ামির প্রধান নির্মাতা ছিল ইংরেজ মেমসাহেবরা। ইংরেজ এবং এদেশীয়দের মধ্যে এই সামাজিক বিচ্ছেদ, ছোট-বড়র ভেদাভেদ ইত্যাদি অবাঞ্ছিত অবস্থাগুলোর প্রধান স্থপতি ছিল তারাই। হয়ত স্বামীদের আড়াল করতেই তাদের কঠোর হতে হয়েছিল। পাছে এদেশী কোন মৃগনয়নার নয়নবাণে আবদ্ধ হয়ে পুরুষেরা দিগ্‌ভ্রান্ত হয়, তাই এই সাবধানতা। মেমসাহেব গৃহিণীরা জানতো যে ভারতীয় প্রিয়াদের রূপের হাতছানি আর ছলাকলার মোহ কাটাতে ব্যর্থ হয়েই বিপত্তি ঘটিয়েছিল প্রথম পর্বের সাহেবরা। আর তারই অবাঞ্ছিত পরিণতি হলো অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান জাতির উদ্ভব। সেই থেকে এই দো-আঁশলা সমাজটি দুই জগতের মধ্যে, না ঘরকা না ঘাটকা, হয়ে ঝুলছে।

এদেশে এসে ক্রীড়াই ছিল ইংরেজদের প্রধান আমোদ-প্রমোদ। বিভিন্ন রকমের খেলাধুলো করতো তারা। ক্রিকেট, টেনিস, স্কোয়াশ, হকি ইত্যাদি। এটাও তাদের একটা গর্ব যে ইংরিজি ভাষার মতন এইসব খেলাধুলোও তারা রেখে গেছে ভারতের মাটিতে এবং ভারতীয়রা শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের রেখে যাওয়া ঐতিহ্যই বহন করে চলেছে। নিউইয়র্ক শহরে গল্‌ফ্ খেলা চালু হবার অন্তত তিরিশ বছর আগে কলকাতায় গল্‌ফ্ খেলা শুরু হয় ১৮২৯ খ্রীঃ। হিমালয়ের কোলে এগার হাজার ফুট উঁচুতে সিমলার যে গল্‌ফ্ গ্রাউণ্ড আছে সেটাই পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ গল্‌ফ্ গ্রাউণ্ড। আরও শোনা যায় যে হাতীর পুরুষাঙ্গের চামড়া থেকে যে গল্‌ফ্ ব্যাগ

www.pathagar.com

তৈরি হয় সেটাই নাকি সবচেয়ে খানদানী এবং শৌখিন, যদি অবশ্য মালিকের নিজের গুলিতে সেই হাতীর প্রাণনাশ হয়ে থাকে।

তবে শুধু আমোদ করা নয় তারা মরেছেও দলে দলে। বেশিরভাগ ইংরেজই মরেছে ছেলেমানুষ বয়সে। সব ক্যান্টনমেন্টের মধ্যেই চার্চের পাশে ছোট্ট একটা কবরস্থান আছে। সেখানে নিয়ম করে মৃত ইংরেজদের কবর দেওয়া হতো। এদের অনেকেই মরতো এদেশের মারাত্মক রোগব্যাধির বলি হয়ে। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা সব রোগেরই প্রাদুর্ভাব ছিল। কেউ কেউ মরতো হিংস্র জানোয়ারদের আক্রমনে। ওদের সমাধিশিলার গায়ে যা উৎকীর্ণ আছে তার চেয়ে বেদনাদায়ক বিবরণ ইংরেজদের সম্বন্ধে আর কিছুতে পাওয়া যাবে না। সমাধিফলকের গায়ে উৎকীর্ণ লেখাগুলি পড়লেই মনে হয় ভারতবর্ষের রূপকথার সেই অস্পষ্ট কল্পলোক কেমন বীভৎসভাবে লুকিয়ে আছে এইসব মৃত্যুকাহিনীর মধ্যে। কেউ মরেছে চিতাবাঘের থাবার ঘা খেয়ে, কেউ মরেছে বাইসনের শিঙ্‌য়ের গুঁতো খেয়ে, কেউ বা হাতীর পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে। সবচেয়ে নিষ্ঠুর এবং ভয়ংকর হলো টমাস হেন্‌রী বাটলার নামে পাব্‌লিক ওয়ার্কস্‌ ডিপার্টমেন্টের এ্যাকাউন্টটেন্টের মৃত্যু। হতভাগ্য মানুষটাকে জব্বলপুরের টিল্‌ম্যান ফরেস্টের একটা মানুষখেকো বাঘ আস্ত উদরসাৎ করে ফেলেছিল ১৮৯৭ সালে।

ভারতবর্ষের চাকরিতে তখন নানারকম ঝুঁকি ছিল। রীতিমত সংকটপূর্ণ এবং প্রাণান্তিক হতো সেইসব চাকরি। বিদেশী মিশনারি সার্ভিসের চাকুরিরতা সিস্টার মেরী মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে ক্লাসঘরে পাঠ নিতে নিতে ঘুণপোকা খাওয়া কড়ির ঘা খেয়ে মারা যায়। এইরকম আর একটি বিচিত্র মৃত্যু হলো রয়্যাল ইঞ্জিনীয়ার্সের মেজর জেনারেল হেনরী ম্যারিঅন ডুরাণ্ডের। ১৮৭১ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে হাতীর পিঠের হাওদা থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

তবে অ্যাড্‌ভেঞ্চার করার নেশায় ইংরেজদের এই নিঃশব্দ প্রাণদানের দৃশ্যটা যতই করুণ হ'ক না কেন, সারা দেশের অসংখ্য কবরস্থানে লাইন করে বাচ্চাদের সমাধিগুলো দেখলে যে কোন মানুষের প্রাণ হু হু করে উঠবে। ভারতবর্ষের যে কোন শহরের কবরস্থানে গেলেই দেখা যাবে কী ভয়াবহ সংখ্যায় ইংরেজ বাচ্চারা এদেশে মরেছে। বাচ্চা, শিশু সবাই আছে এই দলে। কেউ মরেছে নিষ্ঠুর আবহাওয়ার সংগে মানিয়ে নিতে না পারায়, কেউ মরেছে এমন রোগব্যাধিতে যার কোন পরিচয়ই জানতো না কেউ। কখনো একটা নিঃসংগ সমাধি কখনও বা পাশাপাশি তিন-চারখানা সমাধি এক সারিতে বসানো। সবাই একই পরিবারের বাচ্চা হয়ত। সবাই মরেছে প্রায় একই সময়ে কলেরা বা কালাজ্বরে ভুগে। সমাধির পাথরের গায়ে খোদাই করা আছে হতভাগ্য বাপ-মা'র চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাস। জমে শক্ত হয়ে গেছে এই হৃদয়ব্যথা। 'আমার সোনা উইলির স্মরণে'! সমাধিগুলো দেখতে দেখতে ব্যথায় টনটন করে ওঠে বুক। হয়ত এদের কেউ হতভাগ্য বাপ-মা'র একমাত্র সন্তান, আবার কেউ কেউ পিঠোপিঠি ভাইবোন।

কিন্তু ইংরেজদের এই সাম্রাজ্যবাদী অভিযানের কতটুকু মহিমা ধারণ করে আছে এইসব সমাধিশিলাগুলো? ধরার ধুলায় হারিয়ে গেছে ওদের এই বিজয়কেতন। সাধারণ ইংরেজের কাছে তাই এই বিজয় অভিযানের এতটুকু দামও নেই। আশিরগড় কবরস্থানে পাশাপাশি রাখা দুটো শিলা দেখলেই বোঝা যায় সে কথা। একটার গায়ে লেখা আছে কনডাক্‌টর জনসন এবং মার্থার সাত মাস বয়সের ছেলে আলেকজাণ্ডা-

www.pathagar.com

রের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে—১৯শে এপ্রিল, ১৮৪৫। দ্বিতীয়টার গায়ে লেখা আছে চার বছরের উইলিয়ম জনের স্মৃতিতে নিবেদিত, ৩০শে এপ্রিল, ১৮৪৫। হতভাগ্য পিতামাতা জনসন এবং মার্থার দুই শিশুপুত্র মাত্র দশ-এগারো দিনের ব্যবধানে নিষ্ঠুর কলেরায় আক্রান্ত হয়ে, মাতৃভূমি থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরবর্তী এক অখ্যাত শহরে, জাতির সাম্রাজ্যবাদী লালসার বলি হয়েছিল সেদিন।

বাপ-মা'র একটাই আশীর্বাদ, একটাই আদরের কোল ছিল
একটাই কালরোগ সেই কোল থেকে ছিনিয়ে নিল দুজনকে
একটা কবরেই পাশাপাশি চিরনিদ্রায় শুয়ে আছে তারা
ইংল্যান্ড থেকে কত দূরে, তারা জানলোও না!

ইংরেজের শাসনের আদলটা ছিল অবাধ্য ছেলেকে বাপের শাসন করার মতন। বেত হাতে পাবলিক স্কুলের মাস্টার যেমন চোখ রাঙিয়ে ছাত্রর ভালর জন্য লেখাপড়া শিখতে বলে অনেকটা সেইরকম। হয়ত দৈবাৎ সুফল পাওয়া যেত। তখন মনে হতো হয়ত এটাই শাসনের রীতি। কিন্তু সে বড় অসম্ভব ব্যতিক্রম। সাধারণতঃ ইংরেজই ঠিক করতো ভারতীয়দের স্বার্থ, তাদের ন্যায়-অন্যায়, ভালমন্দ। ভারতীয়দের মতামতের কোন দাম ছিল না।

এই শাসনরীতির আরেকটি বড় দুর্বলতা হলো দূরত্ব। শাসক এবং শাসিতদের মধ্যে প্রভেদ গড়ে দিয়েছিল এই দূরত্ব। ইংরেজের জাত্যাভিমান আর আত্মশ্লাঘা এই প্রভেদটি যে কত প্রকট করে তুলেছিল তার নজির মেলে ইংল্যান্ডের সংসদে দেওয়া একজন প্রাক্তন আই. সি. এস. অফিসারের ভাষণে। শতাব্দীর গোড়াতেই সংসদ বিতর্কের সময় তিনি খোলাখুলি বলেছিলেন, 'ভারতে বসবাসকারী প্রতিটি ইংরেজ কর্মচারী মনে মনে যে কামনা পোষণ করে, তা সে সাধারণ কর্মচারী হ'ক বা পত্রিকা সম্পাদক হ'ক, জেলাধ্যক্ষ কমিশনার হ'ক বা স্বয়ং বড়লাটবাহাদুর হ'ক, যে সে রাজার জাতের একজন। ঈশ্বর তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন শাসন করতে।'

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নিষ্ঠুর কসাইখানায় জবাই হলো প্রায় সাত লক্ষ ইংরেজ যুবক। ব্যস! শেষ হয়ে গেল কিংবদন্তীর দেশ ভারতের হাতছানির টান। যাদের তখন ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে সীমান্তপ্রদেশে চৌকি দেবার কথা, তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে পোলো খেলার কথা, দেশের স্বার্থে তারা দেশেই পড়ে রইলো। বস্তুত ১৯১৮ সাল থেকে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে ইংরেজ নিয়োগ প্রায় বন্ধই হয়ে যায় এবং সেই জায়গায় ভারতীয়দের নিয়োগ উত্তরোত্তর বেড়ে যেতে শুরু করে। ১৯৪৭ সালের সেই প্রথম দিনটিতে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত ইংরেজ কর্মচারীর সংখ্যা এক হাজারও ছিল না। এরাই কোনরকমে চল্লিশ কোটি ভারতীয়দের প্রশাসনের আওতার মধ্যে বেঁধে রেখেছিল। জমজমাট ঔপনিবেশিক শাসনরীতির শেষ হুঁকাবরদার ছিল এরাই। তবে রোশনাইয়ের শেষ কিরণটুকুও তখন মুছে যেতে চলেছে। পয়লা জানুয়ারির সকালে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের মন্ত্রণাসভায় গৃহীত সেই দণ্ডাজ্ঞাই বোধহয় ইতিহাসের নির্মম গতি শেষবারের মতন নিরূপণ করে দিল। কালস্য কুটিলা গতিঃ!

www.pathagar.com

একলা চলো রে

শ্রীরামপুর, নোয়াখালি, ১লা জানুয়ারি

ডাউনিং স্ট্রীট থেকে দু'হাজার মাইল দূরে গাঙ্গেয় উপত্যকায় একটা সাধারণ ছোট্ট গ্রামের এক দরিদ্র চাষীর কুঁড়ের নোংরা মেঝেয় শুয়ে আছেন একজন বৃদ্ধ মানুষ। তখন বেলা দুপুর। অন্যদিন এই সময় যা করেন আজও তাই করলেন বৃদ্ধ। জলে ভেজা তুলোর পুটুলিটা হাত বাড়িয়ে নিলেন এক অনুগামীর কাছ থেকে। জলে ভেজা তুলোর থলির মধ্যে পোরা আছে ঠাণ্ডা কাদার তাল। থলি দিয়ে জল ঝরছে। বৃদ্ধ তাঁর তলপেটের ওপর তুলোর থলিটা রেখে আর একখানা তুলোর থলি মাথার চাঁদিতে বসিয়ে দিলেন।

মেঝেয় শোয়া বৃদ্ধের চেহারাটা ভারি কৃশ। তবে ফনফনে চেহারার এই মানুষটার এটা ছদ্মরূপ। কারণ, সাতাত্তর বছরের এই বৃদ্ধ ইতিমধ্যেই শক্তিশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের টনক নড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর কাজকর্মের মারফত। তাই শুধু এই বৃদ্ধ মানুষটিকে সামাল দিতেই ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী এমন একজনকে দূতিয়ালী করতে দিল্লি পাঠাচ্ছেন যিনি মমতাময়ী মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্রপৌত্র। মানুষটি আসছেন ভারতকে স্বাধীনতা দেবার পথ বাতলাতে।

বৃদ্ধের নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। বিপ্লবী না হয়েও যিনি বিশ্বের সবথেকে বিস্ময়কর মুক্তি-সংগ্রামের মহানায়ক এবং সত্যদ্রষ্টা ঋষি। বৃদ্ধ শুয়ে আছেন। তাঁর পাশে রয়েছে এক পাটি ঝকঝকে মাজা নকল দাঁত আর স্টিল ফ্রেমের চশমা। খাবার সময় ছাড়া বৃদ্ধ নকল দাঁত পরেন না। মানুষটি লম্বায় বড়জোর পাঁচ ফিট। ওজন মাত্র একশ' চোদ্দ পাউন্ড। হাতপায়ের গড়ন এতই অপুষ্ট যেন মনে হয় তখনও কিশোর বয়স কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তাঁকে দেখলে মনে হয় প্রকৃতি যেন ষড় করেই তাঁকে কুশ্রী করেছে। মাথাটা বেঢপ বড়। মাথার দুপাশের কান দুটো খাড়া : যেন চিনির পাত্রের (boul) দু'পাশের দুটো হাতল। মুখের ওপর থাবড়া দিয়ে বসানো হয়েছে বেঁটে নাকখানা। দুই প্রসৃত নাসারন্ধ্র যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে কাশফুলের মত সাদা গোঁফগুচ্ছের ওপর। নকল দাঁতের পাটি না পরলে তাঁর ঠোঁট দুটো চুপসে মুখের গহ্বরে ঢুকে যায়। তা সত্ত্বেও গান্ধীজীর উজ্জ্বল মুখখানা থেকে একটা কিরণ ছড়ায়। কখনও তাঁকে বিবর্ণ প্রাণহীন দেখায় না। তাই গান্ধীজী যখন হাসেন তখন বৃদ্ধের সে হাসি বড় পবিত্র দেখায়। তাঁর ঠোঁটের কোণে লুকিয়ে থাকে একটা দুষ্টু হাসির ঝিলিক। চাপা হাসিটা ম্যাজিক লণ্ঠনের দ্রুত বদল হওয়া ছবির মতন দ্রুত বদল হয়। ক্ষণে ক্ষণে বদলে যাওয়া তাঁর মুড টাকে ধরে রাখে বৃদ্ধের এই দুষ্টু হাসিটা আর তারই কিরণে উদ্ভাসিত হয় তাঁর শীর্ণ মুখখানা।

গত একশ' বছরের এই হিংসা-উন্মত্ত দীর্ণ পৃথিবীকে এক আশ্চর্য বিকল্প পথের সন্ধান দিয়েছেন গান্ধীজী। সে পথ অহিংসার। এই সঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়ে তিনি একদিকে যেমন বিপুল জনগণকে বশ করেছেন, তেমনি ধর্মযুদ্ধ করে এই উপমহাদেশ থেকে ইংল্যান্ডকেও তাড়িয়েছেন। কামানের গোলা বা বোমার ঘা দিয়ে

www.pathagar.com

সে আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। প্রতিবাদ গড়ে উঠেছে প্রার্থনার গুঞ্জনে, নির্বাক নিঃশব্দ প্রতিঘাত হয়ে।

যখন পশ্চিমী ইউরোপে প্রতিধ্বনিত হয়েছে একনায়ক নেতাদের হুঙ্কার, তাদের প্রলাপ ভাষণে দিশাহারা হয়েছে সে দেশের অসহায় মানুষজন, তখন পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল অঞ্চলের মানুষের মনে তেনে সাড়া জাগিয়েছেন একটা কথাও চীৎকার না করে। বিনা প্রতিবাদে অসহায় মানুষগুলো সেদিন তাকে মেনে নিয়েছিল। না, গান্ধীজী তাদের মিথ্যে প্রতিশ্রুতির আশ্বাস দেননি। তিনি বলেননি যে তাঁকে নেতা মেনে নিলে তাদের ভাগ্য ফিরে যাবে। তারা ক্ষমতা পাবে। বরং সবাইকে সতর্ক করে বলেছিলেন, 'যারা আমার রাস্তায় আসতে চাও তাদের মেঝেয় শুতে হবে, মোটা কাপড় পরতে হবে, শয্যাত্যাগ করতে হবে অনেক ভোরে, জীবনধারণের জন্যে খেতে হবে মোটা ভাত, এমনকি নিজের হাতে পায়খানাও পরিষ্কার করতে হবে তাদের।' তাই দামী পোশাক আর ঝকঝকে উজ্জ্বল পদকের অলংকরণের বদলে মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় পরিয়ে তিনি তাঁর অনুগামীদের সাজিয়ে দিতেন। এই অনাড়ম্বর পোশাকের একটা গোপন অহংকার ছিল। তা যেমন এক মন এক প্রাণ করে বেঁধে রেখেছিল সবাইকে, তেমনি এক নজরে চিনিয়ে দিত তাদের। যেমন চিনিয়ে দিত কালো বা ব্রাউন সার্ট পরা ইওরোপের তৎকালীন অহংকারী ডিক্‌টেটর্‌দের।

ভক্ত অনুগামীদের সঙ্গে গান্ধীজীর যোগাযোগের মাধ্যমটা ছিল একেবারে সেকেলে। নিজের হাতেই তিনি বেশিরভাগ চিঠি লিখেছেন ; সামনাসামনি কথা বলেছেন ঘরোয়া প্রার্থনা সভায় ; কখনো ভক্তদের মধ্যে দাঁড়িয়ে, কখনো কংগ্রেস দলের মনোনীত সভ্যদের সঙ্গে সহজ সরলভাবে। কিন্তু যে পদ্ধতি অনুসরণ করে উগ্রপন্থী বা রাজনৈতিক, আদর্শবাদী নেতারা জনতার মন অলীক আশার ছলনায় ভুলিয়ে দেয়, তেমন কোন পন্থা গান্ধীজী কখনো প্রয়োগ করেননি। মন ভোলাবার ছলাকলা তাঁর জানা ছিল না। তাই তাঁর সহজসরল উপলব্ধির কথাগুলো আধুনিক প্রচার মাধ্যমের সহায় ছাড়াই মানুষের মনের দোরে ঘা দিত। তাঁর সারল্যের এমন একটা ভঙ্গি ছিল যা সাধারণ মানুষকে সরাসরি টানতো। ফন্দিফিকির ছাড়াই গান্ধীজীর বাণী দেশের মর্মস্থানে পেঁছে গেছে এইভাবে। যে দেশটা নিয়ম করে বছরে একবার দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে, যেখানকার মানুষের 'ভুখা' অবস্থাটা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে গান্ধীজীর প্রতিবাদেরও আলাদা মাত্রা ছিল। আপাত অসংগত মনে হলেও এর কার্যকর ভূমিকা জনমানসে প্রভাব ফেলতো। তাই তাঁর ক্ষীণ দুর্বল শরীরের পক্ষে মারাত্মক হবে জেনেও গান্ধীজী প্রায়ই একবেলা উপোস করতেন। পেট ভরানো খাদ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতেন। জলের মধ্যে বাইকারবনেট সোডা গুলে একচুমুক পান করে তিনি অমন পরাক্রান্ত গ্রেটব্রিটেনকেও অপদস্থ করেছেন। এ সবই ছিল তাঁর প্রতিবাদের নিজস্ব প্রয়োগ।

ভগবৎপ্রাণ ভারতবর্ষ এই শীর্ণ মানুষটির রেখাচিত্রের মধ্যে, তাঁর সহজ স্বাভাবিক প্রতিভার মধ্যে যেন একজন ঈশ্বরাদিষ্ট মহাত্মাকে খুঁজে পেয়েছিল। তাই তিনি যেমনটি বলেছেন, ভারতবর্ষের আপামর জনতা তাই-ই করেছে। যেখানে বলেছেন সেখানে তাঁকে অনুসরণ করেছে। বলতে কি, তিনি ছিলেন এই শতাব্দীর অবিসংবাদী আদর্শ মানুষ। অনুগামীরা ভাবতো তিনি একজন সাধু মহাপুরুষ। কিন্তু ব্রিটিশের দৃঁদে সাম্রাজ্যবাদী আমলাদের চোখে তিনি ছিলেন কপট রাজনীতিক।

www.pathagar.com

তাদের কল্যুষ চোখে তাঁর পরিত্রাতার রূপটা ছিল স্রেফ ভণ্ডামি, কারণ তাঁর অহিংসা সংগ্রামের পরিণাম কখনো কখনো সাধু হয়নি। প্রায়ই তা শেষ হতো বীভৎস হিংসায়। তাঁর আমৃত্যু অনশনের হুমকিটাও নাকি কপট ছিল। তিনি নাকি বহুবার মৃত্যুর কাছাকাছি পেঁছে অনশন ভেঙেছেন। এমনকি ভালমানুষ ওয়াভেলও গান্ধীজী সম্বন্ধে অত্যন্ত ক্রূর মন্তব্য করেছিলেন। 'একটা হিংসুটে বুড়ো রাজনীতিবিদ... ধূর্ত, একগুঁয়ে, দাম্ভিক আর দুমুখো', যার মধ্যে 'এতটুকু সাধুতা নেই।'

বস্তুত, খুব কম ইংরেজ রাজপুরুষই মেলামেশার পর গান্ধীজীকে পছন্দ করেছেন। এদের মধ্যে অনেকেই তাঁকে ঠিকমতন বোঝেননি। গান্ধীজীর ব্যবহার আচরণ দেখে যে এদের মনে ধন্দ লাগতো তা বেশ বোঝা যায়। মানুষটির চরিত্রে একটা অন্যরকম বৈচিত্র্য ছিল যা সাধারণ মানুষ বুঝতো না। প্রবল নীতিবোধ আর ব্যাঙ্গাত্মক বাক্চাতুরীর একটা বিস্ময়কর মিশ্রণ ছিলেন তিনি। হয়ত গম্ভীর রাজনৈতিক আলোচনা চলছে। হঠাৎ সে আলোচনা থামিয়ে এমন এক বিষয়ের আলোচনা পাড়লেন যার সঙ্গে আলোচ্য বিষয়ের কোন মিল নেই। যৌন সংযম বা লবনজলের উপকারিতার কথা পেড়ে সকলের রাজনৈতিক আগ্রহ নিভিয়ে দিলেন।

যখন যেখানে তিনি থাকতেন সেটাই নাকি ভারতের রাজধানী হয়ে উঠতো। তো সেবার নববর্ষের দিনের রাজধানী হলো বাংলার ছোট্ট শ্রীরামপুর গ্রামখানা। এই অগম্য গ্রামে বসেই সেদিন তিনি এই বিশাল উপমহাদেশে তাঁর কর্তৃত্ব বিস্তার করলেন। অথচ আধুনিক নাগরিক জীবনের কোন উপকরণই সেখানে ছিল না। না রেডিও, না বিদ্যুৎ। এমনকি সবথেকে কাছের যে টেলিফোন বা টেলিগ্রাফের লাইন ছিল তারও দূরত্ব তিরিশ মাইল। নোয়াখালি জেলার এই ছোট্ট জলবেষ্টিত শ্রীরামপুর গ্রামে সংবাদ পেঁছানো সত্যিই প্রায় দুঃসাধ্য। প্রায় চল্লিশ বর্গমাইল আয়তনের এই অঞ্চলের জনসংখ্যা পঁচিশ লাখের কাছাকাছি। এদের মধ্যে শতকরা আশীজনই মুসলমান। এখানে এরা গাদাগাদি করে বাস করে। এখানকার গ্রামগুলো ভাগ করেছে নদী, নালা, সরু খাল ইত্যাদি। নৌকা, বাঁশের সাঁকো বা ফেরি নৌকায় চড়ে মানুষজন এ-গ্রাম থেকে ও-গ্রামে যাতায়াত করে। বর্ষায় জলের বেগ প্রবল হলে পলকা বাঁশের সাঁকো ভয়ানকভাবে দোলে; তখন পারাপার করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

১৯৪৭-এর সেই নতুন বছরের সকালটা ছিল গান্ধীজীর জীবনে এক নিটোল খুশীর দিন। সে লক্ষ্যের জন্যে তিনি এতদিন সংগ্রাম করেছেন, সেই বাঞ্ছিত লক্ষ্য অর্থাৎ স্বাধীনতাই পেতে চলেছেন তিনি। সুতরাং বাঁধভাঙা আনন্দের বন্যায় তাঁর দেহমন ভরে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু গান্ধীজী খুশী হননি। ছোট্ট গ্রাম শ্রীরামপুরেও তাঁর এই বিষণ্ণতার কারণগুলো আর চাপা নেই। প্রকাশ হয়ে পড়েছে সেগুলো। শ্রীরামপুর নামটা ক্লিমেন্ট এ্যাটলীর কাছে অচেনা নয়। উচ্চারণ শক্ত হলেও এই গ্রামের নামটা তাঁর কাছে পাঠানো রিপোর্টে প্রায় রোজই দেখছেন তিনি। কলকাতায় হিন্দুর হাতে মুসলমানের নির্বিচার হত্যার আক্রোশে নোয়াখালির সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা যে নিষ্ঠুরভাবে হিন্দু হত্যা শুরু করেছে এ্যাটলী তা জানেন। তারা হিন্দু মেয়েদের ধর্ষণ করছে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে, জোর করে মুখে গোমাংস ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এ এক বীভৎস প্রতিহিংসা। এ্যাটলী জানেন যে অন্তত আধখানা শ্রীরামপুর গ্রাম আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এমনকি যে কুঁড়েটাতে গান্ধীজী আছেন তারও আধখানা আগুনে পুড়ে গেছে।

এ্যাটলী বুঝেছিলেন যে, নোয়াখালির ঘটনাটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা হলেও, যে আক্রোশ

www.pathagar.com

থেকে এই আগুন জ্বলে উঠেছিল, তার ফুলকিতে সারা উপমহাদেশটা জ্বালিয়ে খাক করে দেওয়া যেত। সেদিন এই নারকীয়তার পথ দেখিয়েছিল কলকাতা। ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়ে অন্যত্র। প্রথমে মুসলমান প্রধান নোয়াখালি, পরে হিন্দু প্রধান বিহারে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে। একইরকম বীভৎস পাশবিকতা সেদিন স্তব্ধ করে দেয় সবাইকে। এই উৎকণ্ঠা সেদিন মাউন্টব্যাটেনের সংগে আলোচনার সময় এ্যাটলীর মধ্যেও দেখা যায়। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভারতবর্ষের দায়িত্বভার দিয়ে মাউন্টব্যাটেনকে দিল্লি পাঠাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন এ্যাটলী।

শ্রীরামপুরে গান্ধীজীর আসার কারণও এটাই। জয়ের মুহূর্ত যত এগিয়ে আসছে ততই তাঁর দেশবাসী যেন উন্মত্ত হয়ে উঠছে। আক্রোশ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে পরস্পরের ওপর। গান্ধীজীর কাছে এটাই হয়ে দাঁড়ায় বেদনাদায়ক। স্বাধীনতা সংগ্রামে এরা তাঁকে অনুগমন করেছে। কিন্তু যে অহিংসা নীতি আশ্রয় করে তিনি পথ চলেছেন সেটি যথাযথ বোঝেনি। সত্যাশ্রয়ী গান্ধীজীর জীবনে এটাই সবচেয়ে বেদনাদায়ক। তাঁর অহিংসা হলো শাশ্বত উপলব্ধি। গভীর বিশ্বাস। যে আনবিক যুদ্ধের আস্ফালন পৃথিবীকে সন্ত্রস্ত করে রেখেছে, যার হুংকারে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আছে মানবজাতি, সেই বিভীষিকা থেকে বাঁচাতে পারে একমাত্র অহিংসা। অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌবৈরত্যাগঃ। তাঁর একমাত্র বাসনা ছিল যে এশিয়া এবং বিশ্বকে এই পথেই আলো দেখাবে নতুন ভারত। কিন্তু এ কি হতে চলেছে এখন? তাঁর নিজের অনুগামীরাই যদি তাঁর উপলব্ধ-নীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে কার ওপর ভরসা রাখবেন তিনি? এই স্বাধীনতালাভে তখন আর কোন জয়গৌরব থাকবে না, সেটা হবে মূল্যহীন একটা লড়াই মাত্র। এর চেয়ে বেদনাদায়ক আর কী হতে পারে গান্ধীজীর কাছে?

আর একটা ট্রাজেডিও আসন্ন। মাথার ওপর খাঁড়ার মতন ঝুলেছে সেটা। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের প্রস্তাব এনেছে মুসলিম লীগ। কিন্তু তা হবে না। তাঁর সমস্ত সত্তা দিয়ে এই দেশভাগের বিরোধিতা করবেন। তিনি জানেন কিছু মুসলমান রাজনৈতিক নেতা এই দ্বিজাতি তত্ত্বের দাবি পেশ করেছে। তাদের এই অবাস্তব দাবি মনে মনে মেনে নিয়েছে ইংরেজ শাসককুলও। কিন্তু প্রিয় মাতৃভূমির এই বিভাজন তিনি মেনে নেবেন না। তাঁর বিশ্বাস অন্যরকম। গান্ধীজী মনে করেন যে, ভারতবর্ষের সব ধর্মবিশ্বাসের মানুষ এমন ঘনিষ্ঠ, অখণ্ড সত্তায় মিলেমিশে আছে যা হুবহু কার্পেটের বুননের মতন। তাই বারবার তাঁর এই বিশ্বাসের কথাটা দেশের মানুষকে বলেছেন। 'আমার এই দেহটা আগে দু'টুকরো করো তারপর দেশভাগ করবে।'

এই দাংগা-বিধ্বস্ত শ্রীরামপুর গ্রামে গান্ধীজী এসেছেন তাঁর সেই বিশ্বাসটা খুঁজে পেতে। যে রুগ্ণ মনটা সারা দেশটাকে গ্রাস করেছে তা থেকে মুক্তির উপায় বের করতে। কিন্তু আলোর সন্ধান এখানে এসেও পেলেন না তিনি। তাই প্রথম যেদিন হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক রেষারেষি হিংস্র রক্তপাতে পরিণত হলো, সেদিন আন্তর-যন্ত্রণায় কাতর গান্ধীজী যেন চীৎকার করে বলেছিলেন, 'না, এই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আমি আলোর রেখা দেখতে পেলুম না।' আরও বলেছিলেন, 'যে সত্য ও অহিংসা আমার জীবনের ব্রত পঞ্চাশ বছর ধরে যে নীতি আঁকড়ে ধরে আমি পথ চলেছি, মনে হচ্ছে আমার সেই জীবনায়নে ত্রুটি থেকে গেছে। যা ভেবেছিলাম তা দেখতে পারলাম না।' তারপর ঘনিষ্ঠ অনুগামীদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'আমি তাই এখানে এসেছি নতুন পথের সন্ধান পেতে। এতকাল যে নীতির

www.pathagar.com

হাত ধরে আমি পথ চলেছি, যা আমার জীবন অর্থবহ করেছে, সেই নীতি যে ত্রুটিহীন তার পরীক্ষা দিতে।'

গ্রামে এসে গান্ধীজী বেশ কিছুদিন পথে পথে ঘুরলেন, জনে জনে কথা বললেন। বসে রইলেন তাঁর 'আত্মপুরুষের নির্দেশবাণী' শোনার অপেক্ষায়, যা কত সংকট মুহূর্তে তাঁকে আলোর পথ দেখিয়েছে। ইদানীং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরা লক্ষ্য করেছেন একটা অদ্ভুত কাজে গান্ধীজী মনোযোগ দিয়েছেন। গ্রামের মধ্যে যেখানে যত পিছল বাঁশের সাঁকো আছে, পলকা, সরু সেই বাঁশের ওপর দিয়ে পারাপারের অভ্যাস করছেন তিনি।

সেদিন তলপেটের ওপর কাদার পুলটিস দিয়ে তাঁর কুঁড়ের ভেতরে সবাইকে ডেকে পাঠালেন গান্ধীজী। সেই 'ইনার ভয়েস' বা নির্দেশবাণী তিনি অবশেষে পেয়েছেন। কী সেই নির্দেশ? গান্ধীজী বললেন যে হিন্দুরা যেমন আগে পায়ে হেঁটে তীর্থ করতে যেত, তিনিও তেমনি নোয়াখালির বিদ্বেষ-বিষ কলুষিত গ্রামে গ্রামে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াবেন। হবেন বিষকণ্ঠ। সেই হবে তাঁর প্রায়শ্চিত্ত। অনুতাপীর তীর্থযাত্রা। গান্ধীজী তাই স্থির করেছেন যে, সাত সপ্তাহ ধরে নোয়াখালির ৪৭টা গ্রামে তিনি ১১৬ মাইল পথ-পরিক্রমা করবেন। হিন্দু হয়ে তিনি যাবেন প্রতিটি ক্ষুব্ধ, রুষ্ট মুসলমানের কাছে। তাদের সকলের কুঁড়েতে যাবেন, কথা বলবেন। তাঁর উপস্থিতির প্রলেপ দিয়ে ওদের মনের জ্বালা আর হৃদয়ের ক্ষতটি নিরাময় করার চেষ্টা করবেন। এই পদযাত্রা হবে তাঁর কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত। তাই অন্য সঙ্গী তিনি নেবেন না। তাঁর ভরসা হবেন শুধু ঈশ্বর।

তবে একেবারে নিঃসঙ্গ হলেন না গান্ধীজী। সঙ্গী হলেন বিশ্বস্ত চারজন। গ্রামের মানুষের মুষ্টিভিক্ষায় তিনি জীবনধারণ করবেন। দিল্লিতে বসে কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের নেতারা কি ভবিষ্যৎ সমাধান করবে তারাই জানে। কিন্তু গান্ধীজী সমাধানের সূত্রটি খুঁজে পেয়েছেন। গ্রামই তাঁকে আলোর পথের দিশা দেবে, যেমন এতকাল দিয়েছে। তাঁর জীবনের 'শেষ' এবং 'মহান পরীক্ষা' হবে এটাই। একই বৃন্তে দুটি কুসুমের মতন হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করছে সম্প্রীতি নিয়ে। হিংসাবিষে জীর্ণ এই মনগুলিতে তিনি আলোর শিখা জ্বালবেন। নোয়াখালিতে তিনি ফের প্রেম ও অহিংসার মশালটি জ্বালবেন, আর তার আলোয় উদ্ভাসিত হবে সারা দেশ। সাম্প্রদায়িক বৈরিতার অপদেবতা দূর হবে দেশ থেকে। মুক্তির বাণীর উদ্গাতা হবে নোয়াখালি।

ভোর হতেই ছোট্ট দলটি তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়লো। গান্ধীজীর সুন্দরী উনিশ বছরের যুবতী নাতনী শ্রীমতী মনু তার সৈনিকের ঝোলা, স্পার্টান ব্যাগের মধ্যে ভরে নিল টুকিটাকি কিছু গেরস্তালির জিনিস। একটা কলম, কিছু সাদা কাগজ, একটা ছুঁচসুতো, একটা মাটির মালসা, একখানা কাঠের তৈরি চামচ, তাঁর প্রিয় চরখা আর তিনটে বাঁদরের প্রতিমূর্তি। হাতির দাঁতের তৈরি এই তিনটে বাঁদরের মূর্তি গান্ধীর তিন গুরু। কারণ, এরা 'মন্দ শোনে না, মন্দ দেখে না, মন্দ বলে না।' আলাদা আর একটা থলি নিয়েছে মনু। তার মধ্যে ভরেছে তিন ধর্মের তিনখানা বই। একখণ্ড ভগবদ্‌গীতা, একখণ্ড কোরান এবং 'প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রীসেপ্টস্ অব যীশুস' নামক বইখানা। আর নিয়েছে ইহুদি ধর্মের বাণীসংবলিত একখানা সারগ্রন্থ।

দলের আগে আগে চলেছেন গান্ধীজী। কাদালেপা পিচ্ছিল গ্রামের পথ দিয়ে

www.pathagar.com

দলটাকে চালিয়ে নিয়ে চলেছেন তিনি। পুকুর পাড় ঘেঁষে, পান বরোজের শ্যাওলা মাখা পথ দিয়ে তাঁরা চলেছেন। কোথাও রাস্তা আছে, কোথাও নেই। নারকেল গাছের বীথি পেরিয়ে, ধান জমির পাশ দিয়ে ওই হেঁটে চলেছে দলটা। শ্রীরামপুর গ্রামের মানুষ ভেঙে পড়েছে এই ঐতিহাসিক পদযাত্রা দেখতে। সাতাত্তর বছরের বৃদ্ধ মানুষটি হাতের লম্বা লাঠির ওপর ভর দিয়ে ঈষৎ ঝুঁকে পথ চলেছেন, একটা হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নকে খুঁজে পেতে।

ওরা শুনতে পেল পথ চলতে চলতে আপন মনে গান গাইছেন বৃদ্ধ গান্ধীজী। গানের সুর আর বাণীর প্রেরণায় তিনি উদ্দীপ্ত হচ্ছেন ক্ষণে ক্ষণে। কি গান উনি গাইছেন? ওঁর সবথেকে প্রিয় গানটিই উনি গাইছেন। এই দেশেরই আর এক প্রিয় কবির গান গাইছেন উনি। সে কবির নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছোট্ট দলটি নিয়ে এগিয়ে চলেছেন বৃদ্ধ গান্ধীজী। আর তাঁর খোলা উদাত্ত গলায় গানের কথাগুলো ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে ভেসে ভেসে ফিরে আসছে পিছনে। উনি গাইছিলেন, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে!'

*　　　　*　　　　*

ভাই-ভাইয়ের মধ্যে যে শোণিতপাত, যে রক্তক্ষয় গান্ধীজী থামাতে চেয়েছেন সেটাই এদেশের নিষ্ঠুর ভবিতব্য। দারিদ্র্যের চেয়েও এই ব্যাধি নির্মম। গান্ধীজী চাইলেন এটাই নির্মূল করতে। এই ভ্রাতৃবিরোধ ও শোণিতপাতের দৃষ্টান্ত আজকের নয়। হিন্দুর প্রিয় মহাকাব্য মহাভারতের যুদ্ধ এই ভ্রাতৃবিরোধেরই নির্মম পরিণতি। খ্রীষ্ট জন্মাবার আড়াই হাজার বছর আগে কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে এই হত্যালীলা সংগঠিত হয়েছিল। যে ইন্দো-ইওরোপীয় জাতিগোষ্ঠী ভারতভূখণ্ডে হিন্দুধর্ম নিয়ে আসে তাদের উদ্দেশ্য ছিল দেশটাকে অনার্য দ্রাবিড়দের হাত থেকে জোর করে কেড়ে নেওয়া। অনাবাসী এই ইন্দো-ইওরোপীয় জাতির ঋষিরাই সিন্ধুনদের তীরে বসে খ্রীষ্ট জন্মাবার কয়েক হাজার বছর আগে পবিত্র বেদ রচনা করেছিলেন।

পয়গম্বর মহম্মদ প্রবর্তিত ইসলাম ধর্মবিশ্বাস এদেশে এসেছে আরও পরে। খাইবার গিরিপথ দিয়ে চেঙ্গিস খাঁ ও তৈমুরলঙ সেনাবাহিনীর উপর্যুপরি সশস্ত্র অভিযানের পর গাঙ্গেয় উপত্যকায় হিন্দু অধিকার অনেক হীনবল হয়ে যায়। তারপর এই ভূখণ্ডে ইসলাম ধর্মবিশ্বাস স্বাগত হয়েছে। অতঃপর দুশতাব্দী ধরে মোগল সম্রাটদের বিলাসবহুল নিষ্ঠুর নিপীড়নমূলক শাসনব্যবস্থায় আজ্ঞাধীন থেকেছে এদেশের অধিকাংশ অঞ্চল। এরই পিছু পিছু এসে পড়েছিল ইসলাম ধর্মবিশ্বাস এবং পরম করুণাময় আল্লার বাণী।

সেই থেকে হিন্দু ও ইসলাম এই দুই ধর্মবিশ্বাস এই উপমহাদেশে পাশাপাশি প্রোথিত হয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি থাকলেও দুই ধর্মবিশ্বাসের অভিব্যক্তি দুরকম, একেবারে বিপরীতও বলা যায়। ইসলাম ধর্মবিশ্বাসে প্রেরণার উৎস স্বয়ং পয়গম্বর মহম্মদ। তাদের একমাত্র ধর্মগ্রন্থ কোরান। অন্যদিকে হিন্দুধর্মে কোন প্রবর্তক নেই। সত্যের বিকাশের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে এই ধর্ম। হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠানবিশেষ, সাংগঠনিক। নিয়মনীতি, ক্রিয়াকর্মাদি আর অনুশাসনের উপর গড়ে উঠেছে এই ধর্মবিশ্বাস। ইসলাম ধর্মে আল্লাই সব। তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তাঁর সৃষ্টি থেকে স্রষ্টা আলাদা। হিন্দুধর্মে জগৎকারণ ঈশ্বর এবং তাঁর সৃষ্ট জীবকুল এক ও অভিন্ন। হিন্দুর ঈশ্বর সবেতেই আছেন। তাঁর মধ্যেই বিশ্বব্যাপী শক্তির (কস্‌মিক স্পিরিট) পরিপূর্ণ উৎকর্ষ হয়েছে। যে কোন বস্তু ও প্রাণে তিনি

www.pathagar.com

সত্তাযুক্ত। তাঁর অনন্ত প্রকাশে কোন সীমা নেই।

হিন্দুরা তাই চিৎ-অচিৎ সবেতেই ঈশ্বর সান্নিধ্য পান এবং তাদের আরাধনা করেন। জীব, জড়বস্তু, প্রকৃতি, অগ্নি, বায়ু, লিংগ, গ্রহনক্ষত্র, ঋষি, পূর্বপুরুষ, ও এঁদের সবার মধ্যেই অনন্ত অসীম ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিদ্যমান। অপরদিকে ইসলাম ধর্ম একেশ্বরবাদী। সেখানে আল্লাই একমাত্র অভিব্যক্তি। তাঁদের মূলগ্রন্থ কোরান ভক্তদের নিষেধ করেছে আল্লাকে অন্যরূপে ভজনা করার। ভক্ত মুসলমান সেই নিষেধ মান্য করেন। ইসলাম ধর্মে মূর্তিপূজা অপবিত্র এবং আল্লা-নিন্দাকারী। মুসলমানরা যথেষ্ট ভক্তি আর সতর্কতার সংগে মসজিদের ব্যবহার করেন। ইসলাম-দের উপাসনা মন্দির এই মসজিদের অভ্যন্তরে কোন অলংকরণ থাকে না। সর্বক্ষণ স্মরণ-মননের জন্য নিরানব্বুইজন পয়গম্বরের নাম ছাড়া কোন স্মারকবস্তু মসজিদের মধ্যে থাকে না।

হিন্দু পৌত্তলিক। বিগ্রহপূজারী। তাই হিন্দুর মন্দির আর মুসলমানের মসজিদ একেবারে বিপরীত মেরু। হিন্দুর মন্দির যেন এক আধ্যাত্মিক বিপণিকেন্দ্র (স্পিরি-চুয়্যাল শপিং সেন্টার)। যাঁর যেমন পছন্দ তিনি তেমন দেবদেবী বেছে নেন। কোথাও তিনি দশভুজা, কোথাও লোলজিহ্বা, কারও গলায় হেলায় ঝুলছে নাগনাগিনীরা, আবার কোথাও মাটির মধ্যে প্রোথিত লিংগমূর্তি।

মুসলমান এবং হিন্দুর পূজাবিধিতেও অনেক অমিল। মসজিদের মধ্যে বসে মুসলমানরা ধর্মবিহিত প্রার্থনা করে একত্রে। পবিত্র মক্কাতীর্থের দিকে মুখ রেখে তারা পবিত্র কোরান থেকে পাঠ করে। হিন্দুর ধর্ম মুখ্যত গৃহধর্ম। তার পূজা-রীতি গোপন এবং একান্ত। সেখানে অন্য কারও অনুপ্রবেশ অবাঞ্ছিত। হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর যে কেউ ভক্তের আরাধ্য হতে পারেন। এই নির্বাচনটি ভক্তের একান্ত। ব্যাপারটা এত জটিল যে সামান্য কিছু ধর্মবেত্তা শাস্ত্রালোচক ছাড়া সাধা-রণের কাছে এই তত্ত্ব প্রায় অবোধ্য। এই তত্ত্বের মূল ভাবটি নিহিত আছে হিন্দুর ত্রিমূর্তি কল্পনার মধ্যে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন সত্তা হলেন সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের প্রতীকস্বরূপ। অর্থাৎ অস্তি, নাস্তি এবং অনপেক্ষ. এই তিন মিলিত শক্তি যেন আদর্শ সাম্যাবস্থার অন্বেষণ করে চলেছেন অনন্তকাল। সেই হলো প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ। এই ত্রিমূর্তির পশ্চাদ্‌ভূমিতে অধিষ্ঠিত আছেন প্রকৃতির অন্য দেবদেবীরা। যেমন ঋতু, শস্য এবং ব্যাধির দেবী। এঁরা বৎসরান্তে একবার পূজা পান। হিন্দুর বসন্তরোগের দেবীর যা পূজাবিধি তার সংগে বিস্ময়করভাবে মিলে যায় ইহুদিদের 'পাসওভার' উৎসবের পূজাবিধি।

হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির বড় বাধাটা কিন্তু তাত্ত্বিক বা দার্শনিক নয়, বাধাটা সামাজিক। হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব হয়েছে ধর্মের অনুশাসন থেকে। হিন্দুর প্রাচীনতম শাস্ত্র বেদের মতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতির উৎস হলেন সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মা। চারিজাতি হলো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এদের মধ্যে ব্রাহ্মণ জাতির আসন সর্বোচ্চ, কারণ ব্রহ্মার শ্রীমুখ থেকে জাত হয়েছে ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয়ের স্থান তার পরে। তার জন্ম হয়েছে ব্রহ্মার বাহু থেকে। বৈশ্যজাতির উৎপত্তিস্থান হলো ব্রহ্মার উরুদের এবং পদদ্বয় থেকে জাত হয়েছে শূদ্র। এই জাতিকাঠামোর বাইরে জাতিভ্রষ্টদের স্থান। এই পুণ্যভূমিতে তারা জাত হয়নি। তাই সমাজে তারা অস্পৃশ্য ও অচ্ছুৎ।

তবে জাতিভেদের বৈদিক কল্পনায় যতই ভাবমাহাত্ম্য থাকুক না কেন সমাজে

www.pathagar.com

এর উৎপত্তির আসল কারণটা মোটেই অমন ভাবমহান নয়। এই জাতিভেদের পরিকল্পনা করেছিল এদেশের আর্যরা। একটা উদ্দেশ্য নিয়ে, তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই এই চাতুর্বর্ণ পরিকাঠামো তারা প্রচলন করেছিল। ভারতবর্ষের যারা আদিম অধিবাসী অর্থাৎ অশ্বেতকায় দ্রাবিড় জাতি, তাদের পাকাপাকিভাবে দাস করে রাখার একটা চাতুরী এটা। বর্ণ দিয়েই জাতিভেদ হয়েছে। সাদা-কালো গাত্রবর্ণ থেকেই প্রভেদটা এসেছে। তাই দেখা গেছে কয়েকশ' বছর পরে যাদের গায়ের রং কালো, তারাই অচ্ছুৎ হয়ে গেছে। এই ঘটনাই প্রমাণ করে কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে এই বর্ণাশ্রমপ্রথা প্রচলিত হয়েছিল।

পরবর্তীকালে এক-একটা মূল জাতি থেকে অসংখ্য উপজাতি ভাগ হয়ে গেছে। এমন ভাগের সংখ্যা পাঁচ হাজার। শুধু ব্রাহ্মণদের উপজাতি বা সাব কাস্ট্-এর সংখ্যা ১৮৮৬। অর্থাৎ প্রতিটি বৃত্তির জন্যেই আলাদা জাতিভাগ হয়েছে। ফলে হিন্দুসমাজ ভাগ হয়েছে অসংখ্য ছোট ছোট কূপমণ্ডূক বৃত্তের মধ্যে। চতুর্দিক আবদ্ধ এইসব বৃত্তিমূলক গণ্ডি এত সংকীর্ণ যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এর মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে হয়। সমাজের বৃহত্তর আকাশে সে কোনদিন ডানা মেলতে পারে না। এই প্রভেদ যে কত সূক্ষ্ম তার দৃষ্টান্ত হলো লোহা পেটাই ও লোহা ঢালাই, দুটো আলাদা বৃত্তির প্রচলন। তাই কামার ও ঢালাইকার দুই পৃথক জাতি।

এই জাতিভেদপ্রথার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হিন্দুধর্মের অন্য একটি মৌলভাব, তার পুনর্জন্মবাদ। হিন্দু মনে করে এই নশ্বর জীবন আত্মার সাময়িক দেহবাস মাত্র। দেহবাস জীর্ণ হলে আত্মা অন্য দেহবাস পরিধান করে। প্রতিটি জীবন হলো অনন্তলোকে আত্মার পরিক্রমা। এক জীবন থেকে অন্য জীবনে আত্মা পরিক্রমা করে এবং অবশেষে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বিলীন হয়। 'কর্ম' হলো ইহলোকের সুকৃতি ও দুষ্কৃতির পরিণামফল, যার দায়ভার বইতে হয় আত্মাকে। পরবর্তী জীবনে জাতিকাঠামোর কোন্ স্তরে আত্মার অবস্থান হবে তার নিরূপণ হয় বর্তমান জীবনে। এইভাবেই ভারতের চিরন্তন সামাজিক বৈষম্য বাঁচিয়ে রেখেছে হিন্দুর জাতিভেদপ্রথা। মধ্য যুগে ইওরোপের খ্রীষ্টীয় চার্চও এই মতলব হাতিয়ার করে দুঃস্থ, পীড়িত কৃষকদের সান্ত্বনা দিত। হিন্দুধর্মও যুগ যুগ ধরে এই পন্থা অবলম্বন করেছে। যারা হতভাগ্য তাদের ক্লিষ্ট জীবনযাপন করতে বলেছে যাতে এই জন্মের সুকৃতির পুণ্যফলটি হাতে নিয়ে সে পরের জন্মে পৌঁছতে পারে।

মুসলমানদের কাছে ইসলাম হলেন স্বধর্ম। বিশ্ববাসীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের প্রতীক। তাই মুসলমানদের কাছে হিন্দুর জাতিভেদপ্রথা ঈশ্বরের অভিশাপের মতন। ইসলামের এই স্নেহবন্ধনের হাতছানি পেয়ে ভ্রাতৃত্বের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হতে দলে দলে হিন্দু মোগলযুগে ধর্মান্তর নিয়েছে। এরা মূলত অচ্ছুৎ। বর্ণহিন্দুর শাসন আর আস্ফালন উপেক্ষা করেই এরা ইসলামের ডাকে সাড়া দিয়েছিল। কবে কোন্ দূর ভবিষ্যতে তার উচ্চবর্ণে জন্মলাভ হবে, সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়বে, তার জন্যে বসে থাকেনি এইসব হতভাগ্য মানুষ। দলে দলে তারা ধর্মান্তরী হয়ে ইহজন্মেই অবস্থান্তর ঘটিয়েছে।

আঠারো শতকের শুরুতেই মোগল সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরলো। এই ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো এক জঙ্গী হিন্দু নবজাগরণ। এর প্লাবনে ভেসে গেল সব সম্প্রীতি। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে নতুন করে শুরু হলো রক্তপাত। সৌভাগ্যক্রমে ইংরেজ উপস্থিত থেকে যুধ্যমান দুই সম্প্রদায়কে সামাল

www.pathagar.com

দিলেও ওদের মন থেকে বিদ্বেষবিষ নাশ করতে পারলো না। হিন্দু ভুলতে পারেনি তার পুরনো ব্যথা। একদিন দলে দলে হিন্দু অচ্ছুৎ ধর্মান্তরী হয়েছে। এই কন্-ভার্টরাই যে মুসলমান জনতা বর্ণহিন্দুরা তা জানতো। ফলে জাতিগত বিদ্বেষ-বৈরিতা বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থা হলো যখন মুসলমানের ছায়া মাড়ালেও বর্ণ-হিন্দু সম্প্রদায় শিউরে উঠতো। মুসলমানের ছোঁয়া খাবার তারা খেত না। হিন্দুর হেঁসেলে মুসলমান ঢুকলে তা দূষিত হতো এবং বর্ণহিন্দুরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা গংগার জলে অবগাহন স্নান করে নিজেদের কলুষমুক্ত করতো।

নোয়াখালির যে গ্রামে গান্ধীজী পরিদর্শনে এলেন সেখানকার হিন্দু ও মুসল-মান সম্প্রদায় এক গ্রামে বাস করলেও তাদের বাস্তুঅঞ্চল ছিল আলাদা। সারা উত্তর-ভারতের বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্জাব অঞ্চলেও তারা এইভাবে আলাদা বাস করতো। ওদের পৃথক বস্তুঅঞ্চলকে ভাগ করতো একটা সীমানা সড়ক। একপাশে হিন্দু, অন্যপাশে মুসলমান। এক সম্প্রদায়ের মানুষ অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের সংগে মেলামেশার সুযোগ থাকলেও সামাজিক সম্বন্ধ হতো না। জলচলও ছিল না দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে। হিন্দুর কুয়ো বা পুকুর থেকে মুসলমানের পানীয় জল আনা যেত না। হিন্দু শিশুর বর্ণপরিচয় হতো গ্রামের পণ্ডিতের কাছে। অথচ একই গ্রামের মুসলমান শিশুরা বিদ্যাশিক্ষা করতো গ্রামের মৌলবীর কাছে। এমনকি যে দিশি ভেষজের সাহায্যে গ্রামের হিন্দু ও মুসলমানের চিকিৎসা হতো তারও প্রয়োগ উপাদানে তারতম্য ছিল।

এই সামাজিক ও ধর্মীও বৈষম্যের সংগে ঘনিষ্ঠ ছিল অর্থনৈতিক দিকটাও। বস্তুত দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এই অর্থনৈতিক বৈষম্যটাই ছিল সবথেকে প্রকট। ইংরেজদের আমদানি করা শিক্ষা ব্যবস্থার ফসল সবচেয়ে আগে ঘরে তুলেছিল হিন্দুরাই। পাশ্চাত্য ভাবনার সুফলও তারাই আগে ভোগ করে। ফলে ইংরেজের সংগে মুসলমানদের মেলামেশা অবারিত হলেও প্রশাসনের সর্বত্রই ছিল হিন্দুর আধিপত্য। সর্বক্ষেত্রে হিন্দুরাই ছিল কর্তাব্যক্তি লোক।* লাভজনক নানা কারবারে তারা যেমন টাকা লগ্নি করতো, তেমনি পেশাগত চাকুরিতেও তারাই ছিল অগ্রগণ্য। এমনকি অগ্নি উপাসক জরথুস্ত্রপন্থী ধনী পারসীকদের সংগে জোট বেঁধে তখন ব্যাঙ্কিং ও বীমার কারবার এবং ছোটখাট শিল্প-কারখানাও হিন্দুরাই স্থাপন করেছে।

বড় শহরের মতন ছোট শহরেও প্রধান কারবারী মানুষ ছিল হিন্দুরা। অনেক হিন্দুই বন্ধকী কারবার থেকে অর্থোপার্জন করতো। সমাজের উঁচুতলার অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানরা প্রচার করতো যে তারা বিদেশী মোগল সম্রাটের বংশোদ্ভূত। তাদের প্রধান জীবিকা ছিল সৈন্যবিভাগে চাকরি বা জমিদারির ভোগদখল। যারা সাধারণ মুসলমান তারা কদাচিৎ কোরানের নির্দেশ অমান্য করার স্পর্ধা করতো। এরা ছিল মূলত ভূমিহীন ক্ষেতমজুর বা বিত্তহীন কারিগর মিস্ত্রি। হিন্দু-মুসল-মান জমিদার নির্বিশেষে তারা জমি চাষ করতো। শহরের হিন্দু মালিকের অধীনে কাজ করতো এইসব গরিব কারিগর মিস্ত্রিরা।

---

*১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভারতের মুসলমানদের বিরোধী ভূমিকার দরুন প্রায় যুগ-যুগ ধরে তাদের নানাভাবে পীড়ন সইতে হয়েছে।

www.pathagar.com

এই অর্থনৈতিক আড়াআড়ি থেকেই দু' সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় উত্তেজনা ছড়ালো। শ্রীরামপুরেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। সেখানেও কোন না কোন তুচ্ছ কারণে সাম্প্রদায়িক অশান্তি সৃষ্টি হতো। দুই সম্প্রদায়ের মানুষের হাতেই উত্তেজনা ছড়াবার কিছু কিছু পছন্দের উপাদান মজুত থাকতো। এগুলো ভারি স্পর্শকাতর বস্তু। হিন্দুর হাতে এইরকম স্পর্শকাতর বস্তু হলো গান যা মুসলমানের ধর্ম সাধনের ঐতিহ্যে রীতিমত নিষিদ্ধ। মসজিদে নমাজ পাঠের সময় কোনরকম চটুল গানবাজনা করা আল্লাকে মর্যাদাহীন করার শামিল। কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধনের মধ্যে মুসলমানরা ধর্মবিহিত উপাসনা করে। তাই শুক্রবারের নমাজ পাঠের সময় হিন্দু প্রতিবেশী ঢাকঢোল বাজিয়ে মুসলমানের ধর্মবিহিত উপাসনার পবিত্রতা ক্ষুন্ন করার চেষ্টা করবেই। বলাবাহুল্য, এই দৌরাত্ম্য কোন ধর্মপ্রাণ মুসলমানই সইতে পারে না এবং স্বাভাবিকভাবেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। হিন্দুর হাতে যেমন গান তেমনি মুসলমানের পরম কাম্যবস্তু হলো হৃষ্টপুষ্ট এবং যত্রতত্র শিথিল পরিভ্রমণকারী ধূসর রঙের একটি গৃহপালিত অবোলা জীব। যে জীবটিকে ভারত-বর্ষের গ্রামেগঞ্জে, হাটেবাজারে সর্বত্রই দেখা যায় এবং হিন্দুরা যাকে অতি পবিত্র গোমাতা জ্ঞানে পুজো করে অর্থাৎ গাভী।

সেই বাইবেলের চেয়েও প্রাচীন যুগ থেকেই সমাজে গাভীর সমাদর হয়ে আসছে। যখন শুধু পশুপালন বৃত্তি সম্বল করে যাযাবর ইন্দো-ইওরোপীয়রা এই উপ-মহাদেশে এল তখন গাভী আর গৃহপালিত পশুরাই তাদের ভাগ্য গড়েছে। সুতরাং সহচর পশুদের সুস্থ সবল রাখার একটা প্রেরণা তাদের ছিল। নিজেদের স্বার্থেই তারা এই কাজ করতো। যেমন প্রাচীন জুডিয়ায় [প্যালেস্টাইন] রোগ ছড়াবার কারণে শুয়রের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ হয়ে যায়, তেমনি এই ভূখণ্ডে গাভীকে গো-মাতা রূপে পুজা করার বিধি প্রণয়ন করেছিলেন প্রাচীন মুনি-ঋষিরা। এই-ভাবেই গো-জাতিকে রক্ষা করা হয়েছে নিধন থেকে। দুর্ভিক্ষের সময় এইভাবে নির্বি-চারে গো-হত্যা ঠেকানো হয়েছে যাতে গোধন রক্ষা পায়। গো-হত্যা নিষিদ্ধ হওয়ায় তাদের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। ১৯৪৭ সালে ভারতের গো-জাতির সংখ্যা ছিল পৃথিবীর সর্বাধিক। প্রায় বিশ কোটি। অর্থাৎ প্রতি দুজনের জন্য বরাদ্দ ছিল একটা প্রাণী। সেই হিসাবে গাভীর মোট সংখ্যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যারও বেশি ছিল। এই বিপুলা গো-জাতির মধ্যে মাত্র চার-পাঁচ কোটি গাভীকেই গোধন বলা যায়। এদের দোহন করে যে পরিমাণ দুধ পাওয়া যেত তা খুবই সামান্য, গাভী প্রতি গড়ে এক পাঁইট বা দেড় পোয়া মাত্র। অবশিষ্ট ১৫ কোটির মধ্যে ভারবাহী বলদের সংখ্যা ছিল পাঁচ কোটি। এদের দিয়ে চাষআবাদ বা গাড়ি টানা হতো। বাকী ১০ কোটি ছিল স্রেফ ধর্মের ষাঁড়। তারা ঘাটে-মাঠে চরে বেড়াত আর গৃহস্থের সঞ্চিত আনাজ উদরস্থ করে সর্বনাশ করতো। হিসাবে দেখা গেছে যে প্রতিদিন তারা যে পরিমাণ মনুষ্যখাদ্য নষ্ট করেছে তা দিয়ে বুভুক্ষু এবং অনাহারী প্রায় এক কোটি মানুষের খাদ্যের যোগান দেওয়া যেত।

সুতরাং মানুষের জীবনধারণের প্রয়োজনেই এই অকর্মণ্য ধর্মের ষাঁড়ের জবাই হওয়া দরকার। কিন্তু হিন্দুসমাজে সংস্কার এত গভীর যে এদের সমাদরের মাত্রার কোন হেরফের কখনো হয়নি। বরং নিজেরা অনাহারে থেকেও গাভীর পরিচর্যা করেছে। তুচ্ছ টাকার জন্যে এই অকর্মণ্য জীবদের কখনো কসাইখানায় পাঠায়নি হিন্দু। স্বয়ং গান্ধীজীও ব্যতিক্রম নন এই সংস্কার থেকে। তিনিও দরিদ্র দেশ-

www.pathagar.com

বাসীকে বুঝিয়েছেন যে অবোলা এই জীবটিকে রক্ষা করে হিন্দুরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করছে।

এই বোবা অকর্মা জীবদের ওপর হিন্দুদের ভক্তির ঘটা দেখে মুসলমানরা চিরকালই অবজ্ঞার হাসি হেসেছে। তাই সুযোগ পেলেই অবাধ্য এঁড়ে গরুর পাল নিয়ে হিন্দুর মন্দিরের সামনে দিয়ে তারা কসাইখানায় যেত। মুসলমানের এই দৌরাত্ম্য এই ভূখণ্ডে দিনের পর দিন নিত্য ঘটেছে। ফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধরনের উত্তেজনাকর ঘটনায় নিত্য দাঙ্গা বাধতো এবং কসাইখানায় জবাই হতে যাওয়া গরুদের ভাগ্য অনুসরণ করে হতভাগ্য মানুষও জবাই হতো।

শাসন করতে এসে ইংরেজরা যুধ্যমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন নড়বড়ে একটা ভারসাম্য বজায় রেখে চলবার চেষ্টা করেছে, তেমনি দেশ শাসনের কঠিন দায় সহজ করতে এই বিরোধকে কাজেও লাগিয়েছে। প্রথম প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সিংহভাগ দায় যাদের হাতে ছিল তারা ছিল সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান। ধর্মীয় বিভেদ ভুলে এরা একসঙ্গেই লড়াই করেছে, কারণ ধর্মীয় গোঁড়ামির ওপর তাদের তেমন আস্থা ছিল না। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে গান্ধীজীই উপলক্ষ হয়ে এই ঐক্য ভেঙে দিলেন।

ভারত যেহেতু আধ্যাত্মিক দেশ সেইহেতু স্বাধীনতা সংগ্রামকে ধর্মযুদ্ধরূপে পরিচালিত করা গান্ধীজী কর্তব্য মনে করলেন। বস্তুত গান্ধীজী সেটাই করেছিলেন। অথচ এতবড় দেশে তাঁর মতন সংস্কারমুক্ত স্বাধীনমনের মানুষ একজনও ছিলেন না। তাই তাঁর পরিচালিত আন্দোলনের মধ্যে মুসলমানদের শামিল করাতে তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। কিন্তু গান্ধীজী সফল হননি। কারণ, তাঁর পরিচয় হ'লো যে তিনি হিন্দু এবং নিবিড়ভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী। ফলে কংগ্রেস দল স্বাদেগন্ধে অনিবার্যভাবেই হিন্দুদল হয়ে উঠলো এবং মুসলমানরাও কোনদিন তাঁকে সন্দেহমুক্ত চোখে দেখলো না।

যত দিন গেছে মুসলমানদের মনের সন্দেহ ততই গাঢ় হয়েছে। কারণ, স্থানীয় রাজনীতিতে কংগ্রেস নেতারা কোন নির্বাচনেই মুসলমানদের সঙ্গে সমঝোতা করেনি। ক্রমশ তাদের মনে এমন আতঙ্ক ভর করলো যে, তারা ভাবতে লাগলো যে, স্বাধীন হলে ভারতের হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে দেশ শাসন করবে আর মোগল সম্রাটদের ঐতিহ্য বহনকারী মুসলমানরা হবে হিন্দুর তাঁবেদার।

এই দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তি পাবার একটাই পথ তখন মুসলমানদের সামনে খোলা ছিল। তা হলো এই উপমহাদেশে মুসলমানদের জন্যে পৃথক ইসলামিক রাষ্ট্র গঠন করা। এই আলাদা রাষ্ট্রের যে পরিকল্পনা হয় তা পরিস্ফুট হয়েছিল সাড়ে চার পাতার এক ইংরিজি বয়ানে। এই সাদামাটা ইংরিজি বয়ানের যিনি রচয়িতা তাঁর নাম রহমত আলি। কেমব্রিজের তিন নম্বর হাম্বারস্টোনের এক সাদামাটা কটেজে বসে চল্লিশ বছরের এই গ্র্যাজুয়েট মুসলমান ছাত্রটি ১৯৩৩ সালের ২৮শে জানুয়ারি তারিখে লিখলেন যে, ভারতবর্ষের একজাতিতত্ত্বের কল্পনা 'এক অস্বাভাবিক মিথ্যা উক্তি।' কাশ্মীর, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং বালুচিস্তানের মুসলমানদের নিয়ে রহমত আলি আলাদা রাষ্ট্র তৈরি করার কথা বললেন সেই সাড়ে চারপাতার রিপোর্টে। নতুন রাষ্ট্রের একটা নামও স্থির করেছিলেন তিনি। তার নাম হবে 'পাকিস্তান—পবিত্র মানুষের দেশ।' রহমত আলি তাঁর প্রতিবেদন শেষ করেছেন একটা ক্রুদ্ধ আস্ফালন ছুঁড়ে। বললেন, 'হিন্দু জাতীয়তাবাদের

www.pathagar.com

হাড়িকাঠে আমরা বলি হবো না।'

রহমত আলির প্রস্তাবটা ভারতের মুসলমান জাতীয়তাবাদী দল মুসলিম লীগ আগ্রহভরে গ্রহণ করলো এবং ধীরে ধীরে ভারতের অগণিত মুসলমান জনতার মাথায় ঢুকিয়ে দিল তা। মুসলমানদের ভিন্ন হবার আবদার ক্রমেই বাড়তে লাগলো। এর-জন্যে কিছুটা দায়ী কংগ্রেসের হিন্দু নেতারাও। মুসলমানদের এতটুকুও ছাড় দেবার পক্ষপাতী তারা সেদিন ছিল না। তাদের এই কর্তাসুলভ মনোভাবই সেদিনকার মুসলমানদের জিদ আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর দুই সম্প্রদায়ের উগ্র ধর্মো-ন্মাদনা থেকে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হলো তারই চূড়ান্ত ফল হলো ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্টের ঘটনাটা। নোয়াখালিতে গান্ধীজীর ঐতিহাসিক পদযাত্রার ঠিক পাঁচ মাস আগের ঘটনা সেটা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রধান শহর কলকাতার বুকের ওপর সেদিন প্রথম যে হত্যালীলা সংঘটিত হলো নৃশংসতায় তা বোধহয় ব্ল্যাক হোল্ ট্র্যাজেডিকেও হার মানায়। সেদিন এই নারকীয়তার জন্ম হয়েছিল কলকাতার বস্তি থেকে। কলকাতার এইসব বস্তিগুলোয় থিকথিক করছে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়। যাদের বাঁচার কোন ছিরিছাঁদ নেই, অলংকরণ নেই। পাশাপাশি জড়াজড়ি করে পড়ে থাকা মানুষগুলোর একমাত্র অংগভূষণ হলো নির্দয় দারিদ্র্য। এদেরই বস্তি থেকে উঠে এসেছিল এই নৃশংস হত্যালীলা।

১৬ই আগস্টের ভোর থেকেই বিপন্ন আল্লার জয়ধ্বনি দিয়ে বেরিয়ে পড়লো মুসলমানরা। তাদের হাতে লোহার ডান্ডা, শাবল, খেটে, যার এক আঘাতে মানুষের মাথার খুলি ফাটিয়ে দেওয়া যায়। মুসলিম লিগ থেকে যে 'ডাইরেক্ট এ্যাকশনের' ডাক দেওয়া হয়েছে তারই ডাকে সাড়া দিয়েছে মুসলমান ভাইরা। যদি প্রয়োজন হয় তবে ১৬ই আগস্টের দিনটাকে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' হিসেবে পালন করে তারা ইংরেজ আর কংগ্রেসের হাত থেকে 'পাকিস্তান' ছিনিয়ে নেবে। ওরা তখন পশুর মতন আচরণ করছে। নির্দয়ভাবে হিন্দুদের হত্যা করে মৃতদেহগুলো খোলা ড্রেনের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। এই বীভৎসতা দেখে পুলিসের লোকেরাও সন্ত্রস্ত হয়ে উধাও হয়ে গেল অকুস্থল থেকে। খানিক পরেই আকাশে কুন্ডলী পাকানো ধোঁয়া দেখে বোঝা গেল যে হিন্দুদের বাজারে আগুন লাগানো হয়েছে।

এ হলো একটা দিকের ছবি। অন্যদিকের ছবিটাও সমান ভয়াবহ। প্রথম ঘোরটা কেটে যেতেই হিন্দু জনতাও ঝাঁপিয়ে পড়লো মহারণে। সারা শহর তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়াতে লাগলো মুসলমানদের। কলকাতা নামক শহরটা তখন নরককেও হার মানায়। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে শহরটা যেন মানুষের নিষ্ঠুরতা দেখে বোবা হয়ে গেল গংগা নদী দিয়ে হাজারে হাজারে ভেসে যাচ্ছে মানুষের মৃতদেহ। কাঠের গুঁড়ির মতন মড়াগুলো ভেসে চলেছে সমুদ্রের দিকে। রাস্তাঘাটে পড়ে আছে হাত-পা কাটা মৃত অর্ধমৃত মানুষ। সে এক চরম বীভৎসতা। সেদিন কিন্তু এই নিষ্ঠুরতার বলি হয়েছিল অসহায় গরিব মানুষরাই। যখন মানুষের জবাই পর্ব শেষ হলো, তখন সারা কলকাতা শহরটা যেন শ্মশানভূমি হয়ে উঠেছে। শহরের আকাশ শকুনের কালো ডানায় ঢেকে গেছে। শোনা যায় প্রায় দু'হাজার মড়ার সদগতি করেছিল এই উল্লসিত পক্ষীকুল।

ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংয়ের প্রতিক্রিয়া হলো নোয়াখালিতে। গান্ধীজী তখন সেখানে। প্রতিক্রিয়া হলো বিহারে এবং এই উপমহাদেশের পশ্চিম-তীরের বোম্বাই শহরেও। বলাবাহুল্য, সেদিনের এই নির্বিচার হত্যালীলাই ইতি-

www.pathagar.com

হাসের গতিপথ বদল করে দেয়। এতদিন ধরে মুসলমানদের যে রণহুংকার কর্তৃপক্ষের হুঁস জাগাতে পারেনি, সেটাই যেন উৎকটভাবে প্রকাশ হয়ে পড়লো। ওদের পৃথক রাষ্ট্রের দাবি অস্বীকার করার পরিণাম যে এমন ভয়াবহ বাস্তবসত্য হয়ে উঠবে তা কে জানতো? হঠাৎই দৃশ্যপট বদলে গেল। গান্ধী নিজেও ক্লিষ্ট হয়ে ছুটে গেলেন নোয়াখালিতে যাতে আসন্ন গৃহযুদ্ধ ঠেকাতে পারেন।

সেদিন এই ঘটনাধারা থেকে উঠে এসেছিলেন অন্য একজন সফল মানুষ। একজন্য বুদ্ধিমান আইনজীবী এবং আবেগ উত্তাপশূন্য একজন রাজনীতিবিদ। এঁর নাম মহম্মদ আলি জিন্না। তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গান্ধীর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক শত্রু। এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের দিকে বাঁকা চোখে চেয়ে থাকতে থাকতে হয়ত ক্রুর হাসিতে ভরে গিয়েছিল তাঁর মুখ। হ্যাঁ, জিন্না সাহেবের হাতে ভারত নামক এই ভূখণ্ডটি ভাগ করার হাতিয়ার এসে গেছে। তিনি সফল হয়েছেন তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছতে। হয়ত তাঁর পরবর্তীকালের অনুগামীদের তৈরি করা রাজনৈতিক ইতিহাসে জিন্নার যথার্থ স্থানটি কোনদিন চিহ্নিত হবে না। তবুও গান্ধী বা আর কেউ নন, সেদিন জিন্নাই ছিলেন একমাত্র ভাগ্যবিধাতা। তাঁর হাতেই ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের ভবিষ্যৎ রূপরেখাটি ধরা ছিল। শুধু এই একজন মানুষের অনমনীয় জিদের জন্যেই সবরকম বোঝাপড়া নিষ্ফল হয়ে যায়। তবে একথাও ঠিক যে মুসলমানদের মেস্‌সায়্যা বা পরিত্রাতা ছিলেন জিন্নাই। তাঁর অনুগামীদের তিনি হাত ধরে প্রতিশ্রুত পুণ্যতীর্থে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

১৯৪৬-এর আগস্ট মাস। বোম্বাই শহরের বাইরে ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে এক শিবিরের মধ্যে বসে জিন্না প্রত্যক্ষ সংগ্রামের তাৎপর্য বোঝাচ্ছিলেন। জিন্না তাঁর অনুগামীদের বললেন যে কংগ্রেস যদি গৃহযুদ্ধ চায়, তবে নির্দ্বিধায় 'মুসলমানরা তা মেনে নেবে।' কথাগুলো বলার সময় ফ্যাকাসে ঠোঁট দুটি চেপে একটু নিষ্প্রাণ হাসলেন জিন্না। তাঁর চোখের ভীষণ দৃষ্টির মধ্যে ফুটে উঠেছিল চাপা রাগের গনগনে আঁচ। হ্যাঁ, ওদের ডাকা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক তিনি শুনেছেন। কংগ্রেস আর ইংরেজের মিলিত এই সংগ্রামের ডাক তিনি অস্বীকার করবেন না। যোগ্য জবাবই জিন্না দেবেন। চাপা হিসহিস স্বরে স্বগতোক্তি করলেন জিন্না। 'আমরা ভারত বিভাগ করবই, নয়ত সারা দেশটাকে পোড়ামাটি করে চলে যাব।'

www.pathagar.com

ঈশ্বরই ভারতের ভাগ্যদেবতা

জানুয়ারি ১৯৪৭, লণ্ডন

'শুনুন! একটা বিপত্তি হয়েছে।'

লুই মাউন্টব্যাটেনের কথা শুনে তাকালেন সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ। কথা হচ্ছিল বাকিংহাম প্যালেসের বৈঠকখানা ঘরে। সামনা-সামনি বসে আছেন দুজনে। এ ধরনের অন্তরঙ্গ আলোচনার সময় কখনো-সখনো আনুষ্ঠানিক নিয়মকানুনের বালাই থাকে না। স্কুলের পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেবার মতন চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতেই কথাবার্তা চলে। কিন্তু আজ যেন একটু ব্যতিক্রম হয়েছে। লুই মাউন্টব্যাটেনের কথার ধরনটা একটু বিশেষ রকমের অর্থবহ। সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ সম্পর্কে জ্ঞাতিভাই হন মাউন্টব্যাটেনের। কাজিন্। তাঁর দরবারে শেষবারের মতন আপীলটা পেশ করেছেন মাউন্টব্যাটেন। এটাই তাঁর শেষ ভরসা। যদি অন্তত সম্রাটের হস্তক্ষেপে এই নিন্দনীয় কাজের দায় থেকে তিনি অব্যাহতি পান তাহলেও কৃতার্থ হবেন মাউন্টব্যাটেন। বৃটেনের সঙ্গে ভারতের এতদিনের সম্পর্কটা ছিন্ন করার দায় পড়েছে তাঁর ওপর। এই দায় থেকে মুক্তি চান তিনি। আর যাই হ'ক সম্রাট ত' ভারতেরও সম্রাট। সুতরাং ভারতের বড়লাট বাহাদুরের নিয়োগের ব্যাপারে স্বয়ং সম্রাটই শেষ কথা বলবেন। সম্রাটের হাতেই তাঁর নিয়োগের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এখন। আর সেই নিদারুণ নিয়োগের শেষ কথাটা শোনবার জন্যেই মাউন্টব্যাটেন এখানে এসেছেন।

কিন্তু মহামান্য সম্রাটের মুখের ওই লাজুক হাসিটা খুব ভাল ঠেকলো না মাউন্টব্যাটেনের। তাঁর দিকে চেয়ে ঠোঁটচাপা দুষ্টু একটু হেসে সম্রাট বললেন, 'আমি জানি। পি. এম. আমার সঙ্গে দেখা করে সব কথা বলে গেছেন।' একটু থেমে সম্রাট বললেন, 'আমি রাজি হয়েছি।'

মাউন্টব্যাটেন থমকে গেলেন। সম্রাটের দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনি রাজি হয়েছেন? কিন্তু ব্যাপারটা কি ভাল করে ভেবে দেখেছেন?'

'নিশ্চয়!' বেশ খুশী মনেই সম্রাট বললেন, 'ভাল করেই ভেবে দেখেছি।'

মাউন্টব্যাটেন তখনও বুঝে উঠতে পারছিলেন না। সম্রাট কি আদৌ ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝেছেন? তাই আর একবার সম্রাটকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন।

'শুনুন সম্রাট! ব্যাপারটা সত্যিই গুরুতর। এখন পর্যন্ত কেউ-ই এর সুরাহা খুঁজে পায়নি। কারণ, তা পাওয়া অসম্ভব। আপনি আমার জ্ঞাতি ভাই। যদি সেখানে গিয়ে আনাড়ির মতন একটা কিছু করে ফেলি, তাহলে বিশ্রীভাবে অপদস্থ হবেন আপনি।'

সম্রাট তখনও মৃদু মৃদু হাসছেন। সেইভাবেই বললেন, 'এই-ই তোমার আশংকা!' একটু চুপ করে সম্রাট ফের বললেন, 'কিন্তু সত্যি যদি সফল হও, তাহলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাবমূর্তি কতটা উজ্জ্বল হবে ভাব তো!'

মাউন্টব্যাটেন এবার সত্যিই হতাশ হয়ে গেলেন। চেয়ারের পেছনে শরীরটাকে

www.pathagar.com

এড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'তাহলে বলবো যে আপনি একটু বেশি রকমের আশাবাদী।'

বাকিংহাম প্যালেসের যে অভ্যর্থনা ঘরে বসে অন্তরঙ্গ কথা হচ্ছিল, সে ঘরে ঢুকলেই আর একজন জ্ঞাতিভাইয়ের কথা মনে পড়ে যায় মাউন্টব্যাটেনের। তিনিও আর এক 'কাজিন' এবং ছেলেবেলা থেকেই তার সঙ্গে বন্ধুত্বটা সবচেয়ে গাঢ়। সে হলো ডেভিড, প্রিন্স অব ওয়েলস্। তারই রাজা হবার কথা। আদবকায়দা শেখানোও হয়েছিল সেইভাবে। কিন্তু রাজা হওয়া হলো না ডেভিডের। স্বেচ্ছায় রাজতক্ত ছেড়ে দিল, কারণ যাকে ভালবাসে তাকে ছাড়া সিংহাসনে বসতে চাইল না ডেভিড।

তা সে সব অনেক পুরানো কথা। আজ এই ঘরখানায় বসে মাউন্টব্যাটেনের হঠাৎ মনে হলো ভাগ্যের এ কি প্রহসন! হাতে মুক্তিপত্র নিয়ে তিনি যে দেশে চলেছেন, সে দেশের মাটিতে তিনি প্রথম পা দেন ১৯২১ সালের ১৭ই নভেম্বর তারিখে। ওই ডেভিডেরই এ. ডি. সি. হয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন তিনি। মাউন্টব্যাটেন তখন যুবক। ডাইরির পাতায় মুগ্ধ যুবক লিখেছিলেন, 'এই সেই দেশ যার কথা কত শুনেছি, কত পড়েছি, যাকে নিয়ে কত স্বপ্ন দেখেছি আমি।' সেদিনের অসামান্য সেই রাজকীয় পর্যটনের আড়ম্বর দেখে মাউন্টব্যাটেনের মন বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। ব্রিটিশরাজের তখন দারুণ হাঁকডাক। বলা যায় ঐশ্বর্যের শীর্ষে উঠেছে রাজতন্ত্র। সেই রাজতন্ত্রের ভাবী সম্রাট এসেছেন ভারতদর্শনে। সুতরাং কোন আয়োজনই যথেষ্ট মনে হয়নি। শাহজাদার আপ্যায়নের জন্যে আড়ম্বর, জাঁকজমকের কোন কার্পণ্যই করা হয়নি সেদিন। দেশটার এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত সাদা এবং সোনালী রঙের খাস লাটসাহেবের ট্রেনে চড়ে ঘুরেছেন তাঁরা। ঘটা করে পোলো খেলেছেন, চাঁদের আলোয় হাতীর পিঠে চড়ে বেড়াতে গেছেন, হৈ চৈ করে বাঘ শিকার করেছেন, ভারতীয় রাজারাজড়ার জমজমাট দরবারে এসেছেন সম্মানিত অতিথি হয়ে। তাই দেশটা ছেড়ে যাবার আগে বিমর্ষ মাউন্টব্যাটেনের মনে হয়েছিল, 'ভারতবর্ষ একটা আশ্চর্য সুন্দর দেশ, আর এখানকার বড়লাটের চাকরিটা বোধহয় পৃথিবীর সবচেয়ে চমৎকার চাকরি।' হায়! ভাগ্যের মোচড়ে সেই চমৎকার চাকরিটাই তিনি পেতে চলেছেন এখন।

সারা ঘরে তখন ছড়িয়ে আছে একটা থমথমে নীরবতা। তবে কি সম্রাটের ভাবনাচিন্তায় কিছু ভাঙাগড়া হলো? ঠিক তাই। খানিক পরেই একটা বিষণ্ণ বিলাপ ধরা পড়লো সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের কথায়। আনমনে বলে উঠলেন, 'আমার এখন খুব খারাপ লাগছে ডিকি যে, যখন সাউথ ইস্ট এশিয়ায় লড়াই চালাচ্ছ তখন কত চেষ্টা করেছি তোমার কাছে যেতে। ইচ্ছে ছিল ওখান থেকে ভারতদর্শন সেরে আসবো। কিন্তু উইন্সটন যেতে দেয়নি। অন্তত যুদ্ধটা শেষ হবার পরেও একবার যাব ভেবেছিলাম। তাও হলো না। এখন মনে হচ্ছে আমার ভারতদর্শন আর বোধহয় হলো না।' একটু থামলেন সম্রাট। ঘরখানা সত্যিই বিষণ্ণ হয়ে গেছে তাঁর কথায়। ফের শুরু করলেন বলতে, 'ভারতসম্রাট করে আমায় রাজমুকুট পরানো হলো কিন্তু দেশটাকে ওরা দেখতে দিল না। এখন মনে হচ্ছে লন্ডনের এই প্রাসাদে বসেই আমায় রাজমুকুট খুলে ফেলতে হবে। এর চেয়ে দুঃখের আর কি হতে পারে!'

সম্রাটের মনের খেদ বুঝতে পারেন ডিকি মাউন্টব্যাটেন। স্বপ্নের দেশ ভারতবর্ষে আর কোনদিন যেতে পারবেন না ওই মানুষটি। আর কোনদিন আড়ম্বর করে বাঘ শিকারের ব্যবস্থা হবে না। হাতীর পিঠে সোনা-চাঁদির হাওদায় চড়ে মিছিল করে যাওয়াও হবে না তাঁর। দেশীয় রাজা-মহারাজারাও হীরে-মানিক পরে তাঁর সামনে

www.pathagar.com

আভূমি কুর্নিশ করে দাঁড়িয়ে থাকবে না।

সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের রাজপর্ব শুরু হয়েছে ধনাঢ্য ভিক্টোরীয় যুগের ঐশ্বর্যের তলানি নিয়ে। ধন নয় ধনের স্মৃতি নিয়ে তিনি রাজত্ব করা শুরু করলেন। ইংল্যাণ্ডের রাজকোষ তখন প্রায় শূন্য হয়ে গেছে। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে বটে কিন্তু তার কালো ছায়ায় ঢেকে আছে সারা ইংল্যাণ্ড। সুতরাং বাঁচার প্রয়োজনেই শুরু হলো ব্যয়সংকোচের মহড়া। এখন আর সাম্রাজ্যবাদী আড়ম্বরের আস্ফালন নয়। যা কিছু করণীয় তা সম্পন্ন করতে হবে সোশ্যালিস্ট কৃচ্ছ্রসাধনের পথে। কিন্তু এমনটি হবে কে জানতো! ১৯৩৭ সালের সেই রোদঝলমলে সকালে যেদিন তাঁর অভিষেক হলো সেদিন উৎসবের কত ঘটা! ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ ঘোষণা করলেন যে প্রিন্স য়্যালবার্ট, ডিউক অব ইয়র্ক হলেন গ্রেট ব্রিটেন, আয়ারল্যাণ্ড, সাগরপারের সমস্ত উপনিবেশ এবং ভারতের রাজচক্রবর্তী সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ। অর্থাৎ তাবৎ বিশ্বের বাহান্ন মিলিয়ন বর্গমাইল ভূঅঞ্চলের মধ্যে ষোলো মিলিয়ন বর্গমাইল ভূঅঞ্চলের ভূম্যধিকারী হয়েছিলেন সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ। এই বিস্তৃত ভূখণ্ড সেদিন কোন না কোনভাবে যুক্ত হয়েছিল তাঁর রাজমুকুটের সঙ্গে। কিন্তু সে সব আজ যেন গল্পকথা।

সম্রাট হিসেবে এখন যে মুখ্য ঐতিহাসিক দায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হবে তা বড় নির্মম। তাঁর সামনের চেয়ারে বসা জ্ঞাতি ভাইয়ের উপস্থিতির মধ্যে প্রকট হয়েছে সেই বিষণ্নতাই, যা সম্রাটকে এখন আচ্ছন্ন করেছে। এখন থেকে ইতিহাস তাঁকে মনে রাখবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঘাতক হিসেবে। সাম্রাজ্যের অখণ্ড অবয়ব থেকে একটি একটি করে অঙ্গচ্ছেদ করবেন তিনি। আর সেই গ্রন্থিমোচনের সাক্ষী হবে ইতিহাস। একদিন যে ঐতিহাসিক আগ্রাসন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরিসর ছড়িয়ে দিয়েছিল এক তৃতীয়াংশ ভূখণ্ডে—রোম সাম্রাজ্য, আলেকজাণ্ডার দ্য গ্রেট, চেঙ্গিস খাঁ এবং নেপোলিয়নের উদ্ধত উচ্চাকাঙ্ক্ষার অনুকরণে যে সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল, শুরু হয়েছে তার সঙ্কোচন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহামান্য সম্রাট এখন থেকে দেশের সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ থাকবেন। ইওরোপের আর পাঁচটা দেশের মতন শুধু এই দ্বীপভূমির সম্রাট হয়েই থাকবেন তিনি।

তেমনি তদ্‌গত অবস্থাতেই ম্লান একটু হেসে সম্রাট যেন নিজেকে শোনাতেই বলে উঠলেন, 'আমি জানি জি আর আই থেকে 'আই'টা তুলে নিতে হবে, কারণ রাজচক্রবর্তী সম্রাট আমি আর থাকবো না। এটাই ভবিতব্য। তবে মনে দারুণ কষ্ট পাব যদি এখনই ভারতের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।'

মাউন্টব্যাটেন নির্বাক বসে আছেন। তাঁর মনে হলো সম্রাট যেন ইতিহাসের জটিল গতিপথ ঠিকই বুঝেছেন, তাই এমন আত্মমগ্ন। যথার্থই তাই। সম্রাট বুঝতে পেরেছেন যে পৃথিবীর বুক থেকে সাম্রাজ্যবাদী স্বপ্ন ম্লান হয়ে যাচ্ছে। তবে একেবারে মুছে যাবার আগে তার গর্বের বস্তুগুলো বাঁচানো দরকার। অন্তত আধুনিক যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যদি তাদের বাঁচিয়ে রাখা যায় তাহলে তাঁর মন ভরতো। তেমনি কি করা যায় না? সেই গোপন ইচ্ছের কথাই ব্যক্ত করলেন সম্রাট। মাউন্টব্যাটেনের দিকে চেয়ে সম্রাট বললেন, 'ভারত স্বাধীন হ'ক, কিন্তু কমনওয়েলথ থেকে সে যেন বেরিয়ে না আসে। সেটাই সবচেয়ে দুঃখের হবে।'

স্বাধীন কয়েকটি দেশ নিয়ে যে সম্মেলন সেই-ই তো কমনওলেথ! আর এই কাঠামোর মধ্যেই সম্রাটের আকাঙ্ক্ষাগুলো পূরণ হতে পারে। এই সংযুক্ত রাষ্ট্রমণ্ডল

www.pathagar.com

গড়ে উঠবে বহুজাতির মিলন থেকে। তবে এই মণিমণ্ডলীর কেন্দ্রের মণিটি হবে গ্রেট ব্রিটেন। তারা বাঁধা থাকবে তুল্যমূল্য ঐতিহ্য, পরম্পরা এবং রাজশক্তির প্রতীকগ্রন্থিতে। সম্রাটের ধারণা যে, বিশ্ব রাজনীতিতে এই রাষ্ট্রমণ্ডলের প্রভাব হবে অপরিসীম। তার কেন্দ্রবিন্দুতে স্বমহিমায় বিরাজ করবে গ্রেট ব্রিটেন এবং আগের মতই সাম্রাজ্যবাদী ঘরানার অহঙ্কারটি প্রতিধ্বনিত হবে তার দাম্ভিক কণ্ঠস্বরে। কমনওয়েলথ বা রাষ্ট্রমণ্ডলীর মুখপাত্র গ্রেট ব্রিটেনই থাকবে। লণ্ডন থাকবে লণ্ডন হয়েই, সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক বা অর্থনীতিক এবং আধ্যাত্মিক বিষয়চর্চার রাজধানী রূপে। বস্তুত, এই রাষ্ট্রসম্মেলনের গা থেকে সাম্রাজ্যবাদের খোলসটা খুলে নিলেও রেশটুকু মুছে যাবে না। সর্বাধীশ্বরের একটা সূক্ষ্ম আবরণ দিয়ে ঘেরা থাকবে এই দ্বীপভূমির সম্রাট। তিনি যেন ওদের থেকে আলাদা, ওই ইংলিশ চ্যানেলের ওপারের দেশগুলোর চেয়ে সেটা বোঝানো সহজ হবে। মোটকথা সম্রাট যেন রাজচক্রবর্তীর মোহ তখনও কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তাই তখনও চলছে নকল রাজাগিরি বজায় রাখার এত তোড়জোড়।

অর্থাৎ সম্রাটের স্বপ্নকে সার্থক করতে হলে স্বাধীন ভারতকে কমনওয়েলথ নামক এই যৌথ রাষ্ট্রপরিবারের সভ্য হতেই হয়। কিন্তু ভারত স্বাধীন হবার পর কর্মকর্তারা কী করবেন কে জানে! তখন সে যদি এই পরিবারে না আসে, যদি 'ভেন্ন' থাকতে চায়, তবে পরিবারের চেহারাটা আর সার্বজাতিক রাখা যাবে না। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এশিয়া ও আফ্রিকার আরও যে দেশগুলো স্বাধীনতা পাবে, তারা সবাই ভারতকেই অনুসরণ করবে। তখন কমনওয়েলথ হয়ে দাঁড়াবে সাদা জাতিগোষ্ঠীর দলবাজির জায়গা। তবে এ ব্যাপারে সম্রাটের গোপন আকাঙ্ক্ষাই সব নয়। ক্ষমতাশীর্ষে আছে ব্রিটেনের লেবার পার্টি, যাদের সাম্রাজ্যবাদী-বিরোধী ভূমিকা অনেকদিনের। তাই পার্টির নেতা এ্যাটলী সাহেবের মনোভাব না জানা পর্যন্ত, স্পষ্ট করে আগাম কিছুই বলা যায় না। আর এ্যাটলী সাহেবও এ-ব্যাপারে মাউন্টব্যাটেনকে যখন কিছু বলেন নি, তখন সাংবিধানিক প্রধানরূপে মনের আশা প্রকাশ করা ছাড়া সম্রাটেরও কিছু করার নেই। তবে রাজার মনের ব্যথা জ্ঞাতি ভাইও বুঝতে পারেন। রাজরক্ত তাঁর শরীরেও বইছে এবং রাজপরিবারের একজন হয়ে অখণ্ড ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হাঁকডাক শোনার সৌভাগ্য একমাত্র তাঁরই আছে। তাই সব অধিকার হারানো এতবড় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখ অবস্থা দেখে মাউন্টব্যাটেনের বুকখানাও বোধহয় ব্যথায় টনটন করেছিল সেদিন।

অবশেষে বাকিংহাম প্যালেসের নিভৃত বৈঠকখানা ঘরে বসে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরীয়ার দুই প্রপৌত্র সেদিন গোপন শলা করলেন যে মাউন্টব্যাটেনই এই কাজের ঠিকা নেবেন। তিনিই এ্যাটলীকে বোঝাবেন যে বড়লাটপদে তাঁর নিয়োগের অন্যতম এক শর্ত হলো যে বিভক্ত বা অবিভক্ত ভারতকে কমনওয়েলথের মধ্যে রেখে স্বাধীনতা দেওয়া। এখন থেকে এই-ই হবে তাঁর ধ্যান-জ্ঞান, স্মরণ-মনন। প্রয়োজনে তাঁকে আরও কূট-কচাল হতে হবে, আরও নিপুণ, আরও দক্ষ। মোটকথা ইংল্যাণ্ডের রাজতন্ত্রের সংগে ভারতের গাঁটছড়া যাতে চিরকালের মতন বাঁধা থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে মাউন্টব্যাটেনকেই।

*　　　　　*

ঠিক বলতে গেলে 'ভাইসরয়' নামক মহিমামণ্ডিত এই পদগ্রহণের জয়গৌরব শুধু রবার্ট লুই মাউন্টব্যাটেনেরই প্রাপ্য হয়। একথা না মেনে উপায় নেই যে,

www.pathagar.com

তৎকালীন ইংরেজদের মধ্যেই তিনিই ছিলেন এর স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত দাবিদার। সেই ছেলেবেলার গল্পটা তো ভোলার নয় যখন দাদীমা ভিক্টোরীয়ার কোলে শুয়েই শিশু মাউন্টব্যাটেন তাঁর মুষ্ঠিবদ্ধ হাতের ধাক্কায় অমন ডাকসাইটে সাম্রাজ্যবাদী মহারানীর তোখড় নাক থেকে চশমা খুলে দিয়েছিল! একবার মাউন্টব্যাটেনের কুলগৌরবের দিকে চোখ ফেরান, দেখবেন কেমন ঝলমলে উজ্জ্বল সেই কুলীন ধারাটি। মায়ের দিকে রোমক সম্রাট শার্লেমন থেকে এর শুরু। তারপর হয় রক্তের সম্বন্ধ নয়ত বা পরিণয়সূত্রে তিনি জ্ঞাতিকুটুম ছিলেন দ্বিতীয় কাইজার, দ্বিতীয় নিকোলাশ জার, স্পেনের ত্রয়োদশ এ্যালফান্‌শো, রুমানিয়ার প্রথম ফার্দিনন্দ, সুইডেনের ষষ্ঠ গুস্তাভ, গ্রীসের প্রথম কন্‌স্‌টানটাইন, নরওয়ের সপ্তম হাক্‌র্ক এবং যুগোশ্লাভিয়ার প্রথম আলেকজান্ডারের পরিবারের সঙ্গে। বস্তুত, মাউন্ট-ব্যাটনের কাছে ইওরোপের তৎকালীন রাজনৈতিক সংকটের অনেকটাই পারিবারিক সমস্যা থেকে জাত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে লুই মাউন্টব্যাটেনের বয়স যখন আঠারো অর্থাৎ তিনি সবে প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছেন, তখন ইওরোপের সর্বত্রই শূন্য রাজপাটের বেশ ঘাটতি চলেছে। ভিক্টোরীয়ার প্রাণপুতুলি দৌহিত্রীর চতুর্থ কন্যা হেস্‌-এর (Hesse) রাজকুমারী ভিক্টোরীয়া আর ব্যাটেনবার্গের (Battenberg) রাজকুমার লুইকে রাজকীয় মর্যাদার স্বাদটি অন্যের মুখে পেতে হয়েছিল। গ্রীষ্মের সেই উষ্ণ দিন-গুলো প্রিয় জ্ঞাতি ভাইদের রাজপ্রাসাদের অলিন্দে ঘুরে ঘুরে কাটাতে হয়েছিল তাদের। সেই সব মধুর দিনের স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আঁকা আছে তাঁর মনের মণিকোঠায়। উইন্ড্‌সর দুর্গের লনে অনুষ্ঠিত চা-চক্র, যেখানে আমন্ত্রিত সব অতিথিরই কোন না কোন রাষ্ট্রের রাজমুকুট বরাদ্দ ছিল, জার-এর প্রমোদপোতে প্রমোদভ্রমণ, জ্ঞাতি ভাইয়ের সঙ্গে সেই পিট্‌স্‌বার্গের চারপাশের বনভূমিতে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানো কিংবা জার-তনয়া গ্র্যান্ড ডাচেশ ম্যারীর সঙ্গে প্রেম করা ইত্যাদি ঘটনার স্মৃতি কত মধুর।

এই পারিবারিক কাঠামোতে ডিকি মাউন্টব্যাটেনও রাজতন্ত্রের অধীন ভদ্র চাকরি নিয়ে মোটামুটি শিষ্ট উপার্জন করে শোভন জীবনযাপন করতে পারতেন। কিন্তু ডিকি তা করেন নি। সেদিন তিনি জীবিকার জন্যে অন্য পথ বেছে নিয়েছিলেন। আর সেই অনিশ্চিত পথে একটার পর একটা বাধা টপকে আজ তিনি যেখানে এসে পোঁচেছেন সেটা শীর্ষস্থান। মাউন্টব্যাটেনের বয়স তখন তেতাল্লিশ। হঠাৎ নজরে পড়ে গেলেন ইংল্যান্ডের সবচেয়ে শক্তিধর মানুষ উইন্‌স্‌টন্‌ চার্চিলের। সেটা ১৯৪৩-এর শরৎকাল। উইন্‌স্‌টন্‌ চার্চিল একজন উদ্যোগী যুবকের খোঁজ কর-ছিলেন ; একজন 'তাজা বলিষ্ঠ মনের যুবকের দরকার ছিল চার্চিলের, যার হাতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার দেওয়া যায়। তেতাল্লিশ বছরের যুবক মাউন্টব্যাটেনকে বেশ পছন্দ হলো চার্চিলের। তাঁকেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুপ্রীম এ্যালায়েড কমান্ডার নিযুক্ত করলেন। চাকরি ত' হলো, কিন্ত যে দায়-দায়িত্ব তাঁর কাঁধে পড়লো তার ভার বইতে পারবেন ত' যুবক ডিকি? এই বিশাল কম্যান্ড বা পদাধিকার মাত্র আর একজনের ছিল। তিনি ডোয়াইট আইশেনহাওয়ার। সেদিন ডিকি মাল্টব্যাটেনের আয়ত্বে ছিল এশিয়ার বারো কোটি আশি লক্ষ মানুষের ভালমন্দ। এখন বেশ মনে পড়ে, যখন এতবড় কম্যান্ডের দায়িত্ব পেলেন, তখনো তা ঠিকমতন গড়ে ওঠেনি। না ছিল ভবিষ্যৎ, না কোন সফল অতীতের স্মৃতি। ছিল শুধু একটা ভয়াল পারি-

www.pathagar.com

পার্শ্বিক যেখানে কোনরকম অগ্রাধিকার চলে না। শুধু যুদ্ধ আর নিধন। নির্বিচার শত্রু হত্যা কিংবা পরাজয় বরণ অথবা কঠিন পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম। নৈতিক দায়িত্ব বলতে এইটুকুই ছিল মাত্র।

চাকরি করতে এসে মাউন্টব্যাটেন দেখলেন তাঁর অধীন বেশিরভাগ কর্মচারীই বয়স বা চাকরির সুবাদে তাঁর চেয়ে বড়। তাদের ধারণা রাজবাড়ির মদতের জোরেই ছেকারা এমন একটা দায়িত্বপূর্ণ চাকরি নিয়েছে। আসলে এটা তাঁর শখ। ডিনার জ্যাকেট খুলে নাবিকের পোশাক পরেছেন খেয়াল হয়েছে বলে। যতদিন এই খেয়াল থাকবে ততদিন কাফে দ্য পারিসের নাচঘর বা ডান্স ফ্লোরের বদলে যুদ্ধ-ক্ষেত্রেই ভাল থাকবেন। তারপর শখ মিটলে আবার যে কে সেই। সুতরাং গায়ে উর্দি চড়িয়েই দায়িত্ব এড়ালেন না মাউন্টব্যাটেন। তাঁর অধীন জেনারেলদের মনের আস্থা ফিরিয়ে আনতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হলো তাঁকে। নিয়মিত ফ্রন্টে যাওয়া শুরু করলেন। বর্মা অঞ্চলের ভয়ংকর বর্ষার মধ্যেও জেনারেলদের লড়াইয়ে নামালেন। তারপর ভয় দেখিয়ে, ধমক দিয়ে বা খোশামোদ করে লন্ডন বা ওয়াশিংটনের কর্তৃপক্ষদের কাছ থেকে যতটুকু সাহায্য পাওয়া যায় তা আনতে লাগলেন।

এই ঝাঁকানির দরকার ছিল, নইলে উইটিবির মতন স্থাণু হয়ে যাচ্ছিল তাঁর 'কম্যান্ড'। এই গতিশীলতার ফল হাতে হাতে পেলেন মাউন্টব্যাটেন। ছন্নছাড়া 'কম্যান্ড' সুশৃংখল হয়ে উঠলো এবং জাপানীদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় স্থল বাহিনীর লড়াইটা জিতে নিল। তবে সবচেয়ে মারাত্মক যে আক্রমণ পদ্ধতি সেই অপারেশন জীপার (Operation Zipper) প্রয়োগ করতে পারেন নি মাউন্টব্যাটেন। কারণ, তার আগেই জাপানের ওপর এ্যাটম্ বোমা ফেলে শত্রুপক্ষের রণহুংকার স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। মাউন্টব্যাটেন কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এইরকম আকস্মিক আক্রমণে। তাঁর ধারণা যে পরিকল্পিত 'অপারেশন জীপার' বা উভচর আক্রমণ ঘটাতে পারলে দুহাজার মাইল দূরের মালয় উপদ্বীপের বন্দর থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ সৈন্য নামাতে পারতেন জাপান ভূখণ্ডে। সেটা সম্ভব হলে নরম্যাণ্ডির চেয়েও বড় মাপের সেনা অবতরণের (ল্যাণ্ডিং) দৃষ্টান্ত হতো। বিধ্বংসী এ্যাটম্ বোমা ফেলার দরকারই হতো না।

ছেলেবেলা থেকেই কাউন্টব্যাটেন স্থির করেছিলেন যে বাপের আদর্শেই নিজেকে গড়বেন। তিনিও নৌ বিভাগের সেনাপতির কাজ নিয়ে জীবন সংগ্রাম শুরু করবেন। মাউন্টব্যাটেনের বাবা তাঁর স্বদেশ জার্মানি ছেড়ে আসেন চোদ্দ বছর বয়সে এবং ব্রিটেনের রয়্যাল নেভিতে যোগ দেন। তারপর কর্মক্ষমতার গুণে ধাপে ধাপে ওপরে উঠেছেন এবং শেষমেশ রয়্যাল নেভির ফার্স্ট সী লর্ড পদে উন্নীত হয়েছেন। কিন্তু বাবামশাইয়ের এমন কর্মদক্ষ জীবন হঠাৎই শেষ হয়ে গেল। ইওরোপে তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। সেই সঙ্গে সারা ইংল্যাণ্ডে বইতে থাকলো প্রবল জার্মান বিরোধী ঝড়। ডিকি মাউন্টব্যাটেন তখন সবেমাত্র রয়্যাল নেভির ক্যাডেট হয়ে জীবন শুরু করেছেন। ইংল্যাণ্ডের জার্মান বিরোধী ঝড়ের ঝাপটা এসে লাগলো বাবামশাইয়ের ওপর। জার্মান বংশোদ্ভূত হবার দরুন তাঁকে রয়্যাল নেভির ফার্স্ট সী লর্ডের অলংকৃত পদটি ছাড়তে হলো। ডিকির মনের অবস্থা তখন বেশ বোঝা যায়। বাবামশাইও ভগ্নহৃদয় হয়ে গেলেন। ইংল্যাণ্ডের রাজা তখন পঞ্চম জর্জ। তাঁরই পরামর্শে পারিবারিক পদবি বদল করলেন বাবা-মশাই। বাটেনবার্গ থেকে হলেন মাউন্টব্যাটেন। বিধ্বস্ত ডিকি সেদিনই প্রতিজ্ঞা

www.pathagar.com

করেছিলেন যে, হিস্টিরিয়া তাড়িত ইংল্যাণ্ডবাসীর এই অন্যায়াচরণের যোগ্য জবাব সেদিনই দেওয়া হবে যেদিন বাবামশাইকে উৎখাত করে দেওয়া ফার্স্ট সী লর্ডের পদে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন।

দুটো বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি লম্বা কালটায় মাউন্টব্যাটেনের জীবনযাত্রার গতি ছিল খুব সন্তর্পণ, খুব ধীর। তখন পীস্‌টাইম অফিসার হিসেবে কাজ করেছেন তিনি। এই কাজের দৈনন্দিনতার মধ্যে দেখাবার কিছু ছিল না। বরং অসামরিক জীবনে খুব বড় সাফল্য এসেছিল তাঁর। জনসাধারণের মনে দারুণ উজ্জ্বল হয়েছিল তাঁর ভাবমূর্তি। তখন তিনি যথার্থই নায়ক। যেমন মধুর ব্যক্তিত্ব তেমনি রমণীরঞ্জন দেহকান্তি। বস্তুত কথাবার্তায়, চলাবলায় তিনি প্রায় মোহমুগ্ধ করে দিয়েছিলেন ব্রিটেনের সাধারণ মানুষদের। সব জায়গাতেই তাঁর সুন্দর মুখের জয় হতো। ব্রিটেনের সাধারণ সংবাদপত্রের (পেনি প্রেস) পাতায় তিনি হয়ে উঠলেন 'ডার্‌লিং'। যুদ্ধের বীভৎসতা দেখে দেখে ক্লান্ত অবশ মনগুলো তখন মরিয়া হয়ে রূপের টানে ছুটেছিল। মাউন্টব্যাটেনের মোহনমূর্তি তাদের সেই তৃষ্ণা মিটিয়ে দিতে সক্ষম হয়। সেই সময় অর্থাৎ ১৯২২ সালে ইংল্যাণ্ডের প্রধান সামাজিক ঘটনা হলো সুন্দরী এবং ধনবতী এডনা এ্যাশলীর সংগে মাউন্টব্যাটেনের বিয়ে।

বিয়ের পরের ঘটনা রীতিমত রোমাঞ্চকর। তখন এমন রোববার ছিল না যেদিন লুই এবং এড্‌নার যুগল মূর্তির ছবি খবরের কাগজে ছাপা হতো না। নোয়েল কাওয়ার্ডের সংগে থিয়েটার দেখতে গেছেন। সে ছবি যেমন ছাপা হয়েছে, তেমনি ছাপা হয়েছে ঘোড়দৌড়ের মাঠে রয়্যাল এন্‌ক্লোজারে বসে থাকা স্বামী-স্ত্রীর ছবি। ইংল্যাণ্ডের মানুষ সবচেয়ে মুগ্ধ হতো যখন দেখতো ডাকাবুকো যুবক মাউন্টব্যাটেন নির্ভীক ভাবে ভূমধ্যসাগরের বুকে স্কী করে বেড়াচ্ছেন কিংবা পোলো খেলায় জিতে ট্রফি নিচ্ছেন। মোটকথা কানু বিনে যেমন গীত নেই, তেমনি শ্রীমান ও শ্রীমতী মাউন্টব্যাটেনের ছবি ছাড়া রোববারের কাগজ যেন মানাত না।

এর ফলে লোকের মনে তাঁর যে ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছিল তা দারুণ উজ্জ্বল। মাউন্টব্যাটেন নিজেও সেটা জানতেন। তাই খুব সচেতনও থাকতেন। যে কোন পানভোজনের উৎসবে বা নাচের আসরে কিংবা পোলো খেলার মাঠে তাঁর উপস্থিতিই বদলে দিত অনুষ্ঠানের মেজাজ। কিন্তু এসবই বহিরঙ্গের রূপ যা মানুষের চোখে পড়তো। কিন্তু চেনা মাউন্টব্যাটেনের আড়ালে আর একজন মাউন্টব্যাটেন ছিলেন। সেই ছায়ামানুষের কথা সাধারণ লোক জানতো না। যখন কোলাহল থেমে যেত তখনই আত্মপ্রকাশ করতো মাউন্টব্যাটেনের এই ছায়ারূপ। তখন তিনি অন্য মানুষ। নাচের আসরের সেই তরল প্রগলভতা আর নেই। তখন তিনি জেদী আত্মপ্রত্যয়ী। ছেলেবেলার শপথটা ভোলেন নি মাউন্টব্যাটেন। মনে মনে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস তৈরি করেছেন। নৌবিভাগের অফিসার হিসেবে আরও উঠতে হবে তাঁকে। আরও নিবিড় মনোযোগ দিতে হবে, প্রাণ ঢেলে কাজ করতে হবে তাঁকে। নিরলস একটানা কাজ করার একটা দারুণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। শুধু নিজে খাটা নয় অধীন কর্মচারীদেরও খাটাতে পারতেন। মাউন্টব্যাটেন বুঝেছিলেন যে আগামী দিনে যুদ্ধকৌশল গড়বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা। উন্নত মানের যোগাযোগ ব্যবস্থাই হবে আগামী যুদ্ধের ভাগ্যবিধাতা। সুতরাং সামাজিকতা বজায় রাখতে ভদ্র নিরীহ ডেক্‌ অফিসারের কাজটা ছেড়ে দিয়ে 'সিগন্যাল' সম্বন্ধে পড়াশুনো করতে লাগলেন। ১৯২৭ সালে নৌবিভাগের হায়ার ওয়্যারলেস কোর্সের পরীক্ষায় প্রথম হলেন মাউন্টব্যাটেন। পাশ

www.pathagar.com

করার পর রয়্যাল নেভিতে ব্যবহৃত সব রকম বেতারসেটের একটা ম্যানুয়েল সংকলনের কাজে ব্রতী হলেন। তখন আধুনিক প্রযুক্তি সারা বিভাগে ছড়িয়ে পড়েছে, নতুন দিগন্ত খুলে যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধপ্রকরণের এই আধুনিকতার প্রতি বিজ্ঞান মনস্ক মাউন্টব্যাটেন তীব্র আকর্ষণ পেয়েছিলেন সেদিন। তাই নতুনভাবে নিজেকে গড়ে নেবার তাগিদে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে, যেমন পদার্থবিদ্যা, তাড়িতবিদ্যা, টেলি যোগাযোগ বিদ্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে পাঠ নিতে লাগলেন। তখন বিজ্ঞান শেখার কী তীব্র ক্ষুধা তাঁর। যা শিখছেন, সেগুলো সর্বক্ষণ মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করছেন খেলনার মতন। ব্রিটেনের রয়্যাল নেভির পক্ষে প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছিলেন মাউন্টব্যাটেন। নৌবিভাগকে ঢেলে সাজাতে ফরাসী রকেট বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট সংগ্রহ করলেন। এই বিশেষজ্ঞের নাম রবার্ট পেল্তার। এই অসাধারণ বিশেষজ্ঞ রিপোর্ট থেকেই ব্রিটেন জানতে পেরেছিল, 'ভি' বোমা, ক্ষেপণাস্ত্র আর মানুষের চাঁদে নামার নির্ভুল তথ্য। এমনকি 'স্টুকা' ডাইভ্ বোমারু বিমানকে ঠেকানোর জন্যে সুইজারল্যান্ড যে বিশেষ দ্রুতগামী এ্যান্টি এয়ারক্রাফ্ট্ গান-এর নক্শা উদ্ভাবন করেছিল, তারও হদিস দিয়েছিল এই বিশেষজ্ঞ রিপোর্ট। কিন্তু ব্রিটেনের রয়্যাল নেভি আদর করে তখনই এই বিশেষজ্ঞ-রিপোর্টটা মেনে নেয় নি। এর জন্যে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল মাউন্টব্যাটেনকে।

বিশ্ব রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে হিটলার তখন তীরের মতন উঠছেন। জার্মানির সমরায়োজনে চলেছে আধুনিকীকরণ। মাউন্টব্যাটেন তীক্ষ্ন নজর রেখেছিলেন জার্মানির দিকে। খোলা চোখ দিয়ে দেখছিলেন রাশিয়ার সমাজব্যবস্থার বদলটাও। বোঝবার চেষ্টা করেছিলেন এই বদলের গতিপ্রকৃতি। তখন জারসম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাশ সিংহসান থেকে উৎখাত হয়ে গেছেন। ঘটনাটায় মনে মনে ব্যথা পেয়েছিলেন মাউন্টব্যাটেন। কিন্তু মনকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়েছিলেন তিনি। একটা বিশ্বযুদ্ধ যে আসন্ন, তার পদধ্বনি যে শোনা যাচ্ছে তা বুঝেছিলেন মাউন্টব্যাটেন দম্পতি। ফলে ধীরে ধীরে উদ্দাম প্রগলভ নাচের আসর থেকে নিজেদের সরিয়ে আনতে লাগলেন মাউন্টব্যাটেন দম্পতি।

১৯৩৯ সালের ২৫শে আগস্ট তারিখে সদ্য তৈরি হওয়া ডেসট্রয়ার এইচ· এম. এস· কেলীর (HMS Kelly) দায়িত্বভার নিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী মাউন্টব্যাটেন। দায়িত্বভার নেবার কয়েক ঘণ্টা পরেই বেতার মারফত জানা গেল যে হিটলার ও স্তালিন দুদেশের মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি সই করেছেন। এই ঘোষণার গুরুত্বটা ঠিকঠাক বুঝেছিলেন মাউন্টব্যাটেন। ডেস্ট্রয়ার 'কেলী' তখনও জলে ভাসার মতন উপযুক্ত হয়নি। লোকজনদের ডেকে তিন হপ্তার আগেই ডেস্ট্রয়ারটাকে জলে ভাসানোর মতন উপযুক্ত করতে বললেন মাউন্টব্যাটেন। এই ঘটনার ঠিক ন'দিনের মাথায় যুদ্ধ বাধলো। এতদিনে ডেস্ট্রয়ার 'কেলী' তৈরি হয়ে গেছে। তাই পরের দিনই 'কেলী' নিয়ে জার্মানির একটা ডুবোজাহাজের পিছনে ধাওয়া করলেন মাউন্টব্যাটেন। জাহাজের নাবিক আর লোকজনদের (ক্রু) ডেকে মাউন্টব্যাটেন আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, 'কখনো তোমাদের জাহাজ ছেড়ে পালাতে বলবো না। তবে জাহাজ যখন ডুবে যাবে তখন আমাদের জাহাজ ছেড়ে যেতেই হবে।'

তা মাউন্টব্যাটেন তাঁর কথা রেখেছিলেন। ডেস্ট্রয়ার 'কেলী'কে নিয়ে অনেক দুঃসাহসিক অভিযান করেছেন তিনি। যদ্দিন 'কেলী' সক্ষম ছিল ততদিন অনেক কঠিন কাজ সে সম্পন্ন করেছে। পাহারা দিয়ে 'কনভয়দের' চ্যানেল পার করিয়েছে।

www.pathagar.com

ইউ বোটের সন্ধানে নর্থ সী চষে বেড়িয়েছে। ঘন কুয়াশার মধ্যে জার্মান বোমারুদের পিছনে ধাওয়া করে প্রায় দু'হাজার অভিযাত্রীদের নরওয়ের সংকীর্ণ খাঁড়িমুখ থেকে উদ্ধার করেছে। শেষমেশ নর্থ সীর ওপরেই জাহাজের গলুইয়ে শত্রুপক্ষের টর্পেডোর আঘাত লাগে। সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হলো বয়লারের ঘরখানা। তখন ডেস্ট্রয়ারকে ডুবিয়ে দেবার আদেশ হয়। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন সে আদেশ মানেন নি। একলা সারারাত জাহাজের ডেকে কাটালেন। পরে গুণটানা দড়ি দিয়ে আঠারো জন স্বেচ্ছা-সেবীদের নিয়ে ডেস্ট্রয়ারটাকে নিরাপদে নোঙর করালেন।

এক বছর পরে অর্থাৎ ১৯৪১ সালের মে মাসে 'কেলী'র সৌভাগ্যসূর্য অস্ত গেল। জাহাজের বারুদখানায় একটা বোমা রাখার সংগে সংগেই জাহাজটা ডুবতে শুরু করলো। স্তম্ভিত মাউন্টব্যাটেন ঠায় দাঁড়িয়ে দেখলেন একটু একটু করে এই ডুবে যাবার দৃশ্য। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেখলেন তিনি, তারপর জাহাজ যখন আর ভেসে উঠলো না, তখন একখানা লাইফ বোট করে বেঁচে থাকা মাল্লাদের নিয়ে তীরে উঠলেন। সেদিন যতক্ষণ তিনি এই উদ্ধারের কাজ করেছেন, ততক্ষণই জার্মান বোমারু বিমান তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করেছে। এই অসামান্য সাহসী কাজের উপযুক্ত পুরস্কার পেয়েছিলেন মাউন্টব্যাটেন। 'কেলী'র সুদক্ষ পরিচালনার জন্যে তাঁকে সাম্মানিক ডি.এস ও বা ডিস্টিনগুইস্ড্ সারভিস অর্ডার উপাধি দেওয়া হয়। পরে 'কেলী'কে কেন্দ্র করে একটা কাহিনীচিত্র তৈরি করেন মাউন্টব্যাটেনের বিশেষ বন্ধু নোয়েল কাওয়ার্ড। এই কাহিনীচিত্রটাই 'কেলী'র বীরত্বকথা অমর করে রেখেছে।

এই ঘটনার পাঁচ মাস পরের কথা। চার্চিল একদিন ডেকে পাঠালেন মাউন্টব্যাটেনকে। একজন নির্ভীক আত্মবিশ্বাসী অফিসার খুঁজছিলেন তিনি, যার হাতে নিঃসংশয়ে কম্যান্ডো ফোর্সের দায়িত্বভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কম্বাইন্ড্ অপারেশন নামে এই ফোর্স তৈরি হয়েছিল কৌশল এবং প্রযুক্তির বিকাশসাধন করে মিত্রপক্ষকে কন্টিনেন্টে ফিরিয়ে আনার জন্য। মাউন্টব্যাটেনের কাছে কাজটা দারুণ মনোমত হলো। সাহস বুদ্ধি খাটিয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা প্রয়োগ করার একটা ক্ষেত্র তিনি পেলেন। কাজেরও স্বাধীনতা তাঁর ছিল। সারা দেশের অসংখ্য বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিবিদ আর প্রতিভাবানদের সাহায্য নিয়ে নানারকম পরিকল্পনার কাজ শুরু করলেন। অবশ্য বৈজ্ঞানিক চিন্তানায়কদের অনেক পরি-কল্পনাই অবাস্তব ছিল। যেমন, জমে বরফ হয়ে যাওয়া সাগরজলের সংগে শতকরা পাঁচভাগ কাঠের শাঁস মিশিয়ে ভাসমান এয়ারফিল্ড তৈরি করার কল্পনা। এ-ধরনের উৎকট কল্পনা পুরোপুরি অবাস্তব। তবে প্রতিভাবান প্রযুক্তিবিদদের কিছু কিছু আইডিয়ার সফল রূপায়ণ করে যে কাজের কাজ হয়েছিল, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে। এমনি একটা স্কীম হলো জলের নীচে ট্রান্সচ্যানেল পাইপলাইন বসানোর কাজ। আর একটা কাজ হলো মালবেরীতে কৃত্রিম পোতাশ্রয় তৈরি করা এবং রকেট তৈরির শিল্পকৌশলের নতুন খসড়া করা, এর জন্যেই নর্মাণ্ডি আক্রমণ সেদিন সম্ভব হয়ে-ছিল। মোটকথা, এই সাফল্যটাই অভূতপূর্ব আর এর জন্যেই অল্প সময়ের মধ্যে অমন শীর্ষস্থানে উঠে গিয়েছিলেন মাউন্টব্যাটেন। তেতাল্লিশ বছর বয়সেই সাউথ ইস্ট এশিয়ার সুপ্রীম কমান্ডের দায়িত্বভার পেলেন তিনি।

এই স্পর্ধার কাজটাই হতে চলেছে তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তবে চিরতরুণ মাউন্টব্যাটেন কর্মবিমুখ নন। তাঁর বুদ্ধি আছে কাজ করার সাহস আছে। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁর যোগ্য নেতৃত্ব তাঁকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে

www.pathagar.com

শিখিয়েছে। নেতৃত্ব দেবার একটা স্বাভাবিক প্রতিভার অধিকারী হয়েছেন তিনি। এই সাফল্যের পেছনে আছে তাঁর কঠোর পরিশ্রম আর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণীবুদ্ধি। পরাজয়কে মহান বলে তিনি আত্মপ্রবঞ্চনা করেন না। জেতার নীতিতেই তিনি বিশ্বাসী। একবার নৌবিভাগের এক বাইচ প্রতিযোগিতায় তাঁর ট্রেনিং পাওয়া দাঁড়িরা লম্বা দাঁড়ের টানে অনেক এগিয়ে যায়। ব্যাপারটা অনেকেরই দৃষ্টিপথে পড়ে। কিছু কিছু বিরূপ সমালোচনা হয়েছিল এর দরুন। মাউন্টব্যাটেনের কানেও গিয়েছিল কথাটা। মাউন্ট ব্যাটেন হজম করেন নি ওদের সমালোচনা। তিনি ঈষৎ কটু মন্তব্য করে বলেছিলেন, 'আমি জানতাম যে কোন প্রতিযোগিতায় কাজের কাজ হলো জেতা।'

বস্তুত, মাউন্টব্যাটেনের উচ্ছ্বসিত তারুণ্য তাঁর চরিত্রকে অসাধারণ দীপ্তিময় করে তুলেছিল। একবার যে তাঁর সংস্পর্শে এসেছে তাকেই তিনি বশ করেছেন। তাই গুণগ্রাহী না হয়েও একজন মন্তব্য করেছিলেন, 'ইচ্ছে করলে, মাউন্টব্যাটেন একটা শকুনিকেও এমনভাবে বশ করতে পারেন যাতে মড়া ফেলে সে উড়ে যায়।' আসলে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকতেন মাউন্টব্যাটেন। যারা তাঁর নিন্দা করতো তারা ভাবতো তিনি দাম্ভিক। চার্চিল যখন তাঁকে এশিয়ার কম্‌বাইন্‌ড্‌ ফোর্সের সর্বাধিনায়ক করার প্রস্তাব দিলেন, তখন ভাববার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টার সময় চেয়ে নেন মাউন্টব্যাটেন। বিরক্ত চার্চিল ঈষৎ রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন? আপনি কি দায়িত্ব নিতে পারবেন না?'

মাউন্টব্যাটেন সবিনয়ে চার্চিলের ভুল শুধরে দিয়ে বলেছিলেন, 'স্যার! আমার আত্মবিশ্বাস এমন সহজাত যে আমি পারি না এমন কাজ নেই।'

আগামী দিনগুলোতে সেই আত্মবিশ্বাসটাই পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছিলেন মাউন্টব্যাটেন। এগিয়ে চলার এটাই ছিল তাঁর পাথেয়।

অনুতাপীর পদযাত্রা (১)

যে গ্রামেই গান্ধীজী যাচ্ছেন তাঁর নিত্যকর্মের কোন ব্যতিক্রম হচ্ছে না। গ্রামে পৌঁছেই এশিয়ার এই মহান মানুষটি সোজা চলে যাচ্ছেন কোন মুসলমানের কুঁড়েতে। তার কাছে আশ্রয় চাইছেন। না পেলে যাচ্ছেন আর একজনের কুঁড়েতে। এমনি করে প্রায় জনে-জনের কাছে আশ্রয় চাইছেন। না পেলেও দুঃখ নেই। বড় গাছের ঘন ছায়া আছে। তার উদার কোনে একটু আশ্রয় জুটবেই। এ ছাড়া আর কি চাই। 'আমার আসল সুখ ত' এর নীচেই!'

তবে আশ্রয় জুটে যাচ্ছে কোথাও না কোথাও। শয়ন-ভোজন নিয়েও অরুচির বালাই নেই। বারান্দায় চাটাই পেতে শোওয়া আর শাক-সবজি, ডাবের জল যা জোটে তাই খাওয়া। নোয়াখালির গ্রামে গান্ধীজীর জীবনযাপন ছিল বাঁধাধরা। সেকেন্ড-মিনিট মেপে তিনি চলতেন। গান্ধীজীর জীবনে সময় ছিল একটা আবেগের মতন। সারা মন ছেয়ে থাকতো তাঁর। তাঁর কেবলই মনে হতো সময় ঈশ্বরের দান। এর অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে একটা মুহূর্তও অপচয় করার অধিকার তাঁর নেই, কারণ মানুষের সেবাই এর লক্ষ্য। গান্ধীজীর সময় নির্দেশ করতো ষোলো বছরের পুরনো ও আট সিলিং দামের একটা ইন্‌গারশল্‌ ট্যাঁকঘড়ি। সরু একখণ্ড ফিতা দিয়ে তাঁর কোমরের সঙ্গে বাঁধা থাকতো ঘড়িটা। রাত দুটোয় উঠে গীতা পাঠ করতেন, তারপর

www.pathagar.com

প্রার্থনা করতে বসতেন। প্রার্থনা শেষ হলে ভোর পর্যন্ত চিঠির উত্তর লিখতেন। প্রতিদিন যত চিঠি পেতেন তার উত্তর লিখতেন নিজের হাতে। . বড় বড় হরফে পেন্সিল দিয়ে চিঠির জবাব লিখতেন। যতক্ষণ সেটা আঙুলে ধরা যেত, ততক্ষণ ব্যবহার করতেন পেন্সিলটা। গান্ধীজী ভাবতেন যে শ্রমিকের শ্রমের অমর্যাদা করা হবে যদি পেন্সিলের পূর্ণ ব্যবহার না করেন। রোজ সকালে একটা বিশেষ সময়ে গান্ধীজী নুনজলের পিচকারি দিয়ে গুহ্যদেশ ধুতেন। তিনি মনে করতেন প্রাকৃতিক চিকিৎসায় এইভাবে শরীর থেকে টক্সিন্ বিষ ধুয়ে ফেলা যায়। যেদিন তিনি নিজের হাতে কাউকে নুনজলের পিচকারি দিতেন সেদিনই বোঝা যেত তাকে তিনি দলে নিতে রাজী হয়েছেন।

সূর্যোদয়ের সংগে সংগেই শুরু হতো তাঁর পদযাত্রা। হাঁটতে হাঁটতেই তিনি গ্রামের মানুষদের সংগে আলাপ-সালাপ করতেন। লোকের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনার পক্ষে এই কৌশলটা খুব উপযোগী হতো। এর দরুন নোয়াখালিতে খুব তাড়াতাড়ি শান্তি ফিরে আসে। গ্রামে গিয়ে আগে তিনি একজন হিন্দু আর একজন মুসলমান নেতার খোঁজ করতেন। তাদের সংগে নিয়েই তিনি গ্রাম পরিক্রমা করতেন। তারাই গ্রামের লোকদের তাঁর অহিংসানীতির কথা বোঝাত। গ্রামের 'শান্তিরক্ষার' জামিন হতো তারাই। যে গ্রামে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হতো সে গ্রামে গিয়ে মুসলমান নেতা আমৃত্যু অনশন করতো। আবার যে গ্রামে মুসলমানদের ওপর অত্যাচার হতো, সে গ্রামে গিয়ে হিন্দুনেতা অনশন করতো।

তবে নোয়াখালির সেই রক্তরাঙা গ্রামের পথে যে কুটিল হিংসা আর ঘৃণার ভূত ছড়িয়ে ছিল, গান্ধীজী কখনও তা অলৌকিক উপায়ে তাড়াবার চেষ্টা করেন নি। বরং যখন তাঁর মনে হতো যে গ্রামের সব মানুষ তাঁর কথা বুঝেছে, তখনই তাঁর আবেদনের পরিধিটা আরও ছড়িয়ে দিতেন। তাঁর কাছে ভারতবর্ষ নামক দেশটা ছিল যেন হিংসার পথে হারিয়ে যাওয়া এইসব গ্রাম, যেখানে সহজে পৌঁছানো যায় না। গান্ধীজীর ভারতবর্ষ ছিল এইসব গ্রামগুলো থেকেই আহরণ করা সত্তা। তিনি সারা দেশের গ্রাম দেখেছেন। ভারতের গ্রাম যে কী বস্তু সেকথা অন্য কোন জীবিত নেতা তাঁর মতন বুঝতো না। তিনি মনে করতেন যে স্বাধীন ভারতের ভিত্তিভূমি হবে এইসব আদর্শ গ্রামগুলি। নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া গ্রামগুলিই গড়ে তুলবে ভারতবর্ষকে। কি ভাবে গ্রামগুলি গড়ে তুলবেন তারও নিজস্ব পদ্ধতি ছিল তাঁর।

গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের বলতেন, 'তোমাদের অনেক কিছু শিখতে হবে। কি করে খাবার জল পরিষ্কার রাখবে, কি করে তোমাদের শরীর নীরোগ রাখবে, যে মাটি থেকে তোমাদের শরীর গড়ে উঠেছে তাকে কিভাবে কাজে লাগাবে ইত্যাদি। আরও অনেক কিছু শেখাতে চাই। তোমার মাথার ওপর এই যে অনন্ত আকাশ ছড়িয়ে আছে সেখান থেকেই জীবনীশক্তি পেতে হবে তোমায়। তোমার চারপাশের বাতাস থেকে নিতে হবে সঞ্জীবনী মন্ত্র। তোমার হীনবল জীবন নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে সেই শক্তিতে। এই যে অকৃপণ সূর্যালোক তোমাদের দেহমন শুদ্ধ করছে, তারও যথার্থ ব্যবহার শিখতে হবে তোমাদের।'

বৃদ্ধ নেতার এইসব উপদেশ শুধু কথার কথা নয়। অসার উপদেশ দিয়ে তিনি লোকশিক্ষা দিতেন না। নিজে আচরণ করে দেখতেন। তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা অবাক হয়ে যেত যখন দেখতো গান্ধীজীর কাজের ধারা তাঁর উপদেশের মতন সোজা সরল। লোকের জন্যে যে কথা বলতেন, নিজের ক্ষেত্রেও তাই-ই পালন করতেন। একজন

www.pathagar.com

কুষ্ঠরোগীর সেবার কাজে যতটা আত্মনিয়োগ করতেন, ঠিক ততটা মনোযোগ দিয়েই বড়লাটের সঙ্গে দেখা করার জন্যে নিজেকে তৈরি করতেন। কোন গ্রামে গিয়ে আগে খোঁজ নিতেন কোথা থেকে তারা পানীয়জল সংগ্রহ করছে। গ্রামে ঢুকে গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে আগে সেটা দেখে আসতেন। যেটা পছন্দ হতো না সেটাকে ত্যাগ করে আরও উপযুক্ত জায়গায় ইঁদারা খোঁড়ার পরামর্শ দিতেন। গ্রামবাসীদের উৎসাহ দিয়ে নিজেই সবার সঙ্গে খোঁড়াখুঁড়ির কাজে লেগে যেতেন। নিজেই দেখতে যেতেন গ্রামের সাধারণ পায়খানা। প্রায়ই গ্রামে আলাদা পায়খানা থাকে না। যেখানে তেমন দেখতেন সেখানে নিজেই কোদালের সাহায্যে মাটি খুঁড়ে মলমূত্র চাপা দেবার পদ্ধতি শেখাতেন। এ দেশের উৎকট মৃত্যুহারের জন্যে এইসব কুঅভ্যাসগুলোই যে দায়ী, গান্ধীজী সে ব্যাপারে নিঃসংশয় ছিলেন। তাই যেখানে সেখানে থুথু ফেলা, প্রস্রাব করা, নাকঝাড়া ইত্যাদি বদঅভ্যাস দেখলে গালমন্দ দিতেন, কটূক্তি করতেন। গ্রামের যারা গরিব মানুষ, যারা খালি পায়ে হাঁটে, তাদের স্বাস্থ্যের জন্যেই যে গান্ধী রুষ্ট হতেন, সে কথা যারা বুঝতো তারা সেসব কুকাজ করতো না। গান্ধীজী একবার হতাশ হয়ে বলেছিলেন, 'যদি ভারতবর্ষের সব মানুষ মিলে থুথু ফেলে, তবে যে ডোবাটা তৈরি হবে, সেটা তিন কোটি ইংরেজকে ডুবিয়ে মারার পক্ষে যথেষ্ট।' যখনই গ্রামের মানুষকে রাস্তায় থুথু ফেলতে বা নাক ঝাড়তে দেখেছেন তখনই তাকে মৃদু তিরস্কার করেছেন। কখনও বা রুষ্টও হয়েছেন। গ্রামবাসীদের বাড়িবাড়ি ঘুরে বালি আর কাঠকয়লা দিয়ে জল ছাঁকার প্রক্রিয়া শিখিয়েছেন। গান্ধীজী প্রায়ই যে কথাটা বলতেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। গান্ধীজী বলতেন, 'আমরা যা করি আর যা করতে পারি তার মধ্যে যে তফাত তা দিয়ে জগতের অনেক সমস্যার সমাধান করা যায়।'

প্রত্যহ বিকালে গান্ধীজী প্রার্থনাসভা করতেন। প্রার্থনাসভায় মুসলমানদেরও ডাকতেন তিনি। চেষ্টা করতেন যাতে কোরান থেকে রোজই কিছু কিছু পাঠ হয়। গান্ধীজীর প্রার্থনাসভায় যে কেউ যা খুশি প্রশ্ন করতে পারতো। একদিন একজন মুসলমান গ্রামবাসী গান্ধীজীর শান্তির কথায় ঘোর আপত্তি তুললো। লোকটা অবজ্ঞাভরে বললো যে বৃথাই তিনি নোয়াখালির গ্রামে বসে সময় নষ্ট করছেন। বরং দিল্লি গিয়ে জিন্না ও মুসলীম লিগের নেতাদের সঙ্গে তাঁর আপস করা উচিত। গান্ধীজী তাকে বললেন যে, 'একজন নেতার মধ্যে জনসাধারণের ইচ্ছাই প্রতিফলন হয়।' জনসাধারণকে আগে ধর্মনিরপেক্ষভাবে পাশাপাশি শান্তিতে বাস করে দেখাতে হবে। তারা নিজেরা যখন তেমন অবস্থা তৈরি করতে পারবে, 'তখনই তাদের ইচ্ছার প্রতিফলন হবে নেতাদের মধ্যে।'

গান্ধীজী যখনই বুঝতেন যে তাঁর শান্তির কথা নোয়াখালির মুসলমান গ্রামবাসীরা বুঝেছে, ভয় পাওয়া হিন্দুদের তারা গ্রামে ফিরিয়ে আনতে চাইছে, তখনই আর একটা গ্রামের দিকে তিনি যাত্রা শুরু করতেন ঠিক সকাল সাড়ে সাতটায়।

শ্রীরামপুর গ্রামের ক্ষেত্রেও এর নড়চড় হলো না। সকাল সাড়ে সাতটায় যাত্রা শুরু করলেন গান্ধীজী দলবল নিয়ে। দলের আগে আগে চলেছেন তিনি, পিছনে অন্যরা। কখনো আমবাগানের ভেতর দিয়ে, কখনো শ্যাওলাধরা পুকুর পাড় দিয়ে তাঁরা চলেছেন। এত মানুষের পায়ের আওয়াজে বুনো হাঁস আর বকেরা ডাকতে ডাকতে আকাশের দিকে উড়ে গেল। সরু পায়েচলা ছায়াঘেরা পথ চলেছে ঘুরে ঘুরে। নারকেল গাছের সারি পেরিয়ে খোয়াবাঁধানো পথ। এবড়োখেবড়ো রাস্তায়

www.pathagar.com

পড়ে আছে ইঁটের টুকরো আর ছোট ছোট পাথর। গান্ধীজীর চলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। কোথাও বা গোড়ালি পর্যন্ত পাঁক। চলতে পা ডুবে যায়। এইভাবে পথ চললেন গান্ধীজী। তারপর পাঁচ-দশ মাইল পথ হেঁটে যখন পরের গ্রামে গিয়ে পৌঁছলেন তখন দুপায়ে বড় বড় ফোস্কা পড়ে গেছে। ইঁটের টুকরোয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে তাঁর পা দুখানা। তবে এই হাঁটাই ত শেষ নয়। আরও অনেক পথ হাঁটতে হবে তাঁকে। তাই গরমজলে পা ডুবিয়ে সেঁক দিলেন তাঁর ক্লান্ত পা দুখানায়। সাতাত্তর বছরের এই বৃদ্ধ তখন আরও একটা বিলাসিতা করলেন। তাঁর সঙ্গিনী নাতনী মনু ক্লান্ত পা দুটো টিপে সেবা করলো তাঁর।

তিরিশ বছর ধরে এই ক্ষতবিক্ষত পা দুখানা দরিদ্র ক্ষুধার্ত মানুষকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে। কোথায় কোথায় নিয়ে গেছে তাঁকে। কখনো শহরের নোংরা বস্তিতে, কখনো বড়লোকের প্রাসাদে বা কারাগারে। লক্ষ্য একটাই। জাতির মুক্তি, দেশের স্বাধীনতা। মোহনদাস গান্ধীর বয়স যখন আট, বাকিংহাম প্যালেসে বসে চা খেতে খেতে আলাপরত ওই দুজন জ্ঞাতি ভাইয়ের দাদীমা তখন ভারতবর্ষের সম্রাজ্ঞী হলেন। সে এক ইলাহী কান্ড। দিল্লির লালকেল্লার মাঠে একদিকে চলেছে অভিষেকের বৃহৎ কান্ডকারখানা। অন্যদিকে দিল্লি থেকে সাত শ' মাইল দূরে ছোট্ট শহর পোরবন্দরের রাস্তায় সমবয়সী পড়ুয়াদের নিয়ে গান্ধীও চলেছেন এই অভিষেক অনুষ্ঠানের গান গাইতে গাইতে। সেদিন সবাইকে নিয়ে শক্তিমান ইংরেজের স্তুতিগান করেছিলেন বালক গান্ধী। ওরা মাংস খায়, ওরা দীর্ঘকায় সবল। তাই দুর্বল ক্ষীণদেহ ভারতীয়দের শাসন করতে এসেছে ইংরেজরা। বালক গান্ধী অভিভূত হলেন ইংরেজের বীরত্বে। এক বন্ধুর সঙ্গে গোপনে ছাগমাংস খেলেন সেদিন। কিন্তু লোভে পাপ। তাই মাংস খাবার পরিণতি হলো মারাত্মক। বালক গান্ধী বমি করে ফেললেন। তারপর সারারাত মৃত ছাগশিশুর দুঃস্বপ্ন দেখলেন। গান্ধীর জীবনে এই ঘটনাটা একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়ে আছে সেই থেকে।

গান্ধীর বাবামশাই ছিলেন কাথিয়াবাড়ের এক সামন্ত রাজার দেওয়ান। এই দেওয়ান পদটির ওপর প্রায় পারিবারিক অধিকার ছিল গান্ধীর পরিবারের। গান্ধীর মা ছিলেন ভক্তিমতী। পুজোআচ্চা উপোস অনশন নিয়েই তাঁর দিন কাটতো। মজার কথা, একদিন যে মানুষটিকে সারা দেশের মানুষ তাদের আধ্যাত্মিক গুরুর পদে বরণ করে নেয়, তাঁর জন্ম ব্রাহ্মণবংশে হয়নি। জন্মসূত্রে গান্ধী ছিলেন হিন্দুর ধর্মীয় ঐতিহ্যে অনধিকারী। কুলধর্মানুসারে তাঁরা বৈশ্য অর্থাৎ চতুর্বর্ণের তৃতীয় জাতি ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতির নীচে তাঁর স্থান। অবশ্য শূদ্রদের চেয়ে এক ধাপ ওপরে ছিল তাঁদের সামাজিক অবস্থান। তেরো বছর বয়সে, সামাজিক বিধি মেনে, গান্ধীর বিয়ে হলো অপরিচিতা কস্তুরবার সঙ্গে। বিয়ের পর সম্ভোগে আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন গান্ধী। কে জানতো এই মানুষটিই পরবর্তীকালে নির্লোভ, নিষ্কাম জীবনের পবিত্র প্রতিমূর্তি হয়ে মানুষের মধ্যে চিরকাল বেঁচে থাকবেন। একদিনের ঘটনা বলি। কস্তুরবার সঙ্গে রতিক্রীড়ায় যখন নিমগ্ন হয়ে আছেন তখন দরজায় টোকা দিয়ে বাড়ির চাকর বলে গেল যে বাবামশাই সদ্য প্রয়াত হলেন। খবরটা শুনে গান্ধী কেমন ভয় পেয়ে গেলেন। খানিক আগেও তিনি মুমূর্ষু বাবার শয্যার পাশে ছিলেন। সেবা করছিলেন বাপের। হঠাৎ দারুণ কামার্ত হলেন গান্ধীজী। পায়ে পায়ে নিজের ঘরে এসে ঘুমন্ত কস্তুরবাকে জাগিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। কিন্তু

তার এ কি পরিণতি হলো? সেই থেকে গান্ধীর জীবনে তীব্র রমণেচ্ছা আস্তে আস্তে কমতে থাকে। ঘটনাটা তাঁর মনে নিবিড় ছাপ ফেলেছিল।

বাবামশাই হঠাৎ মারা যাওয়ায় গান্ধী কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে যান। তখন স্থির হয় যে বিলেতে তিনি আইনপড়া শেষ করে ফিরে এসে কাথিয়াবাড়ের দেওয়ান হবেন। কিন্তু সেকালে গোঁড়া হিন্দুপরিবারের কারো পক্ষে বিলেত যাওয়াটা এক কঠিন কাজ ছিল। গান্ধীজীর পরিবারের অন্য কেউ আগে ম্লেচ্ছদের দেশে যান নি। সুতরাং সমাজে ব্যাপারটা নিয়ে বেশ আলোড়ন হলো। এমনকি গান্ধীজীর পরিবারকে 'একঘরে' করার হুমকিও দেওয়া হলো। কিন্তু সমাজের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও গান্ধী কালাপানি পেরিয়ে বিলাতদেশে গেলেন। অবশ্য বিলেতে পৌঁছে যৎপরোনাস্তি ভোগান্তি হলো তাঁর। সর্বক্ষণ মনমরা হয়ে থাকতেন। একে বিদেশী অপরিচিত সমাজ তায় তিনি ছিলেন বেজায় মুখচোরা। কাউকে একটা কথা বলতে গেলি শরীর হিম হয়ে যেত। লণ্ডনের আইনপাড়ার (ইন্স্ অব কোর্ট) শৌখিন সমাজে গান্ধীর অবস্থা করুণ হয়ে ওঠে। ছোটখাট পাতলা চেহারা, পরনে বোম্বাইয়ের দর্জির তৈরি ঢোলা কোটপ্যান্ট, চেহারাটা হতো জাহাজের ফুলে ওঠা পালের মতন। আসলে মানুষটি এত ছোটখাট ছিলেন যে সহপাঠীরা প্রায়ই তাঁকে হুকুমখাটা চাকরবাকর মনে করতো।

বিদেশে এইভাবে একা থাকতে থাকতে গান্ধীর অবস্থা করুণ হয়ে উঠলো। মনে মনে ভাবলেন এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার একটাই পথ। মনেপ্রাণে ইংরেজ হতে হবে তাঁকে নইলে হেনস্তার শেষ হবে না। এই উৎকট ভাবনার প্রথম বলি হলো বোম্বাইয়ের তৈরি পোশাকগুলো। সেগুলো ফেলে দিয়ে আর এক প্রস্থ বিলিতি পোশাক কিনলেন। মাথায় সিল্কের টপহ্যাট, গায়ে ইভনিং স্যুট, পায়ে পেটেন্ট লেদারের বুট জুতো, হাতে সাদা দস্তানা, মায় রুপোর পাতমোড়া হাতের ছড়িটা পর্যন্ত নিখুঁত। সাহেবিয়ানার গন্ধে ভুরভুর করছে গান্ধীর শরীর। কিন্তু মন তবু ভরে না। অবাধ্য খোঁচা খোঁচা চুল শাসন করতে দামী বিলিতি হেয়ার লোশন কিনলেন। তারপর ঘন্টার পর ঘন্টা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে সাজাতে লাগলেন। এত গেল পোশাক-বিপ্লব। কিন্তু সামাজিকতা? এবার সেদিকেও মন দিলেন গান্ধী। একটা বেহালা কিনে আনলেন। নাচের ইস্কুলে ভর্তি হয়ে বল্‌নাচ শিখতে লাগলেন। মাস্টার রেখে ফ্রেঞ্চ শিখতে লাগলেন আর চড়বড় করে ইংরেজের মতন কথা বলার অভ্যেস করতে লাগলেন। সে এক মস্ত ব্যাপার। মানুষটা যেন নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেলেন। কিন্তু ফল হলো বিপরীত। ছেলেবেলায় জিদ করে মাংস খাওয়ার মতন উৎকট প্রতিক্রিয়া হলো তাঁর। বেহালা থেকে যে আওয়াজ বেরোতে লাগলো তা খরখরে কান্নার মতন। পা দুটো কিছুতেই নাচের তালে তালে মিলছে না। তাঁর জিভে ফরাসী উচ্চারণটাও আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এমনকি পোশাক-আশাক পরেও মুখচোরা ভাবটা কাটাতে পারলেন না। শেষমেশ মুখচোরা লাজুক ভাবটা কাটাতে মরিয়া হয়ে একদিন বেশ্যালয়ে গেলেন। কিন্তু হায়! মুখরক্ষা হলো না। ওদের বৈঠকখানা পেরিয়ে শোবার ঘরে যেতে পা সরলো না তাঁর। শেষপর্যন্ত পালিয়ে বাঁচলেন। গান্ধীজী ততদিনে বুঝেছেন যে মনে প্রাণে সাহেব হওয়া তাঁর ধাতে সইবে না। ফলে যা ছিলেন তাই রইলেন। তখন তিনি ব্যারিস্টার হয়ে গেছেন। স্বাধীনভাবে আইনব্যবসা করতে ডাক পেয়ে গেছেন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন গান্ধীজী এবং প্রথম সুযোগেই দেশে ফেরার ব্যবস্থা করলেন।

www.pathagar.com

কিন্তু দেশে ফেরাটা বিজয়ীর মতন হলো না। সারাটা দিন বোম্বাই শহরের আইন পাড়ায় আদালতের দোরে দোরে ঘুরে বেড়াতেন। কিন্তু ভরসা করে কেউ তাঁকে মামলা দিত না। একদিন যে মানুষটার দৃপ্ত কণ্ঠস্বর ভারতবর্ষের তিরিশ কোটি মানুষকে উদ্দীপ্ত করেছিল, সেই মানুষটাই সেদিন আদালতকক্ষে সওয়াল-জবাব করে একজন বিচারকের মনেও কোন ছাপ ফেলতে পারেননি।

এই ব্যর্থতাই গান্ধীর জীবনে সন্ধিক্ষণ হয়ে ওঠে। পরিবারের লোকেরাও ততদিনে হতাশ হয়ে উঠেছেন তাঁকে নিয়ে। সেই সময় একটা ঘটনা ঘটলো। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁদের একজন আত্মীয় থাকতেন। ব্যবসাসংক্রান্ত কিছু মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি। সেই মামলার জট ছাড়াতে গান্ধীকে সেখানে পাঠিয়ে দেয়া হলো। ওখানে তাঁর থাকার কথা মাস দুই। কিন্তু দুবছরের বেশি থাকতে হলো গান্ধীজীকে। তখন দক্ষিণ আফ্রিকার শক্ত রুক্ষ মাটিতে দাঁড়িয়েই গান্ধী খুঁজে পেলেন তাঁর জীবনদর্শন। সেই খুঁজে পাওয়া জীবনদর্শনই অতঃপর তাঁর এবং ভারতের ভবিষ্যতের ইতিহাস একাকার করে দিয়েছিল।

তবে ১৮৯৩ সালের মে মাসে ডারবান শহরে পা দেওয়া গান্ধীকে দেখে সেদিন মনেই হয়নি যে, সাহেবি পোশাকপরা এই মানুষটাই একদিন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর মতন জীবনযাপন করবেন রাজার রাজা হয়ে। সেদিন দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে পা দিয়েছিলেন যে গান্ধী তিনি অন্য মানুষ। সাদা হাই কলারের কোর্তা পরা লন্ডনের বিখ্যাত টেম্পল ইন্-এর ব্যারিস্টার মোহনদাস গান্ধী। তাঁর হাতের ব্রিফ্‌কেস সেদিন ঠাসা ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার এক ধনী বনেদী ভারতীয় মক্কেলের মামলার কাগজপত্রে। এঁরই আইনজীবী হয়ে গান্ধী সওয়ালজবাব করতে এসেছেন এখানে।

কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে তাঁর আসল পরিচয় হলো এক হপ্তা পরে। রাতের ট্রেনে ডারবান থেকে প্রিটোরিয়া যাচ্ছেন গান্ধী। সঙ্গে আছে ফার্স্টক্লাস কামরার টিকিট। সেই নিষ্ঠুর রাতের কথা চারযুগ পরেও ঠিকঠাক মনে আছে তাঁর কারণ নতুন জীবনদর্শন গড়ে উঠেছিল সেই নির্দয় রাতেই। সেই রাতের অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে নতুন দর্শন তৈরি করে দিয়েছিল যেন। তখন মাঝরাত এবং দীর্ঘ যাত্রার মধ্যপথ পেরিয়েছেন। হঠাৎ তাঁর কামরায় একজন শ্বেতাঙ্গ যাত্রী এল। লোকটা তাঁকে দেখেই বিরক্ত। গান্ধীকে মালপত্র নিয়ে ব্যাগেজ কামরায় যেতে বললো। গান্ধীর কাছে ফার্স্টক্লাসের টিকিট রয়েছে। সুতরাং দুঃসাহসী হয়ে সাদা চামড়ার লোকটার কথা কানে তুললেন না। লোকটা পরের স্টেশনেই একজন পুলিস নিয়ে এল এবং বিনা ভূমিকায় পুলিসটা মালপত্র সমেত গান্ধীকে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিল কামরা থেকে। সারারাত সেই ছোট্ট স্টেশনের প্রায়ান্ধকার প্ল্যাটফর্মে শীতে হি হি করে কাঁপলেন কিন্তু লজ্জায় ওভারকোটটা চেয়ে নিতে পারলেন না। শীতে জড়সড় হয়ে বসে থাকতে থাকতে মনে হয়েছিল মানুষের তৈরি এই জাত-বেজাতের বজ্জাতিটা কী ভয়ানক নিষ্ঠুর, দয়ামায়াহীন। মধ্যযুগের যুবকরা যেমন 'নাইট' পাবার আগে বিনিদ্র প্রার্থনা করতো গান্ধীও তেমনি সেই নিঃসঙ্গ প্ল্যাটফর্মে বসে বিপদভঞ্জন কৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়েছিলেন মনে মনে। সারারাত আকুল হয়ে কৃষ্ণকে স্মরণমনন করলেন গান্ধী। পরদিন যখন ভোরের আলো সবে ফুটেছে তখন অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। ছোট্ট মারিৎজ্‌বার্গ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে সেদিন নতুন যুগের ভোর হলো। আলোর ঝরনাধারায় স্নাত হলেন তিনি। ছোটখাট চেহারার সেই ভয়কাতুরে মানুষটা সেদিনই প্রথম সাহস করে 'না' বলতে শিখলেন।

www.pathagar.com

এই ঘটনার এক হপ্তা পরে প্রিটোরিয়া শহরের অধিবাসী ভারতীয়দের জনসভায় গান্ধী প্রথম ভাষণ দিলেন। ততদিনে তাঁর জিভ শাণিত হয়েছে। আগের মতন আড়ষ্ট নন। সেদিন যারা তাঁর সেই উদ্দীপ্ত ভাষণ শুনেছিল, তারা কল্পনাও করে নি মাত্র কদিন আগেও বোম্বাই শহরের আদালতঘরে কেমন জড়সড় ছিলেন গান্ধীজী। প্রিটোরিয়া শহরের জনসভায় গান্ধীজী ওদের শেখালেন কি করে সম্মিলিত হয়ে ওদের মাতৃভাষা ইংরিজি দিয়েই অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে হয়। শুধু উপদেশ দেওয়া নয়। পরদিন বিকাল থেকেই কাজে লেগে গেলেন গান্ধীজী। দোকানী, কেরানী, নাপিত সবাইকে নিয়ে ইংরিজি পাঠ শিক্ষা দিতে লাগলেন। না বুঝে সেদিন যে কাজটা তিনি শুরু করেছিলেন শেষমেশ সেটাই যেন ভারতভূখণ্ডেও স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল। যাই হ'ক, প্রথম সাফল্য এল অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের রেল কর্তৃপক্ষ প্রথম আর দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় সুবেশ ভারতীয়দেরও রেল ভ্রমণের অনুমতি দিল।

মামলার নিষ্পত্তি হয়ে গেলেও গান্ধীজী স্থির করলেন আরও কিছুদিন দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকবেন। ততদিনে ওখানকার ভারতীয় সমাজে তাঁর বেশ প্রতিপত্তি হয়েছে। আইনজীবী হিসেবেও দারুণ সাফল্য এসেছে। এমনকি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকরাও তাঁকে মেনে নিয়েছে ততদিনে। গান্ধীজীও তাঁর যোগ্যতা অনুসারে সরকারকে সাহায্য করেছেন। তিনিই উদ্যোগ করে বুয়র যুদ্ধে রুগণ আহতদের শুশ্রূষার জন্যে স্বেচ্ছাসেবক পাঠালেন। এখানে আসার দশবছর পরে দ্বিতীয় যে দিকনির্দেশকারী ঘটনাটা ঘটলো, সেটাও ট্রেনের কামরায়। ১৯০৪ সাল সেটা। জোহান্সবার্গ থেকে ডারবান আসছেন গান্ধীজী। ট্রেনের কামরায় সহযাত্রী একজন ইংরেজ ভদ্রলোক তাঁকে একটা বই পড়তে দিলেন। বইটা হাতে নিয়ে গান্ধীজী দেখলেন লেখকের নাম জন রাস্কিন। বইয়ের নাম 'আনটু দিস লাস্ট।'

সারারাত ধরে দক্ষিণ আফ্রিকার তৃণময় অঞ্চল দিয়ে যখন ট্রেন ছুটে চলেছে, তখন নিবিষ্ট মনে বইটা পড়েছেন গান্ধীজী। সকালবেলা ট্রেন যখন ডারবান স্টেশনে পৌঁছল, তখন তাঁর জীবনে সত্য প্রকাশ হয়েছে। মনে মনে এক মহান শপথ নিলেন তিনি। শুরু হলো নতুন জীবনযাত্রা। না, আর নয় এই আড়ম্বর। তুচ্ছ হ'ক ধনমান। জীবন রঙ্গভূমিতে নতুন আলোর দীপ্তি ছড়ালো। গান্ধীজী তখন মনস্থির করে ফেলেছেন। সব ঐহিক ভোগসুখ তিনি ত্যাগ করবেন। শুরু হবে নবীন জীবনায়ন রাস্কিনের আদর্শে। রাস্কিন লিখেছেন যে, পুঞ্জীভূত ধন হলো মানুষকে বশে রাখার হাতিয়ার। মামলা নিয়ে উকিল যেমন সমাজ সেবা করে, তেমনি শ্রমিকও সমাজের সেবা করছে। তবে যেহেতু ব্রীফ নেওয়া একজন পসারওলা উকিলের কাজের চেয়ে ক্ষেত মজুরের কাজের দাম অনেক বেশি, তাই সেই কাজেই সমাজের বেশি উপকার করা যায়।

গান্ধীজী তখন যথার্থই পসারওয়লা ব্যারিস্টার। দক্ষিণ আফ্রিকায় নাম করা আইনজীবী। তাঁর মোট আয়ের পরিমাণ বছরে পাঁচহাজার পাউন্ড। তখনকার দিনে দক্ষিণ আফ্রিকায় অঙ্কটা বিপুলই বলা যায়। সুতরাং এক কথায় পেশা ছেড়ে দেওয়াটা যে তাঁর জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তাতে সন্দেহ নেই। তবে দুবছর ধরেই মনের মধ্যে এর একটা আঁচ পাচ্ছিলেন তিনি। শ্রীমদ্ভগবদগীতার ত্যাগের বাণী তাঁকে অহরহ তাড়া করছিল যেন। বিষয়ভোগসুখ যে অনিত্য, ঐহিক কামনা ত্যাগ না করলে যে আধ্যাত্মিক উন্নতি করা যায় না, এই প্রেরণায় উদ্দীপ্ত

www.pathagar.com

হচ্ছিলেন মনে মনে। ইতিমধ্যে নিজের কাজ নিজে করার পরীক্ষা শুরু করে দিয়েছিলেন তিনি। চুল কাটা, কাপড়জামা ধোওয়া, পায়খানা পরিষ্কার করার কাজগুলো নিজেই করতেন। এমনকি শেষ সন্তানের প্রসবের সময় প্রসূতি ও শিশুর সেবার কাজটাও নিজে করতেন। মনে যেটুকু সংশয় ছিল, রাস্কিনের বইটা পড়ার পর তাও দূর হয়ে গেল।

এক হপ্তার মধ্যেই ডারবান থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে ফীনক্স্-এর কাছে প্রায় বন্ধ্যা এক ভূখণ্ডে সংসার উঠিয়ে আনলেন গান্ধীজী। লম্বায় প্রায় একশ' মাইল জমিটায় একটা ভাঙাচোরা খামারবাড়ি ছিল। কাঠের একটা কেবিন, একটা কুয়া, ক'টা কমলালেবু আর আমের গাছ এবং অসংখ্য সাপ এই নিয়ে খামারবাড়ি। গান্ধীজী এর নাম দিলেন 'তলস্তয় ফার্ম' বা খামার। গান্ধীজী তখন স্থির করে নিয়েছেন তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের ছক, সবরকম ঐহিক ভোগসুখ ত্যাগ করবেন এবং জীবনধারণের জন্যে যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই গ্রহণ করবেন। বাঁচার লড়াইয়ে প্রধান হাতিয়ার হলো শ্রম। শ্রমের কোন জাত নেই। সব শ্রমই সমান মূল্যবান এবং শ্রমের দ্বারা যা উৎপন্ন হবে সমানভাবে সেটি ভাগ করে নেবেন। এটিই হবে তাঁর জীবনধারণের আদর্শ।

কিন্তু যে ত্যাগটা সবচেয়ে কঠিন আর বেদনাদায়ক সেই মৈথুনবর্জিত জীবনযাপনের শপথ তিনি তখনও পালন করতে পারেন নি। এই শপথটাই সর্বক্ষণ তাঁর মন পীড়িত করছিল। অবশেষে একটা সময় এল সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করার। গ্রীষ্মকালের এক সন্ধ্যায় গান্ধীজী প্রতিজ্ঞা পূরণ করলেন। বাবার মৃত্যুর সময় তাঁর চরিত্রে যে কলঙ্করেখা পড়েছিল সেটা মুছে ফেলতে চাইলেন গান্ধীজী। তখন সাত্ত্বিক অধ্যাত্মচিন্তায় আরও সচেতন হয়েছেন। কস্তুরবাকে ডেকে গান্ধীজী তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা বললেন। এখন থেকে মহান জীবনযাপন করবেন তিনি। কস্তরবা যেন তাকে সাহায্য করে। তেরো বছর বয়স থেকে যে কামরিপুর পরিচর্যা করে আসছিলেন, এবার তার শেষ হতে চললো। কস্তুরবার সঙ্গে আর তাঁর যৌন সম্পর্ক থাকবে না। তিনি ব্রহ্মচারীর জীবনযাপন করবেন এখন থেকে। গান্ধীজীর বয়স তখন মাত্র সাঁইত্রিশ।

তবে গান্ধীজীর কাছে ব্রহ্মচর্য শুধু মৈথুনবর্জিত জীবনযাপন নয়। তাঁর কাছে ব্রহ্মচর্য হলো সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়ের দমন। আহার, বিহার, আবেগ, বাক্যসংযম, ইত্যাদি সমস্ত মনোবৃত্তির সংযম। অর্থাৎ কামনাশূন্য স্থিতধী অবস্থা যা গীতার ফলাশাহীন নিষ্কাম কর্মের আদর্শস্বরূপ। বস্তুত গান্ধীজী নিশ্চিতভাবেই তখন আত্মনিগ্রহী সন্ন্যাসীর জীবনযাপনের পথ অনুসরণ করছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন এই কৃচ্ছ্রসাধনের পথেই তাঁর যথার্থ রূপান্তর হবে। আর কোন শপথ তাঁকে এমন নিবিড় আন্তরিক সংগ্রামে লিপ্ত করেনি। তাই তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কোন না কোনভাবে এই সংগ্রামটা অক্ষুন্ন ছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় আসার এক সপ্তাহের মধ্যে গান্ধীজী বর্ণবিদ্বেষের দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন, পরবর্তী কালে সেটাই তাঁকে বিশ্বখ্যাত করে দেয়। তাঁর প্রবর্তিত এই নীতি দুটি হলো অহিংসা আর অসহযোগ। বাইবেলের একটা অংশ পড়তে পড়তে তাঁর মনে আলোক উদ্ভাস হয়। অহিংসামন্ত্র গভীরভাবে নাড়া দেয় তাঁকে। গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়ার জন্যে যীশু তাঁর শিষ্যদের মৃদু ভর্ৎসনা করেছিলেন। অংশটুকু পড়ার পর গভীরভাবে অভিভূত হন গান্ধীজী। ইতিমধ্যেই নির্বিকার

www.pathagar.com

ভালমানুষের মতন বিনা প্রতিবাদে অনেকবার সাদাচামড়ার মানুষের হাতে তিনি প্রহৃত হয়েছেন। তাঁর ধারণা যে হত্যা দিয়ে হত্যা বন্ধ করা যায় না। একজন মানুষের মাথা কেটে তার প্রবৃত্তির বিনাশ করা যায় না। কিংবা গুলিবিদ্ধ করে তার মনে নতুন ভাবনার উন্মেষ ঘটানো যায় না। বলপ্রয়োগের ফলে উদ্ধত মানুষ আরও পাষণ্ড আচরণ করে। গান্ধীজী তাই এমন এক নীতির সন্ধান করছিলেন যার দ্বারা শ্রেয়র দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করা যায়। বাহুবল দিয়ে মানুষে মানুষে ভেদ না করে ঈশ্বরের সঙ্গে তার সমন্বয় করা যায়।

এর সুযোগ এল অল্পকিছুদিনের মধ্যে। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার তাঁকে সুযোগ করে দিল তাঁর নিজস্ব পরিকল্পিত নীতির সদব্যবহার করতে। তখন ১৯০৬ সালের শরৎকাল চলছে। সরকার থেকে নতুন আইন পাশ করানো হয়েছে যে আট বছর বয়স থেকে প্রত্যেক অভিবাসী ভারতীয়কে সরকারী দপ্তরে তালিকাভুক্ত হতে হবে। বাধ্যতামূলক ভাবে তাদের আঙুলের ছাপ রাখতে হবে সরকারী হেপাজতে এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর নামে নামঠিকানাযুক্ত সনাক্তকরণ কার্ড বিলি করা হবে। প্রতিবাদে গর্জে উঠলো দক্ষিণ আফ্রিকার অভিবাসী ভারতীয় সমাজ। ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে জোহান্সবার্গের এম্‌পায়ার থিয়েটার হল-এ ভারতীয়দের এক প্রতিবাদ সভা ডাকলেন গান্ধীজী। বক্তৃতামঞ্চ থেকে প্রতিবাদের বজ্রনির্ঘোষ ধ্বনিত হলো। গান্ধীজী ঘোষণা করলেন যে এই আইনের প্রতিবাদ করতে হবে। তিনি বললেন যে এমন আইন মেনে নেবার অর্থ হলো ভারতীয় জনসমাজের বিনাশ ঘটানো। গান্ধীজী বললেন, 'আমার সামনে একটাই পথ খোলা আছে। সে পথ হলো আইন অমান্য করা। মরবো তাও ভাল, তবু এমন আইন মেনে নেব না।' বোধহয় এটাই তাঁর জীবনের প্রথম প্রতিবাদ যখন ঈশ্বরের নামে শপথ করে গান্ধীজী ঘোষণা করলেন যে, ভালমন্দ যাই-ই ঘটুক এমন অন্যায় আইন তিনি মানবেন না। কিন্তু কিভাবে প্রতিরোধ করবেন তার কোন রূপরেখা গান্ধীজী সেদিন জানান নি। হয়ত নিজেও সঠিক জানতেন না। তবে একটা ব্যাপার স্পষ্ট ছিল। সবাইকে তিনি জানিয়েছিলেন যে তাঁদের প্রতিবাদ হবে অহিংস।

জোহান্সবার্গের এমপায়ার থিয়েটার হল-এ সেদিন নতুন যে রাজনৈতিক যুদ্ধনীতির জন্ম হলো তার নাম সত্যাগ্রহ। গান্ধীজীর নেতৃত্বে সরকারী রেজিস্ট্রেশন আইন অবৈধ ঘোষণা করা হলো। গুটিকয়েক স্বেচ্ছাসেবী নিয়ে তাঁরা প্রতিটি সেন্টারে অবস্থান ধর্মঘট করলেন। সরকারও চুপ করে বসে রইল না। অচিরেই গান্ধীজীর কারাদণ্ডের আদেশ হলো। সেটাই হলো তাঁর প্রথম কারাবাস।

জেলে বন্দী থাকার সময় দ্বিতীয় যে বইটির মননশীলতা তাঁর মনে প্রভাব ফেলেছিল তা হলো হেন্‌রী থরোর (Henry Thoreau) লেখা রচনা 'অন সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স'* সিভিল ডিসবিডিয়েন্স বা সত্যাগ্রহ এক আত্মিক শক্তি, যার

---

* তৃতীয় যে ঘটনা গান্ধীর মনোজগতে আলোড়ন এনেছিল সেটি হলো কাউন্ট লিও তলস্তয়ের লেখা 'দ কিংডম অব গড্ ইজ উইদিন্ ইউ' অর্থাৎ স্বর্গরাজ্য তোমার অন্তরে নামের বইটা। তলস্তয়ের মতন গান্ধীজিও চাইতেন যে মানুষের দৈনন্দিন জীবন নীতিবান হক। অনেক বিষয়েই প্রায় সহমত পোষণ করতেন বিশ্বের এই দুইজন সেরা চিন্তানায়ক। শিক্ষাব্যবস্থা, খাদ্যাভ্যাস, শিল্পোন্নয়ন ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রায়ই তাঁদের মত বিনিময় হতো।

www.pathagar.com

প্রয়োগে কল্যাণকামী যে কোন ব্যক্তি অন্যায়ের বিরুদ্ধে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে। হেন্‌রী থরো একজন আমেরিকান। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাসপ্রথার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। অথচ মার্কিন সরকারের সহিষ্ণু মনোভাবের জন্যে এই ঘৃণ্য প্রথার কোন সুরাহা হয় নি। সরকারের এই সহিষ্ণু মনোভাবের বিরুদ্ধে হেন্‌রী থরো প্রতিবাদ করেছিলেন এই রচনায়। তাছাড়া মেক্সিকোয় এক অন্যায় যুদ্ধে সরকার শান্তি যোগাচ্ছিল। সরকারের হিংস্র দমননীতি প্রায় অসহনীয় হয়ে উঠেছিল তখন। তাই ব্যক্তির ন্যায্য অধিকার সাব্যস্ত করতে থরো তাঁর সরকারের প্রতি আনুগত্য দেখাতে অস্বীকার করলেন। থরো বললেন যে বশংবদ নাগরিক হওয়ার চেয়ে ন্যায়পরায়ণ নাগরিক হওয়া অনেক সম্মানের।

থরোর রচনাটা গান্ধীজীর বিক্ষুব্ধ চিন্তাসমুদ্রে যেন একটা মন্থন সৃষ্টি করলো। গান্ধীজী স্থির করলেন যে জেল থেকে বেরিয়েই সত্যাগ্রহ করবেন। একটা ইস্যু হাতের কাছেই ছিল ট্রান্সভাল সীমানায় ভারতীয়দের প্রবেশ আইনতঃ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তখন সেখানে খুব কড়াকড়ি। গান্ধীজী স্থির করলেন এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করবেন। ১৯১৩ সালের ৬ই নভেম্বর তারিখে দু হাজার সাঁইত্রিশ জন ভারতীয় পুরুষ, একশ' সাতাশ জন মহিলা আর সাতান্ন জন বালক-বালিকা নিয়ে শুরু হলো তাঁর অহিংস পদযাত্রা। সবার আগে চলেছেন গান্ধী। তিনি চলেছেন ট্রান্সভালের সীমানার দিকে। সবাই জানে তাদের ভাগ্যে কি আছে। হাজতবাস ত বটেই, চাই কি ভয়াবহ মারধোরও জুটতে পারে কপালে। তাঁর পিছনে চলেছে এক এলোমেলো জনতার মিছিল, করুণ হতভাগ্য মানুষের দল। চলতে চলতেই গান্ধীজীর অন্তর্লোক এক সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত হলো। তিনি অনুভব করলেন যে কষ্ট পাওয়া ছাড়া ওদের আর কিছু পাবার নেই ভবিষ্যত থেকে। হয়ত সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে যে সাদা চামড়ার রক্ষীরা তারা ওদের দেখলেই গুলি করবে। অনেকেই মারা যাবে। তবুও কেমন নির্ভয়ে তাঁর উপলব্ধির সত্যকে আশ্রয় করে ওরা তাঁকে অনুসরণ করে চলেছে। ওরা তাঁকে বিশ্বাস করেছে। তাই তাঁর কথামত আত্মক্লেশের উষ্ণতা দিয়ে শত্রুর পাষাণ হৃদয় গলিয়ে দেবার প্রেরণা নিয়েছে।

এই অহিংস আন্দোলনের আত্মিক শক্তি যে কত প্রবল তার প্রথম উপলব্ধি হলো ট্রান্সভাল সীমান্তে পৌঁছে। গান্ধীজী অনুভব করলেন কী বিপুল সম্ভাবনাময় মানুষের ইচ্ছাশক্তির এই সম্মেলনে। ওদের মনোভূমি অধিকার করে আছে। অকম্পিত নির্ভীকতায়। তাঁর অনুগামী কয়েক শ' অনুপ্রাণিত মানুষ যেন কয়েক হাজার অনুগামীতে পরিণত হয়েছে। তাই নির্যাতন, বেত্রাঘাত, কারাবাস, আর্থিক অবরোধ এসব কিছুই তাঁর আন্দোলনকে দমিয়ে রাখতে পারলো না। বলতে গেলে, গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকার ধর্মযুদ্ধ শেষ হলো পরিপূর্ণ বিজয়গৌরবে এবং সেই গৌরবপতাকা হাতে নিয়েই তিনি ভারতের মাটিতে ফিরে এলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধীজী দেশের উদ্দেশে যাত্রা করলেন ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে। কিন্তু তখন তিনি পুরোপুরি অন্য মানুষ। ডারবানের মাটিতে পা দেওয়া ছোটখাটো চেহারার ভয়পাওয়া উকিলবাবুটি নন। ডারবানের শক্ত নির্দয় মাটি গান্ধীজীর ধাত বদল করে দিয়েছে। খাপখোলা তলোয়ারের মতন শাণিত হয়েছেন তিনি। আর একটা কাজ করেছিল ডারবান। তাঁর জীবনদর্শন সম্পূর্ণ গড়ে দিয়েছিল তিনজন অসাধারণ চিন্তানায়কের সংগে পরিচিত করিয়ে। এ'রা হলেন

www.pathagar.com

রাস্কিন, তলস্তয় এবং থরো। এঁদের রচনা পড়েই গান্ধীজী নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হন। অহিংসা এবং সত্যাগ্রহ তাঁর সেই চিন্তার ফসল। আমরা জানি যে পরবর্তী তিরিশ বছর এই নীতি দুটি হাতে নিয়েই বিশ্বের সবচেয়ে পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যের দাম্ভিক মাথাটি নুইয়ে রেখেছিলেন তিনি।

১৯১৫ সলের ৯ জানুয়ারি তারিখে গান্ধীজী যেদিন বোম্বাই বন্দরে নামলেন, সেদিন বিপুল মানুষ তাঁকে যথার্থ বীরপুরুষের সংবর্ধনা দিয়েছিল। ছোটখাট চেহারার মানুষটি হাতে একখানা স্যুটকেশ নিয়ে গেটওয়ে অব ইন্ডিয়ার খিলানের তলা দিয়ে আসছেন। বিশাল জনতা স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে উদ্বেল হয়ে আছে। গান্ধীজীর হাতের বাক্সটার মধ্যে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কাগজপত্র। মোটা একটা কাগজের বান্ডিল। সবই তাঁর নিজের হাতের লেখা। বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ইন্ডিয়ান হোম রুল বা হিন্দ স্বরাজ। কাগজগুলো দেখতে দেখতেই মনে হবে যে গান্ধীজীর তিরিশ বছরের সংগ্রামী জীবনের উপযুক্ত শিক্ষানবীসক্ষেত্র ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। বস্তুত তাই। গান্ধীজীকে তৈরি করে দেয় দক্ষিণ আফ্রিকাই।

শিল্পনগর আমেদাবাদ শহরে সবরমতী নদীর ধারে গান্ধীজী নতুন আশ্রম গড়লেন। অনেকটা দক্ষিণ আফ্রিকার আশ্রমের আদলে গড়ে তুললেন তাকে। এই সার্বজাতিক আশ্রম থেকে তৈরি হলো তাঁর প্রথম কর্মসূচি। দেশের বিপুল সংখ্যক গরিব মানুষের কথাই তাঁর সর্ব প্রথম মনে হলো। প্রথম পদক্ষেপ নিলেন বিহারের নীলচাষীদের ইংরেজ ভূস্বামীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগঠন করতে। এরপর সংগঠন করলেন করভারপীড়িত বোম্বাই প্রেসিডেন্সির দুর্ভিক্ষ কবলিত চাষীদের। এমনকি, যে কাপড়কলের মালিকদের দানে তাঁর আশ্রমের পালন পোষণ হচ্ছিল, তাদের বিরুদ্ধেও শ্রমিকদের একত্র করেছিলেন। গান্ধীজীই সর্বপ্রথম ভারতীয় রাজনীতিক নেতা যিনি সবার আগে দেশের দরিদ্র মানুষের দুঃখদুর্দশার অংশীদার হন। তাই অনতিকালের মধ্যেই ভারতের সর্বকালের মহত্তম কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেওয়া সম্মানে তাঁকে ভূষিত করা হলো। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম তাঁকে 'মহাত্মা' আখ্যা দেন এবং সারাজীবন এই পরিচয়টি সসম্মানে ধারণ করেছিলেন গান্ধীজী।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় অন্য ভারতীয়দের সংগে গান্ধীজীও বশংবদ প্রজার মতন ইংরেজকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা হলো ইংরেজ সরকার এর যথোচিত প্রতিদান দেবে। তাঁদের স্বদেশানুরাগের অমর্যাদা করবে না। কিন্তু গান্ধীজীর অনুমান ভুল। প্রথম মহাযুদ্ধ নির্বিঘ্নে শেষ হতেই ভারতীয়দের স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করতে ১৯১৯ সালে কুখ্যাত রাউলাট আইন (Rowlatt Act) পাশ করিয়ে নিল ইংরেজ সরকার। গান্ধীজী স্তম্ভিত হলেন ইংরেজের আচরণে। শুরু হলো গভীর চিন্তা। কি উপায়ে এর প্রতিবাদ করবেন? দিনের পর দিন কাটতে লাগলো আত্মমগ্নতায়। ভারতের স্বাধীন হবার স্বপ্ন তখন জলাঞ্জলি যেতে বসেছে। অবশেষে হঠাৎই, প্রায় স্বপ্নঘোরের মধ্যে আশার আলোর উঁকিঝুঁকি দেখতে পেলেন তিনি। কী আশ্চর্য! সমাধানটা কত সহজ। গান্ধীজী ঘোষণা করলেন যে ইংরেজ সরকারের এই কৃতঘ্নতার প্রতিবাদ করবেন নিঃশব্দ বিদ্রোহে। সারা দেশ স্তম্ভিত হবে এই গা ছমছম করা নিঃশব্দ প্রতিবাদে। আগে কেউ ভাবে নি এইরকম প্রতিবাদের কথা। সারা পৃথিবী জানবে এই অভিনব প্রতিবাদের কথা। গান্ধীজী এর নাম দিলেন 'হরতাল' গুজরাতি ভাষায় যার অর্থ

www.pathagar.com

হলো ধর্মঘট, অর্থাৎ কাজকর্ম, দোকানপাট, একদিনের জন্যে সব বন্ধ করে দেওয়া।

গান্ধীজীর আরও অনেক চমকপ্রদ রাজনৈতিক পরিকল্পনার মতন এটাও ছিল একটা দারুণ চমক। বস্তুত এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি মানুষটির নতুন নতুন নানারকম কৌশল আবিষ্কার করার এমন এক সহজাত প্রতিভা ছিল, যা সচরাচর অন্য নেতাদের মধ্যে দেখা যায় না। অত্যন্ত সহজ সরল ভাবে তিনি এমন অনায়াসে তাঁর পরিকল্পনাটা বুঝিয়ে দিতেন, যা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতো। গান্ধীজীর অনুগামীরা বুঝলো যে তাদের কিছুই করতে হবে না। আইন ভাঙতে হবে না, পুলিসের মার খেতে হবে না। বলতে কি, তাদের কিছুই করতে হবে না। বরং নিষ্ক্রিয় থেকেই তারা ঠিকমতন প্রতিবাদ জানাতে পারবে। দোকানী দোকান খুলবে না, পড়ুয়ারা ক্লাসে যাবে না, মন্দিরে পূজা হবে না। সবাই কর্মত্যাগ করে নিশ্চল করে দেবে দেশটাকে। হরতালের দিন স্থির হলো ৭ই এপ্রিল। ১৯১৯ সালের ৭ই এপ্রিল তারিখে দেশের সবাই কর্মত্যাগ করে শোক দিবস পালন করবে। ভারত সরকারের বিরুদ্ধে এটাই হবে প্রথম প্রকাশ্য প্রতিবাদ তাঁর। গান্ধীজীর মনের বাসনা ছিল সারা ভারতের মানুষ এইভাবে বিদেশী সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিঃশব্দে ক্ষোভ জানাক।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতের সর্বত্র এই প্রতিবাদ নীরব থাকেনি। জনতার ক্ষোভ অনেক জায়গাতেই সরব হয়ে উঠেছিল সেদিন। ক্ষিপ্ত জনতা অনেক জায়গাতেই দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়। সব থেকে বিপজ্জনক অবস্থা হয় পাঞ্জাবের অমৃতশরে। শোষক ইংরেজ সরকারও বসে রইল না। তারা সারা শহরটা অবরোধ করলো। প্রতিবাদে ১৩ই এপ্রিল তারিখে শহরের কয়েক হাজার মানুষ জমায়েত হলো জালিয়ানওয়ালা বাগের চত্বরে। ছোট্ট অপ্রশস্ত চত্বর। চারপাশে ভাঙাচোরা বাড়ির ইঁটকাঠের জঞ্জাল। প্রতিবাদ সভায় ঢোকবার রাস্তা ছিল একটাই। অন্যদিকগুলো ঘেরা। দুটো বাড়ির মধ্যে একটা সরু গলিপথ দিয়ে দলে দলে প্রতিবাদী মানুষ হাজির হলো সেই অবৈধ সভায়। সভা শুরু হতেই প্রবেশপথটা আটকে দিল সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনীর প্রধান ব্রিগেডিয়ার আর·ই·ডায়ার পঞ্চাশজন সৈন্য নিয়ে মার্চ করে এগিয়ে এল সেই সরু গলিপথ দিয়ে। তারপর গলিপথের দুপাশে রক্ষী মোতায়েন করে, আচমকা গুলি ছোঁড়ার আদেশ দিল নিরস্ত্র জনতার ওপর। অতর্কিত এবং বর্বরোচিত এই আক্রমণ চললো দশ মিনিট ধরে। মেসীনগান থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বেরিয়ে আসছে আর লুটিয়ে পড়ছে অসহায় মানুষ। পালাবার একটাই পথ এবং সেটা আগলে রেখেছে ডায়ারের পোষা সৈন্যরা। সে এক বীভৎস দৃশ্য। নারী পুরুষ দয়া চাইলো, অনুগ্রহ চাইলো ওই অমানুষ সৈন্যদের কাছে। কিন্তু কেউ তাদের দয়া করলো না। সমানে দশমিনিট ধরে মোট ১৬৫০ রাউন্ড গুলি ছুঁড়লো তারা। প্রায় ১৪১৬ জন মানুষ হত বা আহত হলো এই অতর্কিত আক্রমণে। অবশেষে আত্মতৃপ্ত ডায়ার যখন সৈন্য সরিয়ে নিল তখন সে পুরোপুরি আশ্বস্ত। তার ধারণা হোলো এতদিনে সে একটা 'কাজের কাজ করতে পেরেছে।'

কিন্তু সেদিন তার এই 'কাজের কাজের' জন্যেই ইতিহাসের গতিপথ নতুন বাঁক নেয়। ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের মধ্যে সম্পর্কের যে অস্বস্তিকর চিড় ধরে তেমন ফাটল তেষট্টি বছর আগের সিপাহী বিদ্রোহও ঘটাতে পারে নি।* গান্ধীজীর মনে

* এই নিষ্ঠুর কাজের পরিণাম ডায়ারের কাছে ক্ষতিকর হয় নি। তাকে ভর্ৎসনা করে সেনাবাহিনীর চাকরী থেকে শুধু স্বেচ্ছা অবসর নিতে বলা হয়েছিল। তবে অবসর নিলেও পেনসন না

www.pathagar.com

হয়েছিল এটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের চূড়ান্ত শঠতা। বিশ্বাসভঙ্গ করে ওরা তাঁর আপস নীতির অবমাননা করেছে। সুতরাং সমস্ত উদ্যম দিয়ে গান্ধীজী তাঁর নিজের অধিকার সাব্যস্ত করতে চাইলেন জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস দলটার কর্তৃত্ব হাতে নিয়ে।

কংগ্রেস নামে রাজনৈতিক দলটাই যে একদিন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবে, এমন ধারণা এর ইংরেজ প্রতিষ্ঠাতা স্বপ্নেও সেদিন ভাবেন নি। তেমন সম্ভাবনার আঁচ পেলে হয়ত আঁতুড় ঘরেই সদ্যোজাতর গলা টিপে মারতেন। সেই ইংরেজ রাজপুরুষের নাম অক্টাভিয়ান হিউম। ১৮৮৫ সালে তৎকালীন বড়লাটবাহাদুরের স্নেহাশীর্বাদ নিয়ে একটা ভদ্রলোকের দল গড়লেন হিউম। ওঁর উদেশ্যটা মহৎ ছিল। তিনি এমন একটা দল গড়লেন যার লক্ষ্য হলো এদেশের ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত সমাজের প্রতিবাদ শোভন খাতে বহমান রাখা, যাতে ভবিষ্যতে ইংরেজ সরকারের সংগে কথাবার্তার মাধ্যমে বোঝাপড়া করা যায়। আসলে কংগ্রেস নামে দলটা যেন আন্দোলনকারীর ভূমিকা না নেয় সেটা দেখাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিউমের।

দেশের সেই রাজনৈতিক দৃশ্যপটে গান্ধীজীর আবির্ভাব হলো। সেই সময় কংগ্রেস যথার্থই শিক্ষিত ভদ্রলোকের দল ছিল। দলকে সক্রিয় গণ-আন্দোলনমুখী করতে গান্ধীজী তাঁর অহিংস আন্দোলনের কর্মসূচি দিলেন। ১৯২০ সালের কলকাতা অধিবেশনে বিপুল ভোটাধিক্যে সেই কর্মসূচি গৃহীত হলো। শুধু তাঁর কর্মসূচি নয়, মানুষটাকেও সেদিন মেনে নিয়েছিল সবাই। সেই থেকে আমৃত্যু গান্ধীজীই হয়ে রইলেন কংগ্রেস দলের বিবেক, তার পথের দিশারী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদী নায়ক।

দেশজোড়া হরতালের মতন গান্ধীজীর আর একটা চমকপ্রদ গণবিদ্রোহের ডাক হলো অসহযোগিতা। এককথায় এই রাজনৈতিক বিদ্রোহের পটভূমিও ছিল সহজ, অনাড়ম্বর। গান্ধীজী ঘোষণা করলেন যে এখন থেকে ভারতীয়রা সবরকম বিলিতিয়ানা বর্জন করবে। তারা বিলিতি জামাকাপড় পরবে না, ইংরেজের ইস্কুলে পড়তে যাবে না, তাদের তৈরি আদালতে মামলা দায়ের করবে না উকিলবাবুরা, ইংরেজের দপ্তরে কাজ করতে যাবে না, ইত্যাদি। এমন কি সৈনিকরাও ইংরেজের সেনাবাহিনী বর্জন করবে। তাদের দেওয়া সাম্মানিক মেডাল বা উপাধি ফেরত দেবে। গান্ধীজী নিজেই পথ দেখালেন। বুয়র যুদ্ধে আহতদের সাহায্যের জন্যে পাওয়া মেডাল দুটো বড়লাটের হাতে ফেরত দিয়ে এলেন।

মোটকথা, গান্ধীজীর লক্ষ্য হলো ভারতে ব্রিটিশ শাসনের শক্ত ভিতের সৌধটা নড়বড়ে করে দেওয়া। এ কাজটা করতে হবে অর্থনীতির স্তম্ভগুলো দুর্বল করে। তাই প্রথমে এখানেই আঘাতটা দিতে চাইলেন তিনি। তখন নামমাত্র দামে (derisory prices) দিশি তুলো কিনে ল্যাংকাশায়ারের কাপড়ের কলে পাঠানো হতো। কলে

অবসরকালীন অন্ত পাওনাগণ্ডার সবটাই মিটিয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া ভারতে বসবাসকারী তৎকালীন অনেক ইংরেজই ডায়ারের এই বীরোচিত কাজটাকে সমাদর করে। যাতে তাঁর টাকাপয়সার টানাটানি না হয় তাই ইংরেজ ক্লাবগুলো থেকে টাকা তুলে ডায়ারের হাতে দেওয়া হয়। এই চাঁদার পরিমাণ একটুখানি নয়, ছাব্বিশ হাজার পাউণ্ড। বিপুলই বলা চলে।

www.pathagar.com

তৈরি সেইসব পণ্য আবার ভারতের বাজারেই দ্বিগুণ দামে বিক্রি হতে তা এই পরিবর্তন যে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের একটা ক্লাসিক দৃষ্টান্ত, গান্ধীজী তা বুঝেছিলেন। কিন্তু যে অস্ত্রটা হাতে নিয়ে তিনি এতবড় চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নামলেন, সেটা অতি নগণ্য একটা সেকেলে যন্ত্র, চরকা। সুতো কাটার এই প্রাচীন কেঠো যন্ত্রটা হাতে নিয়ে তিনি শিল্পবিপ্লবের সার্থক ফল কাপড়ের কলগুলোর বিরোধিতা করতে নামলেন। আপাতচোখে ব্যাপারটা অর্বাচীন মনে হলেও গান্ধীজী অসফল হন নি।

পরবর্তী পঁচিশ বছর প্রায় নাছোড়বান্দার মতন গান্ধীজী তাঁর প্রতিজ্ঞায় অটল রইলেন। মিলের তৈরি পরিপাটী কাপড়জামার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামলেন খাদির মোটা কাপড় নিয়ে। গান্ধীজী এখন গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে গ্রামগুলোর হতশ্রী অর্থনীতির জন্য দায়ী অধঃপতিত গ্রামীণ শিল্প। সুতরাং চরকাই কুটীর শিল্পের নবজাগরণ আনবে। তখন দরিদ্র গ্রামগুলোর অর্থনীতি চাঙ্গা হবে এবং সেই সঙ্গে শহরের মানুষও দিনে একবার সুতো কেটে শ্রমের বিনিময়ে আধ্যাত্মিক মুক্তির সাধনা করবে। এইভাবেই শহরের মানুষ আসল ভারতবর্ষকে নিত্য স্মরণ করবে।

চরকার ঘূর্ণায়মান চাকার মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছিল গান্ধীজীর প্রিয় ধারণাগুলো। তাঁর নীতিগুলো উদ্ভাসিত হয়েছিল চাকার আবর্তনে। এই চাকার সঙ্গেই জড়িয়ে রেখেছিলেন গ্রামের মানুষের কদাচার আর কুঅভ্যাসগুলোর বিরুদ্ধে তাঁর ধর্মযুদ্ধ। কিভাবে মলত্যাগের জন্যে পায়খানা ব্যবহার করতে হয়, কিভাবে কিভাবে পরিচ্ছন্ন আর স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন করে রোগের আক্রমণ ঠেকাতে হয়, শিশু-কিশোরদের মধ্যে কিভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা প্রচার করতে হয়, ইত্যাদি আচরণগুলো চরকার দ্বারাই তিনি গ্রামের মানুষদের শেখাতেন। এককথায় ভারতবর্ষের গ্রামীণ জীবনের সর্বস্তরে নবজীবন আনাই ছিল গান্ধীজীর লক্ষ্য। দিনে অন্তত আধঘণ্টা সময় তিনি এই কাজে ব্যয় করতেন। তকলিতে নিত্য সুতো কাটা প্রায় ধর্মাচরণ হয়ে উঠেছিল গান্ধীজীর দৈনন্দিন জীবনে। প্রার্থনা আর জপের মধ্যে সময় ভাগ করে নিতেন গান্ধীজী। চরকার ক্রিক্ ক্রিক্ শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে গান্ধীজী মনে মনে জপ করতেন 'রাম, রাম, রাম।'

১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধীজী তাঁর প্রচারের অন্তিম লগ্নে ঘোষণা করলেন যে বাকি জীবন চরকায় কাটা সুতোর মোটা কাপড় আর উত্তরীয় ছাড়া আর কোন পোশাক পরবেন না। তাঁর দেখাদেখি অনুগামীরাও খাদির পোশাক পরতে শুরু করলো। দেখতে দেখতে ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে খদ্দরের মোটা ধুতি আর উড়ানি হয়ে উঠলো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একমাত্র পোশাক আর গান্ধীজীর চরকা হয়ে উঠলো অহিংস বিপ্লবের প্রতীক। দীর্ঘদিনের জড়তা আর নিষ্ক্রিয় উদাসীনতার গ্লানি কাটিয়ে যেন ধড়মড় করে জেগে উঠলো এই উপমহাদেশ। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটা স্পর্ধা ছুঁড়ে দিল সদ্য জেগে ওঠা একটা জাতি।

শুরু হলো গান্ধীজীর পদযাত্রা। চলার পথে কখনও থকথকে কাদায় গোড়ালি ডুবে গেছে, কখনও উপলাকীর্ণ রাস্তায় হাঁটার সময় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে তাঁর পা। কিন্তু পথচলা কখনও থামে নি। রেলগাড়িতে থার্ড ক্লাস কামরায় কাঠের বেঞ্চির ওপর বসে কেটে গেছে কত বিনিদ্র রাত। এমনিভাবে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন গান্ধীজী। দেশের মানুষকে বুঝিয়েছেন তাঁর অহিংসা

www.pathagar.com

রিমর্ম। সে সময় সারা দেশের বেশ কয়েক হাজার গ্রাম তিনি ঘুরে দেখেন দিনে অন্তত পাঁচ-ছয়বার বক্তৃতা দিয়ে লোককে তাঁর নীতির কথা বোঝান।

সে এক বিরল দৃশ্য। কোমরে একখন্ড ন্যাকড়া জড়ানো একজন শীর্ণ মানুষ খোলা গায়ে আগে আগে পথ হাঁটছেন। নাক থেকে কখন খুলে পড়েছে সরু বাঁশ-পাতা দিয়ে বাঁধা চশমাটা, খেয়াল নেই। তাঁর পিছনে পিছনে চলেছে খোলা গায়ে সাধারণ গ্রামবাসী এবং তাঁর অনুগামীরা। মাথার ওপর বয়ে নিয়ে চলেছে সচল মলমূত্রাগার যেন সেটা বিজয়োৎসবের ট্রফি। গ্রামের সুস্বাস্থ্য সম্বন্ধে গান্ধীজী যে কত নিবিড়ভাবে চিন্তা করতেন, এ তারই নিদর্শন।

গান্ধীজীর এই মুক্তিযুদ্ধ দারুণ সফল হয়েছিল। তখন 'মহাত্মা' হয়ে সর্বত্র সমাদর পাচ্ছেন তিনি। গ্রামে ঢুকলেই লোকে তাঁকে দেখতে ছুটতো। তাঁর স্বেচ্ছা দারিদ্র্য, সহজ অনাড়ম্বর জীবনযাপন, সাধুসুলভ আচরণ ইত্যাদির জন্যে সবাই তাঁর দর্শনের জন্যে ছুটতো। লোকজনের ধারণা হয়েছিল গান্ধীজী বুঝি সামান্য মানুষ নন। তিনি ঐশী শক্তিসম্পন্ন একজন অবতার স্বরূপ। দেশ ও জাতির মুক্তির জন্যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন।

শহরে গিয়ে গান্ধীজী বোঝাতে লাগলেন যে ভারত যদি 'স্বায়ত্তশাসন' পেতে চায় তবে তাকে স্বাবলম্বী হতে হবে। সব রকম বিদেশী দ্রব্য বর্জন করতে হবে। স্বেচ্ছাসেবীদের বললেন তারা যেন গা থেকে বিদেশী পোশাক খুলে তাঁর পায়ের কাছে জমা করে। দেখতে দেখতে ধস নামার মতন বিদেশী পোশাকের স্তূপ জমা পড়তে লাগলো। গান্ধীজী খুশী হলেন যেদিন বিবস্ত্র মানুষ সব পরিধেয় খুলে শুধু কৌপীন সার হয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। তাঁর মুখের হাসির কিরণ দেখে খুশী হলো তাঁর অনুগামীরা। গান্ধীজী আদেশ দিলেন 'আগ লাগাও।' দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো 'মেড ইন ইংল্যান্ড' মার্কা পোশাক-আশাক।

বলাবাহুল্য এতবড় ঘটনায় ব্রিটিশ সরকারের প্রতিক্রিয়া হলো হিংস্র। গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করে তাঁকে শহিদ করতে না চাইলেও কান্ডজ্ঞানহীনের মতন তাঁরা অনুগামী-দের গ্রেপ্তার করতে লাগলো। সারা দেশে তিরিশ হাজার স্বেচ্ছাসেবী গ্রেপ্তার করলো ইংরেজ সরকার। পুলিশ দিয়ে তারা মিটিং, সমাবেশ ভাঙলো, কংগ্রেস আপিসগুলো তছনছ করলো। ১৯২২ সালের তৃলা ফেব্রুয়ারি তারিখে গান্ধীজী এক চরমপত্র দিলেন বড়-লাটকে। চিঠিতে বললেন যে এরপর প্রতিবাদ আরও তীব্র হবে সারা দেশ জুড়ে শুরু হবে অসহযোগ। গান্ধীজী বললেন এখন থেকে সারা দেশের মানুষ আইন অমান্য করবেন। বস্তুত সেটাই ঘটলো। ইংরেজ সরকারের আইন অমান্য করতে বললেন গান্ধীজী। কৃষককে বললেন কর দেওয়া বন্ধ করতে, শহরবাসীদের বললেন আইন ভাঙতে, সেনাবাহিনীর লোকদের বললেন ইংরেজের রাজানুগত্য অস্বীকার করতে। এই-ই হলো গান্ধীজীর অহিংস বিপ্লবের ডাক। ভারতের ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রহীন সংগ্রামের আহ্বান। গান্ধীজী সাবধান করে বললেন, 'ইংরেজ সরকার আমাদের মেসীনগান-এর লড়াইতে নামাতে চাইছে। কারণ ওদের হাতে যে আগ্নেয়াস্ত্র আছে আমাদের হাতে তা নেই। তাই ওদের এমন যুদ্ধে প্ররোচিত করতে হবে যে যুদ্ধে ওরা নিরস্ত্র কিন্তু আমরা নিরস্ত্র নই। তেমন লড়াই না হলে ওদের আমরা হারাতে পারবো না।'

গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার দেশবাসী কারাবন্দী হলো। বোম্বাইয়ের অবরুদ্ধ গভর্নর বললেন, 'পৃথিবীর ইতিহাসে এতবড় পরীক্ষা প্রায়

www.pathagar.com

সফল হতে চলেছে।' কিন্তু এতবড় পরীক্ষা সফল হলো না। উত্তরপ্রদেশের এক অখ্যাত গ্রামে হঠাৎ হিংসার আগুন জ্বলে উঠলো। গান্ধীজী হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং কংগ্রেস দলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আন্দোলন তুলে নিলেন কারণ তিনি বুঝতে পারলেন দেশের মানুষ অহিংস আন্দোলনের জন্যে তখনও তৈরি হয় নি।

ব্রিটিশ সরকার ঠিক এই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিল। যখনই তারা বুঝলো যে আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা করে গান্ধীজী আর বিপজ্জনক নন, তখনই তাঁকে গ্রেপ্তার করলো। গান্ধীজী ধরা পড়লেন এবং রাজদ্রোহের অপরাধ স্বীকার করলেন। আদালতে দাঁড়িয়ে মর্মস্পর্শী আবেদনে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রার্থনা করলেন। জজসাহেব তাঁকে ছ'বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিলেন এবং পুণের কাছে যারবাদা জেলে তাঁকে বন্দী করে রাখা হলো। বিচারাদেশ শুনে গান্ধীজীর মনে কোন খেদ হয়নি। পরবর্তীকালে তিনি লিখেছিলেন 'জেলে গিয়ে বা ফাঁসির দড়িতে ঝুলেই যথার্থ স্বাধীনতা আনা যায়। আদালতঘরে বা কাউন্সিল এসেম্বলিতে কিংবা ক্লাসরুমে দাঁড়িয়ে লেকচার দিয়ে দেশ স্বাধীন করা যায় না।

অসুস্থতার জন্যে মেয়াদ ফুরোবার আগেই গান্ধীজী মুক্তি পেলেন। মুক্তি পেয়ে সারা দেশ ঘুরে বেড়ালেন তিনি। তিন বছর ধরে অসংখ্য রচনায় দেশের মানুষকে তাঁর অহিংস নীতির কথা বোঝালেন। তখন তাঁর একমাত্র চিন্তা আবার যেন হিংসান্মোত্ত হয়ে না ওঠে মানুষ। ক্ষেত্র প্রস্তুত হলো। ১৯২৯ সালের শেষ মাসের শেষ দিনের মধ্যরাতে লাহোর কংগ্রেসের অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজের প্রতিশ্রুতির কথা ঘোষণা করলেন। এই ঘোষণার ঠিক ছাব্বিশ দিন পরে অর্থাৎ ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারি তারিখে সারা দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ এই সঙ্কল্প গ্রহণ করলো।

এই নতুন পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার আর গান্ধীজীর মধ্যে বিবাদ অনিবার্য হয়ে উঠলো। গান্ধীজী তখন আকুলভাবে অপেক্ষা করছেন 'আত্মিক বাণী' শোনার জন্যে। সেই ইনার ভয়েস বা আত্মিক বাণীই তাঁকে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সংঘাতের পথ দেখাল। তাঁর অসাধারণ প্রতিভার এক নিপুণ ফল এই 'ইনার ভয়েস' বা ইন্‌স্টিংকট। অর্থাৎ সহজাত বুদ্ধির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে গান্ধীজী তাঁর পথের হদিস পেয়েছিলেন সেদিন। অথচ কত সহজ, সরল এই পথ। ফলে প্রায় রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন তিনি। কিন্তু যে বস্তুটি কেন্দ্র করে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে বিবাদ ঘনিয়ে উঠলো সেটি অত্যন্ত তুচ্ছ। এই তুচ্ছ বস্তুর ব্যবহার ইন্দ্রিয় সংযমের জন্যে অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছিলেন গান্ধীজী। তাঁর প্রতিবাদের বুনিয়াদ গড়ে উঠলো যে দ্রব্যটি নিয়ে তা হলো লবণ। গান্ধীজী লবণ আইন অমান্যের আন্দোলন শুরু করলেন।

কিন্তু গান্ধীজী জোর করে লবণ খাওয়ার অভ্যাস ছাড়লেও গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এর ব্যবহার জোর করে ছাড়া যায় না। পাতে নুন না থাকলে কোন খাদ্যই রুচিকর হয় না। আলুনি খাদ্যবস্তু গলা দিলে নামে না। প্রকৃতির দান এই লবণের দ্রব্যগুণ অসামান্য। অনাদি অনন্ত লবণাম্বুরাশির এই অকৃপণ দান সমুদ্রের তীরে যত্রতত্র পড়ে থাকে। কিন্তু সমুদ্রতীরের গরিব মানুষও সেই লবণ খেতে পারে না। লবণ তৈরি করে সরকার এবং ট্যাক্স বসিয়ে তা বাজারে বিক্রি করে। দরিদ্র মানুষকে ট্যাক্স দিয়ে লবণ কিনতে হয়। অবশ্য লবণের ওপর বসানো ট্যাক্সের পরিমাণ সামান্য, কিন্তু সামান্য হলেও একজন গরিব চাষীর দু হপ্তার মজুরীর সমান।

www.pathagar.com

১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ তারিখে ভোর সাড়ে ছ'টায় শুরু হলো গান্ধীজীর লবণ আইন অমান্য অভিযান। হাতে লম্বা বাঁশের লাঠি, পিঠটা সামান্য নোয়ানো, পরনে এক ফালি কাপড়—এই-ই হলো তাঁর পোশাক। আমেদাবাদের সবরমতী আশ্রম থেকে ৭৯ জন আশ্রমবাসী নিয়ে গান্ধীজী অভিযানে বেরোলেন। তাঁর লক্ষ্য হলো দীর্ঘ দুশ' একচল্লিশ মাইল দূরবর্তী আরব সাগরের তীরে অবস্থিত ডান্ডি শহরে পেঁছনো। সেদিন আমেদাবাদ শহরের অসংখ্য মানুষ রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে এই আশ্চর্য অভিযান দেখলো। শহরের সারা পথটুকু সবুজ পাতা আর ফুলের মালায় ছেয়ে দিয়েছিল তারা।

শুধু আমেদাবাদ শহর নয়, সারা পৃথিবী থেকেই দলে দলে সাংবাদিক এল এই বিস্ময়কর পদযাত্রা দেখতে। যে পথ দিয়ে তিনি চলেছেন তার দুপাশে উৎসাহী ভক্তের দল হাঁটুমুড়ে বসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। গান্ধীজীর পদযাত্রার মন্থর গতি অত্যন্ত বিড়ম্বিত মনে হয়েছিল ইংরেজ সরকারের কাছে। ইংরেজ সাংবাদিকরা প্রচার করলো সরকারকে অধৈর্য করতে গান্ধীজী স্বেচ্ছায় মন্থর গতিতে হাঁটছেন। চ্যাপলিনের মতন ছোটখাট মানুষটাকে ঘিরে আছে এমন এক রহস্যময়তা তা প্রায় দুর্ভেদ্য। বাঁশের লাঠিতে ভর দিয়ে কোলকুঁজো এক অর্ধনগ্ন বৃদ্ধ ক্রমাগত পথ হেঁটে চলেছেন শক্তিধর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ জানাতে। দিনের পর দিন এই ভাবমূর্তিটাই সারা জগতের কাছে প্রচার হয়ে গেল সংবাদপত্রের মারফত। সংগঠিত হলো এক অভূতপূর্ব গণজাগরণ।

১৯৩০ সালের ৫ই এপ্রিল। দলবল নিয়ে গান্ধীজী এসে পেঁছলেন আরব সাগরের তীরে ডান্ডি শহরে। সে রাতটা সবাইকে নিয়ে গান্ধীজী প্রার্থনা করলেন। পরদিন খুব ভোরে সমুদ্রে স্নান করলেন তাঁরা। এই স্নানানুষ্ঠান দেখলো কয়েক হাজার উৎসুক দর্শক। স্নানপর্ব শেষ হলে গান্ধীজী তীরে উঠলেন এবং হাতে তুলে নিলেন একটা লবণের ঢেলা। তারপর নিষিদ্ধ সেই ঢেলাটি তুলে অপেক্ষমান জনতাকে দেখালেন। তখন তাঁর সারা মুখমণ্ডল আত্মপ্রত্যয় দৃঢ় হয়ে উঠেছিল। সূর্যের প্রথম আলোয় ঝকমক করে উঠলো হাতে ধরা লবণখণ্ডটা। প্রকৃতির এই দান মানুষের আইনে নিষিদ্ধ হলেও প্রথম আলোয় স্নাত হয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নতুন প্রতীকচিহ্নরূপে উন্মোচিত হলো।

সাতটা দিনও কাটলো না। সারা ভারত উদ্বেল হয়ে উঠলো এই গণজাগরণে। সমস্ত দেশ জুড়ে গান্ধীজীর শিষ্যরা তখন লবণ সংগ্রহ ও বন্টনে মেতে উঠেছে। বিলি হচ্ছে ছাপানো প্রচারপত্র কিভাবে লবণ তৈরি করতে হয়। শুধু লবণ সংগ্রহের অভিযান নয়। সেই সঙ্গে চললো বিদেশী বস্ত্র পোড়ানোর উৎসব। সব বড় বড় শহরের রাজপথে দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগলো বিদেশী পোশাক। বিদেশী সরকারও চুপচাপ বসে থাকলো না। অধিকার সাব্যস্ত করতে তারা হাজারে হাজরে অহিংস সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার করলো। স্বেচ্ছাসেবীদের সঙ্গে গান্ধীজীও গ্রেপ্তার হলেন। তবে যারবাদা জেলে যাবার আগে অনুগামীদের উদ্দেশে তিনি গোপনে একটা বার্তা পাঠাতে পেরেছিলেন। কারাবরণের আগে সেটাই তাঁর শেষ বার্তা। অনুগামীদের উদ্দেশে গান্ধীজী বললেন, 'অহিংস সত্যাগ্রহীদের হাতের মুঠোর মধ্যে ধরা এই লবণের টুকরোগুলোই ভারতের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনবে। এই-ই হবে দেশের হারিয়ে যাওয়া মর্যাদার শেষ প্রতীক। হয়ত শাসকের অত্যাচারে মুঠিগুলো ভেঙে যাবে, তবুও মুঠি থেকে লবণের টুকরো খুলে পড়বে না।'

www.pathagar.com

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭—লণ্ডন।

তিনশ' বছর ধরে ইংল্যাণ্ডের সংসদ ভবনের চার দেওয়াল প্রতিধ্বনিত হয়েছে মুষ্টিমেয় কিছু সভ্যের স্বেচ্ছাচারী হুকুমনামায়। বলতে কি সংসদ ভবনের এই ক'জন সভ্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাগ্য নিরূপণ করে এসেছে এতকাল। এরাই ছিল সাম্রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এদের তৈরি করা সিদ্ধান্তগুলোই ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা প্রায় পঞ্চাশ কোটি হতভাগ্য মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। আর এদেরই চাতুরালিতে তিনশ' বছর ধরে ইউরোপের সাদা চামড়ার খ্রীশ্চানরা প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হয়ে দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করেছে। মাথায় চড়ে বসেছে তিন চতুর্থাংশেরও বেশি ভূখণ্ডের মানুষের।

এতকাল যাদের মুখের দাপটে মুখর থাকতো ইংল্যাণ্ডের হাউস অব কমন্স্, এখন তারাই বিমর্ষ হয়ে বসে আছে তাদের নেতার মুখ থেকে বিশাল এই সাম্রাজ্যের অন্ত্যেষ্টির কথা শোনার অপেক্ষায়। বিশাল আয়তনের সাম্রাজ্যের মতনই চেহারা তাদের নেতার। শোকের পোশাক কালো ওভারকোট পরা এই বিরোধী নেতার নাম উইন্সটন চার্চিল। মানুষটার আগের সেই দাপট আর নেই। কর্তৃত্ব অনেক খর্ব হয়েছে তাঁর। অথচ এঁরই দাম্ভিক কণ্ঠস্বর বিগত চার দশক ধরে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী স্বপ্নের রূপরেখা প্রণয়ন করেছে। গত একটা দশক এই মানুষটিই ইংল্যাণ্ডের বিবেক নির্মাণ করে এসেছেন। দেশটাকে সাহস যুগিয়েছেন।

এক বিরল অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ হলেন উইন্সটন। তবুও তাঁর অনেক সিদ্ধান্তের মধ্যেই একটা জেদী, একরোখা ভাব থাকতো। এতবড় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্রই তাঁর আসন গৌরবময় ছিল। এর ফলে একটা প্রচ্ছন্ন গর্ববোধ ছিল তাঁর। কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই আত্মম্ভরি মানুষটারই অন্যরকম আবেগ ছিল। ভারতবর্ষকে একটু অন্য চোখে দেখতেন তিনি। পদানত অন্য দেশগুলো সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবের সঙ্গে যেন এর তুলনা হয় না। চার্চিলের ভারতপ্রেমের চরিত্র একটু অন্যরকম ছিল। কিছুটা অপ্রাকৃত বন্য ছিল এই প্রেম। প্রথম ভালবাসা যেমন উদ্দাম বন্য হয় তেমনি। যখন এদেশে প্রথম আসেন, তখন তিনি যুবক। রানীর নিজস্ব অশ্বারোহী বাহিনীর একজন সামান্য সেনানী (সবল্টার্ন্) হয়ে তিনি প্রথম এদেশে আসেন। এখানে এসে ধুলোভরা মাঠে ঘোড়া ছুটিয়ে তিনি পোলো খেলেছেন। বনে বনে বাঘ, শুয়োর ধাওয়া করে বেড়িয়েছেন। খাইবার গিরিপথে আরোহণ করে পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। শুধু দেশ নয়, এখানকার অনুগত-দেরও ভালবাসতেন তিনি। এদেশ ছেড়ে যাবার একচল্লিশ বছর পরেও তাঁর কাছে মাত্র দুবছর চাকরি করা একজন বেয়ারাকে প্রতি মাসে দুপাউণ্ড করে মাসহারা পাঠাতেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে চার্চিলের আসল মনোভাবের অনেকটাই প্রকাশ হতো তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে। তাঁর কাছে ভারতবর্ষ ছিল এক দামাল শিশুর মতন। তাই শক্ত অভিভাবকের মতনই তাকে শাসন করতে চাইতেন তিনি।

যে সাম্রাজ্যবাদের খোয়াব চার্চিল দেখতেন তাতে কোন ভাঙচুর ছিল না। তাঁর অটুট বিশ্বাস ছিল যে বিশ্বে ব্রিটেনের যথার্থ স্থানটি নির্ণয় করছে তার সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদের আয়তন যত ব্যাপক হবে ততই ছড়িয়ে পড়বে ব্রিটেনের

www.pathagar.com

শ্রেষ্ঠত্ব। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ যে 'নীচ কুলোদ্ভব এবং অসভ্য' এইরকম একটা অর্বাচীন ধারণা তাঁর ছিল। ভিক্টোরীয় যুগের গোঁড়া মনোভাব থেকে তাঁর এই ধারণা হয় যে, ইংরেজের শাসনে এদেশের মানুষরা অনেক স্বস্তি এবং শান্তিতে বাস করছে। ইংরেজ চলে গেলে অন্ত্যজ অসহায় ভারতবাসী একদল অত্যাচারী শাসকের হাতে নিগৃহীত হবে। বিশ্বের যাবতীয় সমস্যা নিয়ে তাঁর মতামত সুস্পষ্ট হলেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি দৃষ্টিহীন অন্ধ ছিলেন। ভারতবাসীর স্বার্থেই যে এদেশে ইংরেজ শাসন কায়েম হয়েছে এবং যতদিন এই শাসন থাকবে ততদিনই এ দেশবাসীর মঙ্গল, এইরকম একটা আত্মম্ভরি প্রত্যয় কিছুতেই তাঁর মন থেকে নড়ানো যায়নি। তাঁর ধারণা যে এই জন্যেই এদেশের সাধারণ মানুষ ইংরেজ সরকারকে এত সমীহ করে এবং যারা এদের নেতাগিরি করছে তারা কেউ সৎ নয়। এরা সবাই ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির মানুষ, অর্ধশিক্ষিত এবং অপদার্থ। তাই সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কোন প্রতিফলনই এদের কথায় ও কাজে ফুটে ওঠে না। চার্চিলের ভারতবর্ষ জানাটা অনেকটা অন্ধের হস্তিদর্শনের মতন অসম্পূর্ণ। সেই বস্তুটা ঠিক কেমন তার কিছুটা আঁচ পাওয়া চার্চিল সরকারের সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার এক অম্লকষায় মন্তব্য থেকে। ভদ্রলোক একদা বলে-ছিলেন, 'চার্চিলের ভারত চেনাটা অনেকটা সম্রাট তৃতীয় জর্জের মার্কিন কলনি চেনার মতন।'

১৯১০ সাল থেকেই ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার সবরকম প্রচেষ্টা জোর করে বাধা দিয়ে এসেছেন চার্চিল। এমনকি গান্ধীজী এবং তাঁর কংগ্রেসী সাঙ্গোপাঙ্গদের 'খড়ের মানুষ' বলে অবজ্ঞাও করে এসেছেন তিনি। সেদিন কমন্সসভায় বসে চার্চিল যখন শুনলেন যে দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটের উত্তরসূরী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গ্রন্থিমোচন করতে উদ্যোগ নিয়েছেন, তখন রাগে দুঃখে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলেন চার্চিল। ১৯৪৫ সালের নির্বাচনে হেরে গেলেও লর্ডস সভায় তখনও তাঁর রক্ষণশীল দল সংখ্যাগরিষ্ঠ। ইচ্ছে করলে অন্তত আরও দুবছর ভারতবর্ষের স্বাধীন হবার সাধ পিছিয়ে দিতে পারেন। সে ক্ষমতা তাঁর আছে। কিন্তু তখনই কোন প্রতিক্রিয়া দেখাতে চাইলেন না চার্চিল। শুধু রাগে ক্ষোভে অতবড় মুখখানা গনগনে আঁচের মতন লাল হয়ে উঠলো। তিনি বসে রইলেন ওই মিতব্যয়ী সোশ্যালিস্ট উত্তরাধি-কারীর শেষ কথাটা শোনার জন্যে।

ক্লিমেন্ট এ্যাটলীর হাতে যে ঘোষণাপত্রটা রয়েছে তা খুবই সংক্ষিপ্ত। প্রধানত লুই মাউন্টব্যাটেনের নিজের হাতে লেখা নোটটাই তিনি এখন পড়বেন। ঘোষণাপত্রে মাউন্টব্যাটেনের ভাইসরয় পদে নিয়োগ এবং ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে ব্রিটেনের ভারত ছাড়ার কথাবার্তা নিয়ে নির্দেশাদি আছে। এ্যাটলী নিজে নোটটার যে খসড়া করেছিলেন তা বেশ বড়। মাউন্টব্যাটেন সাহস করে বড় নোটটা প্রয়োজনমত কাটছাঁট করে ছোট করেছেন। এ্যাটলী সেটাই পড়বেন। দিল্লি গিয়ে মাউন্টব্যাটেন কিভাবে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে কথাবার্তা বলবেন এবং আলোচনা ব্যর্থ হলে সেই অচলাবস্থায় কি ব্যবস্থা নেবেন তারই নির্দেশ আছে নোটের মধ্যে। নোটটা এইভাবে সংশোধন করতে প্রায় ছ'সপ্তাহ ধরে এ্যাটলীর সঙ্গে প্রায় হাতাহাতি করেছেন মাউন্টব্যাটেন।

অবশেষে ঘোষণাপত্র হাতে নিয়ে এ্যাটলী উঠে দাঁড়ালেন। চড়া ঠাণ্ডায় হিম হয়ে যাওয়া সাংসদরা নড়েচড়ে বসলেন যখন ঐতিহাসিক-ঘোষণাপত্র পড়া শুরু হলো।

www.pathagar.com

এ্যাটলী বললেন, 'হিজ ম্যাজেস্টিস্ গভর্নমেন্টের স্পষ্ট অভিপ্রায় হলো যে, ১৯৪৮-এর জুন মাসের আগেই ভারতের যোগ্য এবং দায়িত্বশীল নেতাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা শুনে সারা কমন্স সভা যেন পাথর হয়ে গেল। সেই থমথমে নৈশঃব্দের মধ্যে কেউ যেন বুঝতে চাইছিল না যে এটা ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ এবং ব্রিটেনের অকপট প্রতিশ্রুতি পালন। আসলে সবারই মন শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল এই ভাবনায় যে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজের মেয়াদ আর মাত্র চোদ্দ মাস এবং এই ক'টি মাস পরেই ইংরেজ জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শেষ হতে চলেছে। বিলেতের ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকাও পরদিন সকালে যে কথাটা লিখলো তারই শুরু হতে চলেছে তখন। ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান লিখেছিল, 'ইতিহাসের একটা প্রকাণ্ড দায়মুক্তি' এই ঐতিহাসিক ঘোষণা।

অবশেষে বিরোধী দলের প্রতিবাদ জানাবার সময় এল। টিপির মতন বসে থাকা স্থূল চেহারার মানুষটা দাঁড়িয়ে উঠলেন। সাম্রাজ্যরক্ষার শেষ চেষ্টা করলেন স্থূলকায় বিরোধী নেতা উইন্সটন চার্চিল। চার্চিলের এই স্বতঃস্ফূর্ত শেষ ভাষণটাও ঐতিহাসিক। শীতে এবং আবেগে মানুষটি ঈষৎ কাঁপছেন। তবুও নির্ভীক স্বরে চার্চিল বললেন, 'যুদ্ধের সময় ইংল্যাণ্ডের যে উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছিল সেটাই কাজে লাগিয়ে বর্তমান সরকার তার অকর্মণ্যতার অপমান ঢাকবার চেষ্টা করছে।' চার্চিল আরও বললেন যে, ভারতকে স্বাধীনতা দেবার দিনক্ষণ স্থির করে এ্যাটলী যেন গান্ধীর এলোমেলো ভাবনাটাই শেষ পর্যন্ত মেনে নিলেন যে 'ঈশ্বরই ভারতের ভবিষ্যৎ দেখবেন।" চার্চিলের বক্তব্যের শেষটুকু ছিল আক্ষেপভরা। খেদ করে বললেন, 'গভীর দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে আমার সামনেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঝাঁপ পড়ে গেল। লোকচক্ষুর আড়ালে হারিয়ে গেল এত যত্নে তৈরি করা মানবসেবার মহিমা। শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে অনেকেই এর আগে ব্রিটেনকে সাহায্য করেছেন। কিন্তু আমরাই যখন আমাদের শত্রু তখন আর কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না......সুতরাং আমরা যেন হঠকারী হয়ে কোন চটজলদি সিদ্ধান্ত না নিই। অন্তত আমাদের দুঃখবোধের সঙ্গে যেন অপমানের খোঁচা না মেশাই।'

কিন্ত প্রতিষ্ঠিত বাগ্মীর এই শ্লেষ বিদ্রুপের সব আস্ফালনই অর্থহীন হলো। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য ইতিমধ্যেই ঢলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে। সূর্যের এই অনিবার্য অস্তগামিতা কিছুতেই ঠেকানো গেল না। তাই কমন্স সভায় যখন ডিভিশন বেল বেজে উঠলো তখন ইতিহাসের নির্দেশটাই মেনে নিল সবাই। ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের যবনিকাপাতের পাশেই রায় দিল কমন্স সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সভ্যরা।

অনুতাপীর জয়যাত্রা (২)

গান্ধীজী তাঁর দলবল নিয়ে যত গ্রামের ভিতরে যেতে লাগলেন ততই সাধারণ মানুষের সঙ্গে সহজ মেলামেশা কঠিন হতে লাগলো। প্রথম মুসলমান গ্রামের অপ্রত্যাশিত সাফল্যটাই যেন হেতু হয়ে দাঁড়ালো। গ্রামের মুসলমান নেতারা আগাম

www.pathagar.com

সতর্ক করে দিয়েছিল অগ্রবর্তী গ্রামের নেতাদের। তারা ভাবলো গান্ধীজীর এই পদযাত্রার লক্ষ্য হলো তাদের অধিকার হরণ করা। সুতরাং ব্যাপারটা তাদের কাছে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের মতন। তাই মহাত্মা এবং তাঁর মিশনের প্রতি তারা মোটেই সদয় দৃষ্টিপাত করলো না।

গান্ধীজীর যাত্রাপথে একটা ছোট পাঠশালা পড়ে। মুসলমান পড়ুয়ারা মৌলবী সাহেবকে ঘিরে গাছতলায় বসে পাঠ নিচ্ছিল। ওদের দেখেই গান্ধীজীর মুখখানা আনন্দে উদ্ভাসিত হলো। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে দিলেন বাচ্চাদের দিকে। যেন কোলে টেনে নেবেন সাধের নাতিদের। কিন্তু স্নেহাস্পদদের কাছে পৌঁছবার আগেই মৌলবী সাহেব দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে বাধা দিল। চোখ গরম করে বাচ্চাদের ঘরের মধ্যে যেতে বলে লোকটা গান্ধীজীর দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। বাচ্চাদের চোখেও অবুঝ ভয়। যেন বুড়ো লোকটা কোন ভূতপ্রেত। এখানে এসেছে তাদের খুন করতে। তাই ওঁকে দেখেই ছুটে পালালো তারা। গান্ধীজী স্তম্ভিত। মৌলবী সাহেবের কুঁড়ের কপাটের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। ঘরের মধ্যে বাচ্চাদের ছায়ামুখগুলো নড়াচড়া করছে। ওদের বড় বড় চোখের অবুঝ চাউনিতে কত কৌতূহল! ওদের দিকে চেয়ে হাত নাড়লেন গান্ধীজী। ডান হাত বুকে ছুঁয়ে 'সালাম' করলেন। কিন্তু একখানা কচি হাতও প্রতিনমস্কার করলো না। কেউ বললোনা 'আলেকুম সালাম' বিমর্ষ গান্ধীজী আবার শুরু করলেন পথচালা।

আরও ঘটনা ঘটলো। পথে একটা খাল পড়ে। খালে জল নেই, শুধু থকথকে পাঁক। একটা নড়বড়ে সাঁকো আছে পারাপার করার। দিন চারেক আগে কারা যেন বাঁশের ঠেকনোগুলো ভেঙে রেখে গেছে যাতে সাঁকো পেরোনোর সময় দলবল নিয়ে গান্ধীজী পাঁকের মধ্যে পড়ে যান। সৌভাগ্যক্রমে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায় এবং সাঁকোটা মেরামত করে বিপদ এড়ানো যায়। আর একদিনের কথা। সকালের দিকে গান্ধীজী পদযাত্রা শুরু করেছেন। বাঁশ আর নারকেল বাগানের ভিতর দিয়ে হাঁটছেন। বাগানের প্রতিটি গাছের গায়ে প্ররোচনামূলক নানারকম স্লোগান লেখা। গান্ধীজী দেখছেন আর পথ হাঁটছেন। কোনটার গায়ে লেখা 'ভণ্ডামি চলবে না, পাকিস্তান মেনে নাও', কোনটায় লেখা 'তোমার ভালর জন্যেই ফিরে যাও', ইত্যাদি।

কিন্তু এই ধরনের ভ্রষ্ট প্রচারে গান্ধীজী একটুও বিচলিত হলেন না। নির্বিবাদে পথ চলতে লাগলেন সবকিছু উপেক্ষা করে। বিনা প্রতিবাদে দৈহিক পীড়ন সহ্য করা বা বিপদের সামনে শান্ত থাকার শিক্ষা তাঁর আছে। অহিংস গান্ধীজীর এটাই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আসলে দক্ষিণ আফ্রিকার সেই দৈহিক পীড়নের ঘটনাটাই ক্ষীণদেহ গান্ধীজীকে সাহসী ও নির্ভীক করে তুলেছিল।

মোটকথা, স্কুলের ছেলেদের বিরূপ আচরণ কিংবা গ্রামের মানুষের নির্দয় শত্রুতা সত্ত্বেও গান্ধীজীর পদযাত্রা থমকে গেল না। তিনি নিঃশঙ্ক মনে গ্রামের পর গ্রাম পথ চলতে লাগলেন। এইভাবে পথ চলতে চলতে একদিন রাত হয়ে গেল। স্যাঁতসেঁতে জোলো রাত। এঁটেল মাটির পথ কাদায় পিছল হয়ে আছে। হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন গান্ধীজী আর তাঁর দলবল। গান্ধীজী দেখলেন মেঠো পথে ছড়িয়ে আছে ভাঙা কাঁচের টুকরো আর মানুষের বিষ্ঠা। বুঝলেন যে এই অপকর্ম করেছে কোন মুসলমান। হাতের লাঠি নামিয়ে রাখলেন বৃদ্ধ। তারপর গাছ থেকে চওড়া এবং পুরু একটা নারকেল পাতা ভেঙে নিজের হাতে কাঁচের

www.pathagar.com

টুকরো আর বিষ্ঠা সরিয়ে দিলেন। সেদিন সাতাত্তর বছরের এই ভগ্নস্বাস্থ্য হিন্দু বৃদ্ধ অপরের বিষ্ঠা পরিষ্কার করে এইভাবে পাপ ক্ষালন করলেন।

৭৭ বছরের এই বৃদ্ধ মানুষটির প্রায় সারা জীবনের একমাত্র শত্রু ছিলেন একজনই। ইংল্যাণ্ডের কমন্স সভার শ্রেষ্ঠ কুশলী বক্তা ছিলেন তিনি। কয়েক দশক ধরেই অজাতশত্রু গান্ধীজীর এই একমাত্র রাজনৈতিক শত্রুর নাম উইন্সটন চার্চিল। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে অনেক স্মরণীয় উক্তি করেছেন চার্চিল। সেগুলো একত্র করলে যে এক বিপুল আয়তনের গদ্য সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে গাঁথা হয়ে আছে তাঁর একটি উক্তি। বৃদ্ধ গান্ধীজী সম্বন্ধে তাঁর এই ঐতিহাসিক উক্তিটা তিনি ষোলো বছর আগে করেছিলেন গান্ধীজীকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'হাফ্ নেকেড ফকির।'

কিন্তু কেন? ঘটনাটা এইরকম। ১৯৩১ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি। দিনটা স্মরণীয় হয়ে আছে দুটো কারণে। নতুন দিল্লির ভাইসরয় ভবনের লাল পাথরের সিঁড়ির ধাপ দিয়ে উঠে আসছেন একজন ক্ষীণদেহ ছোটখাট মানুষ। একহাতে ধরা বাঁশের লম্বা লাঠি, অন্যহাতে সাদা উড়ানির খুঁট। লবণ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবার অপরাধে তখনও তিনি ইংরেজের কারাগারে বন্দী। কিন্তু বিলাসবহুল লাট ভবনে করুণাপ্রার্থী হয়ে তিনি আসেন নি। তিনি এসেছেন একজন ভারতবাসী হয়ে।

এক হাতের মুঠোয় লবণের দানা আর অন্যহাতে বাঁশের লাঠি ধরে গান্ধীজী যেন মন্দিরের দ্বার ভেদ করে বেরিয়ে এসেছিলেন সেদিন। অন্তত সেইরকমই মনে হয়েছিল এই বহুব্যাপ্ত আন্দোলনের জননেতাকে দেখে। এই অসাধারণ জনপ্রিয়তা দেখে বড়লাট লর্ড আরউইন কালবিলম্ব না করে গান্ধীজীকে মুক্তি দিলেন এবং আলোচনায় বসতে দিল্লিতে ডেকে পাঠালেন। তিনিই যে ভারতীয় জনগণের একমাত্র স্বীকৃত নেতা ইংরেজ রাজপুরুষ সেদিন তা বুঝেছিলেন। আরবদেশ, আফ্রিকা এবং এশিয়ান মুক্তিযুদ্ধের তিনিই প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা যিনি ইংরেজের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসতে সোজা চলে এসেছেন লাটভবনে।

আলোচনার পরিণাম যে অশুভ হবে তা আগেভাগেই টের পেয়েছিলেন চার্চিল। তাই মানুষটাকে অপদস্থ করতে রুচিহীন ভাষায় আক্রমণ করে বলেছিলেন, 'এককালের টেম্পল-ইন্-এর এই উকিলবাবুর চেহারাটা দেখলেই আমার গা ঘিনঘিন করে। এখন নাকি তিনি অর্ধনগ্ন পোশাকে রাজদ্রোহী ফকির সেজে সম্রাটের প্রতিনিধির সঙ্গে সমান মর্যাদা নিয়ে মিটমাটের কথাবার্তা বলতে লাটভবনে আসছেন।' এটা যে দুর্লক্ষণ চার্চিল তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন। সেদিন চার্চিল সবাইকে সাবধান করে বলেছিলেন যে, 'ভারতকে হারানোর এই ক্ষতি আমাদের কাছে মারাত্মক হবে। এমনকি এই লোকসান যে আমাদের দেশকে ক্ষুদ্র শক্তিতে নামিয়ে আনবে তাতেও কোন ভুল নেই।'

কিন্তু ভাবী অমঙ্গল নিয়ে চার্চিলের এত সতর্কতার কোন প্রভাবই পড়লো না গান্ধী-আরউইন আলোচনা সভায়। তিন সপ্তাহের মধ্যে মোট আটবার আলোচনা সভা বসলো। এই সুদীর্ঘ আলোচনার যে ফল হলো ইতিহাসে তারই নাম গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট। এই চুক্তির মূল বয়ান পাঠ করলে মনে হবে যেন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে দুই সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে। সেখানেই গান্ধীজীর জয়। চুক্তির বয়ান অনুযায়ী আরউইন রাজী হলেন হাজার হাজার বন্দীদের মুক্তি দিতে এবং

www.pathagar.com

গান্ধীজী রাজী হলেন আন্দোলন প্রত্যাহার করে লণ্ডনের গোল টেবিল বৈঠকে মীমাংসা আলোচনায় নতুন করে বসতে।*

চুক্তি সই হবার ঠিক দু'মাস পরে ব্রিটিশরা একদিন অবাক হয়ে দেখলো যে বাকিংহাম প্যালেসের গ্র্যান্ড স্টেয়ারকেসঃ দিয়ে পায়ে পায়ে উঠে আসছেন একজন দীন-বেশধারী ভারতীয়। তিনি আসছেন মহামান্য সম্রাটের চায়ের পার্টিতে যোগ দিতে। মানুষটার পরনে একটা নেংটি আর পায়ে চপ্পল। যিনি আসছেন তিনি সকলের মহাত্মা। তাঁকে দেখে মনে হলো যেন কীপলিঙ রচিত জীবন্ত চরিত্র 'গঙ্গা দীন'। পরে যখন গান্ধীজীকে তাঁর পোশাকের স্বল্পতার কথা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তখন গান্ধীজী মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'মহামান্য সম্রাট একাই যে পোশাকগুলো পরেছিলেন তা আমাদের দুজনের পক্ষেই যথেষ্ট ছিল।'

এই মিটিং ঘিরে যে প্রচার হয়েছিল তাকে লণ্ডনে তাঁর জনপ্রিয়তার মূল্যায়ন বলা যায়। গোলটেবিল বৈঠক সফল হয় নি করণ তখনই ভারতকে স্বাধীনতা দেবার কোনরকম ভাবনা-চিন্তা লণ্ডনের ছিল না। তবে 'কাজের কাজটা' হয়েছিল সভার বাইরে। ব্রিটিশ সংবাদপত্র এবং সাধারণ মানুষ গান্ধীজীর সহজ সরল অহিংস নীতির টানে প্রায় ভেসে যায়। এক গালে চড় খেয়ে অন্য গাল বাড়িয়ে দেবার অহিংস নীতি নিয়েই মানুষটা যেন শক্ত গাঁথনির সাম্রাজ্যবাদী ভিতটা নড়িয়ে দিয়েছিলেন সেদিন। সেদিন সবার অলক্ষ্যে এই বীজটাই রোপিত হয়ে যায় এবং এ কাজটা গান্ধীজী ছাড়া অন্য কেউ এত সফলভাবে সম্পন্ন করতেও পারতন না।

---

* সেদিন যে মানুষটা গান্ধী-আরউইন চুক্তির প্রত্যক্ষ সুফল পেল সে একজন শিখ ছাত্র। তার নাম গুরচরণ সিং। পিঠে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে প্রহরী তাকে লাহোর জেল থেকে বধ্যভূমিতে নিয়ে আসছে। শীতের সকাল। লম্বা টানা বারান্দা দিয়ে গুরচরণকে ফাঁসুড়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গুরচরণ জানে যে সেটাই তার জীবনের শেষ সকাল। কিন্তু বধ্যভূমির কাছাকাছি এসে হঠাৎ অনেক মানুষের পায়ের শব্দ পেল সে। তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে তাকাল। কি ব্যাপার? হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসছে লাহোর জেলের ইংরেজ জেলার মেজর মার্টিন। মার্টিনের হাতে নীল রঙের একটা কাগজ। গুরচরণকে পিছনে তাকাতে দেখে হাত নেড়ে উৎফুল্ল মার্টিন চেঁচিয়ে উঠলো, 'কনগ্র্যাচুলেশনস্'।

গুরচরণ স্তম্ভিত। এরা কি মানুষ! সে চলেছে মরতে আর এই অসময়ে জানোয়ারটা অমন মর্মান্তিক ঠাট্টা করছে! কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতন চেঁচিয়ে উঠলো গুরচরণ। বললো, 'তোমরা ইংরেজরা অমানুষ। এখুনি আমার ফাঁসি দেবে তোমরা। আর বলছো, 'কনগ্র্যাচুলেশনস্!'

ইংরেজ জেলার সজোরে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করলো। 'না, না, তা নয়! তারপর তার হাতের নীল কাগজখানা নাড়িয়ে বললো, 'দিল্লীতে নতুন চুক্তি সই হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী সব প্রাণদণ্ডাদেশ রদ হলো।' এই ঘটনার কয়েক হপ্তা পরেই গুরচরণ সিং মুক্তি পেল। মুক্তি পেয়েই তীর্থদর্শনে যাবার মতন গান্ধীজীর আশ্রম দর্শন করতে গিয়েছিল গুরচরণ। আশ্রমে গিয়ে গান্ধী দর্শন হতেই অভিভূত হলো গুরচরণ। গান্ধীজী তাকে নবজন্ম দিলেন। সেই থেকে হিংসার রাজনীতি ছেড়ে সে গান্ধীজীর অনুগামী হলো। অবশেষে জাতির জীবনে সেই মহা দুর্দিন এল। গান্ধীজী নিহত হলেন। ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! একদা গান্ধীজী যার প্রাণরক্ষা করেছিলেন তারই হাতের ওপর লুটিয়ে পড়লো গান্ধীজীর গুলিবিদ্ধ মৃতদেহটা।

www.pathagar.com

স্টীমার থেকে নেমেই গান্ধীজী শুরু করলেন পথ চলা। পরনে কৌলীন, হাতে লম্বালাঠি এবং চপ্পল পরা লোকটির না আছে দেহরক্ষী, না কোন পরিচারক। আছে কেবল একটা ছাগলী। গান্ধীজীর পিছু পিছু সেও হাঁটছে। গান্ধীজী কোন হোটেলেও উঠলেন না। ইস্ট এন্ড বস্তির একটা সাধারণ ঘরে এসে ঠাঁই নিলেন, সঙ্গে রইল তাঁর প্রিয় ছাগলীটা। লন্ডন তাঁর কাছে অপরিচিত নয়। ছাত্রাবস্থায় এসে অনেকদিন এখানে ছিলেন। তখন ছিলেন ভারি লাজুক। মুখে রা ছিল না। এখন ঠিক বিপরীত। কত মানুষের সঙ্গে কত কথাই না বললেন বাচাল মানুষটি। চার্লি চ্যাপলিন, জেনারেল স্মাট্‌স্‌, জর্জ বার্নার্ড শ, ক্যান্টারবারির আর্চবিশপ, হ্যারল্ড লাস্‌কী, মারিয়া মন্তেশ্বরী ছাড়াও আলাপ-সালাপ করলেন খনি মজুর, বিলাতি পোশাক বর্জনের জন্যে কর্মহীন হয়ে যাওয়া কাপড়কলের বেকার কারিগর এবং অংখ্য নিষ্পাপ শিশুদের সঙ্গে। বলতে গেলে সারা ইংল্যান্ডের প্রায় সব শ্রেণীর মানুষের সঙ্গেই কথাবার্তা বললেন, একজন ছাড়া। তিনি উইন্সটন চার্চিল। সেদিন গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের সব অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এই একজন ইংরেজ।

সাধারণ ইংল্যান্ডবাসীর মনে গান্ধীজী যে ছাপ ফেললেন তা অত্যন্ত নিবিড়। লবণ সত্যাগ্রহের নীউস্‌রীল দেখানোর পর থেকেই তিনি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন। ইংল্যান্ডের সাধারণ মানুষ তখন বেকারি, শ্রমিক অসন্তোষ, ধর্মঘট আর সামাজিক অবিচারের ভয়াবহ পীড়নে নাকালের একশেষ হচ্ছে। এই অবস্থায় গান্ধীজী যেন প্রাচ্যদেশের শান্তির দূত হয়ে স্বয়ং যীশুর মতন ইংল্যান্ডের মানুষের কাছে আবির্ভূত হলেন। তারা দেখলো সাধারণ এক টুকরো ন্যাকড়ায় শরীরটা ঢেকে এই আর্জব মানুষটি যীশুর মতনই প্রেম ও মুক্তির বাণী প্রচার করতে এসেছেন। ইংল্যান্ডের মানুষকে যেন যাদু করে দিয়েছেন তিনি। যেন হাঙ্গামা বাধিয়ে দিয়েছেন তাদের মনে। গান্ধীজী নিজেও মার্কিন বেতার ভাষণে তাঁর এই বিমোহন ব্যক্তিত্বের শিকড়ের সন্ধান দিলেন পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে।

বেতার ভাষণে গান্ধীজী বললেন যে, ভারতবর্ষের অভিনব স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে সারা পৃথিবীর মানুষের চোখ পড়েছে, 'কারণ, মুক্তির জন্যে আমরা যে পথ নিয়েছি তার জোড়া নেই...সারা বিশ্ব এখন রক্তপ্লাবনে ধুঁকছে। এই নিষ্ঠুর রক্তক্ষুধা থেকে রুগ্ন পৃথিবীকে বাঁচাতে পারে শুধু আমাদের প্রাচীন দেশে ভারতবর্ষ। এই-ই আমার গর্ব।'

তবে পাশ্চাত্য দেশ বিপ্লবের এই অভিনব পথটা তখনই মেনে নিতে পারেনি। যে বিপ্লবী তখন ইওরোপ পরিক্রমা করছিলেন তাঁর সঙ্গে ছিল একটা ছাগলী, মেশিন গান নয়, আশ্রয় পত্র নয়। ইতিমধ্যেই ইওরোপের বড় বড় শহরের রাজপথগুলো সৈনিকের ভারী বুটজুতোর সদর্প পদক্ষেপে কাঁপছিল। যুদ্ধবাজ জাতীয়তাবাদীর দাম্ভিক রণহংকার ধ্বনিত হচ্ছিল সেখানে।—তবুও যখনই তিনি কোন ওপর দিয়ে গেছেন তখনই সেই রেলরোড স্টেশনে হাজার হাজার ফরাসী, সুইস এবং ইতালিয়ানরা তাঁকে দেখতে এসেছে। দেখেছে রেলগাড়ির থার্ডক্লাস কামরার জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছেন একজন কৃশ মানুষ। ফোকলা হাসিতে মুখ ভরিয়ে তাকিয়ে আছেন তাদের দিকে। এবং ইনিই সেই বিপ্লবী।

গান্ধীজী যখন প্যারিসে এলেন তখন তাঁকে দেখতে এত ভিড় হয়েছিল যে একটা মালতোলা ঠেলাগাড়িতে উঠে তাঁকে বক্তৃতা দিতে হয়। সুইজারল্যান্ডে

www.pathagar.com

পেঁাছে গান্ধীজী যখন বন্ধু রোঁমা রোঁলার সংগে দেখা করতে যাচ্ছেন তখন লে'মোর (Lemor) গোয়ালারা 'ভারতের রাজা'কে সেবা করার জন্যে হুড়োহুড়ি শুরু করে দেয়। রোম শহরে গিয়ে ফ্যাসিবাদী নেতা মুসোলিনীকে সাবধান করে গান্ধীজী বলেছিলেন, 'তাসের ঘরের মতন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে 'এই জঙ্গি নীতি। রোম শহরে একদিন ফুটবল খেতে দেখলেন তিনি। তবে সবচেয়ে ব্যথিত হয়েছিলেন সিস্‌টিন (Sistine) চ্যাপেলে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর প্রতিমূর্তি দেখে।

কিন্তু এই জয়যাত্রা সত্ত্বেও গান্ধীজী দেশে ফিরলেন পরাজিত নায়কের মতন। বোম্বাই বন্দরে যারা তাঁকে স্বাগত জানাতে এসেছিল, সেই সব হাজার হাজার ভক্ত অনুগামীকে বললেন, 'আমি খালি হাতে ফিরে এসেছি।' সুতরাং দেশবাসী যেন নতুন করে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জন্যে প্রস্তুত হয়। বলাবাহুল্য ভারতের ইংরেজ শাসক চুপ করে থাকলো না। ক'দিন আগেও খোদ সম্রাটের চা চক্রে যিনি ছিলেন সবথেকে মাননীয় অতিথি, তাঁকেই বন্দী করে যারবাদা (yeravda) জেলে পাঠালো সাতদিনের মধ্যে।

পরবর্তী তিনবছর গান্ধীজী বারংবার জেলে গেছেন এবং জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। এইভাবে যতবার তিনি জেলে গেছেন, ততবারই চার্চিল শার্দুলের মতন গর্জন করে বলেছেন, 'গান্ধী এবং তাঁর সব দাবি ভেঙে গুঁড়ো করে দেওয়া হবে।' কিন্তু চার্চিলের ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার ব্যাপারটা একপেশে করে রাখলো না। শাসন কাঠামোর একটা মৌল সংস্কারের কর্মসূচি ঘোষণা করলো এবং ১৯৩৫ এর গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট অনুসারে প্রদেশগুলোয় খানিকটা স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের ব্যবস্থা করলো। এই ঘোষণার পরেই জেল থেকে ছাড়া পেলেন গান্ধীজী। কিন্তু আর রাজনীতি নয়। পরের তিনটে বছর রাজনীতি ছেড়ে দুটো প্রধান সামাজিক সমস্যার দিকে মন দিলেন। একটী হলো সমাজের লক্ষ লক্ষ অচ্ছুতদের হাঘরে দশা কাটানো আর অন্যটী হলো হীনাবস্থার মধ্যে ডুবে যাওয়া গ্রামগুলোর ছিরি ফেরানো।

প্রায় সংগে সংগেই এসে পড়লো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি। যুদ্ধের দামামা কান পেতে শুনলো সারা ইওরোপ। গান্ধীজীও তাঁর মানসচোখে দেখতে পেলেন. যে সত্যাগ্রহ তিনি দেশের অভ্যন্তরে প্রয়োগ করেছেন, সেই সত্যাগ্রহই একমাত্র নীতি যা মানুষকে সর্বনাশা আত্মহনন থেকে বাঁচাতে পারে। মুসোলিনী যখন ইথিওপিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, গান্ধীজী তখন ইথিওপিয়ার দেশবাসীকে বললেন, 'তোমরা প্রতিরোধ না করে আত্মাহুতি দাও।' এই প্রতিরোধটাই সবচেয়ে শক্তিশালী হবে। 'আর যাই হ'ক. একটা মরুভূমির লোভে মুসোলিনী ছুটে আসবে না।' অসহায় ইহুদিদের ওপর নাৎসী বাহিনীর অমানুষিক অত্যাচারের কথা যখন শুনলেন. তখন বেদনায় মূক হয়ে গেলেন গান্ধীজী। সবাইকে শুনিয়ে বললেন. 'যদি কখনও মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্যে ধর্মযুদ্ধ করার দরকার হয় তাহলে মনুষ্যত্ব হত্যাকারী জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা একটুও অন্যায় হবে না।'

সেইসংগে আরও বললেন. 'তবুও আমি যুদ্ধে বিশ্বাস করি না।' বরং বিকল্প একটা অহিংস প্রতিবাদের কথা শোনালেন ইহুদিদের। বললেন. 'জিহোভা (ঈশ্বর) আমাদের পীড়ন সইবার যে ক্ষমতা দিয়েছেন সেই বলে বলী হয়ে তোমরা বলিষ্ঠ নিরস্ত্র প্রতিবাদ জানাও। এর ফলে জার্মানদের মনের বদল হবে। ওরা তখন মনুষ্যত্বের যোগ্য মর্যাদা দিতে শিখবে।' এমনকি জার্মানশিবিরে আটক করে রাখা

www.pathagar.com

ইহুদি যুদ্ধবন্দীদের ওপর নাৎসী বাহিনীর নির্যাতনের খবর কানে এলেও গান্ধীজীর মনে অহিংসা নীতি নিয়ে কোন সংশয় দেখা দেয়নি। শেষমেশ যখন যুদ্ধ বাধলো গান্ধীজী তখন প্রার্থনা করলেন যেন শান্তিকামী অহিংস মানুষের আত্মাহুতির ধ্বংসস্তূপ থেকে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতন ফুটে উঠুক এমন এক আলোকছটা যার আলোয় মাখামাখি হয়ে যাক মানুষের আত্মহননের অন্ধকার প্রবৃত্তি।

চার্চিল যখন নির্লজ্জের মতন তাঁর দেশবাসীর কাছে 'ঘাম, রক্ত আর চোখের জল' চাইলেন, গান্ধীজী তখন ইংরেজদের মধ্যে সেই সাহসী নির্ভীক একটা জাতিকে খুঁজছিলেন যাদের হাতে তাঁর অহিংস নীতির চূড়ান্ত অগ্নিপরীক্ষা হতে পারে। তাই ইংরেজদের সামনে নতুন একটা পথের সন্ধান দিলেন গান্ধীজী। তাদের বললেন, 'হিটলার আর মুসোলিনীকে ডেকে তাদের লোভী হাতে তোমাদের সব ধন বিলিয়ে দাও। তোমাদের এই সুন্দর দেশ, সুন্দর সাজানো ঘরসংসার, সব নিক তারা। তাদের সর্বস্ব দাও, শুধু দিও না তোমাদের মন, তোমাদের হৃদয়।'

গান্ধীজীর দেখানো পথটা তাঁর অহিংসা নীতির পক্ষে যুক্তিসম্মত হলেও, ইংরেজদের দুরন্ত দাম্ভিক নেতার কাছে কথাগুলো বুড়োর প্রলাপের মতন লাগলো। তবে শুধু তিনি কেন, গান্ধীজী তাঁর নিজের কংগ্রেস দলের নেতাদেরও তাঁর আদর্শটা বোঝাতে পারেননি। তাঁর অনেক অনুগামীরাই ফ্যাসি বিরোধী ছিলেন। তাই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলেন। গান্ধীজী দারুণ মনোকষ্ট পেলেন। কিন্তু নিঃশব্দে মেনে নিলেন না। সেবারই প্রথম তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা সুস্পষ্টভাবে আলাদা পথে চলার প্রেরণা পেলেন।

ভারতীয় নেতাদের প্রস্তাবটা একেবারে উড়িয়ে দিলেন চার্চিল। ভারত সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব আগের মতই কঠোর ছিল। তাই কোনরকম আপসের সম্ভাবনাই বিবেচনা করতে অস্বীকার করলেন। ফলে ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতাদের যুদ্ধে সাহায্য করার প্রস্তবটা বাতিল হয়ে গেল। ফ্র্যাঙ্কলীন রুজভেল্টের সংগে আটলান্টিক চার্টার প্রণয়নের ব্যাপারে চার্চিলের যে সাক্ষাৎ হয়, সেই মিটিংয়েই চার্চিল প্রথম সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে চার্টারের উদার আওতার মধ্যে ভারতকে অন্তর্গত করা হবে না। ভারত সম্বন্ধে চার্চিলের এই রাজনৈতিক শুচিবাই দেখে রুজভেল্টও স্তম্ভিত হয়ে যান। এমনকি দিন কয়েকের মধ্যেই মিত্রশক্তির কাউন্সিল সভায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে চার্চিল যে উক্তিটা করেছিলেন তার মধ্যেও ব্যক্ত হলো তাঁর অনুদার মনোভাব। চার্চিল বললেন, 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তুলে দেবার জন্যে হিজ ম্যাজেস্টিস্ সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী হয়ে আমি এ সভায় আসি নি।'

১৯৪২ সালের মার্চ মাসের আগে পর্যন্ত প্রায় এই মনোভাবটাই বজায় রেখে-ছিলেন চার্চিল। কিন্তু মার্চ মাসেই দৃশ্যপট বদলে গেল। জাপানী সৈন্য ভারতের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর পরেই হুঁস হলো মিত্রশক্তির। ওয়াশিংটনের চাপে চার্চিল বাধ্য হলেন দিল্লির কাছে একটা নতুন প্রস্তাব পাঠাতে। রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব এবং এর বার্তাবাহক এমন একজন মানুষ যিনি ভারতের রাজনৈতিক মহলে খুবই ঘনিষ্ঠ ও সহানুভূতিশীল। এঁর নাম সার স্টাফোর্ড ক্রিপ্স্। গোঁড়া নিরামিষাশী এবং সোশ্যালিস্ট এই ভদ্রলোকটির সংগে ভারতের কংগ্রেস নেতাদের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ চেনাজানা। সেই সুবাদেই তাঁর নিয়োগ এবং তাঁর হাত দিয়েই এই আনকোরা প্রস্তাবটা চার্চিল পাঠালেন। ব্রিটেন ভাবলো চমৎকার প্রস্তাব এটা।

www.pathagar.com

অন্তত যুদ্ধকালীন সময়ে এত উদার প্রস্তাব ভারত নিশ্চয় আশা করেনি। ব্রিটেন বললো ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন বা ডোমিনিয়ন স্টাটাস দেওয়া হবে ভারতকে যা স্বাধীনতার তুল্যমূল্য। তবে এখনই নয়, জাপানীদের হারার পর। অবশ্য প্রস্তাবটাও সর্বৈব নিরীহ নয়। মুসলমানদের আলাদা রাষ্ট্রের হুমকিটাও যোগ্য প্রাধান্য পেয়েছিল এই প্রস্তাবে। একটা শর্ত ছিল যে ভবিষ্যতে মুসলমানদের আলাদা রাষ্ট্রের দাবিও যেন মানা হয়।

কিন্তু ভারতের মাটিতে ক্রিপসের পা দেবার আটচল্লিশ ঘণ্টা পরেই গান্ধীজী বললেন যে এ প্রস্তাব মানা যায় না, কারণ এতে আছে 'ভারত বিভাগের পাকাপাকি' পরিকল্পনা। তাছাড়া প্রস্তাবের মধ্যে আরও একটা আপত্তিকর শর্ত ছিল। ভারতকে অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীনতা দেবার যে প্রস্তাব ব্রিটেন দিয়েছে তার বদলে আত্মরক্ষার জন্যে এই ভূখণ্ডে তারা ভারতের সহযোগিতা চাইছে। কিন্তু গান্ধীজীর কাছে প্রস্তাবটা তাঁর অহিংসা নীতির পরিপন্থী। জাপানকে ঠেকিয়ে রাখার দায় যদি ভারতকে নিতেই হয়, তবে সে তা পালন করবে অহিংসভাবে, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে নয়।

মহাত্মাজী মনে মনে একটা স্বপ্ন দেখতেন। অত্যন্ত গোপন সেই স্বপ্ন। তিনি যে সবরকম রক্তপাতের বিরোধী ছিলেন তা নয়। উদ্দেশ্য যদি সাধু হয় তবে রক্তপাতে তাঁর আপত্তি ছিল না। তিনি স্বপ্ন দেখতেন যেন দলে দলে অহিংস ভারতবাসী সুশৃংখল সৈন্যবাহিনীর মতন জাপানী সৈন্যের হিংস্র বেয়নেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং একের পর এক প্রাণ দিচ্ছে। নিরস্ত্র মানুষের প্রাণ দেবার এই কাড়াকাড়ি থেকেই জন্ম হবে এক নিঃশব্দ বিপ্লব যখন শত্রুপক্ষও আত্মবলিদানের বিপুলত্বে অভিভূত হবে। তখন সত্যের আলোয় তাদের অন্তর উদ্ভাসিত হবে এবং ইতিহাসের ধারা বদলে যাবে।

সুতরাং চার্চিলের প্রস্তাবটা সরাসরি নাকচ করে দিলেন গান্ধীজী। ক্রিপ্‌স্‌কে বললেন যে, চার্চিলের প্রস্তাবটা যেন 'কোন একটা দেউলিয়া ব্যাঙ্কের নামে পরবর্তী তারিখের চেক' (এ পোস্টডেটেড্ চেক অন এ ফেলিং ব্যাংক)। সার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌কে আরও বললেন যে, তাঁর যদি আরও প্রস্তাব না থাকে তাহলে, 'পরের বিমানেই তিনি যেন দেশে ফিরে যান।'*

ক্রিপ্‌স্ যেদিন বিদায় নেন তার পরের দিনটা ছিল সোমবার। গান্ধীজীর সাপ্তাহিক মৌনব্রতের দিন। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে গান্ধীজী মৌনব্রত পালন করতেন। এর ফলে সপ্তাহে অন্তত একটা দিন কণ্ঠস্বরের অবিরাম ব্যবহার থেকে নিরস্ত হতেন। তখন বিশ্বঅস্তিত্বের সঙ্গে প্রাণের ঐকতান ধ্বনিত হতো। দুর্ভাগ্যবশত এই সতর্কতা গান্ধীজী তাঁর দৈববাণী বা ইনার ভয়েস প্রয়োগের ক্ষেত্রে পালন করেন নি। ফলে সেই দৈববাণী যা তাঁর বিবেকবাণী, তার নির্দেশ মানতে গিয়ে ভারতের সমূহক্ষতি ডেকে এনেছিলেন।

---

* অবশ্য স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ তখনই দেশে ফিরে যান নি। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কংগ্রেস নেতাদের প্রায় রাজী করাতে পেরেছিলেন। একটা বিষয়েই সামান্য মতভেদ ছিল। যুদ্ধের ব্যাপারে ভারত কতখানি জড়িয়ে পড়বে সেটা নিয়েই অল্পস্বল্প মতানৈক্য হচ্ছিল। কিন্তু এবারও বাদ সাধলেন চার্চিল। বস্তুত তাঁর গোঁয়ারতুমির জন্যেই উভয়পক্ষে কোন চুক্তি হলো না।

www.pathagar.com

বিবেকবাণীর নির্দেশ নিয়ে গান্ধীজী এবার নতুনভাবে সংগ্রামে নামলেন। এবার আন্দোলনের স্লোগান হলো দুটি কথা—'কুইট ইণ্ডিয়া' বা ভারত ছাড়। গান্ধীজী ঘোষণা করলেন যে, এবার ইংরেজের সময় হয়েছে লাগাম খুলে ন্যস্ত ক্ষমতা এদেশের মাটিতে ফেলে চলে যাবার। তিনি বললেন ভারত ছেড়ে চলে যাক ইংরেজ। তাতে দেশের ভালমন্দ যাই-ই হ'ক তা দেখবেন ঈশ্বর। এমনকি দেশ যদি অরাজক হয় এবং বিপ্লব দানা বেঁধে ওঠে, তাহলেও ইংরেজের ভারত ছেড়ে যাওয়া উচিত। তাছাড়া ইংরেজ ভারত ছেড়ে চলে না গেলে ভারতের ওপর জাপানের আক্রমণের আশংকাও কমবে না।'

১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট। মধ্যরাতের কিছু পরে বোম্বাই শহরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বন্ধ সভাঘরের গুমোট গরমের মধ্যে আদুড় গায়ে গান্ধীজী অগ্নিগর্ভ ঘোষণা করলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল ধীরস্থির। কিন্তু উত্তপ্ত কথাগুলোর মধ্যে এমন একটা তেজস্বী আবেগ ছিল যা তাঁর শান্ত চরিত্রের বিপরীত। গান্ধীজী সেই সভায় বললেন, 'আমি এখনই স্বাধীনতা চাই। সম্ভব হলে আজ রাত্রেই, ভোর হবার আগে।' আরও বললেন অনুগামীদের উদ্দেশ করে। 'একটা ছোট্ট মন্ত্র দিলাম তোমাদের, "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।" হয় ভারতকে স্বাধীন করবো নয় মরবো। বেঁচে থেকে চিরদাসত্বের এই অবমাননা আর সইবো না।'

কিন্তু রাত্রি ভোর না হতেই গান্ধীজী যা পেলেন তা স্বাধীনতা নয়, ইংরেজের কারাগারে ফের আটক হবার নিমন্ত্রণ। অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে গান্ধীজী ও তাঁর অনুগামী নেতাদের আটক করে ফেললো ইংরেজ সরকার। কংগ্রেস নেতাদের প্রায় সবাই তখন জেলে বন্দী হলো। এর ফলে সামান্য একটু আবর্ত যা হলো ইংরেজ সরকার তা হপ্তা তিনেকের মধ্যে মিটিয়ে ফেললো।

গান্ধীজীর এই ব্যর্থ রাজনৈতিক কৌশলের দরুন কংগ্রেস নেতারা যখন রাজনৈতিক দৃশ্যপট থেকে এইভাবে মুছে যাচ্ছেন, তখন সেই শূন্যস্থান ভরাট করলেন মুসলিম লীগের নেতারা। জেলের মধ্যে বসে কাতর কংগ্রেস নেতারা তখন বিলাপ করছেন। আর ওদিকে ঘটা করে মুসলমান নেতারা ব্রিটেনের যুদ্ধ সাজের সঙ্গী হয়ে সরকারের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হলো। ইংরেজ সরকারের নেকনজর পেল মুসলিম লীগ আর কংগ্রেস পেল বিষদৃষ্টি। গান্ধীজীর ব্যর্থ কূটকৌশল আর একবার প্রমাণ হয়ে গেল। ইংরেজরা ভারত ত ছাড়লোই না বরং তাদের অনুগ্রহ-দৃষ্টিতে পুষ্ট হয়ে মুসলিম লীগের নেতারাও বুঝে গেল যে দেশ ছেড়ে যাবার আগে তারা ভারত দুটুকরো করে দিয়ে যাবে।

ইংরেজের জেলে গান্ধীজীর সেটাই শেষ যাত্রা ছিল। বন্দীদশা যখন কাটলো তখন বৃদ্ধ গান্ধীজীর মোট দুহাজার তিনশ' আটত্রিশ দিন বন্দীজীবন যাপন করা হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় দুশ' উনপঞ্চাশ দিন এবং ভারতে দুহাজার উননব্বুই দিন। তবে এবার তাঁকে পরিচিত যারবাদা জেলে না রেখে পুণার আগা খাঁর প্রাসাদে নজরবন্দী করে রাখা হলো। সেখানে পাঁচ মাস আটক থাকার পর হঠাৎ এক দুজ্ঞের্য় কারণে গান্ধীজী একুশ দিনের অনশনের কথা ঘোষণা করলেন। কিন্তু ইংরেজ সরকারও আপস করতে এগিয়ে এল না। বরং লন্ডন থেকে হুমকি দিয়ে চার্চিল বললেন যে গান্ধী যদি উপোস করে মরতে চান তবে তিনি তা করতে পারেন।

গান্ধীজীও উপবাস শুরু করে দিলেন। কিন্ত মাঝামাঝি নাগাদ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। অবস্থা খুবই খারাপ। বৃদ্ধ মানুষটি ক্রমেই যেন নেতিয়ে

www.pathagar.com

পড়ছেন। সরকারের মতিগতিও ভাল নয়। অবস্থা সংকটজনক হলেও স্পষ্ট উপেক্ষা ফুটে ওঠে ইংরেজের ব্যবহারে। চার্চিল গোঁ ধরে আছেন কিছুতেই আপস করবেন না। সবাই প্রায় ধরে নিয়েছিল এবার গান্ধীজীর মৃত্যু নিশ্চিত। ইংরেজ সরকারও আগাম বন্দোবস্ত করে রেখেছে তাঁর সৎকারের। দুজন হিন্দু ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে আনিয়ে রেখেছে। চন্দন কাঠ সংগ্রহ করে রেখেছে চিতা সাজাবার জন্য। সারা দেশ উন্মুখ হয়ে আছে কখন তাঁর জীবনাবসান হয়। কিন্তু বৃদ্ধ গান্ধীজী মরলেন না। একশ দশ পাউন্ড ওজন কমে গেলেও শুধু ইচ্ছাশক্তির জোরেই একুশ দিনের অনশনের পরেও বেঁচে উঠলেন চুয়াত্তর বছরের এই বৃদ্ধ কয়েক ফোঁটা পাতিলেবুর রস আর লবণজল খেয়ে। নিজের ওপর যে নির্দয় দণ্ড তিনি ন্যস্ত করেছিলেন প্রবল ইচ্ছাশক্তি দিয়ে সেই বিষম পরীক্ষাই কাটিয়ে উঠলেন তিনি।

কিন্তু আর একটা কঠিন অগ্নিপরীক্ষা অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্যে। নিজে পারলেও আর একজন সে যাত্রা রেহাই পেলেন না। তাঁর জন্যে আনা চন্দনকাঠ দিয়ে তাঁর চিতা সাজানো হলো। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে আর একজনের দেহ ভস্মীভূত করলো। ১৯৪৪ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি, তারিখে যিনি দেহ রাখলেন তিনি কস্তুরবা। তের বছর বয়স থেকে গান্ধীজীর সহধর্মিনী। স্বামীর কোলে মাথা রেখে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন কস্তুরবা। শেষ হয়ে গেল একটা অধ্যায়। সেদিন কিন্তু নীতি জলাঞ্জলি দিয়ে একটা নিঃশব্দ নিবেদিত প্রাণ গান্ধীজী রক্ষা করতে পারেন নি। গান্ধীজী প্রাকৃতিক চিকিৎসায় রোগোপশমের নীতিতে বিশ্বাস করতেন। কারণ তিনি জানতেন যে, ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে রোগনাশক ওষুধ প্রয়োগে শরীরে প্রতিক্রিয়া হয়। সবাই জানতো যে মারাত্মক ব্রংকাইটিস রোগে ভুগে প্রায় মরতে বসেছেন কস্তুরবা। ইংরেজ সরকারও সে কথা জানতো। তাই সেই দুর্মূল্যের বাজারে বিরল পেনিসিলিন ইঞ্জেকশন বিলেত থেকে আনিয়ে দেয়। সময়মত ইঞ্জেকশন দিলে হয়ত গান্ধীজীর জীবনসঙ্গিনীকে বাঁচানো যেতে পারতো। কিন্তু প্রায় শেষ মুহূর্তে গান্ধীজী যখন জানতে পারলেন যে ইনট্রাভেনাস ইঞ্জেকশন দিয়ে শরীরের মধ্যে ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে, তখন আপত্তি জানিয়ে চিকিৎসা বন্ধ করে দিলেন।

কস্তুরবা মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুর পর গান্ধীজীর শরীর হঠাৎ ভেঙে পড়লো। ম্যালেরিয়া, কৃমি, আমাশয় ইত্যাদি ব্যাধিতে ভুগে ভুগে কাহিল হয়ে গেলেন গান্ধীজী। শরীর ভেঙে গেছে। মনে স্ফূর্তি নেই। বোঝাই যাচ্ছিল এমন অবস্থা বেশি দিন চললে তাঁকে বাঁচানো যাবে না। হয়ত চার্চিলও তা বুঝেছিলেন। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও গান্ধীজীর মুক্তির আদেশ দিতে রাজী হলেন যাতে জেলের মধ্যে তিনি মরতে না পারেন। তবে শুধু ইংরেজের কারাগার নয়, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার মাটিতেও গান্ধীজী দেহ রাখেন নি। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে গান্ধীজীর এক ধনী ভক্ত তাঁর সমুদ্রতীরের বাংলো ছেড়ে দিলেন। গান্ধীজী সেখানেই উঠে এলেন এবং ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। গান্ধীজী যত সুস্থ হচ্ছিলেন ততই অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিলেন চার্চিল। দিল্লি থেকে বড়লাট ক্রমাগত তার পাঠাচ্ছেন আসন্ন দুর্ভিক্ষের কথা জানিয়ে। চার্চিলের ভ্রূক্ষেপ নেই। কোন সাড়াশব্দ দেওয়াও দরকার মনে করলেন না চার্চিল। হঠাৎ একদিন ক্ষিপ্ত হয়ে বড়লাটের নামে কেবল্ পাঠালেন। 'কি ব্যাপার? গান্ধী এখনও মরে নি?'

দিনকয়েক পরের ঘটনা। গান্ধীজীর ধনী ভক্ত এসেছেন তাঁর জুহুর বাংলোয়।

www.pathagar.com

ঘরে গান্ধীজী নেই। তবে তাঁর তিন নিত্যসঙ্গী রয়েছেন। তিন মূর্তি তিনভাগে অবস্থান করছেন। একজন শূন্যে পা তুলে মাথায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে, একজন জপে বসেছেন আর অন্যজন মেঝেয় শুয়ে গভীর নিদ্রামগ্ন। মানুষটি অবাক হয়ে গান্ধীজীর খোঁজে তাকালেন। টয়লেটের খোলা দরজা দিয়ে দেখলেন গান্ধীজী আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন। ঘরের এই বিচিত্র ছবিটা দেখে ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন। গান্ধীজীর ঘোর কেটে গেল। ঘরের মধ্যে এসে জিজ্ঞেস করলেন এত হাসির ঘটা কেন? রসিক ভক্তটি তখনও হাসছেন। গান্ধীজীর দিকে চেয়ে বললেন, 'বাপু! ঘরখানার দিকে চেয়ে দেখুন। একজন মাথা নিচু করে পা তুলে দাঁড়িয়ে, একজন পুজোয় বসেছেন, একজন আরামে ঘুমচ্ছেন। আর আপনি গেছেন টয়লেটে। এরাই আপনার ভক্ত সমর্থক আর এদের দিয়েই আপনি ভারত স্বাধীন করবেন!'

* * *

নর্থওল্ট এয়ারপোর্ট, ২০শে মার্চ ১৯৪৭

নর্থওল্ট বিমানবন্দরের রানওয়ের ওপর একটা জঙ্গি বোমারু বিমান সকালের রোদে মাখামাখি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক আড়াইমাস আগে বছরের প্রথম দিনটাতে এখানেই নেমেছিলেন লুই মাউন্টব্যাটেন। বিমানের ভেতরে প্যাক করা জিনিসপত্রের গাঁটরি-গুলো থরে থরে সাজিয়ে রেখেছে তাঁর খাস তল্পিদার (valet) চার্লস স্মিথ। তল্পিতল্পার বহরটা ছোটখাট নয়। মোট ছেষট্টিটা গাঁটরি বিমানের মধ্যে তোলা হয়েছে। লেডি মাউন্টব্যাটেন পাকা গিন্নী। সংসার করতে সবই লাগে, তাই কিছুই বাদ দেন নি। রুপোর য়্যাশট্রে থেকে শুরু করে জুতোর পুরনো বাক্স পর্যন্ত সব-কিছুই নিয়ে চলেছেন তিনি। পাছে চোখ পড়লে আতংক হয় তাই পুরনো জুতোর বাক্সর মধ্যে নিয়ে যাচ্ছেন পারিবারিকসূত্রে উপহার পাওয়া হীরের টায়রাটা। লেডি মাউন্টব্যাটেনের ইচ্ছে যেদিন বড়লাটগিন্নী হবেন সেদিন এটা পরবেন।

সংগে চলেছে সরকারী নানা নথিপত্র, নির্দেশনামা ইত্যাদি। দিনের পর দিন কিভাবে কাজ করতেন, লাটভবনের কর্মচারীদের নামধাম, পদ-পরিচয় ইত্যাদির পুংখানুপুংখ উল্লেখ আছে নির্দেশনামার মধ্যে। আর রয়েছে ক্লিমেন্ট এ্যাটলীর দস্তখত করা দুপাতার নির্দেশপত্রটা। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় নথি এটাই। তাঁকে যে বিশেষ কাজের ভার দিয়ে দিল্লি পাঠানো হচ্ছে তার নির্দেশ আছে সই করা ওই দুপাতার কাগজে। তাঁর আগে আর কোন ভাইসরয় এইরকম লিখিত নির্দেশ সরকার থেকে পায়নি। কাজের সুবিধের জন্যে মাউন্টব্যাটেন নিজেই সহজসরল ভাবে শর্ত-গুলো লিখে নিয়েছেন। তাঁর ওপর লিখিত নির্দেশ আছে যে ১৯৪৮-এর ৩০শে জুন তারিখের মধ্যে স্বাধীন ভারতের হাতে ব্রিটিশের সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। কিভাবে করবেন সে কথাও বলা আছে। আট মাস আগে সার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌সের নেতৃত্বে দিল্লিতে যে ক্যাবিনেট মিশন পাঠানো হয়েছিল তারাই এর নকশা তৈরি করে দিয়েছে। মাউন্টব্যাটেনকে সেই ধারাই মেনে চলতে হবে। প্রস্তাবে বলা আছে যে, মুসলমানদের পৃথক রাষ্ট্রের দাবি মেনে নিয়ে ভারতকে যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো গড়ে দিতে হবে। অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ শাসনের ক্ষেত্রে স্বাধীন হলেও

www.pathagar.com

পাকিস্তান হবে এক অঙ্গরাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। বলাবাহুল্য, এই রাষ্ট্রমেলের (federation of states) কেন্দ্রীয় সরকার হবে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতাসম্পন্ন এবং অঙ্গরাজ্যগুলো হবে স্ব স্ব প্রধান। ছকের বাইরে ভারতের জঙ্গি নেতাদের সঙ্গে নতুন করে আলোচনার প্রশ্নই ওঠে না। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ছ'মাস অর্থাৎ ১লা অক্টোবরের মধ্যে যদি অবিভক্ত ভারতের প্রস্তাবে উভয়পক্ষ রাজী না হয়, তাহলেই মাউন্টব্যাটেন বিকল্প প্রস্তাবের সুপারিশ করবেন।

মাউন্টব্যাটেনের শখের বোমারু বিমান ইয়র্ক এম ডবু ১০২এর* তখন শেষ পর্যায়ের পরীক্ষা চলছে। পাশের টারম্যাকের ওপর পায়চারি করছেন মাউন্টব্যাটেন। সঙ্গে হাঁটছেন যুদ্ধকালীন সময়ের দুজন সহযোদ্ধা। তাঁর পার্সোন্যাল স্টাফের প্রধান ক্যাপ্টেন রোনাল্ড ব্রকম্যান এবং তাঁর সিনিয়র এ.ডি.সি. লেফ্‌টানেন্ট কমান্ডার পীটার হোয়েস। মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে এ'রাও ভারতে চলেছেন। পায়চারি করতে করতে এই ল্যাংকাস্টার বোমারু বিমানটার কথা বারবার মনে পড়ছিল ব্রকম্যানের। মাউন্টব্যাটেনের কত সময় অসময়ের সঙ্গী এই বিমানটা। কত জায়গায় নিরাপদে নিয়ে গেছে তাঁকে। কখনও ব্রহ্মদেশের জঙ্গলের মধ্যে কোন অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে,

---

* মাউন্টব্যাটেনের বড় শখের বিমান এই ল্যাংকাস্টার ইয়র্ক বিমানটা। যখন তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুপ্রীম কম্যাণ্ডার তখন এই বিমানে চড়ে তিনি কত মিশনে গেছেন। কখনও বিফল হন নি। তাঁর ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে বিমানটা। এবার বিমানের মধ্যেই অতিরিক্ত ক্রুম্যানদের জন্যে থাকবার বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন মাউন্টব্যাটেন। দিল্লী পর্যন্ত যেতে যাতে বদলি ক্রু তুলতে অযথা নাকাল না হতে হয় তাই এই ব্যবস্থা করেছেন তিনি। তবে এবার তাঁর যাত্রা প্রায় বাতিল হয়ে যাচ্ছিল। সে এক মজার ঘটনা।

তখন মাউন্টব্যাটেন তাঁর নিজের অফিসে বসে। একটা টেলিফোন এল তাঁর এ. ডি. সি পীটার হোয়েসের কাছে। ওপাশ থেকে টেলিফোন করছে রয়্যাল এয়ার ফোর্সের গ্রুপ ক্যাপ্টেন। 'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করলো হোয়েস। গ্রুপ ক্যাপ্টেন জানালো যে এবার বোধহয় দিল্লী যাত্রার সময় মাউন্টব্যাটেন তাঁর চির সঙ্গী ইয়র্ক এম ডবু ১০২ বিমানটা পাবেন না।

'সে কি?'

মাউন্টব্যাটেন তাড়াতাড়ি এ.ডি.সি.র হাত থেকে টেলিফোনটা প্রায় কেড়ে নিয়ে বললেন, 'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ গ্রুপ ক্যাপ্টেন।'

'ধন্যবাদ আমায়?' ঈষৎ বিচলিত শোনাল গ্রুপ ক্যাপ্টেনের গলার স্বর।

'হ্যাঁ তাই।' এক মুহূর্ত থেমে মাউন্টব্যাটেন ফের বললেন, 'ভাইসরয়ের চাকরিটা পাবার সময় আমি একটা শর্ত দিয়েছিলাম। ইয়র্ক বিমান ছাড়া আমি দিল্লী যাব না। তা আপনি বলছেন যে এই এয়ারক্র্যাফ্‌টটা আমি পাচ্ছি না। আপনাকে সেইজন্যেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনি সত্যিই আমায় বাঁচালেন, কারণ ভাইসরয় হবার একটুও ইচ্ছে আমার নেই।'

মাউন্টব্যাটেন টেলিফোন রাখলেন। ঘরের মধ্যে অস্বস্তিকর নীরবতা। এ. ডি. সি. হোয়েসও স্তম্ভিত। কিন্তু স্তম্ভিত ভাবটা কাটবার আগেই মাউন্টব্যাটেন জানতে পারলেন যে ইয়র্ক এম ডবু ১০২ বিমানটা দিল্লী যাত্রার সময় তিনি পাচ্ছেন।

www.pathagar.com

কখনও বা গুরুত্বপূর্ণ সামরিক মন্ত্রণা সভায়। ব্রকম্যানের পাশাপাশি নিঃশব্দে হাঁটছেন মাউন্টব্যাটেন। চনমনে মানুষটা আজ যেন একটু বিষণ্ণ। গভীর আত্মচিন্তায় ডুবে আছেন। এমন সময় ক্রুম্যান জানালো যে চেকিং শেষ। বিমান এবার উড়তে পারে।

ক্রুম্যানের নির্দেশ মাউন্টব্যাটেনও শুনেছেন। এবার জয়যাত্রায় যাবার পালা এল। কিন্তু সত্যিই কি জয়যাত্রা? ভগ্নোদ্যম মাউন্টব্যাটেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর সহযাত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, 'তাহলে এবার আমরা ভারতে চলেছি। কিন্তু বিশ্বাস করো আমার মোটেই যেতে ইচ্ছে করছে না। হয়ত আমাদের এই যাত্রা মোটেই সফল হবে না। ব্যর্থ হয়েই আমাদের ফিরতে হবে কারণ ওরা কেউ আমাদের চাইবে না।'

তিনজনে বিমানে উঠলেন। ঘর্ঘর শব্দে বিমানের ইঞ্জিন চালু হলো, জনশূন্য রানওয়ের ওপর দিয়ে ছুটলো ইয়র্ক বিমানটা। একটু পরে সূর্যকে আড়াআড়ি কেটে আকাশে উঠলো পূর্ব দিক লক্ষ্য করে। সাড়ে তিনশো বছর আগে ক্যাপ্টেন হকিন্স নামে সেই দুঃসাহসী লোকটা তার স্প্যানিশ জাহাজ 'হেক্টর'-এ চড়ে পূর্ব গোলার্ধের যে দেশটার দিকে যাত্রা শুরু করেছিল, আজ বুঝি সেই যাত্রাই শেষ হতে চলেছে।

www.pathagar.com

মুমূর্ষু রাজতন্ত্রের বিদায় সঙ্গীত—দি লাষ্ট ট্যাটু

অনুতাপীর জয়যাত্রা-৩

না। কোন কিছুই গান্ধীজীকে নিরস্ত করতে পারেনি। অদম্য জীবনশক্তি নিয়ে এই নগ্নপদ বৃদ্ধ মানুষটি গ্রামের পর গ্রাম পায়ে হেঁটে ঘুরেছেন। সারা দেশের ক্ষতদুষ্ট শরীরের জ্বালা জুড়িয়েছেন প্রেম ভালবাসার কথা শুনিয়ে। ধীরে ধীরে ঘা শুকিয়ে গেল। জ্বালা জুড়লো। শেষে এমন হলো যে ভাঙাচোরা মানুষটার আবছা চেহারাখানা নজরে পড়লেই মানুষের মন থেকে সব উন্মত্ত আবেগগুলো দূর হয়ে যেত। এইভাবে ভীরু সলজ্জপায়ে অতি সন্তর্পণে শান্তি ফিরে এল নোয়াখালির রক্তভেজা খাল, বিল, জলায়।

কিন্তু গ্রামে শান্তি ফিরে এলেও গান্ধীজীর বিক্ষুব্ধ মনে যাতনার লাঘব হলো না। তাঁর জীবনকাব্যের একটা ব্যক্তিগত ঘটনা তখন তাঁর পায়ে পায়ে জড়িয়ে চলেছে। এই জটিল কুটিল জীবনকাব্য হয়ত কোন একদিন তাঁর পুরনো সহকর্মী-দের গায়েও অপবাদ লেপে দেবে, স্তম্ভিত করবে তাঁর লক্ষ লক্ষ ভক্তদের। এমনকি মোহনদাস গান্ধীর জটিল জীবনেতিহাস বোঝবার চেষ্টা করবে যে সব ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক, তাদেরও নিরুৎসাহ করবে এই ঘটনা, এবং সাতাত্তর বছরের বৃদ্ধ গান্ধীর জীবনে নিয়ে আসবে এক গভীর ব্যক্তিগত সংকট।

কী সেই ঘটনা যার শিকড় এত গভীরভাবে প্রোথিত? পঁচিশ বছর ধরে যে রাজনৈতিক সংগ্রামের নায়ক হয়ে তিনি সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন তার মধ্যেই কি নিহিত আছে এই শক্তি? তা নয়। চল্লিশ বছর ধরে গান্ধীজী যে ইন্দ্রিয় সংযমের সাধনা করছেন তার মধ্যে সুপ্ত হয়ে আছে এর বীজ। গান্ধীর উনিশ বছরের নাতনী, শ্রীমতী মনুই হলো এর উৎস। মনুকে তিনিই বড় করেছেন। তিনি এবং কস্তুরবা তাকে পালন করেছেন তাঁদের মেয়ের মতন। মনুও সে কথা জানতো। সেও প্রতিদান দিয়েছে কস্তুরবার মৃত্যুশয্যায় নিরলস সেবা করে। তাই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার আগে মনুকে গান্ধীজীর হাতেই তুলে দেন কস্তুরবা।

মনুর ভার নিয়ে গান্ধীজী বলেছিলেন, 'আমি অনেকের বাবা হয়েছি, কিন্তু তোমার আমি মা।' এটা তাঁর কথার কথা নয়। তাঁর ব্যবহারই বোঝা যেত কত ঘনিষ্ঠ-ভাবে তিনি মিশেছেন মনুর সংগে। মনুর খাওয়া, শোওয়া, পরা, তার শিক্ষাদীক্ষা এসব দিকে কত তীক্ষ্ন নজর ছিল তাঁর। প্রায় মায়েঝিয়ের সম্পর্ক ছিল তাঁদের মধ্যে। তাই মনুও কিছু গোপন করতো না। নোয়াখালিতে পদযাত্রায় বেরোবার আগে মনুর সমস্যার কথাটা গান্ধীজী জানতে পারেন। মায়ের কাছে যুবতী মেয়ে যেমন লাজুক মুখে তার মনের সব গোপন কথা বলে, তেমনি গান্ধীজীর কাছেও মনু সব কথা কবুল করলো। গান্ধীজী সেদিনই প্রথম জানলেন যে বয়সের সংগে সংগে যুবতী মেয়ের যেসব ইন্দ্রিয়লক্ষণ প্রকাশ হয়, তার বেলায় সেসব কিছুই ঘটেনি। এত বয়সের মনুর কোন যৌনবোধই গড়ে ওঠেনি।

গান্ধীজীর জটিল যৌনদর্শনের কাছে মনুর কথাগুলো একটা আলাদা গুরুত্ব পেল। যেহেতু তিনি নিজে সংযমী জীবনযাপনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাই তাঁর মনে হতো

www.pathagar.com

যে ইন্দ্রিয়সংযমই একমাত্র শিক্ষা যার দ্বারা মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। যারা তাঁর ভক্ত তাদেরও একথা বোঝালেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল যে সৈন্যবাহিনী তিনি গড়ে তুলবেন তারা যেমন অহিংস হবে তেমনি তাদের যৌনবোধও থাকবে না। তারা হবে ব্রহ্মচারী সৈনিক বা সেক্সলেস সোল্‌জার্‌ এবং সংকটকালে নৈতিক শক্তি হারিয়ে তারা ক্লীব হবে না।

মনুর সমস্যার কথা শুনেই গান্ধীজীর মনে হলো যে সেই-ই হবে তাঁর প্রথম পূর্ণা ভক্ত, যার চরিত্রে স্খলন নেই, যে শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধা। তাঁর মনের কথাটা মনুকে জানালেন। বললেন, 'যদি ভারতের লক্ষ লক্ষ মা বোনের মধ্যে থেকে অন্তত একজনও আদর্শ নারী উপাসিকা তৈরি করতে পারি, তবেই এদেশের মাতৃজাতির প্রতি আমার কর্তব্যপালন করা হবে। সার্থক হবে আমার মা হওয়া।' তবে সব আগে যাচাই হওয়া দরকার যে মনুর কথাগুলো কতটা সত্যি। সেবার গান্ধীজীর সঙ্গে কয়েকজন ঘনিষ্ঠ অনুগামীই নোয়াখালি যাচ্ছেন। মনুর আগ্রহ দেখে গান্ধীজী তাকেও সঙ্গে নিতে রাজী হলেন। তবে শর্ত হলো যে তাঁর প্রবর্তিত নিয়মশৃংখলা তাকে মানতে হবে এবং যদি দরকার হয় তবে তাকে সতীত্বের পরীক্ষাও দিতে হবে।

মনু নিঃশব্দে সম্মতি জানাল। গান্ধীজী বিধান দিলেন যে মাটিতে খড়ের শয্যা পেতে তাঁরা পাশাপাশি শোবেন। গান্ধীজী তখন যথার্থই মা হয়েছেন। যুবতী মনুও তাঁকে সেই চোখেই দেখতে লাগলো। সে বলতো গান্ধীজীর মন ভরা ছিল মাতৃপ্রেমে। তাই মায়ের ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই সে গান্ধীজীর কাছে চায় নি। গান্ধীজী ভাবতেন যদি তাঁর ইন্দ্রিয়সংযমে পাপ না থাকে, যদি সত্যিই যুবতী মনুর নারী মন কামগন্ধহীন হয়, তবে নির্ভয়ে মায়েঝিয়ের মতন তাঁরা পাশাপাশি শুতে পারবেন। একটুও মনোবিকার হবে না। তবে দুজনের মধ্যে যদি একজনও ছলনার আশ্রয় নেয় তবে তা গোপন থাকবে না। একজন আর একজনকে ঠিকই চিনে নিতে পারবে।

মনু যদি সৎ হয়, তবে নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে গান্ধীজী তাকে ঠিকই গড়ে নিতে পারবেন। যৌনবোধহীনতার যে কষ্টসাধ্য ব্রত তিনি পালন করছেন সেই ত্যাগী মন দিয়েই যুবতী মনুর সম্ভোগেচ্ছার গলা টিপে ধরতে পারবেন তিনি। যদি তেমনটি ঘটে তবে পীগ্‌মেলিয়ানের মতন একটা সর্বব্যাপী বদল ঘটবে মনুর জীবনে। তার যুবতী মন নির্মল, বিশুদ্ধ হবে। তার কথায় ব্যক্তিত্বের নতুন মাত্রা যোগ হবে। নতুন ভাবনায় আপ্লুত হবে তার মন। তখন কৃচ্ছ্রসাধনের কঠিন কাজের দায় নেবার যোগ্যতা ও মনোযোগ তৈরি হবে তার মধ্যে।

গান্ধীজীর প্রস্তাবে রাজী হলো মনু এবং নোয়াখালির স্যাঁতস্যাঁতে গ্রামের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলো তাঁর পথসঙ্গী হয়ে। গান্ধীজীর দলবলের লোকজন অবশ্য ব্যাপারটা অত সাদা চোখে দেখলো না। ওরা ভাবলো বুড়ো গান্ধীর ভীমরতি হয়েছে, তাই যুবতী মেয়ের সঙ্গে একঘরে রাত কাটাচ্ছেন। মোটকথা গান্ধীজীর সিদ্ধান্তের কথা শুনে ছোট্ট দলটার সবাই কেমন আতংকগ্রস্ত হয়ে উঠলো। মনুকেও সে কথা বললেন গান্ধীজী। 'ওরা ভাবছে আমার বুদ্ধিলোপ হয়েছে। কিন্তু ওদের অজ্ঞতা দেখে আমার হাসিই পাচ্ছে। ওরা আমার সম্বন্ধে কিছুই জানে না।'

শুধু ওরা নয়, খুব কম মানুষই ব্যাপারটা যথার্থ বুঝেছিল। যারা যথার্থ গান্ধীবাদী শুধু তারাই উপলব্ধি করতে পারলো এর অন্তর্নিহিত আদর্শ। সংযত, পবিত্র, ভোগবর্জিত জীবনযাপনই যে আধ্যাত্মিক অনুশীলনের প্রথম পদক্ষেপ,

www.pathagar.com

এ সত্য অনেকের কাছেই অবলোকিত নয়। গান্ধীজীর জীবনে এই মহান অধ্যাত্ম সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল সেই ১৯০৬ সালে যখন তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় দুর্বহ মানসিক অস্থিরতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। কস্তুরবার কাছে তখনই তিনি ব্রহ্মচর্য পালনের কথা বলেন। সেদিন তিনি ইন্দ্রিয়সংযমের যে শপথ নেন তা হিন্দুধর্মের মতনই প্রাচীন।* শতশত বছর ধরে সাধকরা এই পথেই আত্মিক উৎকর্ষ লাভ করেছে। আত্মোপলব্ধির এই উৎকর্ষের মধ্যেই নিহিত আছে প্রাণসৃষ্টির প্রেরণা। প্রাচীন হিন্দু ঋষিরা মনে করতেন যে, অপরিমেয় যৌনশক্তিকে অন্তরমুখী করে মানুষ তার অধ্যাত্মতেজ উদ্দীপ্ত করতে পারে এবং সেই পথেই তার যথার্থ আত্মোপলব্ধি হয়।

যারা সংযত, পবিত্র জীবন যাপন করতে চায় তাদেরও নির্দেশ দিয়ে গেছেন হিন্দু ঋষিরা। ব্রহ্মচর্যের ন'টি বিধান প্রণয়ন করেছেন তাঁরা। এই ন'টি বিধান হলো কৌমার্যরক্ষার উপায়। নির্দেশগুলি এই রকম। যে যথার্থ ব্রহ্মচারী সে নারী, ক্লীব বা অন্তজ্য জীবের সঙ্গে বাস করবে না। নারীর সঙ্গে সে একাসনে বসবে না এবং কোন নারীঅঙ্গের দিকে তাকাবে না। যে বস্তুর সংস্পর্শে যৌনইচ্ছা উদ্দীপ্ত হয় যেমন গরম জলে স্নান বা গা মালিশ করা ইত্যাদি অভ্যাসগুলোও তার পক্ষে নিষিদ্ধ। এমনকি ঘি, দুধ বা দৈ জাতীয় স্নেহপদার্থ ভোজন করাও তার পক্ষে বারণ।

পবিত্র হবার জন্যে গান্ধীজী হিমালয়ের গুহায় যান নি। তেমন পবিত্রতার জন্যে খুব সামান্যই আত্মসংযম এবং চরিত্রনিষ্ঠার দরকার হয় বলে মনে করতেন তিনি। ইন্দ্রিয়সংযমের এই শপথ তিনি নিয়েছিলেন যৌনশক্তি নিয়ন্ত্রণ করে অধ্যাত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করতে, যাতে তাঁর লক্ষ্য পূর্ণ হয়। গান্ধীজীর কল্পনার যে ব্রহ্মচারী তার সম্ভোগেচ্ছা থাকে না। সে মুক্ত মনের পুরুষ। নারী সমাজে সে স্বচ্ছন্দে বিহার করতে পারে। তার নিজের যেমন সম্ভোগেচ্ছা নেই, তেমন নারী মনেও সে বাসনার উদ্রেক করে না। গান্ধীজী লিখেছেন, 'আমার কাছে সেই-ই যথার্থ ব্রহ্মচারী যে নারীসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চায় না।' কারণ সেই মুক্ত পুরুষের দৃষ্টিতে 'নারী ও পুরুষের ব্যবধান তখন দূর হয়ে গেছে।' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন, 'যথার্থ ব্রহ্মচারীর কাছে পুরুষ জননেন্দ্রিয় এবং স্ত্রীযোনির পৃথক সত্তা থাকে না। ওই দুটি শারীরযন্ত্র শুধুই প্রতীক। যৌনবোধহীন। ফলে পুরুষের সংরক্ষিত বীর্য তার অস্তিত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয় এবং তাকে বীর্যবান করে তোলে।' গান্ধীজী বলতেন, 'সেই যথার্থ ব্রহ্মচারী যে সুন্দরী ভেনাসের নগ্নশরীরের পাশে নির্ভয়ে শুয়ে থেকেও মানসিক বা শারীরিক বিকার বোধ করে না।'

এ এক অসাধারণ আদর্শ এবং লড়াই করে এর নাগাল পাওয়া আরও দুঃসাধ্য ছিল গান্ধীজীর কাছে। মানুষের যৌনবোধ এত নিবিড়ভাবে তার মনে আবিষ্ট হয়ে আছে যে তাকে দমন করার সব চেষ্টাই কঠিন। তাই শপথ নেবার পর বেশ ক'টা বছর নতুন খাদ্যাভ্যাসের পরীক্ষা চালালেন গান্ধীজী। কখনো এটা, কখনো ওটা।

---

* গান্ধীজীর এই শপথগ্রহণের সবটাই শুধু হিন্দুর ধর্মীয় প্রেরণা নয়। খ্রীষ্টের অনুশাসনবাণীও তাঁকে অহিংসানীতিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর অহিংসানীতির মূল আদর্শ হলো অন্য গাল এগিয়ে দেবার নীতি। তাই ক্লীবদের উদ্দেশে যীশুর ওই সপ্রেম বাণী, 'যারা আমার প্রেমের জন্যে ক্লীব হলো ইত্যাদি, ইত্যাদি,' গান্ধীজীকে ব্রহ্মচারীর জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে।

www.pathagar.com

মোটকথা যেসব খাদ্যাভ্যাস থেকে যৌন উত্তেজনা বাড়ে, সেগুলো তাঁর খাদ্যতালিকা থেকে তিনি সযত্নে বাদ দিতে লাগলেন। দেশের হাজার হাজার সাধারণ মানুষ যখন উত্তেজক খাদ্যবস্তু খেয়ে প্রবৃত্তির বৃদ্ধি করতো, গান্ধীজী তখন এমন সব খাবার বাছতেন যা খেলে ইন্দ্রিয়সংযম হয়। মসলা, লঙ্কা, সবুজ আনাজ এবং বিশেষ রকমের কিছু ফল তিনি স্পর্শই করতেন না।

মোটকথা, প্রায় তিরিশ বছর সময় তাঁর লেগেছিল মনের অন্ধকার গহ্বর থেকে ইন্দ্রিয়বৃত্তির শিকড়টা উপড়ে ফেলতে। তবুও তিনি পুরোপুরি সফল হতে পারেন নি। যখন তাঁর মনে হলো যে সাধনা সম্পূর্ণ হয়েছে, তখনই এমন একটা ঘটনা ঘটলো যাতে তাঁর সব গর্ব ভেঙে গেল। ১৯৩৬ সাল। বোম্বাই শহরের এক অন্ধকার গভীর রাতের ঘটনা সেটা। তখন তাঁর সাতষট্টি বছর বয়স। এই ঘটনাটা উল্লেখ করে গান্ধীজী বলেছেন, 'আমার জীবনের সবচেয়ে অন্ধকার মুহূর্ত।' কিন্তু তিরিশ বছর ব্রহ্মচারীর জীবনযাপনের পর কী সেই ঘটনা যা তাঁর জীবনের সবচেয়ে 'ডার্কেস্ট আওয়ার?' একটা দুঃস্বপ্ন দেখতে দেখতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। গান্ধীজী সভয়ে দেখলেন যে তাঁর জননেন্দ্রিয় সবল তেজী হয়ে গেছে। তাঁর বয়সের বুড়োদের কাছে ঘটনাটা পরম আহ্লাদের হলেও গান্ধীজীর কাছে ব্যাপারটা সত্যিই সর্বনেশে। বাস্তবিকই ডার্কেস্ট আওয়ার। থরথর করে, শুধু দেহ নয়, তাঁর অন্তরাত্মাও কেঁপে উঠলো এই ভয়ংকর অঘটনে। তিনি বুঝতে পারলেন যে এতদিন ধরে যার জন্যে তিনি লড়াই করে চলেছেন, সেই লক্ষ্যে তিনি পৌঁছতে পারেন নি। আরও দীর্ঘ-পথ তাঁকে চলতে হবে। এই 'ভয়াবহ দুর্ঘটনায়' গান্ধীজী এত মনমরা হয়ে যান যে, তখনই প্রতিজ্ঞা করলেন আবার সাধনায় বসবেন এবং দুটি সপ্তাহ তিনি পুরোপুরি মৌনী থাকবেন।

ফের আত্মপরীক্ষায় বসলেন তিনি। তাঁর মনে হতে লাগলো তবে কি পাহাড়ের গুহায় গিয়ে সাধনা করতে হবে তাঁকে? শেষমেশ তিনি সিদ্ধান্ত করলেন এটা একটা চ্যালেঞ্জ। ওই রাতের বীভৎস দুঃস্বপ্নটা তাঁর ওপর যেন এক অশুভ শক্তির প্রভাব ফেলেছে। যাতে তাঁর অধ্যাত্মশক্তির বিকাশ না হয়। শ্রেয়াংসী বহুবিঘ্নানী। অতএব সমস্ত সত্তা দিয়ে নতুন করে কৃচ্ছ্রসাধনায় বসতে হবে তাঁকে। যাতে আত্ম-দোষ ক্ষালন করে ইন্দ্রিয়সংযমের সাধনায় উত্তীর্ণ হতে পারেন। যাতে তাঁর জীবন থেকে কামবৃত্তি নির্মূল হয়।

ধীরে ধীরে আত্মনিয়ন্ত্রণ বেড়ে গেল। এখন তিনি মনের কামনা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। পুরোপুরি কর্তৃত্ব এসেছে দেখে গান্ধীজী আরও ঘনিষ্ঠভাবে মেয়েদের সঙ্গে মিশতে লাগলেন। ওরা যখন অসুস্থ হতো তখন গান্ধীজী ওদের সেবা করতেন। আবার যখন তিনি অসুস্থ হতেন তখন যুবতী মেয়েরা তাঁর সেবা করতো। যখন তারা তাঁর হাত পা মালিশ করতো তখন গান্ধীজীর পরনে খুবই সামান্য বসন থাকতো। সেই অবস্থাতেই গান্ধীজী অন্য নেতাদের সঙ্গে কখনও রাজনীতির আলোচনা করতেন, কখনও বাইরের লোকের সঙ্গে আলাপ করতেন, কখনও বা সংবাদপত্রের লোকেদের কাছে ইন্টারভিউ দিতেন। তিনি নিজে যেমন সামান্য পরিধেয় পরতেন, তেমনি আশ্রমবাসীদেরও সেইভাবে পরামর্শ দিতেন। গান্ধীজী বলতেন যে বিলাসী এবং শৌখীন জামাকাপড় পরে মানুষ নকল ভদ্রতা শেখে, যা তার আসল রূপ নয়। উইন্সটন চার্চিলের বিখ্যাত 'হাফ-নেকেড ফকির' উক্তির বিরুদ্ধে গান্ধীজী বলেছিলেন যে তিনি দুই-ই হতে চান। ফকির এবং অর্ধনগ্ন।

www.pathagar.com

কারণ নগ্নতাই মানুষের নিষ্কলুষ রূপ প্রকাশ করে। তাঁর অনুগামীদের তিনি বলেছিলেন যে যারা নিষ্কলুষ ও পবিত্র, যারা ভাবের ঘরে চুরি করে না, কাজের গতিকে সেইসব ছেলেমেয়েদের যদি একঘরে রাত্রিবাস করতে হয় তাহলেও কোন সমস্যা হয় না।

গান্ধীজীর মনে হয়েছিল যে মনুর সংগে রাত্রিবাসের সিন্ধান্তটা যেমন তার আধ্যাত্মিক বিকাশের দিঙ্‌নির্ণয় করবে, তেমনি এর ফলে তাঁর দর্শনেরও প্রচার হবে। পদযাত্রার সেইসব কঠিন যন্ত্রণাময় দিনগুলোয় মনুর ক্ষীণ শরীর যেন ছায়ার মতন তাঁকে অনুসরণ করেছে। এমন দিন ছিল না যখন মনুকে তাঁর পাশে দেখা যায় নি। গ্রামের পর গ্রাম একসংগে পথ হেঁটেছেন। গ্রামের গরিব চাষীরা যেখানে আশ্রয় দিয়েছে, সেখানেই মাথা গুঁজে থেকেছেন। সারাদিনের পদযাত্রার পর তাঁর হা-ক্লান্ত দেহটা মনুর হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। মনু তাঁর সেবা করেছে। হাত পা টিপে দিয়েছে। একবার তাঁর পেটের অসুখ হলো। অতিসারে কাহিল হয়ে পড়লেন গান্ধীজী। মনুই তাঁর সেবা করলো এক শয্যায় শুয়ে। তাঁরা দুজনে একসংগে ঘুমিয়েছেন, একসংগে প্রার্থনা করেছেন, একই ভিক্ষান্ন থেকে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছেন। মনু যেন তাঁর সর্বক্ষণের ছায়া। একবার ফেব্রুয়ারি মাসের এক কনকনে শীতের রাতে মনুর ঘুম ভেঙে গেল। সে উঠে দেখলো যে, পাশে শুয়ে গান্ধীজী ঠকঠক করে কাঁপছেন। গান্ধীজীর শরীরে উত্তাপ আনতে সে তাঁর হাত পা ডলে দিতে লাগলো। কুঁড়ের মধ্যে যেখানে যত কাঁথাকাপড় ছিল সব এনে তাঁকে ভালভাবে মুড়ে দিল। তবুও কাজ হলো না দেখে বৃদ্ধকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়লো পাশাপাশি। গান্ধীজী ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে চোখ খুলে মনু দেখলো যে সেই অবস্থাতেই তাঁরা সারারাত পাশাপাশি শুয়ে দুই শরীরের উত্তাপে উষ্ণ হয়েছেন।

তাঁর শুদ্ধ বিবেকের কাছে গান্ধীজী এত নিরাপদ ছিলেন যে, মনুর সংগে এই সম্পর্কের মধ্যে কোনরকম অবৈধতার হস্তক্ষেপ ছিল না। এই সম্পর্ক ছিল যেন 'নিকষিত হেম।' কামগন্ধের লেশমাত্র ছিল না তাতে। গান্ধীজী সেখানেই প্রকৃত মহাত্মা কারণ মনুর প্রতি এটা তাঁর পবিত্র কর্তব্য বলেই ধরে নিয়েছিলেন তিনি। এই নৈতিক সমর্থন ছিল বলেই তিনি কাজে প্রেরণা পেতেন। সম্ভবত, তাঁর গভীর অবচেতনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অন্য শক্তিগুলো যা তিনি এড়িয়ে যেতেন, সেগুলোই তাঁকে সঠিক পথ চিনিয়ে দিয়েছিল।

জীবনের সায়াহ্নে গান্ধীজী প্রায় একা, নিঃসংগ হয়ে যান। সহধর্মিণী গত হয়েছেন, ঘনিষ্ঠ সহযোগীরাও ইংরেজের কারাগারে যুদ্ধবন্দী হয়ে আছেন। এতদিন ধরে স্বাধীন ভারতের যে স্বপ্নসৌধ নির্মাণ করে এসেছেন, তাও বুঝি ভেঙে পড়ে। গান্ধীজীর মেয়ে নেই। তাঁর আপাত সার্থক জীবনযাত্রার একটাই ত্রুটি যে তিনি পিতৃকর্তব্য পালন করেন নি। অন্তত বড় ছেলের অভিযোগটা সেইরকমই ছিল। ছেলের সংগে বহুকালই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। বাবাকে নিয়ে তারও অভিযোগ কম নয়। সে নাকি কোনদিনই পিতৃস্নেহ পায় নি। নিজেকে নিয়েই চিরকাল ব্যস্ত থেকেছেন গান্ধীজী। এই বঞ্চনাই গান্ধীজীর বড় ছেলেকে প্রায় অমানুষ করে দেয়। এই বেহেড মদ্যপ লোকটা তার মায়ের মৃত্যুশয্যার পাশেও মাতাল হয়ে পড়েছিল। অন্য দুই ছেলের সংগেও গান্ধীজীর কচিৎ যোগাযোগ হতো। তারা দুজনেই সাউথ আফ্রিকায় থাকতো। পিতাপুত্রের স্বাভাবিক সম্পর্কটা বজায় ছিল শুধু ছোটছেলের

www.pathagar.com

সঙ্গে। মোটকথা রটনা যেমনই হ'ক, ওই লাজুক মুখচোরা মেয়েটার সঙ্গে বৃদ্ধ গান্ধীজীর একটা গভীর আধ্যাত্মিক প্রীতির নিবিড় বন্ধন গড়ে উঠেছিল। সেদিন বৃদ্ধের ছায়াসঙ্গিনী হয়ে ওই নতমুখী মনুই তাঁর শেষ জীবনের দুর্ভার দিনগুলিতে অম্লান নক্ষত্র হয়ে তাঁকে পথ দেখিয়েছে, তাঁর নানাবিধ দুঃখক্লেশের ভাগিনী হয়েছে।

এদিকে গান্ধীজীকে ঘিরে ঘোর কুটিল জনরবটা তখন নোয়াখালির সংকীর্ণ বৃত্ত ছাড়িয়ে আরও বড় হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। কুৎসা রটনা করে কান ভারী করে দিচ্ছে মুসলিম লীগের কর্মকর্তারা। উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই তারা এ কাজ করছিল। ক্রমে গান্ধীজীকে ঘিরে অপবাদের জ্বলন্ত টুকরোগুলো দিল্লিতেও পৌঁছে গেল। দিল্লির কংগ্রেসী নেতারাও দারুণ মর্মাহত, কারণ নতুন বড়লাটের সঙ্গে দিনকয়েকের মধ্যেই গুরুতর আলোচনায় বসার কথা তাদের।

এই নিদারুণ সংকট সময়েই গান্ধীজী হঠাৎ স্থির করলেন যে হাটে হাঁড়ি ভাঙবেন। যা সত্য তা সবাইকে প্রার্থনা সভায় জানাবেন এবং এই 'গুজগুজ, ফিসফাস আর পরোক্ষ ইঙ্গিতের' সামনাসামনি হবেন। সাহসের সঙ্গে এবার তাঁর প্রার্থনাসভায় গান্ধীজী সত্যিই হাটে হাঁড়ি ভাঙলেন। যা ঘটনা তাই-ই শোনালেন সবাইকে। স্বীকার করলেন যে, রোজ রাত্রে নাতনী মনুকে নিয়ে তিনি এক শয্যায় শোন। কেন শোন তাও বললেন। ঘনিষ্ঠ এবং অন্তরঙ্গেরা নিস্তব্ধ হয়ে সে কথা শুনলো। তারা শান্তও হলো। কিন্তু এই স্বীকারোক্তি দারুণ বিপরীত ঝড় তুললো অন্যত্র। 'হরিজন' পত্রিকায় ছাপাবার জন্যে খবরটা পাঠিয়েছিলেন গান্ধীজী। প্রথম প্রতিক্রিয়া হলো সেখানে। প্রতিবাদে দুজন সম্পাদক চাকরি ছাড়লেন। তবে পত্রিকার ট্রাস্টিবোর্ড যা করলেন তা অকল্পনীয়। কুৎসা প্রকাশের ভয়ে তাঁরা গান্ধীজীর নিজের হাতে লেখা নোটটা ছাপালেনই না।

সংকট চরমে পৌঁছল যখন নোয়াখালির হৈমচর গ্রামের প্রার্থনা সভায় গান্ধীজী ঘোষণা করলেন যে বিহারের গ্রামে গিয়ে সেখানকার হিন্দুদের সঙ্গে দাঙ্গাবিধ্বস্ত মুসলমান পাড়ায় শান্তি মিছিল বের করবেন। হৈমচর হলো তাঁর পরিক্রমার শেষ গ্রাম। সেখান থেকে বিহারে যাবার এই পরিকল্পনার কথা শুনে দিল্লির কংগ্রেসী নেতারা প্রমাদ গুনলো। বিহারের সংখ্যালঘু মুসলমানদের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনাই ছিল গান্ধীজীর লক্ষ্য। কিন্তু কংগ্রেসী নেতারা ভাবলো মনুর সঙ্গে গান্ধীজীর সম্পর্ক নিয়ে বিহারের গোঁড়া হিন্দুরা তুমুল অশান্তি করতে পারে। সুতরাং যেমন করে হ'ক গান্ধীজীকে এই সংকল্প থেকে নিরস্ত করতে হবে। গোপনে অনেক দূত দিল্লি থেকে হৈমচরে এলেন। তাঁরা অনেকভাবে চেষ্টা করলেন গান্ধীজীকে বোঝাতে। কিন্তু গান্ধীজীও গোঁ ধরে থাকলেন। বিহারে তিনি যাবেনই।

শেষপর্যন্ত এই দূতেদের মধ্যে কেউ বোধহয় মনুকে অনুরোধ করেছিলেন। তাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়িয়ে যেতে পারলো না মনু। সে রাজী হলো গান্ধীজীকে ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝাতে। একদিন গান্ধীজীকে সে যা বললো তাতে স্তম্ভিত হলেন তিনি। মনু বললো যে ক্ষুদ্রবুদ্ধির মানুষের জন্যে অন্তত কিছুদিনের জন্যে এক শয্যায় তাদের শোয়া উচিত নয়। সাধারণ মানুষ গান্ধীজীর আদর্শ কোনদিনই বুঝবে না। কিন্তু এর বিকৃত প্রতিক্রিয়া হবে যদি ব্যাপারটা বন্ধ করা না হয়। সুতরাং সব-দিক ভেবেই মনু জানালো যে গান্ধীজীর সঙ্গে সে

www.pathagar.com

বিহারে যাবে না। মনে ব্যথা পেলেও গান্ধীজী সেদিন মনুর কথায় রাজী হতে বাধ্য হয়েছিলেন।

নতুন দিল্লি—মার্চ ও এপ্রিল ১৯৪৭

নিখুঁত, পাটভাঙা, ধপধপে সাদা নৌসেনার পোশাকে মানুষটাকে ঠিক চলচ্চিত্রের নায়কের' মতন দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছে যেন প্রথম সারির প্রহরী সেনাদলের (Grenadier Guards) ক্যাপ্টেনের এ.ডি.সি. হয়ে তিনি সদ্য কাজে বহাল হয়েছেন। একমুখ হাসি নিয়ে লাটপ্রাসাদের সামনে সোনালী রঙের ল্যান্ডো গাড়ি থেকে নামলেন মানুষটি। পাশে সুন্দরী স্ত্রী। তাঁরও মুখখানা হাসিতে উজ্জ্বল। ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে এই বিশেষ ধরনের ল্যান্ডো গাড়িখানা সম্রাট পঞ্চম জর্জের দিল্লি আগমনের সময় তৈরি হয়েছিল। সেই গাড়িখানা চড়েই আজ যিনি লাটপ্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনিই হলেন ভারতের শেষ বড়লাট। লাটপ্রাসাদের চওড়া গ্র্যান্ড স্টেয়ারকেসের প্রথম ধাপের কাছে সস্ত্রীক এসে পোঁছতেই তাঁর সম্মানে রয়্যাল স্কট গোরা সৈনাদলের ব্যাগপাইপ থেকে ওয়েল্‌কম্‌ সুর বেজে উঠলো। হ্যাঁ, লুই মাউন্টব্যাটেনকে শেষ বড়লাটরূপে অভ্যর্থনা জানালো ভারত।

তখন সোপানের একেবারে উপরের ধাপে দাঁড়িয়ে আছেন আর একজন মানুষ। তিনি বিদায়ী বড়লাট লর্ড ওয়াভেল। তাঁর মুখে বিষণ্ণ একখানি হাসি। দিল্লি মহানগরীর ইতিহাসে এমন ঘটনা আগে ঘটে নি। দুজন বড়লাটের সাক্ষাতের এই ঘটনা ঐতিহ্যবিরোধী। সাধারণত বিদায়ী বড়লাটকে ধুমধামের সংগে গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়ার জাহাজঘাট থেকে কুলোর বাতাসে বিদায় দেবার পর নতুন বড়লাটের জাহাজ নোঙর করতো। এটাই রীতি। হয়ত একই সময়ে দুই দেবতার আবাহনের জাঁক-জমকের বিড়ম্বনা থেকে হতভাগ্য দরিদ্র দেশটাকে রেয়াত দিতেই এইরকম একটা প্রথা তৈরি করা হয়েছিল। তা এবার সেই প্রথাটাই ভাঙা হলো মাউন্টব্যাটেনেরই আগ্রহে। বিদায়ী বড়লাটের সংগে নিভৃতে কিছু আলোচনা করতে চান নতুন বড়লাট। আর তাই এই ব্যবস্থা। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে নতুন বড়লাট মাথা নিচু করে বাও করলেন লর্ড ওয়াভেলকে। সংগে সংগে ঝকমক করে জ্বলে উঠলো ক্যামেরার ফ্ল্যাস বাল্ব।

একটা মুহূর্ত। সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আছেন দুই বড়লাট। মুহুর্মুহু জ্বলে উঠছে ফ্ল্যাস বাল্ব। কিন্তু কত আলাদা এই মানুষ দুজন। একজন দারুণ সফল। বয়সে তরুণ এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশে ঝলমল করছেন যেন। মনোরম এই ব্যক্তিত্বের প্রভায় সবাই মন্ত্রমুগ্ধ। যথার্থই বিজয়ীর মতন দেখাচ্ছিল তাঁকে। যেমন আত্মবিশ্বাস, তেমনি ভরপুর জীবনীশক্তি তাঁর। অন্যজন যেন জীবননাট্যের একজন হেরে যাওয়া পার্শ্বচরিত্র। হতভাগ্য মানুষটি সর্বক্ষেত্রেই অসফল। একটা চোখ দৃষ্টিহীন এবং বৃদ্ধ এই মানুষটি প্রায় সবই হারিয়ে বসেছেন তখন। কর্মচারীদের শ্রদ্ধাভক্তি পেলেও শেষ জীবনে লণ্ডনের রাজনীতিবিদদের হাতে এমন হেনস্তা আর কোন ভাইসরয়কে হতে হয় নি। তাই চাকরি খুইয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছেন তিনি। শুধু রাজনীতিবিদ নয়, ভাগ্যের হাতেও মার খেয়েছেন ওয়াভেল। অসুখী মানুষটা ক'দিন

www.pathagar.com

আগেও ডাইরির পাতায় তাঁর সেই দুর্ভাগ্যের কথাগুলো তাই অমন করুণভাবে লিখে গেছেন। তাঁর সেই ভাগ্য বিড়ম্বনার কথা বলতে গিয়ে ওয়াভেল লিখেছেন যে বিগত পাঁচ বছরে এদেশে তাঁর কাজ ছিল শুধু 'পিছুহটা এবং পরাজয়ের ধাক্কা সামলানো।'*

সামনাসামনি দাঁড়িয়ে দৃষ্টি বিনিময় হলো দুজনের মধ্যে। তারপর লর্ড ওয়াভেল সেগুন কাঠের ভারী দরজা ঠেলে স্টাডি রুমে নিয়ে গেলেন মাউন্টব্যাটেনকে। এই ঘরেই মাউন্টব্যাটেনের প্রথম জানাজানি হলো এখানকার সমস্যাগুলোর সংগে।

ওয়াভেলই প্রথম শুরু করলেন কথা। বললেন, 'আমার খারাপ লাগছে যে আমার জায়গায় ওরা তোমাকেই বাছলো।'

থমকে গেলেন মাউন্টব্যাটেন। ইতস্তত করে বললেন, 'হয়ত স্বাভাবিক বলে ; কিন্তু একথা কেন বলছেন ? আমি কি এই পদের যোগ্য নেই ?'

'না। সে কথা নয়।' শান্ত স্বরে বললেন বৃদ্ধ ওয়াভেল। তারপর একটু থেমে ফের বললেন, 'সত্যি কথা বলতে কি, তোমায় স্নেহ করি বলেই কথাটা বললাম। ওরা তোমায় প্রায় অসাধ্যসাধন করতে পাঠিয়েছে। আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব সব করেছি। কিন্তু সঙ্কটের অন্ধকার কাটিয়ে আলো দেখতে পাই নি। বোধহয়, আর কিছু করার নেই। প্রায় কোণঠাসা অবস্থায় পৌঁছে গেছি আমরা। হোয়াইট্ হল্ থেকেও আর কোনরকম সাহায্য পাচ্ছি না।'

কিভাবে চেষ্টা করেছেন তার অনুপুর্ব বিবরণ দিলেন ওয়াভেল। তারপর আলমারি খুলে লকার থেকে দুটো জিনিস বের করলেন। উপস্থিত এই বস্তুদুটোই তিনি তাঁর উত্তরাধিকারীর হাতে তুলে দিতে চান। প্রথমটা একটা কাঠের বাক্স। তার মধ্যে আছে ভেলভেট মোড়া একটা হীরে বসানো পদক। এর নাম অর্ডার অব্ দ্য স্টার অব ইণ্ডিয়া পদক। হীরার দ্যুতি ঝকমক করছে কৌটার মধ্যে। এখন থেকে ঠিক আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে বড়লাটপদে মাউন্টব্যাটেনের অভিষেকের পর এই চাপরাসখানা গলায় ঝোলাবেন মাউন্টব্যাটেন। দ্বিতীয়টা একটা ব্রাউন কাগজের ফাইল। ফাইলের গায়ে লেখা 'অপারেশন ম্যাড্‌হাউস।' মাউন্টব্যাটেন একটু অবাক হয়ে লেখাটার দিকে চেয়েছিলেন। ওয়াভেল বললেন যে এই নথির মধ্যেই আছে তাঁর তৈরি করা সমাধানসূত্র। মাউন্টব্যাটেন তখনও দ্বিধাগ্রস্ত। বুঝতে পারছেন না কেন এর নাম 'ম্যাড্‌হাউস।' ওয়াভেলই বুঝিয়ে দিলেন তাঁকে। বৃদ্ধ সৈনিক ম্লান হেসে বললেন, 'ম্যাড্‌হাউস ছাড়া আর কি বলি বলো ! এটা তো চূড়ান্ত পাগলামির ব্যাপার ! আমি তো আর কিছু ভেবে পাচ্ছি না এ ছাড়া।'

'আপনার প্রস্তাবটায় কি আছে ?'

---

* ওয়াভেলের সঙ্গে খুবই নির্দয় ব্যবহার করেছিল এ্যাট্‌লির সরকার। তখন কথা পাকা হয়ে গেছে যে ওয়াভেলের জায়গায় বসবেন মাউন্টব্যাটেন। তিনিই হবেন ভারতের পরবর্তী বড়লাট আর ওয়াভেলকে ফিরিয়ে আনা হবে ইংল্যাণ্ডে। ওয়াভেল তখন লণ্ডনেই ছিলেন। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও জানতেন না যে তাঁকে তাড়ানো হচ্ছে। নতুন নিয়োগের ব্যাপারটা খবরের কাগজওলাদের কাছে পাঠানোর কয়েক ঘণ্টা আগে ওয়াভেলকে এটা জানানো হয়। তখন এ্যাট্‌লিকে ব'লে ক'য়ে মাউন্ট-ব্যাটেনই তাঁর লর্ডশিপের ব্যবস্থা করেন। অথচ নিয়মমত সব বিদায়ী ভাইসরয়কেই এই সম্মান দেবার প্রথা চালু ছিল।

www.pathagar.com

ওয়াভেল একটু ভাবলেন। তারপর বুঝিয়ে বললেন যে এক এক করে প্রত্যেক প্রদেশ থেকে ইংরেজদের এখান থেকে চলে যাবার কথা বলেছেন তিনি। প্রথমে যাবে মেয়েরা এবং বাচ্চারা। তারপর সাধারণ সিভিলিয়্যান মানুষ এবং সবশেষে যাবে সামরিক বিভাগের লোকেরা। এককথায়, গান্ধীজী যেমন বলেছেন অর্থাৎ, 'দেশটাকে অরাজক অবস্থার মধ্যে ফেলে' ইংরেজের ভারত ছাড়ার প্রস্তাব করেছেন ওয়াভেল।

মাউন্টব্যাটেনের দৃষ্টিতে তখনও সেই বিব্রতভাব রয়েছে দেখে ওয়াভেল বললেন. 'বুঝতে পারছি যে সমাধানটা ভয়াবহ হয়েছে। কিন্তু এ ছাড়া আর ত কিছু করার নেই আমার!' ওয়াভেল এরপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন. তারপর ফাইলটা নিয়ে স্তম্ভিত মাউন্টব্যাটেনের হাতে দিয়ে বললেন, 'আমি দুঃখিত, খুবই দুঃখিত।'

কাজের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের অভিজ্ঞতাটা নতুন বড়লাটের কাছে যে মোটেই সুখকর হয়নি তা বলাই বাহুল্য। প্রায় একই রকম বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্বাদ পেলেন বড়লাটগিন্নী শ্রীমতী এডুইনা মাউন্টব্যাটেনও। স্টাডি রুমের ঠিক ওপরেই চাকর-খানাসামাদের কোয়ার্টার্স। ওদের কোয়ার্টার্সে গিয়ে শ্রীমতী এডুইনা তাঁর আদরের দুটো কোলপোষা টেরিয়ার কুকুরের জন্যে কিছু খাবার চাইলেন। লণ্ডন থেকে এই দুটো ছোট টেরিয়ার সঙ্গে এনেছেন তিনি. মিজেন্ আর জীব্ (Mizzen and Jib)। ওরা কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইলো এডুইনার দিকে তারপর ঘাড় নাড়লো। আধ ঘণ্টাটাক পরে মাথায় ইয়া পাগড়ি বাঁধা দুজন জবরদস্ত চেহারার খানসামা মার্চ করে শ্রীমতী মাউন্টব্যাটেনের ঘরে ঢুকলো। তাদের দুজনেরই হাতে রুপোর ট্রে। থালার ওপর বসানো সদ্য ঝলসান ঠ্যাং এবং মাথাবিহীন দুটো কুক্কুটশাবক। অর্থাৎ চিকেন রোস্ট।

শ্রীমতী এডুইনা মাউন্টব্যাটেনের চোখ দুটো তখন প্রায় ছানাবড়া হয়ে গেছে। বিস্ফারিত চোখে ঝলসান চিকেন দুটোর দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। ইদানীং ইংল্যাণ্ডে খাদ্যবস্তুর যেমন কড়া নিয়ন্ত্রণ বিধি. তাতে এমন লোভনীয় ভক্ষ্য-বস্তু বহুকাল কপালে জোটেনি। তাই লোলুপ দৃষ্টি দিয়ে ধূমায়িত চিকেন রোস্ট আগেই ভক্ষণ করে নিলেন। একবার শুধু ক্ষুধার্ত টেরিয়ার দুটোর দিকে তাকালেন। তাঁর পায়ের কাছে ঘেউ ঘেউ করে লুটোপুটি খাচ্ছিল সারমেয় দুটো। কিন্তু না। এমন পুষ্টিকর আহার্য ওদের দেওয়া যায় না। সুতরাং খানসামাদের দিকে চেয়ে বললেন. 'ওটা আমায় দাও।' ওরা রুপোর ট্রে নামিয়ে রেখে চলে গেল। এডুইনাও তাড়াতাড়ি ট্রে দুটো নিয়ে বাথরুমে ঢুকে ছিটকিনি তুলে দিলেন। তারপর স্নানঘরের সংগোপনে বসে লাটপ্রাসাদের অন্নপূর্ণা তৃপ্তির সঙ্গে ভক্ষণ করলেন ধোঁয়া ওঠা দুটো চিকেন রোস্ট।

*　　　*　　　*

১৯৪৭ সালের ২৪শে মার্চ—একটা ঘটনাবহুল কাহিনীর শেষ অধ্যায় লেখা এবার শুরু হলো। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সিংহাসনারূঢ় হবেন ভারতের শেষ ভাইসরয়। গাঢ় লাল আর উজ্জ্বল হলুদসোনা রঙের সিংহাসনে বসবেন শেষ ইংরেজ লাটসাহেব. লুই মাউন্টব্যাটেন। গৌরবময় ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের বিংশতম এবং সর্বশেষ রাজপ্রতিনিধি রূপেই তিনি সিংহাসনে বসবেন। এবং ধারাবাহিক ঐতিহ্যের সর্বশেষ বাহক হয়ে তিনি যে রাজদণ্ডটি হাতে নেবেন. সেই ঐতিহ্যধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে হেস্টিংস থেকে। তারপর ওয়েলসলী. কর্নওয়ালিস এবং কার্জন হয়ে এই ধারা শেষ হবে তাঁর মধ্যে।

www.pathagar.com

এই সমারোহপূর্ণ অভিষেকের মঞ্চভূমি হলো বিখ্যাত ঐতিহাসিক দরবার হল। এর পরিসর এত বিশাল যে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে হয়। ভয়ভক্তিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় বোধহয় জগতে এর জোড়া নেই। এ যেন এক ইন্দ্রপুরী। কিছুটা তুলনা করা যায় ফ্রান্সের ভার্সেই আর রুশদের জার সম্রাটদের পীটারফ প্রাসাদের সঙ্গে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী দম্ভের নির্লজ্জ প্রকাশ হয়েছে এই প্রাসাদের নির্মাণে। শুধু একজনের ভোগের জন্যে দিল্লির এই লাটভবন হলো এই শতাব্দীর একটা লজ্জা। শুধু ভারতই পারে তার দেশের লক্ষ লক্ষ নিরন্ন দরিদ্র মানুষকে বঞ্চিত করে এমন এক ইন্দ্রভবনকে টিকিয়ে রাখতে।

প্রাসাদভবনের বহির্গাত্রের (ফ্যাসাড) অলংকরণ করা হয়েছে মোগল স্থাপত্যের নকলে লাল সাদা পাথর বসিয়ে। প্রাসাদের মেঝে এবং দেওয়ালগুলো চিত্রিত করা হয়েছে রঙিন মার্বেল পাথর বসিয়ে তাজমহলের অনুকরণে। এর দরবার হল এত লম্বা যে দরদালানের গৃহতলের (বেসমেন্ট) এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে চাকরবাকরেরা সাইকেল ব্যবহার করে।

প্রাসাদের অসংখ্য ভৃত্যকুল আজ মহাব্যস্ত। কেউ পাথরের মেঝে নিকোচ্ছে, কেউ দরজার পাল্লা আর পিতলের হাতল মেঝেঘষে ঝকমকে করছে। প্রাসাদের মোট তিনশ' চল্লিশটা শয়নঘর আর সাঁইত্রিশটা রিসেপশন ঘরের সব ক'টিতেই পরিষ্করণের কাজ হচ্ছে। কাজ হচ্ছে প্রাসাদসংলগ্ন মোগল গার্ডেনেও। উদ্যান-পালকের সংখ্যা চারশ' আঠারো জন। প্যারিসের ভার্সাই প্রাসাদভবনের সংরক্ষণের জন্যে সম্রাট চতুর্দশ লুই যত মালী রাখতেন তার চেয়েও বেশি মালী কাজ করে লাটপ্রাসাদের বাগানে। এদের কেউ চতুষ্কোণ ঘাসজমির তদারকি করছে, কেউ ফুলের বাগান সাজাচ্ছে, কেউ দেখছে খিলানযুক্ত ছোট ছোট জলধারার প্রবাহ। প্রায় পঞ্চাশ-জন বাচ্চা নিয়োগ করা হয়েছে বাগান থেকে পাখি তাড়াবার জন্যে। পাঁচশ জন শিখ ঘোড়সওয়ার আস্তাবলের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাদের পোশাক পরছে। বড়লাটের খাস দেহরক্ষী এরা। আর খানিকক্ষণের মধ্যেই কালো রঙের তেজী ঘোড়ায় সওয়ার হবে এরা। সারা প্রাসাদ জুড়েই ঝলমল করছে ওদের লালহলুদ রঙের উষ্ণীষ। ওদের পরনের সাদা পোশাকের ওপর আঁকা হয়েছে নতুন ভাইসরয়ের সাংকেতিক পরিচয়-চিহ্ন, কোট অব আর্মস। টানা বারান্দা দিয়ে শশব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে অন্য ভৃত্যেরা। মালী, বেহারা, রাঁধুনি, করণিক। ভাঁড়ারী, ঘোড়সওয়ার সবাই একত্রে আজ এই বিশাল কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

বিশাল ও সুরক্ষিত সামন্তান্ত্রিক প্রাসাদের মধ্যে যত আশ্রিত আছে তারা সবাই আজ ব্যস্ত। ব্যস্ত একজন বিদেশী কর্মচারীও। শুধু তারই মাথায় জড়ানো নেই লাল হলুদ রঙিন পাগড়ি। কারণ মানুষটা পাঞ্জাব বা রাজস্থানের রহনেওলা নয়। ওর নাম চার্লস স্মিথ। দক্ষিণ ইংল্যান্ডের গ্রামের ছেলে সে। প্রাসাদের একটা খাস ঘরে বসে এ্যাডমিরালের সাদা পোশাকটা একমনে পরীক্ষা করছে সে। এই সাদা উর্দিটা পরেই মাউন্টব্যাটেন আজ লাটভবনের সর্বময় কর্তৃত্ব হাতে নেবেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই অনুষ্ঠান হবে। তখন তিনিই হবেন এই প্রাসাদের একমাত্র অধীশ্বর।

স্মিথ তাই ভারি ব্যস্ত। গত পঁচিশ বছর ধরে সে মাউন্টব্যাটেনের সেবা করে আসছে। তাঁর পছন্দ অপছন্দের খুঁটিনাটি সে জানে। কাজের সুবাদে তাঁকে খুশী করার যোগ্যতা অর্জন করেছে স্মিথ। তার হাতে রয়েছে একটা হালকা নীল রঙের

www.pathagar.com

সিল্কের স্যাশ। এটা হলো অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাদল দ্য অর্ডার অব দ্য গার্টার সেনাদলের স্মারক স্যাশ। সাদা ইউনিফর্মের ডানকাঁধের শোলডার পীস-এর (epaulette) মধ্যে স্যাশটা গলিয়ে উর্দির গায়ের সঙ্গে আড়াআড়ি করে এ'টে দিল স্মিথ। একবার দেখে নিল উর্দির গায়ের সঙ্গে স্যাশটা টানটান করে পরানো হয়েছে কি না। তারপর ডানদিকের স্কন্ধত্রাণ (শোলডার পীস) থেকে ঝুলিয়ে দিল সোনার তৈরি ট্যাগ (এ্যাগলেট)। এটাই এই সামরিক পোশাকের পরিচয়চিহ্ন। পরিধানকারী ব্যক্তি যে সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের পার্সোন্যাল এ.ডি.সি. ছিলেন তার পরিচিতি-নিদর্শন হলো এই এ্যাগলেট।

এরপর ভেলভেটের বাক্স থেকে বিভিন্ন অর্ডারের মেড্যাল ও স্টার চিহ্নের পদক বের করলো স্মিথ। দ্য অর্ডার অব দ্য গার্টার, দ্য অর্ডার অব দ্য স্টার অব ইণ্ডিয়া, দ্য অর্ডার অব দ্য ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার এবং দ্য গ্র্যাণ্ড ক্রস অব দ্য ভিক্টোরিয়ান অর্ডার। সাম্মানিক এই সোনার পদকগুলো হলো প্রধান অর্ডারের সাম্মানিক উপাধি। এই মেড্যালগুলো না পরলে মাউন্টব্যাটেনের সামরিক পোশাক সম্পূর্ণ হবে না। তাই আর একবার মেজেঘষে সেগুলো চকচকে করতে বসলো স্মিথ।

কাজ করতে করতে স্মিথের কত কথাই মনে হতে লাগলো। রিবন ও ক্রস্ আঁকা এই পদকগুলোই যেন মাউন্টব্যাটেনের সুদীর্ঘ কর্মজীবনের সাফল্যের পরিচয় দিচ্ছে। কিন্তু শুধু কি তাঁর? চার্লস স্মিথ নামের এই যুবকও কি এই ঐতিহ্যের অংশীদার নয়? মাউন্টব্যাটের অধীনে থার্ড ফুটম্যান হিসেবে যেদিন সে এই কাজে বহাল হয় সেদিন তার বয়স মাত্র আঠারো। সেই থেকে ছায়ার মতন সে ওই মানুষটাকে অনুসরণ করে আসছে। কোথায় না কোথায় সে গেছে! ইংল্যাণ্ডের কান্ট্রি হাউস থেকে শুরু করে ইওরোপের সব ক'টি দেশের রাজধানী শহরে এবং নৌ কার্যালয়ে। সর্বত্রই সে সঙ্গে থেকেছে একনিষ্ঠ সেবকের মতন তাঁর সুখদুঃখ আনন্দ বেদনার সমব্যথী হয়ে। তার মনে পড়ে গেল সেই অবিস্মরণীয় দিনটার কথা। তখন বিশ্বযুদ্ধ চলছে। মাউন্টব্যাটেন এসেছেন পূর্বভূখণ্ডে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রধান শহর সিঙ্গাপুরের সিটি হল্ মঞ্চে নাটকের পর্দা উঠলো। দর্শকের আসনে বসে চার্লস স্মিথ নিবিড় চোখে তাকিয়ে আছে মঞ্চের ওপর উপবিষ্ট সুপুরুষ মাউন্টব্যাটেনের দিকে। ওঁর পরনের পোশাকটাও তারই তৈরি করা। গর্ব ও আনন্দের অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে তার দৃষ্টি। আজ সত্যিই আনন্দের দিন। একটু পরেই জাপানী সেনাবাহিনীর সেনানায়ক আত্মসমর্পণ করলো। তাঁর হাতে তুলে দিল আত্মসমর্পণের দলিল। স্থলবাহিনী, বিমানবাহিনী এবং নৌবাহিনীর এই আত্মসমর্পণ যেন ব্রিটেনের গা থেকে সেদিন মুছে দিয়েছিল অতীতের একটা পুরানো লজ্জা।

কিন্তু না। অলস অতীত চিন্তায় বিভোর হবার সময় এটা নয়। আজ অনেক বড় কাজের দায়িত্ব আছে তার ওপর। এই মুহূর্তে সে কোন ভুল করতে পারে না। চার্লস স্মিথ জানে যে তার মনিবপ্রভু মাউন্টব্যাটেন পোশাকের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে কত খুঁতখুঁতে। সামান্য ত্রুটিও তাঁর নজর এড়ায় না। সুতরাং ভুল করার অবকাশ তার নেই। পোশাক মঞ্চ (ড্রেস ডামি) থেকে এবার সে জ্যাকেট আর স্যাশটা হাতে নিল। তারপর বোতাম খুলে সেগুলো গায়ে চড়িয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াল। কিন্তু আয়নার গায়ে উর্দি পরা যে মানুষটার ছায়া পড়েছে সেটা কার? আবেগের একটা ছোট্ট মুহূর্ত যেন দোলা দিয়ে গেল তার মনে। কী তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্তটা!

www.pathagar.com

পলকের জন্যে তারও কি মনে হলো না যে ইণ্ডিয়ার ভাইসরয় সেই-ই ?

ভারিক্কি চেহারার অসংখ্য সাম্মানিক পদক আর অলংকরণে আঁটোসাঁটো জোব্বাটা গায়ে চড়াতেই মন যেন পঁচিশ বছর পিছিয়ে গেল মাউন্টব্যাটেনের। নিবিড় আত্ম-চিন্তায় ডুবে গেলেন তিনি। হ্যাঁ, সেই-ই তাঁর প্রথম ভারত দেখা। আবিষ্কারও বলা যায়। প্রিন্স অব ওয়েল্স্ এবং তিনি। সম্পর্কে ওঁরা দুভাই। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখছেন স্তম্ভিত হয়ে। সেদিন ভাইসরয় অব ইণ্ডিয়া নামক ওই রাজ-প্রতিনিধিকে ঘিরে উপচে পড়েছে বৈভবের সমারোহ। এত আড়ম্বর, এত বিলাসিতা, এত ভক্তিশ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠা ! এ ত অচিন্ত্যনীয় ! 'দেখিলেও না হয় প্রত্যয় !' যেন চোখের সামান্য ইসারায় দেশশুদ্ধ লোক পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়বে, এমনি ভাবখানা ওদের। এতসব কাণ্ডকারখানা দেখেশুনেই প্রিন্স অব ওয়েল্স্ তাই বোধহয় সেদিন বলেছিলেন, 'বুঝলে হে! ভারতের বড়লাটকে না দেখা পর্যন্ত আমি জানতেও পারতাম না রাজারা কিভাবে থাকেন।'

বাস্তবিক তাই। মাউন্টব্যাটেনের মনে পড়ে যাচ্ছে সেদিনের কথা। ওঃ ! সে কি ধুমধড়াক্কা কাণ্ডকারখানা ! বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন সেদিন তিন। তাঁর মনে হয়েছিল যেন সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ওই একজন ইংরেজ রাজপুরুষের মধ্যে কেন্দ্রিত হয়েছে আর বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ ভূখণ্ড যেন প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে ওই মানুষটার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে। তাঁর অবাক লাগছিল দেখে যে লাটপ্রাসাদের ঘরগেরস্থালির ঠাটঠমক যেন ইওরোপের ধনাঢ্য রাজারাজড়ার রাজসভাকেও হার মানায়। হার মানায় ভারতীয় রাজন্যকুলের প্রায় হারিয়ে যাওয়া ভোজসভার আড়ম্বর। পূর্ব-পশ্চিমের এমন যুৎসই মিলন ক্বচিৎ অন্যত্র দেখা যায়। তখন কে জানতো যে একদিন তাঁরই হাতে আসবে এই লাটপ্রাসাদের কর্তৃত্ব। কিন্তু ভবিতব্য কে খণ্ডায়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আজ তিনিই অধিশ্বর হতে চলেছেন এই বিশাল এস্ট্যাব্লিশমেন্টের, এই রাজসিক খ্যাতি, গর্বের। কিন্তু হায়! সে রাম নেই। সেই অযোধ্যাও এখন লুপ্ত গরিমা। উচ্ছল আনন্দসাগরে ভেসে বেড়াবার সময় এটা নয়। স্বপ্নের দেখা সেই ভারত এখন হারিয়ে গেছে তাঁর মনোভূমি থেকে। তাঁর যৌবনের স্বপ্ন হয়ত সার্থক হতে চলেছে কিন্তু ১৯২১ সালের সেই রূপকথার ভারত আর বোধহয় ফিরে আসবে না।

হঠাৎ দরজায় টোকা পড়লো। আচমকা ভেঙে গেল মাউন্টব্যাটেনের স্বপ্ন দেখা। চকিতে দরজার দিকে তাকালেন। এতটুকুও আবেগ নেই সে মুখে। বস্তুত এটাই মাউন্টব্যাটেনের বৈশিষ্ট্য। দরজার ফ্রেমে যে চেহারাটা ভেসে উঠেছে সেটা তাঁর স্ত্রী এডউইনার। পত্নীর মুখের দিকে তাকালেন। ও মুখ আজ গরবিনী। অনেকটা সেইভাব, 'তোমার গরবে গরবিনী হাম, রূপসী তোমার রূপে।' মাথার ঈষৎ লাল চুলের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে বহুমূল্য হীরের টায়রা। সিল্কের সাদা গাউনটা কেমন নিপুণ-ভাবে জড়িয়ে আছে ওর ছিপছিপে কোমল দেহবল্লরী ঘিরে। অনেকদিন আগের একটা মিষ্টি ছবি চোখের ওপর ভেসে উঠলো মাউন্টব্যাটেনের। ওয়েস্টমিনস্টারের সেন্ট মার্গারেট গির্জা থেকে হাত ধরে বেরিয়ে আসছেন গরবিনী এডউইনা। হুবহু সেই ভাব, সেই ভঙ্গি।

*   *   *

স্বামীর মতন এডুইনাও যেন খানিকটা ভাগ্যের মর্জির হাতে নিজেকে সঁপে

www.pathagar.com

দিয়েছিলেন। বলা যায়, ভাগ্যই তাকে গড়েপিটে দিয়েছে। অথচ তাঁর রূপ ছিল, তীক্ষ্ন বুদ্ধির ধার ছিল। লোকে এমনও বলে যে তাঁর স্বামীর চেয়েও তিনি নাকি বুদ্ধিমতী। রূপ বুদ্ধির সংগে বিত্তও পেয়েছেন এড্‌উইনা। উত্তরাধিকার সূত্রে দাদামশাই স্যর আর্নেস্ট ক্যাসেলের অগাধ সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। তাছাড়া ছিল বনেদী পারিবারিক ঐতিহ্য। এটা পেয়েছেন পিতৃকুল থেকে। এই বংশেরই পূর্ব-পুরুষ লর্ড পামারস্টোন একদা ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন উনবিংশ শতকে। তাঁর পিতৃকুলের আর একজন বিখ্যাত মানুষ হলেন সপ্তম আর্ল অব শ্যাফ্‌ট্‌-সবেরী। তাঁর সময় তিনি ছিলেন এক উদার মানবপ্রেমী রাজনীতিজ্ঞ। কিন্তু সংসার শুধুই সুখের দিব্যধাম নয়। সেখানেও হুল থাকে। সেই বিষণ্নতার মেঘ এড্‌উইনাকেও আবৃত করেছিল। তাঁর ছেলেবেলাটা বড় অসুখী ছিল। অল্প বয়সেই মা গত হলেন। সেই থেকে এড্‌উইনার মানসিকতা কেমন যেন অন্তর্মুখী হয়ে গেল। নিজেকে গুটিয়ে নিলেন নিজের মধ্যে। একটু আঘাতেই তখন মন ভেঙে যেত। মনের সেই কষ্ট বুকের মধ্যে তালাবন্ধী করে রাখতেন। ধীরে ধীরে সেই কষ্টগুলোই তাঁর সত্তার আন্তরটা কুরে কুরে খেতে লাগলো। তখন একটুতেই দারুণ কষ্ট পেতেন মনে। কিছুতেই মনের উষ্মা চেপে রাখতে পারতেন না। স্বামীর ঠিক বিপরীত ছিলেন এড্‌উইনা। স্বামীর চরিত্রে যেন কোন আড়াল নেই। যা পছন্দ নয় মুখের উপর তা জানাতে কোন দ্বিধা নেই তাঁর। এমন কি বিরুদ্ধ মতামত শুনতেও নিস্পৃহ নন। এড্‌উইনা কিন্তু ঠিক বিপরীত। সামান্য সমালোচনাতেও ফোঁস করে ওঠেন। ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাবার অবস্থা হয় তাঁর। তাঁরা দুজনে ঠিক কেমন তার তত্ত্ব মেলে মাউন্টব্যাটেনেরই একজন সীনিয়র রাজপুরুষের কথায়। উনি ঠিকই বলেছিলেন, 'লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কাছে যে কোন কথা যে কোনভাবে বলা যায়, কিন্তু লেডী লুইয়ের কাছে কোন কথা পাড়ার আগে যথেষ্ট সতর্ক হতে হয়।'

শ্রীমতী এড্‌উইনা তাঁর লাজুক কুনো মনটাকে কৃচ্ছ্রতার শক্ত খোলসের (Strait Zacket) মধ্যে এমনভাবে কুলুপ এঁটে রাখতেন যাতে মন অবাধ্য না হয়, উচ্ছ্বাসে ভেসে না যান। ফলে স্বভাববিরুদ্ধ হয়ে উঠেছিল তাঁর চরিত্র। প্রকৃতিগত ভাবে তিনি ছিলেন রীতিমত সপ্রতিভ, বলিয়ে-কইয়ে মহিলা। হয়ত কিছুটা স্বেচ্ছাচারী। কিন্তু ভান করতেন উল্টোটা। এই ভাবটা বজায় রাখতে রীতিমত দাম দিতে হতো তাঁকে। এক দশক ধরে নানা জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছেন। কখনো এক হপ্তার মধ্যে দুটো তিনটে জনসভাতেও তাঁকে বক্তৃতা দিতে হয়েছে। তবুও গুরুত্ব-পূর্ণ কোন ভাষণ দেবার আগে অবাধ্যের মতন তাঁর হাত কাঁপতো। তাঁর শরীরটা ছিল পোরসীলেন পাত্রের মতনই ঠুনকো। একটা ঘা খেলেই যেন চুরচুর হয়ে ভেঙে যাবে। প্রায় প্রত্যহই মাইগ্রেনের নিষ্ঠুর মাথার যন্ত্রণায় কাতর হতেন। কিন্তু পরিবারের কেউ তা জানতো না কারণ অসুখকে প্রশ্রয় দেবার মানুষ তিনি ছিলেন না। তবে স্বামীর যেমন কোন কিছুতেই তাপ উত্তাপ ছিল না তেমন নিরুত্তাপ হতে পারতেন না শ্রীমতী এড্‌উইনা। শয্যায় শুয়ে স্বামী ঘুমিয়ে পড়লেও, শ্রীমতীর পক্ষে সে শয্যা যেন কন্টকশয্যা হতো। ঘুমের বড়ি না খাওয়া পর্যন্ত ঘোর আসতো না তাঁর।

মাউন্টব্যাটেনদের পঁচিশ বছরের দাম্পত্য জীবনের দুটো পৃথক সত্তা আছে। লুই মাউন্টব্যাটেনের প্রথম চোদ্দটা বছর কেটেছে নিরলস পদোন্নতির সাধনায়। তখন শুধু পদোন্নতির সিঁড়ি ভেঙেছেন। একটার পর একটা ধাপ উপরে উঠেছেন।

www.pathagar.com

তখন তিনি স্ত্রীর ঐশ্বর্য আর তাঁদের সামাজিক প্রতিপত্তির ব্যাপারটা চাকরির পরিবেশ থেকে আলাদা করে রাখতে চাইতেন। তবে যখন নৌঘাঁটি থেকে তাঁরা দূরে থাকতেন, তা সে লন্ডন, প্যারিস যেখানেই হ'ক, তখন এডুইনা হয়ে উঠতেন 'ডানামেলা সুখের প্রজাপতি।' তখন ফুরফুরে প্রজাপতি হয়ে অনেক মনে দোলা দিয়েছেন ফিট্‌জেরাল্ডের নায়িকার মতন। মা সম্বন্ধে এইরকমই মন্তব্য করেছিলেন এডুইনার মেয়ে। পার্টি দিতে যেমন ভালবাসতেন, তেমনি পার্টিতে যেতেও। যখন নাচতেন না, তখন অন্য দুঃসাহসিক অভিযানে মেতে উঠতেন। কখনও দুমাস্তুলের দ্রুতগামী জাহাজে চড়ে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিচ্ছেন, কখনো প্রথম ফ্লাইটে সিড্‌নী থেকে লন্ডন দৌড়চ্ছেন। বোধহয় তিনিই প্রথম ইওরোপীয় মহিলা যিনি বার্মারোড পাড়ি দেন।

কিন্তু তাঁদের সেই খোলামেলা নির্দোষ জীবনযাপন যেন হঠাৎই শেষ হয়ে গেল। মুসোলিনীর ইথিওপিয়া আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল এডুইনার ডানা মেলা উড়ন্ত জীবন। যখন মিউনিখও চলে গেল তখন পুরোপুরি বদলে গেছে এডুইনার জীবনযাপনের ধারা। তখন তাঁর মনে হতে লাগলো যে শুধু চপল জীবনযাপনই তাঁর লক্ষ্য নয়। আর্তের সেবা ও মঙ্গলের জন্যে যে জীবন ব্যয়িত নয় সে জীবন নীতিভ্রষ্ট। সামাজিক বা রাজনৈতিক কল্যাণকর্মের মধ্যেই নিহিত আছে জীবনের উদ্দেশ্য। সেই থেকে লঘুছন্দের জীবন থেকে আরও গভীর অর্থবহ জীবনের যাত্রাপথে অন্বেষণ শুরু হলো তাঁর। সুন্দরী এডুইনা হয়ে উঠলেন সমাজ সংস্কারক ; আর শুধু সুখের সন্ধানে উড়ে বেড়ানো নয়। এখন থেকে মানবসেবায় উদ্বুদ্ধ জীবনযাপনে আরও নিবিড় ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। অবশ্য তাঁর অভিজাত খানদানীতে ব্যাপারটা মোটেই মনঃপূত হয় নি সেদিন।

যুদ্ধ চলাকালীন সেন্ট জন য়্যাম্বুলেন্স ব্রিগেডের ষাট হাজার কর্মীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এডুইনা। জাপান যখন আত্মসমর্পণ করলো তখন স্বামীর নির্দেশ মতন জাপানে গেলেন যুদ্ধবন্দীদের ক্যাম্প দেখতে। ক্যাম্প ঘুরে ঘুরে যুদ্ধবন্দীদের দুরবস্থা নিজের চোখে দেখলেন। তাদের হতাশ মনে উৎসাহ দিলেন, সান্ত্বনা জানালেন। যারা বেশী আহত তাদের সেবা চিকিৎসার জন্যে অন্যত্র সরিয়ে দিলেন। অধিকৃত মালয় উপদ্বীপে তখনো ইংরেজ সৈন্য এসে পৌঁছয় নি। এইরকম সময়ে স্বামীর একখানা চিঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন এডুইনা। সঙ্গী হলো একজন সেক্রেটারী, স্বামীর তিনজন বিশ্বস্ত স্টাফ অফিসার আর তাঁর ভারতীয় এ.ডি.সি.। অতবড় ভূখণ্ডে তখনও জাপানীরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। এখানে ওখানে চলছে চোরাগোপ্তা আক্রমণ। নির্ভীক এডুইনা জাপানীদের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে বালিকপান্, ম্যানিলা এবং হংকং ঘুরে আহত, হতাশ যুদ্ধবন্দীদের সেবাপরিচর্যা আর খাবারদাবার যোগানোর দায় নিতে বাধ্য করলেন জাপানী সৈন্যদের। এইভাবে মিত্রশক্তির সাহায্য না আসা পর্যন্ত এডুইনার সময়োচিত হস্তক্ষেপের দরুন হাজার হাজার আহত এবং অনাহারক্লিষ্ট জাপানী যুদ্ধবন্দীর প্রাণরক্ষা হয়েছিল সেদিন।

সেদিন যুদ্ধ শেষ হবার পর স্বামীর মতন তিনিও অসংখ্য মানুষের ভালবাসা আর সংবর্ধনা পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন। এসবই তাঁর প্রাপ্য ছিল সেদিন। তবে আজ তিনি আর একটা মহান কর্তব্য পালন করতে স্বামীর সঙ্গে দিল্লি ছুটে এসেছেন। এখন থেকে তিনিই হবেন লুই মাউন্টব্যাটেনের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু এবং পরামর্শদাতা। গৃহিণী, সচিব এবং সখী, এই তিন ভূমিকাই পালন করবেন স্বামীর

www.pathagar.com

সংকটের মুহূর্তে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে। স্বামীর দূতী হয়ে এখানকার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। প্রিয় সখা মাউন্টব্যাটেনের হাত ধরে তিনি তাঁকে পৌঁছে দেবেন তাঁর লক্ষ্যে। সেই-ই হবে তাঁর সার্থক দূতিয়ালী।

স্বামীর মতন এডুইনাও এদেশে এক অসাধারণ চারিত্রিক দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। এই অসাধারণ মহিলা ছিলেন যথার্থই বহুমুখী প্রতিভা-সম্পন্ন। রাত্রে সিল্কের পোশাক পরে যেমন নিপুণভাবে নিমন্ত্রিতদের ভোজসভায় আপ্যায়ন করেছেন, তেমনি কলেরা রোগাক্রান্ত নেতিয়ে পড়া শিশু রোগীকে কোলে নিয়ে গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে যাওয়া পাঁকের ভেতর দিয়ে পথ হেঁটেছেন দক্ষ সেবিকার মতন। সেই সব দুর্লভ মুহূর্তে যেন প্রেম ও করুণার প্রতিমূর্তি হয়ে উঠতেন তিনি। মাউন্টব্যাটেনের মধ্যে মমত্ববোধের অভাব দেখে যারা ক্ষুণ্ণ হতো, তাঁদের ব্যথার স্থানটি সযত্নে ঢেকে দিতেন এই মহিলা তাঁর করুণাঘন সেবা দিয়ে। শুকনো কর্তব্যবোধের দায়মুক্তির মনোভাব নিয়ে তিনি সেবার কাজ করেন নি। অভিজাত সমাজের মহিলারা যেমন অনুগ্রহ দেখাতে দরিদ্রের সেবা করেন, এডুইনাকে তেমন ছল করতে হয় নি। ভারতের অসংখ্য গরিব-মানুষের দুঃখে এই ইংরেজ রমণীর মন যথার্থই কাঁদতো। তাই ভারতীয়রাও তাঁর মধ্যে এক মমতাময়ী মায়ের হৃদয় খুঁজে পেয়ে তাঁর ডাকে এমন আকুল হয়ে সাড়া দিয়েছিল সেদিন।

* * *

ঘরে ঢুকলেন শ্রীমতী এডুইনা। তারপর স্বামীর দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন। মাউন্টব্যাটেনের মনে হচ্ছিল ভাগ্যের কি আশ্চর্য মোচড়! এখান থেকে এক মাইল পথও নয় সেই ঘরটার দূরত্ব, যেখানে তিনি শ্রীমতী এডুইনা এ্যাশ্লের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেন। ঘটনাটা প্রায় পঁচিশ বছর আগে ঘটেছিল, ১৯২২ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারিতে। প্রিন্স অব ওয়েল্স্-এর সম্মানে বলনাচের আয়োজন করেছেন তখনকার বড়লাট। সেদিন এই নাচের আসরের কর্ত্রী ছিলেন স্বয়ং বড়লাটগিন্নী লেডি রিডিং। মাউন্টব্যাটেন এবং এডুইনা দুজনেই উপস্থিত ছিলেন সেখানে। সেদিন এডুইনার কাছে বিয়ের প্রস্তাবে মোটেই খুশী হননি বড়লাটগিন্নী। এডুইনার এক খুড়ীকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে, যুবক মাউন্টব্যাটেনের ভবিষ্যৎ মোটেই উজ্জ্বল নয়। মহিলার সেই আশংকার কথাটাই এখন মনে পড়লো মাউন্টব্যাটেনের। হালকা একটু হাসি তাঁর মুখে ছড়িয়ে পড়লো। সত্যিই ভাগ্যের মোচড় এটা। তারপর হাত বাড়িয়ে দিলেন শ্রীমতী এডুইনার দিকে। এখন ভাগ্যের মোচড়ে লেডি রিডিং-এর সেই পরিত্যক্ত সিংহাসনেই বসতে চলেছেন শ্রীমতী এডুইনা।

রাজারাজড়াদের দেশ এই ভারতবর্ষে আড়ম্বর ও সমারোহের ঘটাটা চিরকালই একটু বাড়াবাড়ি রকমের হয়। তবে মার্চ মাসের সেই সকালবেলায় মাউন্টব্যাটেনের অভিষেক-উৎসবের ঘটাপটা অনেক বেশী হয়েছিল। নবাবী বিলাসিতার সংগে যুক্ত হয়েছিল ভিক্টোরীয় আমলের গম্ভীর আড়ম্বর। উৎসবের এই সাবেকী মেজাজটাই এখনো টিকিয়ে রেখেছে ব্রিটিশ রাজতন্ত্র। লাটপ্রাসাদের প্রশস্ত সোপানশ্রেণীর সামনে থেকে দরবার হল পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে অনার গার্ডের দল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর আর্মি, নেভি ও এয়ার ফোর্সের রক্ষীরা। ওদের হাতের অহংকারী বাঁকা তলোয়ার সকালের সূর্যালোকে ঝকমক করছে। ওদের পরনে টকটকে লাল

www.pathagar.com

উর্দি আর সাদা ব্রীচস এবং পায়ে রয়েছে চকচকে কালো চামড়ার জ্যাকবুট। দরবার হলে যাবার পথে ওরা লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে মাউন্টব্যাটেনকে গার্ড অব অনার দিয়ে ফৌজি সম্মান দেখাতে।

সুরম্য ভাইসরয় হাউসের হৃদয় হলো এই দরবার কক্ষ। এই বিশাল কক্ষের অভ্যন্তরে সাদা মার্বেল পাথরের গোল ছাদের নীচে অপেক্ষা করছেন আলোক-প্রাপ্তরা। এ'রা অপেক্ষা করছেন সস্ত্রীক মাউন্টব্যাটেনের রাজকীয় উপস্থিতির জন্যে। শিক্ষায়, আভিজাত্যে এ'রাই এদেশের সর্বোচ্চ শ্রেণীর লোক। কেউ হাই কোর্টের বিচারক, কেউ আমলা, কেউ বা মহারাজা। যাঁরা বিচারক বা ন্যায়ধীশ তাঁরা পরেছেন কালো রঙের আচকান। তাঁদের মাথায় রয়েছে কোঁচকান পরচুল (উইগ) এদেশের আইনের মতন এখানকার ন্যায়াধীশদেরও পোশাকও ইংরেজের নকল। ন্যায়াধীশদের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন আমলারা। এ'রাই হলেন রোমানস্ অব দ্য রাজ। অর্থাৎ ভারতীয় সিভিল সার্ভিস নামক আমলাতান্ত্রিক শাসনপ্রণালীর তৈরি এদেশীয় সাহেব। ব্রিটিশ প্রশাসনের স্বার্থরক্ষার দায় নিয়েছে এই আমলাকুল। শ্বেত ঔপনিবেশিকতার খানদানী ছিটেফোঁটা এখনও লেগে আছে এ'দের বাদামি মুখে প্রায় ব্রীড়াবনত যুবতীর মুখের রক্তিমাভার মতন। এদের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন রাজামহারাজারা। বহুমূল্য রত্নাভরণে শরীরগুলো আবৃত করে সোনার ময়ূরের মতন ঝকমক করছেন তাঁরা। সবশেষে আছেন অতি সাধারণ পোশাক পরা গুটিকয় মানুষ। ঘরে বোনা সাদা সুতির খদ্দর পরা জওহরলাল আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা। এ'রাই হলেন ভারতের আগামী দিনের বার্তাবহ।

রাজকীয় শোভাযাত্রার প্রথম দলটি যে মুহূর্তে হলঘরে ঢুকলো সঙ্গে সঙ্গে গম্বুজের আড়াল থেকে তূরীভেরীনিনাদ ধ্বনিত হলো। চারজন ট্রাম্পেটার তাদের রণবিষণ বাজিয়ে অভ্যর্থনা করলো মাউন্টব্যাটেনের অনুচর বাহিনীর (কোর্-তেজ)। তারপর শোভাযাত্রা যত অগ্রসর হলো ততই উচ্চকিত হতে লাগলো ভেরীনিনাদ। শিঙার ধ্বনির সঙ্গে সমতা রেখে উজ্জ্বল হতে লাগলো দরবারকক্ষের নিষ্প্রভ আলোগুলি। তারপর যে মুহূর্তে সপত্নীক মাউন্টব্যাটেন দরবারকক্ষে ঢুকলেন, সেই মুহূর্তে পরিপূর্ণ দীপ্তিতে ঝলমল করে উঠলো দরবারকক্ষের সব আলো। শিঙার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হলো খিলান, গম্বুজ, অলিন্দে। আর মেঝের পাতা পুরু পশম গালিচার ওপর দিয়ে ভাবগম্ভীর স্মিত মুখে হেঁটে চললেন ভারতের শেষ বড়লাট এবং তাঁর পত্নী। তাঁরা এগিয়ে চললেন অপেক্ষামাণ শূন্য সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হতে।

কিন্তু যত এগোচ্ছেন ততই যেন মাউন্টব্যাটেনের বুকের মধ্যে একটা অনিশ্চিত ভয়ভাব জেগে উঠছে। যুদ্ধ শুরুর আগে যেমন এক অবুঝ ভয় সারা মন আচ্ছন্ন করে অনেকটা সেইরকম। ফলে অভিষেকের অন্তিম মুহূর্তের দিকে তিনি যত এগোতে লাগলেন ততই প্রকট হলো সেই ত্রাস। অবশেষে সিংহাসনের মাথার ওপর টাঙানো লাল ভেলভেটের চাঁদোয়ার নীচে এসে দাঁড়ালেন মাউন্টব্যাটেন দম্পতি। প্রধান ন্যায়াধীশ তাঁর ডান হাত তুলে এসে দাঁড়ালেন মাউন্টব্যাটেনের সামনে এবং তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করালেন। ছোট্ট অনতিদীর্ঘ অনুষ্ঠান। ভাবগম্ভীর সেই পরিবেশে শপথবাক্য পাঠ শুরু করলেন মাউন্টব্যাটেন।

তারপর শপথপাঠ যখন প্রায় শেষ হয়ে আসছে, তখনই হলঘরের বাইরে তোপধ্বনি হলো। তোপধ্বনি করলো রয়্যাল হর্স আর্টিলারি। তোপধ্বনির শব্দ

www.pathagar.com

গড়িয়ে এসে সমস্ত দরবারকক্ষ ভরিয়ে দিল। তবে শুধু দিল্লি নয়; এই উপ-মহাদেশের প্রতিটি অংশে তখন তোপধ্বনি করে বড়লাটপদে মাউন্টব্যাটেনের অভিষেক বার্তা ঘোষিত হচ্ছে। খাইবার গিরিপথের শীর্ষদেশে অবস্থিত ল্যান্ডি-কোটাল থেকে শুরু করে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ, সর্বত্রই তোপধ্বনি হচ্ছে। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ থেকেই একদিন শুরু হয়েছিল ইংরেজের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের জয়যাত্রা। শুরু করেছিলেন লর্ড ক্লাইভ। তোপধ্বনি হলো লখনউ রেসিডেন্সেও, যেখানে কখনও ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা নামানো হয়নি। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় যারা প্রাণ দিয়ে এই রেসিডেন্স রক্ষা করে-ছিল তাদের সম্মানেও এই পতাকা অর্ধনমিত করা হয়নি তখন। তোপধ্বনি হলো কন্যাকুমারিকায় যেখানে রানী প্রথম এলিজাবেথের দাঁড়টানা সাবেককালের জাহাজখানা জলে ভাসানো হয়েছিল। তোপধ্বনি হলো মাদ্রাজের সেন্ট জর্জ কেল্লায় যেখানে সযত্নে রাখা আছে সোনার থালার গায়ে খোদাই করা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে প্রথম প্রদানস্বত্ব করা জমির দিনক্ষণ। আরও অনেক জায়গায় তখন তোপধ্বনির হচ্ছে। পুনা, পেশোয়ার, সিমলা, যেখানে গ্যারিসন আছে সেখানেই। তোপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে প্যারেডরত বিভিন্ন সেনাদল যেমন ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রাইফেল্স্, গাইড্স্ ক্যাভালরি, হডসন অ্যান্ড স্কীনার্স হর্স, তাছাড়া শিখ, ডোগরা, জাঠ, পাঠান, গোর্খা এবং মাদ্রাজী রেজিমেন্টের সেনাদল নতুন বড়লাটের সম্মানে অস্ত্র প্রদর্শন করলো। একদিকে যখন এই জমকাল প্যারেড চলছে তখন কামান থেকে মুহুর্মুহু তোপধ্বনি করে ধ্বনিত হলো ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের বিদায় সঙ্কেত, দি লাস্ট ট্যাটু।

তোপধ্বনি ধীরে ধীরে ক্ষীণ হলো। দরবারকক্ষের গম্বুজ, খিলানেও ম্লান হয়ে আসছে তার প্রতিধ্বনি। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন নতুন বড়লাট মাউন্টব্যাটেন। তারপর এগিয়ে গেলেন মাইক্রোফোনের দিকে। কি আশ্চর্য! উনি কি ভাষণ দিতে আসছেন? এটা তো প্রথা নয়। কিন্তু পুরনো সব প্রথা ভেঙে এবং সকলের পরামর্শ উপেক্ষা করেই এই কাজ করবেন মাউন্টব্যাটেন। বস্তুত, দেশের এই রাজনৈতিক অস্থিরতা যে তাঁকে উদ্বিগ্ন করেছে তা যেন প্রকাশ হচ্ছিল তাঁর এই ব্যাকুলতায়। মাই-ক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে তাই প্রথম নিবেদনটি জানালেন সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে। তিনি বললেন, 'আমার কাজ যে অত্যন্ত কঠিন সে ব্যাপারে আমার মনে কোন সংশয় নেই। তাই আপনাদের সকলের কাছে শুভেচ্ছা চাইছি। ভারতের সব মানুষের শুভেচ্ছাই এখন আমার দরকার এবং সেটাই আমি এই মুহূর্তে প্রার্থনা করছি।'

ভারতের মানুষের কাছে নতুন বড়লাটের সংক্ষিপ্ত নিবেদন শেষ হতেই রক্ষীরা হাট করে খুলে দিল দরবারকক্ষের সেগুনকাঠের দরজার পাল্লা। চোখের সামনে ভেসে উঠলো কিংসওয়ের অনাবৃত পরিবেশ। বুক জুড়ানো খোলা হাওয়া, ছায়াবীথি আর ছোট ছোট দীঘিগুলি যেন তৃষ্ণার শান্তি। পিছন থেকে আর একবার ধেয়ে এল তূরীভেরীনিনাদ। এর কঠোর নির্ঘোষ সচকিত করলো মাউন্টব্যাটেনকে। তিনি হঠাৎ অনুভব করলেন কখন মন থেকে হারিয়ে গেছে সেই অহেতুক ভয়ভয় ভাব। সেদিনের এই ছোট্ট অভিষেক-অনুষ্ঠানটাই বদলে দিয়েছে তাঁকে। তাঁর মনে হচ্ছিল এখন তিনি বিশ্বের সবচেয়ে পরাক্রান্ত মানুষ।

উৎসব শেষ হয়েছে। ঠিক পৌনে একঘণ্টা পরে উর্দি ছেড়ে সাধারণ পোশাকে আপিসঘরের টেবিলে এসে বসলেন মাউন্টব্যাটেন। উষ্ণীষধারী খাস পেয়াদা সবুজ

www.pathagar.com

চামড়ায় মোড়া ডেসপ্যাচ বাক্সটা ঘটা করে তাঁর টেবিলের ওপর বসিয়ে গেল। ডেস-প্যাচ বক্সের ডালা খুলে তার ভেতর থেকে একটা সরকারী নথি বের করলেন মাউন্টব্যাটেন। একটু আগেই যে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা তিনি অর্জন করেছেন, তারই প্রয়োগ হবে এই নথিতে। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞায় দণ্ডিত একজন অপরাধী তার দণ্ডমুক্তির প্রার্থনা করেছে। লোকটার আপীলের দরখাস্ত এসেছে অনুমোদনের জন্যে। ঘটনার আকস্মিকতায় কিছুটা বিমূঢ়, স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মাউন্টব্যাটেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লোকটার কেস ইতিহাস পড়ে ফেললেন তিনি। একদল লোকের সামনে লোকটা বর্বরের মতন তার বউকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। এই নৃশংস ঘটনার সাক্ষী অনেক মানুষ। বিচারে তার প্রাণদণ্ড হলেও দণ্ডমুক্তির প্রার্থনা করেছে লোকটা। বড় আদালতে সে আপীল নামঞ্জুর হলেও লোকটা হাল ছাড়ে নি। শেষ প্রার্থনা জানিয়েছে ভারতের সর্বোচ্চ পদাধিকারী ভাইসরয়ের কাছে। কিন্তু এত নৃশংস হত্যাপরাধকে কি করে লঘু করবেন তিনি? অনেকক্ষণ ভাবলেন মাউন্টব্যাটেন। তারপর মনস্থির করে কলম নিয়ে লিখতে বসলেন তাঁর প্রথম বিচারটি। মাউন্টব্যাটেন লিখলেন,

'সম্রাটের বিশেষ অধিকারের প্রয়োগ দ্বারা হত্যাপরাধীর ক্ষমা প্রদর্শনের কোন কারণই নেই এক্ষেত্রে।' বিচারবাণীটি লেখার পর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন মাউন্টব্যাটেন। মনটা খুবই ভেঙে গেল তাঁর।

ক্ষমতা হাতে নিয়ে মাউন্টব্যাটেনের মনে হলো যে ভারতীয় নেতাদের ওপর তাঁর মতামত আর ভাবাদর্শটা চাপিয়ে দেবার আগে সারা দেশে তাঁর ভাবমূর্তিটা ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। তাঁর আগের বড়লাটকে যে পিঠে গুলি খেয়ে ভারত থেকে পালাতে হয়েছে, এই আশঙ্কার কথাটা নর্থওল্ট বিমান বন্দরেই তার মনে হয়েছিল। কিন্তু তবুও গায়ে ফুঁ দেওয়া বড়লাট তিনি হতে চান না। তিনি এমন বড়লাট হতে চান যা আগে কেউ হননি। তবে তেমন লাটসাহেব হতে হলে তাঁকে যথার্থই 'মহৎ' কিছু করে দেখাতে হবে। তিনি জানেন যে, তাঁকে দিল্লি পাঠানো হয়েছে এদেশ থেকে ইংরেজদের নিরাপদে সরিয়ে দেবার জন্যে। তারা যাবে তবে মুখ লুকিয়ে নয়। তাঁর ধারণা যে এদেশ ছেড়ে চলে যাবার আগে শেষবারের মতন উজ্জ্বল হয়ে উঠবে ইংরেজের হারিয়ে যাওয়া গরিমা। মহৎ কিছু করে যাবে তারা।

দায়িত্ব হাতে নিয়েই লাটপ্রাসাদের সবকটি বন্ধ হয়ে যাওয়া জমজমাট অনুষ্ঠান ফের চালু করার আদেশ দিলেন মাউন্টব্যাটেন। ফলে এ.ডি.সি.রা আবার তাদের ঝলমলে পোশাক পরতে শুরু করলো, নিয়মিত ব্যাণ্ড বাজতে লাগলো এবং রক্ষী-দের হাতের খোলা তলোয়ারগুলো সূর্যের আলোয় ঝলসে উঠতে লাগলো। এইসব আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের প্রতিটি মুহূর্তই উপভোগ করতে লাগলেন মাউন্ট-ব্যাটেন। কিন্তু এইসব বাহ্য আড়ম্বরে খুশী হওয়া ছাড়াও এর অন্তর্নিহিত একটা চতুরালি ছিল এইসব জাঁকজমকে। আসলে এইসব ঠাটবাটের আয়োজন করে তিনি তাঁর বড়লাটসুলভ আচরণ টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন, যাতে তাঁর প্রভুত্ব বজায় থাকে এবং একটা নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে তাঁর কাজগুলো অতিরিক্ত মাত্রা পায়। তাঁর পূর্বসূরীর পরিকল্পিত 'অপারেশন ম্যাডহাউসে'র বদলে 'অপারেশন সীডাকশন' চালু করতে চাইলেন মাউন্টব্যাটেন। অর্থাৎ উৎকেন্দ্রিক কাজকর্মের বদলে এমন কিছু করা যাতে মানুষ বশ হয়। ছোট মাপের একটা বিপ্লব বলা চলে এই বশ করার নীতিকে। যার লক্ষ্য সবাই। যুগপৎ সাধারণ মানুষ আর নেতারা, যাদের নিয়ে তিনি আলোচনায় বসতে চান। দুই বিপরীত মূল্যবোধের মেলবন্ধন

www.pathagar.com

হবে মাউন্টব্যাটেনের এই নীতিতে। একদিকে মুমূর্ষু রাজতন্ত্রের প্রাচীন আভিজাত্যের নিবুনিবু রোশনাই আর অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জন্যে নতুন নতুন উদ্যোগ যার মধ্যে প্রতিফলিত হবে আগামী দিনের ভারতবর্ষের চেহারা। এটাই হলো তাঁর 'অপারেশন সীডাকশন' অর্থাৎ বশ করার কারিগরি।

মজার কথা যে, মাউন্টব্যাটেন তাঁর এই বিপ্লব শুরু করলেন অন্দরমহল থেকে, হাতে রঙের তুলি নিয়ে। সহকারীদের আতঙ্কিত করে আদেশ দিলেন যে বড়লাটের স্টাডিরুমের দরজা জানলার বিবর্ণ রঙ তুলে হালকা উজ্জ্বল রঙ লাগাতে হবে। তাঁর ধারণা ঘরের দরজা জানলার অন্ধকার রঙের জন্যেই এতদিন সব আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। নতুন রঙে ঘরের চেহারা যেমন ঝকঝকে হবে, তেমনি ভারতের নেতারাও স্বচ্ছন্দ মনে আলোচনায় বসতে পারবেন। তাঁর দ্বিতীয় পদক্ষেপ হলো লাটভবনের কাজকর্মের বনেদী ঢিলেমি দূর করা। কাজকর্মের ধারায় এমন এক শৈথিল্য ছিল যা প্রায় অযোগ্যতার সমান। মাউন্টব্যাটেন তাঁর কাজকর্মে একটা দ্রুততা নিয়ে এলেন। একটা চটপটে তেজী ভাব। লাটভবন তখন গমগম করতে লাগলো কাজ-কর্মের ব্যস্ততায়। প্রায় এক আধা সামরিক প্রধান কার্যালয়ের চেহারা নিল লাটভবন। রোজ সকালে স্টাফ মিটিং হতে লাগলো এবং প্রায় 'প্রার্থনা সভার' মতন অনিবার্য হয়ে উঠলো এই স্টাফ মিটিং। প্রতিদিনের কার্যক্রম শুরু হতে লাগলো এই স্টাফ মিটিং দিয়ে।

মাউন্টব্যাটেনের তরতাজা মন আর কাজের চটপটে ধারা দেখে তাঁর অধীনের সব আই.সি.এস. অফিসারই অবাক হয়ে গেলেন। যে কোন সমস্যার মূলে গিয়ে একটা সমাধান খুঁজে বের করার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর। যখন কাজ করতেন তখন নিমগ্ন হয়ে যেতেন কাজের মধ্যে। সবুজ রঙের চামড়া দিয়ে মোড়া ডেস্‌প্যাচ বক্সের মধ্যে কাগজপত্র ভরে ভাইসরয়ের অবগতির জন্যে চাপরাসীরা মিছিল করে আসতো। প্রথাটা পুরনো হলেও মাউন্টব্যাটেন তা তুলে দিলেন। সরকারী কাজের এই নবাবী ভড়ং তাঁর পছন্দ হয়নি। তাছাড়া তালা খোলা ও তালা বন্ধ করার মতন সময়ও তাঁর নেই। ফাইলের নোটের মার্‌জিনে হাতে লেখা লম্বা মন্তব্য লিখতেন না। তাঁর মনে হতো এটা সময়ের অপব্যয়। তার বদলে মুখে মুখে স্বল্প কথায় বক্তব্য বুঝিয়ে দিতেন। তাঁর একজন স্টাফ অফিসার একবার একটা মজার ঘটনা বলেছিলেন। 'যখন কোন কর্মচারী "মে আই স্পিক?" লিখতো, অর্থাৎ যদি কথা বলার অনুমতি চাইতো, তবে মনে মনে তার বক্তব্যটা গুছিয়ে রাখতে হতো সর্বক্ষণই। কারণ মাউন্টব্যাটেনের কাছ থেকে সে ডাক যে কোন সময়েই আসতে পারে। রাত দুটোও হতে পারে আলোচনার সময়।'

আসল কথা, মাউন্টব্যাটেন চাইতেন যে জনসাধারণের সংগে তাঁর একটা অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ গড়ে উঠুক। তিনি চাইতেন তাঁর সম্বন্ধে একটা পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি গড়ে উঠুক সাধারণ মানুষের মনে। তাঁর চারপাশে এত সব বদলের আয়োজন এই কারণেই। একশ বছর ধরে এই লাটসাহেব পদটা ঠাটবাটের আবেষ্টনের মধ্যে তালা-বন্ধ হয়ে ছিল। এতদিন ধরে শুধু ঐশ্বর্য আর দাম্ভিকতাই প্রচার করেছে। এর একমাত্র তুলনা চলে তিব্বতের দলাই লামার সংগে। যেন সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন আর অনেক দূরের কোন দেবতা, দেবতামণ্ডলীর মধ্যে সবচেয়ে দাম্ভিক, যাঁকে নিজের ভাবা যায় না। তারপর দুবার গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাবার পর ভাইসরয় যেন আরও আলাদা হয়ে গেলেন। আম জনতার সংগে কোনরকম যোগাযোগই আর

www.pathagar.com

থাকলো না। যখনই যেখানে যেতেন সঙ্গে রক্ষী থাকতো এবং বড়লাটের স্পেশ্যাল সাদা এবং সোনালী রঙের ট্রেনে চড়ে যেতেন। গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার অন্তত চব্বিশঘণ্টা আগে থেকে সাদা পোশাক পরা রক্ষী মোতায়েন থাকতো সারা রাস্তায়। সঙ্গে থাকতো শ'য়ে শ'য়ে বডিগার্ড পুলিস আর সাদা পোশাকের পুলিস। যখন গল্‌ফ্‌ খেলতে যেতেন তখন প্রায় প্রতিটি গাছের আড়ালে বন্দুক নিয়ে পুলিস বসে থাকতো। ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে চলেছেন বড়লাট সঙ্গে চলেছে এক স্কোয়াড্রন বডিগার্ড আর পুলিস বাহিনীর লোকজন। মোটকথা বড়লাটকে ঘিরে নিরাপত্তার প্রায় নিশ্ছিদ্র লোহারঘর বানিয়ে তোলা হয়েছিল যাতে রন্ধ্রপথে কোন কালসাপ ঢুকে পড়তে না পারে।

ক্ষমতায় বসেই মাউন্টব্যাটেন স্থির করলেন যে এই তামাসা তিনি ভাঙবেন। তাঁর প্রথম কাজ হবে রক্ষী না নিয়ে বেড়াতে বেরনো। মাউন্টব্যাটেন প্রচার করলেন যে রোজ সকালে মেয়ে এবং বউকে নিয়ে তিনি ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরোবেন। সঙ্গে কোন নিরাপত্তা কর্মী থাকবে না। মাউন্টব্যাটেনের কথা শুনেই আঁতকে উঠলো নিরাপত্তার লোকজন। কিন্তু মাউন্টব্যাটেনের ভ্রূক্ষেপ নেই। রোজ সকালে আশে-পাশের গ্রামে বেড়াতে যেতেন। হঠাৎ একদিন গ্রামবাসীরা দেখলো যে, তাদের হাঁটা পথ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াচ্ছেন বড়লাট এবং তাঁর গিন্নী। সঙ্গে কোন রক্ষী নেই। নিরাপত্তার বাড়াবাড়ি নেই। দৃশ্যটা প্রায় মরীচিকার মতন অবিশ্বাস্য। গ্রামের সরল মানুষরা সত্যিই অবাক হয়ে যেত এই দৃশ্য দেখে।

তবে এর পরে যে কাণ্ডটা তিনি করলেন সেটা আরও বৈপ্লবিক। বিগত দু'শ' বছরে অন্য কোন বড়লাট তা কল্পনাও করেন নি। বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন সব রীতিনীতি আর পদাধিকারের মর্যাদা তুচ্ছ করে একজন সাধারণ ভারতীয়র নেমন্তন্ন গ্রহণ করলেন। আগে রাজা-মহারাজার দেওয়া পার্টি ছাড়া অন্য কোথাও বড়লাট যেতেন না। এবার কিন্তু ব্যতিক্রম হলো। জওহরলাল নেহরুর নতুন দিল্লির বাসভবনে আয়োজিত পার্টিতে হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন মাউন্টব্যাটেন। সস্ত্রীক বড়লাটকে দেখে সকলেরই চক্ষুস্থির হয়ে গেল। পার্টিতে যত্রতত্র নেহরুর হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হাসিঠাট্টা করছেন। এর ওর সঙ্গে কথা বলছেন, হ্যান্ডসেক করছেন। সবাই স্তম্ভিত। এমনকি জওহরলাল নিজেও। ঘটনাটা তাঁকেও প্রভাবিত করেছে। সরল ভাবেই তাই মনের কথাটা ভগ্নীকে বললেন জওহরলাল। 'যাক, শেষ পর্যন্ত একজন মানুষকেই ভাইসরয় হিসেবে পেলাম। আর যাই হ'ক ইনি অন্তত পোশাকসর্বস্ব নন।'

মাউন্টব্যাটেন এসেই লাটভবনের পরিবেশে ভারতীয় হাওয়া বইয়ে দেন। তাঁর একটা কাজের মধ্যেই সেই অনুকূল কৃপাবাতাসের যেন ছড়াছড়ি হতে লাগলো। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুপ্রীম কমান্ডার থাকার সময় তাঁর অধীনের প্রায় বিশলক্ষ ফৌজির রাজানুগত্যের পুরস্কার দিলেন তিনজন ভারতীয় সেনানীকে তাঁর এ.ডি.সি. করে। এরপর আদেশ দিলেন যে লাটভবনের সব অনুষ্ঠানেই যেন ভারতীয়রা অবাধে আসেন। তাঁর আগে লাটপ্রাসাদের চৌহদ্দির মধ্যে প্রবেশ করার অধিকার ছিল খুব কম ভারতীয়র। মাউন্টব্যাটেন বললেন যে লাটপ্রাসাদের ভোজ-সভায় এখন থেকে যথেষ্ট সংখ্যক ভারতীয়রাও নিমন্ত্রণ পাবেন। এক আধজন রাজরাজড়া নয় অন্তত যত নিমন্ত্রিত আসবেন তার অর্ধেক যেন ভারতীয় হন এবং তাঁর খানা টেবিলের চারপাশে যেন তাঁদের দেখা যায়।

www.pathagar.com

লাটভবনের অন্তঃপুরের বদলটা আরও বড় এবং নাটকীয়। ডাইনিং টেবিলে প্রায় নাটক এনে ফেললেন শ্রীমতী এডুইনা। যাকে বলে হেঁসেল বিপ্লব তাই করে তুললেন তিনি। লাটভবনের শতাধিক বছরের ঐতিহ্য ভেঙে ভারতীয় নিরামিষ রান্নার ব্যবস্থা চালু করলেন লাটপ্রাসাদের হেঁসেলে। শুধু তাই নয়। বড়লাট-গিন্নীর আদেশ হলো যে ভোজ্যবস্তু ভারতীয় থালায় পরিবেশন করতে হবে এবং নিমন্ত্রিতরা যাতে হাত দিয়ে খাবার খেয়ে কুলকুচা করে মুখ ধুতে পারেন তার জন্যে তাঁদের পিছনে জলের বালতি, তোয়ালে আর বেসিন্ নিয়ে পরিচারকরা দাঁড়িয়ে থাকবেন।

এইভাবে ছোটবড় নানা সৎ ও মহৎ কাজের আয়োজন করে সারা দেশের শ্রদ্ধা অর্জন করলেন মাউন্টব্যাটেন দম্পতি। একদিন এই দেশের মাটিতেই শুরু হয়েছিল তাঁদের প্রথম প্রেম। তাই দেশের মানুষ তাঁদের আন্তরিকভাবেই মেনে নিয়েছিল। মাউন্টব্যাটেন যেন স্রেফ যুদ্ধ জয় করতে এদেশে আসেন নি। তিনি এসেছেন তাদের পরিত্রাতা হয়ে। সুতরাং এই দম্পতিকে ঘিরে সব মানুষের বিশ্বাস আর ভালবাসা যে এক অতীন্দ্রিয় ভাবময় জগৎ সৃষ্টি করবে তাতে সন্দেহ নেই। ভারতের মাটিতে তাঁদের পদার্পণের দিন কয়েকের মধ্যে 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকা যা লিখেছিল তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। নিউ ইয়র্ক টাইমস লিখেছিল, 'এর আগে আর কোন বড়লাট সাধারণ মানুষের এত শ্রদ্ধা আর ভালবাসা পান নি।' তাঁর প্রবর্তিত 'অপারেশন সীডাকশন' অর্থাৎ প্রেম দিয়ে বশ করার এই নীতিটা সাধারণ মানুষের মনে এমনভাবে গেঁথে যায় যে, স্বয়ং নেহরুও স্তম্ভিত হয়ে যান। যান মানুষটার অসাধারণ জনপ্রিয়তা দেখে ঠাট্টাচ্ছলেই সে কথা বলে ফেলেছিলেন নেহরু। বলেছিলেন যে ওঁর সঙ্গে আলোচনায় বসা অত্যন্ত কঠিন কারণ এখন 'ভারতের আর কোন নেতার এত জনসমর্থন নেই।'

লোকটার কথাগুলো রীতিমত ভীতিকর। বস্তুত, ভীতিকর কথাগুলো ভারতবর্ষের যে ছবিটা তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরলো তার ভয়াবহতা ক্লিমেন্ট এ্যাটলীর আঁকা চিত্রটার চেয়েও বীভৎস। অথচ যার মুখ থেকে তিনি কথাগুলো শুনেছেন তাকে কি করেই বা অস্বীকার করেন? খুবই খাতিরের মানুষ সে। এই দেশটার নাড়িনক্ষত্র তার নখদর্পণে রয়েছে। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ট্রিপল্ ব্লু এবং প্রথম হওয়া এই মেধাবী ছাত্রের নাম জর্জ এ্যাবেল। মাউন্টব্যাটেনের পূর্বসূরী ওয়াভেলের খুবই ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিল সে।

ভীতিকর কথাগুলো সেই-ই বলেছে মাউন্টব্যাটেনকে তাঁর স্টাডি রুমের নির্জনতায় বসে। এ্যাবেলের কথাগুলো সোজা সরল অথচ মাউন্টব্যাটেনের কাছে কেমন যেন দুর্বোধ্য লাগছিল। এ্যাবেল বললো যে ভারতবর্ষ নাকি অত্যন্ত দ্রুত রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের দিকে এগিয়ে চলেছে। সুতরাং যত সত্বর সম্ভব একটা সমাধানের পথ যেন মাউন্টব্যাটেন খুঁজে বের করেন। একমাত্র তিনিই পারেন এর বিহিত করতে কারণ প্রকৃতপক্ষে দেশটার রক্ষক এখন তিনিই। তার মানে, এতবড় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রশাসন যন্ত্রটা ভেঙে পড়তে চলেছে? কিন্তু তা কি সম্ভব? ঠিক তাই এবং কারণটাও খুব দুজ্ঞেয় নয়। যুদ্ধের পর থেকেই ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের চাকরিতে ব্রিটিশ অফিসারের নিয়োগ বন্ধ হয়ে গেছে। অন্যদিকে বিবদমান হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে হিংসা আর রেষারেষি এমন উদ্ধত হয়ে উঠেছে যে ভারতীয়

www.pathagar.com

অফিসারদের পক্ষেও এর প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা টিকিয়ে রেখে ওদের সংযত করা কঠিন। তারাও দ্বিধাগ্রস্ত। এখন যা অবস্থা তাতে অলস আলোচনায় বসে কাল-ক্ষেপের অবকাশ নেই। যা করার এখনই করতে হবে, নইলে সর্বনাশ ঠেকানো যাবে না।

এ্যাবেলের পদমর্যাদার একজন মানুষের কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ শুনে প্রায় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন নতুন বড়লাট। তাও সেটা প্রথম রিপোর্ট। এক পক্ষকালের মধ্যে জলস্রোতের মতন আসতে লাগলো আরও রিপোর্ট। হতভম্ব হলেন মাউন্ট-ব্যাটেন। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর রিপোর্টটা এল তাঁর চীফ অব স্টাফ লর্ড ইস্‌মের কাছ থেকে। এই বিচক্ষণ মানুষটিকে তিনিই সঙ্গে নিয়ে এসেছেন এই উপমহাদেশে। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত স্যার উইন্সটন চার্চিলের চীফ অব স্টাফ ছিলেন ইস্‌মে। তাছাড়া পূর্বতন একজন বড়লাটের মিলিটারি সেক্রেটারিও ছিলেন। ইস্‌মে তাঁর রিপোর্টের উপসংহারে লিখলেন, 'ভারত এখন মাঝদরিয়ায় আগুন লাগা এক যুদ্ধজাহাজ হয়ে আছে।' কিন্তু প্রশ্ন হলো ওর ভাঁড়ারে গোলাবারুদের গায়ে আগুন লাগার আগে মাউন্টব্যাটেন কি সেই সর্বনাশা আগুন নেভাতে পারবেন?

দাঙ্গার প্রথম রিপোর্ট মাউন্টব্যাটেন পেলেন পাঞ্জাবের ইংরেজ গভার্নারের কাছ থেকে। গভার্নার লিখেছেন যে 'সারা প্রদেশে এখন গৃহযুদ্ধের অবস্থা চলছে।' তাঁর সন্দেহ যে অসত্য নয় তার প্রমাণ দিতে একটা বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করেছেন রিপোর্টে। রাওয়ালপিণ্ডির কাছে একটা ছোট গ্রামে ঘটনাটা ঘটেছিল। একজন মুসলমানের একটা মোষ চরতে চরতে এক শিখ প্রতিবেশীর বাড়ির আঙিনায় ঢুকে পড়ে। মুসলমান মালিক খুঁজতে খুঁজতে সেখানে এসে হাজির হলো এবং ফেরত চাইল জানোয়ারটাকে। এই নিয়ে প্রথমে কথা কাটাকাটি পরে হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল ওদের মধ্যে। খানিকবাদে দেখা গেল যে দুপক্ষেই অনেক সমর্থক জুটে গেছে। কাস্তে আর ছোরাছুরি নিয়ে তারা দাঙ্গায় নেমে পড়েছে। এই মারামারির পরিণামটা যে কতটা উগ্র তার হদিস পাওয়া গেল ঘণ্টাদুয়েক বাদে। দেখা গেল যে মাঠেঘাটে পড়ে আছে প্রায় শতাধিক মানুষের মৃতদেহ।

নতুন ভাইসরয়ের ভারতে আসার দিন পাঁচেক পরেই আর একটা দাঙ্গার খবর এল দিল্লিতে। দাঙ্গার আগুনে তখন কলকাতা জ্বলছে। ইতিমধ্যেই নিরানব্বুই জন মানুষ প্রাণ দিয়েছে সেই দাঙ্গায়। এই ঘটনার দুদিন পরে বোম্বাই শহর থেকেও দাঙ্গার খবর এল। সেখানেও একচল্লিশ জন মানুষের হাত-পা কাটা ধড় ফুটপাতে পড়ে থাকতে দেখা গেল।

তখন একের পর এক দাঙ্গার খবর পাচ্ছেন মাউন্টব্যাটেন। কিছুটা বিচলিত হয়েই ডেকে পাঠালেন দেশের পুলিস প্রধানকে। কি ব্যাপার? উনি কি শান্তি-শৃঙ্খলা ফেরাতে পারবেন? 'নো ইওর এক্‌সেলেন্‌সি! সবিনয়ে জানালেন সর্বোচ্চ পুলিস প্রধান। বিচলিত মাউন্টব্যাটেন এবার ডেকে পাঠালেন কমান্ডার ইন্ চীফ্, ফিল্ড মার্শাল স্যার ক্লড অচিনলেক্‌কে। তিনিও একই উত্তর দিলেন।

মাউন্টব্যাটেন প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে গেলেন। কিন্তু বুদ্ধিভ্রংশ হননি একটুও। তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর পূর্বতন ভাইসরয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে কোয়ালিশনের যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তা কত অবাস্তব। এই মিলন শুধু কথার কথা। আসলে দুদল শত্রুর মধ্যে দলগড়ার সামিল হবে এই কোয়ালিশন। যাদের মতামত ভিন্ন এবং সম্পর্ক তিক্ত তাদের দিয়ে যৌথ সরকার গঠনের প্রস্তাব

www.pathagar.com

হাস্যকর। এই যৌথ শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়বেই এবং যখন তা ঘটবে তখন রোষদীর্ণ এই দেশটার শাসনের ভীতিকর দায়িত্বটা সরাসরি তাঁর ওপর এসে পড়বে। তিনি তখন বাধ্য হবেন সরকারি প্রশাসন হাতে নিতে আর তাঁর চোখের আড়ালেই প্রশাসন যন্ত্রটা একটু একটু করে ভেঙে পড়বে।

কিন্তু না। এই ভয়াবহ পরিণামের চেহারাটা আগাম দেখার পর এতবড় ঝুঁকি তিনি নিতে পারেন না। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুহুর্মুহু দাঙ্গার খবর আসছে। তাঁর দূরদর্শী উপদেষ্টারাও তাঁকে যথাযোগ্য পরামর্শ দিচ্ছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে এদেশে আসার দশদিনের মধ্যেই মাউন্টব্যাটেন যে সিদ্ধান্তটা নিলেন সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বুঝতে পারলেন যে প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এ্যাটলীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে দিনক্ষণ তিনি নিজেই সুপারিশ করেছিলেন সেটা অনেক বেশি ভাবপ্রবণ। আসলে সময় অপচয়ী সেই সিদ্ধান্তটা কোন হিতকর সমাধানই করবে না। এখন মাস নয় সময় গুনতে হবে সপ্তাহ দিয়ে। এই অস্থির ভূখণ্ডে যে সমাধানের কথাই তিনি ভাবুন না কেন, তা আনতে হবে খুব তাড়াতাড়ি, এখনই।

১৯৪৭-এর ২রা এপ্রিল তারিখে এ্যাটলী সরকারের কাছে তাঁর প্রথম পাঠানো রিপোর্টে মাউন্টব্যাটেন লিখলেন, 'এখানের বর্তমান ছবিটা নিরন্ধ্র অন্ধকারে লেপা...আমি অন্তত ভরসা করার মতন কোন সমাধান এখনই দেখতে পাচ্ছি না।' এরপর তাঁর প্রতিবেদনে দেশের সামগ্রিক অবস্থার কথা বর্ণনা করে এ্যাডমিরাল যে সতর্কবাণী লিখলেন তা হলো, 'যে একটাই সিদ্ধান্ত আমি নিতে পেরেছি তা হলো যে এখনই কোন উপায় বের না করলে হয়ত আমার হাতেই গৃহযুদ্ধ শুরু হবে। আমাকেই তার দায় নিতে হবে।'

www.pathagar.com

এক স্বপ্ন এবং তাঁর ভাঙাচোরা স্বপ্ন

নতুন দিল্লি, এপ্রিল ১৯৪৭

ঘরে কেউ নেই। এমনকি নোট নিতে একজন সেক্রেটারিকেও ডাকা হয় নি দুজনের এই একান্ত আলোচনায়। দরকারটা জরুরী এবং যথাসম্ভব গোপনতা বজায় রাখা দরকার বলেই এই কৌশলটা নিয়েছেন মাউন্টব্যাটেন। বলাবাহুল্য, এইরকম একান্ত আলোচনার আয়োজন নজিরবিহীন। আগে কখনও এমন হয় নি। ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্য নিরূপণ হয়েছে খোলামেলা কন্‌ফারেন্স টেবিলে, দুজনের গোপন সভায় নয়। সেই হিসাবে মাউন্টব্যাটেনের সিদ্ধান্তটা বৈপ্লবিক। এই একান্ত আলোচনাতেই স্থির হবে ভারতকে রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের বিভীষিকা থেকে রক্ষা করা যাবে কি না। এরই পূর্বাভাস তাঁর দিনকয়েক আগের রিপোর্টে মাউন্টব্যাটেন জানিয়েছেন। আলোচনা সভা বসেছে বড়লাটের সদ্য রঙ করা স্ট্যাডি রুমে। এটাই প্রথম সভা। আলোচনায় অংশ নেবেন মোট পাঁচজন। স্বয়ং মাউন্টব্যাটেন এবং অন্য চারজন ভারতীয় নেতা।

এই চারজন ভারতীয় নেতাই এতকাল ইংরেজের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে এসেছেন। দেশের মানুষকে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়েছেন। সবাই প্রায় মধ্যবয়স্ক এবং পেশায় আইনজীবী। এঁদের সকলেরই আইন পাঠের হাতেখড়ি হয়েছে লণ্ডনের আইন বিদ্যালয়ে (ইন্‌স্‌ অব কোর্ট)। সেখানেই বুদ্ধির ধার শানিয়েছেন এঁরা। এতকাল, প্রায় পঁচিশ বছর, এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলেন এই নেতারা। তূণের বাণ অক্ষত রেখেছেন কবে সুযোগ আসবে যখন বুদ্ধির মারপেঁচ এবং বাকপৌরুষের তুফান তুলে নতুন বড়লাটকে বিধ্বস্ত করতে পারবেন। ভারতের ভবিষ্যৎ গড়ার ভার এই চার নেতাই নিয়েছেন।

আলোচনার ফল নিয়ে মাউন্টব্যাটেন একটুও চিন্তিত নন। অন্য ইংরেজদের মতন তিনিও চান যে ভারত অবিভক্ত থাকুক। অন্তত এদেশ ছেড়ে যাবার আগে এই উত্তরাধিকারটাই ভারতীয়দের হাতে তাঁরা ছেড়ে যেতে চান। মাউন্টব্যাটেন নিজেও নিঃসংশয় যে নিষ্ঠাভরেই এই পবিত্র ধর্মাচরণ তাঁকে পালন করতে হবে। মুসলমান নেতারা ইতিমধ্যেই ভারতভাগের যে বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছে তা তিনি মানবেন না কারণ সে প্রস্তাব মানার অর্থ হলো বিষবৃক্ষের চারা রোপন করা।

সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে নেতাদের সঙ্গে যে আধাপ্রকাশ্য মিটিংটা হয়েছে তা প্রায় ব্যর্থই বলা যায়। একটা অচল অবস্থায় মিটিং শেষ হয়েছে। তবে মাউন্টব্যাটেনের ধারণা যে শোরগোলের মধ্যে যা বিফল হয়েছে এই অন্তরঙ্গ স্টাডি রুমে বসে, জনে জনে পৃথকভাবে আলোচনা করে তা বিফল হবে না। তাঁর হাতে যে সময় আছে তা অল্পই। কিন্তু তিনি নিশ্চিত যে এর মধ্যেই তাঁর ব্যক্তিত্ব দিয়ে তিনি সবাইকে তাঁর বক্তব্য বোঝাতে পারবেন। বছরের পর বছর ধরে যে কাজে তাঁর পূর্বগামীরা ব্যর্থ হয়েছেন, সে কাজে তিনি সফল হবেন। সবাইকে নিয়ে একটা ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারবেন।

www.pathagar.com

এই মুহূর্তে তাঁর সামনে যিনি বসে আছেন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মানচিত্রে তাঁর অধিকারটি বেশ জোরদার। খুবই চেনা মানুষ ইনি। কেশবিরল মাথায় পরা সাদা টুপি, লম্বা কোটের তিন নম্বর বোতাম ঘরে গোঁজা একটা সদ্যফোটা গোলাপ-ফুল। ইনিই জওহরলাল নেহরু। চরিত্রে কিছুটা চপলতা থাকলেও নতুন বড়লাটের মতন এই নাটকের এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র ইনি। মুখের গড়নে একটা ভোগী ভাব আছে এঁর। হঠাৎ হঠাৎ মুখের ভাব বদলে যায়। এই আছেন দিব্যি ভালমানুষ। দেবদূতের মতন নরম নিরীহ মুখ। পরক্ষণেই হিংস্রতায় কঠিন হয়ে উঠলো মুখের চেহারা। তবে সর্বক্ষণই মেদুর বিষণ্নতা ছায়া ফেলে থাকে তাঁর মুখমণ্ডলে। মাউন্টব্যাটেন যেমন স্থির দৃঢ়সংকল্প নেহরু কদাচিৎ তেমনটি। জলের বুকে আলোছায়ার খেলার মতন তাঁর মুখে লুকোচুরি করে মনের বিচিত্র ভাবনাগুলো।

তবে ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে এই একটি নক্ষত্রকেই মাউন্টব্যাটেন ভাল করে চেনেন। যুদ্ধের ঠিক পরেই নেহরু একবার সিংগাপুরে গিয়েছিলেন। সাউথ ইস্ট এশিয়ান কম্যান্ডের (SEAC) প্রধান কার্যালয় তখন সিংগাপুরেই ছিল এবং কার্যোপলক্ষে মাউন্টব্যাটেনও তখন সিংগাপুরে ছিলেন। দুজনের তখনই আলাপ হয়। যে লোকটার (নেহরু) পায়ে তখনও ইংরেজের জেলহাজতের ধুলো লেগে আছে, সেইরকম একজন রাজদ্রোহীর সংগে আলাপ করতে নিষেধ করেছিল মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শদাতারা। কিন্তু মন্ত্রণাদাতাদের পরামর্শ উপেক্ষা করেই মাউন্টব্যাটেন যেচে আলাপ করেছিলেন নেহরুর সংগে।* সেদিন দুজনেরই ভাল লেগেছিল দুজনকে। সপত্নীক মাউন্টব্যাটেনকে দেখে নেহরুর মনে হয়েছিল যে তিনি যেন ইংল্যান্ডকে নতুন করে আবিষ্কার করলেন। চল্লিশ বছর ধরে ইংরেজের কারাগারে বন্দী থাকতে থাকতে যে ইংল্যান্ডকে তিনি ভুলে গেছেন তারই স্মৃতি উসকে দিলেন এই দম্পতি। এ যেন তাঁর ছেলেবেলার দেখা খোলামেলা উদার মনের রোমান্টিক ইংল্যান্ড। আর মাউন্টব্যাটেনরা মুগ্ধ হয়ে দেখলেন স্পর্ধিত আকর্ষণীয় এক ব্যক্তিত্ব যেন মূর্ত হয়েছে নেহরুর মধ্যে—শিক্ষিত, রসবোধসম্পন্ন এক মার্জিত রুচির মানুষ। প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হলেন মাউন্টব্যাটেন দম্পতি এবং তখনই মনস্থির করে ফেললেন যে সিঙ্গাপুরের রাজপথ দিয়ে খোলা গাড়ি চড়ে তাঁরা যাবেন। তাঁদের পাশে থাকবেন নেহরু। মাউন্টব্যাটেনের মনের বাসনা শুনে সবাই থ। কর্মচারীরা আঁতকে উঠলো প্রস্তাব শুনে। এ কি ধাষ্টামো মাউন্টব্যাটেনের! শেষ পর্যন্ত একজন রাজদ্রোহীকে খাতির করতে চলেছেন? সেদিন কর্মচারী আর পরামর্শদাতাদের মাউন্টব্যাটেন যা বলেছিলেন সে উক্তি প্রায় ঐতিহাসিক হয়ে আছে। মাউন্টব্যাটেন বলেছিলেন, 'সেকি? আমি কেন ওঁকে খাতির করবো? বরং উনিই আমায় খাতির করছেন রাজী হয়ে। দেখবেন, একদিন উনিই হবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।'

তা মাউন্টব্যাটেনের ভবিষ্যৎবাণী ঠিকই ফলেছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের

---

* এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৪ সালের ২২শে জানুয়ারী তারিখে তেত্রিশতম আর্মি কোর্ (33rd Army Corps) পরিদর্শন করতে আমেদনগরে গিয়েছিলেন মাউন্টব্যাটেন। নেহরু তখন সেখানে। মাউন্টব্যাটেনের অধীনে দশলক্ষাধিক ভারতীয় সেনা থাকলেও, নেহরুর সঙ্গে দেখা করার আবেদন মঞ্জুর হয় নি সেবার।

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রীরূপে নেহরুই আজ তাঁর খাস মন্ত্রণাকক্ষে ঢুকেছেন প্রথম আলোচনাকারী নেতা হয়ে।

বড়লাটের খাস মন্ত্রণাকক্ষে সেদিন নেহেরু যে কথাবার্তা বলেছেন সেটাকে তাঁর আগের কথাবার্তারই জের বলা যায়। এর আগে সারা জীবন ধরেই এই বিষয় নিয়ে কলোনাইজারদের সংগে অনেক আলোচনা করেছেন তিনি। তখন একটু বেশিই প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে তাঁকে। খাতিরের মানুষ নেহরুকে রাজ অতিথি করে কান্‌ট্রি হাউসে রাখা হয়েছে। তখন বাকিংহাম প্যালেসে ডিনার খেয়েছেন। আবার যখন জেলে বন্দী হয়েছেন তখন কাঁসার বাসনেই খাবার দেওয়া হয়েছে তাঁকে। অনেক মানুষের সঙ্গেই তাঁর আলোচনা হয়েছে। তাঁরা কেউ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, কেউ প্রধান মন্ত্রী, কেউ পূর্বতন ভাইসরয়, কেউ বা স্বয়ং মহামান্য সম্রাট আবার কখনো বা সাহেব জেলার।

প্রাচ্যের খুবই সম্ভ্রান্ত অভিজাত এক কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। প্রাচীন ঐতিহ্যসম্পন্ন এই পরিবারের এমন অহংকার ছিল যা তখনকার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার অন্য কোন খানদানী রাজ পরিবারের ছিল না। বিদ্যাচর্চা শেষ করতে মাত্র ষোলো বছর বয়সে তাঁকে বিলেত পাঠানো হয়। পরের সাতটা বছর লাতিন শিখে আর হ্যারোর মাঠে ক্রিকেট খেলে সুখে কাটে দিনগুলো। এরই সংগে বিদ্যাচর্চাও চলেছে। কেমব্রিজে বিজ্ঞান পড়েছেন, নীৎসের দর্শন আওড়েছেন, চুটিয়ে চসার পড়েছেন এবং আইনে কলেজে (ইন্‌স্‌ অব কোর্ট) সারগর্ভ সওয়ালজবাব শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁর শান্ত মধুর ব্যক্তিত্ব, সভ্য মার্জিত রুচি আর বহুমুখী শিল্পানুরাগের জন্যে যখন যেখানে গেছেন সেখানেই অসাধারণ সাফল্য পেয়েছেন। সবাই তাঁকে আদর করে ডেকেছে। অন্তত কোথাও তিনি অবাঞ্ছিত হন নি। তখনকার ইংল্যাণ্ডের যে কোন অভিজাত পরিবারের ড্রয়িংরুমে ঢোকার অধিকার তাঁর ছিল এবং সহিষ্ণু ধাতের জন্যে সবরকম মূল্যবোধকেই তিনি অনায়াসে তাঁর জীবনে পরিপাক করে নিয়েছেন। এই বদলটা এমনই পরিপূর্ণ ছিল যে সাতবছর পরে নেহেরু যখন বিলেত থেকে এলাহাবাদ ফিরে এলেন, তখন বন্ধুবান্ধব আর পরিবারের লোকজন অবাক হয়ে দেখলো যে মানুষটা পুরোপুরি সাহেব হয়ে গেছেন, ভারতীয়তার গন্ধটুকুও গায়ে লেগে নেই।

তবে দেশে ফিরেই যুবক নেহরু তাঁর সাহেবিয়ানার চৌহদ্দি টের পেলেন। স্থানীয় ব্রিটিশ ক্লাবে সভ্য হবার আবেদনপত্র পাঠাতেই বুঝতে পারলেন তাঁর সীমাবদ্ধতা। গোপন ভোটে তাঁর আবেদন নামঞ্জুর হয়ে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন যে হ্যারো বা কেম্‌ব্রিজের ছাত্র হলেও যে ক্লাবের সব সভ্যই সাদা চামড়ার মধ্যবিত্ত ইংরেজ, সেখানে তিনি এখনো ব্ল্যাক ইণ্ডিয়ান। সুতরাং সভ্য হবার যোগ্যতাও তাঁর নেই।

বলাবাহুল্য, তাঁর চামড়ার এই কালো রঙের হেনস্থা নিঃশব্দে হজম করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়লো নেহরুর। ঘটনাটা তাঁকে ক্ষিপ্ত করে তুললো। প্রতিশোধ নিতে হন্যে হয়ে বেশ কয়েক বছর ঘুরে বেড়ালেন তিনি। অবশেষে বুঝতে পারলেন যে একটাই পথ খোলা আছে এবং সেটা হলো স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া। অতএব তাই করলেন। কংগ্রেস পার্টিতে নাম লেখালেন এবং রাজনীতিকে পুরোপুরি পেশা করলেন। তখন রাজনীতির ট্রেনিং স্কুল ছিল ইংরেজের কারাগার। এই জেলহাজতের

www.pathagar.com

নিভৃতে সেলের মধ্যে শুরু হলো নেহরুর রাজনীতির শিক্ষানবিশি। তাঁর ন'বছর জেল বাসের সময় সংগী হলো আরও নেতা। এদের নিয়েই শুরু হলো আদর্শবাদী নেহরুর ভবিষ্যৎ ভারতের স্বপ্ন দেখা। কেমন হবে আগামী দিনের ভারতবর্ষের চেহারা তার রূপরেখা জেলে বসেই স্থির করলেন নেহরু। সমাজ বিপ্লবের নীতির মধ্যেই নিমজ্জিত হলো তাঁর আদর্শবাদ। সেদিন নেহরুর স্বপ্নের মধ্যে মেলবন্ধন হলো দুটো পরস্পরবিরোধী চিন্তাবিলাসের। এই সহবাস আপাত অসংগত হলেও এর মাধ্যমে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন লুপ্ত হয়ে যাওয়া চেতনা। ইংল্যান্ডের সংসদীয় গণতন্ত্রের সংগে জোট বাঁধলেন কার্ল মার্কসের অর্থনৈতিক সমাজতন্ত্র (ইকনমিক সোশ্যালিজম)। তিনি স্বপ্ন দেখলেন, এর ফলে ভারতবর্ষ যেন ক্ষুধা আর কুসংস্কার থেকে মুক্তি পেয়েছে, মুক্তি পেয়েছে ধনতন্ত্রের চাপ থেকে এর বন্ধ্যা অর্থনীতি। দেশময় গড়ে উঠেছে নানা শিল্প, নানা কলকারখানা। কারখানার ধোঁয়ায় শিল্প-নগরের আকাশ ছেয়ে গেছে এবং শিল্পবিপ্লবের সব মুনাফা আঁচলভরে তুলে নিচ্ছে ভারত।

কিন্তু ভারতকে সেই স্বপ্নের দেশে নিয়ে যাবার সার্থক নেতৃত্ব জওহারলাল নেহরু ছাড়া আর কে দিতে পারেন? কংগ্রেস দলের নির্দেশ মেনে ভালমানুষের মতন খাদির পোশাক পরলেও মনেপ্রাণে তিনি তখনও সাহেব। এই অলৌকিকের দেশে তিনিই হলেন একমাত্র যুক্তিবাদী মানুষ। কেমব্রিজে পাঠের সময় যে মন বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারে উল্লসিত হয়েছে সেই মনই আঁতকে উঠলো যখন দেখলো তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মীরা তাদের প্রিয় জ্যোতিষির নির্দেশে ওঠাবসা করছে। এই চরম আধ্যাত্মিক দেশে তাঁকে অজ্ঞেয়বাদী বলা হতো। তবুও দমে যাননি। 'ধর্ম' নামক কথাটা যেন বিভীষিকা ছড়াতো তাঁর মনে। তিনি মনপ্রাণ দিয়ে এদেশের পুরোহিত, সাধু, মন্ত্রপড়া বামুন আর মোল্লাদের ঘৃণা করতেন। তাঁর মনে হতো এরাই দেশটাকে উৎসন্নে দিচ্ছে। এরাই থামিয়ে দিচ্ছে দেশের উন্নতি। এদের জন্যেই দেশের মধ্যে এত ভাঙচুর, বিদেশী শাসনের এত দাপট।

তবে মোল্লা পুরুতের ভারতবর্ষ, কুসংস্কারের ভারতবর্ষই নেহরুকে আপনজন বলে মেনে নিল। তাদের নেতা হলেন তিনি এবং তিরিশটা বছর ধরে দেশটার একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়ালেন। অসংখ্য মানুষের সংগে মিশলেন, তাদের কথা শুনলেন। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। যখন যেখানে গেছেন দেশের মানুষ জলস্রোতের মতন আছড়ে পড়েছেন তাঁকে দর্শন করতে। কেউ এসেছে ট্রেনের গায়ে ঝুলে, কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ গরুর গাড়ি চেপে। মাইলের পর মাইল পেরিয়ে তারা এসেছে তাঁর কথা শুনতে, তাঁকে দেখতে। তবে যারা আসতো তাদের অনেকেই তাঁর কথা বুঝতো না। তারা দেখতো ওই মানুষটাকে। বিশাল জনসমুদ্রের মধ্যে ঈষৎ কৃশ চেহারার ওই মানুষটার হাত পা নাড়া উত্তেজিত চেহারাটা দেখতে পেলেই তাদের মনের সাধ মিটতো।

জওহরলাল ছিলেন এক অতি দক্ষ কথাকার। কথার পরে কথা সাজিয়ে তিনি অতি নিপুণভাবে মালা গাঁথতে পারতেন। যেমন লিখতেন তেমনি বলতেন। গণিকা যেমন অলংকার সংগ্রহ করে তিনি তেমনি কথার মণিমুক্তা চয়ন করতেন। গান্ধীজীই তাঁকে কংগ্রেসের রাজনীতিতে অভিষিক্ত করে দেন। তারপর একটার পর একটা ধাপ ভেঙে তিনি এই দলের সর্বোচ্চ পদে উঠে গেছেন। তিনবার দলের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। তাঁর ইচ্ছের কথা সবাইকে জানিয়ে গান্ধীজী বলেছিলেন যে, নেহরুই

www.pathagar.com

তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী।

নেহরুর চোখে এক বিস্ময়কর প্রতিভা হলেন গান্ধীজী। কেমন এক প্রেরণার মতন মনে হতো তাঁকে লবণ-আন্দোলন, সত্যাগ্রহ আন্দোলন, ভারত ছাড় ইত্যাদি আন্দোলনের পরিকল্পনা তাঁর কাছে অবাস্তব মনে হতো। বিষয়ী বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে নেহরু সেগুলো নাকচ করে দিলেও, মন চুপিচুপি বলতো যে, গান্ধীজীর পথে চলো। তিনিই ঠিক পথ বেছেছেন। পরবর্তীকালে নেহরু এটা স্বীকার করেছিলেন।

একদিক থেকে নেহরুর গুরু ছিলেন গান্ধীজী। সাহেব হয়ে যাওয়া মানুষটাকে ধীরে ধীরে দিশি মানুষ করে তোলেন গান্ধীজী। তিনিই নেহরুকে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে পাঠাতেন, যাতে নিজের চোখে দরিদ্র গ্রামবাসীর দুরবস্থা দেখে তাঁর মন আর্ত হয়, বেদনার আঁচে মন ভারি হয়ে ওঠে। যখনই ওঁরা দুজনে কোথাও গেছেন সেখানে অন্তত আধঘণ্টা বাপুজীর পায়ের কাছটিতে বসে থেকেছেন নেহরু। এটা যেন তাঁর বটগাছের আশ্রয়, দুদণ্ড জিরোতেই এখানে এসে বসেছেন। কখনও কথা বলেছেন, কখনো শুনেছেন, কখনো বা ওঁর মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে থেকেছেন। নেহেরুর কাছে এইসব মুহূর্তগুলো যেন তাঁর নিবিড় আধ্যাত্মিক উপ-লব্ধির মুহূর্ত। তাঁর নাস্তিক মনের কালো দাগগুলো ঝকঝকে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো গান্ধীজীর সান্নিধ্যে এসে যা কোন ধর্মগ্রন্থ পারে নি।

অথচ কত বিষয়েই না অমিল ছিল তাঁদের চরিত্রে। নেহরু নাস্তিক, ধর্মদ্বেষী। আর গান্ধীজীর সবটুকুই ঈশ্বরাশ্রিত, যিনি মনে করেন যে গাছের পাতাটিও ঈশ্বরের নির্দেশ ব্যতিরেকে নড়ে না। এই অটুট ঈশ্বরপ্রেমই গান্ধীজীর অস্তিত্ব, তাঁর সত্তা। দাম্ভিক রুক্ষ মেজাজের দরুন নেহরু কোনদিনই গান্ধীজীর অহিংসা আন্দোলনের যোগ্য সেনা হতে পারেন নি। তিনি বিভোর ছিলেন বিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চায়। দেশ গড়ার কাজে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার অনিবার্যতা তিনি মেনে নিয়ে-ছিলেন অথচ গান্ধীজী ছিলেন ঠিক বিপরীত। তাঁর ধারণা, মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দশার কারণ এরাই।

তবে অমিল সত্বেও উভয়ের মধ্যে একটা আত্মহারা পিতাপুত্র সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। আসলে নেহরুর চরিত্রে একটা প্রবৃত্তিগত অসহায়তা ক্রিয়া করতো। সারা জীবনব্যাপীই একজন প্রবল ব্যক্তিত্বের অভিভাবকত্বের প্রয়োজন বোধ করেছেন নেহরু যাতে তাঁর সাহায্য নিয়ে লঘু চপল মানসিকতা থেকে উদ্ভূত সংকট কাটিয়ে উঠতে পারেন। প্রথম জীবনে এই দায়িত্ব পালন করেছেন নানা স্বাদের পানীয়তে আসক্ত তাঁর আইনজীবী পিতা। তিনি গত হবার পর এই শূন্য স্থানটা পূরণ করলেন গান্ধীজী।

গান্ধীজীর ওপর নেহরুর ভক্তিশ্রদ্ধার কোন অভাব না হলেও ইদানীং একটা সূক্ষ্ম বদল টের পাচ্ছিলেন নেহরু। নেহরুর জীবনের একটা অধ্যায় তখন শেষ হতে চলেছে। তিনি মনস্থির করে ফেলেছেন যে, পৈত্রিক ভবন ছেড়ে যাবেন কারণ গেটের বাইরে আর একটা জগতের হাতছানি টের পাচ্ছিলেন তিনি। এই নতুন জগতে তাঁর দরকার আর একজন গুরুর, যিনি জীবনের জটিল সমস্যাগুলো থেকে তাঁকে উতরে দিতে পারেন। সমস্যার চেহারাটা জানা না থাকলেও, তিনি যখন বড়লাটের সংগে দেখা করতে এলেন, তখন নেহরুর মনোজগতে ছেয়ে ছিল এই শূন্যতা।

www.pathagar.com

সিংগাপুরে তাঁদের প্রথম সাক্ষাতের পর জগতের অনেক বদল হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। বদলেছে মাউন্টব্যাটেন ও নেহরুর জীবনযাত্রাও। কিন্তু সৌহার্দ্যের যে ফল্গুধারা তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎটি মধুর করেছিল তার আঁচ তখনও নিভে যায় নি। ভাইসরয়ের স্টাডি রুমে ঢুকেই নেহরু যেন তা টের পেলেন। ব্যাপারটার মধ্যে অস্বাভাবিকতা ছিল না। কারণ মাউন্টব্যাটেন না জানলেও নেহরু জানতেন যে মাউন্টব্যাটেনের এই নিয়োগের ব্যাপারে তিনি কতটা দায়ী।

এ ছাড়াও দুজনের মধ্যে এই সম্প্রীতির আর একটা কারণ ছিল। তাঁদের সাক্ষাতের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল দুটি কুলীন পরিবারের। একটি হলো তিন হাজার বছরের পুরনো বংশগৌরব সমন্বিত কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ পরিবার এবং অন্যটি হলো ইংল্যান্ডের প্রাচীনতম বনেদী প্রোটেস্ট্যান্ট বংশ। দুই পরিবারের দুটি মানুষের মধ্যে চারিত্রিক মিলও অনেক। দুজনেই বাকপটু এবং পরস্পরের সাহচর্যে নিজেদের জড়িয়ে দিতে জানেন। ভাবুক নেহরু কল্পনাবিলাসী হলেও মাউন্টব্যাটেনের বাস্তববুদ্ধির প্রশংসা করেন। প্রশংসা করেন তাঁর দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবার দক্ষতাকে। অন্যদিকে নেহরুর মুক্তচিন্তা এবং কৃষ্টিসম্পন্ন মনের প্রতি বিস্ময়কর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন মাউন্টব্যাটেন। তাঁর মনে হতো নেহরুই একমাত্র যোগ্যতাসম্পন্ন ভারতীয় রাজনীতিক নেতা যিনি তাঁকে ঠিকমতন বুঝবেন এবং ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে সম্পর্কটা অটুট রাখার চেষ্টাকে যিনি মর্যাদা দিতে পারবেন।

আলোচনার টেবিলে বসে সরলভাবেই মাউন্টব্যাটেন তাঁর দায়িত্বের কথা স্বীকার করলেন। বললেন কি ভীতিকর দায়িত্বভার নিয়ে তিনি এদেশে এসেছেন। তবে নিরপেক্ষ এবং বাস্তবসম্মত দৃষ্টিতেই সমস্যাটা তিনি বুঝে নিতে চান। আলোচনার মধ্যে দুজনের কাছে স্পষ্ট হলো দুটো প্রধান বিষয়। তাঁরা একমত হলেন যে কোন মূল্যে দেশজুড়ে এই রক্তপ্লাবন বন্ধ করবেন এবং দেশবিভাগ রোধ করবেন, কারণ দেশভাগ হলে তা হবে অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

আলোচনা প্রসঙ্গে আর একজনের কাজকর্মের ধারা নিয়ে কথা উঠলো। এরপর তিনিই মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন। নির্বিচার গণহত্যায় অনুতপ্ত মানুষটি নাকি একাই পদযাত্রা শুরু করেছেন বিহারে এবং বাংলার নোয়াখালিতে। মাউন্টব্যাটেনের মনে হলো তাঁর সামনে বসে থাকা নেহরু স্পষ্টই বিরক্ত তাঁর কাজে। অথচ এতদিন এঁকেই গুরু মেনে এসেছেন নেহরু। নেহরু যা বললেন তা থেকেই প্রকাশ পেল তাঁর বিরক্ত মনোভাব। নেহরু বললেন, 'উনি দোরে দোরে মলম নিয়ে ঘুরছেন, চেষ্টা করছেন প্রতিটি ক্ষতের গায়ে মলম লাগাতে। কিন্তু যে ক্ষত সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে তার কারণ নির্ণয় করছেন না, তাই চিকিৎসাও হচ্ছে না।'

নেহরুর ইঙ্গিতটা অর্থবহ। তাই তখনই প্রয়োজনীয় তত্ত্বটি বুঝে নিতে পারলেন মাউন্টব্যাটেন। তিনি উপলব্ধি করলেন যে ভারতের মুক্তিদাতা এই বৃদ্ধ নেতা এবং তাঁর অনুরাগীদের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বড় হচ্ছে। সুতরাং এই ব্যবধানটাই কাজে লাগাতে হবে। তাঁর মনে হলো ভারতীয় নেতারা যদি দেশকে অখণ্ড রাখার তত্ত্ব বুঝতে না চান তবে সংকট থেকে মুক্তি পেতে দেশভাগের নৈতিক দায়িত্ব তাদেরই নিতে হবে। তাদের বুঝতে হবে এর প্রয়োজনীয়তা। অবশ্য তখন গান্ধীজীর তরফ থেকে যে বাধা আসবে তা দুর্লঙ্ঘ্য। তবে সে বাধা তিনি কাটিয়ে

www.pathagar.com

উঠতে পারেন যদি অন্য নেতারা তাঁর ভারত ভাগের প্রস্তাবে রাজী হয়। কিন্তু গান্ধীজীর সংগে বিরোধ করার ঝুঁকি কে নিতে পারেন নেহরু ছাড়া? একমাত্র তিনিই পারেন গান্ধীজীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার দুঃসাহসী ভূমিকা নিতে।

গান্ধীজী এবং কংগ্রেস পার্টির অন্য নেতাদের মধ্যে বিরোধের আভাসটা নেহরুর কথার মধ্যেই পরিস্ফুট হয়েছে। এখন মাউন্টব্যাটেনের লক্ষ্য হবে সেই ফাঁকটা বাড়ানো এবং একে কাজে লাগানো। সুতরাং নেহরুর সমর্থন তাঁর চাই-ই। এর জন্যে সবরকম উদ্যোগ তাঁকে নিতে হবে। তাঁর 'বশ করার নীতি'কে কার্যকর করতে নেহরু ছাড়া আর কোন নেতার উপর তিনি নির্ভর করতে পারেন না। সখ্যতার প্রশ্রয়ের আড়ালেই এই দুরূহ কাজটি তাঁকে সম্পন্ন করতে হবে। সুতরাং আগামী দিনে তিনি কোন ভূমিকা নেবেন তার প্রস্তুতি শুরু হলো সেদিনের আলোচনার টেবিলে।

আলোচনা শেষ হলো। নেহরুকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে মাউন্টব্যাটেন বললেন, 'মিস্টার নেহরু, শেষ বড়লাট হিসেবে এদেশ থেকে ইংরেজের রাজ্যপাট তুলে দিতে আমি এখানে আসিনি। আমি এসেছি ভারতকে নতুন পথের সন্ধান দিতে। আমার অনুরোধ, সেই ভূমিকাতেই আমায় দেখুন।' নেহরু ঘুরে তাকালেন মাউন্টব্যাটেনের দিকে। মনে পড়লো এই মানুষটাকেই তিনি বড়লাট হিসেবে চেয়েছিলেন। তাই মানুষটার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললেন, 'এখন বুঝছি কেন সবাই আপনার মধুর ব্যক্তিত্বকে অমন সর্বনেশে মনে করে।'

* * *

চার্চিল বর্ণিত 'অর্ধ নগ্ন ফকির' আর একবার সম্রাটের প্রতিনিধির সংগে সমান মর্যাদায় কথা বলতে বড়লাটের স্টাডি রুমে এসে বসেছেন। উনি এসেছেন ভারতের প্রতিনিধিরূপে। মাউন্টব্যাটেন চেয়ে আছেন অপলক চোখে তাঁর দিকে। তাঁর মনে হলো 'যেন একটা ছোট্ট পাখি' উনি। ছোট্ট 'মিষ্টি কিন্তু মনমরা একটা চড়াই পাখি চেয়ারের হাতলের ওপর এসে বসেছে।'*

কিন্তু সামনাসামনি বসে থাকা মানুষ দুজন কত আলাদা। ছিমছাম সামরিক পোশাকে একজন কেতাদুরস্ত। অন্যজন যেন তাঁর কৃশ শরীরটুকু পরিপূর্ণ পোশাক দিয়ে ঢাকতেও কুণ্ঠিত। মোটা খদ্দরের চাদর দিয়ে ঊর্ধাংগ ঢেকে আলোচনা সভায় এসেছেন। দেহলাবণ্যে ঝলমল করছেন একজন। ভরপুর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মানুষটা কি দারুণ প্রাণবন্ত! অথচ বৃদ্ধ গান্ধীজী যেন তাঁর ক্ষয় হয়ে যাওয়া ক্ষীণ শরীরটা নিয়ে অতবড় আর্মচেয়ারের খোলের মধ্যে হারিয়ে গেছেন। একজন অহিংসার পূজারী হয়েও নির্ভীক। অন্যজন পেশাদারী সৈনিক। যুদ্ধই তাঁর জীবিকা। একজন অভিজাত পরিবারের স্বচ্ছল অবস্থায় মানুষ হয়েছেন, অন্যজন স্বেচ্ছায় দীনদরিদ্র মানুষের সেবায় তুচ্ছ জীবনধারণ বেছে নিয়েছেন। একজন যুদ্ধের প্রকরণে

* প্রিন্স অব ওয়েলস্-এর সঙ্গে যুবক মাউন্টব্যাটেন ১৯২১ সালে প্রথমবার ভারতবর্ষে আসেন। সেবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন মাউন্টব্যাটেন। কিন্তু ভাবী সম্রাটের সঙ্গে গান্ধীজীর দেখা করার ব্যবস্থা করতে পারেন নি। প্রিন্স অব ওয়েলস্ রাজী হয়েছিলেন মাউন্টব্যাটেনের কথায়। কিন্তু গান্ধীজী তখন রাজদর্শন বয়কট করেছেন। তাছাড়া বড়লাট লর্ড রীডিংও চান নি যে ওঁদের সাক্ষাৎ হোক। এমন কি মাউন্টব্যাটেনকেও গান্ধীজীর সঙ্গে একা দেখা করতে দেন নি লর্ড রীডিং।

www.pathagar.com

আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা এনে যোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিক করেছেন, অন্যজন জীবনে জীবন যোগ করেছেন যন্ত্রের তোয়াক্কা না করেই। পৃথিবীর ভাগ্যাবিড়ম্বিত কোটি কোটি মানুষের সঙ্গে প্রাণে প্রাণে কথা বলেছেন। এমন সার্থক অন্তরঙ্গ আলাপন এই শতাব্দীর এক বিস্ময়।

এঁদের চরিত্রের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে বসলে মনে হবে এঁরা দুজন কত আলাদা। কিন্তু দিন যত এগোতে লাগলো মনের অমিলভাব ততই মিলিয়ে যেতে লাগলো। অমন ডাকসাইটে পেশাদার যুদ্ধনেতার মধ্যেও গান্ধীজী 'এমন কিছু নীতিবোধের পদধ্বনি শুনলেন যা তাঁর প্রাণে দোলা দিয়ে গেল।' তবে শুধু গান্ধীজী নন। এর প্রতিধ্বনি মাউন্টব্যাটেনও শুনেছিলেন। 'ওরে তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি?' বাস্তবিক তাই। সেইজন্যে এই মহান তীর্থ-যাত্রীর মহামরণের পরে বিস্ময়স্তব্ধ মাউন্টব্যাটেন খেদ করে বলেছিলেন, 'ইতিহাসের পাতায় যুগ যুগ ধরে খ্রীষ্ট বুদ্ধের মতন মহাত্মা গান্ধীও মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে থাকবেন।'

গান্ধীজীর সঙ্গে এই সাক্ষাতের ব্যাপারটা তাঁর কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, বড়লাটপদে অভিষেকের আগেই মাউন্টব্যাটেন তাঁকে দিল্লি আসতে অনুরোধ করলেন। সম্মত হয়ে গান্ধীজীও সঙ্গে সঙ্গে জবাব লিখলেন বটে, কিন্তু পাঠালেন না। একজন সহকর্মীকে ডেকে বললেন, 'এখুনি চিঠিটা ডাকে ফেলো না। তাহলে ছোকরা হয়ত ভেবে বসবে যে দেখা করার জন্যে আমি হেদিয়ে মরছি।'

'ছোকরা'ও কম নন। নেমন্তন্নের চিঠির সঙ্গে মনযোগানো একটা প্রস্তাবও পাঠিয়েছিলেন তিনি। প্রস্তাবটা একটু অন্যরকম। যার দরুন সহযোগী অনেক ইংরেজেরই বিরাগভাজন হতে হয় মাউন্টব্যাটেনকে। সচরাচর যা হয় না সেটাই করতে চেয়েছিলেন মাউন্টব্যাটেন। তাঁর নিজের ব্যবহারের বিমানখানা বিহারে পাঠিয়ে গান্ধীজীকে দিল্লি আনাতে চেয়েছিলেন। অবশ্য গান্ধীজী রাজী হননি। বলে পাঠিয়েছিলেন যে রেলগাড়ির তৃতীয় শ্রেণী চড়েই তিনি দিল্লি আসবেন।

গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর আলোচনা যাতে হার্দ্য হয় তাই শ্রীমতী এড্‌উইনাকেও মিটিংয়ে থাকতে বলেছেন মাউন্টব্যাটেন। কর্তাগিন্নী দুজনেই লক্ষ্য করলেন যে গান্ধীজী যেন কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কিন্তু অতবড় মানুষটার মন এত দুঃখী কেন ? তাঁরা দায়ী নন তো? আতিথেয়তায় ত্রুটি হয়নি তো ? বিচলিত মাউন্টব্যাটেন পত্নীর দিকে চাইলেন। চোখে চোখে কথা হলো এঁদের। কিন্তু কথাটা পাড়বেন কি করে? যাই হ'ক, শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে মাউন্টব্যাটেন জিজ্ঞেস করলেন কেন তাঁর এই মনোকষ্ট।

মাউন্টব্যাটেনের কথা শুনে আস্তে আস্তে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন গান্ধীজী। তারপর বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে দক্ষিণ আফ্রিকার সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমার নিজস্ব কিছু নেই। সব ত্যাগ করেছি।' গান্ধীজী থামলেন। মাউন্টব্যাটেনও সে কথা জানেন। একখণ্ড গীতা, দুটো কলাই করা বাসন আর তাঁর তিন 'গুরুর' মূর্তি ছাড়া আর কিছু তাঁর নেই। এগুলো হলো যারবাদা জেলের স্মৃতিচিহ্ন। তবে আর একটা বস্তুর ওপর তাঁর কিঞ্চিৎ দুর্বলতা আছে। সেই ইন্‌সারসল ট্যাঁকঘড়িটা। এইটুকুই বিষয়তৃষ্ণা তাঁর। আট সিলিং দাম দিয়ে কেনা ট্যাঁকঘড়িটা কোমরের কষির সঙ্গে সুতো দিয়ে বাঁধা থাকতো। সাধের সেই ঘড়িখানা আর তাঁর দখলের মধ্যে নেই। 'কেন? কি হলো ঘড়ির ?' ঘড়ির টিকটিক শব্দের সঙ্গে তাঁর কাজের গতি মেলানো থাকতো যাতে প্রতিটি মুহূর্তেই তিনি ঈশ্বরের

www.pathagar.com

কাজে মগ্ন থাকতে পারেন। 'সেই ঘড়িটাই ওরা চুরি করে নিল।' ভারি বিমর্ষ দেখাচ্ছে গান্ধীজীকে। ঘড়ির শোকে উতলা হয়ে গেছেন। ধীরে ধীরে বললেন, 'ট্রেনে চড়ে যখন দিল্লি আসছি তখনই ভিড়ের মধ্যে কেউ এই দুষ্কর্মটা করেছে।' কথাটা বলেই হতাশায় যেন এলিয়ে পড়লেন চেয়ারের খোলের মধ্যে। বিপন্ন বোধ করছেন মাউন্টব্যাটেন। বৃদ্ধকে কী সান্ত্বনা দেবেন? চোখ দুটো চকচক করছে। এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো বৃদ্ধের শুকনো গাল বেয়ে। মাউন্টব্যাটেন বুঝতে পারলেন যে ঘড়ির শোকে তিনি কাতর হন নি। যে অজানা লোকটা এই কাজ করেছে সে না জেনে তাঁর ব্যথার জায়গায় নিষ্ঠুর ঘা দিয়েছে। ঘড়িটা তাঁর কাছে কোন বিলাসবস্তু নয়। যা খোয়া গেছে তা একটুকরো বিশ্বাস। চুরি হয়ে যাওয়া সেই বিশ্বাসের শোকেই বৃদ্ধ এমন কাতর হয়েছেন।*

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন গান্ধীজী। তারপর বিমর্ষ ভাবটা কাটার পর আলোচনা শুরু করতে চাইলেন। কিন্তু তখনই আলোচনায় বসলেন না মাউন্টব্যাটেন। বৃদ্ধের দিকে নিবিড় চোখে চেয়ে বললেন, 'মিস্টার গান্ধী, আগে আপনার নিজের কথা বলুন।' নিজের কথা? কিন্তু কেন? পরক্ষণেই তাঁর মনে হলো কেন এই কৌতূহল। মাউন্টব্যাটেনের প্রশ্নটার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে একটা কূট চাল। মাউন্টব্যাটেন জানতে চান নেতাদের মনের ভাবটা, যাতে আলোচনায় বসেই তাঁর ওপর কর্তৃত্ব করতে তাঁরা না পারেন। তিনি চান আলোচনা হ'ক প্রীতিপূর্ণ হার্দ্য পরিবেশে যাতে নেতারা খোলা মনে কথা বলতে পারেন। তখন কর্তৃত্ব নিয়ে কথা বলবেন মাউন্টব্যাটেন এবং অনায়াসে তাঁর প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন নেতাদের মনের ওপর।

মাউন্টব্যাটেনের এই কূট চালটুকু উপভোগ করলেন গান্ধীজী। তাছাড়া নিজের কথা বলতেও ভাল লাগে তাঁর। মাউন্টব্যাটেন দম্পতিও আগ্রহ ভরে অপেক্ষা করছেন তাঁর কথা শুনতে। বৃদ্ধের ভারি ভাল লাগছিল জীবনের কথা বলতে। কত কথা ভিড় করে আছে মনে। ভেবেছিলেন বুঝি হারিয়ে গেছে তারা। কিন্তু তা কি যায়? রাতের সব তারাই থাকে দিনের আলোর গভীরে। তাই বটে। নইলে দক্ষিণ আফ্রিকার সেই সব তুচ্ছ কথাগুলো কেন মনে পড়ছে তাঁর? সেই বুয়র যুদ্ধে কাঁধে স্ট্রেচার

---

* এই ঘটনার ছ' মাস পরের কথা। ১৯৪৭-এর সেপ্টেম্বর মাস, গান্ধীজী তখন নতুন দিল্লীর বিড়লাভবনে আছেন। একদিন বিকাল নাগাদ একজন অচেনা লোক এসে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে চাইল। লোকটা প্রথমে তার নামধাম বা উদ্দেশ্য জানাতে চায় নি। কিন্তু পীড়াপীড়িতে স্বীকার করলো যে গান্ধীজীর বিলিতি ট্যাকঘড়িটা সেই-ই চুরি করেছিল। এখন সেটা ফেরত দিয়ে ক্ষমা চাইতে এসেছে। গান্ধীজীর সেক্রেটারী আহ্লাদে আটখানা। বললেন, 'ক্ষমা? গান্ধীজী তোমায় খুশীতে জড়িয়ে ধরবেন।' লোকটাকে তারপর গান্ধীজীর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। গান্ধীজীর সামনে উবু হয়ে বসে কি কথা সে বললো তা শুনতে পান নি সেক্রেটারী। কিন্তু যা তিনি দেখলেন তা অবিশ্বাস্য। গান্ধীজী সত্যিই তাকে জড়িয়ে ধরলেন। খুশীতে উপচে পড়েছেন তিনি। সবাইকে ডেকে ডেকে দেখাচ্ছেন চুরি হয়ে যাওয়া ঘড়িটা। বাচ্চা ছেলেরা যেমন হারিয়ে যাওয়া খেলনা ফিরে পেয়ে আনন্দে নাচানাচি করে, তিনিও তেমনি করতে লাগলেন। সবাইকে ডেকে ডেকে লোকটার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন।

www.pathagar.com

নিয়ে বেড়ানো, তারপর ভারতে এসে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া। লবণ আন্দোলন, সত্যাগ্রহ আন্দোলন, আরও কত কি। কথা বলতে একসময় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন। বললেন যে পশ্চিম চিরকালই তার প্রেরণা নিয়েছে প্রাচ্য থেকে। জরথুস্ত্র, বুদ্ধ, মোসেস্, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, শ্রীরামচন্দ্র এ'রা সবাই প্রাচ্যের মহামানব। এ'দের বাণীই পশ্চিমকে পথের সন্ধান দিয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য প্রাচ্যের। তাই শত শত বছর ধরে পাশ্চাত্যের উন্নত সংস্কৃতি ঢেকে দিয়েছিল প্রাচ্যকে। আজ আবার ওরা ফিরে তাকিয়েছে প্রাচ্যের দিকে। ওরা এ্যাটম বোমা তৈরি করে নির্বিচার ধ্বংসলীলায় মেতে উঠেছিল বলেই হাত থেকে রক্তের দাগ মুছে ফেলতে চাইছে। ওরা এখন ভালবাসার কাঙাল হয়ে ফিরে তাকিয়েছে পূবের দিকে। কিন্তু প্রাচ্য ওদের ফিরিয়ে দেবে না। ভরে দেবে প্রেমের ঘট। গান্ধীজীও তাই চান। প্রেমের বাণী। মুক্তির বাণী প্রচার করতে চান পশ্চিমের মানুষের কাছে।

ওঁদের আলোচনা চলেছিল প্রায় ঘণ্টা দুই। এর মধ্যে প্রমাণ হয়ে গেল মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাবটা কত সফল। গান্ধীজী শুধু সাড়াই দিলেন না, সুরে সুর মিলিয়ে বেজে উঠলো তাঁর হৃদয়বীণা। আলোচনা যখন মাঝামাঝি পৌঁছেছে তখন তিনজনেই ঘর থেকে বেরিয়ে মোগল উদ্যানে ছবি তোলাতে এসেছেন। ছবি তোলার পর আবার তাঁরা স্টাডি রুমের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। সাধারণত দুজন যুবতীর কাঁধে হাত রেখে সাতাত্তর বছরের বৃদ্ধ মানুষটি পথ হাঁটতেন। গান্ধীজী স্নেহভরে ওদের 'অন্ধের যষ্ঠি' বলতেন, বলতেন অবলম্বন। আজ আছেন শুধু মনু। অথচ বৃদ্ধকে পথটুকু একটা কিছু ভর করে হাঁটতে হয়। সামনে ছিলেন বড়লাটপত্নী। পরম নির্ভরতায় নিজের অজান্তেই মহিলার কাঁধে এক হাতের ভর দিয়ে হাঁটতে লাগলেন বৃদ্ধ। তাঁর এই নির্ভার পথচলা দেখেই বোঝা গেল তিনি কত সহজ হয়ে গেছেন। যেন বিকালের প্রার্থনা সভায় যোগ দিতে চলেছেন এমন একটা সহজ ভাব। আলোচনার এই হার্দ্য পরিবেশটাই চেয়েছিলেন মাউন্টব্যাটেন।

ওঁরা যখন দ্বিতীয় দফার আলোচনা শুরু করতে ঘরে ফিরে এলেন তখন অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়েছে দিল্লি শহর। প্রখর রোদের তাপে সেঁকা হচ্ছে মানুষজন ঘরবাড়ি। রাস্তাঘাট খাঁ খাঁ করছে। সূর্যের ঝলসানো আলোয় মোগল গার্ডেন্স্-এর গাছগুলো থেকে যেন আগুনের ফুলকি বেরোচ্ছে। রোদের তেজ এত চড়া যে লেবুর ফেলে দেওয়া খোসাটাও মুহূর্তের মধ্যে শুকিয়ে মুড়মুড়ে হয়ে যাচ্ছে। সারা শহরের মধ্যে মাউন্টব্যাটেনের স্টাডি রুমটাই স্নিগ্ধ শীতল। ঘরখানার রঙ ফিরিয়ে আর ঠাণ্ডা মেশিন বসিয়ে তিনি একে প্রীতিমুখর করেছেন।

কিন্তু ঘরের এই হিমাবস্থা সেদিন আর একজনের কাছে মোটেই সুখকর হয়নি। বরং পদে পদে অপদস্থ হতে লাগলেন বৃদ্ধ গান্ধীজী। আজীবন যিনি শিল্প-বিজ্ঞানকে বস্তুবাদী জগতের সর্বদুঃখের কারণ মনে করেছেন, তাঁর কাছে ঠাণ্ডা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রটা কোন বিশেষ আরামের উপকরণ হলো না। খোলা গায়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন ঠাণ্ডার দাপটে। ব্যাপারটা যে এমন হবে মাউন্টব্যাটেন তা ভাবতে পারেন নি। তাড়াতাড়ি এ.ডি.সি.কে ডেকে পাঠালেন। মাউন্টব্যাটেনের পত্নীও সঙ্গে এলেন।

ঘরে ঢুকেই এড্উইনার চক্ষুস্থির। 'একি কাণ্ড করেছ তুমি ? বুড়ো মানুষটাকে নিউমোনিয়া ধরাবে ?' বলতে বলতেই এয়ার কন্ডিশনার যন্ত্রটার কাছে গিয়ে সেটা

www.pathagar.com

বন্ধ করে দিলেন। তৎপর হাতে ঘরের সব ক'টা জানলা খুলে দিলেন। তারপর স্বামীর রয়্যাল নেভির মোটা পশমের সোয়েটার এনে বৃদ্ধের গায়ে চাপা দিলেন। ততক্ষণে কাঁপুনি একটু কমেছে বটে, কিন্তু ঠোঁট প্রায় নীল হয়ে গেছে। এডুইনা তার ব্যবস্থাও করেছেন। ট্রে হাতে খানসামারা চা নিয়ে এল। দামী শৌখিন পাতলা বোন চায়নার কাপে গরম চা পরিবেশন করলেন এডুইনা। চা খেতে তাঁরা তখন বাইরের ঢাকা বারান্দায় এসে বসেছেন। গান্ধীজীর জন্যে মনু কিছু খাবার এনেছে। পাতি লেবুর রস, খেজুর, ছাগলদুধের দই ইত্যাদি। সংগে এনেছে একটা হাতল-ভাঙা চামচ, ভাঙা কলাইকরা বাসন। গান্ধীজীর ব্যবহারের জিনিসগুলো যারবাদা (Jarvada) জেল থেকে আনা হয়েছে।

খাবার খেতে খেতে গান্ধীজী হঠাৎ মাউন্টব্যাটেনের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমার সংগে একটু দই খাবেন নাকি?' পাত্রের ওপর রাখা হলুদ রঙের বস্তুটার দিকে চোখ পড়তেই সাহেব যেন মনে মনে শিউরে উঠলেন। খাদ্যের চেহারা দেখেই চোখে দেখার প্রবৃত্তি চলে গেছে। ঘাড় নেড়ে মাউন্টব্যাটেন বললেন, 'আজ্ঞে না, আগে কখনও খেয়েছি বলে মনে হয় না।' ভাবলেন, তাঁর অপ্রবৃত্তির কথা শুনে গান্ধীজী হয়ত তাঁকে অব্যাহতি দেবেন। কিন্তু এত সহজে গান্ধীজী তাঁকে রেয়াত দিলেন না। মাউন্টব্যাটেনের কথা শুনে একমুখ হেসে বললেন, 'তাতে কি! সব ব্যাপারেই একটা প্রথম অভিজ্ঞতা আছে। নিন, এখুনি একটু চেখে দেখুন।' এই বলে এক চামচ দই মাউন্টব্যাটেনের দিকে এগিয়ে দিলেন গান্ধীজী। নিজের ফাঁদেই আটকা পড়েছেন মাউন্টব্যাটেন। বাধ্য ছেলের মতন টক দইয়ের চামচ নিতে হলো তাঁকে। হাত বাড়িয়ে নিলেন বটে কিন্তু মনে মনে বলে উঠলেন, 'বীভৎস!'

ওঁদের আলোচনার প্রাথমিক পর্ব লনে বসে চা খেতে খেতেই শেষ হলো। আলোচনার শেষে একটা যেন খেই পেলেন মাউন্টব্যাটেন, কারণ তাঁর পূর্ববর্তীরা যতবার এই বৃদ্ধের সংগে আলোচনায় বসেছেন, ততবারই অধৈর্য হয়ে তাঁরা আলোচনা ভেঙে দিয়েছেন।

বস্তুত, ব্রিটিশ সরকারের কাছে গান্ধীজী সবসময়ই একজন ডিফিকাল্ট পারসন (দুর্জ্ঞেয় ব্যক্তি) রূপে চিহ্নিত হয়েছেন। তাঁকে বোঝা যায় না। তাঁর সম্বন্ধে পূর্বানুমান করা যায় না। কিন্তু কেন দুর্বোধ্য তার নির্ণয় হয়নি। গান্ধীজী সত্যান্বেষী। সত্যই তাঁর কাছে একমাত্র নিত্যবস্তু। কিন্তু কী এই সত্য? কেমন তার মূর্তি? গান্ধীজীর 'সত্য' দ্বৈতসত্তাযুগ্ধ। একটা প্রকৃত অন্যটা আপেক্ষিক। মানুষ যতক্ষণ হাড়মাংসের খাঁচার মধ্যে বন্দী আছে, ততক্ষণ সে মাঝে মাঝেই য়্যাব্‌সোলিউট্‌ বা অবিমিশ্র খাঁটি সত্যের নির্দেশ পায়। তবে এই নিত্য সত্য ক্ষণস্থায়ী। পরিপার্শ্বের চাপে তা হারিয়ে যায়। কিন্তু দৈনন্দিন জীবন-যাপনে যে সত্যের সংগে তার লেনদেন হয়, সে সত্য আপেক্ষিক। তার বদল হয়। একটা সহজ নীতিকথা দিয়ে প্রায়ই তিনি তফাতটা বুঝিয়ে দিতেন। বলতেন, তোমার বাঁ হাত একবাটি ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে রাখ, তারপর সামান্য উষ্ণ জলে ডোবাও। মনে হবে ঈষদুষ্ণ পাত্রের জল বেশ গরম। এরপর তোমার ডান হাতটা প্রথমে গরম জলের পাত্রে ডোবাও, তারপর ঈষদুষ্ণ জলের পাত্রে ডোবাও। মনে হবে ঈষদুষ্ণ বাটির জল ঠাণ্ডা। ঈষদুষ্ণ জলের তাপমান দুবারই এক হওয়া সত্ত্বেও অনুভবের এই তারতম্য হয়। তফাতটা এখানেই। গান্ধীজীর আপেক্ষিক সত্য (রিলেটিভ ট্রুথ) কোন আড়ষ্ট বস্তু নয়। অনুভবের তারতম্যের সংগে সত্যের

www.pathagar.com

চেহারার বদল হতে পারে। তাই অনেকক্ষেত্রেই গান্ধীজীকে পরস্পরবিরোধী মনে হয়েছে। সত্য যেমনভাবে তাঁর মনের আরশিতে ছায়া ফেলেছে সেইভাবে নিজেকে তিনি বদলেছেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তাঁর এই অসংগতি সহজভাবে মেনে নিতে পারে নি। তাঁর সংগে আলোচনা করতে এসে অনেক ইংরেজেরই মাঝে মাঝে মনে হয়েছে তিনি অতি ধূর্ত এশীয়। তিনি দুমুখো। এমনকি তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহকর্মীও একবার সেকথা বলে ফেলেছিলেন, 'বাপু! আমি আপনার কথা মোটেই বুঝতে পারছি না। গত সপ্তাহে আপনি যা বলেছেন, এ সপ্তাহে তার ঠিক উল্টোটা বলছেন কি করে?' অভিযোগ স্পষ্ট হলেও গান্ধীজী বিচলিত হন নি। মুচকি হেসে বলেছিলেন, 'কারণ আগের হপ্তার চেয়ে এ হপ্তায় আমি একটু বেশি জেনেছি।'

সুতরাং গান্ধীজীর সংগে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাটা একটু ভয়ে ভয়েই শুরু করেছিলেন নতুন ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন। তাঁর একবারও মনে হয় নি যে দুর্জ্ঞেয় গান্ধীজী তাঁকে কোনভাবে সাহায্য করতে পারবেন। ছোট্ট চেহারার যে মানুষটি তাঁর পাশে বসে 'খুশীতে চড়াই পাখির মতন কিচিরমিচির করছে,' এখানকার সংকটমোচনে তিনি কোন সাহায্যই করতে পারবেন না। বরং তাঁর তরফের কোন সফল উদ্যোগ পণ্ড করে দিতে পারেন বৃদ্ধ গান্ধীজী। এর আগে অনেক ইংরেজই সালিসীর চেষ্টা করে বিফল হয়েছেন এঁর অবুঝপনার জন্যে। ১৯৪২ সালে স্যর স্টাফোর্ড ক্রিপসকে শূন্য হাতে তিনিই ফিরিয়ে দেন। আবার এই মানুষটিরই দুর্বোধ নীতির জন্যে ওয়াভেলের পক্ষে ভারতীয় সমস্যার গিঁট খোলা সম্ভব হয় নি। এমনকি এঁর কূটনীতির দরুন ব্রিটিশ সরকারের এই সাম্প্রতিক উদ্যোগটাও বিফল হয়ে যাবে। ক্যাবিনেট মিশনের যে প্রস্তাব নিয়ে মাউন্টব্যাটেন এসেছেন হয়ত তার ফলে তাঁকেও এবার এই ভূখণ্ড থেকে বিদায় নিতে হবে। কারণ, আগের দিনই তাঁর সান্ধ্যপ্রার্থনা সভায় গান্ধীজী তাঁর আগের কথারই পুনরুক্তি করে বলেছেন যে, ভারতবর্ষ ভাগ হবে, 'আমার মৃতদেহের ওপর। যতদিন আমি বেঁচে আছি ততদিন ভারত বিভাগ কিছুতেই মেনে নেব না।' (So long as I am alive, I will never agree to the partition of India)।

মাউন্টব্যাটেনের দুশ্চিন্তা এখানেই। অনিচ্ছুক হলেও, ভারতভাগের সিদ্ধান্তটা যদি তাঁর ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে অপ্রীতিকর কাজটা তাঁকেই প্রথম করতে হবে। গান্ধীজীর কাছে ছুটে গিয়ে তাঁকে রাজী করাতে হবে। সেক্ষেত্রে বৃদ্ধ গান্ধীজীর দেহ নয়, মনটাই ভেঙে দেবেন তিনি।

গান্ধীজীকে তিনি বললেন যে ব্রিটিশের কৌশল হলো শক্তের কাছে মাথা না নোয়ানো। অহিংস বিপ্লব করে গান্ধীজী জিতেছেন এবং ভাগ্যে যাই-ই থাকুক ইংরেজরা এদেশ ছেড়ে চলে যাবেই। এটাই ভবিতব্য। সব শুনে বৃদ্ধ একটাই জবাব দিলেন। বললেন, যাবার আগে 'দেশটাকে ভাগ করে যাবেন না।' এমনকি তার জন্যে যদি 'শোণিত স্রোত' বয়, তাও সইবে। কিন্তু দেশভাগ সইবে না। অহিংসার পূজারী গান্ধীজীর এটাই হলো শেষ ভিক্ষা। এটুকু আশ্বাস মাউন্টব্যাটেন তাঁকে দিলেন। তিনি জানালেন যে ভারতভাগ হবে তাঁর সর্বশেষ সমাধান। কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থা ত একটা থাকা দরকার। সেটা কি?

গান্ধীজী তখন এত মরিয়া যে দেশভাগ এড়াতে তিনি যে সমাধানের কথা বললেন তা চরম নির্বোধের (Solomonic judgement) বিচারের মতন শোনালো। বৃদ্ধ বললেন যে দেশভাগ না করে পুরো দেশটাই মুসলমানদের হাতে তুলে দেওয়া

www.pathagar.com

হ'ক। জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ বরং দেশ শাসন করুক এবং তারাই হ'ক তিরিশ কোটি হিন্দুর ভাগ্যবিধাতা। এখান থেকে চলে যাবার আগে শুধু একটা খণ্ড নয়, অখণ্ড ভারতের অধিকার জিন্নার হাতে তুলে দিক ইংরেজ।

দেশভাগ এড়াতে মাউন্টব্যাটেন তখন যে কোন খড়কুটো অবলম্বন করতে প্রস্তুত। গান্ধীজীর ইঙ্গিতের মধ্যে 'আজব দেশে এ্যালিসে'র মতন অবাস্তবতা থাকলেও মাউন্টব্যাটেন তা উড়িয়ে দিলেন না। বুদ্ধের আরও অনেক পরামর্শই তো এই ধরনের উৎকট খেয়ালীপনার সামিল এবং তাদের কয়েকটা তো কার্যকরও হয়েছে! তাহলে? সুতরাং মনস্থির করে মাউন্টব্যাটেন জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু আপনার কংগ্রেস পার্টি? তারা কি এমন একটা পরামর্শ মেনে নেবে?'

গান্ধীজী বললেন, 'নেবে। কারণ কংগ্রেস পার্টিও দেশভাগ ঠেকাতে চাইছে। এর জন্যে তারা সব কিছু করতে প্রস্তুত।'

'আর জিন্না? তাঁর প্রতিক্রিয়া কি হবে?'

মহাত্মা এবার হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, 'জিন্নাকে যদি বলেন এটা আমার প্রস্তাব তবে সে ঠিক বলবে "গান্ধী অতি ধূর্ত।"

মাউন্টব্যাটেন একটু যেন ভাবনায় পড়লেন। চুপ করে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। গান্ধীজীর প্রস্তাবের মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা কার্যকর করা যায় না। তাই এত তাড়াতাড়ি একটা হটকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি তাঁর নিজের মানসম্মান খোয়াতে চান না। কিন্তু সেইসঙ্গে ভারতকে অখণ্ড রাখার যে প্রস্তাব এসেছে সেটাও হালকাভাবে দেখতে চান না। তাই গান্ধীজীর দিকে চেয়ে মাউন্টব্যাটেন বললেন, 'দেখুন, আপনি যদি কথা দেন যে কংগ্রেস দল আপনার পরামর্শ মেনে নেবে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করবে, তবে আমার তরফ থেকেও আপনার প্রস্তবটা মেনে নিতে আপত্তি হবে না।'

খুশীতে গান্ধী প্রায় লাফিয়ে উঠলেন তাঁর চেয়ার থেকে। তারপর বললেন, 'আমি কথা দিচ্ছি। সারা দেশ ঘুরে আমি দেশশুদ্ধ মানুষকে বোঝাবো যাতে তারা আপনার সিদ্ধান্তটা মেনে নেয়।'

এই আলোচনার কয়েক ঘণ্টা পরের কথা। একজন ভারতীয় সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে গান্ধীজী তাঁর প্রার্থনা সভায় যাচ্ছিলেন। সাংবাদিকটির মনে হলো গান্ধীজীর মনে যেন 'আনন্দের হাট' বসেছে। বাস্তবিক তাই। প্রার্থনা সভার কাছাকাছি এসে গান্ধীজী হাসতে হাসতে বললেন, 'মনে হচ্ছে স্রোতের মুখ ঘুরিয়ে দিতে পেরেছি।'

'লোকটা আমায় ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে নাকি!' রীতিমত সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন মাউন্টব্যাটেন। তাঁর অমন সাধের 'বশ করার নীতি' হঠাৎ যেন থমকে গেল সামনের চেয়ারে বসে থাকা জগদ্দল পাথরের নিশ্চল মানুষটার গায়ে ধাক্কা লেগে। খদ্দরের চাপকানটা টোগার (toga) মতন কাঁধে ফেলে, চকচকে টাক মাথা লোকটা অপ্রসন্ন মুখে তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে। ওঁর চোখ দুটো উদ্ধত এবং ভ্রুকুটি-কুটিল। দেখে মনে হচ্ছে যেন একজন রোমান সেনেটর, এদেশী নেতা নন।

ওঁর নাম বল্লভভাই প্যাটেল। ভারতের একমাত্র নেতা যিনি স্বভাবে, আদতে পুরোপুরি রাজনীতির মানুষ। মার্কিন রাজনৈতিক সোসাইটি টামানী হলের (Tammany Hall) ভারতীয় সংস্করণের জাঁদরেল মালিকের মতন তাঁর হাবভাব।

www.pathagar.com

আর সেইভাবেই নির্মম শক্ত হাতে কংগ্রেস দল চালাচ্ছেন এই দুঁদে নেতাটি। তবে আলোচনার জন্যে যে ভারতীয় নেতারা এসেছেন, তাদের মধ্যে ইনিই হয়ত মাউন্ট-ব্যাটেনের পক্ষে সবচেয়ে সহজ হতে পারেন, কারণ তাঁর মতন ইনিও বাস্তববাদী এবং শক্ত ধাতের মানুষ। এঁরা দেখে শুনে বাজিয়ে বস্তু সংগ্রহ করেন বটে কিন্তু আত্মহারা কল্পনাবিলাসী হয়ে বাস্তবসত্য এড়িয়ে যান না। অবশ্য আলোচনার টেবিলে এই দুজনের মধ্যে একটা যে অদৃশ্য চাপ রয়েছে তা বেশ অনুভব করা যায়। অন্তত মাউন্টব্যাটেন সেটি বেশ টের পাচ্ছিলেন।

কিন্তু আশ্চর্য! চাপের কারণটা কোন রাজনৈতিক বিষয়ই নয়। টেবিলের ওপর পড়ে আছে একটা সরকারী নথি, একটা নিয়োগের ব্যাপারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কার্য-বিবরণী। ভাইসরয়ের অনুমোদনের জন্যে হাতে করে নিয়ে এসেছেন স্বয়ং বল্লভভাই প্যাটেল। ব্যাপারটা খুবই মামুলী এবং মন্ত্রীর হাতে করে নিয়ে আসা কাগজে অনুমোদন দেওয়াই প্রচলিত বিধি। কিন্তু প্যাটেল যেভাবে বক্তব্য সাজিয়েছেন, যে ঔদ্ধত্য পরিস্ফুট হয়েছে ওই কাগজটার মধ্যে, মাউন্টব্যাটেন তা মেনে নিতে পারেন না। এ যেন স্রেফ নিয়মরক্ষা। মেপেজুপে তাঁর অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করতে চেয়েছেন প্যাটেল।

শক্ত ধাতের মানুষ বলে খ্যাতি আছে মানুষটার। কিন্তু কতখানি শক্ত তার পরিমাপ করা দরকার বোধ করলেন মাউন্টব্যাটেন। টেবিলের ওপর পড়ে থাকা কাগজখানা নিয়েই পরখ করতে চাইলেন তিনি। এটা না হওয়া পর্যন্ত অন্য গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয়ে মনঃসংযোগ করতে পারবেন না তিনি।

*

বল্লভভাই প্যাটেলের জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা মাউন্টব্যাটেন শুনেছেন। সেই থেকে, বেঁচে থেকেই প্রায় কিংবদন্তীর মানুষ হয়ে গেছেন প্যাটেল। বোম্বাই হাইকোর্টের আদালতকক্ষে একটা কেসের বিবরণ দিচ্ছেন বল্লভভাই। জুরিদের অবগতির জন্যে মামলার এই সংক্ষেপবিবরণী দেবার সময় একটা ছোট্ট চিরকুট হাতে এল তাঁর। সেদিকে একবার চেয়েই চিরকুটটা পকেটে পুরে ফেললেন প্যাটেল। তারপর অবিচলিতভাবে বক্তব্যের উপসংহার ভাগ, একটুও সংক্ষেপ না করে, শেষ করলেন। ছোট্ট চিরকুটে তাঁর পত্নীর মৃত্যুর সংবাদ লেখা ছিল।

এই ঘটনাটাই প্রমাণ করে যে, কত শক্ত ধাতের মানুষ হলেন প্যাটেল। তাঁর এক ঘনিষ্ঠ সহযোগী একদা মন্তব্য করেছিলেন যে, প্যাটেলের চরিত্রে আবেগের বালাই নেই। মন্তব্যটা সঠিক নয়। তিনি যথেষ্টই আবেগপ্রবণ মানুষ ছিলেন। কিন্তু জগতের সামনে তাঁর যে শান্ত, নিবৃত্ত ভাবমূর্তি ছড়িয়ে দিয়েছেন তার খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসতে চান না। নিজের সম্বন্ধে একটিমাত্র ধারণাই তিনি জ্ঞাপন করেছেন, তা হলো আত্মসংযম।

দীর্ঘদিন জলবিহারের পর নাবিকরা যেমন স্থলে নেমে বেপেরোয়া টাকা ওড়ায়, সেইরকম অনর্গল শূন্যগর্ভ কথার বুদবুদ আকাশে ছড়ায় এদেশের মানুষ। এই মাত্রাহীন অসংযমের দেশে প্যাটেল হলেন বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। কৃপণের মতন তিনি শুধু কথার পাহাড় সঞ্চয় করতেন। ব্যয় করতেন না। স্ত্রীর মৃত্যুর পর এই নিঃসঙ্গ মানুষটার সর্বক্ষণের সঙ্গিনী ছিলেন মনিবেন। তাঁর একমাত্র মেয়ে। কিন্তু সারা দিনে বাপ-বেটির মধ্যে দশটা কথাও হতো কি না সন্দেহ। তবে প্যাটেল যখন কথা বলতেন লোকে তাঁর কথা শুনতো।

www.pathagar.com

বল্লভভাই ছিলেন আপাদমস্তক ভারতীয়। মাথার চাঁদি থেকে শুরু করে পায়ের চেটোর শক্ত চামড়াটা পর্যন্ত তিনি ছিলেন খাঁটি স্বদেশী। তাঁর দিল্লির বাসভবন বইতে ঠাসা ছিল। তবে সব ক'টাই হলো ভারতীয় লেখকের লেখা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বই। তিনিই ছিলেন একমাত্র ভারতীয় নেতা যিনি দেশের মাটি থেকে উঠে এসেছেন। প্যাটেলের পিতৃদেব ছিলেন গুজরাত জেলার একজন জোতদার চাষী। সেই ধাঁচে অভ্যস্ত হয়ে প্যাটেল নিজেও তাঁর জীবনযাপনের কাঠামোটা শেষ দিন পর্যন্ত বজায় রেখেছেন। রোজ ভোরে ঠিক চারটায় উঠতেন এবং রাত সাড়ে ন'টায় শুতে যেতেন। এই ধরাবাঁধা নিত্যকর্মের কোন ব্যত্যয় একদিনও হয়নি। ঘুম থেকে উঠে প্রথম দু-এক ঘণ্টা কাটতো প্রাতঃকৃত্য সারতে এবং খবরের কাগজ পড়তে। প্রত্যহ সারা দেশ থেকে প্রায় তিরিশটা খবরের কাগজ তাঁর নামে আসতো। কন্যা মনিবেন নজরদারি রক্ষীর মতন তাঁর চলাফেরা, কাজকর্মের ওপর নজর রাখতেন। দীর্ঘ দু'দশক ধরে মনিবেনই ছিলেন পিতার সচিব, সখি এবং সর্বক্ষণের ছায়াসঙ্গিনী। বাপ-বেটির মধ্যে সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ ছিল যে রাত্রেও তাঁরা এক ঘরে শুতেন।

ভারতের জাতীয়তাবাদের প্রতি তাঁর ঝোঁকটুকু বাবার কাছ থেকেই পাওয়া। ১৮০৭-র মিউটিনির সময় ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন তাঁর বাবা। ছেলেবেলায় বল্লভভাই কুঁড়ের চাতালে বসে শীতের রাত্রে ঘুঁটের আগুনের সেঁক নিতে নিতে বাবার মুখে মিউটিনির সেই সব দুঃসাহসিক ঘটনার গল্প শুনতেন। তারপর বড় হয়ে চাষীর কাজ ছেড়ে দিলেন বল্লভভাই। আমেদাবাদে গিয়ে একটা কাপড়ের কলে শ্রমিকের চাকরি নিলেন। দিনে কলে কাজ করেন আর রাত্রে লণ্ঠন জ্বেলে পড়াশুনো করেন। মজুরী যা পান তার প্রতিটি পাই পয়সা হিসেব করে খরচ করেন। এইভাবে কিছুটা সঞ্চয় হলো তাঁর। তারপর যখন তাঁর তেত্রিশ বছর বয়স, তখন জমানো টাকা নিয়ে আইন পড়তে বিলেত পাড়ি দিলেন।

বিলেত গিয়েও বল্লভভাই নীতিভ্রষ্ট হন নি। যে লণ্ডনকে অভিজাত মে-ফেয়ারের ড্রয়িংরুমে বসে দেখা যায়, সেই লণ্ডন তিনি কখনও দেখেন নি। এইসব অভিজাত ড্রয়িংরুমে নেহরু ছিলেন মানী অতিথি। প্যাটেল যে লণ্ডন চিনতেন তা হলো আদালতপাড়ার লণ্ডন। আদালতপাড়ার লাইব্রেরির জগৎটাই ছিল তাঁর চেনা জগৎ। সেখানেই তিনি স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছেন। দিনে দু'বার তাঁর থাকার জায়গা থেকে প্রায় দশমাইল পথ হেঁটে তিনি লাইব্রেরিতে পড়তে যেতেন। বাসের ভাড়া বাঁচিয়ে এইভাবে তিনি দেশে ফেরার টাকা জমাতেন। পাঠ শেষ হবার পর যেদিন হাইকোর্ট বার-এ যোগ দেবার ছাড়পত্র পেলেন সেদিনই জাহাজঘাট পর্যন্ত হেঁটে গেলেন দেশে ফেরার টিকিট কাটতে। সেই যে দেশে ফিরলেন তারপর আর কখনও দেশের বাইরে পা দেন নি।

দেশে ফিরে আমেদাবাদ শহরেই মিল মালিকদের পক্ষে আইনজীবীর পেশা শুরু করলেন প্যাটেল। এতোদিন এদেরই বেতনভুক হয়ে তিনি কাজ করেছেন। দিনে ওকালতি আর রাত্রে আমেদাবাদ ক্লাবে বসে ব্রিজ খেলা—এই ছিল তাঁর নেশা। একদিন আমেদাবাদ ক্লাবে গান্ধীজী বক্তৃতা দিচ্ছেন। ওদিকে ব্রিজ খেলাও চলছে। বল্লভভাইয়ের কোন আগ্রহই নেই। ঘাড় তুলে দেখলেনও না কে বক্তা কিংবা কী সে বলছে। পরদিন কেউ একজন তাঁর বক্তৃতার একটা ছাপানো কপি প্যাটেলের হাতে দিয়ে গেল। পড়তে পড়তে তাঁর চোখের ওপর একটা ছবি যেন ভেসে উঠলো। একটা ভিসন, যা অনেকদিন আগে মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন

www.pathagar.com

তাঁর বাবা। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল প্যাটেলের। শীতের রাত্রে ঘ'ুটের আগুনের সে'ক নিতে নিতে বাবার মুখে যখন মিউটিনির গল্প শুনতেন তখনই এই ভিসনটা দেখেছেন।

বাস! শুরু হয়ে গেল বদলের পালা। গান্ধীজীর বক্তৃতাটা পড়ে তখন শীৎকৃত হয়েছেন বল্লবভাই। বেরিয়ে পড়লেন মানুষটির খোঁজে। দেখা হলো ওঁদের। নিজেকে স'পে দিলেন গান্ধীজীর কাজে। সেটা ১৯২২ সাল। তখন সারা দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন গান্ধীজী। আন্দোলন থেকে কি পাবেন তা নিয়ে কিছুটা উদ্বিগ্ন ছিলেন গান্ধীজী। বল্লভভাইকে প্রচারের কাজে লাগিয়ে দিলেন তিনি। বারদোলী জেলার ১৩৭ গ্রামের মোট সাতাশ হাজার গ্রাম-বাসীর মধ্যে প্রচার চালাতে বললেন। প্যাটেলের সংগঠন এত নিটোল, এত নিখ'ুত হয়েছিল যে সারা অঞ্চলে পে'ৗছে গেল গান্ধীজীর ডাক। এতটা সাফল্য গান্ধীজীও আশা করেন নি। সেই থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথম সারির সৈনিক হয়ে উঠলেন প্যাটেল। গান্ধীজীর ঠিক পরেই তাঁর স্থান হলো। এরপর তিনি কংগ্রেস দলটার পুনর্গঠনের কাজে মনোযোগ দিলেন। তাঁর সংগঠনী প্রতিভার ছোঁয়ায় পুনরুজ্জীবিত হলো কংগ্রেস দল। সারা দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে গেল এর প্রভাব।

কংগ্রেস পার্টির একজন মানুষ সম্বন্ধেই প্যাটেল কিছুটা সতর্ক ছিলেন। খাদির পোশাক পরা এই মানুষটি নেহরু। শুধু পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া নয়, নেহরু এবং প্যাটেলের দৃষ্টিভঙ্গিরও কমবেশি পার্থক্য ছিল। স্বাধীন ভারতের সামাজিক চিত্ররূপটি কেমন হবে এ নিয়ে দুজনের মত সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। নেহরু যে রামরাজ্যের (ইউটোপিয়া) কথা ভাবতেন, তেমন আদর্শ সমাজের কল্পনাটাই প্যাটেলের কাছে অবাস্তব মনে হতো। নেহরুর দেখা নতুন সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন ছ'ুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন প্যাটেল। তাঁর মনে হতো যেন 'তোতা পাখির বুলি' (প্যারট ক্রাই) হলো এই সোশ্যালিজম। প্যাটেল মনে করতেন এ দেশের পক্ষে এই ধনতান্ত্রিক কাঠামোই উপযুক্ত হবে। কেবল তার বিদেশী খোলসটা খুলে স্বদেশী-য়ানায় মুড়ে ফেলতে হবে। তাহলেই সুফল মিলবে। যা ছায়া মারীচ হয়ে মিলিয়ে যায়, তেমন কাল্পনিক সমাজের জন্যে প্রচলিত ব্যবস্থা বর্জন করে ভারমুক্তির চেষ্টা করা অজ্ঞতা।

প্যাটেল এবং নেহরুর চরিত্রের তফাতটা খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দেন প্যাটেলেরই একজন সহকারী। তিনি বলেন, 'প্যাটেল এসেছেন একটা শিল্পনগর থেকে : কারখানা, যন্ত্র আর কলের ধোঁয়ার শহর থেকে তিনি এসেছেন। কিন্তু নেহরু যেখান থেকে এসেছেন সেটা হলো ফুল, ফল আর সবুজ পাতার দেশ।' বলা বাহুল্য তফাতটা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

অন্তর্বর্তী সরকারের বিদেশ দফতরের দায়িত্বটা নেহরুই নিতে চান। এতে প্যাটেলের আপত্তি ছিল না। তিনি জানতেন যখন তখন বিদেশ যাওয়া, বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে গল্পগুজব করা, ইত্যাদি ব্যাপারে নেহরুর যথেষ্ট মোহ আছে। কিন্ত প্যাটেলের কাছে ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বহীন। প্যাটেলের ধারণা, মন্ত্রীসভার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ হলো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। যারা ক্ষমতার উৎস, যেমন পুলিস, নিরাপত্তা এবং সরকারের প্রচার বিভাগ, তাদের চালনা করেন হোম মিনিস্টার। এদের মধ্যে কংগ্রেস দলের প্রতি আনুগত্য বা বশ্যতা তৈরি করতে পারেন শুধু তিনিই।

www.pathagar.com

হয়ত গান্ধীজীর আশীর্বাদধন্য হয়েছেন নেহরু। ওয়ারিসী স্বত্বটাও হয়ত তিনিই পাবেন। কিন্তু মাটির সঙ্গে যোগাযোগহীন এই নিরুদ্দেশ মেঘ দেশের রাজনৈতিক আকাশে কোনদিনই স্বচ্ছন্দে বিহার করতে পারবেন না। নেহরুরও তা জানতেন। তিনিও বুঝেছিলেন যে তাঁর পিছনে যে বিপুল সমর্থনের আশ্বাস আছে, তারা ছায়া মাত্র। অন্য এক 'সীজারে'র আজ্ঞাবহ এই বিপুল বাহিনী নড়াচড়া করে সেই মানুষটারই নির্দেশে। তবে বিশ্বের রাজনৈতিক মঞ্চে গান্ধী এবং নেহরু যেমন ভাস্বর হয়ে আছেন, তেমন মনোযোগী দৃষ্টিপাত প্যাটেল পান নি। জিন্নার মতন তিনিও আছেন এক গৌণ পার্শ্বচরিত্র হয়ে। এটা দারুণ এক রাজনৈতিক বিমূঢ়তা কারণ প্যাটেল ছিলেন, তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীর মতে, 'ভারতের সর্বশেষ মোগল।'

*

টেবিলের ওপর পড়ে থাকা সরকারী নোটটার দিকে তাকিয়ে আছেন মাউন্টব্যাটেন। নিরীহ চেহারার কাগজখানা রীতিমত রুষ্ট করেছে তাঁকে। খানিক বাদে ডেস্কের মধ্যে রাখা সরকারী নথিটা প্যাটেলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন ওটা যেন তিনি তখনই ফিরিয়ে নেন। কিন্তু দাম্ভিক প্যাটেলে তা করলেন না। বাধ্য ছেলের মতন তখনই ফিরিয়ে নিলেন না সরকারী নোটটা।

সামনে বসে থাকা এই ভারতীয় নেতাকে আপাদমস্তক চিনে নিয়েছেন মাউন্টব্যাটেন। এই মানুষটিকে তাঁর দরকার হবে। কারণ কংগ্রেস দলের সমর্থন তাঁর চাই এবং এই মানুষটিই তা জুটিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু এঁকে দলে পাবেন না যদি এখনই লোকটার সঙ্গে বোঝাপড়া না করে নেন। প্যাটেলের সরাসরি প্রত্যাখ্যানই যেন শক্ত করে দিল মাউন্টব্যাটেনের সিদ্ধান্ত। মাউন্টব্যাটেন তখন মনস্থির করে ফেলেছেন। প্যাটেলের দিকে স্থির চোখে চেয়ে থাকতে থাকতে বললেন, 'আপনি যদি নোটটা সরিয়ে না নেন তবে আমাকেও কিছু করতে হবে।' প্যাটেল চেয়ে আছেন মাউন্টব্যাটেনের দিকে। মাউন্টব্যাটেন বললেন, 'ভাবছি আমার প্লেনটা পাঠিয়ে দিতে বলবো।'

প্যাটেল অবাক। বললেন, 'কেন? প্লেন পাঠাতে বলবেন কেন?'

'কারণ, আমি স্থির করেছি যে ইংল্যান্ড ফিরে যাব।' খুব শক্ত করে কথাগুলো বললেন মাউন্টব্যাটেন। একটু চুপ করে থেকে ফের বললেন, 'মিঃ প্যাটেল! আপনি হয়ত জানেন না যে, এই দায়িত্বটা আমি নিতেই চাই নি। তাই ঘাড়ে বোঝাটা চাপিয়ে দিলেও কোন ছলছুতোয় দায়িত্বটা ঘাড় থেকে নামিয়ে ফেলার সুযোগ খুঁজছিলুম। তা আপনিই সেই সুযোগটা করে দিলেন। কাজটা ছাড়ার একটা উপলক্ষ্য এখন পেয়ে গেছি আমি। মনে হচ্ছে এবার মুক্তি পাব।'

মাউন্টব্যাটেনের কথা শুনে প্রায় আঁতকে উঠলেন প্যাটেল। বললেন, 'বলেন কি? আমায় উপলক্ষ্য করে কাজ ছাড়বেন? সত্যি তাই করবেন নাকি?'

'নিশ্চয়ই! আপনার কি মনে হচ্ছে এ আমার শূন্যগর্ভ হুংকার?' মাউন্টব্যাটেন স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে বললেন, 'আপনি কি মনে করেন যে আপনার মতন মানুষের হুমকি আর ধমক খেয়ে এখানে পড়ে থাকবো? তা যদি ভেবে থাকেন তবে ভুল। হয় মিনিটের কাগজটা আপনি সরিয়ে নিন, নয়ত আমাদের মধ্যে একজনকে যেতেই হবে। অবশ্য আমায় যেতে হলে আপনার পি.এম. এবং মিস্টার জিন্নাকে কারণটা জানিয়েই যাব। তারপর সারা দেশ জুড়ে যে ধস নামবে আর যত শোণিতপাত হবে, তার দায় নেবেন আপনি। অন্য কেউ নয়।'

www.pathagar.com

প্যাটেল স্তম্ভিত। মাউন্টব্যাটেনের শক্ত কথাগুলো যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না তখনও। খানিক পরে একটু ধাতস্থ হলে ব্যাপারটা লঘু করতে চাইলেন। বললেন, 'আরে না না। অত শক্ত হবার দরকার নেই। একমাসও হয়নি আপনি বড়লাটের দায়িত্বভার নিয়েছেন। এর মধ্যে এমন কিছু গুরুতর ব্যাপার ঘটলো না যার দরুন আপনাকে চাকরি ছাড়তে হবে।'

মাউন্টব্যাটেন তখনও তেমনি কঠিন। বললেন, 'মিস্টার প্যাটেল, আপনি আমার ধাত জানেন না। আমি যা বলি তা করি। হয় এখুনি আপনি মিনিটের ওই কাগজটা ফিরিয়ে নিন, নয়ত পি.এম.কে ডেকে আমার পদত্যাগের কারণ বলতে হবে আমায়।'

দীর্ঘক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইলেন প্যাটেল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'এখন বুঝতে পারছি, যা আপনি বলছেন হয়ত তাই-ই করবেন।'

'ঠিক তাই।'

প্যাটেল হাত বাড়িয়ে ডেস্কের ভেতর থেকে মিনিটের কাগজখানা বের করলেন। তারপর মাউন্টব্যাটেনের চোখের সামনেই সেটাকে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেললেন।

* * *

ছোট্ট মাথা নিচু বস্তিঘর। সিলিং থেকে ঝুলছে একটা কম পাওয়ারের বাল্ব। বাল্বের গায়ে কালো কালো দাগ। মরে যাওয়া পোকার দাগ ওগুলো। কোমর পর্যন্ত খোলা গায়ে গান্ধীজী বসে আছেন মেঝেয় পাতা খড়ের তোশকের ওপর। তাঁর চারপাশে যাঁরা বসে আছেন তাঁরা বেশ উত্তেজিত। এটা একটা ধাঙড় কলোনি। দিল্লির ভাঙ্গী ধাঙড়রা বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে এখানে ঘর সংসার করে। দিল্লির অতি কদর্য বস্তি এটা। যেখানে সেখানে পড়ে আছে মানুষের মলমূত্র। দুর্গন্ধে ভরে আছে কলোনির বাতাস। বস্তির কালো কালো বাচ্চাগুলো ঘরের জানলায় হুমড়ি খেয়ে বসে আছে। খুশীতে ঝিকমিক করছে ওদের চোখ। ওরা সবাই অচ্ছুত। দিল্লির রাস্তাঘাট ঝাড়ু দেয় ওরা। পায়খানা সাফসুতরো করে। জানলা দিয়ে ওরা তাকিয়ে আছে ওদের পরিত্রাতা গান্ধীজীর দিকে।

যাঁরা গান্ধীজীকে ঘিরে বসে আছেন এঁরা হলেন স্বাধীন ভারতের আগামী দিনের নেতা। গান্ধীজীর জন্যেই ওঁরা এই নোংরা, দুর্গন্ধময় বস্তিতে এসেছেন। কিন্তু কি জঘন্য এর পরিবেশ? বস্তির মধ্যে ঢুকলেই ভক্ করে নাকে একটা দুর্গন্ধ লাগে। নালার মধ্যে পড়ে আছে মানুষের বিষ্ঠা। প্রস্রাবের জল গড়াচ্ছে পায়ে চলা পথে। সেই জল মাড়িয়েই চলাফেরা করছে সবাই। গান্ধীজীর গোঁ, যে ক'টা দিন দিল্লিতে থাকবেন, ওই অচ্ছুতদের সঙ্গেই বাস করবেন। হিন্দু সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত সম্প্রদায় হলো এই অচ্ছুত। গান্ধীজী এদের নাম দিয়েছেন 'হরিজন'। এদের জন্যে কিছু করতে বদ্ধপরিকর তিনি। তাঁর মন জুড়ে আছে এই হতভাগ্যরা। তাই স্বাধীনতা সংগ্রামের পাশাপাশি এই লড়াইটাও চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার ছ'ভাগের এক ভাগ হলো হরিজন। সবারই ধারণা যে পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির জন্যেই এমন জাত গোত্রহীন হয়ে এরা জন্মেছে। এদের চিনিয়ে দিতে হয় না। দেখলেই চেনা যায়। গায়ের কালো রঙ, সর্বদাই সশঙ্ক ভাব, জড়সড় হয়ে একপাশে পড়ে থাকা, এগুলোই বলে দেয় যে এরা অচ্ছুত, ক্রীতদাস, সমাজের বাইরের মানুষ এরা। মানুষগুলো এমনই অযোগ্য যে এদের নামোচ্চারণেও

www.pathagar.com

লোকে অশুদ্ধ হয়। তখন পাপ স্খালন করতে হয় গঙ্গাস্নান করে। পথ চলার সময় এদের পায়ের ছাপ মাটিতে পড়াও বারণ। তাই অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে পথের এক ধার দিয়ে এরা হাঁটে, পাছে কোন বর্ণহিন্দু তাদের ছায়া মাড়িয়ে ফেলে। উত্তর ভারতের কোথাও কোথাও অচ্ছুতরা শুধু রাতের অন্ধকারেই ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোতে পারে এবং দিনের আলোয় তাদের অদৃশ্য মানুষ হয়ে থাকতে হয়।

কোন অচ্ছুতের সামনে বর্ণহিন্দুর ভোজন করা নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ তার ছোঁয়া কুয়ার জল পান করা বা তার ছোঁয়া বাসন ব্যবহার করা। ভারতবর্ষের অনেক মন্দিরেই এখনও এদের প্রবেশাধিকার নেই। তাদের ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে ভর্তি করা হয় না। এমনকি মরেও নিস্তার নেই তাদের। পয়সার অভাবে মড়ার সদগতি হয় না। বেওয়ারিশ মড়া যত্রতত্র পড়ে থাকে। তারপর অগ্নিগর্ভের বদলে শেয়ালশকুনের গর্ভে গিয়ে সেই মড়ার গতি হয়।

ভারতের কোথাও কোথাও কিছুদিন আগেও ক্ষেতিজমির মতন হরিজন কেনাবেচা হয়েছে। কেনা গোলাম হয়ে এরা মাঠে ঘাটে উদয়াস্ত খেটে মালিকের মন যুগিয়ে চলতো। যারা যুবক তাদের দামড়া বলীবর্দের মতন মালিকের পোষ মানা হয়ে থাকতে হতো। একটা ষাঁড়ের চেয়ে একজন অচ্ছুত যুবকের দাম বেশি হতো না। সমাজ ব্যবস্থার বদলের সংগে অবশ্য একটা উপস্বত্ব ভোগ করার অধিকারী হলো তারা। যখন মড়ক লাগতো তখন মরা গরু ষাঁড়ের পচা মাংস বিক্রি করার অধিকার পেত সে।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এদের নিয়েই প্রথম সমাজান্দোলন শুরু করেন গান্ধীজী। প্রথম যে আশ্রমটি তিনি তৈরি করেন সেখানে সবাই ঠাঁই পেত। ফলে অচ্ছুতরাও আশ্রমের অধিবাসী হয়। কিন্তু প্রথাটা নাকি বেদবিহিত নয়, তাই প্রতিবাদের ঝড় উঠলো এবং আশ্রম প্রায় ভেঙে গেল। গান্ধীজী নিজের হাতে হরিজনদের সেবা করতেন। এমনকি একজন হিন্দুর কাছে যে কাজ সবচেয়ে গর্হিত, তাও করতেন। নিজের হাতে অচ্ছুতদের মলমূত্র পরিষ্কার করে তিনি প্রায় দৃষ্টান্ত হয়ে যান। সেই সময়, অর্থাৎ ১৯৩২ সাল নাগাদ সমাজ সংস্কারের নামে হরিজনদের আলাদা প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত করে হিন্দু সমাজের মূল কাঠামো থেকে সরিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র হয়। এর বিরুদ্ধে আমরণ অনশন করে ব্যাপারটা ঠেকাতে পারলেও প্রায় মরতে বসেছিলেন গান্ধীজী। তখন থেকেই অচ্ছুতদের মতন সহজ সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হন তিনি। রেলের থার্ড ক্লাস কামরায় যাতায়াত করেন, তাদের সংগে বস্তিতে থাকেন ইত্যাদি। এইভাবেই গান্ধীজী চেষ্টা করে গেছেন যাতে সমাজের হরিজনরা নিজেরাই তাদের দুরবস্থার কথাটা সম্যক ভাবে বুঝতে শেখেন।*

---

* গান্ধীজীর দরিদ্রিয়ানার চেষ্টাটা তাঁর কংগ্রেসী সহকর্মীদের কাছে রীতিমত অস্বাস্থ্যকর ছিল। গান্ধীজীর এই স্বেচ্ছাদারিদ্র্য নিয়ে দিল্লি আসার দিন কয়েকের মধ্যেই মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে কবি সরোজিনী নাইডুর কিছু কথাবার্তা হয়। গান্ধীজীর এই ঘনিষ্ঠ সঙ্গিনীর কাছে মাউন্টব্যাটেন জানতে চান এমন অবস্থায় গান্ধীজীর তত্ত্বাবধান কংগ্রেস দল কেমনভাবে করেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের প্রশ্ন শুনে হেসেই সারা হলেন শ্রীমতী নাইডু। বললেন, 'আপনি বা গান্ধীজী ভাবতে পারেন যে কলকাতার প্ল্যাটফর্মে হাঁটতে হাঁটতে যখন তিনি কম ভিড়ের থার্ড ক্লাস কামরা খুঁজছেন তখন তিনি একা। কিংবা যখন হরিজনদের কলোনিতে তিনি থাকতে গেছেন, তখন তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের কথা দল ভাবে না। কিন্তু তা নয়। তিনি না জানলেও কংগ্রেস দল থেকে গান্ধীজীর জন্যে অনেক কিছু করতে হয়।

www.pathagar.com

আর কয়েক মাস, কিংবা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই গান্ধীজীকে ঘিরে থাকা এইসব নেতারা স্বাধীন ভারতের মন্ত্রীপদে অভিষিক্ত হতে চলেছেন। ইংরেজের ছেড়ে যাওয়া সুসজ্জিত ঘরে তাঁরা মন্ত্রীমশাই হয়ে বসবেন। দামী আমেরিকান গাড়ি চড়ে দিল্লি শহর ঘুরবেন। উর্দি পরা চালক গাড়ি চালাবে, দরজা খুলবে, দরজা বন্ধ করবে। রীতিমত ঠাটবাটের এইসব আয়োজন শুরু হবে অনতিবিলম্বেই। কিন্তু তার আগে শিক্ষানবিশিকাল উত্তীর্ণ হতে হবে তাদের। একরকম জোর করেই গান্ধীজী ওদের এখানে আনিয়েছেন যাতে ওদের শিক্ষানবিশি হয়। সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট এই ভাংগী কলোনির বস্তিবাসীর দুরবস্থা ওরা নিজের চোখে দেখুক। ভারতের প্রকৃত দারিদ্র্য যে কত ভয়াবহ সেই ছবিটা ওদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন গান্ধীজী। তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, ওদের কর্তব্য কত কঠিন।

বস্তুত, এই রাজনৈতিক বাস্তব সত্যটাই সেদিন রাতে নেতাদের মন আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। ঘরের মধ্যে চাপা গুমোট গরম। দমবন্ধ করা গরমে প্রাণ আইঢাই করছে নেতাদের। গান্ধীজীও কষ্ট পাচ্ছেন। কষ্ট কমাতে তাঁর কেশবিরল মাথায় ভিজে তোয়ালে পাগড়ির মতন বেঁধেছেন। এটাই তাঁর শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র। গান্ধীজী সকৌতুকে দেখলেন যে ওঁর সমর্থকদের মেজাজেও বেশ ঝাঁজ। গুমোট আঁটসাঁট মনের উত্তাপে থমথম করছে অপ্রসন্ন মুখগুলো। কিন্তু কেন?

মাত্র ক'টা দিন আগেই মাউন্টব্যাটেনকে গান্ধীজী কথা দিয়ে এসেছেন যে দেশভাগ ঠেকাতে তাঁর কংগ্রেস দল যে কোন সমাধান মেনে নেবে। কিন্তু সেটা যে তাঁর মিথ্যে প্রতিশ্রুতি সেই ভুলটা এখন তিনি বুঝতে পেরেছেন। তাঁকে ঘিরে থাকা ওই কংগ্রেস নেতাদের সংগে বৃদ্ধ মহাত্মার মনের অমিল যে এই ক'দিনে অনেক বড় হয়ে গেছে এটা তিনি টের পান নি। কিন্তু ফাঁকটা ওরাই বাড়িয়েছে যাদের তিনি এত যত্ন করে তৈরি করেছেন এতদিন ধরে।

পঁচিশ বছর ধরে এদের তিনি উপযুক্ত করে গড়েছেন। এতদিন তাঁকে নির্বিচারে মেনে এসেছে তারা। তাঁর কথায় সাহেবিয়ানা ছেড়ে খাদির পোশাক পরেছে। অনভ্যস্ত হাতে চরকার চাকা ঘুরিয়ে সুতো কেটেছে, পুলিসের লাঠির গুঁতো সহ্য করে নির্ভয়ে ইংরেজের জেল গেটের দিকে এগিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে ওদের আনুগত্য যে শিথিল হয় নি তা নয়। কিন্তু সেই সব ক্ষণিক স্খলন এদের মনে ছায়া ফেলে নি কখনও। অসম্ভব জেনেও তাঁর সংগে অহিংসযুদ্ধে একনিষ্ঠ সৈনিকের মতন শামিল হয়েছে। তারপর ইতিহাসে যা কখনও ঘটে নি, সেই অভূত-পূর্ব স্বাধীনতা স্মারকটি ছিনিয়ে এনেছে বলদর্পী ইংরেজের হাত থেকে। হ্যাঁ অহিংস আন্দোলন করে সেই পরমকাঙ্খিত স্বাধীনতাই এখন পেতে চলেছে ভারত এবং তারই জয়ধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন তিনি।

অনেক কারণেই এরা তাঁকে মেনে এসেছে এতদিন। কিন্তু যে কারণটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো বৃদ্ধ গান্ধীজীর অসাধারণ জনপ্রিয়তা। এক আশ্চর্য প্রতিভায়

একদল সাধারণ মানুষকে যাত্রী সাজিয়ে তাঁর সঙ্গে ট্রেনের এক কামরায় ভ্রমণ করতে পাঠানো হয়। শ্রীমতী নাইডু আরও বললেন যে দিল্লির ভাঙ্গী কলোনীতে আগে থেকেই কিছু মানুষকে হরিজন সাজিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গান্ধীজী তা জানতেন না। শেষমেশ হাসতে হাসতে শ্রীমতী নাইডু বললেন, 'লর্ড লুই, আপনি কোনদিনই জানতে পারবেন না যে, গান্ধীজীকে গরিব করে রাখবার জন্যে কংগ্রেস দলকে কত খরচ করতে হয়।'

www.pathagar.com

ভারতের কোটি কোটি মানুষের সংগে মন দেওয়া নেওয়া করেছেন তিনি। দেশের সব মানুষকে একটি পতাকার আশ্রয়ে নিয়ে এসেছেন গান্ধীজী। ফলে নিজেদের মধ্যে যে বিরোধটা এতদিন গোপন ছিল সেটি প্রকট হয় নি। কারণ, ইংরেজের সংগে বৃহত্তর সংগ্রামের ভূমিকাই প্রধান হয়ে উঠেছিল তখন। কিন্তু গান্ধীজীর দেওয়া প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করতে করতে মনের অচেতন মতপার্থক্য দিল্লির বুকচাপা গ্রীষ্মরাতে আবার যেন উদ্দীপ্ত হলো। গান্ধীজী বুঝতে পারলেন যে, জিন্নাকে প্রধানমন্ত্রী করে মন্ত্রীসভার বানানোর বিকল্প প্রস্তাবটা কংগ্রেসী নেতাদের মনঃপূত হয় নি। তিনি অনেকভাবে সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। বললেন যে, এই প্রস্তাব কার্যকর না হলে মাউন্টব্যাটেন কোনঠাসা হয়ে যাবেন। তখন দেশভাগ করা ছাড়া আর কোন পথ তাঁর সামনে খোলা থাকবে না। গান্ধীজী যখন বিহার এবং নোয়াখালির দাংগাপীড়িত গ্রামগুলি পায়ে হেঁটে ঘুরেছেন, তখনই দেখেছেন দাংগার দুঃসহ পরিণতি। সেই নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি সাময়িকভাবে চাপা দেওয়া আছে মাত্র। দেশভাগ হলে আবার তা জ্বলে উঠবে, তাই কংগ্রেসের নেতাদের হাতে ধরে মিনতি করলেন বৃদ্ধ গান্ধীজী। যে আগুন নেভে নি, তা যেন আবার উস্‌কে দেওয়া না হয়। অন্তত ভারতকে ঐক্যবদ্ধ রেখে নির্বিচার খুনোখুনির তাণ্ডব থেকে মুক্তি পাবার এটাই হবে শেষ সুযোগ যদি তাঁর দেওয়া প্রস্তবটা সবাই মেনে নেন।

কিন্তু পারলেন না গান্ধীজী। নেহরু এবং প্যাটেলকে একবিন্দুও নড়াতে পারলেন না তিনি। বরং তাঁরাই অবাক হলো গান্ধীজীর জিদ দেখে। বৃদ্ধ কি চান ? দেশকে অখণ্ড রাখতে আরও কত দাম দিতে হবে তাঁদের ? তাছাড়া জিন্নার মতন শত্রুর হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার প্রস্তাবে কেন তাঁরা রাজী হবেন ? দেশভাগ করলে অনিবার্য হবে দাংগা, এ কেমন যুক্তি ? না না, এ অসম্ভব। কিছুতেই মানা যায় না এ প্রস্তাব। বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে বৃদ্ধ গান্ধীজীর। তাঁদের বিপথগামী করতে এসেছেন বল, বুদ্ধিহীন এই অকর্মণ্য বৃদ্ধ। সুতরাং বিফল হলেন গান্ধীজী। একেবারে ভেঙে পড়লেন তিনি। কি করে মুখ দেখাবেন মাউন্টব্যাটেনের কাছে? কি করে বলবেন যে তাঁর হাতে গড়া এই আজ্ঞাধীন নেতাদের তিনি স্ববশে আনতে পারেন নি ? মাউন্টব্যাটেন জেনে যাবেন যে তাঁর আর এদের চলার পথ আলাদা। কিন্তু বৃদ্ধ তখনও জানতেন না যে, এই পথ আরও সরে গেছে। কালের লিখন পড়তে পারেননি বৃদ্ধ। তাঁর সাধের 'ক্রুসেড্‌' কী ভয়ংকর পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে তা তিনি বোঝেন নি। তিনি জানতেন না যে এর শুরু যেমন, শেষও হবে তেমনি, আত্মার নীরবতায়।

* * *

বড়লাটের স্টাডিরুম আজ আর বাতানুকুল করার দরকার হয় নি। অবশ্য সময়টা এপ্রিলের মাঝামাঝি এবং দিল্লি শহরও যথেষ্ট উত্তপ্ত। কিন্তু দ্বিপ্রাহরিক বৈঠকে বাইরের সেই উত্তাপটা যেন অনুপস্থিত। তাই শীতাতপ যন্ত্র চালানো হয় নি। কারণটা বোধহয় বড়লাটের সামনের চেয়ারে বসে থাকা ওই মানুষটি। কি আশ্চর্য শীতল আর নিরুত্তাপ উনি ! মনে হয় যেন একটা ঠাণ্ডা স্রোত বেরিয়ে আসছে ওঁর শরীর থেকে এবং এতেই শীতল হয়ে গেছে ঘরের পরিবেশ। উনিই মুসলিম লীগ নেতা মহম্মদ আলি জিন্না। তবে জনগণ থেকে অনেক দূরবর্তী হয়ে থাকেন এই মানুষটি। পাছে ওদের আবেগের উত্তাপে ওঁর মনের বরফকঠিন

www.pathagar.com

শীতলতা আর্দ্র হয়ে যায়। তবে সেদিন যখন মাউন্টব্যাটেনের স্টাডিরুমে বৈঠক করতে ঢুকলেন তিনি মানুষটাকে তখন আরও নিষ্প্রাণ আরও শীতল মনে হলো মাউন্টব্যাটেনের।

মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনাকারী ভারতীয় নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে মুখ্য ভূমিকা যাঁর, তিনিই হলেন মহম্মদ আলি জিন্না। কারণ এ'র হাতেই আছে এই উপমহাদেশের যাবতীয় সমাধান এবং হয়ত শেষমেশ তিনিই শেষ কথাটা বলবেন। তাই আলোচনার জন্যে সবশেষে জিন্নাকেই ডেকেছেন মাউন্টব্যাটেন। তারপর ত কত বছর কেটে গেছে। কিন্তু ওই মানুষটার মনের ক্ষোভ তাঁর কানে যেন নিয়ত বাজে। বাস্তবিক তাই। পরবর্তীকালে তাঁর মনে হয়েছে সে কথা। সমস্যা সমাধান ছাড়াও আরও কত কঠিন ছিল এ'কে প্রভাবিত করা। মাউন্টব্যাটেন তা স্বীকারও করেছেন। বলেছেন, 'মহম্মদ আলি জিন্নার সঙ্গে আলাপ হবার আগে পর্যন্ত আমি বুঝি নি যে এদেশে আমার কাজটা কতটা কঠিন।'

বৈঠকের শুরুতেই মজাদার এমন একটা ঘটনা ঘটলো যা থেকে জিন্না নামক মানুষটার তীক্ষ্ন বিষয়ী মনের ছবির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর চলাফেরা বা কাজকর্ম কোনটাই যে স্বতঃস্ফূর্ত নয়, সবটাই ছকবাঁধা, এই ঘটনাটা তারই প্রমাণ। মহম্মদ আলি কোনভাবে জানতে পারেন যে তাঁকে নিয়ে মাউন্টব্যাটেন দম্পতির একটা ছবি তোলা হবে। এটা জানতে পেরেই মনে মনে একটা ছক কষে ফেললেন জিন্না। তাঁর ধারণা হলো যে সুন্দরী এডুইনাকে মাঝখানে রেখে তাঁরা ছবি তুলবেন। সুতরাং সুন্দরী এডুইনার মনোরঞ্জনের জন্যে একটি শরিফ্ লাইন মুখস্ত করে রাখলেন, যাতে ঠিকসময়ে প্রয়োগ করতে পারেন।

কিন্তু হায় জিন্না ! খোদার ওপর খোদকারি চললো না তার। তাঁর মনোবাসনা পূরণ করলেন না আল্লা। ছবি তোলার সময় দেখা গেল যে সুন্দরী এডুইনার বদলে মাঝখানে এসে গেছেন স্বয়ং জিন্না সাহেব আর তাঁর দুপাশে দাঁড়ালেন মাউন্টব্যাটেন দম্পতি। ব্যাপারটা সত্যিই মজাদার। মাউন্টব্যাটেন দম্পতি কি 'সলাহ্' করে এমনটি ঘটালেন ? কিন্তু জিন্না নামক ওই কম্পিউটার যন্ত্রটিতে যে প্রোগ্রামটা তখন লেখা হয়ে গেছে তার যথাযথ প্রতিফলন হবেই। সুতরাং ছবি তোলার মুহূর্তেই দড়ির মতন শুকনো পাকানো চেহারার মানুষটি যে লাইনটা মুখস্ত করেছিলেন, সেটা উগরে দিলেন। একপাশে সুন্দরী এডুইনা, অন্যপাশে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে নিয়ে পোজ্ নিয়ে দাঁড়িয়েই জিন্না বলে উঠলেন, 'আ! এ যেন দুই কাঁটার মধ্যে একটা রঙিন গোলাপ ফুল ! (আ রোজ বিটুইন টু থর্নস!)' জিন্নার উক্তিটা শ্রীমতী এডুইনার কাছে নিশ্চয়ই দারুণ উপভোগ্য হয়েছিল সেদিন।

ছবি তোলার পাট চুকলে আবার তাঁরা দুজনে বড়লাটের স্টাডিরুমে এসে বসলেন। চেয়ারে বসেই জিন্না শুরু করতে চাইলেন আলোচনা। এই চাই, ওই চাই : চাহিদার এক লম্বা ফিরিস্তি। অভিজ্ঞ মাউন্টব্যাটেন সঙ্গে সঙ্গে হাত নেড়ে জিন্নাকে থামিয়ে দিলেন। তারপর ওই নিষ্প্রাণ রসবোধহীন মানুষটার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'মিস্টার জিন্না, ঠিক এখনই এই ধরনের আলোচনা করতে চাইছি না আমি। তার চেয়ে আসুন, আগে আমরা ভাল করে আলাপ-পরিচয়টা সেরে নিই।'

এরপর আর কথা চলে না। জিন্না মুষড়ে পড়লেন। মাউন্টব্যাটেনও এ সুযোগ হাত ছাড়া করতে চাইলেন না। তাঁর 'অপারেশন সীডাক্শন্' নীতির মধুর প্রভাব ছড়িয়ে দিতে চাইলেন ওই মুসলমান নেতার ওপর। কিন্তু জিন্না তখন শীতল হয়ে

www.pathagar.com

গেছেন। বশ মানলেন না তিনি। নিজেকে গুটিয়ে আড়াল করে রাখার যে সংস্কার নিয়ে মানুষটি বড় হয়েছে, অতি ঘনিষ্ঠ সহযোগীর কাছেও যে নিজেকে মেলে ধরে নি, তার পক্ষে ভিনদেশী, অচেনা, অজানা এই মানুষের কাছে নিজেকে মেলে ধরা, খুবই অপ্রীতিকর।

তবে মাউন্টব্যাটেনও ধৈর্যহীন হলেন না। খেলাচ্ছলে চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। এক এক করে থলি থেকে 'বশ' করার অনেক নতুন নতুন জড়িবুটি বের করে তাঁর মোহন প্রভাব ছড়িয়ে দিতে লাগলেন ওই কঠিন মানুষটার ওপর। ফল মিললো। ধীরে ধীরে শুরু করলো বরফ গলতে। তাও প্রথমেই নিজেকে হাট করে মেলে দেন নি জিন্না। একটু একটু করে মেলে ধরেছেন নিজেকে। প্রথম প্রথম একবার একটা দুটো নিষ্প্রাণ 'হাঁ', 'হুঁ' ছাড়া আর কিছুই জুটলো না মাউন্টব্যাটেনের কপালে। কিন্তু শেষমেশ পুরস্কার পেলেন। ক্রমাগত ঢুঁ মেরে টলিয়ে দিলেন ওই মানুষটার মনের পাথর। দীর্ঘ দুঘণ্টা লড়াই করলেন মাউন্টব্যাটেন অবশেষে ক্ষরিত হলো বিন্দু বিন্দু জলধারা মনের অটল পাথরের গা বেয়ে। তরলিত হলেন জিন্না। ঘণ্টা দুয়েকের ধস্তাধস্তির পর জিন্না যখন স্টাডিরুম ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। মানুষটা চলে যাবার পর ক্লান্ত, অবসন্ন মাউন্টব্যাটেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। তারপর তাঁর প্রেস্ অ্যাট্যাশে অ্যালান্ ক্যাম্পবেল জনসনের দিকে চেয়ে বললেন, 'হায় ভগবান ! লোকটা কি ভীষণ ঠাণ্ডা। আমার এতক্ষণ সময় লাগলো লোকটার মন ভেজাতে !'

*

একদিন যে মানুষটা পাকিস্তানের জনক হবেন, সেই পয়গম্বর জিন্না বিশ্বের নয়নগোচর হন লণ্ডনের ওয়ালডর্ফ হোটেলের ডিনার টেবিলে। জগতের সামনে সেই তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ বলা যায়। সেটা ১৯৩৩ সালের কথা। লণ্ডনে তখন বসন্তকাল চলছে। শীতের হাওয়া বিদায় নিয়েছে। লণ্ডনের পাতাঝরা গাছগুলি সেজেছে নতুন পাতায়। নতুন আশায় মুকুলিত হয়েছে শীতে জবুথবু মানুষের মন। রহমত আলী নামে সেই গ্র্যাজুয়েট ছাত্রটির মনও নবীন আশায় মুকুলিত। নিজের খরচে লণ্ডনের ওয়ালডর্ফ হোটেলে ব্ল্যাক টাই (black-tie) ডিনারের ব্যবস্থা করেছে রহমত। রীতিমত পৃথুল ভোজের আয়োজন। অ-মুসলমানী এবং নিষিদ্ধ মাংস মদ্যের ছড়াছড়ি। দামী সাদা রঙের ফরাসী পানীয় (chablis) আর কুক্কুটের পিঠের মাংস পরিবেশিত হচ্ছে এই ডিনারে। আজকের ভোজনানুষ্ঠানে ভারতের একমাত্র মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতা মহম্মদ আলি জিন্নাকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে। মানুষটাকে রহমতের বড় দরকার। তার খুব আশা যে জিন্নাকে নিজের দলে টানতে পারবে। পৃথক ইসলামী রাষ্ট্রের আন্দোলনের দায়িত্ব যদি জিন্না নেন, তবে খুবই নিশ্চিন্ত হয় রহমত আলি। কিন্তু ডিনার টেবিলেই ঠাণ্ডা ধমক খেল রহমত। ভারতের মুসলিম নেতা নিস্পৃহ স্বরে বললেন, 'এ আপনার অলীক স্বপ্ন দেখা। এ খোয়াব কোনদিনও সম্ভব হবে না।'

সেদিন রহমত আলি যে মানুষটার হাতে পৃথক ইসলামী রাষ্ট্রের আন্দোলনের ভার দিতে চেয়েছিল, জিন্না নামে সেই মুসলিম নেতার রাজনীতির হাতেখড়ি হয় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতির কথা প্রচার করে। গান্ধীজীর মতন জিন্নাও কাথিয়াবাড়ের মানুষ এবং জিন্নার ঠাকুর্দা যদি ধর্মান্তরিত মুসলমান না হতেন তবে এই দুই রাজনৈতিক শত্রু একই সমাজের অন্তর্গত হতেন। গান্ধীজীর মতন

www.pathagar.com

তিনিও আইন পড়তে লণ্ডনের ইন্‌স্‌ অব কোর্টে ভর্তি হন। তারপর পড়া শেষ করে আইনজীবীর পেশা নিয়ে যখন দেশে ফিরে এলেন তখন তিনি পুরোপুরি সাহেব।

এক চোখে চশমা (monocle) এই দিশি সাহেবটি দিনে অন্তত চার প্রস্থ স্যুট বদলাতেন। সাহেব দর্জির কাটা সেই স্যুটের চুনট বম্বের স্যাঁতস্যাঁতে হাওয়ায় পাছে নষ্ট হয়, তাই এত যত্ন নিতেন জিন্না। শুধু পোশাক নয় খাদ্যাভ্যাসেও খাঁটি বিলিতি ছিলেন জিন্না। ইসলামি আদতের গন্ধটুকুও সেখানে ছিল না। ভক্ষ্যবস্তুর মধ্যে জিন্নার সবচেয়ে প্রিয় হলো মোরগের পিঠের মাংস (oyster) এবং মাছের ডিমের চাটনি (caviare)। পানীয়র মধ্যে শ্যাম্পেন, ব্র্যান্ডি, বা অন্য যে কোন সুমিষ্ট মদিরা (claret)। কোন পানীয়তেই অরুচি ছিল না তাঁর। তবে জিন্নার আসল ইসলামি গর্ব ছিল তাঁর চারিত্রিক সততা। প্রায় দুর্ভেদ্য বললেই হয় তাঁকে। অধিকারহীন হবার একটা পাইপয়সাও ছোঁননি তিনি। অত্যন্ত তীক্ষ্মবুদ্ধির এই মানুষটির আইনজ্ঞান ছিল খুবই পরিপক্ক। চুলচেরা আইনজ্ঞ ছিলেন জিন্না। তবুও সর্বক্ষেত্রেই ভারী সন্তর্পণ ছিল তাঁর পদক্ষেপ। আবেগ নামক বস্তুটি তাঁর চরিত্রে ছিল না বললেই হয়। তাঁর সম্বন্ধে একজন ঘনিষ্ঠ সহকারী একদা মন্তব্য করেছিলেন 'লাস্ট অব দ্য ভিক্টোরীয়ান্‌স্‌।' ভদ্রলোকটির মতে জিন্নার আসল মুনশীয়ানা হলো তাঁর বাকচাতুর্য। সংসদ ভবনের মধ্যে 'গ্ল্যাডস্টোন, ডিজ্‌রেলির মতন নিপুণ বক্তা' ছিলেন জিন্না।

আইনজীবীর পেশায় অসাধারণ কৃতবিদ্য জিন্না স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁর প্রতিভার স্ফুরণের জন্যে রাজনীতিতে চলে আসেন। এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক আকাশে তখন কংগ্রেস দলের অপ্রতিহত প্রাধান্য। তো এই কংগ্রেস দলেই যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন জিন্না এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্যের বাণী প্রচার করে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করলেন। কিন্তু কংগ্রেস দল সম্বন্ধে জিন্নার মোহভঙ্গ হলো রাজনীতির মঞ্চে গান্ধীজীর আবির্ভাবের পর। জিন্না চেয়েছিলেন যে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে তিনি হবেন একমেবাদ্বিতীয়ম। কিন্তু গান্ধীজীর হঠাৎ আবির্ভাব তেমনটি হতে দিল না। ক্ষমতাশীর্ষে গান্ধীজীর আরোহণ সইতে পারলেন না জিন্না। নিখুঁত সাহেবি পোশাকের জিন্নাকে কোনদিন গান্ধীজীর মতন নেংটি পরা অর্ধউলঙ্গ পরিধানে ভাবা যায়নি। কারণ, অমন পোশাকে মাথায় নির্বোধ একটা খদ্দরের টুপি লাগিয়ে ইংরেজের নোংরা জেলে যেতে ঘেন্না করতেন তিনি। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে জিন্নার মন্তব্য যেমন স্পষ্ট তেমনি কঠোর ছিল। এমনকি গান্ধীজীর কাছেও তাঁর স্পষ্ট মতামত জানাতে তিনি দ্বিধা করেন নি। গান্ধীজীকে তিনি বলেছিলেন যে ওই আন্দোলনটা 'অশিক্ষিত এবং মূর্খদেরই মানায়।'

জিন্নার রাজনৈতিক জীবনের সন্ধিক্ষণ (টার্নিং পয়েন্ট) হলো ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পরবর্তীকাল। এই নির্বাচনে জেতার পরেই আখের গুছিয়ে নিল হিন্দু কংগ্রেস। যে সব প্রদেশে সংখ্যালঘু হয়েও মুসলমানরা যথেষ্ট প্রভাবশালী সেখানেও তাদের জন্যে ছিটেফোঁটা বরাদ্দ ছাড়লো না কংগ্রেস। এতবড় বঞ্চনা জিন্নার মতন দাম্ভিক মানুষের বরদাস্ত হলো না। তাঁর ধারণা হলো এটা তাঁর ওপর ব্যক্তিগত আক্রোশের পরিণাম। ভারতে যদি কখনও কংগ্রেসের শাসন কায়েম হয়, তাহলে সেই কংগ্রেস শাসিত ভারতে তিনি বা তাঁর মুসলিম লীগ কোন 'ফায়দা' তুলতে পারবে

www.pathagar.com

না কোনদিন। অতএব এক কালের হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সাধক (য়্যাপস্টল্) হয়ে উঠলেন পাকিস্তান নামক পৃথক রাষ্ট্রের জেদী একরোখা প্রবক্তা। বছর চার আগেও যে প্রস্তাবটাকে 'অলীক স্বপ্ন' বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেটাই হয়ে উঠলো তাঁর ধ্যানজ্ঞান।

অথচ ভারতীয় মুসলমানদের অবিরোধী নেতা হওয়ার উপযুক্ত ছিলেন না জিন্না। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ঠাকুরদাদার ইসলাম ধর্মটুকু ছাড়া আর কোনকিছুর মধ্যেই তাঁর মুসলমানী খানদান ছিল না। তিনি মদ্যপান করতেন, শুয়েরের মাংস খেতেন। রোজ সকালে নিয়ম করে দাড়ি কামাতেন এবং যে নিয়মনিষ্ঠা নিয়ে এইসব নিষিদ্ধ কাজ করতেন, সেই নিয়মনিষ্ঠা মেনেই শুক্রবারদিন মসজিদে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। জিন্নার মানসচোখে যে জগতের প্রতিফলন হয়েছিল সেখানে ঈশ্বর বা কোরানের কোন স্থান ছিল না। এমনকি তাঁর একমাত্র রাজনৈতিক গান্ধীজীও পবিত্র কোরান থেকে যতটুকু উদ্ধৃতি দিতে পারতেন, তিনি সেটুকুও পারতেন না। ভারতের লক্ষ লক্ষ মুসলমান জনসাধারণ বংশপরম্পরায় তাদের মাতৃভাষা উর্দুতে যে ভাব প্রকাশ করতে পারতো, সেই উর্দু জবানে দশটা বাক্য গুছিয়ে বলার মুরদ বা যোগ্যতাও তাঁর ছিল না। তবুও শ্রদ্ধাভক্তি গদগদ হয়ে ভারতের অসংখ্য উর্দুভাষী মুসলমান এই মানুষটিকেই তাদের সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতার আসনে বসিয়েছিল সেদিন।

ওদের কাছে পয়গম্বর হলেও জিন্নার চোখে এই মানুষরা কোনদিন এতটুকু সমাদর পায়নি। সাধারণ মানুষকে রীতিমত হেয় জ্ঞান করতেন তিনি। ওদের ছেঁড়া ময়লা পোশাক, কোলাহলময় জীবনযাত্রা, এখানকার উৎকট গরম, এসবের কিছুই তাঁর সইতো না। গান্ধীজীর ঠিক বিপরীত চরিত্রের মানুষ ছিলেন জিন্না। একজন যেমন রেলগাড়ির থার্ডক্লাস ডাবায় চড়ে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছেন, অসংখ্য মানুষের সংগে অনায়াসে মিশে গেছেন, অন্যজন তেমন পারেন নি। অতি সন্তর্পণে এড়িয়ে গেছেন সাধারণ মানুষের সান্নিধ্য। রেলগাড়ির প্রথম শ্রেণীতে চড়ে একা একা ঘুরে বেড়িয়েছেন দেশটা।

সরল জীবনযাপনের ওপর গান্ধীজীর কেমন একটা অনুরাগ ছিল, জিন্নার তেমন কোন বালাই ছিল না। বরং ঠাটবাট, ভড়ং ভালবাসতেন জিন্না। ভারতবর্ষের যে সব শহরে মুসলিম সংস্কৃতির ঐতিহ্য আছে, সেসব শহরে জিন্না যখন যেতেন, তখন দারুণ জমজমাট মিছিল হতো। মনে হতো শহরে যেন কোন নবাবজাদা এসেছেন। হাতির পিঠে রুপোর হাওদায় সাড়ম্বরে তিনি বসতেন। সুন্দরী মেয়েরা চামর দোলাতো। রাস্তার মোড়ে মোড়ে গোলাপকুঁড়ির মালায় তোরণ সাজানো হতো। শোভাযাত্রার আগে আগে বাদ্যকাররা বাজনা বাজিয়ে চলতো। তারা বাজাতো 'গড্ সেভ দ্য কিং' সুর, কারণ ওই বাঁধাগৎটাই শুধু সাধারণ মানুষের জানা ছিল।

তাঁর জীবন ছিল নিয়মের নিগড়ে বাঁধা একটা 'মডেল'। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যাবে ঠিক কতটা শৃংখলাবদ্ধ ছিল তাঁর জীবনযাত্রা। তাঁর বিশাল 'মন্জিলে'র বাগানে নানারকম ফুলগাছের চারা লাগানো ছিল। শ্রেণীবদ্ধভাবে লাগানো এইসব ফুলগাছগুলো (phlox and petunias) নানা রঙের ফুলে রঙিন হয়ে থাকতো। মন্জিল্ থেকে যখন তিনি বেরোতেন তখন শ্রেণীবদ্ধ সেনানীর মতন রঙিন ফুলের গাছগুলো যেন তাঁকে কুর্নিশ করতো। দুপাশে সাজানো গাছ-গুলোর মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়তেন জিন্না। তারপর পিছন

www.pathagar.com

ফিরে তাকাতেন। না, রঙিন ফুলগাছগুলোর রূপের হাতছানিতে আকৃষ্ট হয়ে নয়। তিনি দাঁড়িয়ে পড়তেন গাছগুলোর শ্রেণীবদ্ধতা যাচাই করতে। কারণ জিন্নার জীবনে নান্দনিক কোন মোহ ছিল না। তাঁর জীবনের মুখ্য বিষয় ছিল ডিসিপ্লিন। তাই পৃথুল আকারের আইনের কেতাব আর সংবাদপত্রের উপাদান ভাণ্ডার যা কিনা নিছক তত্ত্বজ্ঞাপন এবং 'পদাতিক গদ্যে' লিপিবদ্ধ, সেগুলি ছাড়া আর কিছু তাঁর পাঠ্য ছিল না। সংবাদপত্র পাঠ তাঁর জীবনের একটা 'প্যাশন' ছিল। সারা পৃথিবীর 'অখ্বার' তাঁর কাছে আসতো। তিনি সেগুলো মন দিয়ে পড়তেন। তারপর বিষয় অনুসারে তথ্যগুলো কেটে সাদা নোটখাতার পাতায় সেঁটে রাখতেন। যত্ন করে রাখা জিন্নার অসংখ্য কাটিং বই হয়ত তাঁর আফিসঘরের তাকে ধূলিশয্যা নিয়ে অনাদরে এখনো পড়ে আছে।

প্রতিপক্ষ হিন্দুদের সম্বন্ধে মানুষটার তীব্র অবজ্ঞা ছিল। হিঁদুয়ানার কোন কিছুই তাঁর ধাতে সইত না। নেহরু তাঁর কাছে মার্কামারা চপল ফূর্তিবাজ, 'পীটার প্যান।' যার বয়সের গাম্ভীর্য নেই। প্রগল্ভ, ছ্যাবলা। কখনো তাঁকে 'সাহিত্যজগতের লোক' বলেছেন। বলেছেন, 'রাজনীতি নয়', নেহরুর আসল পেশা হওয়া উচিত ছিল, 'ইংরিজি সাহিত্যের অধ্যাপনা।' আবার কখনও বলেছেন, 'একটা একগুঁয়ে বামুন যে তার হিঁদুয়ানার দুষ্টুমি বিলিতি শিক্ষায় মুড়ে দিব্যি ভণ্ডামি করে চলেছে।' নেহরুকে তিনি ভণ্ড তপস্বী ছাড়া আর কিছু মনে করতেন না। পরে গান্ধীজীকে বলতেন 'ধূর্ত শেয়াল'। কখনো বলতেন 'গোঁড়া হিন্দু প্রতিদ্বন্দ্বী।'

একবার এক মজার ঘটনা ঘটে। জিন্না সাহেবের প্রাসাদোপম ভবনে এক বৈঠকের ব্যবস্থা হয়েছে। গান্ধীজীও এসেছেন সেই আলোচনা সভায় যোগ দিতে। বিরতির সময় দেখা গেল যে প্রাসাদের হলঘরের মেঝেয় পাতা দামী পারসিয়ান গালচের ওপর খোলা গায়ে, পেটে কাদার পুলটিস সেঁটে গান্ধীজী দিব্যি চলাফেরা করছেন। কোন ভ্রূক্ষেপ নেই কারো দিকে। দৃশ্যটা দেখেই রাগে গা রিরি করে উঠলো জিন্নার। এ এমন এক দৃশ্য যা ভোলা যায় না, ক্ষমাও করা যায় না।

মুসলমানদের মধ্যে কেউ তাঁর বন্ধু ছিল না। সবাই ছিল তাঁর সমর্থক। সহকর্মী অনেক ছিল কিন্তু অনুরাগী ভক্ত বলতে যা বোঝায় তা কেউ ছিল না। স্নেহের বোনটি ছাড়া পরিবারের আর কারো মতামতের তোয়াক্কা করতেন না তিনি। একা একাই জীবন কাটাতেন। শুধু মনের নিভৃতে পাকিস্তানের স্বপ্নে মশগুল হয়ে থাকতেন। প্রায় ছ'ফুট লম্বা মানুষটা কিন্তু আশ্চর্যরকমের ক্ষীণস্বাস্থ্য ছিলেন। তাঁর শরীরের ওজন ছিল মাত্র একশ' বিশ পাউন্ড। তাঁর মুখের ত্বক এত টানটান পাতলা ছিল যে দুগালের দুই হনু মুখের পাতলা মসৃণ চামড়া ভেদ করে প্রায় ঠেলে উঠেছিল। টানটান চামড়া চকচক করতো এর দরুন। তাঁর মাথার ঘন চুলের গোছাটা প্রায় সবটাই সাদা হয়ে গেছে তখন। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা যে, সতেরো বছর ধরে সর্বক্ষণের সঙ্গিনী থেকেও তাঁর স্নেহের ডেন্টিস্ট বোন ভাইয়ের হলুদ ছোপ লাগা পচা দাঁতগুলো কেমন সযত্নে জিইয়ে রেখেছিলেন। জিন্নার মুখের ভাব এত গম্ভীর আর কঠোর ছিল যে মনে হতো যেন ইস্পাত কঠিন ধাত ওঁর। একজন স্পার্টানবাসীর মতনই নির্ভীক আর বেপরোয়া উনি। কিন্তু সেটাই দারুণ ভ্রম। আসলে ভেতরে ভেতরে খুবই দুর্বল স্বভাবের মানুষ ছিলেন জিন্না। শুধু দুর্বল নয়, অসুস্থও। তাঁর ডাক্তারও সেই কথাই বলতেন। বলতেন, উনি ত তিন বছর ধরে 'শুধু সিগারেট, হুইস্কি আর মনের জোরে' বেঁচে আছেন।

www.pathagar.com

ঠিক তাই। এই অসাধারণ মনের জোরেই জিন্নার সাফল্যের চাবিকাঠি। তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা অনেক নিন্দেমন্দ করেছেন তাঁর সম্বন্ধে। কিন্তু শত্রু বা মিত্র যিনিই হন, তাঁর মনের জোর নিয়ে কেউ কখনও অভিযোগ করেননি।

মাউন্টব্যাটেন আর জিন্নার মধ্যে মোট ছ'টা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। সব ক'টা বৈঠকই হয় ১৯৪৭এর এপ্রিলের প্রথম পনেরো দিনের মধ্যে। এই ক'টা বৈঠকে খুবই অপরিহার্য আলোচনা হয়েছিল। সময়ের মাপে হয়ত দশঘন্টাও নয়, কিন্তু গুরুত্বের বিচারে অনেকখানি ছিল এই ক'টা বৈঠক। কারণ, এই ক'টা বৈঠক থেকেই ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক সংকট মোচনের একটা ইংগিতও তৈরি হয়ে যায়। এই সব আলোচনায় রীতিমত তৈরি হয়েই মাউন্টব্যাটেন যেতেন। তাঁর নিজের কথায়, 'মানুষকে বোঝাবার যে বিরাট গর্ব আমার ছিল তার সবটুকুই তখন প্রয়োগ করেছি, যাতে সঠিক পথ খুঁজে পাই। পারি বলেই যে করেছি তা নয়। আসলে ঘটনাগুলো যথাযথভাবে স্থাপন করে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আমার আছে বলেই করেছি।' তবে সফল হননি মাউন্টব্যাটেন। পরবর্তীকালে সে কথা স্বীকার করেছেন তিনি। বলেছেন, 'জিন্নাকে বশে আনতে কী না করেছি। ছলচাতুরি, কৌশল ; এমনকি হাতে পায়ে ধরে অনুনয় বিনয় করেছি যাতে ওঁর চৈতন্যোদয় হয়। কিন্তু দেশভাগের গোঁ থেকে জিন্নাকে টলাতে পারিনি।' সেদিন কোন যুক্তিই মানতে চান নি জিন্না। তিনি ভেবেছিলেন, তাঁর সংকল্প পাহাড়ের মতন অটল। সুতরাং আগ্রাসী সেই সংকল্পের বিরুদ্ধে কোন যুক্তিই তিনি মেনে নিতে চান নি। পাকিস্তান যে অলীক স্বপ্ন সেই উপলব্ধিই তাঁর হয়নি সেদিন।

দলের এবং সমর্থকদের মধ্যে তাঁর সর্বগ্রাসী কর্তৃত্ব মূলত দুটো কারণের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। মুসলিম লীগ দলের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাধিপতি। তাঁর নিরংকুশ কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ ওঠে নি কখনও। দলের মধ্যে তিনিই নায়ক, অন্য সবাই পার্শ্বচরিত্র। হয়ত এ নিয়ে আপস আলোচনায় বসতে তাঁরা তৈরি ছিলেন। কিন্তু জিন্না বেঁচে থাকতে রফা বা আপসের কথা তোলার সাহসটাও তাঁদের ছিল না। সুতরাং জিন্নার কথাটাই সর্বসম্মত হ'লো। দ্বিতীয় কারণটা হলো কলকাতা শহরের যথেচ্ছ রক্তপাতের বীভৎস স্মৃতি। একবছরও পেরোয় নি তার পর। সুতরাং সেই বীভিষিকাময় স্মৃতি ঝাপসাও হয়নি জিন্নার মন থেকে।

বৈঠক শুরু হলো। গোড়াতেই একটা বিষয়ে দুজনে সহমত হলেন। দুজনেই অনুভব করলেন যে যা করার ক্ষিপ্রতার সংগেই তা করতে হবে। কিন্তু কি করা? জিন্না বললেন যে আপস রফার দিন পেরিয়ে এসেছে দেশ। এখন একটাই সমাধান আছে, তা হলো ছুরি চালিয়ে দেশটাকে দু ভাগ করা। তাঁর কথায় 'সার্জিক্যাল অপারেশন,' নতুবা দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে।

মাউন্টব্যাটেনের তবুও সংশয় ছিল। পার্টিশনের পরেও যদি রক্তপাত হয়? দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি নতুন করে দাংগা বাধে? জিন্না তাঁকে আশ্বস্ত করলেন। বললেন একবার ভাগ হলে সব বালাই কেটে যাবে। তখন দুভাগের মানুষের মধ্যে আবার সম্প্রীতি ফিরে আসবে। সুখশান্তি নিয়ে আবার তারা পাশাপাশি বাস করতে পারবে। মাউন্টব্যাটেনকে তিনি আরও বললেন যে শরিকী মামলায় আদালত থেকে সম্পত্তিভাগের রায় বেরোলেই দু ভায়ের মধ্যে বিবাদ চুকে যায়। তখন আর গোল

www.pathagar.com

থাকে না। ভারত ভাগ হলেও এর অন্যথা হবে না। পাকিস্তান এবং ভারতের মানুষের মধ্যে আবার জাতিপ্রেম জেগে উঠবে।

মাউন্টব্যাটেনকে তিনি আরও বোঝালেন যে ভারতের মুসলমানরা সম্পূর্ণ আলাদা জাতি। 'তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ভিন্ন, ভাষা-সাহিত্য ভিন্ন, ভিন্ন তাদের শিল্পকলা ও স্থাপত্যশৈলী, তাদের আইন ও রীতিনীতি এবং ব্যবহারিক ক্রিয়াকর্ম ও আচারাদি, ভিন্ন তাদের মাস তিথির হিসাব এবং সর্বোপরি তাদের ইতিহাস ও খানদান।' শুধু আলাদা হওয়াই নয়। এই স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

জিন্না তাঁকে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'ভারত কোনকালেই এক জাতির দেশ ছিল না। মানচিত্রে ভারতকে ওই ভাবে দেখানো হয়েছে মাত্র।' তিনি আরও বললেন, 'যে গোমাংস আমি খেতে চাই, হিন্দুরা আমায় সেই গো হত্যা করতে দেয় না। একজন হিন্দু যতবার আমার হাত ধরে করমর্দন করে, ততবারই তাকে হাত ধুতে হয়। শুধু একটা ব্যাপারেই হিন্দুমুসলমানের মধ্যে ঐক্য আছে তা হলো ইংরেজের গোলামি।'

পরবর্তীকালে মাউন্টব্যাটেন বলেছেন যে, সেদিন তাঁদের মধ্যে চাপান-উতরের এই কাজিয়া বেশ চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছিল। 'কিছুটা বিরক্তিকর হলেও গোলক-ধাঁধায় ঘুরপাক (round and round the mulberry bush) খাওয়া খেলা বেশ জমে উঠেছিল।' জিন্না তাঁর কোট ছাড়বেন না; এ্যালিস ইন্ ওয়ান্ডারল্যান্ডের 'মার্চ হেয়ার' হয়ে শুধু একদিকেই হেলে থাকবেন, আর মাউন্টব্যাটেনও তাঁকে রেয়াত দেবেন না। ক্রমাগত নানা যুক্তিজাল ছড়িয়ে লোকটাকে বশ করার চেষ্টা করে যাবেন। খেলাটা এইভাবেই চলেছিল সেদিন। শেষমেশ মাউন্টব্যাটেনেরই আতংক হলো যেন। একই কথা বারবার বলে 'লোকটাকে পাগল করে তুলবো না তো?'

জিন্না তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে দেশভাগ কোন হঠাৎ সিদ্ধান্ত নয়। এটা স্বাভাবিক পরিণতি। বরং দেশভাগ হলে যে নতুন রাষ্ট্র জন্ম নেবে তার আত্মরক্ষার সংস্থান সে নিজেই তৈরি করে নিতে পারবে। তবে জীবনীশক্তির যোগান দেবে যে দুটো প্রদেশ সেই পাঞ্জাব ও বাংলা তাঁর চাই। হ্যাঁ, হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা বেশি হলেও এই প্রদেশ দুটো তাঁদের ভাগে ছেড়ে দিতে হবে।

কিন্তু এমন সরল মীমাংসায় মাউন্টব্যাটেন রাজী হতে পারলেন না। যে অজুহাত দেখিয়ে আলাদা রাষ্ট্র চাইছেন জিন্না, সেই কারণটা মাউন্টব্যাটেনও পেশ করলেন। জিন্না বলেছিলেন যে ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানরা হিন্দুর শাসন মানবেন না। অতএব আলাদা 'পাকিস্তান' চাই। কিন্তু কোন্ যুক্তিতে জিন্না এখন তাঁর পাকিস্তান নামক মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে পাঞ্জাব ও বাংলার হিন্দুদের মুসলমান শাসনাধীনে আনতে চাইছেন? মাউন্টব্যাটেন আরও বললেন যে জিন্না যদি আলাদা মুসলিম রাষ্ট্রের বাহানা করে দেশভাগের গোঁ ধরেন, তবে তিনিও দরাদরি করে পাঞ্জাব ও বাংলার ভাগ চাইবেন।

জিন্নার মোটেই পছন্দ হলো না যুক্তিটা। তিনি জানেন যে নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্রের কোন আর্থিক সংগতি থাকবে না যদি পাঞ্জাব বা বাংলা পুরোটা না জোটে। পাকিস্তান যদি নিজের ভরণপোষণে অক্ষম হয়, তাহলে 'পোকায় কাটা পাকিস্তান' নিয়ে কি হবে! মাউন্টব্যাটেন কখনই জিন্নার আলাদা রাষ্ট্রের দাবি মানতে চান নি, তাই জিন্নার কথা শুনে বললেন, তেমন যদি মনে হয় তবে তেমন 'কীটদষ্ট' দেশ তাঁর না নেওয়াই উচিত।

www.pathagar.com

মাউন্টব্যাটেনের কথায় বিচলিত বোধ করলেন জিন্না। একেবারে গোড়া ধরেই টেনেছেন সাহেব। তাঁকে বোঝাতে জিন্না বললেন, 'ইওর এক্সেলেন্সি বোধহয় জানেন না যে একজন মানুষ আগে একজন পাঞ্জাবী বা বাঙালী পরে সে হিন্দু বা মুসলমান। ধর্ম যাই-ই হ'ক তার পরিচয়, সে বাঙালী বা পাঞ্জাবী। তার ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, তার অর্থনীতি সবই এক। সেক্ষেত্রে পাঞ্জাব বা বাংলা ভাগ করা মানে পাঞ্জাবী বা বাঙালীদের ভাগ করা। এর ফলে নতুন করে রক্তপাত হবে, দাংগা হবে।'

মাউন্টব্যাটেন মন দিয়ে জিন্নার কথা শুনছিলেন। বললেন, 'আমিও আপনার সংগে একমত মিস্টার জিন্না?'

'আপনিও একমত?'

'নিশ্চয়ই! আপনি হক্ কথা বলেছেন জিন্না সাহেব। এ যুক্তির জবাব নেই। আপনি বললেন, আগে বাঙালী বা পাঞ্জাবী পরে হিন্দু বা মুসলমান। কিন্তু সবার আগে ত সে একজন ভারতীয়। তাই না? ভারতের ঐক্য রক্ষার এমন যুক্তির জন্যে আপনাকে সেলাম মিস্টার জিন্না।'

'কিন্তু আপনি মোটেই বুঝতে চাইছেন না ইওর এক্সেলেন্সি! আমি যা বলতে চাই...'ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার শুরু হয়ে গেল গোলকধাঁধায় ঘুরপাকের খেলা। একই যুক্তির চাপান-উতর।

জিন্না নামক মানুষটার এই আত্মম্ভরি এবং আড়ষ্ট (rigid) মনোভাবে প্রায় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মাউন্টব্যাটেন। একজন শিক্ষিত বুদ্ধিমান মানুষের এ কি জড়তা? পরবর্তীকালে জিন্না সম্বন্ধে এই বিচারই করেছেন মাউন্টব্যাটেন। 'কি করে একজন বিদ্বান, বুদ্ধিমান, লণ্ডনে পড়া আইনজীবী মানুষ এমন একরোখার মতন মনের দরজায় কুলুপ এ'টে থাকতে পারেন, ভাবিনি। উনি যে আমার যুক্তিটা দেখেন নি তা নয়। উনি ঠিকই দেখেছিলেন। তবে চোখের ওপর সার্সী ফেলা ছিল তাঁর। জিন্না একজন দুষ্টবুদ্ধির প্রতিভা (evil genius)। অনেককে যা বোঝানো যায় জিন্নাকে তা বোঝানো যায় না। অন্তত জিন্না বে'চে থাকতে যে কিছুই করা যাবে না এটা আমি বুঝেছিলাম।'

আলোচনার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হলো ১০ এপ্রিল তারিখে। এদেশে মাউন্টব্যাটেনের আসার তিন সপ্তাহের মধ্যেই যেন শেষ বিচার হয়ে গেল এতবড় সমস্যাটার। সেদিন দুঘণ্টা ধরে জিন্নাকে অনেক অনুরোধ উপরোধ করলেন মাউন্টব্যাটেন। অনেক তর্ক, বচসা হলো তাঁদের মধ্যে। কিন্তু সংহতির ছবিটা কিছুতেই ফুটে উঠলো না ওই একগ'ুয়ে মানুষটার মনোমুকুরে। মহান দেশটা সম্বন্ধে অল্প যেটুকু জেনেছেন এই ক'দিনে তারই একটা মহামহিম ছবি আঁকলেন মাউন্টব্যাটেন। কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। যে জিদ জিন্না ধরেছেন সেখান থেকে তিনি সরে এলেন না। সেদিন মাউন্টব্যাটেন বলেছিলেন যে, চল্লিশ কোটি মানুষের এই মহান দেশ তাঁর কাছে যেন এক অন্তহীন মহাদেশ। বহুবিচিত্র জাতি, উপজাতি, মত, বিশ্বাসের এক স্থূলকায় অস্তিত্ব এখানে অবস্থিত যা কিনা একটি কেন্দ্রীয় শাসনের অধীন হয়ে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে অবস্থান করছে। এখানে বিরাজ করছে অফুরান অর্থনৈতিক সম্ভাবনা। এই ঐশ্বর্যই তার প্রাণশক্তি। ক্রমে ক্রমে এই মহাদেশ উত্তীর্ণ হবে সব রকম বন্ধ্যাত্ব থেকে। মুক্তি পাবে এর অবরুদ্ধ বুদ্ধি, এর অনুন্নত শিল্পোদ্যোগ। বহু সহস্রাব্দসঞ্চিত ঘুম থেকে জেগে উঠবে দেশ। সমগ্র

www.pathagar.com

দূরপ্রাচ্যে প্রোথিত হবে এর বিজয়দৃপ্ত নিশান। এক প্রাগ্রসর শক্তিশালী দেশে পরিণত হবে এই মহাভারত। মিস্টার জিন্না নিশ্চয় চাইবেন না এই মহাদেশ দ্বিখণ্ডিত করে তাকে হীনবীর্য করে তুলতে। চাইবেন না তার অফুরান প্রাণৈশ্বর্য নষ্ট করে তাকে তৃতীয় শক্তিতে নামিয়ে আনতে।

কিন্তু এই বৃহদায়তন চিত্রটি জিন্না উপলব্ধি করলেন না। উপলব্ধির ক্ষমতা বা সদিচ্ছা কোনটাই দেখালেন না তিনি। মাউন্টব্যাটেন যে সেদিন ক্ষুন্ন হয়েছিলেন সেটা তাঁর মন্তব্য থেকেই বোঝা যায়। বৈঠক শেষে ক্ষুন্ন মাউন্টব্যাটেন বললেন, 'আমার দুঃখ হচ্ছে যে হতভাগ্য অসুখী মানুষটা পাকিস্তান নামক এক অসম্ভব স্বপ্নের দিকে কেমন বিপদজনক ভাবে ঝুকে আছেন।'

জিন্না চলে গেছেন। কিন্তু মঞ্চ থেকে তাঁর প্রস্থানের পরেও অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন মাউন্টব্যাটেন। এখন তাঁর মনে হচ্ছে জিন্না যা চেয়েছেন সেটুকু দিতেই হবে তাঁকে। কিন্তু যার নির্দেশে তাঁর দিল্লি আসা সেই ব্রিটিশ সরকারের প্রতিও তাঁর একটি কর্তব্য আছে। আগে সেই দায়টাই তাঁকে পালন করতে হবে। একথা ঠিক যে আন্তরিকভাবেই তিনি ভারতের ঐক্য রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইচ্ছাপূরণ করতে গিয়ে দেশ জুড়ে যদি নতুন করে দাঙ্গা বেধে যায়, আর ব্রিটিশ সরকার যদি অসহায়ের মতন সেই ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে, তবে সে দায় তাঁকেই নিতে হবে।

তাই সমাধান একটা চাই-ই এবং যত তাড়াতাড়ি সেটা আনা যায়, ততই মঙ্গল। অবশ্য জোর করে কোন সমাধান তিনি চাপিয়ে দিতেও চান না। কিন্তু প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগ তিনি করবেন। সমস্ত সামরিক বাহিনী তাঁর আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। একটা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্যেই এই বলপ্রয়োগ তাঁকে করতে হতে পারে। তিনি জানেন এর জন্যে তিনি সমালোচিত হবেন। ইতিহাসে তাঁর জায়গা চিহ্নিত হবে একজন প্রবৃত্তি তাড়িত নাবিকরূপে : কোন প্রাজ্ঞ রাজনীতিক হিসেবে তাঁর বিচার করবে না ভাবীকালের মানুষ। তবুও জিন্নার সঙ্গে বৃথা আলোচনায় সময় অপচয় করতে চাইলেন না মাউন্টব্যাটেন। অবশ্য জিন্নার সঙ্গে তিনি ফের বৈঠক করতে পারেন। কিন্তু ফল একটাই হবে। ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ। ভারত নামে দেশটা অনিবার্যভাবে আবার নিরয়গামী হবে।

হ্যাঁ। যা নিরেট সত্য (blunt realism) সেটা তাঁকে মানতেই হবে। তাঁর 'বশ' করার নীতি (অপারেশন সীডকশন) ওই মুসলমান একচ্ছত্র নেতার ওপর কোন প্রভাবই যে ফেলেনি মাউন্টব্যাটেন তা জানেন। ক্রমশ তিনিও বুঝতে পারছেন যে দেশভাগই বোধহয় মুক্তির একমাত্র পথ। এখন তাঁর কাজ নেহরু ও প্যাটেলকে রাজী করানো আর তাঁর সংকল্পিত ছকটার সমর্থন পাওয়া।

পরদিন সকালেই জিন্নার সঙ্গে আলোচনার সারবস্তু অফিসারদের জানিয়ে দিলেন মাউন্টব্যাটেন। সেদিনের বৈঠকে তাঁর চীফ অব স্টাফ লর্ড ইসমেও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের পরে ইসমের দিকে তাকালেন মাউন্টব্যাটেন। তারপর বিষণ্ণ মুখে বললেন, 'তাহলে আর দেরি নয়। দেশভাগের নকশাটিও তৈরি করে ফেলার সময় এসে গেছে।'

* * *

মাউন্টব্যাটেনের সিদ্ধান্তটা অনিবার্যভাবে একজন নিরপেক্ষ পাঠকের কাছে আধুনিক ইতিহাসের একটা দারুণ নাটক বলে মনে হতে পারে। সাড়ে তিনশ' বছর

www.pathagar.com

ধরে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি যে জমাট ঐক্য স্থাপন করেছে, সেই সংহতিরই অংগচ্ছেদন করে দেশটার একটা বিকলাংগ চেহারা দিতে চলেছেন সবাই। এঁদের মধ্যে জিন্নার কৃতিত্বটাই বেশি চোখে পড়ে। কারণ, তাঁর ক্রমবর্ধমান খাঁই মেটাতে স্বতন্ত্র অস্তিত্বসম্পন্ন দুটো আলাদা প্রদেশ পাঞ্জাব ও বাংলাকেও ভাগ করতে রাজী হয়েছে ব্রিটিশ সরকার। এটা জানা কথা যে এর ফলে পরিকল্পিত পাকিস্তানের ভৌগলিক চেহারাটা অস্বাভাবিক হয়ে যাবে। মনে হবে দুমাথা বিশিষ্ট এক শিশু, যা বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে ৯৭০ মাইল লম্বা দুর্লংঘ্য পাহাড় চূড়ায় আর ভারতের সীমানারেখায়। যার এক অংশ থেকে অন্য অংশে পৌঁছুতে ঘুর জলপথে সময় লাগবে বিশ দিন। আর আকাশ পথে এই দূরত্ব অতিক্রম করতে যে চার ইঞ্জিনের এয়ারক্রাফট লাগবে তার পরিবহন ব্যয় এত বেশি যে কোন শিশু রাষ্ট্রের পক্ষে তা হবে এক ব্যয়সাধ্য বিলাসিতা।

এ ত হলো বাইরের দূরত্ব, অর্থাৎ ভৌগোলিক দূরত্ব। কিন্তু পাঞ্জাব ও বাংলার মানুষের মধ্যে যে মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব তা রীতিমত হতবুদ্ধিকর। কোথাও এতটুকু মিল নেই পাঞ্জাবী আর বাঙালীর মধ্যে। না পোশাক-আশাকে, না ভাবনাচিন্তায়, না চেহারা আকৃতিতে। পরম করুণাময় আল্লার কৃপাটুকু ছাড়া দুঅংশের মানুষ বোধহয় একসংগে আর কিছুই ভাগ করে নিতে পারে না। নৃকুলবিদ্যা (ethnology) মতে তারা দুই আলাদা জাতি। যেমন আলাদা ফীনল্যান্ড আর গ্রীসবাসীরা। বাঙালীরা খর্বকায়, তাদের গায়ের রঙ কালো এবং ছটফটে স্বভাবের। জাতিগতভাবে এশিয়ার বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে পাঞ্জাবীদের শিরায় বইছে প্রায় তিন হাজার বছরের ক্ষমতাশীল বিজেতার উদ্ধত রক্ত। তাদের দেহাকৃতিতে সুস্পষ্ট আর্য লক্ষণ যার উন্মেষ হয়েছে মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ অনাকর্ষ পতিত প্রান্তরে। দু দেশের অধিবাসীদের মধ্যে ভাষা, সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত এমন কোন মিলনের বস্তু নেই যা দিয়ে তাদের মধ্যে ভাবের বিনিময় হয়। এমনকি একই ধর্মভুক্ত হলেও পাকিস্তানের পাঞ্জাবী ও বাঙালীদের মধ্যে বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন হয় না কারণ তেমন মিলন প্রচলিত নীতি নির্দেশের বিরোধী।

পাঞ্জাব হলো ভারতের মুকুটমণি, ক্রাউন জুয়েল। আয়তনে ফ্রান্সের অর্ধেক এই ভূখণ্ড ছড়িয়ে আছে উত্তর-পশ্চিমের সিন্ধুনদের পর্যংক থেকে দিল্লির উপকণ্ঠ পর্যন্ত, সমগ্র অঞ্চল উর্বর পলিমাটি সমৃদ্ধ সমতলভূমি। এই ভূখণ্ড উজ্জ্বল হয়ে আছে সমৃদ্ধ কৃষি ফসলে। গম, ভুট্টা, বাজরার ক্ষেতের পাকা সোনারঙের ফসল ছড়িয়ে গেছে দূরবর্তী দিগন্তরেখা পর্যন্ত। রোদের আলোয় ঝলমল করে এর স্রোতস্বিনীগুলি। পাঞ্জাবকে বলা হয় পঞ্চনদের দেশ। যে অঞ্চল দিয়ে এই পাঁচটি নদী প্রবাহিত হয়েছে সেই পাঞ্জাব অঞ্চল যেন উত্তর-পশ্চিম অংশের কঠিন রুক্ষ ভূখণ্ডের মধ্যে একটুকরো শ্যামলিম মরূদ্যান। খরস্রোতা নদীগুলির জলধারায় অভিষিক্ত হয়ে এই সমতলভূমি উর্বরা হয়েছে। পঞ্চনদের প্রধান হলো সিন্ধু যা থেকে নামকরণ হয়েছে এই বিশাল উপমহাদেশের।

পাঁচ হাজার বছরের রণোন্মত্ত ইতিহাসই এ চরিত্র এমন কঠিন করেছে, এর আলাদা সত্তা দিয়েছে। এর সমতলভূমির মাটি কান পেতে শুনেছে মধ্য এশিয়ার যাযাবর লুণ্ঠনকারীদের অশ্বখুরের ধ্বনি। এই পাঞ্জাবেরই কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে হিন্দুদের মহান ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রণীত হয়েছিল। এই যুদ্ধভূমিতে দাঁড়িয়েই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় সখা মহাবীর অর্জুনকে কর্মজ্ঞানের উপদেশ

www.pathagar.com

দিয়েছিলেন। দারিয়ুস, সাইরস এবং মহাবীর আলেকজাণ্ডারের সেনাদলের ছাউনি পড়েছিল এরই সমতলভূখণ্ডে। মৌর্য, শক (Scythians) এবং পহ্লব্ (Parthians) যাযাবররা এই পথে এসেই এখানে অধিকার গেড়ে বসেছিল। পরে হূনদের দ্বারা উৎখাত হয় তারা। এই পথেই এসেছিল এক নতুন ধর্মবিশ্বাস। ইসলাম একেশ্বরবাদ। ইসলাম ধর্মনেতারা যে ধর্মবিশ্বাস এদেশে এনেছিলেন সেই বিশ্বাস তখনই এদেশে লক্ষ লক্ষ বহুদেবোপাসক হিন্দুদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এরপর তিনশ বছর ধরে ভারতবর্ষ মোগলশক্তির অধীন হয়ে থাকে। তখন শক্তিসামর্থ্যে প্রায় শীর্ষদেশে পৌঁছে যায় ভারত। দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে অনুপম মোগলস্থাপত্যের নানা নিদর্শন। অতঃপর শিখ জাতির অধিকারে আসে পাঞ্জাব ভূখণ্ড এবং ইংরেজের হাতে এই অধিকার চলে না যাওয়া পর্যন্ত পাঞ্জাব ছিল শিখেদেরই কর্মভূমি।

মোগলদের স্থাপত্যশৈলীতে যেমন বিচিত্র নকশার অলংকরণ, তেমনি বিচিত্র হলো পাঞ্জাব প্রদেশের চরিত্র। হিন্দু, মুসলমান ও শিখদের এক জটিল নকশা এই পাঞ্জাব। তাই ভেবেচিন্তে এই দেশটাকে ব্যবচ্ছিন্ন করার মানে, সাধারণ অধিবাসীদের দুভাগ করে দেওয়া, যে ক্ষতের কোনদিন মেরামত হবে না। তখন পাঞ্জাবের অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা ছিল এক কোটি পনেরো লক্ষ এবং এক কোটি ষোল লক্ষ। সে তুলনায় শিখেদের সংখ্যা ছিল মাত্র পঞ্চাশ লাখ। সমগ্র পাঞ্জাবের অন্তর্গত ১৭৯৩২টি গ্রাম, শহর ও বাজারে মিলেমিশে এক অভিন্ন অস্তিত্ব নিয়ে তারা বসবাস করতো। ধর্ম ভিন্ন হলেও ভাষা, জাতিগত ঐতিহ্য এবং খানদানের মধ্যে একটা বিশিষ্ট পাঞ্জাবী চেহারা সুস্পষ্ট ছিল। এই বিশিষ্ট পাঞ্জাবী ঘরানার গোপন গর্ব হলো এই মিলিত সত্তাটি। এমনকি তাদের আর্থ-সামাজিক অস্তিত্বর মধ্যেও এই নিবিড় সংহতির লক্ষণগুলো ধরা পড়তো। এখানকার সমৃদ্ধি বা সাফল্যের সবটুকুই ধর্মনিরপেক্ষ পুরুষকার দ্বারা অর্জিত যা ধর্মীয় বিচারে ভাগ করা যায় না। ইংরেজরা উদ্যোগ নিয়ে সারা প্রদেশ জুড়ে অনেকগুলি সেচনালা খনন করে দেয় বটে। কিন্তু পাঞ্জাবের পুরুষরা জাতিধর্ম-নির্বিশেষে তাদের পুরুষশক্তি প্রয়োগ করে অঞ্চলটাকে ঐশ্বর্যশালী করে তোলে। তখন পাঞ্জাবকে বলা হতো 'ভারতের শস্যাগার' (গ্র্যানারী অব ইণ্ডিয়া)। সারা প্রদেশ জুড়ে পূব থেকে পশ্চিমে আড়াআড়ি ভাবে খনন করা সেচনালাগুলোই পোষ্টাই করেছে এখানকার শুকনো পতিত জমি এবং লক্ষ লক্ষ পাঞ্জাবীদের 'দুধভাত' যুগিয়েছে। শুধু আপনাকে অন্নপুষ্ট করে রাখা নয়, অবশিষ্ট ভারতের অন্নপূর্ণা হলো এই পাঞ্জাব। ঠাস বুননের রেলপথ আর সড়কপথ বাহিত হয়ে সারা ভারতবর্ষ 'অন্নপুষ্ট' হয়েছে এখানকার উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যে।

একথা ঠিক যে বিভক্ত পাঞ্জাবের সীমান্তরেখা উত্তর থেকে দক্ষিণ ছাড়া টানা যায় না। এর ফলে নদীনালা বিশিষ্ট পাঞ্জাব অঞ্চলকে লম্বালম্বিভাগ করতে হবে। এইরূপ ভাগ করলে শুধু দেশ নয়, গর্বিত যুদ্ধপ্রিয় শিখজাতিকেও দুখণ্ডে কাটতে হবে। ফলে পার্টিশনের পর অন্তত বিশলক্ষ শিখ অধিবাসী আর তাদের সযত্নে গড়ে তোলা কর্মভূমি এবং অনেকগুলো পবিত্র তীর্থস্থান প্রস্তাবিত মুসলমান রাষ্ট্রের অন্তর্গত করতে বাধ্য হবে।

বস্তুত যে পদ্ধতিতেই সীমানারেখা টানা হ'ক না কেন, যেখান দিয়ে এই সীমানারেখা বিস্তৃত হবে, সেখানকারই লক্ষ লক্ষ মানুষের নাকালের একশেষ হবে। তাদের চোখের জলে ভিজে উঠবে পাঞ্জাবের মাটি। যে দুর্গতি হবে তা থেকে উদ্ধার

www.pathagar.com

পাবার একটাই রাস্তা। তা হলো দুই রাষ্ট্রের মধ্যে লোকবিনিময়। কিন্তু এত বৃহৎ আকারের লোকবিনিময় ইতিহাসে ত আগে কখনও ঘটে নি ! অর্থাৎ লর্ড ইস্‌মের তৈরি করা পার্টিশন প্ল্যান কার্যকর হলে সিন্ধু নদী থেকে দিল্লি পর্যন্ত পাঁচ-শতাধিক মাইল বিস্তৃত ভূখণ্ডে একটাও শহর, গ্রাম, তুলোগাছের বাগান বা ক্ষেতিজমি থাকবে না, যা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

এবার আসুন এই উপমহাদেশের আর একপ্রান্তে, বাংলাদেশে। দেখা যাক, প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গ মানুষের দুর্ভোগের কতটা হেতু হতে পারে। উত্তরে নগাধিরাজ হিমালয়ের ব্যাঘ্রসংকুল তরাই বনভূমি থেকে শুরু করে গংগা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর পদশাখাবাহিত জলধারা যেখানে সাগরগর্ভে মিশেছে, মোহানার সেই তপ্ত ভাটিদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা এক বিস্তৃত অঞ্চল এই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। এই বিস্তৃত ভূখণ্ড, যা কিনা গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডের সম্মিলিত জনসংখ্যার চেয়েও অধিক মানুষের আশ্রয়ভূমি, সেখানে হাজার বছর ধরে পাশাপাশি বাস করছে সাড়ে তিন কোটি মুসলমান এবং তিন কোটি হিন্দু। এই দুই সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস আলাদা হলেও এরা মূলত বাঙালী এবং হয়ত পাঞ্জাবীদের চেয়েও অপেক্ষাকৃত অধিক ভাবে এক আলাদা সত্তাযুক্ত জাতি। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও বাঙালীর জনপদ-সংস্কৃতি অভিন্ন। একই বর্ণগোষ্ঠী থেকে তার উদ্ভব এবং দুই সম্প্রদায়ের মানুষের ভাষা এক। দুই সম্প্রদায়ের মানুষই মাটিতে আসনপীঁড়ি হয়ে বসে এবং একই ঢংয়ে কথা বলতে বলতে হঠাৎ স্বরের উচ্চগ্রামে পৌঁছে যায়। দুই সম্প্রদায়ের মানুষই ধুমধামের সঙ্গে ১লা বৈশাখ দিনটি নববর্ষের দিন হিসেবে পালন করে এবং সব শ্রেণীর বাঙালীর কাছেই পরম গর্বের মানুষ হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাঙালীরা যে সংস্কৃতির ওয়ারিসান তার শিকড় চলে গেছে সুদূর অতীতে সেই খ্রীষ্টপূর্ব কালে, যখন বৌদ্ধ সভ্যতার প্লাবনে ডুবে গিয়েছিল বঙ্গদেশ। কিন্তু খ্রীষ্টিয় প্রথম শতকে তৎকালীন হিন্দু রাজার মনস্তুষ্টির জন্যে বৌদ্ধ ধর্ম-বিশ্বাস ছেড়ে দলে দলে বাঙালীরা হিন্দু হয়ে যায়। কিন্তু পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষ বর্ণহিন্দু উচ্চ-সমাজের হাতে নিগৃহীত হতে হতে অত্যন্ত হেয় হয়ে পড়ে। তখন ইসলাম ধর্মপ্রচারকরা সীমানা পেরিয়ে বঙ্গভূমিতে প্রবেশ করেছে। ফলে নিগ্রহ থেকে মুক্তি পেতে তারা ইসলাম ধর্ম আত্মসাৎ করে। সেই থেকে বাঙালীরা দুই ধর্মাবলম্বী। পূর্বে মুসলমান এবং পশ্চিমে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

১৯০৫ সালে ভারতের বড়লাট বাহাদুর ছিলেন লর্ড কার্জন। একজন দক্ষ প্রশাসক হিসেবেই ইংরেজ মহলে তাঁর নামডাক। প্রশাসনের সুবিধার অজুহাত দিয়ে বাংলা দেশকে দুই ভাগে ভাগ করতে উদ্যোগী হলেন তিনি। আসলে পূর্ব পশ্চিমের এই ধর্মীয় বিভেদটাকে কাজে লাগাতে তিনি এই বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব আনেন। মুখে সে কথা না বললেও বাঙালীকে বলহীন করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ছ'বছর চেষ্টা করেও কার্জন নিষ্ফল হন। বাঙালীর জাতীয়তাবাদ এত নিবিড় হয়ে ওঠে যে সারা বঙ্গভূমি জুড়ে বিদ্রোহ দানা বাঁধে। সেদিন বাঙালীরা প্রমাণ করেছিল যে ধর্মীয় উন্মাদনা নয় জাতীয়তাবাদী আবেগেই তারা আত্মহারা।

পাঞ্জাবকে যদি ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, তবে বাংলা হলো তাঁর অভিশাপদুষ্ট অংশ। পালা করে খরা ও বন্যার দাপাদাপিতে বাংলার মানুষ সারা বছর অসহায় জীবনযাপন করে। দুই অবস্থাই ভয়াবহ এবং বিপদুদ্ধার সম্পূর্ণ দৈবাধীন। প্রায় সারা বাংলাই আর্দ্র জবজবে ভূমিখণ্ডে আদৃত।

www.pathagar.com

আবহাওয়া স্যাঁতস্যাঁতে ও রুগ্ণ। বাংলার দুটো প্রধান ফসল হলো ধান ও পাট। এই নিয়েই বাংলার যত কিছু সমৃদ্ধি। কিন্তু এই সমৃদ্ধিও অনিশ্চিত কারণ ফসলের উৎপাদনও দৈবাধীন। প্রধান এই ফসল দুটির উৎপাদন কিছুটা ধর্ম-নির্ভর। কারণ ধান হলো হিন্দু অধ্যুষিত ,পশ্চিম আর পাট হলো মুসলমান অধ্যুষিত পূর্ববাংলার প্রধান কৃষি ফসল।

তবে এই প্রধান ফসল দুটির ওপরেই বাংলার অর্থনৈতিক অস্তিত্ব নির্ভর করে নেই। বাংলার অস্তিত্ব টিকে আছে একটা শহরের ওঠানামার ওপর, ইংরেজরা যে শহরটাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সেকেন্ড সিটি বলতো এবং যেখান থেকে শুরু হয়েছিল ব্রিটিশরাজের ঔপনিবেশিক অভিযান। যে শহরটা একদিন ছিল এশিয়ার প্রথম বন্দর এবং ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে যে শহরটা হয়ে উঠেছিল নির্বিচার গণহত্যার লীলাভূমি। এই গুরুত্বপূর্ণ শহরটার নাম কলকাতা যা কি না সারা বাংলার প্রাণকেন্দ্র।

বাংলার সব ধনসম্পদ, সব আন্দোলন, তার ঘরবাড়ি, গাড়িঘোড়া, তার সড়ক-পথ, রেলপথ, মায় তার শিল্প, কাঁচামাল সবই যেন ফুন্দেল দিয়ে কলকাতার উদরে এসে জমা হচ্ছে। তাই বাংলাকে যদি পূর্ব ও পশ্চিমে ভাগ করা হয়, তবে ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী কলকাতা হবে পশ্চিম বাংলার সম্পদ। ব্যাপারটা অবশ্যই পূর্ব বাংলার মুসলমানদের কাছে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির সামিল (য়্যাস্ফিক্সিয়া)। অর্থাৎ মৃত্যুর পরোয়ানা পাওয়া একটা চরম অবস্থার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়া। কারণ এই শহরের বুকের মধ্যেই লুকানো আছে বাংলার দুই অংশের জীয়নকাঠি। যদি পৃথিবীর সমস্ত কাঁচা পাটের একমাত্র উৎপাদক হয় বাংলার পূর্ব ভাগ তবে কাঁচা পাট থেকে থলি বা দড়ি তৈরির পাটকলগুলো রয়েছে কলকাতার আশেপাশে, পশ্চিমবঙ্গে। যদি মুসলমান অধ্যুষিত পূর্ব বাংলা পাট বোনে তবে বাঙালীর প্রধান খাদ্য চাল তৈরি হয় হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গে।

১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে বাংলার শেষ গভর্নর এবং রেলকর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রাক্তন নেতা ও সেনাবাহিনীর সার্জেন্ট স্যার ফ্রেড্রিক বারোজ একটা দারুণ ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। বারোজ সাহেব বলেছিলেন যদি কখনও ভারতভাগ হয় তবে বিচ্ছিন্ন পূর্ববাংলা, যার নিয়তি হলো পৃথক বাংলাদেশ রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া, 'হয়ে উঠবে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় চাষাড়ে বস্তি (রুর‍্যাল স্লাম্)।'

প্রথমদিকে যে অজুহাত দেখিয়ে পাকিস্তান নামক আলাদা রাষ্ট্র তৈরির কথা জিন্না বলেছিলেন, সেই অজুহাত যে কতটা যুক্তিহীন তার প্রমাণ ভারতভাগের পরবর্তী অবস্থা। দেখা গেল যে ভারতভাগের পরেও অখন্ড ভারতের প্রায় অর্ধেকের বেশি মুসলমানকে হিন্দু গরিষ্ঠতার অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করে থাকতে হচ্ছে। এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে এমনভাবে মুসলমানরা ছড়িয়ে আছে যে তাদের আলাদা করাই এক অসম্ভব ব্যাপার। ফল এই হল যে দুদেশের মধ্যে সংঘাতের পরিপার্শ্ব তৈরি হলে এই ভারতীয় মুসলমানদেরই সংঘাতের প্রথম বলি হতে হবে। তখন পাকিস্তান নামক মুসলিম রাষ্ট্রের জামিন হয়ে থাকতে হবে তাদের। বস্তুত, অঙ্গচ্ছেদ হলেও ভারতের হিন্দুদের হাততোলার ওপর নির্ভর করে থাকতে হচ্ছে প্রায় পাঁচকোটি মুসলমানকে। সংখ্যাটা যথেষ্টই বিপুল। কারণ, ইন্দোনেশিয়া এবং নবতম পাকিস্তানের পর এদের নিয়েই অনায়াসে তিন নম্বর মুসলিম রাষ্ট্র

www.pathagar.com

তৈরি করা সম্ভব।

*　　*　　*

সেদিন অর্থাৎ ১৯৪৭এর এপ্রিল মাসে লুই মাউন্টব্যাটেন, জওহরলাল নেহরু কিংবা মহাত্মা গান্ধী যদি ঘুণাক্ষরেও একটা গোপন তথ্য টের পেতেন তবে হয়ত ভারতভাগের মতন অশুভ ঘটনাটা এড়ানো যেত। সেই তথ্যটা নাকি গোপন রাখা হয়েছিল একটা ধূসর রঙের ছবির প্লেটের গায়ে। প্লেটের গায়ে যেটা লুকানো ছিল সেদিন তা জানাজানি হলে এই মূল্যবান বস্তুটা নিশ্চয়ই ভারতের বিপর্যস্ত রাজনৈতিক ভারসাম্য অনেকখানি স্বাভাবিক করে দিতে পারতো। এবং অনুমান করা যায় যে, এশিয়ার রাজনীতির ধারা বদলেও যেত সেক্ষেত্রে। কিন্তু আশ্চর্য! এমন মূল্যবান গুপ্ত খবরটা ব্রিটিশ সি.আই.ডি.র মতন দুঁদে গোয়েন্দা বিভাগের নজরও এড়িয়ে গিয়েছিল সেদিন।

অত্যন্ত নিরীহ একটা ছবির প্লেট নিয়েই ব্যাপারটা। প্লেটের ঠিক মধ্যিখানে পিংপং বলের মতন দুটো কালো গোল দাগ। গোল দাগের চারপাশে যেন চাঁদের আড়ালে গ্রহণ লাগা সূর্যের আলোকচ্ছটা। বৃত্ত দুটোর ওপরে অসংখ্য ছোট ছোট সাদা দাগ ধূসর রঙের প্লেটের সারা গায়ে ছড়িয়ে আছে। একটা এক্স-রে ছবির প্লেট ওটা। একজন মানুষের একজোড়া ফুসফুসের ছবি। কালো বৃত্তদুটো ফুসফুসের গহ্বর যার ভাইট্যাল টিস্যুগুলো মরা। আর ছোট ছোট মালা নির্দেশ করছে কতটা জায়গা জুড়ে ফুসফুসের টিস্যুগুলো মরে শক্ত হয়ে গেছে। এগুলোই প্রমাণ করে যে, মানুষটার দুটো ফুসফুসই ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়েছে এবং যতটুকু ক্ষতি হবার তা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। অর্থাৎ আক্রান্তকারীর পরমায়ু বড় জোর দু বা তিন বছর।

এক্স-রে প্লেটটা রাখা আছে একটা মুখবন্ধ সাদা খামের মধ্যে। রেখেছেন বোম্বাই শহরের নামকরা চিকিৎসক ডাক্তার জে.আর. পটেল। মুখআঁটা খামটা তিনি যত্ন করে দেরাজের মধ্যে রেখেছেন যাতে সহজে লোকের নজরে না পড়ে। যাঁর বুকের ছবি ওটা তাঁকে সবাই চেনেন। এঁরই অদম্য জিদের জন্যে ভারতকে অখণ্ড রাখার সব চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে মাউন্টব্যাটেনের। এতকাল এই কাণ্ডজ্ঞানহীন এক-রোখা মানুষটাই নিরেট পাথরের মতন মাউন্টব্যাটেনের সংকল্পের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু বিধির বিধান কি জটিল! মানুষটা জানতেও পারেন নি যে জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে একটা পলকা সুতোয় ঝুলছেন তিনি। হ্যাঁ, অন্য কেউ নন উনি; স্বয়ং মহম্মদ আলি জিন্না।

ডাক্তার পটেল ওঁর এই এক্স-রে ছবিটা তোলেন ১৯৪৬এর জুন মাসে। অর্থাৎ এ দেশের মাটিতে মাউন্টব্যাটেনের পা দেবার ঠিক ন'মাস আগে। প্লেটটা দেখেই তিনি সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন কত তাড়াতাড়ি উনি অনিবার্য মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন। এ সেই ভয়ঙ্কর যক্ষ্মাব্যাধি যার নির্দয় আক্রমণে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ নিরন্ন অপুষ্ট দরিদ্র ভারতবাসী চোখের ওপর নিত্য মরছে। কিন্তু পাকিস্তানের পয়গম্বর সত্তর বছরের বৃদ্ধ জিন্না কেমন করে এই কালব্যাধির শিকার হলেন?

সারাটা জীবনেই শ্বাসকষ্ট পেয়েছেন জিন্না। আর এর জন্যেই তাঁর স্বাস্থ্য এত ক্ষীণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বেশ কিছু আগে বার্লিনে গিয়ে একবার প্লুরিসির চিকিৎসা করিয়েছিলেন। সেই থেকে ব্রংকাইটিস রোগে নিয়মিত কষ্ট পেয়েছেন। তখন থেকেই তাঁর শরীর ভেঙে যায় এবং নিয়মিত হাঁপানিতে ভুগতে থাকেন।

www.pathagar.com

তখন তাঁর এমন অবস্থা যে কোন বড়সড় বক্তৃতা দেবার পর বেশ কয়েক ঘণ্টা তাঁকে হাঁপাতে হতো।

১৯৪৬এর মে মাসের শেষের দিকে সিমলায় থাকাকালীন তাঁর দারুণ শ্বাসকষ্ট শুরু হলো। সঙ্গিনী বলতে ভগিনী ফতিমা। তিনি কালবিলম্ব না করে জিন্নাকে বোম্বাইগামী একটা ট্রেনে তুললেন। কিন্তু মাঝপথে অমন দুর্ধর্ষ মুসলিম লীগ নেতা রোগের চাপে কাহিল হয়ে পড়লেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা এমন খারাপ হয়ে উঠলো যে নিরুপায় ফতিমা ট্রেন থেকেই ডাক্তার পটেলের কাছে জরুরী বার্তা পাঠালেন। ডাক্তার পটেল বোম্বাই শহরের বাইরে গিয়ে ট্রেনে উঠে রোগীকে পরীক্ষা করলেন। তিনি বুঝলেন রোগীর 'অবস্থা সঙ্গিন'। এখন তখন অবস্থা তাঁর। ডাক্তার পটেল বুঝতে পারলেন যে, রোগীকে কোনমতেই বোম্বাই সেন্ট্রাল স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না। জিন্নার স্তাবক ভক্তেরা তাঁর জন্যে যে বিরাট অভ্যর্থনার আয়োজন করেছে তার ধাক্কায় পড়লে রোগীর প্রাণসংশয় হয়ে উঠবে। অতএব জিন্না এবং ফতিমাকে শহরতলির একটা স্টেশনে নামিয়ে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিলেন ডাক্তার পটেল। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার সময় ডাক্তার পটেল প্রথম জানতে পারেন রোগের আসল বৃত্তান্ত। তবে তিনি ছাড়া জিন্নার এই রোগের বৃত্তান্ত পৃথিবীর আর কোন মানুষ জানতে পারে নি সেদিন। ভবিষ্যতেও এই গোপনতা যথারীতি সুরক্ষিত রাখা হয়েছিল।

জিন্না যদি সাধারণ যক্ষ্মা রোগী হতেন তবে সাধারণ ভাবে সারাটা জীবনই তাঁকে স্যানাটোরিয়ামে চিকিৎসাধীন থাকতে হতো। কিন্তু জিন্না ত স্বাভাবিক রোগী নন! তাই হাসপাতালে কিছুদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর রোগের জ্বালা কিছুটা কমলে ডাক্তার পটেল তাঁকে নিজের চেম্বারে নিয়ে এলেন। তখনই এই মারাত্মক কালব্যাধির অনুপূর্ব বৃত্তান্ত জানালেন জিন্নাকে। ডাক্তার তাঁকে সতর্ক করে বললেন যে শারীরিক সঙ্গতির আর কিছুই অবশিষ্ট নেই জিন্নার। মৃত্যু থাবা গেড়ে বসেছে তাঁর শিয়রে। সুতরাং জিন্না যদি কাজের ভার লাঘব না করেন, যদি যথেষ্ট বিশ্রাম না নেন এবং অত্যধিক মদ্যপান ও ধূমপান বন্ধ না করেন, তবে দু-এক বছরের বেশি তিনি বাঁচবেন না।

সেদিন নাকি ডাক্তারের নির্মম কথাগুলো খুবই নির্লিপ্তভাবে শুনেছিলেন জিন্না। মুখ দেখে বোঝবার জো নেই মনের ভাব। কারণ মুখের ভাবে একটুও ছায়া পড়ে নি ভয়ের। বরং ডাক্তারের দিকে চেয়ে যা তিনি বললেন তা শুনে প্রায় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ডাক্তার পটেল। সেদিন জিন্না যা বলেছিলেন তার মর্মার্থ হলো যে স্যান্যাটোরিয়মের একটা বেডের জন্যে জীবনের সংকল্প থেকে সরে আসার কোন প্রশ্নই ওঠে না। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। এর জন্যে কবরে যেতেও তিনি প্রস্তুত। কিন্তু লক্ষ লক্ষ ভারতীয় মুসলমানের মুক্তির জন্যে যে 'জবান' তিনি দিয়েছেন, তাঁকে তা পালন করতেই হবে। ইতিহাসের এক মহা সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। ভারতীয় মুসলমানদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে তাঁর আন্দোলনের ওপর। তবে ডাক্তারের উপদেশও তিনি শুনবেন। ততটুকুই মানবেন যতটুকু তাঁর মহান কর্তব্যের পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। জিন্না আরও বললেন যে ভারতের হিন্দু নেতারা যদি এই মুহূর্তে তাঁর মুমূর্ষু অবস্থার কথা জানতে পারেন, তবে তাঁরা রাজনৈতিক লক্ষ্য বদলে দেবে। এমনকি সমস্ত আন্দোলনটা তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত পিছিয়েও দিতে পারেন তাঁরা। কারণ, তাঁরা জানেন যে জিন্নার 'মৌৎ' হবার পর মুসলিম লীগ

www.pathagar.com

দলের পরের ধাপের নরম নেতাদের বশে আনা তাঁদের পক্ষে অনেক সহজ।*

দুসপ্তাহ অন্তর একটা করে ইঞ্জেকশন দিয়ে জিন্নাকে প্রায় খাড়া করে তুললেন ডাক্তার পটেল। এই ইঞ্জেকশন দেবার ঘটনাটা খুবই গোপন রাখা হয়েছিল সেদিন। কাকপক্ষীতেও জানাজানি হয় নি। তবে আবার কাজের মধ্যে ফিরে গিয়ে ডাক্তারের কোন পরামর্শই গ্রাহ্য করেন নি জিন্না। ডাক্তারকে তোয়াক্কা না করে নিজের খেয়াল-খুশিতে চলতে লাগলেন জিন্না। তাঁর ধারণা, 'মরণরে তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান' বলে ব্যাকুল হলে নিজেকেই ঠকাতে হবে। তখন ইতিহাসের পাতায় পরিচয়টা স্থায়ী করে রাখার চেষ্টা বিফল হয়ে যাবে। জীবনের পরম মুহূর্ত বার বার আসে না। সুতরাং বিলম্ব করে সেই পরম মুহূর্তটা বিড়ম্বিত করতে চান নি জিন্না। অসাধারণ দুঃসাহস আর তীব্র উৎসাহে তাঁর জীবনপ্রদীপের শিখাটি উস্‌কে দিয়ে শেষ বারের মতন উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন তিনি। লক্ষ্যের দিকে পৌঁছতে আকুল হয়ে গিয়েছিলেন। মনে পড়ে যায় মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের সময়ের কথাটা। জিন্না বলেছিলেন এখন দরকার 'স্পিড।' কালক্ষেপ না করে অনেক সত্বর পথ চলতে হবে। সেটাই হবে 'চুক্তির আসল উদ্দেশ্য।' মনে হয়, বোধহয় ভবিতব্যেও সঙ্গেও এইরকম একটা চুক্তিপত্রই স্বাক্ষর করেছিলেন জিন্না।

*

ডিম্বাকৃতি একটা বড়সড় টেবিলের চারপাশে এগার জন মানুষ গম্ভীর মুখে বসে আছেন বড়লাটভবনের কন্‌ফারেন্স ঘরে। চেহারা আর মুখের ভাবগতিক দেখলেই বোঝা যায় এঁরা সবাই কেউকেটা। কখন মাউন্টব্যাটেন এসে আলোচনা শুরু করবেন তারই অপেক্ষায় বসে আছেন সবাই। একদিক দিয়ে বলতে গেলে এঁরা সবাই হলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সেই চব্বিশজন আদিপুরুষ প্রতিষ্ঠাতার উত্তরাধিকারী। সে প্রায় সাড়ে তিনশ' বছর আগেকার কথা। সেদিন এঁদেরই আদিপুরুষদের বাণিজ্য ক্ষুধা মেটাতে ইংরেজকে হাজার হাজার মাইল জলপথ পেরিয়ে ভারতে এসে সাম্রাজ্য গড়ার স্বপ্ন দেখতে হয়েছিল। লোভ লালসা দিয়ে

---

* মাউন্টব্যাটেনের পূর্ববর্তী বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ১০ই জানুয়ারি আর ২৮শে ফেব্রুয়ারি (১৯৪৭) তারিখের ডাইরির পাতায় জিন্না সম্বন্ধে লেখেন 'হি ওয়াজ অফ সিকম্যান' অর্থাৎ জিন্না অসুস্থ। কিন্তু তিনি কতটা অসুস্থ তার কোন উল্লেখ ডাইরিতে নেই। লর্ড ওয়াভেলই তা জানতেন না। এমনকি মাউন্টব্যাটেনকে তখন এই উপ-মহাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানাচ্ছেন, তখনও লর্ড ওয়াভেল এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটার কোন ইঙ্গিত দেন নি। মাউন্টব্যাটেন যদি ঘুর্ণাক্ষরেও টের পেতেন যে জিন্না মরণাপন্ন, তবে ভারতে তাঁর নিজের কাজকর্মের গতিবিধির ওপর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতো এই ঘটনাটা। জিন্নার মৃত্যুর প্রায় পঁচিশ বছর পরে মাউন্টব্যাটেন নিজেই একথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু কিছু ইঙ্গিতপূর্ণ জনরব থেকে অনুমান হয় যে হয়ত জিন্নার মৃত্যুর ছ'মাস আগে লিয়াকত আলি খান ব্যাপারটা প্রথম জানতে পারেন! ১৯৭৩-এর ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই শহরে জিন্নার মেয়ে ওয়াদিয়ার সাক্ষাৎকার নেন এই গ্রন্থের লেখকদ্বয়। ওয়াদিয়া তাঁদের বলেন যে পিতা 'মৌৎ' হবার পরে তিনি জানতে পারেন যে তাঁর যক্ষ্মা হয়েছিল। ওয়াদিয়ার ধারণা যে তাঁর বাবা সমস্ত ঘটনাই ফতিমাকে বলে দেন। তবে একথাও ঠিক যে জিন্নার হুকুমেই ঘটনাটা গোপন রেখেছিলেন ফতিমা।

www.pathagar.com

গড়া অতবড় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এগারোটা খুঁটি হলো এই এগার জন মানুষ। এঁরা হলেন গুরুত্বপূর্ণ এগারটা প্রদেশের গভর্নর বা ভাগ্যবিধাতা। যোগ্যতা আর সাফল্য এঁদের পৌঁছে দিয়েছে এই শীর্ষদেশে। আর মাত্র একটি ধাপ। সেটি অতিক্রম করতে পারলেই পৌঁছে যাবে সেই সর্বোচ্চ পদে যার স্বাদগন্ধ চোখ বুজলেই নাকে এসে লাগে। এর জন্যে কত ব্যাকুলতা সেই যুবক বয়স থেকে। হাসিমুখে কত দুর্গম 'পোস্টিং'এর যন্ত্রণা সইতে হয়েছে এঁদের। পায়ে পায়ে সেই কাঁটাভরা দুর্গম পথ পেরিয়ে আজ তাঁরা যেখানে এসে পৌঁছেছেন, সেখান থেকে আর মাত্র একটা ধাপ। তাহলেই চরম প্রাপ্তি। অবশ্য আজকের আলোচনা সভার সবাই ইংরেজ নয়। দুজন ভারতীয়ও আছেন এই এগারজনের দলে।

এঁরা সবাই যোগ্য প্রশাসক এবং সাম্রাজ্যবাদীর স্বার্থে নিবেদিতপ্রাণ। ভারতে এসে সারাটা চাকরি জীবনে যতটুকু অধিকার এঁরা অর্জন করেছেন তার সবই ভারতের সেবায় ঢেলে দিয়েছেন। বিনিময়ে ভারতও ঢের দিয়েছে। প্রাসাদের মতন ভবনে রাজার হালে থাকেন এঁরা। এঁদের হুকুমের তাঁবে থাকে অসংখ্য চাকর, খানসামা, বেয়ারা, বাবুর্চির দল। এঁরা যে অঞ্চলের ভাগ্যবিধাতা তার অধিকারের সীমানা বহুবিস্তৃত। কখনো তা ইওরোপের একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের চেয়েও বহরে বড় এবং লোকসংখ্যার হিসেবে দ্বিগুণ। এই সব গভর্নররা যখন নিজস্ব রাজ্য পরিদর্শনে যান, তখন সারা অঞ্চলে মহা হৈচৈ বেধে যায়। সুখ আমাদের প্রতিযোগিতায় যেটি শ্রেষ্ঠ সেটিই তাঁদের কপালে জোটে। আলাদা রেলগাড়ি, রোল্স্-রয়েস্ মোটরগাড়ি ইত্যাদি।

টেবিলের চারপাশে যে ক্রম অনুসারে এঁরা বসেছেন তা এইরকম। পাশাপাশি বসেছেন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেসিডেন্সির গভর্নররা। এই প্রধান তিন প্রেসিডেন্সি হলো বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বেংগল প্রেসিডেন্সি। এঁদের পরে বসেছেন প্রদেশের গভর্নররা। প্রথমে পাঞ্জাব, তারপর বসেছেন করাচি বন্দর সহ সিন্ধুপ্রদেশের গভর্নর। এরপর বসেছেন ইউ পি, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশের গভর্নরগণ। সব শেষে বসেছেন সেন্ট্রাল প্রভিন্স ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর। এঁর হাতেই রয়েছে ভারতের সীমান্তরক্ষার ভার। আফগান সীমান্ত ও খাইবার গিরিপথ রক্ষণাবেক্ষণ করেন এই মানুষটিই।

বলাবাহুল্য, এইসব যোগ্য প্রশাসকদের সামনে বসে আলোচনা করতে মাউন্টব্যাটেনের একটু যেন অস্বস্তি হচ্ছে। কারণটা স্বাভাবিক। একে বয়স অল্প, মাত্র ছেচল্লিশ বছর বয়স তখন তাঁর. তায় যোগ্যতা বিচারেও এঁদের কারও সমকক্ষ তিনি নন। তাঁর না আছে দারুণ ঝলমলে সাংসদবক্তার যোগ্যতা না কোন প্রশাসনিক বাহাদুরি। ঝোলা থেকে খুলে দেখাবার মতন কোন বিস্ময়ই তিনি বিলেত থেকে বয়ে আনেন নি। বরং এ দেশে তিনি সম্পূর্ণ নবাগত। ভারত সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ওই এগারজন গভর্নরের তুলনায় অনেক নিরেস। দীর্ঘদিন বাস করার দরুন দেশটাকে এঁরা আষ্টেপৃষ্ঠে চেনেন। শুধু কাজ করাই নয় এখানকার জটিল ইতিহাসের গতিপ্রকৃতিও এঁদের নখদর্পণে। এঁরা এখানকার স্থানীয় মানুষদের চেনেন। তাদের সংগে মিশেছেন তাদের ভাষায় কথা বলেছেন। এক এক ক্ষেত্রে কেউ কেউ বা বিশেষজ্ঞ বনে গেছেন। সুতরাং একজন সম্পূর্ণ আনাড়ী মানুষ, নতুন শিক্ষার্থীর মতন যদি কোন প্রস্তাব দেয় তবে সেটা যাচাই করার অধিকার এঁদের আছে বৈকি।

www.pathagar.com

তবুও মাউন্টব্যাটেনের ধারণা যে তাঁর এই অনভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে খুব বড় একটা বিঘ্ন নয়। বহুদর্শিতা থাকা সত্ত্বেও এঁরা তো কোন সমাধানই খুঁজে পায় নি এতদিন! আসল বাধা হলো সংস্কার। যতক্ষণ গায়ে ব্রিটিশ উপনিবেশিক নামাবলী-খানা জড়ানো আছে, ততক্ষণ কিছুতেই নিরপেক্ষ সমাধান পাওয়া যাবে না। এঁদেরও সেই গতিক। 'এঁরা সমাধান খুঁজেছেন ব্রিটিশ রাজের মেজাজটা বজায় রেখে। যে আদত চলছে সেটা কিছুতেই ভাঙতে চান নি পাছে তাঁদের নিরাপদ অস্তিত্ব বিপন্ন হয়।' তাই সোনার পাথরবাটিও খুঁজে পাওয়া যায় নি এতকাল। যাই হ'ক, মাউন্টব্যাটেন মনস্থ করলেন যে আলোচনা শুরুর আগে এঁদের প্রত্যেককে আলাদাভাবে নিজের প্রদেশের রাজনৈতিক অবস্থার কথা বর্ণনা করতে বলবেন। তাই-ই করা হলো। এগারজনের মধ্যে আটজন গভর্নরই রাজনৈতিক অস্থিরতার যে ছবিটি দিলেন তা রীতিমত ভয়াবহ। তবে এ আশ্বাসও দিলেন যে অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় নি। শুধু পাঞ্জাব, বাংলা আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গভর্নরদের দেওয়া ছবিটাই সবাইকে চিন্তিত করে দিল।

এই তিনটি উপদ্রুত প্রদেশের মধ্যে সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর স্যার ওলাফ্ ক্যারো সারবেরাসকে প্রথম ভাষণ দিতে অনুরোধ করা হলো। টানটান চেহারার মানুষটির মুখ চোখ ক্লান্তিতে বসে গেছে। তিরিশটা শতাব্দী ধরে যে গিরিপথ দিয়ে বিদেশী লুঠেরারা এখানে এসেছে, তারই প্রবেশমুখ পাহারা দিচ্ছেন স্যার ওলাফ্ ক্যারো। প্রায়ই রাত জাগতে হচ্ছে তাঁকে, কারণ প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন হাঙ্গামার খবর আসছে তাঁর কাছে! ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের এই প্রান্তিক অংশে প্রায় সারাটা জীবন কেটেছে এই দক্ষ প্রশাসকের। পাঠান উপজাতির সংস্কৃতি ও ভাষা সম্বন্ধে এমন নিবিড় জ্ঞান আর কোন পাশ্চাত্যবাসীর নেই। দীর্ঘদিন শাসকপদে থাকার দরুন এই সীমান্ত প্রদেশকে মনের মতন গড়েছেন স্যার ওলাফ্। এর রাজধানী শহর পেশোয়ারের বিপনিকেন্দ্রটা পৃথিবীর অন্যতম সেরা ঝলমলে বাজার। সপ্তাহে একদিন কাবুল থেকে আফগান বণিকরা উটের পিঠে পণ্য নিয়ে খাইবার গিরিপথ পেরিয়ে পেশোয়ারের হাটে বিপণন করতে আসে। দুর্মূল্য পশুচর্ম, শুকনো ফল, মেওয়া, পশম, মৃৎপাত্র, ঘড়ি শর্করা আরও কত কি সঙ্গে আনে তারা। এই পর্বতসঙ্কুল সীমান্ত প্রদেশের গোপন গুহাগহ্বরগুলো চোরাই পথে আমদানি করা নানারকম মারণাস্ত্রে ভরাই থাকে এবং দুর্ধর্ষ বিদ্রোহী মাসুদি, আফ্রিদি প্রভৃতি পাঠান উপজাতিদের হাতে চলে যায়।

স্যার ওলাফ্ সতর্ক করে বললেন যে সারা সীমান্ত প্রদেশ এখন ভাঙনের মুখে। তাঁর আশংকা যে, এবার হয়ত ব্রিটিশরাজের সেই ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন ফলে যাবে। অর্থাৎ এই অঞ্চলের আক্রমণকারী উপজাতিরা সীমান্তের দোর ভেঙে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়বে ভারতের মূল ভূখণ্ডে। ইতিমধ্যেই আফগানিস্তানের পাঠান উপজাতিরা খাইবার গিরিপথ দিয়ে পেশোয়ারে ঢুকে পড়ার হুমকি দিয়েছে। প্রায় একশ' বছর ধরে সিন্ধুনদ অঞ্চলে নিজস্ব বাস্তুভূমির দাবি জিইয়ে রেখেছে তারা। সুতরাং ব্রিটিশরাজ যদি এখনও যথেষ্ট 'সতর্ক' না হয়, তবে এক দুরূহ 'আন্ত-র্জাতিক সংকটের' আবর্তে পড়ে যাবে ব্রিটিশরাজ।

স্যার ওলাফ্ ক্যারোর পরের বক্তা হলেন পাঞ্জাবের গভর্নর স্যার ইভান্ জেন্‌কিন্‌স্। স্বল্পবাক এই মানুষটি তাঁর অঞ্চলের যে ছবি উপহার দিলেন তা যেন আরও ভয়ঙ্কর। ওয়েল্‌স্‌বাসী জেন্‌কিন্‌স্‌ও পাঞ্জাবের সমৃদ্ধির জন্য

www.pathagar.com

নিজেকে সঁপে দিয়েছেন ঠিক ক্যারোর মতন। সবাই আড়ালে বলে যে পাঞ্জাব যেন তাঁর বিয়ে করা বউ। বোধহয় সত্যি বিয়ে হলো না বলেই এই বাড়াবাড়ি। পাঞ্জাব ছাড়া অন্য প্রদেশের কথা চিন্তাও করেন না জেনকিন্‌স্‌। পাঞ্জাবের কথা বর্ণনা করার সময় জেনকিন্‌স্‌ প্রথমেই বললেন যে ভারতের জন্যে যে সমাধানের কথাই ভাবা হ'ক না কেন, পাঞ্জাবে আগুন জ্বলবেই। আর পাঞ্জাব ভাগ করলে অন্তত চার ডিভিসন সেনা লাগবে শান্তি বজায় রাখতে। তা যদি না হয় তাহলেও প্রতিক্রিয়া হবে। শিখদের আলাদা অঞ্চলের দাবি মেটাবার চাপ আসবে। জেন্‌কিন্‌স্‌ শেষ যে কথাটা বললেন তা খুবই অর্থবহ। তিনি বললেন, 'যারা মনে করে যে পার্টিশনের পরে পাঞ্জাবে আগুন জ্বলবে তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। পাঞ্জাব এখনই অগ্নিগর্ভ হয়ে আছে।' জেন্‌কিন্‌সের ধারণা যে আগুন পাহাড়ের চূড়ায় বসে আছেন সবাই।

পরবর্তী বক্তা হলেন বাংলার গভর্নর স্যার ফ্রেডরিক বারোজ। কিন্তু অসুস্থ থাকায় কলকাতা থেকে আসতে পারেন নি তিনি। তাঁর প্রতিবেদনটি নিয়ে এসেছেন একজন সহকারী। প্রায় একই রকম অস্থিরতার চিত্র এঁকেছেন বারোজ সাহেবও।

একে একে সবগুলি প্রতিবেদন পেশ হবার পর মাউন্টব্যাটেনের একজন খাস কর্মচারী সকলের হাতে হাতে এক প্রস্থ টাইপ করা কাগজ বিলি করলেন। মাউন্ট-ব্যাটেন ঘোষণা করলেন যে সম্ভাব্য পার্টিশন প্রস্তাবটার দফাওয়ারি আলোচনা আছে ওই কাগজের স্তূপের মধ্যে। সকলের বোঝার সুবিধার জন্যে এর নামকরণ হয়েছে 'বলকান প্ল্যান।' লর্ড ইস্‌মের তৈরি এটাই প্রথম পার্টিশন প্ল্যান। সাতদিন আগে তিনি এরই খসড়া করতে বলেছিলেন চীফ্‌ অব স্টাফ্‌ লর্ড ইস্‌মেকে।

খসড়া প্রস্তাবের পাতা ওল্টাতে লাগলেন গভর্নরেরা। প্রতিটি পাতায় ছড়িয়ে আছে টুকরো টুকরো নানা বিস্ময়। অসতর্ক মন যেন স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছে সেগুলো চাক্ষুষ করে। এতকাল ধরে ঐক্যবন্ধতার যে মহান দায় তাঁরা কাঁধে নিয়ে বেড়িয়ে-ছেন, এই হাতেধরা কাগজগুলোর মধ্যে যেন তারই ভগ্নদশা। এতবড় ইমারতটা ভূমিসাৎ করার কি সুন্দর পরিকল্পনা! বিসর্জনের বাজনা বাজিয়ে দিয়েছেন ইস্‌মে। ব্রিটেন চলে যাবে ঠিকই। তবে কি সব ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিল সে? কেমন যেন হতবাক হয়ে গেলেন গভর্নররা।

'বলকান প্ল্যান' নামকরণটা বড় সার্থক হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মধ্য ইওরোপের বিরোধী রাষ্ট্রগুলো যেমন আলাদা হয়েছিল সেইরকম পৃথগন্নের প্রস্তাব করেছেন ইস্‌মে। নিরাপত্তার স্বার্থেই ভারতকে এক গৃহস্থালি রাখা যাবে না আর। তাই এগারটা প্রদেশের কর্ণধারদের বেছে নিতে হবে পাকিস্তান বা ভারত কোন পরিবারভুক্ত হবেন তাঁরা। অথবা হিন্দু-মুসলমানের বেশিরভাগ মানুষ যদি চায় তবে কোন তরফে যোগ না দিয়ে স্বতন্ত্রও থাকতে পারে। অবশ্য ঐক্যবন্ধ ভারতের স্বপ্ন তখনও জলাঞ্জলি দেন নি মাউন্টব্যাটেন। তিনি বললেন যে এ ব্যাপারে ব্রিটেনের চেষ্টার কথাটা সারা পৃথিবীকে জানাতে হবে। সেই সঙ্গে এও প্রচার করতে হবে যে ব্রিটেন যদি ব্যর্থ হয় সে দায় তার নয়। বিশ্বকে বলতে হবে যে 'পার্টিশন বেছে নেওয়া হয়েছে হটকারী সরকারী সিদ্ধান্তে নয়. এটা ভারতের জনগণের অভিমত।' সব শেষে পাকিস্তান সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব ধারণার কথাও বললেন মাউন্টব্যাটেন। অত ক্ষীণ জীবনীশক্তি নিয়ে আগামী ভবিষ্যতে পাকিস্তানের টিঁকে থাকাটা যথেষ্ট সন্দেহপূর্ণ। সুতরাং স্বখাত সলিলেই তাকে ডুবে মরতে হবে।

www.pathagar.com

সেই 'সুযোগ তাকে দেওয়া উচিত', যাতে 'ঐক্যবদ্ধ ভারতের মধ্যে সসম্মানে ফিরতে পারে মুসলিম লীগ।'

এগারটা প্রদেশের এগারজন গভর্নর চুপ করে মাউন্টব্যাটেনের কথা শুনলেন। দেশভাগের পক্ষে বা বিপক্ষে টুঁ শব্দও উচ্চারণ করলেন না কেউ। এটা ত বাস্তব সত্য যে তাঁদের হাতে কোন বিকল্প প্রস্তাবও ছিল না সেদিন।

সন্ধ্যে বেলায় ভাইসরয় ভবনের স্টেট ডাইনিংরুমে খানাপিনার জমজমাট আসর বসলো। ভোজদাতা গৃহস্বামী সস্ত্রীক মাউন্টব্যাটেন স্বয়ং। নিমন্ত্রিতরাও সস্ত্রীক এসেছেন। ডাইনিংরুমের দেওয়ালে টাঙানো আছে প্রথম ঊনিশজন বড়লাটের পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র। ছবির মানুষরা সকৌতুকে তাকিয়ে আছেন এই আসরের দিকে। মনে হচ্ছে যেন অতীতের ধুরন্ধর রাষ্ট্রনায়করা কালের ব্যবধান পেরিয়ে তাকিয়ে আছেন এ কালের নায়কদের দিকে। বিচার করতে বসেছেন এ'দের কাজের ধারা যখন বৈঠক শেষ করে খানাপিনার আসরে এসেছেন ব্রিটিশরাজের এইসব স্থপতিরা। ভোজনপর্ব একসময় শেষ হলো। বড়লাটভবনের উর্দি পরা খানসামারা ডীক্যানটার পূর্ণ করে সুমিষ্ট 'পোর্ট' পানীয় নিয়ে এল। অতিথি নিমন্ত্রিতদের হাতের পানপাত্র কানায় কানায় ভরে উঠলো টলটলে মদিরায়। লুই মাউন্টব্যাটেন দাঁড়িয়ে উঠলেন। তারপর মদিরার পাত্র উঁচুতে তুলে সবাইকে অভিবাদন করলেন। কেউ বুঝলো না যে একটা 'ট্র্যাডিশন' শেষ হয়ে যাচ্ছে। শেষ হয়ে যাচ্ছে একটা সমৃদ্ধ খানদান। ভবিষ্যতে এমন অনুষ্ঠান আর কোনদিনই হবে না, যখন ইণ্ডিয়ার ভাইসরয় হাতের পানপাত্র উঁচুতে তুলে দাঁড়িয়ে উঠবেন। তারপর সমবেত নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে চার হাজার মাইল দূরবর্তী সম্রাটের স্বাস্থ্যকামনা করে বলবেন, 'লেডিজ্ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, দ্য কিং এম্প্যারার!'

সীমান্ত প্রদেশ এবং পাঞ্জাব, ১৯৪৭এর শেষ এপ্রিল

বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ব্যক্তিগত ইয়র্ক এম ডব্লু ৯০২ বিমানের গোল জানলা দিয়ে হঠাৎ যেন উঁকি দিল নংগা পর্বতের শুভ্র সুমহান শংকু। আকাশের গায়ে ঠেলে উঠেছে পঁচিশ হাজার ফিট উঁচু এই পর্বতশৃংগ। বিমানের আরোহীরা স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে আছেন প্রায় একশ' মাইল উত্তরের ওই গিরিশৃংগের দিকে। দিগন্তের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে হিন্দুকুশ পর্বতমালার হিমানী শৃংগগুলি যা আড়াল করে রেখেছে ওপারের প্রায় চির তুষারাচ্ছাদিত সেই শুষ্ক শীতল অঞ্চল, যার ভৌগোলিক নাম রুফ্ অব দ্য ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ পৃথিবীর ছাদ। ইয়র্ক বিমানটি এবার দক্ষিণে বাঁক নিল। তারপর সিন্দুনদের আঁকাবাঁকা গতি-পথ অনুসরণ করে শহরতলির কাদালেপা বস্তিঘরের এলাকা পেরিয়ে বহুতলভবন সমন্বিত রাজধানী শহর পেশোয়ারে এসে পোঁছাল বিমান।

বিমান তখন বন্দরের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। আরোহীরা হঠাৎ নীচের দিকে চেয়ে প্রায় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন যেন। এক বিশাল জনতা থিকথিক করছে বিমান-বন্দরের সারা চত্বর এবং তার আশপাশের চতুর্দিকে। হাজার হাজার উদ্ধত মানুষের চাপে প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে পুলিসের অবরোধ। বিমানের জানলা দিয়ে

www.pathagar.com

ওই রোষোদ্ধত জনতার দিকে মাউন্টব্যাটেনেরও চোখ পড়লো। তিনিও কিছুটা স্তব্ধ হয়ে গেলেন এই লক্ষ মানুষের মিছিল দেখে। দিল্লির লাটভবনের বাতানুকূল স্টাডিরুমের আলোচনা দিন কয়েকের জন্যে বন্ধ রেখে মাউন্টব্যাটেন ছুটে এসেছেন এখানে। পাঞ্জাব আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাজনৈতিক উত্তাপটা চোখে কানে পরখ করতেই তাঁর এই ছুটে আসা।

এখানে তাঁর আসার খবরটা চব্বিশ ঘণ্টা আগেই সীমান্তের সর্বত্র পেঁৗছে গেছে। জিন্নার মুসলিম লীগের নেতারা হাঁক দিয়ে জড়ো করেছে অনুগামীদের। সমস্ত সীমান্ত প্রদেশের আনাচকানাচ থেকে অনুগামীরা এসে জমা হয়েছে রাজধানী শহর পেশোয়ারে। তারা এসেছে বাস লরির মাথায় চড়ে, এসেছে ট্রেনের কামরায় ঝুলে ঝুলে। হাজারে হাজারে মানুষগুলো এসেছে জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে একটা প্রতিবাদ জানাবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে।

ফ্যাকাশে চামড়ার লম্বা চওড়া চেহারার পাঠানরা বড়লাটবাহাদুরের জন্যে এক অভিনব অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করতে জড়ো হয়েছে এখানে। গরমে আর ধুলোয় এমনিতেই ঝলসে আছে মানুষগুলো। ক্ষণে ক্ষণে তাদের পাঠানী মেজাজ চড়ছে। যারা দৈবাৎ নেতাদের আজ্ঞা শিরোধার্য করে, অপেক্ষায় থেকে থেকে ক্রমেই ভয়ঙ্কর হয়ে পড়ছে। পুলিসের অবরোধ উপেক্ষা করতে ঝোঁক বাড়ছে প্রতি মুহূর্তে। রেলরোডের উঁচু পাড় থেকে পুরনো মোগল কেল্লার গড়ানে পাঁচিল পর্যন্ত টানা নিচু দেওয়ালের বেড়ার মধ্যে আটকে রাখা হয়েছে হাজার হাজার প্রতিবাদী মানুষকে। খাঁচার মধ্যে আটকানো মানুষগুলো মাঝে মাঝে অসহিষ্ণু হয়ে হাতের রাইফেল তুলে হুমকি দিচ্ছে। মনে হচ্ছে এই বুঝি পোষ মানানো কৃত্রিম শান্তির আবরণ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে ওরা। ওদের হাতের রাইফেল থেকে বেরিয়ে আসবে বিদ্রোহের আগুন।

এই সীমান্ত প্রদেশে একটা রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচারের প্রতিবাদ জানাতেই ওদের জড়ো করিয়েছে মুসলিম লীগ নেতারা। এখানকার মোট জনসংখ্যার শতকরা তিরানব্বুই ভাগ হলো মুসলমান। অথচ তাদের শাসন করে কংগ্রেস নামক এক হিন্দু রাজনৈতিক দলের মন্ত্রীসভা। ওদের মতে ঘটনাটা স্রেফ গোঁজামিল। কংগ্রেস দলের নেতা হলেন একজন উপজাতি প্রধান। তাঁর নাম আবদুল গফ্ফর খান। শমশ্রুভূষিত এই দীর্ঘদেহী পাঠানকে ওল্ড টেস্টামেন্টের একজন খ্রীষ্টবাণী প্রচারকের মতন দেখতে। সীমান্ত প্রদেশের পাঠান উপজাতিদের মধ্যে গান্ধীজীর প্রেম ও করুণার বাণী প্রচার করে প্রতিহিংসা আর অনর্থক রক্তপাতের প্রবণতা থেকে পাঠান উপজাতিদের বিরত করার ব্রত নিয়েছেন এই মানুষটি। পাঠান উপজাতিরা এতদিন তাঁকে মেনে এসেছে। কিন্তু যখনই গান্ধীজীর বশংবদ হয়ে তিনি জিন্নার পৃথক ইসলামিক রাষ্ট্রের জিগিরের বিরোধিতা করলেন, তখনই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো পাঠান জওয়ানেরা। সেই থেকে জিন্নার খিদমতগার ওই রাজনৈতিক প্ররোচকরাই উসকানি দিয়ে জনতাকে গফ্ফর খান সরকারের শত্রুপক্ষ করে তুললো। মাউন্টব্যাটেন, তাঁর স্ত্রী এডুইনা এবং সপ্তদশী কন্যা পামেলার অভিনব অভ্যর্থনার জন্যে যে বিশাল রোদে পোড়া ক্ষুব্ধ জনতা রাইফেল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা প্রমাণ করতে এসেছে যে, 'সীমান্ত গান্ধী' নয়, মুসলিম লীগের দাবির সমর্থনেই তারা জমায়েত হয়েছে এখানে। কারণ এ প্রদেশে মুসলিম লীগ দলই এখন সকলের সমর্থন পেয়েছে। জনতার এই বিক্ষোভ দেখে সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর স্যার ওলাফ ক্যারো

www.pathagar.com

বেশ চিন্তায় পড়ে গেলেন। যেমন করে হ'ক মহামান্য অতিথিদের এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া দরকার। তাই একটা সুরক্ষিত মোটরগাড়িতে বড়লাট মাউন্টব্যাটেন এবং তাঁর গিন্নী ও মেয়েকে চড়িয়ে সোজা এনে তুললেন তাঁর নিজের লাটপ্রাসাদে। উত্তাল হয়ে উঠেছে তখন জনসমুদ্র। খাঁচায় বন্দী শার্দুলের মতন রোষে ফুঁসছে। মনে হচ্ছে রোদেপোড়া মানুষগুলো এখনই পুলিসের বেড়া ভেঙে ঝাঁপিয়ে পড়বে লাটভবনের ওপর। তেমন ঘটনা যদি হয়, তবে সেনাবাহিনীর ওই ক'জন প্রহরী সেনা দিয়ে কোন প্রতিরোধই তৈরি করা যাবে না। গুলি চালানো ছাড়া আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায় থাকবে না। তার পরিণাম যে কত বীভৎস হবে তা বোঝাই যায়। শুধু যে অনেক মানুষ হতাহত হবে তাই নয়, মাউন্টব্যাটেনও মুছে যাবেন ইতিহাসের পাতা থেকে। সমাধান পাওয়ার সব আশা জলাঞ্জলি যাবে। আর অনর্গল রক্তস্নানের বন্যায় বিপন্ন হবে তাঁর পদমর্যাদা।

কিন্তু সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর স্যার ওলাফ্ ক্যারোও ভেবে পাচ্ছেন না প্রতিকার কি। হঠাৎ বিদ্যুত চমকের মতন একটা আলোর রোশ্নি দেখতে পেলেন তিনি। তাঁর মনে হলো একটাই পথ খোলা আছে এখন। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব শুনে থ হয়ে গেল পুলিস আর সামরিক বাহিনীর লোকেরা। তাদের মনে হলো এটা সেরেফ পাগলামি। তবুও এটাই একমাত্র মুক্তির উপায়। এই জটিলতা থেকে নিষ্কৃতি পেতে জনতার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই হবে মাউন্টব্যাটেনকে। তারপর? আর জানেন না স্যার ওলাফ্ ক্যারো। তবে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে মাউন্টব্যাটেনকে চোখের দেখা দেখে মানুষগুলো হয়ত শান্ত হবে।

সব শুনলেন মাউন্টব্যাটেন। কিছুক্ষণ নিবিষ্টমনে ভাবলেন। তারপর মনস্থির করে বললেন, 'ঠিক আছে, আমি ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াবো। ওদের সঙ্গে দেখা করবো। একটা চান্স নিয়ে দেখাই যাক।' কিন্তু উপসর্গ জুটলো যখন এডুইনা জিদ ধরলেন যে তিনিও স্বামীর সঙ্গে যাবেন। স্যার ওলাফ্ ক্যারো আর নিরাপত্তা অফিসাররা এবার সত্যিই মাথায় হাত দিয়ে বসল।

মিনিট কয়েক পরের কথা। রেলের উঁচু বাঁধের কাছে একটা জীপগাড়ি এসে থামলো। জীপগাড়ির ভেতর থেকে নামলেন সস্ত্রীক মাউন্টব্যাটেন। বাঁধের ওপাশে থই থই করছে উত্তাল জনসমুদ্র। রোদে, ঘামে আর ধুলোয় ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ হয়ে আছে ওরা। ওদের নিষ্ফল আক্রোশের গর্জন শোনা যাচ্ছে অনেক দূর থেকে। স্ত্রীর হাত ধরে বাঁধের ওপর উঠলেন মাউন্টব্যাটেন। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে জনসমুদ্র। মাত্র পনেরো ফুট দূরেই ওই তরঙ্গক্ষুব্ধ জনসমুদ্রের দিকে চেয়ে রইলেন মাউন্টব্যাটেন। পাগড়ি পরা পাঠানরা একটা বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যেন রোষে ফুঁসছে। ওদের পায়ের দাপাদাপিতে কেঁপে উঠছে মাটি। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু পাগড়ি আর পাগড়ি। কী একান্ত এই জনতা! যেন উদ্বেলিত ভীষণাকার জনসমুদ্র। পুলিসের বেড়া ভেঙে আরও কাছে আসতে চাইছে ওরা। ক্ষোভে রাগে ওরা মাঝে মাঝে গর্জন করে উঠছে। তখন ফুটে বেরচ্ছে ওদের মনের রাগ। ছবিটা চোখের সামনে দেখতে দেখতে কেমন যেন অবশ হয়ে গেলেন মাউন্টব্যাটেন। ওদের গর্জন আর হাত পা নাড়ার মধ্যে ফুটে বেরচ্ছে ওদের মনের ধিক্কার আর আবেগ। তিনি বুঝতে পারলেন যে ভারতের এক বিশাল জনতার আবেগের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। তাঁর পায়ের গোড়ায় আছড়ে পড়ছে মানুষগুলোর আবেগের স্রোত। হাজার হাজার মানুষের ঠেলাঠেলিতে যে ধুলো উড়ছে তাতে ভারী হয়ে গেছে বাতাস। মনে হচ্ছে

www.pathagar.com

ওদের চিৎকার যেন বাতাসের স্তরের মতন মোটা হয়ে তাদের মাথার ওপর ভেঙে পড়ছে। মাউন্টব্যাটেন প্রায় স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে আছেন এই স্তব্ধ বিশাল জনতার দিকে। তাঁর মনে হলো এ যেন তাঁর জীবনের এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। তাঁর 'অপারেশন সীডাকশনের' এক চূড়ান্ত পরীক্ষার মুহূর্ত এটা। এ এমন এক মুহূর্ত যখন অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে।

কিছুটা অনিশ্চিত সংশয় নিয়ে উদ্বেল জনসমুদ্রের দিকে চেয়ে আছেন মাউন্টব্যাটেন। এক হাত দিয়ে ধরেছেন পত্নী এডুইনার হাত। দুজনেরই চোখের দৃষ্টি বিমূঢ়। উঁচু বাঁধের নীচে দাঁড়িয়ে দুজনের এই ভাবমগ্ন রেখাচিত্র দেখছেন স্যার ওলাফ্ ক্যারো। তাঁরও মন দ্বিধাগ্রস্ত। এই বিশাল জনতার মধ্যে হয়ত বিশ, তিরিশ বা চল্লিশ হাজার বন্দুকধারী মানুষ আছে। রোদে, তাতে আর অপেক্ষার অনিশ্চয়তায় যদি একজন মানুষও সাময়িক ক্ষিপ্ত হয়ে মাউন্টব্যাটেনকে তাক করে গুলি ছুঁড়ে বসে? মনে মনে শিউরে উঠলেন স্যার ওলাফ্ ক্যারো। 'জলের বুকে ভেসে বেড়ানো হাঁসের' মতন অসহায় মাউন্টব্যাটেন দম্পতির ভাগ্য নিয়ে এ কি ছিনিমিনি খেলায় মেতেছেন তিনি? পলকের জন্যে তাঁর মনে আশঙ্কার ছায়া পড়লো। তাঁর মনে হলো 'একটা কিছু যদি ঘটে যায়?' অন্তত তেমন কিছু ঘটে যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। কারণ লোকগুলো কেউই ত প্রকৃতিস্থ নয়.!

মাউন্টব্যাটেনের মনেও ধন্দ। কি করবেন জানেন না। কিছুটা আবেগের বশে জনতার মুখোমুখি দাঁড়াতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু অতঃপর! মাউন্টব্যাটেনের মনে হলো কিছু একটা বলা দরকার ওদের। কিন্তু কি বলবেন? ওদের মাতৃভাষা পুস্তুতে একটা শব্দও উচ্চারণ করার ক্ষমতা নেই তাঁর। তাই কিছুটা অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন জনসমুদ্রের দিকে। ক্যারোও চেয়ে আছেন সতর্ক চোখে। হঠাৎ যেন একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটলো। ক্যারোর মনে হলো মাউন্টব্যাটেনের দিকে চেয়ে থাকা ওদের হিংস্র বধোদ্যত হাতগুলো কেমন যেন নেতিয়ে পড়ছে। উত্তাল জনসমুদ্রোত্থিত গর্জনও ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছে। ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু কোন মন্ত্রের গুণে ওরা এমন মোহিত হলো? অপরিকল্পিত এই জনসভায় হঠাৎই এসে পড়েছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই সফল কুশলী যুদ্ধনেতা লর্ড মাউন্টব্যাটেন। সুপ্রীম এ্যালায়েড কম্যান্ডার লুই মাউন্টব্যাটেনের কোনরকম পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না এখানে আসার। তাই যেমন তেমন পোশাক পরেই দিল্লি থেকে উড়ে এসেছেন তিনি। তাঁর তখনকার পোশাকটা, বলা বাহুল্য, খুবই সাদামাটা। সবুজ রঙের একটা হাফ হাতা বুশ জ্যাকেট আর প্যান্ট। কিন্তু পোশাকে পরিপাট্য না থাক, রঙেতে একটা অভিনবত্ব আছে। মাউন্টব্যাটেনের পরনের বুশ জ্যাকেটের রঙ সবুজ। যে সবুজ রঙ ইসলামের রঙ। হাজী তীর্থযাত্রীরা যে সবুজ রঙের পোশাক পরে পবিত্র মক্কা তীর্থে হজ করতে যায়, সেই রঙের জামা গায়ে দিয়েছেন তিনি। সুতরাং রঙের যাদুতেই ভাবপ্রবণ মানুষগুলো মুগ্ধ হয়ে গেছে। তাদের মনে হয়েছে মাউন্টব্যাটেন ওদেরই আপনজন। এই ভাবনাটাই দারুণ ক্রিয়া করেছে হাজার হাজার মুসলমান জনতার মনে। একটা স্ফীত আত্মপ্রসাদে পরিতৃপ্ত হয়ে সবাই ভেবে নিয়েছে যে সবুজ পোশাক পরা ওই সাহেব মানুষটা তাদের সমব্যথী, তাদের মহান ধর্মের প্রতি চিরানুগত উনি।

হ্যাঁ, সেদিন এই অনুপ্রাণিত ভাবটাই বদলে দিল জনতার চরিত্র। মাউন্টব্যাটেন তখনও তেমনি শূন্য স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন জনতার দিকে। তাঁর হাতে ধরা

www.pathagar.com

আছে এডুইনার নরম হাতখানা। সেই অবস্থাতেই পত্নীর কানে ফিসফিস করে বললেন, 'ওদের দিকে চেয়ে হাত নাড়ো।' স্বামীর কথামত এডুইনাও ক্লান্ত হাতখানা শূন্যে তুলে ধীরে ধীরে নাড়াতে লাগলেন। মাউন্টব্যাটেনও উঁচুতে হাত তুলে নাড়াচ্ছেন তখন। সেই মুহূর্তে ভারতের ভাগ্যও যেন দুটি আন্দোলিত হাতের সঞ্চালনের ওপর নির্ভর করছিল। হাজার হাজার উদ্ধত মানুষ তখন স্তব্ধ হয়ে চেয়ে আছে এই দুটি মানুষের দিকে। হঠাৎ সেই স্তব্ধতা চিরে একটা চীৎকার উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিধ্বনি হলো হাজার কণ্ঠের নির্ভীক জয়োল্লাসে। জনতার সেই নির্ভীক ভীমগর্জন মথিত করলো সমস্ত আকাশ। 'মাউন্টব্যাটেন জিন্দাবাদ!' অসংখ্য পাঠানবীরের এই স্বতঃস্ফূর্ত জয়ধ্বনি যেন উপাসনাকালের প্রার্থনামন্ত্রের মতন উদ্বুদ্ধ করলো সেই সংকটময় মুহূর্তটা।

পাঠানদের সঙ্গে মুখোমুখি 'মোলাকাতে'র ঠিক আটচল্লিশ ঘণ্টা পরের কথা। মাউন্টব্যাটেনের নিজস্ব বিমান এসে নামলো পাঞ্জাবের এক বিমানবন্দরে। বিমান থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই পাঞ্জাবের গভর্নর স্যার ইভান জেন্‌কিন্স সস্ত্রীক বড়লাটকে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ২৫ মাইল দূরের একটা ছোট্ট গ্রামে নিয়ে এলেন। গ্রামের নাম কাহুটা। গ্রামের মাটিতে পা দিয়েই মাউন্টব্যাটেন বুঝতে পারলেন দেশের ভয়াবহ অবস্থার কথা। দুহপ্তা আগে স্যার ইভান জেন্‌কিন্স যা বলেছিলেন তা মোটেই অতিরঞ্জিত নয়। পাঞ্জাবে সত্যিই তখন আগুন জ্বলছে এবং তার লেলিহান শিখায় সারা দেশ যে কবলিত, সেই বীভৎস ছবিটাই যেন প্রত্যক্ষ করলেন মাউন্টব্যাটেন এখানে এসে।

যুদ্ধের অনেক বীভৎসতা মাউন্টব্যাটেন দেখেছেন। তাঁর সেই যুদ্ধস্মৃতি তখনও মলিন হয়ে যায় নি। ডেস্‌ট্রয়ার 'কেলী'র সমুদ্রডুবির সময় অসহায় নাবিকদের জলমগ্ন হবার ছবিটা স্পষ্ট মনে আছে তাঁর। ভুলে যান নি বর্মামুলুকের সেই অরণ্যযুদ্ধের নির্দয় ঘটনাগুলোর কথা। কিন্তু মাত্র সাড়ে তিন হাজার গ্রামবাসীর এই ছোট্ট গ্রামটায় এসে মানুষের যে দুর্দশার ছবি দেখলেন তা যেন সব বীভৎসতা ছাপিয়ে যায়। তাঁর মনে হলো যে, একখানা গ্রামের এই কলঙ্কচিহ্ন যেন সারা ভারতবর্ষের পাঁচ লক্ষ গ্রামের বুকে এক দুরপনেয় অপবাদ এঁকে দিয়েছে।

কাহুটা গ্রামের হিন্দু, শিখ আর মুসলমান অধিবাসীরা আপনজনের মতন পাশাপাশি বাস করছে যুগ যুগ ধরে, তাদের পিতামহ প্রপিতামহদের আমল থেকে। মোট সাড়ে তিন হাজার অধিবাসীর মধ্যে হিন্দু ও শিখ অধিবাসীর সংখ্যা দু হাজার এবং মুসলমানের সংখ্যা দেড় হাজার। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন যেদিন গ্রামখানা দেখতে এলেন, সেদিন গ্রামের মধ্যে একটা কুঁড়েও অক্ষত নেই। শুধু গ্রামের মধ্যে টিকে আছে পাথরের তৈরি একটা মসজিদ আর গোল গম্বুজের একটা গুরুদ্বার। শুধু এই দুটি ধর্মস্থানই মানুষের নৃশংস বর্বরতার পরিচয় ঘোষণা করছে অনাবৃত ভূমিকায় আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে।

মাউন্টব্যাটেনরা এখানে আসার খানিক আগেই নিয়মমাফিক রোঁদে (রীকন্‌-নেস্যানস) বেরিয়েছিল ব্রিটিশ নরফোক রেজিমেন্ট। তারা চলে যাবার পরেই নৃশংস ঘটনাটা ঘটে। অন্যদিনের মতন সে রাতেও হিন্দু ও শিখ গ্রামবাসীরা পরম নিশ্চিন্তে পাশাপাশি শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। কিন্তু গ্রামে পরদিন স্বাভাবিক ভোর হল না। আলো ফুটলে দেখা গেল যে গ্রামের হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়ের প্রায় সব মানুষ আগুনে পুড়ে ঝলসান অবস্থায় মরে পড়ে আছে। যারা দগ্ধ হয় নি তারা গ্রাম

www.pathagar.com

ছেড়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে বেঁচেছে।

আগের দিন রাত্রে এক পাল নৃশংস নেকড়ের মতন এক ঝাঁক বর্বর উন্মত্ত মুসলমান গা ঢাকা দিয়ে গ্রামের হিন্দু ও শিখদের ওপর হানা দেয়। তারপর জ্যান্ত মানুষের গায়ে পেট্রল ঢেলে তাদের পুড়িয়ে মারে। পুড়িয়ে দেয় তাদের ঘরবাড়িও। যারা পালাবার চেষ্টা করে তাদের দড়ি দিয়ে বেঁধে পেট্রল ঢেলে মশালের মতন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ঘরবাড়ি পুড়িয়ে, পুরুষদের গায়ে আগুন লাগিয়ে, সম্পত্তি লুঠ করেও তারা ক্ষান্ত হয় নি। কিছু হিন্দু মেয়েদের বিছানা থেকে টেনে তুলে ধর্ষণ করে তাদের ধর্মান্তর করা হয়। অন্য মেয়েরা ইজ্জৎ বাঁচাতে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে খেলা সাঙ্গ করে। কিন্তু আগুন জাতধর্ম মেনে শুধু হিন্দু বা শিখদেরই পোড়ায় নি। হিন্দু পাড়ার আগুন মুসলমান পাড়াতেও ছড়িয়ে যায় এবং সমস্ত কাহুটা গ্রামটাকেই ভস্মসাৎ করে দেয়। সস্ত্রীক মাউন্টব্যাটেন যখন কাহুটা গ্রামে পৌঁছলেন তখন (সেখানে জীবনের কোন স্পন্দনও ছিল না। সারা গ্রামখানা নিঃসঙ্গ শ্মশানভূমির মতন ধিকিধিকি জ্বলছিল। এই ঘটনার উল্লেখ করে মাউন্টব্যাটেন যে প্রতিবেদনটি লন্ডনে পাঠান, তাতে লেখেন, 'কাহুটায় না যাওয়া পর্যন্ত এই দেশব্যাপী তান্ডবের গুরুত্বটা আমি ঠিকমতন উপলব্ধি করতে পারতুম না।'

পেশোয়ারের বিক্ষুব্ধ মানুষের সেই জনসভা আর পাঞ্জাবী গ্রামের বীভৎসতাই মাউন্টব্যাটেনের আবৃত দৃষ্টি মুক্ত করে দিল যেন। সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে এই বাস্তব প্রমাণগুলোই তাঁর দরকার ছিল। বস্তুত, এই দুটো বাস্তব ঘটনাই সিদ্ধান্ত নেবার প্রেক্ষিত নির্মাণ করে দিল। অতঃপর দশদিন পরে লাটভবনের বাতানুকূল স্টাডি রুমে বসে মাউন্টব্যাটেন যে সিদ্ধান্ত নিলেন তার মধ্যে আর কোন সংশয় রইল না। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে ভারতকে বাঁচাতে হলে যা করার তা এখনই করতে হবে। অন্যথায় সারা দেশের কাঠামো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। সেই সঙ্গে নড়বড়ে হবে সুবিন্যস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। তবে শুধু ক্ষিপ্রতাই নয়, এই কানা গলি থেকে বেরিয়ে আসার যে পথটা আছে, সেটাই সমাধানের একমাত্র পথ। হয়ত ব্যক্তিগতভাবে সমাধানের এই পথটা তাঁর মনঃপূত নয়। কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সুপরিকল্পিতভাবে সেই অমোঘ নিয়তির দিকেই ছুটে চলেছে। এ তরঙ্গ রোধিবে কে ? পার্টিশনই সেই অমোঘ বিধান। অন্য পথ নেই। নান্যঃ পন্থা !

* * *

১৯৪৭এর ১লা মে। সেদিন সন্ধ্যে থেকেই শুরু হলো গান্ধীজীর সবচেয়ে দুরূহ তীর্থপরিক্রমা। বলাবাহুল্য, এটাই তাঁর সর্বশেষ পরিক্রমা। ভারত স্বাধীনতা পেতে চলেছে। সুতরাং আর দরকার হবে না তীর্থযাত্রার। তবে বড় বেদনাময়, বড় কঠিন এই সর্বশেষ যাত্রা। নিউ দিল্লির ভাংগী ধাঙড়দের সেই বুকচাপা বস্তি ঘরেই আবার বৈঠক বসেছে, যেমনটি বসেছিল পনেরো দিন আগে। সেদিন অক্ষম অসহায় গান্ধীজী কিছুতেই তাঁর প্রস্তাবে রাজী করাতে পারেন নি সবাইকে। মেলাতে পারেননি সুর। ভারতকে সংহত রাখার ঐকতানসুর কেটে গিয়েছিল সেদিন। আচমকা নিভে গিয়েছিল আশার প্রদীপের শেষ শিখাটি। আজও ধাঙড় বস্তির এই বুকচাপা ঘরখানায় তাদের নিয়েই বৈঠক বসেছে। মেঝের ওপর পা মুড়ে বসে আছেন গান্ধীজী। তাঁর কেশবিরল মাথায় চাপানো আছে একটা ভিজে গামছা। তাঁকে ঘিরে বসে আছেন কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের সদস্যেরা। ওঁদের আলোচনা বোঝবার চেষ্টা

www.pathagar.com

করছেন গান্ধীজী। কিন্তু যত শুনছেন ততই মনমরা হয়ে যাচ্ছেন। আগের বৈঠকেই যথেষ্ট হেনস্তা হয়েছে তাঁর। ওঁরা যে তাঁর পথ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে সেদিনই বৃদ্ধ গান্ধীজী তা টের পেয়েছিলেন। সেই ছাড়াছাড়িটাই যে আজ আরও প্রকট হতে চলেছে, তা বেশ বোঝা যায়। তবুও ভারত যে স্বাধীন হতে চলেছে তা আজ আর বায়বা কোন কল্পনা নয়। এতদিন এই দিনটিরই অপেক্ষায় ছিলেন সবাই। এই দিনটির জন্যেই বছরের পর বছর হাজতবাস, হরতাল আর অনশন করেছেন গান্ধীজী। আজকের সভা এ সবেরই ফল। গান্ধীজী পেরেছেন ভারতের যথার্থ ভাবমূর্তি উন্মোচন করতে। পেরেছেন এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধটি জাগিয়ে তুলতে। পেরেছেন দেশের মানুষকে অহিংসা নীতির আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে। হ্যাঁ, আদর্শের এই পথ ধরেই দুর্লভ স্বাধীনতা আসছে। কিন্তু মহান এই জয়ের পথে দেখা দিয়েছে এক বিরাট বাধা। নাটক যেন দ্রুত বিয়োগান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। আজ তাঁর সহযাত্রীরা সবাই বিধ্বস্ত। স্খলিত হয়েছে ওঁদের ধৈর্য। ওঁদের এই বিপর্যস্ত মানসিকতায় আর অপেক্ষা করার অবসর নেই। স্বাধীনতা নামক পাকা ফলটি প্রায় হাতের নাগালের মধ্যে এসে গেছে ওঁদের। তাই প্রাপ্তি ত্বরান্বিত করতে দেশভাগ নামক চরম প্রস্তাবটাও মেনে নিতে চাইছেন ওঁরা। যে পথেই আসুক স্বাধীনতা চাই-ই এবং এখনই।

ভারতের সংহতির প্রতি দুর্মর দায়বদ্ধতার জন্যেই যে গান্ধীজী দেশভাগে আপত্তি করেছিলেন তা নয়। বছরের পর বছর এতবড় দেশটার হাজার হাজার গ্রামে ঘুরে বেড়াবার সময় দেশের আত্মাকে জানবার এক সহজাত জ্ঞান তাঁর মধ্যে গড়ে ওঠে। সেই বোধ থেকেই তাঁর ধারণা হয়েছে যে পার্টিশন মানে শুধু ছুরি চালিয়ে দেশটাকে দুভাগ করা নয়, যেমনটি মাউন্টব্যাটেনকে বুঝিয়েছেন জিন্না। পার্টিশনের অর্থ হ'ল দেশটাকে কসাইখানা করে তোলা যখন গ্রামবাসীরা বন্ধুর বিরুদ্ধে বন্ধু, প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে প্রতিবেশীকে উসকে দেবে। সারা দেশ জুড়ে তখন যে রক্তনদীর ধারা বইবে তা থেকে প্রাপ্তিটুকু হবে নেহাতই তুচ্ছ। অর্থাৎ জন্ম হবে দুই চিরবৈরি রাষ্ট্রের, যারা উভয়ে উভয়ের শবভক্ষণ করে বেঁচে থাকবে। তিনি এও জানতেন যে একবার দেশভাগ হলে সে ভুলের প্রায়শ্চিত্য বংশপরম্পরায় দুদেশের মানুষকেই করতে হবে।

মাউন্টব্যাটেনের মতন নেহরু, প্যাটেল এবং অন্যরাও বুঝতে পেরেছিলেন যে দারুণ একটা বিপর্যয় ঘনিয়ে আসছে দেশের বুকে এবং যত মন্দই হ'ক দেশভাগই হ'ল এর একমাত্র মুক্তির উপায়। নয়ত দেশকে বাঁচানো যাবে না। শুধু গান্ধীজীই মনেপ্রাণে এই সমাধানটা মেনে নিতে চান নি। তাঁর ধারণা ওরা সবাই ভুল করছে কিংবা যদি ভুল না-ও করে তাহলেও দেশভাগ কোন উত্তর নয় এই সমস্যার। বরং তার বদলে দেশ জুড়ে নৈরাজ্য আসুক। সেও সইবে, কিন্তু দেশভাগ সইবে না।

গান্ধীজী তাঁর অনুগামীদের বোঝালেন যে ইংরেজ দয়া দেখিয়ে হাতে তুলে না দিলে জিন্না কখনও পাকিস্তান পেতে পারেন না। আর ইংরেজও চট করে এত মূল্যবান অনুগ্রহটি দেখাবে না, কারণ তার সে সাহস নেই। মাউন্টব্যাটেন ভাল করেই জানেন যে তাঁর যে কোন প্রস্তাবই 'না' (ভেটো) করার অধিকার গরিষ্ঠ দল কংগ্রেসের আছে। সুতরাং পরিণামের কথা আগাম না ভেবে ইংরেজকে এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলা হ'ক। বস্তুত, জনে জনে সেই ভিক্ষাই চাইলেন গান্ধীজী। বললেন, 'ইংরেজ দেশ ছেড়ে চলে যাক।' অন্তত, দেশের মানুষের হাতে তাদের নিজেদের ভাগ্য জয় করার

www.pathagar.com

অধিকার ছেড়ে দিয়ে যাক ইংরেজ। তারপর দেশ জুড়ে 'স্বর্গরাজ্য বা নৈরাজ্য' যা হবার হ'ক। মোটকথা ইংরেজ চলে গেলেই দেশবাসী হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। 'হয়ত সারা দেশ অস্থির হবে। সারা দেশে আগুন জ্বলবে। কিন্তু সেই আগুনে পুড়েই আমরা খাঁটি হবো।'

তবু গান্ধীজীর এই আর্ত আবেদনে সেদিন কেউ সাড়া দিল না। অরণ্যে রোদন সার হ'ল তাঁর। এমনকি যাঁদের তিনি নিজের হাতে গড়েছেন সেই দুজন অনুগামীও কানে তুললেন না তাঁর আবেদন। অথচ এমন দিনও গেছে যখন তাঁর সংগে গলা মিলিয়ে দাবি জানিয়েছেন এঁরাও।

এদেশে মাউন্টব্যাটেনের আসার আগে থেকেই দেশভাগের যুক্তি মেনে নিয়েছিলেন প্যাটেল। তাঁর বয়স হচ্ছে। ইতিমধ্যেই দুবার হার্ট এ্যাটাক হয়ে গেছে। তাই দীর্ঘ নিষ্ফল আলোচনা তাড়াতাড়ি শেষ করে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে চাইছিলেন তিনি, যাতে স্বাধীন ভারতের রূপরেখা বিন্যাসে মন দিতে পারেন। তাঁর ধারণা, জিন্নাকে তাঁর ভাগ দেবার পর পাঁচটা বছরও কাটবে না। মুসলিম লীগের নেতারা নতুন করে অবিভক্ত ভারত গড়ার জন্যে হুমড়ি খেয়ে পড়বেন তাঁদের দোরগোড়ায়।

কিন্তু প্যাটেলের এমন সরল সিদ্ধান্তটা সরাসরি মেনে নিতে পারলেন না নেহরু। ইতিমধ্যেই দোটানায় পড়ে দ্বিখণ্ডিত হয়েছেন তিনি। একদিকে গান্ধীজীর ওপর নিবিড় অনুরাগ, অন্যদিকে নতুন বন্ধু মাউন্টব্যাটেনের প্রতি মুগ্ধ শ্রদ্ধা। গান্ধীজীর আহ্বান তাঁর হৃদয়ের কাছে, মাউন্টব্যাটেনের আহ্বান বুদ্ধির কাছে। অবশ্য সহজ বুদ্ধি দিয়ে নেহরু বুঝেছেন যে দেশভাগের প্রস্তাবটা একটা জাতির কাছে অবমাননাকর। তবুও তাঁর বুদ্ধিগ্রাহ্য মন সায় দিল এ প্রস্তাবে, কারণ এ প্রশ্নের অন্য উত্তর হয় না। মাউন্টব্যাটেনও যখন সে কথা জানলেন তখন নানারকম কূটনীতির ছলাকলা প্রয়োগ করে নেহরুকে বশে আনার চেষ্টা করলেন। তাঁর যুক্তিগুলোর মধ্যে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটাই অধিক ভাবে ক্রিয়া করলো নেহরুর মনে। মাউন্টব্যাটেন ঘটা করে বুঝিয়ে দিলেন যে ভারতের গ্রহণলাগা আকাশ থেকে জিন্নার প্রস্থান খুব তাড়াতাড়ি হবে। তখন রাহুমুক্ত হয়ে পূর্ণচন্দ্রের শোভা পাবেন নেহরু এবং হিন্দু ভারতের শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারকে কাজে লাগিয়ে সমাজবাদী রাষ্ট্র তৈরির স্বপ্ন সার্থক করতে পারবেন। মোটকথা, এতদিন যে বৃদ্ধ মানুষটিকে মেনে এসেছিলেন নেহরু সেদিন তিনিও তাঁকে ত্যাগ করলেন।

প্রধান দুজন কংগ্রেসী নেতার সমর্থন পেয়ে মাউন্টব্যাটেনের পক্ষে কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেল। হাইকম্যাণ্ডের অবশিষ্ট সদস্যদের বশে আনতে একটুও কালক্ষেপ করলেন না তিনি। তারাও ওই দুজন নেতার মত শিরোধার্য করে নিলেন। অতঃপর কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ডের নির্দেশে বড়লাটবাহাদুর মাউন্টব্যাটেনের কাছে গিয়ে নেহরু ঘোষণা করলেন, 'কংগ্রেস দল একনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ভারতই চেয়ে এসেছে এতকাল,' তবে দেশভাগের সিদ্ধান্তও তারা মেনে নিতে প্রস্তুত, যদি একই সংগে পাঞ্জাব ও বাংলাকেও ভাগ করা হয়। এতকাল পথ চলে যে বৃদ্ধ মানুষটি সাফল্যের সিংহদ্বার পর্যন্ত এদের পৌঁছে দিলেন, তিনি প'ড়ে রইলেন একা তাঁর ভাঙা স্বপ্ন আর জীর্ণ জয়গৌরব নিয়ে।

www.pathagar.com

পরদিন অর্থাৎ ২রা মে। ইয়র্ক এম্ ডব্লু ১০২ নামে বড়লাটবাহাদুরের বিশেষ বিমানটি পালাম বিমানবন্দরে অবতরণ করার ঠিক চল্লিশ দিন পরের কথা। তখন সন্ধ্যে ছ'টা। ওই একই পালাম বিমানবন্দর থেকে লণ্ডনের উদ্দেশে যাত্রা করলো ইয়র্ক এম্ ডব্লু ১০২ বিমান। সেদিন এই বিমানের একমাত্র উল্লেখযোগ্য আরোহী হলেন বড়লাট মাউন্টব্যাটেনের চীফ্ অব স্টাফ লর্ড ইস্মে। তিনি চলেছেন হিজ্ ম্যাজেস্টিস গভর্নমেণ্টের কাছে তাঁর তৈরি ভারত ভাগের খসড়া নকশাটা নিবেদন করতে।

বলাবাহুল্য ভারত ভাগের এই খসড়া নকশাটা তৈরি হবার সংগে সংগেই মাউন্টব্যাটেনের সব আশা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত জিন্নার না-ছোড় মর্জির কাছে হার মানতে হলো তাঁকে। অবশ্য একটা প্রধান ব্যাপার তাঁর নজর এড়িয়ে গিয়েছিল। এই সাজানো অংকের প্রধান উপলক্ষ্য সেটাই। জিন্নার অসুস্থতা। মাউন্টব্যাটেন জানেন যে জীবনের বাকী দিনগুলোয় তাঁকে আপসোস করতে হবে এর জন্যে। কারণ জিন্না নামক বাধাটি তিনি টপকাতে পারেনি। এই একটা হতাশাই তাঁর আপাত সফল জীবনের গায়ে লজ্জার কালি ঢেলে দিল। তিনি জানেন যে ভারতভাগের একমাত্র স্থপতি হিসেবে ইতিহাসে তিনি ধিকৃত হবেন। এটা যে তাঁর জীবনের কতবড় মানসিক যন্ত্রণা তার একটা আঁচ পাওয়া যায় যদি লর্ড ইস্মের হাতে পাঠানো এ্যাট্লি সরকারের কাছে তাঁর পঞ্চম ব্যক্তিগত রিপোর্টটা খুললে দেখা যায়। সেই গোপন প্রতিবেদনে মাউন্টব্যাটেন লিখেছিলেন. 'এটা নিছক পাগলামি' এবং 'অন্য কেউ আমায় কখনো রাজী করাতে পারতো না যদি সারা দেশের প্রত্যেকটি মানুষ অমন উগ্র সাম্প্রদায়িক না হ'ত ও অন্য পথ খোলা থাকতো।' রিপোর্টের শেষে লিখলেন, 'বিশ্বের চোখে এই উন্মাদ আচরণের দায়টা ভারতীয় নেতাদেরও সমানভাবে ভাগ করে নিতে হবে, কারণ যে কাণ্ডজ্ঞানহীন ক্ষ্যাপামি তারা করলো, তার জন্যে একদিন না একদিন তাদের পশ্চাত্তাপ করতেই হবে।'

www.pathagar.com

একটা ছোট্ট দামী শহর

সিমলা, ১৯৪৭, মে মাস

লুই মাউন্টব্যাটেনের এখন আর বাতানুকূল ঘরের দরকার হচ্ছে না। স্টাডি রুমের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চাইলেই দেহমন জুড়িয়ে যাচ্ছে। চোখের সামনেই ঝকমক করছে তুষারমণ্ডিত সুমহান হিমালয় আর তার গিরিশৃঙ্গগুলো। পৃথিবীর এই উচ্চতম তুষারপ্রাচীর যেন তিব্বত আর চীনদেশ থেকে ভারতকে আড়াল করেছে। জানলা দিয়ে মুগ্ধ চোখে হিমালয়ের এই মহান বিস্ময়কর রূপে দেখতে দেখতে মাউন্টব্যাটেনের মন যেন উধাও হয়ে গেল ওই পাহাড়ের রাজ্যে। এখন আর নির্দয়, শুকনো, রোদে ঝলসান সমতলের কথা মনে পড়ছে না তাঁর। এই সবুজের গভীরে যেন অবগাহন ডুব দিয়েছে তাঁর চোখের পীড়িত দৃষ্টি। যে দিকে তাকাও শুধু সবুজ আর সবুজ। মনে হয় সবুজের বান ডেকেছে এই ছোট্ট জায়গাটায়। তাঁর ঘরের সামনের লন্‌টা দেখে মনে হয় যেন মখমলের মধ্যে রাখা একটা সবুজ পান্না। লম্বা লম্বা দেবদারু গাছগুলো সবুজ পাতার ঘোমটা পরে আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রকৃতি যেন নিপুণ মালিনীর মতন পাহাড়ের গায়ে সবুজ ফার্ন গাছের কুঞ্জ বানিয়ে রেখেছে। কয়েক সপ্তাহ ধরে ক্রমাগত পরিশ্রম করে দেহমন অবসাদে ডুবে গিয়েছিল মাউন্টব্যাটেনের। তাই প্রথম সুযোগেই পূর্ববর্তীদের তৈরি করা ট্র্যাডিশন বজায় রেখে সিমলার অবসর কাটাতে চলে এসেছেন। লর্ড ইস্‌মেকে লণ্ডনের দিকে রওনা করিয়েই দিল্লি ছেড়েছেন মাউন্টব্যাটেন এবং এসে পৌঁছেছেন পাহাড়তলির এই ছোট্ট শৈলশহরে।

ছোট্ট এই শৈলশহরটা যেন ইংরেজের হাতের তৈরি একটা বিলিতি পণ্য। বস্তুত, সিমলায় সারা গা জুড়েই ভুরভুর করছে এই বিলিতি গন্ধ। বিগত একশ' বছর ধরে বছরে পাঁচ মাস ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী হিসেবে সিমলার খ্যাতি প্রতিপত্তি। ৭৩০০ ফুট উঁচুতে পাহাড়ের কোলের মধ্যে নিরিবিলি পরিবেশে এই শৈলশহর অবস্থিত। বছরের পাঁচ মাস এখান থেকেই প্রশাসন চালায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক। তবে শুধু ভারত সাম্রাজ্যই নয়, রেড্ সী থেকে শুরু করে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের তাঁবেদার দেশগুলোর ওপর নেকনজর দেবার কাজটাও এই ক'টা মাস এখান থেকে করা হয়। ফলে বছরের এই ক'টা মাস ছোট সংস্করণের এই সাসেক্স হ্যামলেটটির রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক। তখন কর্মব্যস্ত হয়ে ওঠে এর নীলসাদা থামওলা আটকোণা ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ড, এখানকার খেলার ময়দান, সযত্নবিন্যস্ত একাধিক মনোরম বাগান। শহরের মধ্যে ক্রাইস্ট চার্চ গির্জার যে ঘণ্টাঘর (বেলফ্রি) আছে, তার ঘণ্টাগুলো নাকি তৈরি হয়েছিল শিখযুদ্ধের সময় বাজেয়াপ্ত করা কামানের পিতল দিয়ে। খ্রীস্টধর্মের বলিষ্ঠ ভিক্টোরীয়্যান ধারা বজায় রাখতেই এই ব্যবস্থা। সমুদ্র থেকে প্রায় হাজার মাইল দূরবর্তী এই শৈলশহরে পৌঁছবার পথ হ'ল ন্যারো গেজ রেলপথ। তবে ক্লান্তিকর একঘেয়ে দীর্ঘ মোটরপথেও এখানে পৌঁছানো যায়। আর একবার পৌঁছলেই সব ক্লান্তি আর

www.pathagar.com

অবসাদের শেষ। তখন ফেলে আসা ওই রুক্ষ, তপ্ত সমতল ভূখণ্ডে থিকথিক করা মানুষের ভিড় থেকে অনেক উঁচুতে, যেন আকাশের গায়ে হেলান দেওয়া এই শৈলশহরটির দিকে সমীহ করে তাকাতে হয়। মনে হয়, কি নিবিড় সবুজ, কেমন স্নিগ্ধ শীতল এর পরিবেশ।

প্রতি বছর এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি থেকে যখন গ্রীষ্মঋতুর শুরু হয়, যখন তাপে গরম হয়ে ওঠে বাতাস, ঠিক তখনই শুরু হয় রাজধানী বদলের তোড়জোড়। বড়লাটের সাদাহলুদ রঙের স্পেশ্যাল ট্রেন ভোঁ বাজিয়ে সবাইকে জানান দিয়ে চলতে শুরু করে সিমলার দিকে। সঙ্গে চলে এক বিরাট অনুগত বাহিনী। এদের কলরবেই আড়মোড়া ভেঙে শীতঘুম থেকে জেগে উঠবে সিমলা। দেখতে দেখতে সারা শহর হয়ে উঠবে প্রাণচঞ্চল। বাস্তবিক, এক বৃহৎ ব্যাপার এই পালাবদল। শুধু প্রশাসনের লোকজনই নয়, পিছনে পিছনে আসবে নানা পেশার মানুষজন। বড়লাটবাহাদুরের স্পেশ্যাল দেহরক্ষী, তাঁর ব্যক্তিগত সচিব, এ.ডি.সি., সামরিক বাহিনীর প্রধান, বিদেশী রাষ্ট্রদূত, আই.সি.এস. আমলা ইত্যাদি। এঁরা যেমন আসবে তেমনি দলবদ্ধভাবে আসবে দরজি, ক্ষৌরকার, চর্মকার, সেকরা, শুঁড়িখানার মালিক, মেমসাহেবদের লটবহর বহনকারী অগণিত চাকরবাকর, পেয়াদা, খানসামা এবং দুর্বিনীত মিসিবাবারা। ১৯০৩ সাল পর্যন্ত ন্যারো গেজ্ রেলপথ চালু ছিল মোট বিয়াল্লিশ মাইল অর্থাৎ কালকা শহর পর্যন্ত। সেখান থেকে এই বিরাট সেবকবাহিনীকে দুঘোড়ার টঙ্গাগাড়িতে চড়ে আট ঘণ্টার চড়াই ভেঙে সিমলায় পেঁছতে হ'ত। কিছু লটবহর চড়ানো হ'ত বলদগাড়িতে, কিছু যেত মানুষ নামক ঘোড়ার পিঠে। সে এক অভিনব দৃশ্য। কুলী নামক ভারবাহী মানুষের লম্বা লাইন পিঠ বাঁকিয়ে বোঝা নিয়ে চড়াইপথে পাহাড়ে উঠছে। তারা বয়ে নিয়ে চলেছে বড় বড় পেটী। তাদের কোনটায় ভরা আছে মাছ, মাংস, কোনটায় বা বিভিন্ন বিলিতি পানীয়। শৈলশহর সিমলার ভূরিভোজের আসরে খাদ্য-পানীয় যোগানটা নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্যেই এত সব আয়োজন। মোটকথা শৈলবাসের সীজন্‌টায় খানাপিনার ব্যাপারে কোন কার্পণ্যই করা হত না এবং পাঁচ মাস সিমলাবাস এদের কাছে এমন প্রীতিকর আর উন্মাদক ছিল যে তার তুলনা সারা ভারতে নেই।

'কুলী' নামক এই ভারবাহী জীবটির তখন বড়ই আদর ছিল শৈলশহর সিমলায়। কারণ, ঘোড়ায় টানা ল্যান্ডো গাড়ির খট্‌খট্ শব্দ বা মোটরগাড়ির ইঞ্জিনের ঘড়ঘড় আর্তনাদ, এর কোনটাই সিমলাবাসীর মনঃপূত হ'ত না তখন। তাদের নাকি ভারী আকুলতা ছিল মানুষের হালকা, লঘু পায়ের শব্দের ওপর। শুকনো ঝরাপাতার মর্মরধ্বনির মতন নাকি ভারী উপাদেয় এই 'কুলী'দের থপথাপ পায়ের শব্দ। তা সে যাই হ'ক, সিমলা শহরের নিরুপদ্রব শান্ত জীবনে তখন মাত্র তিনখানা ঘোড়ায় টানা গাড়ি চলতো। অবশ্য পরের যুগে ঘোড়ায় টানা ল্যান্ডো গাড়ির জায়গায় মোটর গাড়ির প্রচলন হয়। মোটকথা, এই তিনখানা ছাড়া অন্য একখানা গাড়িও সিমলা শহরের রাস্তায় তখন চলতো না। এই তিনখানার মধ্যে একখানা ছিল বড়লাটের ব্যবহারের গাড়ি, দ্বিতীয়টা ছিল সামরিক বাহিনীর প্রধান অর্থাৎ কম্যান্ডার-ইন্-চীফের গাড়ি এবং শেষেরটা ছিল পাঞ্জাবের গভর্নরের ব্যবহারের গাড়ি। স্থানীয় মানুষ ঠাট্টা করে বলতো যে স্বয়ং ঈশ্বরকেও গাড়ির মালিক হবার জন্যে আবেদন করতে হয়েছিল। কিন্তু প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সরকার

www.pathagar.com

খোদার ওপর খোদকারি করে না-মঞ্জুর করে ঈশ্বরের আবেদন। ফলে সিমলার রাস্তায় গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়াবার সাধ ঈশ্বরেরও মেটে নি। এদেশে যদ্দিন ব্রিটিশ-রাজ কায়েম ছিল, তদ্দিন এই ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। তখন সিমলার একমাত্র জনতা গাড়ি ছিল দুচাকার রিক্‌শ্। সেটাই ছিল সাধারণ নাগরিকের একমাত্র যানবাহন। তবে সাধারণভাবে এই সব রিক্‌শগাড়ি বেশ বড়সড় হ'ত যাতে আয়েশ করে বসা যায়। সাধারণত যেমনটি ভারতের অন্যত্র দেখা যায়, তেমন ক্ষীণতনু আঁটসাঁট গাড়ি নয় যাতে চড়লে পাঁজরার হাড়ে ধাক্কা খেতে হয়। বলাবাহুল্য, সিমলার উঁচুনিচু রাস্তায় টানবার জন্যে চারজন 'কুলী' নামক বাহকের দরকার হ'ত তখন। চারজন গাড়ি চালাতো আর গাড়ির সঙ্গে ছুটতো আর একজন কুলী। সে ছিল এদের 'বদলি' পঞ্চম কুলী।

তখনকার আদত অনুযায়ী বাহকদের শ্রীচরণে কোন পাদুকা থাকতো না। তবে পাদমূল নগ্ন হলেও অন্য ভাবে অভাব যথাসাধ্য পুষিয়ে দেওয়া হ'ত। নাকের বদলে নরুনের মতন, বাহকদের সর্বাঙ্গ মুড়ে দেওয়া হ'ত রঙিন পোশাকে। সেই সব চটকদার বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে সিমলার রাস্তায় রিক্‌শ টানবার জন্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা হ'ত। লাল রঙের উর্দি পরার একমাত্র অধিকার ছিল বড়লাটের খাস বাহকদের। একজন স্কটল্যাণ্ডবাসীর খাস কুলীর পোশাক ছিল ঘাগরা। অন্য একজন সিমলাবাসীর অনুগ্রহপুষ্ট বাহকরা সকাল সন্ধ্যায় দুপ্রস্থ পোশাক পরতো। বাহকরা সবাই তাদের জামার বুকে মালিকের কুলশীলের সাঙ্কেতিক পরিচয় এঁটে বড়াই করে গাড়ি টানতো। সেকালে সিমলা শহরের প্রায় কুলীরই ক্ষয়কাশ রোগ ছিল।

সাধারণত এইসব খানাপিনার আসর হ'ত রাজসিক। ভোজসভায় নিমন্ত্রিত হয়ে যারা আসতো তারাও কৃতার্থ হ'ত। তবে সবচেয়ে জমজমাট ভোজসভাটি বসতো ভাইস-রীগ্যাল লজে। খোদ বড়লাট তত্ত্বাবধান করতেন এই ভোজসভা। শহরের যারা সেরা অভিজাত, তাদের কুলীরা পেত লাল ফিতের তৈরি গোলাপফুল। গাড়ির গায়ে লাল গোলাপের এই নির্দেশিকা সেঁটে সরাসরি চলে যাওয়া যেত বল নাচের ঘর আর পার্টির জায়গা পর্যন্ত। বড়লাটের নিজস্ব প্রবেশপথ দিয়েই লাটভবনের ভিতরে যাবার ছাড়পত্র ছিল তাদের। সাদা গোলাপের মালিকদের জন্যে নির্দিষ্ট থাকতো সাধারণ প্রবেশপথ। তবে রঙ যাই হ'ক, আসল কথা হ'ল এদেশী নেটিভদের এড়িয়ে চলার সুযোগপ্রাপ্তি। সবাই বুঝতো যে বড়লাটের আয়োজিত এই নন্দন সভায় একবার প্রবেশ করলেই নিজেকে পৃথক রাখা যায়। তখন দু-একজন মহারাজা ছাড়া অন্য নেটিভের সঙ্গে গা ঘষাঘষির আতঙ্ক থাকে না। আর যাই হ'ক, সম্পর্কটা যে রাজা-প্রজার। সুতরাং আড়াল ত থাকবেই!

লাটভবনের এই নাচসভার আড়ম্বর যে কী বস্তু সাধারণ মানুষ তার হদিসও মালুম করতে পারে না। এর একটা বিবরণ দিয়েছেন একজন বিদেশিনী। তাঁর মন্তব্য থেকেই বোঝা যায় এই নাচের আসরে যোগ দিতে সবাই কেমন উৎসুক ছিল। 'রাতের অন্ধকারে চড়াই ভেঙে চলেছে রিক্‌শাচালকেরা। নির্মম শীতে খালি পায়ে তারা যাত্রী সমেত গাড়ি টানছে। সার দিয়ে চলেছে গাড়ির লম্বা লাইন। টিমটিম করে জ্বলছে গাড়ির নীচে বাঁধা তেলের কুপি। কোথাও কোন শব্দ নেই। শুধু শোনা যাচ্ছে রিক্‌শওলাদের পায়ের থপ্‌থপ্ শব্দ।'

এইরকম প্রমত্ত সামাজিক জীবনের ছবি পাওয়া যায় আর এক জায়গায়। সেটা

www.pathagar.com

হ'ল সিমলার সিসিল হোটেল। প্রতিদিন রাত আটটা পনেরো মিনিটে একজন উর্দিধারী খানসামা পুরু গালচে পাতা টানা বারান্দা দিয়ে হেঁটে গিয়ে ডিনারের ঘণ্টা বাজাতো। যেমন পি অ্যান্ড ও জাহাজে ডিনারের সময়ে ঘণ্টা বাজিয়ে যাত্রীদের ডাকা হয়, ঠিক তেমনি। ঘণ্টার শব্দ শুনে একে একে অতিথিরা কালো টাই আর সান্ধ্য পোশাক পরে টেবিলে এসে বসতো। টেবিলের ওপর থাকতো দুষ্প্রাপ্য আইরীশ লিনেন। খাদ্যবস্তু পরিবেশিত হ'ত ঝকঝকে রুপার বাসনে কিংবা বহুমূল্য চীনামাটির তৈজসপাত্রে। পানীয় দেওয়া হ'ত পাতলা স্বচ্ছ ফিনফিনে কাঁচের গ্লাসে।

সিমলার যথার্থ মর্মস্থল তার 'ম্যাল', অর্থাৎ সুপ্রশস্ত পর্যটন-পথ। শৈল-পৃষ্ঠের (রিজ্) এক প্রান্ত থেকে শুরু করে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত চলে গেছে এই চওড়া শরণি। পথের গায়ে ময়লার আঁচড়টুকুও পর্যন্ত লেগে নেই। এত মসৃণ আর চকচকে এই পথ যেন মনে হয় লাটসাহেবের ব্যবহার করা নিত্য মার্জিত চীনামাটির বাসন। ম্যালের দুপাশের দোকানগুলো শৌখিন বিলিতি পণ্যে ঠাসা। দোকানপসার, স্টোর্স্, ব্যাংক, সবই ইংরিজি। ম্যালের একদিকের প্রান্তে অবস্থিত ক্রাইস্ট চার্চ ক্যাথিড্রাল। প্রতি রবিবার সকালে নিখুঁত সামরিক পোশাক পরে স্বয়ং কম্যান্ডার-ইন-চীফ দলবল নিয়ে প্রার্থনা সভায় যান। তখন ইংরেজ পুরুষ ও মহিলারা গলায় গলা মিলিয়ে যীশুর ভজনা করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ম্যালের রাস্তায় কোন ভারতীয়কে পথ চলতেও দেওয়া হ'ত না।

এই নিষেধাজ্ঞাটাই সিমলার বিলিতি খানদান। যত্ন করে ইংরেজ তাকে এমনভাবে গড়েছে যেন নেটিভের কলুষ স্পর্শে তার দেহলাবণ্য মলিন না হয়। সুতরাং সমতলের প্রখর তপন তাপ থেকে রেহাই পেতেই যে ঊর্ধ্বশ্বাসে ওরা এই সময়টায় এখানে ছুটে আসে, তা নয়। বছরের এই ক'টা মাস ইংরেজ তার মিইয়ে যাওয়া জাত্যাভিমানটা খোঁচা দিয়ে উদ্ধত করতে এখানে আসে। যে ক'টি বিরল গুণের সমন্বয়ে তারা শ্রেষ্ঠ এবং লক্ষ লক্ষ বাদামী মানুষগুলো থেকে তারা আলাদা, সেই গুণগুলো দানা বাঁধাবার একটা অনুশীলন-ক্ষেত্র হল সিমলা।

তবে মাউন্টব্যাটেন যখন সিমলায় এলেন তখন হায়, ইংরেজের সেই সুদিন আর নেই। পুরনো সিমলার সেই গৌরবগাথা এখন অতীতের স্মৃতি মাত্র। তবুও যাই যাই করেও চলে যেতে গড়িমসি করেছে ব্রিটিশ আভিজাত্য। আস্ফালনটুকু তখনও নিঃশেষ হয়ে যায় নি। তাই ১৯৪৭ সালের মে মাসের গোড়ায় মাউন্টব্যাটেন যখন সিমলায় এলেন, তখন ম্যালের রাস্তায় ভারতীয়কে পথ চলার অধিকার দেওয়া হলেও, জাতীয় পোশাক পরে পথ চলার অধিকার সে তখনও পায় নি।*

---

* স্বাধীনতার পর থেকেই সিমলার চরিত্র যে খুব দ্রুত বদলে যাবে তা টের পাওয়া যাচ্ছিল। সিমলার অতি আদরের 'সমার ক্যাপিটাল' নামকরণ প্রায় বর্জন করলো মানুষ, কারণ এই নামের সঙ্গেই জড়িয়ে ছিল উদ্ধত ঔপনিবেশিকতার দম্ভ। মোটকথা সিমলার গায়ে বিলিতিয়ানার কিছুই প্রায় অবশিষ্ট রইল না ক্লাইমেটটুকু ছাড়া। ১৯৭৩ সালে কথাটা ভারী খেদের সঙ্গে বলেছিলেন সিমলার সিসিল হোটেলের স্বত্বাধিকারী এবং ওবেরয় হোটেলস্ লিমিটেডের চেয়ারম্যান এম. এস. ওবেরয় সাহেব। একজন মেমসাহেব বৃদ্ধা বেঁচে আছেন যিনি কিছু কিছু পুরনো কথা মনে রেখেছেন। সাতাশি বছরের এই বিধবা বৃদ্ধার নাম মিসেস হেন্‌রী পেন্‌মান্টেগু। বিষণ্ণ, অন্ধকার একটা মস্ত বাড়িতে

www.pathagar.com

বিরামহীন বৈঠকের ধকল থেকে মুক্তি পেতে সিমলায় ছুটে এসেছেন বটে মাউন্টব্যাটেন। তবে অবসাদ তাঁকে পুরোপুরি অক্ষম করে দিতে পারে নি। মন-মেজাজ আগের মতই চনমনে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। এ কথা ত ঠিক যে, বছরের পর বছর পার করেও তাঁর পূর্বগামীরা যা করতে পারেন নি, মাত্র ছ'সপ্তাহের মধ্যেই তিনি তা করেছেন। ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটের কাছে যে খসড়া প্রস্তাবটা তিনি পাঠিয়েছেন, সেটা তাঁর সদিচ্ছারই প্রকাশ। অন্তত ভারত থেকে সসম্মানে চলে যাবার একটা হদিস তিনি দিতে পেরেছেন ব্রিটেনকে। সেই সংগে বন্ধমুখ গলি থেকে নিষ্ক্রমনের একটা উপায়ও তিনি ভারতীয় নেতাদের দিয়েছেন।

পাঠকের হয়ত স্মরণ আছে যে, লণ্ডন ছাড়ার আগে এ্যাটলী সরকারের অধিকার থেকে পূর্বানুমতি ছাড়াই পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগের দাবি [প্লেনিপোটেনশ্যারি পাওয়ার] আদায় করে নিয়েছিলেন মাউন্টব্যাটেন। এটা পেয়েছিলেন বলেই খসড়া প্রস্তাবটা লণ্ডনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ভারতীয় নেতাদের মতামত ছাড়াই। অবশ্য এ্যাটলী সরকারকে এটুকু ভরসা তাঁকে দিতে হয়েছে যে তাঁর প্রস্তাবিত দেশভাগের খসড়াটা ভারতীয় নেতারাও বিনা দ্বিধায় মেনে নেবেন।

কিন্তু তাঁর প্রস্তাবিত পার্টিশন প্ল্যান যে ঠিক কী বস্তু তার একটা আঁচ পাওয়া দরকার। বস্তুত, এটা যে তাঁর স্টাডিরুমের সংগোপন আত্মচিন্তার ফল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দুপক্ষের নেতাদের সংগে এ যাবৎ আলোচনার নির্যাসটুকুই তিনি তাঁর গোপন কক্ষের নির্জনতায় নির্মাণ করেছেন। রাজনীতিতে পোড় খাওয়া অভিজ্ঞ নেতাদের সঙ্গে আলোচনার যথাযথ পুনরাবৃত্তি, এই নির্মাণ নয়। আসলে যা তিনি শুনেছেন, দেখেছেন, সেই সব তন্ময় সেন্টিমেন্ট, হৃদ্‌বোধ, আর প্রত্যয়ের দর্পণে একটা নতুন দৃষ্টিপাত বলা যায় একে। সাহসী পদক্ষেপ সন্দেহ নেই, কিন্তু ভারী সতর্ক, সংবেদনশীল। যাতে আত্মবিশ্বাসটা অবিশ্বাসী না হয়ে যায়, যাতে টুকরো সত্যগুলো মেলে ধরার পর জোড়া লাগাতে অসুবিধা না হয়, যাতে পরিপূর্ণভাবে ভারতীয় নেতারা সবটুকু মেনে নেন। বলাবাহুল্য, সেদিন এই আত্মবিশ্বাসটা এত দৃঢ় ছিল যে, সিমলার উদ্দেশে রওনা হবার আগেই মাউন্টব্যাটেন আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে দেন যে, ১৭ই মে তারিখে দিল্লিতে ফিরেই খসড়া প্রস্তাবটা সকলের অবগতির জন্যে পেশ করবেন।

তবে সিমলার এমন প্রাণচঞ্চল পরিবেশ, এর চতুষ্পার্শ্বের অমন ধ্যানী স্তব্ধতা একটা বিপরীত ক্রিয়া করলো মাউন্টব্যাটেনের উপর। সিমলায় পা দিয়েই পরিবেশ যেন তাঁকে আত্মমগ্ন করে তুললো। এক অনিশ্চিত সংশয়-কীট তখন তাঁকে কুরে

একা থাকেন তিনি। এটা তাঁর কাকার তৈরি বাড়ি। ভাইসরয় লর্ড কার্জনের সচিবালয়ে অর্থসচিব ছিলেন তাঁর কাকা। তবে বৃদ্ধা মেমসাহেব একেবারে একা নন। সঙ্গে থাকে ছ'টা কুকুর, পাঁচটা বিড়াল, চারজন চাকর আর ঘর ভর্তি অদ্ভুত নানা স্মরণীয় জিনিস। এই বৃদ্ধা মেমসাহেবটি ছ'টা ভাষায় কথা বলতেন এবং বিকাল চারটের সময় ঘুম থেকে উঠতেন। সূর্যাস্তের পর মোটা করে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বৃদ্ধা যে ঘরটায় গিয়ে ঢুকতেন সেখানে একটা আস্ত মহসামুদ্রিক (ট্রান্স্ ওশীয়্যানিক) রেডিও আছে। তারপর যখন সিমলা শহর ঘুমতো, তখন আড়ি পেতে সারা জগতের কথা শুনতেন ওই রেডিও চালিয়ে। বোধহয় রাত চারটের সময় সিমলা ও তিব্বতের মধ্যে যে একটাই আলো জ্বলতো, সেটা ওই বৃদ্ধারই ঘরের আলো।

www.pathagar.com

কুরে খাচ্ছে। অথচ এমন পশ্চাৎচিন্তায় ব্যাকুল হওয়া ত তাঁর স্বভাব নয় ! তাঁর খসড়া প্রস্তাবটা লন্ডনে পাঠানর পর থেকেই বন্যার মতন তারবার্তা আসতে শুরু করেছে তাঁর কাছে। প্রায় ডুবে যাবার অবস্থা হয়েছে তাঁর। সব ক'টা বার্তাতেই মূল বয়ানের কিছু না কিছু রূপান্তরের প্রস্তাব আছে। অর্থাৎ বস্তুটা অক্ষত রেখে খোলটা বদলানো।

কিন্তু তাঁর মন যে কারণে আতংকগ্রস্ত হয়েছে সেটা আরও গুরুত্বপূর্ণ। ওরা যদি তাঁর খসড়া প্রস্তাবটা মন দিয়ে যাচাই করে তাহলেই বুঝবে যে খসড়ার মধ্যে দুটো নয়, তিনটে পৃথক রাষ্ট্রের প্রস্তাব আছে। মাউন্টব্যাটেনই আগ্রহ করে এই ধারাটি প্ল্যানের মধ্যে ঢুকিয়েছেন। এর ফলে ভারতের যে কোন প্রদেশ তার অধিবাসীর ইচ্ছানুসারে পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে স্বাধীনভাবে থাকতে পারে। এই শর্তটা অন্তর্ভুক্ত করার আসল লক্ষ্যবস্তু হল বংগদেশ। এখানকার সাড়ে ছ'কোটি হিন্দুমুসলমান অধিবাসী যদি ইচ্ছে করে তবে কলকাতাসহ যে কোন স্বয়ম্ভর অংশের দিকে সে ঝুঁকতে পারে।

আশ্চর্য ব্যাপার ! এমন একটা প্রস্তাব মাউন্টব্যাটেন পেলেন কোথা থেকে ? বলতে কি এমন একটা ধারা যে আছে অনেকেই তা জানতো না। ভাবনাটা তাঁর মাথায় ঢুকিয়ে দেয় এমন একজন মানুষ যার পরিচয় পানাসক্ত এবং নাইট ক্লাব প্রেমী রাজনীতিক নেতা হিসেবে। শ্যাম্পেন এবং নাইট ক্লাব প্রেমী এই মানুষটার নাম শহীদ সুরাবর্দী। কলকাতার মুসলিম লীগ পার্টির একজন বিশিষ্ট নেতা সুরাবর্দী। দশমাস আগে এই লোকটাই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের হুমকি দিয়ে সারা বাংলাদেশে রক্তগংগা বইয়েছিল। তবুও সুরাবর্দীর প্রস্তাবটা মাউন্টব্যাটেনের ভাল লেগেছে কারণ, পূর্ব ও পশ্চিম নিয়ে দুই মাথাওলা পাকিস্তান তৈরির যে স্বপ্ন জিন্না দেখেছেন, তার চেয়ে এটা অনেক বাস্তবসম্মত। অন্তত এর ফলে একটা রাষ্ট্র অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে। হঠাৎ বিপন্ন হয়ে যাবে না। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার যে বাংলার কংগ্রেসী হিন্দু নেতারাও এতে সায় দিয়েছে। সুতরাং সকলের স্বার্থেই প্রস্তাবটা নিঃশব্দে মেনে নিয়েছেন মাউন্টব্যাটেন। শুধু তাই নয়, তাঁর ধারণা হয়েছে যে জিন্নাও এতে আপত্তি করবেন না। তবে পাছে ব্যাপারটা বানচাল হয়ে যায় তাই নেহরু এবং প্যাটেলের কাছে ফাঁস করেন নি প্রস্তাবটা। আর এই ভুলটাই তাঁকে এখন দারুণ আতংকিত করে তুলেছে। এখন তাঁর মনে হচ্ছে যে রাজধানী কলকাতা আর তার ব্যস্ত নৌবন্দর এমনভাবে হাতছাড়া করতে কি রাজী হবেন ওঁরা ? শুধু ত বন্দরই নয়, কলকাতার আশপাশে ঘিরে থাকা অতগুলো সুতোর কলও হাতছাড়া হয়ে যাবে এই সংগে। কে না জানে যে সুতোকলের মালিক এইসব বড় বড় শিল্পপতিরাই কংগ্রেসের আর্থিক সহায়। সুতরাং কংগ্রেসের নেতারা যদি এখন বেঁকে বসেন তবে এতদিন ধরে লন্ডনকে যে ভরসা তিনি দিয়ে এসেছেন সেটা মিথ্যে হয়ে যাবে। লন্ডনের এ্যাটলী সরকার জানবে যে মাউন্টব্যাটেন ধাপ্পাবাজ, ভন্ড। তখন শুধু ভারত বা ব্রিটেন নয়, সারা দুনিয়া তাঁর দিকে আঙুল তুলে বলবে 'আ ব্লাডি ফুল !'

এই সময় হঠাৎই তাঁর মনে যেন নব প্রেরণার উদ্ভাস হ'ল। তাঁর মনে হ'ল মাত্র একজনই ভারতীয় নেতা আছেন যার সংগে গোপনে আলোচনা করে তিনি কিছুটা আশ্বস্ত হতে পারেন। ইতিমধ্যেই সহকর্মীদের প্রায় স্তম্ভিত করে মানুষটিকে তিনি একদিনের ছুটি কাটাতে নেমন্তন্ন করেছেন সিমলায়। মানুষটি অন্য কেউ

www.pathagar.com

নন, স্বয়ং জওহরলাল নেহরু। রুচিবান, সংস্কৃতিসম্পন্ন যে মানুষটির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য এই উপ-মহাদেশে তাঁর একমাত্র নির্ভরতা। তাঁর অনেক নীতির উদার পৃষ্ঠপোষক তিনি এবং আগামী দিনে ব্রিটেন এবং পুরনো ভারত সাম্রাজ্যের মধ্যে হার্দ্য সম্পর্ক গড়ে তুলতে যাঁর সহায়তা ছাড়া এক পা চলাও সম্ভব নয়।

মাউন্টব্যাটেন আরও লক্ষ্য করেছেন যে তাঁর গৃহিণীর সঙ্গেও রীতিমত প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে জওহরলালের। একথা অবশ্য ঠিক যে, সংসারে এডুইনার মতন প্রতিভাময়ী রমণীরা সত্যিই বিরল এবং ১৯৪৭এর ভারতবর্ষে ত তেমন মহিলার সাক্ষাৎ দৈবাৎ মিলতো। বলতে কি, তিনি ছাড়া আর কেউ-ই বোধহয় নেহরুকে তাঁর হতাশা আর সংশয়ের খোলস ভেঙে বের করতে পারতেন না। এই অভিজাত মহিলাই তাঁর প্রতিভার দীপ্তি দিয়ে, তাঁর সান্নিধ্যের উষ্ণতা দিয়ে উজ্জ্বল করেছেন নেহরুকে এবং তাঁকে স্বমহিমায় ভাস্বর করেছেন। তাই প্রায়ই যখন লাটপ্রাসাদের মোগল গার্ডেনে চায়ের কাপ নিয়ে তাঁরা আলাপ করতেন, কিংবা যখন বড়লাটবাহাদুরের খাস পুকুরে দুজনে সাঁতার কাটতেন তখন তাঁর আন্তরিক সান্নিধ্য দিয়ে এডুইনা যেন নেহরুকে অন্ধকার হতাশা থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছেন। শুধু তাই নয়, এই বন্ধুত্বের জন্যে অনেক বিরূপ অবস্থা কেটে গেছে এবং নিপুণভাবে এডুইনা তাঁর স্বামীর চেষ্টাগুলো ফলপ্রসূ করেছেন।

সুতরাং মাউন্টব্যাটেন সঙ্কল্প করলেন যে, তাঁর সহজাত প্রবৃত্তির নির্দেশ অনুসারে কাজ করবেন। ফলে তাঁর কার্যালয়ের সব সহকর্মীদের একদিন তিনি তাঁর স্টাডি রুমে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর পরবর্তী সঙ্কল্পের কথাটা বুঝিয়ে দিলেন। সবাই শুনে থ। ভয়ে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেছে সবাই। জিন্নাকে না দেখিয়ে, লন্ডন থেকে অনুমোদিত হয়ে আসা পার্টিশন প্ল্যানটা যদি নেহরুকে দেখানো হয়, তাহলে মুসলিম নেতার সঙ্গে তঞ্চকতা করা হবে। এমনকি জিন্না যখন ব্যাপারটা জানতে পারবেন তখন মাউন্টব্যাটেনের খাতির প্রতিপত্তি সব ধুলোয় গড়াগড়ি যাবে। দেশময় তাঁর নামে কুৎসা ছড়িয়ে দেবে মুসলিম লীগ নেতা। সুতরাং মাউন্টব্যাটেন যেন এমনটি না করেন।

তাদের যুক্তির কথাগুলো মন দিয়ে শুনলেন মাউন্টব্যাটেন। টেবিলের ওপর আঙুলের ডগা দিয়ে টোকা মারছেন আর তন্ময় হয়ে ভাবছেন। অনেকক্ষণ এই অবস্থায় কাটলো। শেষমেশ মনস্থির করলেন মাউন্টব্যাটেন। মন থেকে সব সংশয় ঝেড়ে ফেলে বললেন, 'আপনাদের সব কথা শুনলাম। আপনাদের যুক্তি অকাট্য। কিন্তু আমারও গোঁ যে এটা আমি নেহরুকে দেখাবোই। হয়ত এটা আমার সংস্কার কিন্তু এটাই মেনে চলবো।'*

---

* এবারই প্রথম নয়। এর আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে যখন সহকর্মীদের সমবেত পরামর্শ উপেক্ষা করে নিজের ঝোঁকে কাজ করেছেন মাউণ্টব্যাটেন। ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের একটা ঘটনার কথা বলি। মাউণ্টব্যাটেন চলেছেন বিস্কে উপসাগর দিয়ে জিব্রলটার বন্দরের দিকে। তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন চারখানা ছোট যুদ্ধ জাহাজ (ফ্লোটিলা) 'কে' ডেস্ট্রয়ারের। এমন সময় ফার্স্ট সী লর্ডের কাছ থেকে জরুরী তারবার্তা পেলেন মাউণ্টব্যাটেন। তাঁকে জানানো হল যে, দুখানা জার্মান যুদ্ধ-জাহাজকে (Scharnhorst ও Gneisenau) সাঁ-নাজারের দিকে আসতে দেখা গেছে, তাদের যেন গতিরোধ করে আটক করা হয়। মাউণ্টব্যাটেন তারবার্তা পড়লেন কিন্তু যা করতে আদেশ দিলেন তা

www.pathagar.com

সেই রাত্রেই নেহরুকে তাঁর স্টাডি রুমে আমন্ত্রণ করলেন মাউন্টব্যাটেন। দুজনের হাতেই পানীয়র গেলাস। লণ্ডন থেকে সংশোধিত হয়ে আসা পার্টিশন প্ল্যানটা টেবিলের টানা থেকে বের করে নেহরুর হাতে দিলেন মাউন্টব্যাটেন। নেহরু কিছুটা অবাক। 'এটা কি?' মাউন্টব্যাটেন মুচকি হেসে বললেন, 'আপনার বেডরুমে নিয়ে গিয়ে এটা পড়ুন। কাল মতামত দেবেন।' হ্যাঁ, প্রতিক্রিয়া একটা হবেই। শুধু ওঁর একার নয়, কংগ্রেস দলের মন জানাজানি হয়ে যাবে। দেখাই যাক না কেমন হয় ব্যাপারটা! মাউন্টব্যাটেনের দিকে তখনও স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে আছেন নেহরু। তবে তিনি খুশী। দারুণ খুশী এবং বোধহয় কৃতার্থ। হাত বাড়িয়ে খসড়া প্ল্যানটা নিলেন যেন হাতে চাঁদ পেলেন।

এই ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরের কথা। মানসিক চাপ হালকা করতে তাঁর পারিবারিক কুলুজিনামাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন মাউন্টব্যাটেন। এটাই তাঁর নিয়মিত অনুশীলন। এইভাবেই মনোযোগ বিনিময় করে তিনি চিত্তবিনোদন করেন। কিন্তু অন্য ঘরে আর একজনের মানসিক উদ্বেগ ক্ষণে ক্ষণে বেড়েই চলছিল। মানুষটি স্বয়ং জওহরলাল নেহরু। খসড়া প্রস্তাবের একটা করে পাতা দেখছেন আর আতঙ্কে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছেন তিনি। এ কি বীভৎস প্ল্যান? প্ল্যানটা যেন আদ্যন্ত প্রতারণা। যে মূর্তিটা বেরিয়ে এসেছে তা মোটেই অখণ্ড ভারতের মূর্তি নয়। প্রায় এক ডজন ছোট ছোট রাষ্ট্রের চিত্রপট এই প্ল্যান। বাংলার জন্যে যে দরজাটা হাট করে খুলে দিয়েছেন মাউন্টব্যাটেন, সেখান দিয়ে অবিরাম ধারায় রক্তক্ষরণ হয়ে যাবে। ভারতের শ্বাসযন্ত্র হল বাংলা। বাংলার উপর অস্ত্রাঘাতের ফলে শুধু কলকাতা বন্দরই নয়, সেই সঙ্গে হাতছাড়া হয়ে যাবে অসংখ্য কলকারখানা আর বিস্তীর্ণ খনিঅঞ্চল। সবচেয়ে বেদনাদায়ক হল যে কাশ্মীর আর ভারতের অংগীভূত থাকবে না। স্বাধীন কাশ্মীরের রাজা হয়ে বসবে ওই যথেচ্ছাচারী প্রজাপীড়ক লোকটা যাকে তিনি মনেপ্রাণে অপছন্দ করেন। আরও আছে। ভারতবর্ষের শরীরভাগের উদরস্থল হল বিশাল হায়দ্রাবাদ অঞ্চল। স্বশাসিত এই অঞ্চলটা হয়ে উঠবে মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল। যাকে কোনদিনই বরদাস্ত করা

অস্থিরকম। সমুদ্রে তখন সবে সূর্যাস্ত হয়েছে। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু কালো অন্ধকার। মাউন্টব্যাটেনের নির্দেশ পেয়ে সহকর্মীরা শশব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন তাঁর কাছে। কি ব্যাপার? সাঁ-নাজারের দিকে না গিয়ে ব্রেস্ট বন্দরের দিকে যেতে বলা হচ্ছে কেন? মাউন্টব্যাটেন কি তারবার্তার নির্দেশ মানছেন না? 'না, মানছি না।' কেন মানছেন না সেকথাও বুঝিয়ে বললেন সবাইকে। সূর্যাস্ত হয়ে যাবার পর বিমান থেকে নজরদারির অবকাশ থাকে না কারণ সমুদ্র অন্ধকারে ডুবে যায়। অনুমান করা যায় যে জার্মান যুদ্ধজাহাজ দুটোর যিনি এ্যাডমিরাল তিনি বিচক্ষণ নৌ-সেনাধ্যক্ষ। সুতরাং সাঁ-নাজারের দিকে তিনি যাবেন না। তাঁর আসল লক্ষ্য ব্রেস্ট বন্দর। সেটাই ওঁর গন্তব্যস্থান। অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে গতিপথ বদল করে তিনি সে দিকেই যাবেন। তা সেবারও প্রমাণিত হয় যে মাউন্টব্যাটেনের মানসিক অনুমান নির্ভুল। বস্তুত, অন্ধকারের মধ্যে ওই যুদ্ধজাহাজ দুখানা ব্রেস্ট বন্দরের দিকেই ঝড়ের বেগে তখন ছুটে যাচ্ছিল। তবে দুর্ভাগ্য মাউন্টব্যাটেনের। ৩২ নট্ বেগে ছুটে গিয়েও জার্মান জাহাজ দুখানার গতিরোধ করতে পারেন নি তিনি। ফ্লোটিলা নিয়ে তাঁর আসার আগেই জার্মান জাহাজ দুখানা নিরাপদে ফরাসী বন্দরে (ব্রেস্ট) পৌছে যায়।

www.pathagar.com

যাবে না। তাছাড়া, অন্তত আরও আধডজন নেটিভ স্টেট স্বাধীনতা স্বপ্নে বিভোর হয়ে অনবরত দাবিদাওয়ার দৌরাত্ম্যে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে তাঁকে। মোটকথা, সারা প্ল্যানের মধ্যে ভারতকে খণ্ডখণ্ডভাবে ভাগ করার প্রবৃত্তিটাকে যেন উস্‌কে দেওয়া হয়েছে। জাত, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি সবকিছুই পৃথক অস্তিত্বর দাবিতে নিত্য কলহ দ্বন্দ্বে দীর্ণ হবে। ছোট ছোট স্বার্থ নিয়ে সংঘাতে ক্ষয় হবে ওদের শক্তি। আর শক্তিহীন, দুর্বল কিছু রাষ্ট্রের কর্ণধার হয়ে দেশহিতৈষণার বেগার ঠেলবেন নেহরু। ছিঃ ছিঃ, যাবার বেলায় এ কি ছিনিমিনি খেলায় মেতে উঠেছে ব্রিটেন! তিনশ' বছর ধরে 'ডিভাইড্ অ্যান্ড রুল' নিয়মে ওরা প্রভুত্ব বজায় রেখেছিল। এখন 'ফ্র্যাগ্‌মেন্ট অ্যান্ড কুইট', অর্থাৎ ভেঙেচুরে পোড়ামাটি করে দেশ থেকে চলে যেতে চাইছে ওরা। কিন্তু অসম্ভব। এমনটি কিছুতেই হতে দেবেন না তিনি। রাগে তখন থরথর করে কাঁপছেন নেহরু। মুখখানা কাগজের মতন সাদা হয়ে গেছে। হাতে খসড়া প্ল্যানটা নিয়ে কিছুক্ষণ ঘরময় দাপাদাপি করে বেড়ালেন। তারপর রাগে, ক্ষোভে, আক্রোশে দড়াম করে দরজা খুলে কৃষ্ণমেননের শোবার ঘরে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লেন নেহরু। ভাগ্যিস, চিরবিশ্বস্ত এই মানুষটিকে সঙ্গে করে সিমলায় এসেছিলেন! অমন উদ্ভ্রান্তের মতন নেহরুকে ঘরে ঢুকতে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন কৃষ্ণমেনন। ব্যাপার কি? হাতের পার্টিশন প্ল্যানের খসড়াটা তাঁর দিকে সজোরে ছুঁড়ে দিয়ে প্রায় চীৎকার করে উঠলেন নেহরু। 'সব শেষ!'

মাউন্টব্যাটেন যে প্রতিক্রিয়া চাইছিলেন পরদিন সকালেই নেহরুর একটা চিঠি মারফত তা পেয়ে গেলেন। নেহরুর প্রতিক্রিয়া রীতিমত উদ্ধত। আত্মপ্রত্যয়ী মাউন্টব্যাটেনের কাছেও ব্যাপারটা যেন প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সামিল। অপ্রত্যাশিত এই আঘাত প্রায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিয়েছে তাঁকে। তাঁর মনে হচ্ছিল যে, ছ'সপ্তাহ ধরে এত যত্ন করে যে তাসের বাড়ি বানিয়েছিলেন এক ধাক্কায় তা ভেঙে গেল। নেহরুর চিঠির ভাষা খুবই কঠিন। তিনি লিখেছেন যে খসড়া প্রস্তাব পড়তে পড়তে তাঁর মনে হয়েছে যেন প্রায় অংক কষেই প্ল্যানটা তৈরী করা হয়েছে। যাতে যাবার আগে 'দেশটাকে ভেঙেচুরে এলোমেলো' করে দেওয়া যায়। তাঁর আরও মনে হয়েছে যে কংগ্রেস দলের কাছেও প্ল্যানটা 'অপছন্দের হবে এবং খুবই 'কটু' সমালোচনা হবে এর।

নেহরুর চিঠিখানা বারকয়েক পড়লেন মাউন্টব্যাটেন। ইতিমধ্যেই তাঁর অমন সুঠাম আত্মবিশ্বাস আলগা হয়ে কখন যে চোরাবালির গর্ভে নিমজ্জিত হয়েছে তা তিনি বোঝেন নি। এখন হঠাৎই আবিষ্কার করলেন কেমন যেন ফাঁপা হয়ে গেছেন তিনি। যে মানুষটা সদম্ভে বলে এসেছে যে দশদিনের মধ্যেই সংকট মোচনের সমাধান ঘোষণা করবেন, সেই মানুষটারই আত্মম্ভরিতার ফানুস এক মুহূর্তে চুপসে গেল। হয়ত আজই ইংল্যান্ডের এ্যাটলী ক্যাবিনেটে তাঁর প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। তিনি এ্যাটলী সরকারকে আশ্বস্ত করেছেন যে ভারতের সমর্থন আদায় করে দেবেনই। কিন্তু কোথা থেকে কি হয়ে গেল। এখন তাঁর মনে হচ্ছে যারা মেনে নিলেই সব গোল চুকে যায় সেই কংগ্রেস দলের কাছে প্রস্তাবটা আদৌ উপাদেয় না হতেও পারে।

হয়ত ছিদ্রান্বেষীরা মাউন্টব্যাটেনকেই দায়ী করবে এর জন্যে। দায়ী করবে তাঁর উত্তুঙ্গ আত্মম্ভরিতাকে। কিন্তু ব্যাপারটা যাই হ'ক কৃতকর্মের জন্যে বসে বসে খেদ করার মানুষ মাউন্টব্যাটেন নন। নেহরুর প্রতিক্রিয়ায় হতাশ না হয়ে তিনি বরং

www.pathagar.com

নিজেকে ধন্যবাদ দিলেন। নেহরুর কটু প্রতিক্রিয়া আগাম জানতে পেরে ভালই হয়েছে তাঁর। ভাগ্যক্রমে প্ল্যানটা তাঁকে দেখিয়েছিলেন বলেই আজ তিনি ধাক্কাটা সামলে উঠতে পারবেন। যাই হ'ক, মাউন্টব্যাটেনের পীড়াপীড়িতে আরও একটা রাত সিমলায় থাকতে রাজী হলেন নেহরু। স্থির হল যে এর মধ্যেই খসড়া প্ল্যানের যথোচিত সংস্কার করে সেটাকে কংগ্রেস দলের গ্রহণযোগ্য করার কাজ শেষ করে ফেলবেন মাউন্টব্যাটেন। তবে যে ফাঁকগুলো নেহরুকে ব্যথিত করেছে সেগুলো অবশ্যই ভরাট করতে হবে। নতুন খসড়ায় প্রদেশগুলো বা দিশি রাজ্যগুলোর কাছে বাছাইয়ের একটাই বিকল্প থাকবে—হয় ভারত নয়ত পাকিস্তান।

বঙ্গদেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন তখন ধূলিসাৎ হয়েছে। তবে মাউন্টব্যাটেন এখনও নিঃসন্দেহ যে জিন্নার দুই মাথা বিশিষ্ট কল্পলোকের মুসলিম রাষ্ট্র কিছুতেই টিকে থাকবে না। তাঁর এই আশঙ্কার কথাটা পরবর্তী বড়লাট চক্রবর্তী রাজা-গোপালাচারীর কাছে আগেই প্রকাশ করেছিলেন মাউন্টব্যাটেন। মাউন্টব্যাটেন বলেছিলেন যে, পঁচিশ বছরও কাটবে না। পূর্ববাংলা পৃথক হয়ে যাবে। তাই-ই হয়েছিল। ১৯৭১এর বাংলাদেশ যুদ্ধ তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণীই সত্য প্রমাণ করে দেয়। পঁচিশ বছর পূর্তির একবছর আগেই এই যুদ্ধ ঘটে।

নতুন ভাবে প্ল্যানের খসড়া মুসাবিদা করতে মাউন্টব্যাটেন তাঁর সচিবালয়ের যোগ্যতম মানুষটিকেই স্টাডি রুমে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু অদৃষ্টের কি নিদারুণ পরিহাস! এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাকে তিনি যোগ্যতম বলে বেছে নিলেন সে মানুষটি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস নামক ঠাটঠমকের চাকরিজীবী নন। শুধু তাই নয়, অক্সফোর্ড বা ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রিধারীও তিনি ছিলেন না। এমনকি তাঁর পারিবারিক মর্যাদার সূত্রটিও এমন মজবুত ছিল না যা অবলম্বন করে তাঁর আরোহণ ত্বরান্বিত হয়েছে। ভি.পি. মেনন্ (ভি. কৃষ্ণমেনন্ নন) নামে উদ্যমী মানুষটি ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী, সেল্ফ্ মেড্। নিজের ভাগ্য নিজেই গড়েছেন তিনি। তাই ভাইসরয়ের সচিবালয়ের অমন আড়ম্বরের পরিবেশে তিনি ছিলেন কিছুটা অশোভন।

এক অতি সাধারণ পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান মেনন মাত্র তেরো বছর বয়সেই লেখাপড়ায় ইতি করে রুজির ধান্দায় বেরিয়ে পড়েন। সেই থেকে শুরু হয় তাঁর জীবনসংগ্রাম। প্রথমে এক নির্মাণ প্রকল্পের কর্মী, সেখান থেকে খনি শ্রমিক, পরে কিছুদিন দক্ষিণভারতীয় রেলের ইঞ্জিনে চালকের সহকারী ইত্যাদি। এইভাবেই একদিন চাকরি ছেড়ে স্বাধীন ভাবে দালালি ব্যবসায় নেমে পড়লেন মেনন। কিন্তু তুলোর দালালিতে সাফল্য এল না। তখন ফের চাকরির মধ্যে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা চলতে লাগল। এবার তিনি প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি নিলেন। মাস্টারি করার ফাঁকে ফাঁকেই দু আঙুলে টাইপ করা শিখতে লাগলেন। তখনই ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হলেন। অধ্যবসায়ী এবং উদ্যমশীল মেনন তাঁর প্রতিভা বিকাশের পথটি খুঁজে পেলেন যেন। ১৯২৯ সালে ভারতীয় প্রশাসন বিভাগে ক্লার্কের চাকরি পেলেন। তাঁর কর্মস্থল হল সিমলা।*

এর পরের কাহিনী খুব সংক্ষিপ্ত। শুরু হল ধাপে ধাপে আরোহণের পালা।

---

* মেনন যখন দিল্লি হয়ে সিমলা যাচ্ছেন তখন দিল্লি স্টেশনে তাঁর সর্বস্ব চুরি হয়ে গেল। নিজের কাছে একটা টাকাও নেই যা দিয়ে সিমলা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন। নিরুপায় মেনন তখন একজন বয়স্ক শিখ ভদ্রলোকের কাছে পনেরোটা টাকা চাইলেন। শিখ ভদ্রলোকটি চেহারা বেশভূষায় বেশ পরিপাটী।

www.pathagar.com

উল্কার মতন আশপাশ উজ্জ্বল করে তিনি তাঁরের মতন শীর্ষে উঠেছেন। ভারতের প্রশাসনের ইতিহাসে এমন ঝলমলে আরোহণ (মীটিয়রিক রাইজ্) সচরাচর দেখা যায় না। ১৯৪৭ সালে ভাইস্রয়ের নিজস্ব সচিবালয়ে এমন এক উচ্চতর পদে তাঁর আরোহণ হল যেখান থেকে হাত বাড়ালেই খোদ বড়লাটের স্নেহস্পর্শ পাওয়া যায়। এদেশে এসেই এই কর্মীটিকে চিনে নেন মাউন্টব্যাটেন। প্রথম নজরেই তাঁর মনে হয়েছিল যে মেননই একমাত্র যোগ্যতম সাবঅর্ডিনেট যাকে তিনি আস্থাভাজন করতে পারেন।

স্টাডি রুমে ডেকে মেননের হাতে খসড়া প্ল্যানের কাগজগুলো তুলে দিলেন মাউন্টব্যাটেন। তারপর সন্ধ্যার মধ্যেই নতুন করে সনদটার খসড়া মুসাবিদা তৈরি করতে বললেন। এটাই ভারতকে স্বাধীনতা দানের সনদ। এর মধ্যে দেশভাগ আছে। তবে কোন্ ভাগের সঙ্গে কারা যুক্ত হবে ; সে দায়িত্ব দেওয়া হবে ভারতীয় নেতাদের ওপর। প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচন মারফত তারা স্থির করবে এটি।

মাউন্টব্যাটেনের নির্দেশ মতন দুরূহ কাজটি ছ'ঘন্টারও কম সময়ে সম্পন্ন করলেন মেনন। লাঞ্চ এবং রাত্রের ডিনার টাইমের মধ্যেই সমাপ্ত হল এই অধ্যবসায়ী অভিযান (ত্যুর দ্যফোর)। দু আঙুলে টাইপ শিখে যিনি কর্মজীবন শুরু করেছিলেন, তাঁর যোগ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হল এই খসড়া মুসাবিদায়। তাঁর ঘরের সামনের ঢাকা বারান্দা দিয়ে সুমহান হিমালয়ের দিকে চেয়ে কাজ করতে করতে তাঁর তখন মনে হয়েছে, হিমালয় যেন যোগ্যতার মানদণ্ড। এরই নিরিখে যে খসড়া সনদটি মেনন সেদিনে তৈরি করলেন. আগামী দিনে সেটিই পৃথিবীর মানচিত্রে এই উপ-মহাদেশের রাজনৈতিক অবস্থান নতুন করে চিহ্নিত করে দিয়েছিল।

* * *

অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছটফট করছে মনু। তার রোগা শীর্ণ শরীরটা রোগের টানাটানিতে থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। ঘরের মধ্যে যত কাঁথা-কম্বল আছে সব এনে চাপানো হয়েছে তার পাতলা শরীরের ওপর। তবু কাঁপুনি থামছে না। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে মেয়েটার গা। চোখ দুটো নিষ্প্রাণ। অসহ্য যন্ত্রণাটা লাঘব করতে শরীরটাকে গর্ভস্থ ভ্রূণের মতন বাঁকিয়ে কোলকুঁজো হয়ে শুয়ে আছে মেয়েটা। তবুও গান্ধীজী মনস্থির করতে পারছেন না। বিপন্ন মুখে মেয়েটার এই প্রাণান্তিক ছটফটানি দেখছেন আর নিঃশব্দে পায়চারি করছেন।

আর একবার তাঁর বিশ্বাসের ভিতটায় যেন চিড় খেল। তাঁর মনে হচ্ছে ফের আর একটা বড় চ্যালেঞ্জের সামনাসামনি পড়েছেন তিনি। কিন্তু পারবেন কি এর মোকাবিলা করতে ? পারবেন কি শুধু প্রকৃতি চিকিৎসার (নেচার কিউর) ওপর ভরসা করে মনুকে সারিয়ে তুলতে? সবাই জানে যে আধুনিক চিকিৎসাবিধির কতবড় নির্দয় সমালোচক তিনি। সবাই জানে তাঁর বিশ্বাসের কথা। শরীর ব্যাধি-গ্রস্ত হলে যখন সংযম আর আত্মনিয়ন্ত্রণের দরকার. তখন আধুনিক চিকিৎসকেরা

টাকা নিয়ে মেনন যখন তাঁর ঠিকানা চাইলেন তখন শিখ ভদ্রলোকটি ঘাড় নেড়ে বললেন, 'উহুঁ ! ওভাবে নয়। যতদিন বাঁচবেন ততদিন যে কোন সৎ মানুষকে ওই টাকা দিয়ে সাহায্য করবেন। সেই-ই হবে আপনার ঋণ শোধ'। সেই বয়স্ক শিখ ভদ্রলোকটির উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন মেনন। তাঁর মৃত্যুর ঠিক দেড়মাস আগের ঘটনা। ঘটনাটা তাঁর মেয়ের কাছে শোনা। মেনন তখন তাঁর বাঙ্গালোরের বাসায় থাকেন। একদিন সকালবেলা একজন ভিখারী ভিক্ষা চাইতে এল। মেনন তাঁর মেয়েকে ডেকে মনিব্যাগ আনতে বললেন। তারপর ব্যাগ থেকে পনেরোটা টাকা বের করে ভিক্ষা প্রার্থীর হাতে দিলেন। এইভাবে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ঋণ শোধ করে গেছেন মেনন।

www.pathagar.com

উত্তেজক বড়ি আর ইঞ্জেকশন দিয়ে শরীরের স্বাভাবিক বৃত্তি উত্তেজিত করে। এটা ওদের অর্থলালসার পরিণতি। তাঁর এই বিশ্বাসের কথা কে না জানে! ভারতবর্ষ হল রোগ নিবারণকারী নানা ওষধির দেশ। সারা দেশময় ছড়িয়ে আছে অসংখ্য লতাগুল্ম, উদ্ভিদ যার সঠিক ব্যবহার করে সমস্ত জাতিকে রোগমুক্ত রাখা যায়। যেখানে প্রকৃতির দান এমন অকৃপণ সেখানে প্রকৃতি চিকিৎসা কোন বাহ্য বিষয় নয়। এটা তাঁর অহিংস নীতির অবলম্বন। আর ঠিক এই কারণের জন্যে আগা খাঁর প্রাসাদে মুমূর্ষু পত্নীর শরীরে বলপূর্বক ইঞ্জেকশন প্রয়োগ করে অশান্তি করতে তিনি চাননি। তাই রোগের যন্ত্রণার কথা মনু যখন প্রথম জানায়, তখন তিনি তার জন্যেও প্রকৃতি চিকিৎসার বিধানই দিয়েছিলেন। যে চিকিৎসাবিধির ব্যবস্থা করেছিলেন তা হ'ল তলপেটে কাদার প্রলেপ লাগানো, নিয়ন্ত্রিত পথ্য নেওয়া আর ডুস্ দিয়ে তলপেট পরিষ্কার করা (এনীম্যা)।

কিন্তু কোন চিকিৎসাতেই ফল হ'ল না। রোগিণীর অবস্থাও ক্রমেই সঙ্গিন হয়ে উঠতে লাগলো। এখন যা অবস্থা তা খুবই সংকটময়। গান্ধীজীকেও বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসার কথা ভাবতে হচ্ছে কারণ মনুর ব্যাধির সব তত্ত্বটুকুই তাঁর জানা।

আর মনুও যেন নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিয়েছে গান্ধীজীর ওপর। যেমনটি নোয়াখালিতে করেছিল সেইরকম তার ভালমন্দর সব দায়টুকুর বকলম দিয়েছে তাঁকে। তাই যেন আরও বিব্রত বোধ করছেন গান্ধীজী। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে তাঁর প্রকৃতি চিকিৎসা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে গেছে। তাঁর ধারণা, এই ব্যর্থতা, মনুর এই রোগযাতনার কারণ হল তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার ত্রুটি। হয়ত তাই। কিন্তু তাই বলে যে মানুষটা নিজের ভালমন্দর সব দায় তাঁর ওপর ছেড়ে দিয়েছে তাকে কি এইভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারেন? না, পারেন না। সুতরাং গান্ধীজীও শেষমেশ হার মানলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই হার তাঁকে স্বীকার করে নিতে হ'ল। ফলে নিজের স্ত্রীর ক্ষেত্রে রোগপ্রতিকারসাধক যে ইঞ্জেকশন দেওয়ায় তিনি আপত্তি করেছিলেন, মুমূর্ষু নাতনীর বেলায় সেই গোঁ বজায় রাখতে পারলেন না। শল্যচিকিৎসকের ধারালো ছুরি (স্ক্যালপেল্) উদ্যত হ'ল। ইমার্জেন্সি অস্ত্রোপচারের জন্যে মনুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'ল তখনই। তারপর য়্যানাস্থেটিক প্রয়োগের পর মনু যখন প্রায় সংজ্ঞাহীন তখন তাঁর কপালে হাত রেখে গান্ধীজী প্রায় মন্ত্রোচ্চারণের মতন অস্ফুটে বললেন, 'রামনাম করো! সব ঠিক হয়ে যাবে!'

ঘণ্টাকয়েক পরের কথা। গান্ধীজীর হতাশ করুণ চেহারা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন একজন ডাক্তার। এ কি চেহারা হয়েছে ওঁর! কোটরে চোখ ঢুকে গেছে। শরীর হয়ে গেছে ঝরা পাতার মতন শুকনো, নীরস। ডাক্তারটি এগিয়ে এলেন বৃদ্ধের দিকে। তারপর অনুনয় করে বললেন 'এবার একটু বিশ্রাম নিন। তাতে মনের উদ্বেগ কমবে। এদেশের মানুষের কাছে আপনার এখনও অনেক প্রয়োজন।' ডাক্তারের কথা শুনে ম্লান একটু হাসলেন গান্ধীজী। তারপর বিমর্ষ মুখে মাথা নাড়লেন। ডাক্তারটি অবাক। গান্ধীজী বললেন, 'একটুও নয়। সাধারণ মানুষই বলো আর যারা ক্ষমতায় বসেছে তাদের কথাই বলো, আজ আর কারো দরকার নেই আমায়।' একটু চুপ করলেন তিনি। তারপর দুঃখিত স্বরে ফের বললেন, 'এখন আমার একমাত্র কামনা, কাজ করতে করতে ভগবানের নাম নিয়ে যেন মরতে পারি।'

www.pathagar.com

সুরম্য প্রাসাদভবন ও বাঘ, হাতি ও হীরাজহরতের দীপ্তি

মে মাসের সকাল। উর্দিপরা এক রাজভৃত্য অতি সন্তর্পণে গালচে পাতা মেঝের ওপর দিয়ে হাঁটছিল। লোকটার হাঁটাচলার মধ্যে ফুটে উঠেছে একটা গদগদ বিনীতভাব। লোকটা লঘু পায়ে হাঁটছে খাটের ওপর শুয়ে থাকা দশাসই চেহারার একজন মানুষের দিকে। ওই ঘুমন্ত লোকটাই তার প্রভু। ঘর জুড়ে পাতা রয়েছে শিকার করা বাঘ চিতা আর হরিণের চামড়া। লোকটার হাতে রয়েছে একটা রুপোর ট্রে। ১৯২১ সালে যখন প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্‌ ভারতভ্রমণে আসেন তখনই এটা লণ্ডন থেকে কিনে আনা হয়েছিল। ট্রের মাধ্যখানে রুপোর জল করা কমলা-রঙের টিপট। কেতলির ভেতরে গরম জলে ভিজছে দামী চা। ভেজা চায়ের সুগন্ধ ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে। মাসে দুবার এই স্পেশ্যাল ব্লেন্ড করা চায়ের পাতা আর বিস্কুট আসে বিলেতের ফোর্টনাম আর ম্যাসন কোম্পানি থেকে। মস্ত শোবার ঘরের চারপাশের দেওয়ালের কোণে কোণে টাঙানো আছে শিকার করা জানোয়ারের খড়ঠাসা মুণ্ডু। আর আছে শিকার করে পাওয়া নানা ট্রফি কিংবা পোলো স্টিক বা ক্রিকেট ব্যাট। এই বিজয় চিহ্নগুলি মনে করিয়ে দেয় যে শুধু বিগ্ গেম নয় পোলো বা ক্রিকেট খেলাতেও ওই শুয়ে থাকা মানুষটা সমান অভিজ্ঞ।

প্রভুর পালঙ্কের কাছে এসে রাজভৃত্য এবার হাতের ট্রেখানা নকশা করা বেড-সাইড টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলো। তারপর ঘুমন্ত প্রভুর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লো। লম্বা-চওড়া পেশীবহুল মানুষটা একজন শিখ। একমুখ কালো দাড়ি সিল্কের জাল দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। যেন কালো ফ্রেমের মধ্যে আঁটা আছে মানুষটার ঘুমন্ত মুখখানা। লোকটা এবার প্রভুর কানের কাছে মুখ এনে প্রায় বিহ্বল স্বরে ফিসফিস করে বললো, 'বেডটি সাব!'

ওই চুপিচুপি ডাক শুনেই ছ' ফুট চার ইঞ্চি মাপের লম্বা-চওড়া চেহারার লোকটা অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায়, বিছানা ছেড়ে মেঝের ওপর টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। চোখে তখনও ঘুমের আমেজ লেগে আছে। সংগে সংগে ছুটে এল আর একজন পরিচারক। তারপর মানুষটার বলিষ্ঠ কাঁধের ওপর একটা সিল্কের জোব্বা পরিয়ে দিল সে। ঘুমের ঘোর কাটিয়ে এবার তিনি অনেকটা ধাতস্থ হয়েছেন। বুঝতে পারলেন যে আর একটা সকাল এসেছে তাঁর জীবনে। পাতিয়ালা স্টেটের অষ্টম মহারাজা হিজ হাইনেস যাদবেন্দ্র সিং জীবনের আর একটা ভোর দেখলেন সেদিন।

ভারতের সামন্ত রাজামহারাজদের মধ্যে পাতিয়ালার মহারাজা যাদবেন্দ্র সিং-এর খ্যাতি প্রতিপত্তি একটু অন্য রকমের। যা অন্য কারো ক্ষেত্রে হয় নি এবং সম্ভবত হবেও না, সেইরকম এক বিরল খ্যাতির অধিকারী তিনি। ভারতীয় রাজন্য পরিষদের সভাধ্যক্ষ তিনি। অতি সম্প্রতি প্রায় ৫৬৫ জন সামন্ত রাজা, মহারাজা, নবাব এবং জমিদার, তালুকদার মিলে যে পরিষদ গড়েছে তারই সর্বাধিনায়ক হয়ে ইতি-

www.pathagar.com

মধ্যেই সারা দেশের রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছেন মানুষটি। একথা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই ভূখণ্ডের এক তৃতীয়াংশ জমির মালিক এই পরিষদের রাজন্যবর্গ। শুধু তাই নয়। সারা ভারতের মোট চারভাগ জনসংখ্যার মধ্যে একভাগ হ'ল তাদেরই আশ্রিত প্রজা। সুতরাং সারা দুনিয়ার কাছে একথা বললে অন্যায় হবে না যে, ব্রিটিশ শাসনের অধীন ছিল দুটো ভারতবর্ষ। একটা দিল্লিশাসিত ভারত, যার রাজা ছিল ইংরেজ। এদের শাসিত প্রজা ছিল ভারতবর্ষের আম জনতা। অন্যটা হ'ল সামন্তরাজাদের ভারতবর্ষ। দুটো ভারত আলাদা।

ব্যাপারটা বুঝতে হলে ইতিহাসের পথ ধরে কিছুটা পিছু হাঁটা দরকার। ভারতে ইংরেজের রাজ্যজয়ের ব্যাপারটা কিছুটা এলোমেলো। এই ভূখণ্ডে ইংরেজ যখন দিগ্‌বিজয় করতে বেরোয় তখন তারা প্রথম বাধা পায় আজকের এইসব রাজা-মহারাজাদের তরফ থেকেই। যুদ্ধক্ষেত্রে যোগ্যতার সঙ্গে লড়াই করে হেরে গেলেও সিংহাসন খোয়া যায় নি তাদের। সন্ধির মাধ্যমে অনেকগুলো চুক্তি হ'ল পৃথক পৃথকভাবে। চুক্তিপত্রে লেখা হ'ল যে আপন এলাকায় ক্ষমতার অধিকারী হলেও ব্রিটেনকেই প্রধান শক্তিরূপে তারা মেনে নেবে। সেই প্রধান শক্তি হলেন কিং এম্‌পারার এবং তাঁর প্রতিনিধি দিল্লির ভাইসরয়। এই সর্বক্ষমতাসম্পন্ন ভাইসরয় দেখবেন বৈদেশিক নীতি এবং নিরাপত্তা। পরিবর্তে রাজন্যবর্গের হাতে তাদের নিজ রাজ্যের স্বশাসনের পূর্ণ ক্ষমতা ছেড়ে দেবে ব্রিটেন।

চুক্তির পর দেখা গেল এমন কিছু কিছু রাজ্য আছে যেমন হায়দ্রাবাদ এবং কাশ্মীর, যার আয়তন এবং অধিবাসীর সংখ্যা বিপুল। পশ্চিম ইওরোপের ক'টা স্বাধীন স্টেটের সঙ্গে রীতিমত পাল্লা দিতে পারে তারা। আবার এমন কিছু রাজ্য আছে যেমন কাথিয়াবাড়, যার সীমানা, জনসংখ্যা খুবই সীমিত। তাদের জমিদার, তালুকদারের বাসভবন প্রায় আস্তাবলের মতন এবং লণ্ডনের রিচমণ্ড পার্কের চেয়ে যা কোন অংশেই বড় নয়। এদের মধ্যে যেমন ধনপতি কুবের ছিল তেমনি দরিদ্রতম জমিদারও ছিল। মোটকথা চারশরও বেশি সামন্ত রাজ্যের সঙ্গে ইংরেজের চুক্তির ফলে নিজ নিজ এলাকায় সবাই স্বাধীন ছিল। এদের কারও কারও প্রশাসন ইংরেজের প্রশাসনের চেয়েও উন্নত ছিল। আবার কোন কোন রাজামহারাজা এমনই স্বেচ্ছাচারী ছিল যে রাজস্বের পনেরো আনাই নিজেদের উচ্ছৃংখল শখ মেটাতে অপব্যয় করতো।

মোটকথা এইসব দেশীয় রাজারাজড়াদের মনের ভাবটি যাই হ'ক, একাধিক বেগম আর ছেলেপুলে নিয়ে এরা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইংরেজ সরকারের কাছে সেই ১৯৪৭ সালে। সুতরাং এটার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কোন সমাধানকেই স্থায়ী বলা যাচ্ছিল না। এই প্রসঙ্গে একটা কৌতূহলোদ্দীপক পরিসংখ্যান তুলে দিচ্ছি। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এটি পাঠ করে পাঠক বেশ মজা পাবেন। হিসাবে দেখা গেছে যে, এইসব রাজারাজড়াদের গড়ে ১১টা টাইটেল, ৫.৮ গেহিণী, ১২.৬ বাচ্চা-কাচ্চা, ৯.২ হাতি, ২.৮ নিজস্ব রেলপথ, ৩.৪ রোল্‌স্‌রয়েস মোটরগাড়ি আর শিকার করে মারা বাঘের সংখ্যা ছিল ২২.৯।

অবশ্য গান্ধীজী, নেহরু বা তাঁদের কংগ্রেসের কাছে একটা যুৎসই উত্তর সব সময়ই মজুত থাকতো। তাঁরা ভাবতেন, ভারত স্বাধীন হবার পর এইসব রাজা-মহারাজাদের রাজপাট গুটিয়ে স্বাধীন ভারতের সঙ্গে মিশে যেতেই হবে। এর কোন বিকল্প নেই। কিন্তু যাদবেন্দ্র সিং-এর মতন দাম্ভিক ধনপতি রাজার পক্ষে এই সমাধান

www.pathagar.com

মোটেই মনঃপূত হয় নি। আর কি করেই বা হয়? এই পাতিয়ালা স্টেটের কথাই ধরা যাক। ধনে মানে এমন স্বচ্ছল স্টেটটার ভবিষ্যৎ এত সহজে নির্ধারণ করা যায় না। বলা যেতে পারে কুবেরের সম্পদ আছে পাতিয়ালায়। শুধু কি ঐশ্বর্য ? বোধহয় এটাও অন্যতম স্টেট যার নিজস্ব সেনাবাহিনী আছে, আছে সাঁজোয়া বাহিনী আর আছে সেঞ্চুরীয়্যান ট্যাঙ্কের ব্যূহবেষ্টনী। সুতরাং প্রয়োজনে পাতিয়ালার প্রতিরক্ষা মোটেই অসম্ভব ব্যাপার নয়।

বলাবাহুল্য, চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সেদিন এই ব্যাপারটাই ভাবছিলেন যাদবেন্দ্র। ভারতীয় রাজন্যপরিষদের সভাপতি হয়েছেন তিনি। সুতরাং স্টেটগুলোর রাজনৈতিক ভবিষ্যতের কথা তাঁকে ভাবতেই হবে। তাছাড়া আরও একটা বিশেষ কারণ আছে। একটা মুখরোচক কথা তাঁর কানে এসেছে এখন। এই জন্যে ক্ষণেক্ষণেই উৎকণ্ঠা বেড়ে যাচ্ছিল তাঁর। তিনি শুনেছেন, এই মাসেই ব্যাপারটা নিয়ে একটা মীমাংসা হয়ে যাবে। খবরটা নাকি স্বয়ং ভাইসরয়ও জানেন না। এখান থেকে ছ'হাজার মাইল দূরে লণ্ডনে বসে যে লোকটা কলকাঠি নাড়ছে তার হাতেই জীয়ানো আছে দেশীয় রাজারাজড়াদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ। যাদবেন্দ্র শুনেছেন লোকটা নাকি মরিয়ার মতন এমন একটা ওজর খুঁজছে যা প্রয়োগ করে সমাজবাদী নেহরু এবং তাঁর ধূর্ত পার্ষদদের খপ্পর থেকে রাজারাজড়াদের মুক্তি দেওয়া যায়।

* * *

কিন্তু এই ষড়যন্ত্রীমশাইটি কে? আর একজন মহারাজা? না, তা নয়। তবে লোকটা ষোলআনা ইংরেজ। তার ধমনীতে বইছে খাঁটি বিলিতি রক্ত। লোকটা নাকি ভাইসরয়কে না জানিয়ে, তাঁর অনুমতি না নিয়েই লণ্ডনে বসে গুপ্ত সলা চালিয়ে যাচ্ছে। লোকটার নাম স্যার কনরাড্ করফিল্ড। একজন মিশনারির ছেলে। তবে প্রশাসনেও সে বেশ হোমরাচোমরা একজন এবং ভারতে ইংরেজ রাজত্বের শক্তি আর দুর্বলতা, দুটোরই হদিস তার জানা। তার কর্মজীবনের বেশিরভাগ সময়টাই এই সব দেশীয় রাজাদের সেবা করে কাটিয়েছে সে। ফলে তার কাছে এদের মঙ্গলই তার মঙ্গল। তার কাছে ভারত বলতে যা বোঝায় তা এই দেশীয় রাজ্যগুলোই। এটাই আসল ভারত তার কাছে। সুতরাং নেহরু বা তাঁর পৃষ্ঠপোষক কংগ্রেসকে শত্রু ভেবেই ঘেন্না করে সে। এই ঘৃণা ঠিক ততটাই তীব্র যতটা ওদের অবজ্ঞা।

১৯৪৭এর মে মাসে ভারত সরকারের বেশ গুরুত্বপূর্ণ পদেই কাজ করতো করফিল্ড। ভাইস্রয়ের রাজনৈতিক সচিব সে। তার প্রধান কর্তব্যকর্ম ছিল ভাইসরয়ের প্রতিনিধিরূপে মহামান্য ইংল্যাণ্ডেশ্বরের কাছে সমর্পিত দেশীয় রাজাদের অধিকারের সুষ্ঠু প্রয়োগ করা। দিল্লিতে আসা ইস্তক কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের রাজনৈতিক কাজিয়া নিয়ে মাউন্টব্যাটেনকে এত ব্যস্ত থাকতে হয়েছে যে, অন্য বিষয়ে মন দেবার অবকাশ তিনি পান নি। ফলে করফিল্ড এবং দেশীয় রাজাদের নিয়ে যে সমস্যাটা দেখা দিয়েছে সেটা তাঁর অজানাই ছিল। মাউন্টব্যাটেনের এই অমনোযোগ শাপে বর হ'ল করফিল্ডের কাছে। তাছাড়া নেহরুর সঙ্গে মাউন্টব্যাটেনের ঘনিষ্ঠতাটাও সাদা চোখে দেখে নি সে। সুতরাং সুযোগ পেয়েই লণ্ডনে পাড়ি দিল করফিল্ড। যে ঘরটায় বসে যুক্তিতর্ক দিয়ে করফিল্ড তার বক্তব্য পেশ করছিল, সেই ঘরখানা হ'ল সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার আপিসঘর। আটকোণা ঘরখানা রাজনৈতিক বিচারে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কারণ দেশীয় রাজন্যদের রাজনৈতিক ভাগ্য এখান থেকেই নির্ধারিত হয়। জন্ মোরলের আমল থেকেই ঘরটার নাম 'সোনার

www.pathagar.com

খাঁচা'। ঘরটার একটা বিশেষত্ব হ'ল যে, সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার বসার টেবিলের সামনাসামনি একই রকম দেখতে দুখানা দরজা দিয়েই ঘরে ঢোকা যায়। যাতে সমান পদমর্যাদার দুজন মহারাজা একই সঙ্গে ঘরে ঢুকতে পারেন তার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

করফিল্ড যার কাছে তার বক্তব্য পেশ করছিল, সেই-ই হল বর্তমান সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়া, আর্ল অব লিস্টওয়েল। অত্যন্ত জোর দিয়েই করফিল্ড বোঝাচ্ছিল যে দেশীয় রাজন্যবর্গ যখন ব্রিটিশ ক্রাউনের হাতে তাদের অধিকার অর্পণ করেছিল তখন ভারত পরাধীন ছিল। সুতরাং ভারত স্বাধীন হলে সেই অধিকার দেশীয় রাজাদের হাতেই ফিরে আসা উচিত। এটাই যুক্তিসংগত। এরপর দেশীয় রাজারাই তাদের রাজনৈতিক ভাগ্য স্থির করবে। পাকিস্তান না ভারত কোন শক্তির সঙ্গে গ্রন্থিবন্ধন করবে অথবা স্বাধীন থাকবে সেটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার। এটাই চুক্তির শর্ত। ব্রিটেন এবং দেশীয় রাজারাজড়ার মধ্যে এই চুক্তিই হয়েছিল। সুতরাং এর অন্যথা হলে চুক্তি লংঘন করা হবে।

আইনের সূক্ষ্ম বিচারে এই ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত মনে হলেও কার্যত এটা এক বীভৎস প্রস্তাব। এমনটি হলে সারা উপ-মহাদেশ জুড়ে অসংখ্য ছোট ছোট স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরি হবে এবং ভারতের অখণ্ড অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। অর্থাৎ, ছোট ছোট রাষ্ট্র নিয়ে ভারতের যে মানচিত্র তৈরি হবে, সেই ভগ্ন ছবিটা সিমলায় বসে নেহরুও দেখতে পান নি।

* * *

একদা রুডিয়ার্ড কিপ্‌লিংয়ের মনে হয়েছিল যে সারা পৃথিবীর সাধারণ মানুষকে ঐশ্বর্যের আড়ম্বর দেখাতেই ঈশ্বর যেন রাজামহারাজা নামক উৎকৃষ্ট জীব সৃষ্টি করেছিলেন। তাদের সুরম্য প্রাসাদভবন, তাদের হাতিশাল, ঘোড়াশাল এবং মণিমুক্তা ও হীরা-জহরতের চোখ ধাঁধানো দীপ্তি — এ সবকিছুরই লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষ। প্রবল বা দুর্বল, ধনী বা দরিদ্র যেমনই হ'ক, এইসব রাজামহারাজারা যেন জন্ম থেকেই কিংবদন্তীর মানুষ হয়ে সাধারণ মানুষের মনে বিরাজ করতো। এদের ঘিরে থাকতো কত না মেদুর কল্পকাহিনী। হায়! কল্পলোকের সেইসব মানুষগুলোই হারিয়ে যেতে বসেছে আজ। হারিয়ে যেতে বসেছে তাদের সৃষ্টিছাড়া পাপপুণ্যেবোধ, তাদের প্রমত্ত জীবনযাত্রা, তাদের অসংযমী ভোগবিলাস, তাদের খামখেয়ালী আচরণ কিংবা নির্বুদ্ধিতা। এসবই এখন যেন রূপকথার গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। তারপর এমন দিন আসবে যেদিন শেষ হয়ে যাবে এই রূপকথার গল্প। পৃথিবীর মানুষ আর ক্ষুধার্ত হয়ে এদের গল্পকথা শুনবে না এবং যেদিন সত্যই তেমনটি হবে, সেদিন পৃথিবীটা বড়ই নীরস হয়ে উঠবে।

তবে যে সব রাজামহারাজাদের ঘিরে এইসব রূপকথার গল্প প্রচলিত আছে, তাদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। যাদের হাতে অপর্যাপ্ত ঐশ্বর্য ছিল, ছিল বিপুল সময় কিংবা নানারকম খামখেয়ালী শখ, তারাই পারতো এই ধরনের গালগল্পের স্রষ্টা হতে। এক ধরনের প্রমত্ত চিত্তবিকার আবৃত করে রাখতো এইসব উৎকেন্দ্রিক মানুষগুলোকে আর সেই নেশার ঘোরেই প্রায় বুঁদ হয়ে থাকতো তারা। তাদের নেশার বস্তুর মধ্যেও বৈচিত্র্য থাকতো। কারও শখ ছিল শিকার, কারও মোটরগাড়ি, কারও খেলাধুলা, কারও শখ ছিল অভিনব প্রাসাদ গড়ার, কেউ বা আনন্দ পেত সুন্দরী রমণীতে হারেম পূর্ণ রাখতে। তবে রাজামহারাজাদের সবচেয়ে প্রিয়

www.pathagar.com

নেশা ছিল সোনাদানা, হীরা জহরতের সংগ্রহ।

বরোদার মহারাজার প্রায় জপমন্ত্র ছিল এইসব মণিমুক্তা আর হীরাপান্না। যে ঢিলা পোশাকটা পরে তিনি রাজসভায় আসতেন তার সূক্ষ্ম জালির কাজ তৈরি করতো শহরের একটিই পরিবার। সোনার জালির এই কাজে বহাল ছিল পরিবারের সবাই। তারা লম্বা লম্বা নখ রাখতো এবং এমনভাবে সেগুলি ছাঁটাই করতো, যাতে প্রতিটি নখ খাঁজকাটা চিরুনির দাঁতের মতন দেখায়। এই খাঁজকাটা নখ দিয়েই সোনার তারের জাল বুনতো তারা।

বরোদার রত্নভাণ্ডারে যে মহামূল্য বস্তুটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, সেটা একটা বড় মাপের হীরকখণ্ড। এই ইতিহাস বিখ্যাত হীরাটার নাম 'স্টার অব সাউথ'। পৃথিবীর মধ্যে সপ্তম বৃহত্তম এই হীরাটা নাকি ইউজেনীকে উপহার দিয়েছিলেন তৃতীয় নেপোলিয়ন। তাঁর রত্নভাণ্ডারের আর একটি বহুমূল্য সংগ্রহ হল রত্নখচিত দেওয়ালবস্ত্র (ট্যাপিস্ট্রি)। ট্যাপিস্ট্রির সারা গা চুনিপান্নার বুটি দিয়ে অলংকরণ করা থাকতো।

ভরতপুরের মহারাজার সংগ্রহ ছিল আরও আকর্ষণীয়। হাতির দাঁতের তৈরি নানা অসাধারণ শিল্পকর্ম ছিল তাঁর সংগ্রহে। এক একটা শিল্পী পরিবার বছরের পর বছর ধরে এইসব শিল্পবস্তু তৈরি করতো। এ কাজের প্রধান মূলধন হ'ল অসাধারণ ধৈর্য আর দক্ষতা। ফলের খোসা ছাড়ানোর মতন গজদন্তটি কুরে বের করতে হতো। কপুরথালার শিখ মহারাজার পাগড়ির মধ্যে যে হলুদ রঙের পোখরাজ আছে, সেটাই পৃথিবীর বৃহত্তম। এক বিশালকায় মানুষের চোখের মতন জ্বলজ্বল করে সেটা। প্রায় তিন হাজার মণিমুক্তা বসানো এই উষ্ণীষটা এক অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় ঝলমল করতো সারাক্ষণ। জয়পুরের মহারাজার সংগ্রহ করা রত্ন ত প্রায় গল্পকথার সামিল। এইসব বহুমূল্য মণিরত্ন পোঁতা আছে রাজস্থানের আরাবল্লী পাহাড়ের তলায়। বংশপরম্পরায় সেই জায়গাটা পাহারা দেয় এক জঙ্গি রাজপুত পরিবার। জয়পুরের সব মহারাজাই তাঁর সারা জীবনে একবার এই বিস্ময়কর সঞ্চয় থেকে তাঁর পছন্দের একটা দামী পাথর বেছে নেবার সুযোগ পান। এটাই হয় তাঁর রাজত্বের প্রতীকী রত্ন। আর একটা আশ্চর্য অলংকার আছে জয়পুরের রাজপরিবারের সংগ্রহে। তিন থাক বিশিষ্ট লাল চুনি পাথরের একটা নেকলেশ। এর প্রতিটি চুনির আকার পায়রার ডিমের মতন। এর সঙ্গে আছে তিনখানা বৃহত্তম মরকত মণি। এদের মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড় সেটার ওজন ৯০ ক্যারাট।

পাতিয়ালার মহারাজার প্রধান আকর্ষণীয় সংগ্রহ হ'ল একখানা মুক্তা বসানো নেকলেশ। এই মহামূল্যবান 'জেবর'টা লণ্ডনের লয়েডস ব্যাঙ্কে ১০ লক্ষ ডলারে বিমা করা আছে। তবে যে অলংকারটা দেখে দৃষ্টি মুগ্ধ হয়, সেটি হ'ল মহারাজার বুকের বর্মটা। হাজার একটা সাদানীল রঙের হীরা বসানো এই বর্মখানা পরে রাজামশাই এই সেদিনও (শতাব্দী শুরুর আগে) সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে প্রজাদের সামনে এসে দাঁড়াতেন। রাজাদের এই নগ্ন বিকাশ দেখে খুশীতে চেঁচিয়ে উঠতো প্রজাকুল। তাদের ধারণা ছিল যে, এমন সাহসী এবং মহাবলবান রাজার সামনে রাজ্যে কোন অমঙ্গল কাছে ঘেঁষতে পারবে না।

রাজামহারাজাদের অতৃপ্ত এবং বিকৃত যৌনরুচির অনেক দৃষ্টান্ত আছে। একবার মহীশূরের এক প্রাচীন মহারাজাকে কোন চৈনিক পরিব্রাজক নাকি জানায় যে, হীরকচূর্ণ থেকে যৌনউত্তেজক বটিকা তৈরি করা যায়। ব্যস! এই ভয়ঙ্কর

www.pathagar.com

আবিষ্কারটাই কামাবিষ্ট রাজার মাথা বিগড়ে দিয়েছিল সেদিন। রাজকোষ শূন্য' সবক'টা হীরে গুঁড়ো করার আদেশ দেওয়া হল। রাজার মনোরঞ্জনের জন্যে যে নর্তকী ছিল তাদের এক চুমুক করে সেই নেশার বস্তু পান করিয়ে হাতির পিঠে চড়িয়ে সারা রাজ্য ঘোরানো হয়েছিল। যে ক'টি হীরাজহরত রক্ষা পেয়েছিল সেগুলো দিয়েই হাতির শুঁড় সাজানো হয়েছিল আর কানের মাকড়ি তৈরি করা হয়েছিল।

বরোদার রাজা যখন হাতির পিঠে চড়ে রাজ্য দর্শনে বেরোতেন সেটা খুবই জমজমাট ছিল। তিনি যে হাতিটার পিঠে চড়তেন, তার বয়স একশ' বছর। সেটা একটা দামাল মদ্দা হাতি। তার খাড়া, ছুঁচালো দাঁতের ঘা খেয়ে অনেক হাতিই আগে মরেছে। এই গৌরবোজ্জ্বল অতীতের জন্যেই তার সর্বাঙ্গ সোনাদানায় মুড়ে দেওয়া হয়েছিল। হাতির সব সাজ-সরঞ্জামই ছিল সোনার তৈরি। তার পিঠের হাওদা, যেখানে রাজা বসেন, তার পিঠের আসন অর্থাৎ জীন, এই সবই ছিল সোনার। দুই কানে দশটা করে সোনার চেন পেনডেন্টের মতন ঝোলানো ছিল। প্রতিটি সোনার চেনের দাম ছিল পঁচিশ হাজার পাউন্ড। এ সবই ছিল হাতিটার যুদ্ধজয়ের স্মারক।

ঐতিহ্য বা রাজকীয় প্রথা যাই-ই বলুন, সে সময় হাতিই ছিল রাজারাজড়াদের সবচেয়ে প্রিয় বাহন। স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রের হাতে যার জন্ম হিন্দু পুরাণে সেই জীবটির স্থান বেশ মর্যাদাসম্পন্ন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্তম্ভস্বরূপ এই জানোয়ারটি যেন আকাশকে ধরে রেখেছে তার মাথায়। তাই বছরে একদিন এই অতিকায় বলবান জীবটির পায়ের গোড়ায় গড়াগড়ি দিয়ে মহীশূরের মানুষ ভক্তি নিবেদন করতো এবং এইভাবেই প্রাকৃত শক্তির সঙ্গে মানুষের সেতুবন্ধন রচনা করতো।

হাতিশালায় পালিত এই যূথচর প্রাণীদের আকৃতি, তাদের সংখ্যা আর প্রাচীনতা দিয়েই তখন যে কোন দেশীয় রাজার হাঁকডাক বা প্রতাপ প্রতিপত্তির যাচাই হ'ত। খ্রীষ্টপূর্বাব্দকালে কার্থেজের মহাবল সেনাপতি হ্যানিবল যখন হাতির পাল নিয়ে আল্পস অতিক্রম করেছিলেন সম্ভবত তার আগে এই যূথচর প্রাণীর সুশৃংখল শোভাযাত্রা দেখা যায় নি। তবে এর সঙ্গে তুলনা করা যায় মহীশূরের দশেরা উৎসবের সময় হাতির পালের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার। এই শোভা-যাত্রা সত্যই এক দেখবার বস্তু ছিল। হাজারটা হাতির সারা শরীর ফুলের মালায় সাজানো হ'ত। তাদের মাথায় পরানো হ'ত মণিমুক্তা বসানো সোনার টায়রা। যেটা সবচেয়ে বলবান হাতি তার পিঠেই পাতা হ'ত মহারাজার সোনার সিংহাসন। সিংহাসনের পায়াগুলো সোনার পাত দিয়ে মোড়া। ধ্বজার মতন সিংহাসনের মাথায় থাকতো রুপার ছাতা। এই আতপত্রটাই হ'ল রাজশক্তির প্রতীক। এই পুরুষ হাতির পিছনে থাকতো আরও দুটো সুসজ্জিত হাতি। এই হাতি দুটোর হাওদা শূন্য থাকতো। মহারাজার প্রেম ও ক্ষমা আধারিত থাকতো এই দুই হাওদায়। তাই শূন্য হাওদা দুটোর দেখা পেলেই সাধারণ প্রজারা নিঃশব্দে ও পরম ভক্তিভরে তাকিয়ে থাকতো তাদের দিকে।

বরোদার অন্যতম আকর্ষণীয় রাজোৎসব ছিল দুটো মদ্দা হাতির দ্বন্দ্বযুদ্ধ। এই প্রমোদায়োজন দেখতে সারা রাজ্যের মানুষ জমায়েত হ'ত সেখানে। সে এক বীভৎস, নৃশংস দৃশ্য। প্রকাণ্ড শরীরের দুটো মদমত্ত হাতিকে বল্লমের খোঁচায় উত্তেজিত করে শিকল খুলে দেওয়া হ'ত। ছাড়া পেয়েই জানোয়ার দুটো ঝাঁপিয়ে পড়তো পরস্পরের দিকে। মদমত্ত হাতি দুটোর পায়ের দাপাদাপিতে থরথর করে

www.pathagar.com

পে উঠতো মাটি, তাদের বৃংহিতে বিদীর্ণ হতো আকাশ। এই নৃশংস দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলতো যতক্ষণ না একটা হাতির প্রাণনাশ হচ্ছে। উড়িষ্যার ঢেন্‌কানলের রাজাও এরকম প্রমোদায়োজন করতেন। তবে সেটা কোন রক্তাক্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধ নয়। হাতির লড়াইয়ের বদলে দুটো মাদালসা স্ত্রী-পুরুষ করীর মধ্যে প্রকাশ্য মৈথুনলীলার ব্যবস্থা করতেন রাজা। বলাবাহুল্য এই প্রকাশ্য রতিক্রিয়া দেখতে সারা রাজ্যের লোক উপচে পড়তো সেখানে।

একবার গোয়ালিয়রের মহারাজার একটা অদ্ভুত সাধ হয়। সময়টা এই শতাব্দী শুরুর আগে। তাঁর মনে হলো যে রাজপ্রাসাদে এমন একটা ঝাড়বাতি টাঙাবেন যেটি মাপে ব্যাকিংহাম প্যালেসের বড় ঝাড়বাতিটার চেয়েও বড় হবে। রাজারাজড়ার খেয়াল। ভাবা মাত্রই ভেনিসে অর্ডার চলে গেল। তখন রাজার কানে কেউ বোধহয় একটা সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছিল যে অতবড় ঝাড়বাতির ভার প্রাসাদের ছাত সইতে পারবে না। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। তবে মহারাজার কাছে এটা কোন সমস্যাই হ'ল না। তিনি স্থির করলেন যে, আস্তাবলের যে হাতিটা সবচেয়ে স্থূলাঙ্গী সেটাকে ছাতের ওপর তুলে ভার পরীক্ষা করবেন। মস্ত বড় একটা ক্রেন এল। সেই ক্রেনের মধ্যে হাতিটাকে চড়িয়ে ছাতের ওপর তোলা হল। ছাত যখন ভেঙে পড়লো না তখন নাকি ভারী খুশী হয়েছিলেন মহারাজা। কারণ, ঝাড়বাতিটা টাঙাবার ব্যাপারে আর কোন বাধা রইল না।

অবশ্য মোটরগাড়ির প্রচলন হবার সঙ্গে সঙ্গেই হাতির আদর-যত্নের দিন চলে গেল। তখন উৎসব বা পর্ব ছাড়া হাতির ব্যবহার হ'ত না। যাতায়াতের জন্যে রাজামহারাজারা তখন মোটরগাড়িই চড়তেন। ১৮৯২ সালেই এদেশে প্রথম মোটর-গাড়ির আমদানি হয়। গাড়িখানা ছিল ফরাসী কোম্পানির তৈরি। গাড়িখানা আনিয়েছিলেন পাতিয়ালার মহারাজা। এদেশে প্রথম এই গাড়িখানা যে পরম সমাদার পেয়েছিল তার প্রমাণ এর লাইসেন্স নাম্বারটি। পরবর্তীকালে এই গাড়িখানাই প্রথম মোটরগাড়ি হিসেবে নথিভুক্ত হয়। এর লাইসেন্স নম্বার হয় জিরো অর্থাৎ শূন্য। হায়দ্রাবাদের নিজামেরও খুব শখ ছিল অনেক গাড়ির মালিক হবার। তবে স্বভাবকৃপণ নিজাম গাড়ি কিনতেন না। যখনই তাঁর রাজ্যে কেউ নতুন মোটরগাড়ি নিয়ে আসতো তখনই তার কাছে নিজাম চিরকুট পাঠাতেন যে, মহামান্য নিজামবাহাদুর গিফ্‌ট্‌ হিসেবে পেতে চান গাড়িখানা। এইভাবে সংগ্রহ করা গাড়ির সংখ্যা ১৯৪৭ সালেই একশ'র বেশি হয়ে যায়। তবে তেলের খরচের ভয়ে একখানা গাড়িও তিনি চড়েন নি কখনও।

অনিবার্য কারণেই সকলের প্রিয় মোটরগাড়ি ছিল রোল্‌স্‌রয়েস। সবরকম রোল্‌স্‌রয়েস গাড়িই এদেশে আনানো হত। লিমুজিন, কুপে, স্টেশন ওয়াগন, এমনকি বড়বড় ট্রাকও আনাতেন রাজামহারাজারা। পাতিয়ালার মহারাজার প্রথম কেনা ছোট্ট 'ডিয়ান' গাড়িখানা ছাড়াও আরও সাতাশটা বিপুলকায় রোল্‌স্‌রয়েস ছিল তাঁর গ্যারাজে। তবে এদেশে ভরতপুর মহারাজার রোল্‌স্‌ গাড়িটাই ছিল সবচেয়ে শৌখিন। এই 'বাবু' গাড়িটা ছিল রূপোর পাত মোড়া। এই কন্‌ভার্টিব্‌ল্‌ গাড়িখানা সম্বন্ধে নানান গুজব ছড়ানো ছিল সর্বত্র। রূপোর পাত মোড়া এই গাড়িটায় চড়লে নাকি যৌনবাসনা উদ্দীপ্ত হয়। ভরতপুরের মহারাজা তাই নাকি রাজামহারাজার বিয়েতে নতুন বরকনেকে এটা ব্যবহার করতে দিতেন। এতেই নাকি তাঁর যৌনসুখের তৃপ্তি হ'ত। এটা ছাড়াও ভরতপুরের মহারাজার আর একটা

www.pathagar.com

রোল্‌স্‌রয়েস ছিল। শিকার ধরার জন্যে নাকি বিশেষভাবে সেটা তৈরি হয়েছিল। ১৯২১ সালে এই গাড়িতে চড়েই প্রিন্স অব ওয়েলস আর তাঁর এ.ডি.সি. মাউন্টব্যাটেনকে (বর্তমান ভাইসরয়) নিয়ে পাতিহাঁস শিকার করতে গিয়েছিলেন মহারাজা। জলে স্থলে শিকারের পিছু পিছু যেভাবে গাড়ি দৌড়েছিল, তা দেখে অবাক হয়ে যান মাউন্টব্যাটেন। তাঁর ডাইরিতে এর উল্লেখ করেন 'লাইক আ বোট এ্যাট সী' বলে।

তবে যথার্থ রাজকীয় রোল্‌স্‌ গাড়ির মালিক ছিলেন আলওয়াড়ের মহারাজা। একটা বিচিত্র ঢপের গাড়ি ছিল এটা। সমস্ত গাড়িটা ছিল সোনার পাত-দিয়ে মোড়া। স্টীয়ারিং হুইলটা ছিল হাতির দাঁতের তৈরি। শোফার অর্থাৎ চালকের আসন ছিল সোনার তারের জরির গদি। গাড়িটা হুবহু দেখতে ছিল ইংল্যান্ডের রাজাদের করোনেশন গাড়ির মতন। তবে সবচেয়ে অলৌকিক হ'ল এর যন্ত্রপাতির নির্মাণ-কৌশল। রীতিমত ওজনদার গাড়িখানা এখনও অটুট আছে এবং ঘণ্টায় সত্তর কিলো-মিটার বেগে ছুটতে পারে এখনও।

মোটকথা রাজস্ব বা শুল্ক থেকে আহৃত আয় যেমন বিপুল ছিল তেমনি রাজারাজড়াদের ব্যক্তিগত খামখেয়ালীপনারও অন্ত ছিল না। আর এইসব খাম-খেয়ালীপনা মেটাতে যে পরিমাণ অর্থের অপচয় হ'ত, তার পরিমাণটাও নেহাত কম নয়। এর কিছু কিছু দৃষ্টান্ত পাঠক ইতিমধ্যেই পেয়েছেন। আরও আছে। গোয়ালিয়রের মহারাজার একধরনের প্যাশন বা মোহ ছিল ইলেকট্রিক ট্রেনের ওপর। তাঁর প্রাসাদের মধ্যেই এই বৈদ্যুতিক রেলগাড়ি বানিয়েছিলেন তিনি। এ এক তুলনাবিহীন রাজখেয়াল যা বোধহয় কোন দুরন্ত বালকের কল্পনাতেও আসবে না কখনও। প্রাসাদের মধ্যে আড়াইশ' ফুট জায়গা নিয়ে রুপোর রেলপথ পাতা হয়েছে একটা প্রকাণ্ড লোহার টেবিলের ওপর। হল্‌ঘরের দেওয়াল ফুঁড়ে ছোট ছোট টানেল তৈরি করা হয়েছে। সেই সুড়ঙ্গপথ দিয়ে রেলপথ চলে গেছে রন্ধনশালা পর্যন্ত। খানাপিনার দিন রাজার অতিথিরা প্রকাণ্ড লোহার টেবিলের চারপাশে বসতেন। স্বয়ং মহারাজা বসতেন টেবিলের মাথার দিকে। তাঁর পাশে থাকতো একটা বিশাল কনট্রোল প্যানেল। গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করা, থামানো বা বিপদ সংকেত দেওয়া— ইত্যাদি কাজ সীটে বসেই সম্পন্ন করতেন রাজা। কিচেন থেকে খাদ্যদ্রব্য বহন করে আনতো বৈদ্যুতিক ট্রেন এবং টেবিল আর কিচেনের মধ্যে সেটি মাকুর মতন ছুটো-ছুটি করতো। মহারাজা তদারকি করতেন অতিথিদের পছন্দ অপছন্দের। আবার কখনও বা একজনের জন্যে নিয়ে আসা ফলমিষ্টান্নাদির প্লেটখানা অন্য অতিথির পাতে পরিবেশন করে কিঞ্চিৎ আমোদও করতেন। মোটকথা কনট্রোল প্যানেলের সুইচ টিপে স্বয়ং মহারাজা অতিথিদের খাদ্যরুচির নিয়ন্ত্রণ করতেন।

কিন্তু একদিন ভোজের টেবিলে দারুণ এক অঘটন ঘটলো! যান্ত্রিক গোলযোগ ঘটে কনট্রোল প্যানেলে শর্ট সারকিট হলো। ভীতত্রস্ত অতিথিরা অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন কেমন লণ্ডভণ্ড কাণ্ডকারখানা শুরু করে দিয়েছে ট্রেন। ঝাল, ঝোল, অম্বল সব একাকার হয়ে গেছে। পুরী, সবজি, মাংস এক হয়ে মিশে পাঁক পাকিয়ে গেছে। বোধহয় রেলগাড়ির ইতিহাসে এমন বিপর্যয় আগে কখনও ঘটেনি।

রাজারাজড়াদের আর একটা প্রিয় নেশা ছিল সারমেয় পালন। এই অদ্ভুত নেশার প্রধান পৃষ্ঠপোশক ছিলেন জুনাগড়ের নবাব। বেশ কয়েকশ' প্রজাতির কুকুর

www.pathagar.com

। পুষতেন। শুধু প্রতিপালন নয়, তাদের আরাম স্বাচ্ছন্দ্যের তদারকি করতো এক ডজন চাকরবাকর। তাদের ঘরে বিজলী বাতি জ্বলতো, পাখা ঘুরতো। নবাবের ঘরের সংগে টেলিফোন যোগাযোগ ছিল সারমেয় ভবনের। কোন কুকুর মারা গেলে রীতিমত সামরিক মর্যাদায় তাকে কবর দেওয়া হ'ত।

নবাবের একটা প্রিয় কুকুরী ছিল। তার সংগে একটা শিকারী কুকুরের বিয়ে উপলক্ষ্য যে ঘটা হয়েছিল তা প্রায় তুলনাহীন। স্বয়ং বড়লাটও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন সেই অনুষ্ঠানে। অবশ্য বড়লাট না আসায় নবাববাহাদুর নাকি ভারী মনোকষ্ট পেয়েছিলেন। বিয়ের পর সারমেয় আর সারমেয়ীকে রীতিমত শোভাযাত্রা সহকারে নতুন ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেই অভূতপূর্ব জাঁকজমক দেখেছিল প্রায় দেড়লক্ষ প্রজা। শুধু তাই নয়। এই উপলক্ষে নবাব সাহেব দারুণ এক ভোজসভা দিয়েছিলেন। সব মিলিয়ে খরচ যা হয়েছিল সেই ষাট হাজার পাউন্ড ব্যয় করে জুনাগড়ের হতদরিদ্র হাজার বারো প্রজার সম্বৎসরের ভাতকাপড়ের সাশ্রয় করতে পারতেন নবাব।

রাজামহারাজাদের এইসব প্রাসাদভবনগুলো যেন তাজমহলের মতন তাঁদের কীর্তিস্তম্ভ ছিল যা আকারে এবং সম্পদে তাজমহলকেও হার মানায়। কিন্তু রুচির বালাই ছিল না রাজামহারাজাদের। ছ'শখানা ঘর বিশিষ্ট মহীশুরের রাজপ্রাসাদটা আয়তনে লাটপ্রাসাদকেও ছাপিয়ে যায়। ছ'শখানা ঘরের মধ্যে কুড়িটা ঘর ঠাসা থাকতো তিনপুরুষ ধরে শিকার করা বাঘ. চিতার চামড়ায়। রাতের বেলায় যখন হাজার হাজার বাল্বের আলোয় সমস্ত প্রাসাদভবনটা ঝলমল করতো তখন মনে হতো একটা অতিকায় সমুদ্রগামী জাহাজ (ওশ্যান লাইনার) ভারতবর্ষের ঠিক মধ্যিখানে যেন স্থলবন্দী হয়ে গেছে। জয়পুরের হাওয়া মহলের ন'শ তিপান্নটা জানলা শুধু তার সামনের অংশেই ছিল। ঝিকিমিকি ঝিলের জল থেকে উঠে আসা উদয়পুরের দুধসাদা মার্বেল প্রাসাদখানা আবছা কুয়াশার মধ্যে কেমন যেন রহস্যময় হানাবাড়ির মতন দেখাতো।

ভার্সাই প্রাসাদ দেখার সময়ই কাপুরথলার মহারাজার মনে মহান সম্রাট চতুর্দশ লুইয়ের পুনরবতার হওয়ার বাসনা জাগে এবং তখনই স্থির করে ফেলেন যে তাঁর ছোট্ট রাজ্যেও সূর্যদেবতার গৌরবকীর্তিগুলো পুনঃস্থাপন করবেন। অতএব সাজসাজরব উঠলো কাপুরথালায়। এসে পড়লো ফরাসী স্থপতি আর প্রাসাদপ্রসাধক (ডীজাইনর)। হিমালয়ের পায়ের তলায় ভার্সাই প্রাসাদের অনুকরণে তৈরি হ'ল মহারাজার প্রাসাদ। প্রাসাদের অলংকরণের জন্যে আনা হ'ল ফিনফিনে চীনামাটির টব এল প্যারিসে তৈরি করা বিশেষ নকশার দেওয়ালবস্ত্র (ট্যাপিস্ট্রি) এল প্রাচীন ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিক স্মৃতিচিহ্ন। শুধু তাই নয়, ফরাসী ভাষার চর্চা আবশ্যিক হ'ল রাজসভায় এবং উষ্ণীষধারী শিখ অনুচরের পোশাক হল চতুর্দশ লুইয়ের রাজসভার সভাসদদের মতন। তাদের মাথায় উঠলো পরচুল গায়ে চড়ানো হল সিল্কের ওয়েস্টকোট আর আঁটো পাজামা (নিকার্স)। তারা পায়ে দিল রুপোর বকলস দেওয়া চপ্পল।

কোন কোন প্রাসাদের মধ্যে রাজসিংহাসনের পারিপাট্যে এমন বিলাসিতা থাকতো যা পরবর্তী প্রজন্মের কাছেও এক অবিস্মরণীয় বস্তু হয়ে অক্ষত থাকে। যেমন মহীশূরের রাজাসনটি। ন'টা সিঁড়িযুক্ত এই সিংহাসনখানা তৈরি হয়েছিল

www.pathagar.com

এক টন পাকা সোনা দিয়ে। রাজামশাই সিংহাসনে উঠতেন ন'টা ধাপ ভেঙে। ধাপগুলো যেন ভগবান বিষ্ণুর সত্যারোহণের পথে ন'টি পদক্ষেপের প্রতীকস্বরূপ। উড়িষ্যার রাজাসনখানা ছিল একটা প্রকাণ্ড শয্যাবিশেষ। লণ্ডনের এক পুরনো জিনিসের কারবারীর দোকান থেকে এই শয্যাখানা কেনার পর তার গায়ে মণিমুক্তা বসানো হয়। এর প্রধান আকর্ষণ হলো এর ডিজাইন। শোনা যায় মহারানী ভিক্টোরিয়ার ফুলশয্যার খাটের মতন এটি দেখতে।

যে ঘরের মধ্যে রামপুরের নবাবের সিংহাসন ছিল সেটা দেখতে নাকি গির্জার মতন এবং যে উঁচু মঞ্চের ওপর সিংহাসনটা বসানো থাকতো সেটা নগ্ন নারীমূর্তির প্রতিরূপ। এই সিংহাসনের বিশেষত্ব হল যেখানে আসনের তলাটা ফাঁপা এবং সেখানে একটা মূত্রাধার আছে। ফলে রাজকাজের হানি না করে ইচ্ছামতন মূত্রত্যাগ করে নবাববাহাদুর স্বস্তি পেতে পারতেন।

স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়, যেখানে বিলাসোপকরণের এত বাহুল্য, সেখানে রাজারাজড়াদের সময় কিভাবে কাটতো। অনুমান করা যায় যে, এইসব অলস মুহূর্তগুলো নিশ্চয়ই তাদের বুকের ওপর বিশমণ বোঝার মতন চেপে থাকতো। তখন অবসর বিনোদনের মাত্র দুটিই উপায় ছিল তাদের। হয় শিকার নয়ত নির্বিচার রমণসুখ। দ্বিতীয়টির জন্যে দরকার হয় নিত্য নতুন নারী। তা এদের সেটা ছিল। হিন্দু বা মুসলমান, সব রাজামহারাজা বা নবাবের অন্তঃপুরেই একটা রক্ষিতাভবন বা হারেম থাকতো এবং নিত্য নতুন যুবতী নারীর আমদানি হ'ত সেখানে।

প্রায় সব রাজারই নিজস্ব মৃগয়ারণ্য ছিল। সেই অভয়ারণ্যের প্রধান শিকার ছিল বাঘ। ১৯৪৭ সালেই সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা বাঘের সংখ্যা ছিল কুড়ি হাজার। ভরতপুরের মহারাজা ছিলেন নিপুণ শার্দূল শিকারী। আট বছর বয়সেই প্রথম বাঘ শিকার করেন তিনি। যখন পঁয়ত্রিশ বছরে পা দিলেন তখন তাঁর হাতে নিহত বাঘের সংখ্যা এত বিপুল হয়ে গেছে যে, তাদের চামড়া জুড়ে তাঁর রীসেপসন্-রুমের চারখানা দেওয়ালই ঢেকে দেওয়া হয়। এই নির্ভীক শিকারী মহারাজার আর একটা অসাধারণ কৃতিত্ব হ'ল পাতিহাঁস শিকার। ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জকে কৃতার্থ করতে তিন ঘণ্টায় ৪৪৮২টা পাতিহাঁস মেরেছিলেন তিনি। গোয়ালিয়রের মহারাজা তাঁর সারাজীবনে ১৪০০টা বাঘ মেরেছিলেন। তাঁর লেখা 'এ গাইড টু টাইগার শুটিং' একটি বিখ্যাত বই। তবে এর প্রচার খুবই সীমাবদ্ধ।

অবশ্য নারী এবং বাঘ, দুই শিকারের ক্ষেত্রেই পাতিয়ালার সাত নম্বর শিখ রাজা ভূপিন্দার সিংয়ের সুনাম (দুর্নাম!) ছিল ভারতজোড়া। অমন রমণীমোহন চেহারার মানুষটা তাঁর সময়ে ছিলেন সাক্ষাৎ মন্মথ। ছ'ফুট চার ইঞ্চি মাপের বলিষ্ঠ মানুষটা সব বিচারেই ছিলেন একমাত্র পুরুষ। যেমন তাঁর কামাতুর পুরু ঠোঁট, তেমনি উদ্ধত চাহনি। তিনশ' পাউণ্ড ওজনের এই বিশালদেহী পুরুষটির মদগর্বীভাব, পিনের মতন সরু গোঁফের দুই প্রান্ত আর সিল্কের জালের মধ্যে গোটানো চাপ দাড়ি নিয়ে যে কোন নারীকেই ভোগ করার অধিকার তাঁর ছিল। তাঁর দিকে চাইলে মনে হ'ত যেন হাতির দাঁতের ফ্রেমের মধ্যে আবদ্ধ মোগল যুগের কোন বাদশা, ফ্রেমের ভিতর থেকে সবে উঠে এসেছেন বর্তমান শতাব্দীতে।

ভূপিন্দারের ঔদরিক খ্যাতির কথা সবারই জানা। এক এক দফায় বিশ পাউণ্ড ওজনের খাদ্যবস্তু উদরসাৎ করা বা চায়ের আসরে বসে খান কয়েক কুক্কুটশাবক হজম

www.pathagar.com

র কাছে মোটেই কঠিন কাজ ছিল না। উত্তম পোলো খেলোয়াড় হিসেবেও ধারের যথেষ্ট হাঁকডাক ছিল। টাইগার্স অব পাতিয়ালা নামে পোলো দলের টন্ হয়ে অনেক পুরস্কার জিতেছেন তিনি। তাঁর আস্তাবলে সবসময়ই ০টা টাট্টু ঘোড়া মজুত থাকতো।

বলাবাহুল্য, এইসব সাফল্য রাজোচিত মর্যাদারই যোগ্য প্রতিফলন। তবে ধু শিকারনৈপুণ্য বা পোলো খেলাই নয়, রতিক্রীড়াতেও ভূপিন্দর ছিলেন সমান করিতকর্মা। বয়ঃসন্ধির সময় থেকেই তিনি নারীপরিবৃত্ত হয়ে থাকতেন। তারপর যৌবনকাল প্রাপ্ত হয়ে বহু নারী সমাগমে আরও মনোযোগী হয়ে উঠলেন কাম-ক্রীড়ায়। তখন চুলোয় গেল তাঁর পোলো খেলা। সারা দেশের সুন্দরী রমণীদের সংগ্রহ করে তাঁর হারেমে পুরতে লাগলেন। তাঁর এই বাছাইয়ে কোন খুঁত থাকতো না। বিভিন্ন প্রকার রতিক্রীড়ায় নিপুণ এইসব মনোহারিণীদের এক বিচিত্র সমাহার হয়ে উঠেছিল তাঁর হারেম। সুতরাং হারেম নামক এই অবৈধ রাজঅন্তঃপুর যখন পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হলো তখন তাঁর অন্তপুরবাসিনীদের সংখ্যা ছিল সাড়ে তিনশ'।

ঘোর গ্রীষ্মে পাঞ্জাব যখন দগ্ধ হচ্ছে, তখন তাপের জ্বালা জুড়াতে এক অভিনব জলবিহারের ব্যবস্থা করেছিলেন ভূপিন্দর। সূর্যাস্তের পর হারেমের দরজা খুলে দেওয়া হতো। সুন্দরীরা নগ্ন শরীরে মহারাজার খাস দীঘির জলে নামতো। জলাশয়ের ধারে নগ্ন দিব্যাঙ্গনাদের দাঁড় করিয়ে রাখা হতো। চাঙড় চাঙড় বরফ ফেলা হতো পুকুরে। তারপর পুকুরের গরম বাতাস যথেষ্ট শীতল হলে মহারাজা ভূপিন্দর জলে নেমে সাঁতার কাটতেন এবং হুইস্কি পানের ফাঁকে ফাঁকে সুস্তনী-দের সঙ্গে বিহার করতেন। তাঁর একান্ত ঘরের সীলিং এবং চারখানা দেওয়ালের গায়ে মিথুনাসক্ত স্ত্রীপুরুষের নানা ভঙ্গীর ছবি আঁকা থাকতো।

তবুও যেন মহারাজার যৌনতৃপ্তি পরিপূর্ণ হতো না এবং এই অতৃপ্তি দূর করতেই নানারকম বিকৃতির আশ্রয় নিতেন। রক্ষিতাদের মনের মতন ভোগ্যা করতে নিত্য নতুন ভাবে তাদের সাজতে হতো। হারেমের দরজা অবাধ থাকতো দরজী, সেক্‌রা, সুগন্ধি বিক্রেতা এবং বেশকারদের জন্যে। তাছাড়া তাঁর তাঁবে কাজ করতো বেশ কিছু ফরাসী, ইংরেজ আর ভারতীয় শল্যচিকিৎসক। মহারাজার রুচি অনু-যায়ী রক্ষিতাদের মুখের বা শরীরের গড়নের (ফিজিয়গ্‌নমি) হেরফের করতো তারা। সাধারণত লন্ডনের ফ্যাশন পত্রিকার নির্দেশ মতই এই নিষ্ঠুর ব্যভিচার করতেন ভূপিন্দর। তাঁর অতৃপ্ত যৌনক্ষুধা উদ্দীপ্ত করতে হারেমের একটা দিকে পরীক্ষাগার বসিয়েছিলেন তিনি। সেখানে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরি হতো কামোদ্দীপক মদিরা, মাদক কিংবা কবচতাবিজ।

শেষ পর্যন্ত এইসব বিচিত্র রসায়নপ্রক্রিয়ার ব্যবহার হতে লাগলো মহারাজার প্রমোদ ভবনের দোর খোলা রাখতে। কারণ, ভূপিন্দর সিংএর মতন বলিষ্ঠ পুরুষও যেন হারেমের সাড়ে তিনশ' কামক্রীড়া পটিয়সী পয়োধরাদের সঙ্গে আশ মিটিয়ে রতিসুখ ভোগ করতে পারলেন না। হয়ত সম্ভবও ছিল না। তাই কামোদ্দীপক মাদক সেবন প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠলো মহারাজার কাছে। তাঁর পালিত বদ্যি হাকিমরা সোনা, রুপো এবং মুক্তাভস্ম ইত্যাদি দিয়ে যে তরল মদিরা তৈরি করতে লাগলো, তা খুবই উত্তেজক হতো।

কিন্তু এই উত্তেজক মাদকের প্রভাবও ক্রমে ক্রমে হ্রাস পেতে লাগলো। তখন

www.pathagar.com

মহারাজার ধারণা হলো বিদেশী বিশেষজ্ঞরাই তাঁর এই অবসাদের চিকিৎসা পারবে। কিন্তু ফরাসী বিশেষজ্ঞদের বিশেষ রেডিয়াম চিকিৎসার প্রভাবও দী স্থায়ী হলো না। ক্রমে ক্রমে জানা গেল, যে ব্যাধিতে তিনি ভুগছেন, তার চিকিৎসা নেই। এই ব্যাধি পুরুষত্বহীনতা নয়। সাধারণত ভোগী রাজাদের ব্যাধি হয়, সেই অতিভোগজনিত ক্লীবত্ব এটা নয়। এ এক বিচিত্র অসুখ। ভোগে যেন বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল তাঁর এবং তাতেই তিনি মারা যান।

ভগবদভক্তির দেশ বলে এদেশের গল্পপুরাণে রাজাদের ঈশ্বরের অংশ বলা হয়। যেমন মহীশূরের মহারাজারা নাকি সরাসরি চন্দ্রবংশজাত। বছরে একবার, যখন শরৎকালে দিনরাত সমান হয় (ঈকুইনক্স্) সেদিন প্রজাদের কাছে সাক্ষাৎ ঈশ্বর হয়ে আবির্ভূত হন মহারাজা। তা ভগবান হলে সর্বক্ষণ লোকের সামনে ঘোরা যায় না। তাই তিনি অদৃশ্য হতেন। তবে পাহাড়ে যেতেন না। প্রাসাদের মধ্যেই একটা অন্ধকার ঘরে ন'দিন বন্ধ থাকতেন। এই ন'দিন তিনি দাড়ি কামাতেন না, স্নান করতেন না, কেউ তাঁকে ছুঁতে পেত না, দেখতেও পেত না। নবম দিনে তিনি ঘর থেকে বেরোতেন। তখন প্রাসাদের বাইরে অপেক্ষা করে থাকতো তাঁর প্রিয় হস্তীবাহনটি। তার সারা গায়ে ঝলমল করতো সোনার ঝালর। কপালে পরানো থাকতো মণিমুক্তার টিকলি। মহারাজা এসে তাঁর প্রিয় হাতির পিঠে চড়তেন। তারপর বল্লমধারী সেনাবাহিনীর রক্ষাধীনে থেকে তিনি যেখানে যেতেন সেটা কোন দেবালয় নয়। বরং ব্যাপারটা কিছুটা অ-ধর্মীয়। মহারাজা যেতেন ঘোড়দৌড়ের মাঠে। সেখানে একজন পুরোহিত তাঁকে মন্ত্র পাঠ করাতেন। তারপর রাজাকে ক্ষৌরী করে, স্নান করিয়ে দেওয়া হ'ত এবং খেতে দেওয়া হ'ত। সূর্যাস্ত হলে সারা মাঠে যখন অন্ধকার নেমে আসতো তখন একটা কালো ঘোড়া রাজামশাইয়ের সামনে আনা হতো। তিনি যেমনি কালো ঘোড়ার পিঠে চড়তেন, অমনি সারা মাঠ জুড়ে জ্বলে উঠতো হাজার হাজার মশাল। তখন মশালের লাল আলোয় ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে সারা মাঠ ঘুরে বেড়াতেন মহারাজা। প্রজারা হর্ষধ্বনি করতো। তাদের মনে হতো চন্দ্রের বরপুত্র হয়ে স্বয়ং মহারাজা তাদের কৃপা করতে এসেছেন। এমন বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা দেখে সবাই ভাগ্যবান মনে করতো নিজেদের।

উদয়পুরের মহারাজার বংশধারাও খুব কুলীন। বলা হয় সূর্যবংশজাত তাঁরা। উদয়পুরের রাজাসনটি নাকি প্রাচীনতম। দু হাজার বছরের প্রাচীন এই সিংহাসনে সম্মানের সঙ্গে আসীন হয়ে আছেন বর্তমান রাজবংশ। বছরে একবার উদয়পুরের মহারাজও দেহায়িত ঈশ্বর হিসেবে পূজিত হন। সেদিন একটা বজরায় চড়িয়ে কুমির উপদ্রুত লেকের জলে তাঁকে ঘোরানো হয় এবং নতুনভাবে রাজতক্তে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বজরার পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে রাজ্যাভিষেকের এই উৎসবটি সাদা পোশাক পরা সভাসদরা পরম শ্রদ্ধাভরে দেখেন।

তবে জাঁকজমকে বাড়াবাড়ি না থাকলেও ধর্মীয় ঐতিহ্য পালনে কাশীর রাজার ভূমিকাও অকিঞ্চিৎকর ছিল না। পারিবারিক ধারা অক্ষুন্ন রেখে প্রতিদিনই সকালে একটি পুণ্যকর্ম তিনি সম্পন্ন করতেন। এই পুণ্যকর্ম হলো একটি গাভী দর্শন। রোজ সকালে চোখ খুলেই গাভীটি তিনি দেখতেন। তাঁর শোবার ঘরের জানলার কাছে গাভীটিকে আনা হতো, তারপর পাঁজরে খোঁচা দিয়ে তাকে উত্তেজিত করা হতো। অবোধ জীবটি হাম্বা ডাক দিলেই রাজা চোখ খুলে তাকে দর্শন করতেন

www.pathagar.com

..। হতেন। হিন্দু ধর্মে গাভী খুবই পবিত্র জীব এবং ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ততার ..এই জীবটি দর্শন করে রাজার যে পুণ্যার্জন হতো, তাতে খুবই ঐহিক ..বোধ করতেন রাজা। কিন্তু একবার একটি অঘটন ঘটলো। প্রতিবেশী ..পুরের নবাবের নিমন্ত্রণ পেয়ে কাশীর রাজা রামপুরে এলেন। মান্য অতিথির ..ন্য তিনতলার মহল ছেড়ে দিলেন নবাব। তবুও কাশীর রাজা খুবই বিষণ্ণ কারণ ..রদিন সকালে প্রাত্যহিক পুণ্যকর্মটি তিনি পালন করতে পারবেন না। তখন রামপুরের নবাবই রাজার মুশকিল আসান করে দিলেন এক অভিনব পন্থায়। তার পরামর্শে একটা ক্রেন আনানো হলো, যাতে তিনতলায় রাজার ঘরের জানলার সামনে গাভীটাকে নিয়ে দাঁড় করানো যায়। কিন্তু অবোধ জীবটাকে যখন ক্রেনের মধ্যে তোলা হলো তখন ভয় পাওয়া জন্তুটার হাম্বা রব শুনে শুধু কাশীর রাজারই নয়, সারা প্রাসাদেরই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল সেই সকালে।

আস্তিক বা নাস্তিক, হিন্দু বা মুসলমান, ধনী বা নির্ধন, কিংবা পুণ্যাত্মা বা পাপাচারী যে যেমনই হ'ক, কয়েকশ বছর ধরে এইসব রাজারাই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নিশ্চিন্ত স্তম্ভ ছিল। এদের সংগে সম্পর্ক বজায় রেখেই ইংরেজ এদেশে 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতিতে শাসন কাজ চালিয়ে গেছে। নীতিগতভাবে এইসব রাজাদের বিরুদ্ধে অপশাসনের অভিযোগ এনে সিংহাসনচ্যুত করার ক্ষমতা ব্রিটিশের ছিল। কিন্তু কার্যত তেমনটি ব্রিটিশরাজ কখনও করেনি। ব্রিটিশরাজের প্রতি এইসব দেশীয় রাজাদের আনুগত্য যতদিন অক্ষুণ্ণ ছিল ততদিন পর্যন্ত রাজ্যের মধ্যে খুন রাহাজানির ঘটনাগুলো নির্বিবাদেই মেনে নিয়েছে ব্রিটিশ, দেখেও দেখেনি। তবে দেশীয় রাজারাও অকৃতজ্ঞ নয়। ধারাবাহিকভাবে ইংরেজের এই দানের যোগ্য প্রতিদানই তারা দিয়েছে। এদের প্রতিবিপ্লবী চরিত্রই অমন নির্বিবাদে তাদের প্রভুভক্ত করেছিল। ফলে ভারতের মেন ল্যান্ড যখন বিপ্লবের আগুনে জ্বলছে তখন সীমানার বাইরে নোঙর করে বিপ্লবী হাওয়াকে ঠেকিয়ে রেখেছিল তারা, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে দেয় নি।

অবশ্য রাজারাজড়াদের ইংরেজভজনা শুধু এইটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। আরও বাস্তব ছিল তাদের এই ইংরেজস্তুতি। যোধপুরের অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব না থাকলে তুর্কীদের অধিকার থেকে হাইফা বন্দর ইংরেজ কেড়ে নিতে পারতো না।* বিকানীরের ক্যামেল কোর, বা উষ্ট্রবাহিনী ইংরেজের পক্ষে দু-দুটো লড়াইয়ে সামিল হয়েছিল। গোয়ালিয়রের রাজা তিন ব্যাটালিয়ন পদাতিক আর পুরো একটা হাসপাতাল জাহাজ পাঠিয়ে অবরুদ্ধ ইংরেজকে সাহায্য করেছিল ১৯১৭ সালের যুদ্ধে। এইসব সেনাবাহিনীর পালন পোষণ হতো রাজাদেরই টাকায়। ইংরেজ সরকার এর জন্যে একটা পাই পয়সাও কখনও দেয় নি তাদের।

---

* যোধপুরের এই মহারাজাই অভিজাত ইংরেজ সমাজে পা-আঁটা ব্রীচেস চালু করে দিয়েছিলেন। ঘটনাটা ঘটেছিল মহারানী ভিক্টোরিয়ার হীরক-জয়ন্তী উৎসবের সময়। উৎসবে যোগ দিতে লণ্ডনে পৌছেছেন যোধপুরের মহারাজা। পৌছে শুনলেন যে জাহাজে তাঁর পোশাক আসছিল সেই জাহাজটা জলে ডুবে গেছে। মহারাজা তখন একবস্ত্রে লণ্ডনে ঘুরছেন। নিরুপায় হয়ে সাহেব দরজী ডাকিয়ে পোশাক তৈরি করতে দিলেন তিনি। পা-আঁটা ব্রীচেস্ তৈরির কৌশল তখনই শিখে নেয় লণ্ডনের সাহেব দরজী। সেই থেকেই অভিজাত মহলে পোশাকটা চালু হয়ে যায়।

www.pathagar.com

১৯৪৩ সালে জয়পুরের মহারাজা নিজে তাঁর 'ফার্স্ট' জয়পুর ইন্‌ফ্যান্‌ট্রি'র নেতৃত্ব দেন ইতালির মন্টি ক্যাসিনোর উতরাই পথে। বর্মা মুলুকে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে বুন্দীর মহারাজাকে 'মিলিটারি ক্রস' পদক দেওয়া হয়েছিল।

ইংরেজও অকৃতজ্ঞ ছিল না। এতগুলো ভরণীয় পোষ্যের শুধু প্রতিপালন নয়, মর্যাদার সঙ্গে ঋণস্বীকার করাও তার কর্তব্য। সেই কর্তব্য সে পালন করতো খুবই সতর্কতার সঙ্গে। কাউকে সাম্মানিক পদ দিয়ে, কাউকে মণিমুক্তো বসানো পদক দিয়ে। গোয়ালিয়র এবং কুচবিহারের মহারাজাদের অনারয়ারি এ.ডি.সি. করা হয় যাতে সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের অভিষেকের সময় রাজশকটের পাশাপাশি তাঁরা ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারেন। তাছাড়া অনেক রাজা এবং তার বংশধরদের জন্যে অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডিগ্রিও বরাদ্দ ছিল। যারা সবচেয়ে রাজভক্ত তাদের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল খুবই মূল্যবান রত্নখচিত পদক, যেমন অর্ডার অব দ্য স্টার অব ইণ্ডিয়া কিংবা অর্ডার অব দ্য ইণ্ডিয়ান এম্‌পারার।

জায়গীরভোগী এইসব গোলামদের কাকে কতখানি সম্মান দেওয়া হবে তা নির্ধারণ করার একটা অদ্ভুত পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল ব্রিটিশ ক্রাউন। এই মাপকাঠিটা হলো রাজাদের সম্মানে তোপধ্বনির সংখ্যা। রাজতন্ত্রের কাঠামোতে কোন্ রাজার স্থান কোথায় হওয়া উচিত তা নির্ণয় করতো এই তোপধ্বনি। একমাত্র বড়লাটবাহাদুরই নির্বাচন করতেন কোন রাজার সম্মানে কতগুলো তোপ দাগা হবে। রাজ্যের আয়তন বা জনসংখ্যা এর বিচারের মাপকাঠি ছিল না। বড়লাটবাহাদুর বিচার করতেন রাজকোষের সমৃদ্ধি, রাজরক্তের কৌলীন্য আর সর্বোপরি ব্রিটিশ-রাজের প্রতি তাদের আনুগত্যবোধ। তিনিই পারতেন তোপধ্বনির সংখ্যা বাড়াতে বা কমাতে। পাঁচটি প্রধান জায়গীরভোগী রাজা যেমন হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর, গোয়ালিয়র, মহীশূর এবং বরোদার বরাদ্দ ছিল ২১ বার তোপধ্বনির সম্মান। ক্রমানুসারে কেউ পেত ১৯, কেউ পেত ১৭, কেউ ১৫ কিংবা ৯টি তোপের আখ্যা। তবে মোট ৪২৫ জন রাজা, নবাব বা জমিদারদের কপালে একটা তোপধ্বনিও বরাদ্দ ছিল না। বলতে গেলে এইসব হতভাগ্য ভূস্বামীরা প্রায় বিস্মৃতই ছিল। ব্রিটিশ ক্রাউনের নেকনজর কোনদিনই পায় নি তারা এবং তাদের সম্মানে একটা তোপও দাগা হয় নি কখনও।

নানা প্রগতিবাদী কর্মদ্যোগের জন্যে মহারাজাদের ভারতবর্ষ বেশ অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছিল। বেশির ভাগ রাজাই শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত ছিল। অনেকেই বিলেতে গিয়ে লেখাপড়া শিখেছিল। সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মেই অনেক রাজার মনই মুক্ত ছিল। ফলে সেইসব রাজার রাজত্বে সাধারণ প্রজারা যে সামাজিক সুবিধা বা অধিকার ভোগ করতো ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষের মানুষের কাছে তা প্রায় অজ্ঞাতই ছিল। বরোদার রাজা আইন করে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করে দেন। তাছাড়া আগের শতকেই শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করেছিলেন তিনি। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্যে রীতিমত সরকারী উদ্যোগ নেওয়া হতো বরোদায়। তেমন প্রচার না হলেও গান্ধীজীর প্রয়াসের চেয়ে তা কোন অংশে কম ছিল না। প্রতিষ্ঠান গড়ে, তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করে তাদের মূল্যস্রোতে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে খুবই প্রশংসনীয় উদ্যম নিয়েছিলেন বরোদার রাজতন্ত্র। বরোদার রাজা এমন একজন মানুষকে আমেরিকার কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখতে

www.pathagar.com

পাঠিয়েছিলেন, যিনি পরে হরিজনদের নেতৃত্ব দেন। ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকর খুবই প্রিয়জন ছিলেন বরোদার রাজার তাই আমেরিকায় তাঁর উচ্চশিক্ষার সব ভার তিনিই নেন। বিকানীরের রাজা রাজস্থানের একটুকরো মরুঅঞ্চলকে ঝিল, দীঘি আর বাগানে মনোরম করে সাজিয়ে দেন। ভুপালের রাজা তাঁর রাজ্যে মেয়েদের যে অধিকার আর মর্যাদা দিয়েছিলেন, ভারতবর্ষের আর কোথাও তেমনটি দেখা যায় না। মহীশূরের রাজা তাঁর রাজ্যের বৈজ্ঞানিক আর প্রযুক্তিবিদদের দিয়ে অনেকগুলো হাইড্রো-ইলেকট্রিক বাঁধ তৈরি করিয়েছিলেন। এর ফলে রাজ্যের সাধারণ চাষীর খুব উপকার হয়েছিল। জয়পুরের মহারাজা ছিলেন তাঁর বংশের এমন একজন প্রতিভাবান জ্যোতির্বিজ্ঞানীর বংশধর যিনি ইউক্লিডের প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্‌ অব জিয়োমেট্রি নামক জ্যামিতিশাস্ত্রের বিখ্যাত বইটা সংস্কৃতে অনুবাদ করেন। তাছাড়া তাঁর রাজ্যে তিনি যে মানমন্দিরটা তৈরি করান তেমন অব্‌জারভ্যাটারি সারা দুনিয়াতেই কম আছে। রাজামহারাজাদের পরবর্তী বংশধররা সিংহাসনে বসেই প্রমাণ করে দেন যে রুচি আর স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁদের অগ্রজদের চেয়েও তাঁরা অগ্রসর মনের মানুষ ছিলেন। পাতিয়ালা স্টেটের অষ্টম মহারাজা সিংহাসনে বসেই বাপের তৈরি অমন জমজমাট 'হারেম' প্রাসাদ থেকে ঝেঁটিয়ে দূর করে দেন। গোয়ালিয়রের মহারাজা একজন সাধারণ ঘরের রাজকর্মচারীর শিক্ষিতা ও রুচিসম্পন্না মেয়েকে বিয়ে করে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভারী মজার কথা হয়ত বা দুঃখেরও যে, এইরকম শিক্ষিত প্রগতিবাদী রাজন্যবর্গ থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ সেই আদিম ঘরানার বিকৃতরুচির অপব্যয়ী খামখেয়ালী রাজাদের কথাই মনে রেখেছে। এঁদের কথা মনে রাখে নি।

ভারতের যে দুটো স্টেট ২১টা তোপধ্বনির সম্মান পেত, তাদের জন্যেই যে বিশেষ তদবির করতে কনরাড লণ্ডনে বসে ছিল সে কথা বলেছি। এর একটা বিশেষ গুরুত্ব ছিল তখন কারণ, দুটো রাজ্যই মাপে বিশাল আর দুটো রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান একটু অন্যরকম। দুটো স্টেটই স্থলবন্দী (ল্যাণ্ড-লক্‌ট্‌)। দুই রাজ্যের রাজাই তাঁর প্রজাদের সংগে এক ধর্মবন্ধনে আবদ্ধ নন। আর দু-রাজ্যের রাজাই মনে মনে স্বপ্ন দেখতেন যে ব্রিটিশ ক্রাউন তাঁদের স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজার মর্যাদা দেবেন।

ভারতীয় রাজন্যপরিবারের মধ্যে সব থেকে পাগলাটে ছিলেন হায়দ্রাবাদের নিজাম। তিনি ছিলেন রুস্তম-ই-দৌড়ান, আরাস্তু-ই-জমান, ওয়ালমা মালিক, আশীফ্‌জা, নবাব মীর ওসমান, আলী খান্‌ বাহাদুর, মুজফ্‌ফর উল্‌মুল্‌ক্‌ নিজাম-অল্‌-মুদ্‌, সিপাহ্‌ সালার ফতে জং। তিনি হলেন ব্রিটিশ ক্রাউনের সবচেয়ে অনুগত সপ্তম নিজাম এবং সবচেয়ে বিচিত্র চরিত্রের। এক ইসলামী রাজগোষ্ঠীর মদত নিয়ে এই গোঁড়া এবং শিক্ষিত মুসলমানটি যে রাজ্যটার নৃপতি হয়ে ছিলেন তার বিপুল প্রজাসংখ্যার মধ্যে দুকোটি ছিল হিন্দু আর মাত্র তিরিশ লক্ষ মুসলমান। বৃদ্ধ নিজাম ছিলেন ছোটখাট মানুষ এবং ক্ষীণদেহ। মাত্র পাঁচফুট তিন ইঞ্চি মাপের মানুষটার ওজন নব্বুই পাউণ্ডের মতন। সুদীর্ঘকাল ধরে একনিষ্ঠ তাম্বুলসেবী হবার দরুন দাঁতের পাটি পানের রঙের ছোপলাগা। মানুষটি সর্বক্ষণই ভয়ে ভয়ে থাকেন এই বুঝি কেউ তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবে। তাঁর ধারণা প্রাসাদের সর্বত্রই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। তাই যেখানেই তিনি যেতেন সংগে

www.pathagar.com

একজন চাখনদার থাকতো। এই লোকটাই তাঁর জন্যে বরাদ্দ ভক্ষ্যবস্তু যেমন ফল, মিষ্টি, দুধের সর, পান, আফিং ইত্যাদি চেখে দেখতো। সারা ভারতের মধ্যে শুধু হায়দ্রাবাদের নিজামকেই হিজ্ এগ্‌জল্‌টেড হাইনেস খেতাব দেওয়া হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজের যুদ্ধতহবিলে ২৫ লক্ষ পাউন্ড দান করে তাদের কৃতার্থ করেই এই সম্ভ্রমসূচক খেতাবটি আদায় করেন নিজাম।

১৯৪৭ সালে পৃথিবীর সেরা ধনী হিসেবে তাঁর খ্যাতিপ্রতিপত্তি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তবে যে খ্যাতিটা তাঁর ঐশ্বর্যকেও ছাপিয়ে যায় সেটা হলো তাঁর কৃপণতা নিয়ে নানা গল্পকথা বা লেজেন্ড। সেসব গল্পের সবক'টিই যে অলীক তা-ও নয়। তাঁর নিত্যকার পোশাক ছিল সুতির কোঁচকান পাজামা আর বাজার থেকে কেনা পাঁচটাকা দামের একটা সস্তা চপ্পল। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে যে ফেজ্ টুপিটা তিনি পরতেন সেটা একদিনও কাচা হয় নি। নোংরা টুপিটা ছিল উকুনভর্তি। মানুষটা এত কৃপণ আর নোংরা স্বভাবের ছিলেন যে অতিথিদের ফেলে দেওয়া সিগারেটের টুকরোগুলো তুলে ধূমপান করতেন। শতাধিক সোনার থালবাটি থাকলেও মেঝের ওপর আসন পেতে বসে কাঁসার বাসনে আহার্য খেতেন। যখন বিশেষ রাজকাজের জন্যে সরকারী ভোজের আয়োজন করা হতো, তখন টেবিলের ওপর একটাই শ্যাম্পেন মদের বোতল রাখতেন। ১৯৪৪ সালে তৎকালীন বড়লাট লর্ড ওয়াভেল হায়দ্রাবাদ ভ্রমণে আসছেন শুনে নিজাম প্রমাদ গনলেন। তাড়াতাড়ি দিল্লিতে তার পাঠিয়ে জানতে চাইলেন যে বড়লাটের সম্মানে দুর্মূল্য শ্যাম্পেন মদ পরিবেশন আবশ্যিক কি না। ইংরেজ সরকারের সাহেব রেসিডেন্ট প্রতি রবিবার তাঁর সংগে সৌজন্যসাক্ষাৎ করতে আসতেন। তখন নির্দেশ মতন পরিচারক ট্রের ওপর সাজিয়ে আনতো এক কাপ চা, একখানা বিস্কুট আর একটা সিগারেট। এক রবিবার রেসিডেন্ট সাহেবের সংগে একজন মান্য অতিথিও এলেন। নিজাম বাহাদুর চুপি চুপি পরিচারককে আর এক কাপ চা, আর একটা বিস্কুট ও সিগারেট আনতে বলে দিলেন।

প্রায় সব দেশীয় রাজ্যেই বছরে একবার রাজার সম্মানে ভেট দেবার প্রথা আছে। রাজামহারাজার সম্মানে প্রদত্ত এই প্রতীকী উপহার রাজামশাইরা গ্রহণ করেন না। শুধু স্পর্শ করেই উপহারদাতাকে ধন্য করেন এবং তাকে ফিরিয়ে দেন। কিন্তু কৃপণ নিজামবাহাদুর সেই 'সওগাত' ফেরত দিতেন না। যে যা দিত সবই নিতেন এবং সিংহাসনের পাশে রাখা একটা কাগজের ঠোঙার মধ্যে ভরতেন। একবার একটা মজার ঘটনা ঘটে। হাত থেকে একটা সোনার মুদ্রা মাটিতে পড়ে গড়িয়ে যাচ্ছিল। সংগে সংগে সিংহাসন থেকে প্রায় বন্দুকের গুলির মতন ছিটকে গিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ধাওয়া করেছিলেন সেই গড়ানো মুদ্রাটার দিকে।

মানুষটার কৃপণতা নিয়ে এমন অনেক ঘটনাই প্রচলিত আছে সারা দেশে। একবার বোম্বাই থেকে একজন সাহেব ডাক্তার এসেছেন নিজামের চিকিৎসা করতে। রুগীর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন মাপতে সংগে ই.সি.জি. যন্ত্র এনেছেন ডাক্তার। কিন্তু যন্ত্র কাজ করলো না। পরে ডাক্তার আবিষ্কার করলেন যে প্রাসাদের সর্বত্র বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়ার দরুনই এই বিভ্রাট ঘটেছে। নিজামও বোধহয় হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন কারণ চিকিৎসার অপব্যয় থেকে রেহাই পেয়েছিলেন সেদিন।

প্রাসাদের মধ্যে নানা আবর্জনার স্তূপে তাঁর শোবার ঘরখানা প্রায় আঁস্তাকুড় হয়ে উঠেছিল। একটা ভাঙা খাট আর নড়বড়ে টেবিল, খানতিনেক কিচেন চেয়ার

www.pathagar.com

সিগারেটের টুকরা আর উপচীয়মান ছাইদান, বাতিল ছেঁড়া কাগজভর্তি টুকরি ইত্যাদিতে বোঝাই হয়ে থাকতো ঘরখানা। ঘরময় ছড়ানো ছিল ধুলোমাখা নানারকম দুষ্প্রাপ্য ঐতিহাসিক সংগ্রহ। সমস্ত ঘরখানার ছাদ আর দেওয়ালকটা মাকড়সার জালে বন হয়ে থাকতো।

তবুও প্রাসাদের নানা আলক্ষ্য অংশে অবহেলায় পড়ে থাকতো এমন বহুমূল্য রত্ন যার কোন হিসেব নেই। নিজামের টেবিলের ডেস্কের মধ্যে পুরনো খবরের কাগজ মোড়া পাতিলেবুর মাপের একটা ঝকঝকে হীরা ছিল। সেটাকে তাঁর কাগজচাপা হিসাবে ব্যবহার করতেন নিজাম। তাঁর বাগানের ঘন গাছপালার মধ্যে পাঁকের ভিতরে চাকা পর্যন্ত ডুবে যাওয়া সোনার তাল ভর্তি বারটা ট্রাক পড়ে ছিল। তাঁর চোখ ধাঁধানো রত্নভাণ্ডার দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়। শুধু নানা মাপের মুক্তার সংখ্যা এত অধিক ছিল যা দিয়ে পিকাডেলী সার্কাসের সবক'টি ফুটপাত মুড়ে দেওয়া যায়। প্রাসাদের গোপন গর্ভঘরের মেঝের ওপর কয়লার টুকরোর মতন যত্রতত্র পড়ে থাকতো বহুমূল্য সব রত্ন। কোনটা হলুদ পান্না, কোনটা নীলকান্ত বৈদুর্য মণি, কোনটা সাদা ঝকমকে হীরা। তাঁর হাতে নগদ টাকার যে বিপুল পরিমাণ সঞ্চয় মজুত থাকতো, স্টার্লিং আর টাকায় মিলিয়ে তা প্রায় বিশলক্ষ। পুরনো খবরের কাগজে মোড়া এই টাকার বাণ্ডিলটা ভূগর্ভের একটা ছোট্ট ঘরে ধুলোভরা কোণে ফেলা থাকতো আর সুদেমূলে না বেড়ে লক্ষ লক্ষ টাকার সেই কাগুজে নোটগুলো ইঁদুরের দাঁতে দংশিত হতে হতে আয়তনে কমতো।

নিজামের একটা নিজস্ব প্রমাণ মাপের সৈন্যবাহিনী ছিল। ছিল তাঁর নিজস্ব গোলন্দাজ সৈন্য আর বিমানবাহিনী। প্রতিরক্ষার এই উপকরণ দিয়ে স্বাধানীতা রক্ষার সব আয়োজনই তিনি করেছিলেন। শুধু পারেন নি দুটি ব্যবস্থা করতে। একটা সী পোর্ট অর্থাৎ সমুদ্র বন্দর আর অন্যটা পীপল্স্ সাপোর্ট অর্থাৎ জনগণের পৃষ্ঠপোষকতা। বস্তুত তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু প্রজারা সংখ্যালঘু মুসলমান রাজতন্ত্রকে কোনদিনই সমীহর চোখে দেখে নি। বলতে কি, মনে মনে ওদের ঘেন্না করতো হিন্দুরা। তাহলেও কিছুটা পাগলাটে এবং কৃপণ নিজামের মনে হায়দ্রাবাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোন সংশয় ছিল না। তিনি যেন বুঝতে পেরেছিলেন যে ফ্রান্সের আয়তনের অর্ধেক এই হায়দ্রাবাদের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। তাই কনরাড্ করফিল্ড যখন ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ব্রিটেনের ভারত ছাড়ার কথা জানালো, তখন চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে চীৎকার করে নিজাম বলে উঠেছিলেন, 'এবার তাহলে আমি স্বাধীন হবো।'

ঠিক একইরকম উচ্চাকাঙ্ক্ষার আগুনে ধিকিধিকি পুড়ছিল আর একটা মন। ভারতের আর একপ্রান্তে অবস্থিত পাহাড় ঘেরা উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত সেই নয়নসুখকর রাজ্যের রাজা তিনি। কাশ্মীর সেই স্বর্গরাজ্য যার অপ্রতিম নিসর্গ শোভা মর্ত্যের কোথাও দেখা যায় না। এখানকার রাজা হরি সিং একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ। অথচ তাঁর অধীনস্থ প্রায় চল্লিশ লক্ষাধিক প্রজাদের সবাই মুসলমান। তুষারমৌলি হিমালয়ের উন্নত পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত এই কাশ্মীর উপত্যকা যেন বাত্যাক্ষুব্ধ লাদাখ্, তিব্বত ও সিংকিয়াংয়ের মাথার উপরের ঘর। কাশ্মীর এমন এক সন্ধিস্থল যেখানে দেখা হতে পারে তিন শক্তির, চীন, আফগানিস্তান এবং ভবিষ্যতের পাকিস্তানের। হয়ত অধিকার সাব্যস্ত করতে এরা সবাই হাত বাড়াতে পারে কাশ্মীরের দিকে কোনও একদিন।

www.pathagar.com

কাশ্মীরের অস্থিরমতি রাজা হরি সিং একজন দুর্বল মানুষ। সিদ্ধান্ত নিতে অপারগ মানুষটা তাঁর অলস সময়টা ভাগ করে নিয়েছিল দুভাগে। শীতে জম্মুর প্রাসাদভবনে শুধু খানাপিনা ও বিলাসব্যসন, আর গ্রীষ্মে প্রাচ্যের ভেনিস শ্রীনগরের ঝিলের জলে প্রমোদবিহার। রাজা হয়েই কিছু কিছু উন্নয়নের কাজ হাতে নিয়েছিলেন হরি সিং। কিন্তু তার মধ্যে প্রতিশ্রুতি ছিল না। ফলে পথভ্রষ্ট রাজা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্যশাসনে স্বৈরাচারিতা শুরু করে দিলেন। ফল শুভ হল না। কাশ্মীরের জেলখানা ভরে গেল রাজনৈতিক শত্রুতে। স্বয়ং জওহরলালও বন্দী হলেন হরি সিংয়ের হাতে। ভীত হরি সিং হুংকার দিয়ে বললেন যে তাঁরও উপযুক্ত সেনাবাহিনী আছে। সুতরাং কোন পক্ষেই যোগ না দিয়ে তিনিও স্বাধীন থাকতে চান।

www.pathagar.com

গ্রহনক্ষত্রের বিচারে একটা অভিশপ্ত দিন

লন্ডন, ১৯৪৭. মে মাস

দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটের সেই বিখ্যাত বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে যে মানুষটি উঠে আসছেন. তাঁকে মুহূর্তের জন্যেও অপদস্থ বা নিদেন পক্ষে ভীত সন্ত্রস্ত মনে হচ্ছিল না। এ্যাটলীর জরুরী বার্তা পেয়েই দিল্লি থেকে লন্ডনে উড়ে এসেছেন তিনি। বার্তাটাও খুব নিরীহ নয়। তাঁর কাছ থেকে কৈফিয়ত চেয়েছেন এ্যাটলী। বোঝাই যায় যে সিমলার ব্যাপারটা নিয়ে এ্যাটলীর লেবার সরকার বেশ চিন্তিত। যেন সত্যিই একটা অনুচিত কাজ করে ফেলেছেন মাউন্টব্যাটেন। এয়ার-পোর্টে নামতেই চীফ-অব-স্টাফ লর্ড ইস্‌মে এসে সাবধান করে গেছেন তাঁকে। একপাশে ডেকে নিয়ে ইস্‌মে বললেন. 'পাগলের মতন দাপাদাপি (হপিং ম্যাড) করছে এ্যাটলীর সরকার। ওরা জানেই না আপনি কি করছেন। কিংবা আদৌ কিছু করেছেন কি না সে ব্যাপারেও খুব একটা ভরসা করছে না।'

মাউন্টব্যাটেন শুনলেন কিন্তু একটুও বিচলিত হলেন না। ভি.পি. মেননের তৈরি করা নতুন পার্টিশন প্ল্যানের খসড়াটা ব্রীফ্‌কেসের মধ্যেই আছে। সংগে করে এনেছেন সেটা। তাঁর ধারণা যে যাবতীয় সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি ওই প্রস্তাবের মধ্যেই আছে। লন্ডনে আসার আগে নেহরু তাঁকে কথা দিয়েছেন যে কংগ্রেস এই নতুন প্রস্তাব মেনে নেবে। সুতরাং জবাবদিহি করবেন না তিনি। তাঁর কাজ হবে পুরনো প্রস্তাবটা চেয়ে নিয়ে নতুন খসড়া প্রস্তাবটা এ্যাটলীর হাতে সঁপে দেওয়া। আর একটা কাজও তিনি করবেন। ওদের বলবেন. ভাগ্যিস তাঁর মনে ধন্দটা জেগেছিল। তাই সব দিক রক্ষা পেল।

এইসব ভাবতে ভাবতেই গাড়ি থেকে নামলেন মাউন্টব্যাটেন। আর তাঁর মনে কোন চাপ নেই। আত্মতৃপ্তির একটা হালকা হাসি তাঁর মুখে লেগে আছে। মনে পড়ে গেল ছ'মাস আগের কথা। সেদিন এক দুঃসহ দায়িত্বভার মাথায় চাপিয়ে যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মন নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন. আজ তার লেশমাত্র নেই। ফোটো-গ্রাফারদের ক্যামেরাতেও তাঁর সেই খুশীর মেজাজটাই ধরা পড়লো।

ঘরের মধ্যে সবাই অপেক্ষা করছেন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলী স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ এবং মন্ত্রীসভার অন্য সদস্যরা। এঁরা সবাই ভারতবিষয়ক বিশেষজ্ঞ। মাউন্টব্যাটেনকে দেখে সবাই অভিনন্দন জানালেন বটে. তবে অনেক চাপা। মাউন্টব্যাটেন অবশ্য ভ্রূক্ষেপও করলেন না। চেয়ার টেনে বসে ব্রীফ কেস খুলে নতুন খসড়া প্রস্তাবটা বের করলেন তারপর আলোচনা শুরু করলেন। তাঁর তখনকার মনোভাবের সঠিক চিত্র পাই তাঁর ডাইরি থেকে। অংশটুক উদ্ধৃত করছি। 'আমি সেদিন স্থির করেই রেখেছিলাম যে কোন অজুহাত দেব না। কোন জবাব-দিহিও করবো না। কারণ, আমি জানতাম (মাপ করবেন এ আমার দম্ভোক্তি নয়) যে, আমি যা বলবো তার সবটুকই ওঁদের মেনে নিতে হবে।'

www.pathagar.com

মাউন্টব্যাটেন ওঁদের সব ঘটনাটুকু বললেন। আগের প্রস্তাবে ক্যাবিনেটের কিছু সংশোধনী ছিল। সেগুলো দেখেই তাঁর মনে ধন্দ জাগে। তাঁর মনে হয় যে নেহরুকে খসড়াটা দেখানো দরকার। নেহরুর মৌলিক আপত্তিগুলো তাৎপর্যহীন নয়। সেগুলো কংগ্রেস দলেরই আপত্তি এবং তাদের পরিবর্তন না হলে হয়ত বিপর্যয় ঘটে যেতে পারতো। যাই হ'ক. পরিবর্তিত খসড়ায় আপত্তিকর অংশগুলোর যথা-সম্ভব সংস্কার করা হয়েছে। এবং তাঁর ধারণা যে, এবার হয়ত এটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হবে। ঘটনার অনুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে মাউন্টব্যাটেন একটু চুপ করলেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন যে এ্যাটলী সরকারের জন্যে একটা সুসংবাদ সঙ্গে এনেছেন তিনি।

মাউন্টব্যাটেনের শেষ কথায় মন্ত্রীসভার সদস্যেরা নড়েচড়ে বসলেন। আর কী সুসংবাদ হতে পারে? মাউন্টব্যাটেন ওঁদের বললেন যে মহামান্য সম্রাটের কাছে তিনি যে শপথ করেছিলেন তা তিনি পালন করতে চলেছেন। প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলী এবং তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যদের দিকে চেয়ে মাউন্টব্যাটেন জানালেন যে স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তান ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত থাকতে রাজী হয়েছে। জিন্না আগেই রাজী হয়েছিলেন। এবার কংগ্রেসও রাজী হয়েছে। হ্যাঁ, প্রাথমিক পর্বে ব্যাপারটা একটু কঠিন ছিল। কারণ ব্রিটিশ ক্রাউন নামক প্রতীকী সাম্রাজ্যবাদীর শক্তির বিরুদ্ধেই চিরকাল লড়াই করে এসেছে কংগ্রেস। কমনওয়েলথভুক্ত হবার অর্থ সেই লড়াইটাকে হেয় করা।

কিন্তু তেমনটি যে নয় সে কথা অনেক ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন মাউন্টব্যাটেন। জনে জনে নেতাদের ধৈর্য ধরে বুঝিয়েছেন যে কমনওয়েলথের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে ভারত তার সৈন্যবাহিনী গুটিয়ে নিতে পারবে। তার অন্য লাভও হবে। কিন্তু সফল হন নি। হঠাৎই একদিন একটা ঘটনা ঘটলো। মাউনব্যাটেন তখন সিমলায়। বল্লবভাই প্যাটেলের কাছ থেকে একটা গোপন নোট পেলেন তিনি। তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্যাটেল জানতেন যে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে মাউন্টব্যাটেন খুবই ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। প্যাটেলও তাই চান। অতএব প্রস্তাব এল যে অযথা কালবিলম্ব না করে ব্রিটিশ সরকার যেন কানাডার মতন ভারত ও পাকিস্তানকে স্বাধীন উপনিবেশ হিসেবে ঘোষণা করে এবং তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। এর ফলে সংবিধান রচনার বিলম্বিত কাজটা সাময়িকভাবে ঠেকানো যাবে। সংবিধান রচিত হবার পর নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারটা ধীরে সুস্থে করলেই চলবে। এমনটি হলে কংগ্রেস দলও কৃতজ্ঞতা জানাতে দ্বিধা করবে না। মাউন্টব্যাটেন যদি ৩০শে জুনের আগেই ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজটা সম্পন্ন করতে পারেন. তাহলে কংগ্রেস দলও কমনওয়েলথ ছেড়ে বেরিয়ে আসবে না. কারণ ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রদানের মধ্যেই এই অলিখিত শর্তটি নিহিত আছে। বলাবাহুল্য. প্যাটেলের প্রস্তাবটা পেয়ে মাউন্ট-ব্যাটেন সেদিন খুবই খুশী হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে পুরনো ডেড লাইন ৩০শে জুন দিনটাকে এগিয়ে আনতেই হবে। নতুন ড্রাফটে এই সংশোধনীটি যাতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় সে নির্দেশও মেননকে দিলেন। এই সংশোধিত প্রস্তাবটাই এখন তিনি এ্যাটলীর হাতে তুলে দিতে এসেছেন।

সুতরাং এখন যা দরকার তা হলো 'স্পীড'। অর্থাৎ কত দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায় তা দেখা। এটুকু আশ্বাস তিনি মন্ত্রীসভাকে দিতে পারেন যে এই প্ল্যানটি

www.pathagar.com

যদি তাঁরা মেনে নেন, তাহলে ডোমিনিয়ন ভারত ও পাকিস্তান কমনওয়েলথ ছেড়ে বেরিয়ে আসবে না। অন্যথায় বিলম্বে অঘটন ঘটতে পারে। যদি অঘটন ঘটে, দেশজুড়ে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, তবে তার দায় ব্রিটেনকেও নিতে হবে। কারণ ব্রিটেনকেই উদ্যোগ নিয়ে তখন ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করতে হবে। পার্লামেন্ট থেকে আইনটি পাশ করাতে হবে খুব তাড়াতাড়ি। তা, কত সময় নেবেন তাঁরা?

মাউন্টব্যাটেন যখন দীর্ঘ ভাষণ শেষ করলেন তখন সারা ঘরখানা বিস্ময়ে স্তম্ভিত। এ যেন তাঁর নিপুণ বাকপটুতার শ্রেষ্ঠ প্রদর্শন। অখণ্ডনীয় প্রমাণ দিয়ে তিনি যা বললেন তাতেই ধরাশায়ী হলেন স্বয়ং পি.এম. এবং সাঙ্গোপাঙ্গরা। খানিক আগে যাঁরা পাগলের মতন লাফালাফি করছিলেন, এখন তাঁরাই হাতধরা হয়ে গেলেন মাউন্টব্যাটেনের। পরিবর্তিত খসড়া প্রস্তাবটা শুধু অনুমোদন করা নয়, কমা দাঁড়ি পর্যন্ত মেনে নিলেন এ্যাটলী সরকার।

এই আদ্যন্ত অনুমোদনের ব্যাপারটা ইস্‌মের দৃষ্টিও এড়িয়ে যায় নি। এই বিচক্ষণ, প্রবীণ মানুষটি এর আগে অনেক উত্তাল ঘটনার সাক্ষী হয়েছেন। অনেক কিছু দেখেছেন তিনি। কিন্তু সেদিন যা দেখলেন তা যেন তুলনাহীন। ঘর থেকে বেরিয়েই সে কথা কবুল করলেন তিনি। মাউন্টব্যাটেনকে বললেন, 'আমার জীবনে বেশ কিছু অসম্ভব কাজ আমি সম্ভব হতে দেখেছি। কিন্তু আজ আপনি যা করলেন তা সবকিছু ছাপিয়ে যায়।'

মুখের চুরুটটা যাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী, যাঁর কাঁধ থেকে খসে পড়েছে তুলোর ড্রেসিং গাউন আর নাকের ওপর ঝুলে পড়েছে হাফ্‌রিমের চশমাটা, বিছানায় বসা ওই মানুষটির অতি চেনা ছায়ামূর্তিটা মাউন্টব্যাটেনের জীবনের আকাশে কখনও ম্লান হবে না। এই মানুষটিকে ঘিরে তাঁর ছেলেবেলা থেকেই কত রঙিন স্বপ্ন! চার্চিল তখন যুবক। ব্রিটিশ নৌসেনার ফার্স্ট লর্ড। প্রায়ই আসতেন বাবার সঙ্গে আলাপ করতে। বাবা তখন ফার্স্ট-সী-লর্ড। একটা ঘটনার কথা বেশ মনে আছে মাউন্টব্যাটেনের। ঠাট্টা করে মা একদিন বলেছিলেন, ওকে কখনও বিশ্বাস করো না। লোকটা 'আন্‌রীলাইয়্যাবল'! ইওরোপের মাটিতে যদিও ওই লোকটাই হিটলারকে বাধা দেবে তবুও ওঁর ওপর নাকি ভরসা করা যায় না। কথাটা নেহাত ঠাট্টা করেই বলা কারণ, চার্চিল নাকি একখানা বই চেয়ে নিয়ে ফেরত দেন নি। অপরাধটা মায়ের কাছে অমার্জনীয় বটে!

রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে তখনও নজর কাড়েন নি চার্চিল। ইংল্যান্ডের সামরিক শক্তির পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগটাই তাঁকে পাদপ্রদীপের সামনে নিয়ে আসে। সেই থেকেই নৌ সেনাপতি মাউন্টব্যাটেন এবং তাঁর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। তারপর মাউন্টব্যাটেনকে যখন তিনি সম্মিলিত অপারেশনে যুদ্ধকালীন নির্দেশ দিতেন, তখন প্রায়ই দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে যুবক মাউন্টব্যাটেনকে আসতে হয়েছে।*

---

* ১৯৪১ সালের ২১শে জুন, শনিবার। চার্চিলের মধ্যাহ্নিক ভোজে নেমন্তন্ন পেয়েছেন মাউন্টব্যাটেন। তাঁর সঙ্গে এসেছেন সংবাদপত্রের প্রকাশক ম্যাক্স বীভারব্রুক। প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এসেই বললেন, 'একটা দারুণ খবর দিচ্ছি তোমাকে। কালই হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করবে শুনেছি। পরিণাম কি হয় তাই নিয়ে সকাল থেকেই আমাদের তোড়জোড় চলছিল।'

www.pathagar.com

মাউন্টব্যাটেন জানতেন যে চার্চিল তাঁকে স্নেহ করেন। কিন্তু যে কারণে স্নেহ করেন সেটা কখনও তাঁর মনঃপূত হয় নি। চার্চিলের ধারণা যে মাউন্টব্যাটেন একজন ঘাগী সৈনিক। এই জঙ্গি ফৌজি জওয়ানকে ভরসা করা যায়। কারণ, সে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবে না। কিন্তু মাউন্টব্যাটেনের এটা রাজনৈতিক বিদ্যেবুদ্ধির স্বীকৃতি নয়। তাঁর যে রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকতে পারে এ বোধ চার্চিলের ছিল না। ১৯৪৫ সালের নির্বাচনে যদি চার্চিলের দল ক্ষমতায় ফিরে আসতো, তাহলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মাউন্টব্যাটেনের মতাদর্শটা কামানের গোলার মতন উড়িয়ে দিতেন চার্চিল।

আজ অবশ্য এ্যাটলীরই অনুরোধে চার্চিলের কাছে এসেছেন মাউন্টব্যাটেন। যে কাজটা করাতে এসেছেন এই টোরী দলের নায়কের কাছে, সেটা খুবই বেদনা-দায়ক। কারণ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গ্রন্থিমোচনের এই কাজটা চার্চিলের পক্ষে পরিপাক করা সম্ভব নয়। অথচ এই খসড়া প্রস্তাব তাঁর আশীর্বাদ ছাড়া কোনদিনই কার্যকর করা যাবে না। চার্চিল ক্ষমতায় থাকুন আর না থাকুন তাঁর সাধের সাম্রাজ্যের ভালমন্দ নির্ভর করছে তাঁর কথাতেই। তিনিই এর চাবিকাঠিটি ধরে আছেন। এ্যাটলী বা কোন সরকারের পক্ষেই তাঁকে প্ররোচিত করা সম্ভব নয়। তবে স্নেহভাজন মাউন্ট-ব্যাটেন চেষ্টা করতে পারেন। সেই কথা বলেই তাঁকে এখানে পাঠিয়েছেন এ্যাটলী। বলেছেন, 'য়ু হ্যাভ্ এ চান্স!'

সেই 'চান্স'টাই নিতে এসেছেন মাউন্টব্যাটেন। তবে যে কঠিন বিষয়ের ওপর আলোচনা দাঁড়িয়ে আছে, তাতে ফল কী হবে তা শুধু ভবিষ্যতই জানে। ভারতীয়-দের হাতে শাসনভার তুলে দেবার চিন্তাটাই তাঁর কাছে পাগলামির সামিল। তাঁর বেশ মনে পড়ে চার্চিলের সেই আন্তরিক বিশ্বাসের কথাটা যখন তিনি সদম্ভে

বীভারব্রুক বললেন, 'আমি বলতে পারি কি হবে।

'কি হবে?'

'রুশদের তুলোধোনা করবে হিটলার। বড়জোর একমাস বা দু'হপ্তার। তার মধ্যেই কুরুসম হয়ে যাবে রাশিয়ার অবস্থা।'

চার্চিল ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন। বললেন, 'আমারও সেই মত তবে অত কম সময়ে নয়। মার্কিনরা মনে করছে যে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হতে দু' মাসের বেশি সময় লাগবে। আমাদের সেনা-প্রধানরাও তাই মনে করে।' একটু চুপ করে চার্চিল বললেন, 'আমার নিজের ধারণা যে মাস তিনেক লড়াই হলেই রাশিয়া পাততাড়ি গোটাবে। তখন আমাদের অবস্থা হবে সেই শুরুর মতন। দেওয়ালে পিঠ দিয়ে আত্মরক্ষা করতে হবে আমাদের।'

কথা বলতে বলতে চার্চিলের নজরে পড়ে গেলেন মাউন্টব্যাটেন। মাউন্টব্যাটেন যে উপস্থিত আছেন তা যেন ভুলেই গেছিলেন চার্চিল। তাঁকে দেখেই চার্চিল বললেন, 'তোমার ক্রীট অভিযানের কথা বলো ডিকি।'

'আজ্ঞে, ওটা এখন ইতিহাস হয়ে গেছে। তার চেয়ে যদি অনুমতি দেন ত হিটলারের রুশ আক্রমণ সম্বন্ধে আমার মতামত জানাতে পারি।'

'তোমার মত? বেশ বলো, শুনি।'

www.pathagar.com

ঘোষণা করেছিলেন যে সৎ, যোগ্য ব্রিটিশ প্রশাসনকে সরিয়ে 'অযোগ্য, অপদার্থ এবং দুর্নীতিপরায়ণ ভারতীয় নেতাদের হাতে শাসনভার দিলে ভারতের সাধারণ মানুষের পক্ষে তা খুবই হানিকর হবে। সেদিন কথাটা যথেষ্ট আন্তরিকতার সংগেই বলেছিলেন চার্চিল।

যাই হ'ক, ভারতে তাঁর কাজের আনুপূর্বিক বিবরণ দিলেন মাউন্টব্যাটেন। বিছানার মধ্যে আধশোয়া অবস্থায় বসে আছেন চার্চিল। তাঁর সেই বিখ্যাত টাক মাথার দিকে চোখ রেখেই মাউন্টব্যাটেন ঘটনার বিবরণ দিচ্ছেন। চার্চিলের দৃষ্টি কিন্তু তাঁর মুখের ওপর নিবদ্ধ। বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে এই একটা মানুষের 'না' ভারতকে স্বাধীনতা দেবার চেষ্টাকে বিফল করে দিয়েছে। সুতরাং মাউন্টব্যাটেনের সব আশা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে এই এক ধাক্কায়। হাউস অব লর্ডস সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ টোরীরা ইচ্ছে করলেই আরও দু বছর পিছিয়ে দিতে পারেন ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি।

তখন মাউন্টব্যাটেনের সব চেষ্টাই বিফল হবে। তাঁর এই উচ্চাভিলাষী অভিযান সম্পূর্ণ 'ধ্বংস হয়ে যাবে', কারণ ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস না পেলে কংগ্রেস দল এই খসড়া প্রস্তাব মানবে না। সেক্ষেত্রে দাঙ্গাপ্রবণ এই উপ-মহাদেশে দু বছর ধরে শান্ত বজায় রাখবার মতন ধৈর্য বা প্রশাসনিক যোগ্যতা তাঁর থাকবে না।

আধখানা চোখ বুজে মাউন্টব্যাটেনের বক্তব্য শুনছিলেন চার্চিল। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন ধ্যানমগ্ন কোন যোগী ধ্যানের অতীন্দ্রিয়লোকে হারিয়ে গেছেন।

চার্চিল যে অনিচ্ছুক তা জানলেও মাউন্টব্যাটেন ভনিতা করলেন না। সরাসরি বললেন, 'ম্যাক্সের সঙ্গে আমি একমত নই। একমত নই আমেরিকান বা আমাদের সেনাপ্রধানদের সঙ্গেও।' এবার প্রাইম মিনিস্টার চার্চিলের চোখের দিকে চেয়ে মাউন্টব্যাটেন বললেন, 'স্যার! আপনার মতও আমি জানি না।' চার্চিল চেয়ে আছেন মাউন্টব্যাটেনের দিকে। মাউন্টব্যাটেন বললেন, 'রুশদের পাততাড়ি গোটাবার কোন প্রয়োজনই নেই। কারণ, যুদ্ধে তাদের হার হবে না। বরং যুদ্ধের গতি বদলে যাবে। এই আক্রমণ তারই ইঙ্গিত দেবে। এখানেই শেষ হবে হিটলার।'

চার্চিল রীতিমত স্তম্ভিত। বললেন, 'তোমার মতামত শুনলুম। কিন্তু এমন আলাদা অভিমতের কারণ?'

মাউন্টব্যাটেন সবিনয়ে বললেন, 'আজ্ঞে, দুটো কারণ আছে। প্রথমটা হলো যে, স্তালিনকে উৎখাত করার যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল, তার বিচারের পর ঘরের শত্রুরা প্রায় নির্বংশ হয়ে গেছে। এরাই পারতো নাৎসী বাহিনীকে সাহায্য করতে। দ্বিতীয় কারণটা আমার পক্ষেও স্বীকার করা লজ্জার আমার পূর্বপুরুষরাও রাশিয়ার সাধারণ মানুষকে শোষণ করে এসেছে একদিন। কিন্তু আজ দেশটা একটা ভরসার জায়গা ওদের কাছে। কোন দামেই ওরা এই শক্ত মাটিটা হারাতে চাইবে না।'

মাউন্টব্যাটেন চুপ করলেন। তাঁর উত্তরটা গম্ভীর মুখে শুনলেন চার্চিল। কোন মন্তব্য করলেন না। তবে চুপ করেও রইলেন না। বললেন, 'ডিকি, তোমার মতামত শুনলাম। তুমি নতুন প্রজন্মের মানুষ। নির্ভীক, স্পষ্টবাদী। ভালই লাগলো তোমার কথা শুনে। এখন দেখা যাক।'

বলাবাহুল্য, মাউন্টব্যাটেনের উত্তরটা চার্চিলের মনে তেমন কোন চাপই ফেলেনি সেদিন।

www.pathagar.com

তাঁর কাছে কিছুই পৌঁছচ্ছে না। যাবতীয় ঐহিক সুখদুঃখের অতীত কোন জগতে তিনি বাস করছেন। কোন কোলাহল দিয়েই তাঁর ধ্যান ভাঙানো যাবে না।

তবে ধ্যান ভাঙলো শেষপর্যন্ত। সিমলা থেকে নিয়ে আসা প্রতিশ্রুতির কথাটা শুনেই নড়েচড়ে বসলেন চার্চিল। কংগ্রেস দল নাকি বলেছে যদি এখনই দেওয়া হয় তবে তারা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন মেনে নেবে। তারপর যখন শুনলেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঘোরতর শত্রুরা কমনওয়েলথভুক্ত হয়ে থাকতে সম্মতি দিয়েছে, তখন আর উদাসীন থাকতে পারলেন না। তাঁর মনে হলো যে, ব্রিটিশ রাজ অপসৃত হলেও ভারত ও পাকিস্তান যদি কমনওয়েলথের সঙ্গে জুড়ে থাকতে রাজী হয়, তবে অন্তত স্মৃতির মধ্যেও বেঁচে থাকবে সাম্রাজ্যবাদ। সেই পুরনো ভারতবর্ষের অনেক কিছুই বেঁচে থাকবে তাঁর স্মৃতিতে যা একদিন তাঁর রোমান্টিক মনে আগুন জ্বালিয়েছিল। তবে সবচেয়ে বড় কথা এবং গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো যে, কমনওয়েলথ নামক প্রতিষ্ঠান মারফত যোগসূত্রটা টিকিয়ে রাখা যাবে যা কিনা ভারতের ভবিষ্যত মংগলের জন্যে খুবই জরুরী।

কিন্তু সন্দেহের ঘোর তখনও কাটে নি বৃদ্ধ নেতার। মাউন্টব্যাটেনের চোখের দিকে চেয়ে চার্চিল জানতে চাইলেন যে কোন লিখিত প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন কিনা। পেয়েছেন বৈকি। নেহরুর একখানা চিঠি আছে। এ্যাটলীর হাতে সেটা দিয়ে এসেছেন মাউন্টব্যাটেন। আর গান্ধী? তাঁর আজন্ম শত্রু সেই বুড়োটা? সে কি বলে?

হ্যাঁ, মাউন্টব্যাটেনও জানেন যে বৃদ্ধ গান্ধীজী এক প্রবল অন্তরায়। এই অবুঝ মানুষটি সম্বন্ধে যেন শেষ কথা কিছুতেই বলা যায় না। সুতরাং যে কোন সময়েই তিনি এক সংকট হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু তাই বলে থেমেও থাকা যায় না। তাছাড়া তাঁর বিশ্বাস যে নেহরু এবং প্যাটেলের সাহায্য পেলে যে কোনরকম সংকট-সম্ভাবনা তিনি কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

চার্চিল তখন উত্তেজনায় বিছানার ওপর উঠে বসেছেন। দাঁতের মধ্যে সিগার চেপে বেশ চিন্তিত মুখে বসে রইলেন তিনি। খানিকক্ষণ ভাবলেন। তারপর সায় দিলেন মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাবে। তবে তাই হ'ক। মাউন্টব্যাটেন যদি ভারতের সব রাজনৈতিক দলের সমর্থন যোগাড় করতে পারেন, তবে চার্চিলও কথা দিচ্ছেন যে, সারা ইংল্যাণ্ডকে মাউন্টব্যাটেনের পিছনে দাঁড় করিয়ে দেবেন। পার্লামেন্টের গ্রীষ্মের অবকাশের আগেই মাউন্টব্যাটেনের প্রয়োজন মতন একটা বিল পাশ করিয়ে দেবেন লেবার দলকে দিয়ে। চার্চিলের এই প্রতিশ্রুতি যেন শেষ বাধা অতিক্রম করলো। মাউন্টব্যাটেন অনেকখানি হালকা বোধ করছেন তখন। তাঁর মনে হলো যে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার দিনটা আর বছর বা মাস নয়, দিন দিয়ে গুনতে হবে।

নতুন দিল্লি-মে, জুন ১৯৪৭

সারা দেশটার সর্বত্র যেন শ্মশান-চিতা জ্বলছে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে আর কালো ধোঁয়ার স্তম্ভ আকাশে উঠে সারা পরিবেশ আঁধার করে দিয়েছে। কিন্তু এত চিতা জ্বলছে কেন? ঘি নেই, চন্দনকাঠ নেই, স্বজনবিয়োগে কাতর আত্ম-

www.pathagar.com

পরিজনদের চাপা কান্না নেই, পুরুতের মন্ত্রপাঠ নেই। এ তবে কার অন্ত্যেষ্টি? আত্মপরিজন ঘিরে না থাকলেও, সারা দেশময় ছড়িয়ে থাকা এইসব শ্মশান-চিতার চারপাশে শান্ত, ভাবনাহীন মুখে দাঁড়িয়ে আছে ব্রিটিশ আমলারা। যা পুড়ছে তা শুধু কাগজ। টন্ টন্ কাগজের বাণ্ডিল। ফাইল, রিপোর্ট ইত্যাদি। আমলাদেরই হেপাজতে দীর্ঘদিন ধরে এইসব দলিল সযত্নে ধরা ছিল। স্যার কনরাড কর্ফিল্ডের আদেশে এই ডকুমেন্টগুলিই পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। পাঁচ পুরুষ ধরে ভারতীয় রাজারাজড়াদের যতরকম পাপাচার আর বিকৃত যৌনাচারের ঘটনা ধরা আছে সে সবই পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কারণ, ওই সব নথিপত্র স্বাধীন ভারত বা পাকিস্তানের প্রশাসকদের হাতে পড়লে রাজন্যদের যৎপরোনাস্তি হেনস্থা হতে পারে। এমন ঘটনা যে ঘটতে পারে সে সম্ভাবনাটা উড়িয়েও দেয় নি ব্রিটিশ সরকার যখন বংশানুক্রমিক এইসব পাপাচারের রিপোর্টগুলো জমিয়ে রাখার আদেশ হয়।

রাজামহারাজাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ তখনও অস্পষ্ট। তাদের স্বার্থ কতটা রক্ষা করা যায় সে সম্বন্ধে স্যার কনরাডও যথেষ্ট নিশ্চিন্ত নন। তা তিনি একটা কাজ করতে পারেন। ওদের নোংরা অতীতটা অন্তত মুছে ফেলতে পারেন। সেইরকমই আদেশ নিয়ে দিল্লি এসেছেন কনরাড এবং এসেই সারা দেশের রেসিডেন্ট এবং পোলিটিক্যাল এজেন্টদের বলে দিয়েছেন যেন তাদের কাছে জমা থাকা রাজন্যদের ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি রিপোর্টগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়। স্যার কনরাড করফিল্ড স্বয়ং পি.এম. এ্যাটলীর সমর্থন নিয়ে এসেছেন এ ব্যাপারে।

প্রথম চিতাটা জ্বাললেন স্যার কন্রাড্ নিজে। তাঁর অফিস ঘরের জানালার নীচে চিতা সাজানো হলো। ঘরের মধ্যে যে দুফুট উঁচু লোহার সিন্দুকটা আছে তার চাবি তাঁর কাছেই থাকে। সিন্দুক খুলে দেড়শ' বছরের পুরনো এবং গোপন নথিপত্র বের করে আগুনে ফেলা হলো। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো রাজারাজড়াদের রসালো প্রেমভালবাসার কেচ্ছাকাহিনী। পুড়ে যাওয়া কাগজের ছাই ছড়িয়ে পড়লো দিল্লির আকাশে। ব্যাপারটা তখনি জানাজানি হয়ে গেল। খবর রটে গেল যে নানা গোপন তথ্য পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। নেহরু প্রতিবাদ পাঠিয়ে বললেন যা পোড়ানো হচ্ছে তা নাকি ভারতের পৈত্রিক সম্পত্তি। সুতরাং অবিলম্বে বহ্ন্যুৎসব বন্ধ করা হ'ক।

কিন্তু যা ঘটার তা ঘটে গেছে তখন। পাতিয়ালা, হায়দ্রাবাদ, ইন্দোর, মহীশূর, বরোদা, পোরবন্দর, কোচিন সর্বত্রই সাহেব আমলাদের সামনে, তাদের সাক্ষী রেখে রাজারাজড়াদের মুখরোচক গালগল্প পুড়িয়ে দেওয়া হলো।

প্রধানত এ সবই ছিল রাজারাজড়াদের বিকৃত যৌনাচারের ঘটনা। এক একজন রাজার কাহিনী এত লম্বা ছিল যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় লেগেছিল পুড়তে। রামপুরের কোন এক নবাবের কুৎসিত খেয়াল হয় যে রাজ্যের মধ্যে কুমারী মেয়েদের ধর্ষণের প্রতিযোগিতা হবে। যারা যোগ দেবে প্রমাণ স্বরূপ তাদের, কুমারীদের ব্যবহার করা নাকের নথটি জমা দিতে হবে। সেই প্রতিযোগিতায় নবাবের সংগ্রহ করা নথই সবচেয়ে বেশি ছিল। সভাসদরা সারা রাজ্য থেকে পাখি ধরার মতন কুমারী মেয়ে ধরে নবাবের কুক্ষিগত করেছিল।

কাশ্মীরের মহারাজার ব্যক্তিগত যে কেলেংকারির কাগজপত্র পুড়িয়ে দেওয়া হয়, সেটা বোধহয় দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে সবচেয়ে লজ্জাজনক ঘটনা। লণ্ডনের স্যাভয় হোটেলের মধ্যেই একজন লোক হাতেনাতে ধরে ফেলে কাশ্মীরের যুবরাজকে।

www.pathagar.com

লোকটা পরিচয় দেয়, যে সে নাকি রাজার সবচেয়ে রতিমতি শয্যাসঙ্গিনীর স্বামী। আসলে এমন একদল দুষ্ট লোকের খপ্পরে পড়েছিলেন রাজা, যারা লণ্ডনের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা কাশ্মীররাজ্যের কোষাগার ফাঁকা করে দেবার মতলবে ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যায় যখন যুবতী মহিলার আসল স্বামী, সম্ভবত লেন-দেনের ব্যাপারে দুর্বৃত্তদের ব্যবহারে রুষ্ট হয়ে, পুলিসের কাছে ওদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ করে। এরপর মামলা হলো এবং দীর্ঘদিন মামলা চলাকালীন কাশ্মীরের রাজা হরি সিংকে পরিচয় গোপন করে লণ্ডনে বাস করতে হলো। এইভাবে মুখ লুকিয়ে থাকার দরুন মহারাজার যথেষ্ট শিক্ষা হয়। তিনি মনে মনে শপথ করেন যে জীবনে আর কোন নারীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক করবেন না। কিন্তু কাশ্মীরে ফিরেই মহারাজা অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। সেখানে শুধু যৌবনের জয়গান। যেমন প্রকৃতিতে তেমনি মানুষের রূপে ভাললাগার ছড়াছড়ি। সুতরাং প্রেমিক এবং রোমান্টিক মহারাজার জীবনেও নতুন করে বসন্ত এল। নারীসঙ্গলোলুপ রাজার মন থেকেও ভয়ভাবনা নিমেষে উড়ে গেল তাজা পাহাড়ি বাতাসে।

হায়দ্রাবাদের নিজামের লাম্পট্য অন্যরকম ছিল। রতিক্রিয়ার অসংখ্য ছবির সংগ্রহ ছিল নিজামের। তাঁর গেস্ট রুমের সিলিং এবং দেওয়ালে কখনও বা স্নানঘরের মধ্যে গোপনে স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা বসিয়ে মহিলাদের নগ্ন দেহের বিভিন্ন ছবি তুলতেন নিজাম। অবসর সময়ে এইসব ছবি দেখেই বুড়ো নিজামের যৌনতৃপ্তি হতো।

চিতায় যে রিপোর্টটা পোড়ানো হচ্ছিল সেটা খুবই সাম্প্রতিককালের ঘটনা। ইংরেজ সরকারের একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকায় ব্যাপারটা তাদের কাছেও অস্বস্তিকর ছিল। হায়দ্রাবাদের ইংরেজ রেসিডেন্ট কানা-ঘুষো শুনেছিলেন যে নিজামের যুবক ছেলে নাকি লাম্পট্যে 'বাপকা বেটা' হতে পারে নি। ছেলেটা নাকি জরু কা গোলাম অর্থাৎ বিবির আঁচলধরা। তা ভবিষ্যতে এমন এক-পত্নীপ্রিয় স্ত্রৈণ নিজাম কিছুতেই মনঃপুত হবে না ব্রিটিশ সরকারের। অভিযোগ শুনে বুড়ো নিজাম বেজায় খাপ্পা। তখনই ছেলেকে ডেকে পাঠালেন রেসিডেন্টের সামনে। তারপর হারেম থেকে একটি যুবতী রক্ষিতা আনিয়ে সাহেব রেসিডেন্টের সামনেই কামাচার করতে বললেন তাদের। সে এক তুলকালাম কাণ্ড। রেসিডেন্ট সাহেব দারুণ অপ্রস্তুত। নিজামও কোন যুক্তি শুনবেন না। এমন নিরীহ গৃহপালিত ছেলের বদনাম ঘোচাতে বদ্ধপরিকর তিনি।

এই বহ্ন্যুৎসবে সবচেয়ে কেলেংকারির রিপোর্টটা আলওয়ারের রাজাকে নিয়ে। রাজস্থানের এই ছোট্ট রাজ্যে একনাগাড়ে চল্লিশ বছর রাজত্ব করেছেন এই রাজা। দীর্ঘদিনের রাজত্বকালে যে কলঙ্কচিহ্ন তিনি এঁকে গেছেন তা দুরপনেয়। শিক্ষা-রুচিতে সংস্কৃতিবান এই সুদর্শন রাজার ব্যক্তিগত আচার আচরণ দিয়ে পরের পর বড়লাটদের মোহিত করে রাখতেন তিনি। তিনি প্রচার করেছিলেন যে ভগবান রামের একজন অবতার তিনি। পাছে মানুষের ছোঁয়ায় তাঁর দেবভাব কলুষিত হয়, তাই সর্বক্ষণ দুহাতে কালো দস্তানা পরে থাকতেন। এমনকি ইংল্যাণ্ডের রাজার সঙ্গেও গ্লাভ্‌স্ খুলে করমর্দন করতে রাজী হন নি তিনি। রামের মাথায় মুকুটের সঠিক গড়ন জানতে তিনি একাধিক জ্যোতিষীকে বেতন দিয়ে নিয়োগ করেছিলেন যাতে নিজের মুকুটটাও সেই ধাঁচের হয়।

তবে অবতারের ভাবগতিক বজায় রাখলেও রাজার ঐহিক ভোগবিলাসে বিতৃষ্ণা ছিল না। একজন দক্ষ শিকারী হিসেবে বেশ নামডাক ছিল তাঁর। প্রায়ই

www.pathagar.com

বাঘ শিকারে যেতেন এবং শিশুদের টোপ হিসেবে ব্যবহার করতেন। শিশুদের হতভাগ্য বাপ-মায়েদের বোঝাতেন যে তাদের কোল থেকে ছিনিয়ে নেওয়া ছেলে-মেয়েদের জ্যান্ত ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু কার্যত তেমনটি হ'ত না। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার যে সব জেনেশুনেও ব্রিটিশ প্রশাসন মুখ বুজে সহ্য করতো রাজার এই অনাচার। বিকৃত রুচির এই রাজা রোজ রাত্রে একজন যুবক শয্যাসঙ্গীর সঙ্গে সমকামী ক্রীড়ায় মত্ত থাকতো। রাজার সামরিক বিভাগে অফিসারের চাকরির লোভে যুবকরা রাজার বিকৃত লালসার বলি হতো। রাজার মদনোৎসবে জোর করেই যোগ দিতে হতো তাদের এবং অনেক সময়ই এর পরিণতি হতো নিষ্ঠুর হত্যায়।

ক্ষমতার অপপ্রয়োগের এই ধারাবাহিকতা অবশেষে শেষ হলো দুটো ঘটনাকে কেন্দ্র করে। দুটো ঘটনাই ঘটে লর্ড উইলিংডনের ভাইসরয় থাকাকালীন সময়ে। বড়লাটভবনে লাঞ্চের নেমন্তন্ন খেতে এসেছেন আলওয়ারের রাজা। তাঁর পাশে বসেছেন ভাইসরয় গিন্নী। রাজার হাতের আঙুলে হীরার আংটিটা দেখে বড়লাটগিন্নী মুগ্ধ। এত বড় আর এমন ঝকমকে? রাজা তাড়াতাড়ি হাত থেকে আংটিটা খুলে মহিলার হাতে দিলেন। এটাই রেওয়াজ রাজপরিবারের। মানী অতিথি কোন বস্তুতে আগ্রহ প্রকাশ করলে সেটা দান করার রীতি এই রাজপরিবারের একটা পুরনো সংস্কার।

ভাইসরয়গিন্নী তা জানতেন। এইভাবেই অনেক হীরাজহরত সংগ্রহ করেছেন মহিলা। কোন্ দ্রব্যটার দিকে হাত বাড়াতে হয়, মহিলা তা সম্যক ভাবেই জানতেন। সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে হীরার আংটিটা আঙুলে পরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন কেমন মানায়। তারপর রাজাকে ফেরত দিলেন আংটিটা।

এরপর যে কাণ্ডটা হলো তার জন্যে তৈরি ছিল না ব্রিটিশ আমলারা। লজ্জায় মিশে গেল তাদের গর্ব। আলওয়ারের রাজা একজন খানসামাকে ডেকে এক বাটি জল আনালেন। তারপর পরিষ্কার জলে বেশ করে ধুয়ে আংটিটা পরলেন। রাজার কাণ্ড দেখে সেদিন মনে হয়েছিল যেন বড়লাটগিন্নীর ছোঁয়ায় কলুষিত হয়েছে আংটিটা। তাই পরার আগে আংটির গা থেকে সেগুলো প্রক্ষালন করলেন রাজা।

দ্বিতীয় ঘটনাটা রাজার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী ব্রিটিশ আমলাদের চোখের সামনেই ঘটে। কিন্তু কাজটা এমনই নিষ্ঠুর, অমানুষিক যে ক্ষমার অযোগ্য মনে হয়েছিল তাদের। সেটা পোলো খেলার মাঠের ঘটনা। একটা টাট্টুঘোড়ার বেয়দাব বরদাস্ত হলো না রাজার। বেয়াড়া টাট্টুর গায়ে কেরোসিন ঢেলে স্বহস্তে আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। দাউ দাউ করে জ্বলে গেল অসহায় জীবটা। এই নিষ্ঠুর ঘটনাটা ইংরেজকে সেদিন এত লজ্জা দেয় যা আগে কখনও দেয় নি। সমকামী রাজার হাতে শয্যা-সংগীদের হত্যাও যেন নিষ্ঠুরতার মাত্রা ছাড়াতে পারে নি। সুতরাং বিচারের বাণী শুধু নিভৃতে অশ্রুবিসর্জন না করে কর্তৃপক্ষের টনক নাড়ালো। আলওয়ারের রাজাকে রাজাসন থেকে টেনে নামিয়ে নির্বাসনে পাঠিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হলো তারা।

আলওয়ারের ঘটনাটা যদিও একটু অন্যরকম। তাহলেও গোঁড়া ইংরেজ অভিভাবক আর উচ্ছৃংখল রাজারাজড়াদের মধ্যে প্রায়ই সম্পর্কের টানাটানি এবং ভুল বোঝাবুঝি হতো নানা ঘটনা কেন্দ্র করে। এইরকমই এক উৎকট গম্ভীর ঘটনা ঘটলো বরোদার রাজাকে নিয়ে। ব্রিটিশের চোখে তাদের নিযুক্ত রেসিডেন্ট আর স্টেটের রাজার মান মর্যাদা যেহেতু সমান সেইহেত রাজা এবং রেসিডেন্টের সম্মানে একই রকম সংবর্ধনার প্রথা ব্রিটিশরাজ চালু করেছিলেন। ব্যাপারটা বরোদার রাজার কাছে

www.pathagar.com

খুবই আপত্তিকর মনে হয়েছিল। তাঁর মতে রাজ্যের রেসিডেন্ট সাহেব খুবই সাদা-মাটা এবং সাধারণ ফৌজি মানুষ। সুতরাং বেতনভুক এই রাজকর্মচারী এবং তাঁর মধ্যে আপ্যায়নের কিছু ইতরবিশেষ থাকা উচিত। সুতরাং রাজাজ্ঞা অগ্রাহ্য না করেও অন্যভাবে আত্মসম্মান রক্ষা করলেন রাজা। সোনার পাতমোড়া এমন এক বিশেষ কামান আনালেন নিজের জন্যে যার তোপধ্বনি একটু বিশেষ রকমের রাজকীয়। এতে খুবই গোঁসা হলো ইংরেজ রেসিডেন্টের। বরোদার রাজার নামে ব্যাভিচারিতার অভিযোগ করে এক কড়া রিপোর্ট পাঠালেন খোদ লন্ডনে। রাজা নাকি তাঁর হারেমের মধ্যে সুন্দরী মেয়েদের বন্দী করে রাখেন।

বরোদার রাজা এতই ক্ষিপ্ত হলেন যে জ্যোতিষী ডাকিয়ে তখনই পরামর্শসভা বসালেন। গ্রহনক্ষত্র বিচার করে বিধান দিতে বলা হলো জ্যোতিষীদের কবে এবং কিভাবে ওই সাহেব বেটার খপ্পর থেকে নিষ্কৃতি পাবেন। জ্যোতিষীরা গণনা করে বিধান দিল যে খাবারের সংগে হীরার গুঁড়ো মিশিয়ে লোকটাকে মেরে ফেলতে হবে। অতএব ফৌজি লোকটাকে কাবু করতে প্রমাণ মাপের একটা হীরা আনিয়ে তাকে গুঁড়ো করা হলো। কিন্তু দুষ্পাচ্য বিষের গুঁড়ো প্রত্যাশিত ক্রিয়া করার আগেই, সাহেব রেসিডেন্টের ভেদবমি শুরু হয়ে গেল। তখুনি হাসপাতালে পাঠিয়ে মানুষটার জঠর পরিষ্কার করার পর সে যাত্রা টিকে গিয়েছিল সাহেব।

কিন্তু খুনের চেষ্টা একটা ঘোরতর অপরাধ। তায় লোকটা যদি সাহেব হয় ত কথাই নেই। ঘটনাটা নিয়ে বেশ তোলপাড় হলো। সাহেব রেসিডেন্টের স্বার্থেই যে পন্ডিতরা যাগযজ্ঞ করেছিল একথা মানলো না ইংরেজ বিচারসভা। সেকরার জবানবন্দিতেও সন্তুষ্ট হলো না তারা। ফলে বিচারে অভিযুক্ত হলেন বরোদার রাজা। তাঁকে নির্বাসনে পাঠানো হলো।

ইংরেজের এই অবিচারের অন্যরকম ভাবে প্রতিশোধ নিলেন পাতিয়ালার মহারাজা। যে ভাইসরয় বরোদার রাজার নির্বাসনদন্ডে দস্তখত করেছিলেন তিনি একবার পাতিয়ালা দর্শন করতে এলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে এই রাজপ্রতিনিধির যথোপযুক্ত সংবর্ধনার আয়োজন করা রাজার কর্তব্য। অর্থাৎ ৩১ বার তোপধ্বনির যে সম্মান ভাইসরয়ের পাওনা তার আয়োজন করতে হলো পাতিয়ালার মহারাজাকে। ৩১ বার তোপদাগা হলো ঠিকই, কিন্তু শব্দ হলো যেন ছেলের হাতের পটকা। অনুমান করা যায় যে ইচ্ছাকৃত এই অপমানটুকু করতে পেরে পাতিয়ালার রাজা নিশ্চয়ই ভারী তৃপ্তি পেয়েছিলেন।

করফিল্ডের লন্ডনে পেঁৗছানোর পরেই এইসব রিপোর্ট পোড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে অন্য কারণও ছিল। বিবাদ দানা বাঁধছিল ধীরে ধীরে। একযোগে রাজামহারাজারা তাড়া তাড়া চিঠি পাঠাতে শুরু করলেন দিল্লির সচিবালয়ে। যে চুক্তি অনুযায়ী রাজ্যের মধ্যে রেলগাড়ি চলছে, ডাকযোগাযোগ হচ্ছে সেটা রদ করতে চাইলেন রাজন্যরা। ব্যাপারটা বোঝাই যায় যে, এর পিছনে দুরভিসন্ধি ছিল। ঝাঁপ ফেলার সময় যাতে দর কষাকষি করতে পারেন, তার জন্যেই এই কূটনৈতিক চাল খেললেন তাঁরা। এর ফলে যে ছবিটা ফুটে উঠলো তা ভয়াবহ। অর্থাৎ দেশের সামগ্রিক চেহারাটা বিশৃঙ্খল হবে। ট্রেন চলবে না, ডাক বিলি হবে না, অন্য যোগাযোগ ব্যবস্থাও থাকবে না, ইত্যাদি।

একেই বলে ভবিতব্য। কেমন ড্যাবড্যাবে মরা চোখে ওই সাতজন নেতার দিকে

www.pathagar.com

চেয়ে আছে রবার্ট ক্লাইভের তেলরঙের মস্ত ছবিটা! পাশাপাশি বসে থাকা ওই সাতজন নেতাই আজ ৪০ কোটি মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা। এ'রাই গড়ে দেবেন ভারতীয়দের ভাগ্য যাদের সম্বন্ধে গান্ধীজী বলতেন, 'হতভাগ্য মনুষ্যত্ব।' দিনটা ২রা জুন ১৯৪৭। ভাইসরয়ের স্টাডি রুমে ওই সাতজন জনপ্রতিনিধি এসেছেন লণ্ডন থেকে পাশ হয়ে আসা খসড়া প্রস্তাবটা খুঁটিয়ে দেখতে। আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে এই দলিলটাই ব্রিটিশ ক্যাবিনেট থেকে পাশ করিয়ে এনেছেন মাউন্টব্যাটেন।

গোল টেবিলের চারপাশে নেতারা বসেছেন। প্রথমে বসেছেন কংগ্রেস দলের প্রতিনিধিরা। নেহরু, প্যাটেল এবং দলের সভাপতি আচার্য কৃপালনী। তাঁর পাশে বসেছেন মুসলিম লীগ নেতা জিন্না, লিয়াকত আলী খান এবং রব নিস্তার। তাঁর পাশে বসেছেন ষাট লক্ষ শিখেদের মুখপাত্র নেতা বলদেও সিং।

দেওয়ালের দিকে বসেছেন ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেনের দুজন প্রধান উপদেষ্টা। একজন লর্ড ইসমে অন্যজন স্যার এরিক্ মেভিল। টেবিলের মাথায় বসেছেন স্বয়ং বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন। সবাই নিঃশব্দ। একজন ফোটোগ্রাফার এসে ঐতিহাসিক বৈঠকের ছবি তুললো কয়েকটা। এই ছবিগুলিই সংগ্রশালায় নথিভুক্ত হয়ে থাকবে। নিঃশব্দ পরিবেশে মাঝে মাঝে গলাঝাড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। সচিবালয়ের একজন অফিসার সকলের সামনে একটা ম্যানিলা ফোল্ডার রেখে গেলেন। ওই ফোল্ডারের মধ্যেই রাখা আছে প্রস্তাবের একটা করে কপি।

মাউন্টব্যাটেন নেতাদের সংগে পৃথক বৈঠক করছেন না এবার। কিছুটা বাধ্য হয়েই সবাইকে নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক করতে রাজী হয়েছেন তিনি। বলাবাহুল্য, এটা তাঁর রাজনৈতিক কৌশল। তিনি স্থির করেছেন যে, এই ঐতিহাসিক বৈঠকে শুধু তিনি কথা বলবেন, অন্যেরা শুনবে। মিটিংটাকে তিনি উদ্ধত বাদানুবাদের ক্রীড়াক্ষেত্র করতে দিতে চান না।

মাউন্টব্যাটেন প্রথমেই স্বীকার করলেন যে গত পাঁচ বছরে যতগুলি আলোচনা সভায় তিনি অংশ নিয়েছেন গুরুত্বের বিচারে সেগুলোও ঐতিহাসিক। কারণ সেইসব আলোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বিশ্বযুদ্ধের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করেছে। কিন্তু আজকের এই বৈঠকটি যেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কালের বুকে এক নিবিড় দাগ রেখে যাবে আজকের বৈঠকের সিদ্ধান্তটা। এরপর দিল্লিতে আসা ইস্তক নেতাদের সংগে তাঁর জরুরী কথাবার্তার একটা সংক্ষিপ্তসার দিলেন তিনি।

নেতারা সবাই তখন অধীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছেন মাউন্টব্যাটেনের দিকে। মাউন্টব্যাটেন তাকালেন জিন্নার দিকে। তারপর সকলের সামনেই জিজ্ঞেস করলেন যে, ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব মতন, অখণ্ড ভারতবর্ষ তিনি চান কি না। জিন্না নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লেন। আবার কিছুক্ষণ নীরবতা। মাউন্টব্যাটেনের হাতে ভারত বিভাজনের প্রস্তাবের একটা কপি। সংক্ষেপে প্রস্তাবটার বিভিন্ন ধারাগুলো আলোচনা করার পর মাউন্টব্যাটেন বললেন যে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের প্রস্তাবটি চার্চিলও মেনে নিয়েছেন। সবাই নিঃশব্দে শুনলেন। মাউন্টব্যাটেন আরও জানালেন যে পা বাড়িয়ে দোর আগলে রাখতে চায় না ইংরেজ। তবে সাহায্যের আবেদন এলে যাতে হাতটা বাড়িয়ে দেওয়া যায় তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। কলকাতার বিশৃংখল অবস্থার কথাই ধরা যাক না! কিংবা আগামী দিনে শিখদের মনের ক্ষোভ! তখন সাহায্য চাইলে ব্রিটিশ সরকার সরাসরি মুখ ঘুরিয়ে নেবে না।

মাউন্টব্যাটেন আরও বললেন যে খসড়া প্রস্তাবে এমন কিছু ধারা আছে যা

www.pathagar.com

হয়ত নেতাদের মনঃপূত নয়। তিনি চান না যে বিবেক খুইয়ে নেতারা তা মেনে নেন। তবে তাঁর অনুরোধ যেন নেতারা খুনের রাজনীতি না করেন। শান্তির পরিবেশেই সবাই এটা মেনে নিন।

মাউন্টব্যাটেন চুপ করলেন। দফাওয়ারি আলোচনা শেষ হলো। মাউন্টব্যাটেন বললেন যে পরদিন সকালেই সবাইকে নিয়ে বৈঠক করবেন। সুতরাং আজ রাত্রের মধ্যেই তিন দলকেই তাদের মনোভাব জানাতে হবে। নেতারা যদি ঐকমত্যে পৌঁছতে পারেন, তবে পরের দিন সন্ধ্যায় দিল্লির আকাশবাণী থেকে তিন দলের নেতাকেই ভারতভাগের প্রস্তাবের সমর্থনে বেতার ঘোষণা করতে হবে। ওই একই সময়ে লন্ডন থেকেও বেতার ঘোষণা করবেন ক্লিমেন্ট এ্যাটলি। সুতরাং আজ মধ্যরাতের মধ্যে তিন দলের নেতারা যেন তাঁদের মনোভাব তাঁকে জানিয়ে যান। পর্যায়ক্রমে সকলের দিকে চেয়ে মাউন্টব্যাটেন বললেন, 'জেন্ট্‌ল্‌মেন, আই শুড্‌ লাইক ইওর রীয়্যাকশন্‌স্‌ টু দ্য প্ল্যান বাই মিডনাইট !'

মাউন্টব্যাটেনকে যেন দিল্লি পর্যন্ত তাড়া করে এনেছিল না-বলা একটা ভয়। এমনকি লন্ডনে তাঁর অমন আকাশচুম্বী সাফল্যের আনন্দও মাটি করে দিয়েছে এই অহেতুক ভয়টা। শুধু কি তাই? ভবিষ্যতের বিপুল আশাও জলাঞ্জলি যেতে বসেছে এই ভয়টার জন্যে। যদি গান্ধী নামে ওই ছোটখাট চেহারার অবুঝ মানুষটি তাঁর বিরুদ্ধতা করেন?

তা সেই আশঙ্কাটা কি নেহাতই অমূলক, হয়ত তাই। না হলে এই ক'দিনেই ওই 'মনমরা ছোট্ট পাখি'টার জন্যেই এমন আন্তরিক টান বোধ করেছেন কেন তিনি! দেশটার ভালমন্দ নিয়ে ওই অহিংসার পূজারীর সঙ্গে বোঝাপড়া করতেই বা খারাপ লাগবে কেন তাঁর!

তবে ভয়টা অহেতুক নয়। জিন্না নামে মানুষটা যেমন তাঁর অখন্ড ভারতের স্বপ্ন ভেঙেচুরে দিয়েছেন, তেমনি গান্ধীজীও তাঁর অমন সাধের বিভাজন প্ল্যানটা তছনছ করে দিতে পারেন। তাই এদেশের মাটিতে পা দেবার পর থেকেই কংগ্রেসী নেতাদের গান্ধীজীর কাছাকাছি নিয়ে আসার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন মাউন্টব্যাটেন। যাতে দরাদরির বৈঠকে গান্ধীজীকে অক্ষম করে দিতে পারেন, তাঁর প্রভাবটা ক্ষুণ্ণ করে দিতে দিতে পারেন। তা, এই দুরূহ কাজটা অপ্রত্যাশিত ভাবেই সহজ হয়ে গেছে যেন। তাঁকে কোন অতিরিক্ত উদ্যোগ নিতে হয় নি। কিছুটা অবাক হয়েই তিনি দেখেছেন যে কংগ্রেসের নেতারা যেন বৃদ্ধ গান্ধীজীর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েই তাঁকে সমর্থন করেছেন।

তবুও গান্ধীজীকে নিয়ে মাউন্টব্যাটেনের আতঙ্ক যেন কাটে নি। তিনি জানেন যে ওই দুর্জ্ঞেয় মানুষটির পিছনে আছে বিপুল জনসমর্থন। এতবড় আশ্বাসের জোর কংগ্রেসের আর কোন নেতার নেই। তাই ওরা নেতা হলেও আসল দল গান্ধীজীই। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁকে ঠাকুরের মতন পুজো করে এবং তিনিও যেন তাঁর ইচ্ছা দ্বারাই ওদের চালনা করেন। সুতরাং তিনি যদি চান তবে নেতাদের বাদ দিয়েই ভারতের জনগণের সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন। তেমনটি যদি ঘটে তবে ক্ষমতা যাচাইয়ের লড়াইয়ে একদিকে থাকবেন তিনি, নেহরু এবং প্যাটেল ও অন্যদিকে সুমহান আধ্যাত্মিক শক্তি নিয়ে থাকবেন একা গান্ধীজী।

আর সেই সম্ভাবনাটাই ঘটতে চলেছে। এবং ইতিমধ্যেই তার কিছু কিছু ইঙ্গিতও প্রকাশ পেয়েছে। যেদিন লন্ডন থেকে তাঁর 'ইয়র্ক' বিমানে চড়ে দিল্লির দিকে যাত্রা করলেন মাউন্টব্যাটেন, সেদিনই তাঁর এক সান্ধ্য প্রার্থনা সভায় গান্ধীজী

www.pathagar.com

ঘোষণা করলেন, 'জ্বলেপুড়ে যাক সারা দেশ, কিন্তু পাকিস্তানের জন্যে সূচ্যগ্র-ভূমিও আমরা ছেড়ে দেব না।'

তবে লোককে তিনি যাই-ই বলুন, ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত নেবার পরের মাসটা এক দুঃসহ বেদনা আর অনিশ্চিত মানসিক অবস্থার মধ্যে কাটাতে হচ্ছিল গান্ধীজীকে। তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে গান্ধীজী অনুভব করছিলেন যে দেশভাগ করা অন্যায়। কিন্তু কোথায় তাঁর সেই আকাশ কাঁপানো প্রতিবাদ? বরং তিনি বুঝতে পারছিলেন যে নেতারা অনেক সরে গেছে তাঁর অনুসরিত পথ থেকে। আর নিজের 'পরেও' সেই আত্মবিশ্বাস নেই যা দিয়ে ভারতের মানুষকে তাঁর ডাকে সাড়া দেওয়াতে পারেন। 'হায়! সে ভাষা ভুলিয়া গেছি'! ঠিক তাই। একদিন সকাল-বেলা দিল্লির রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন গান্ধীজী। সংগে একজন সহকর্মী। সে হঠাৎ বললো, 'যে সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তার ছবি দেখলাম। আপনি নেই। ওরা আপনাকে বা আপনার আদর্শকে এখন খেদিয়ে দিয়েছে।' গান্ধীজী শুনলেন এই তিক্ত মন্তব্য। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তা বটে। এখন থেকে আমার ছবি বা মূর্তিতে ওরা শুধুই মালা দেবে। আমার কথা কেউ শুনবে না।'

এই ঘটনার দিনকয়েক পরের কথা। সেদিন ভোর সাড়ে তিনটায় ঘুম ভেঙে গেল গান্ধীজীর। সাধারণত ভোর চারটায় উঠে তিনি প্রার্থনা করতেন। কিন্তু আধ ঘণ্টা আগে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় অন্ধকারেই চুপ করে বসে রইলেন গান্ধীজী। পাশেই শুয়ে আছে মনু। দিল্লির ধাঙড় কলোনির এই একখানা ঘরে নাতনীকে পাশে নিয়ে শুয়েছিলেন বৃদ্ধ। শেষদিন পর্যন্ত এইভাবেই পাশাপাশি শুয়েছেন তাঁরা। মনুরও ঘুমের ঘোর কেটে গেছে। সে শুনলো অন্ধকারে বসে বিড়বিড় করছেন গান্ধীজী। মনু শুনতে পেল তিনি যেন নিজেকে শোনাতেই বলছেন, 'আজ আমি সম্পূর্ণ একা। নেহরু, প্যাটেলও আমার পাশে নেই। ওদেরও ধারণা যে আমিই ভুল করেছি। দেশভাগ না হলে ভারতে শান্তি আসবে না।' একটু চুপ করলেন গান্ধীজী। তারপর বললেন, 'ওরা ভাবছে যে আমি বুড়ো হয়ে গেছি। আমার ভীমরতি হয়েছে। হয়ত তাই। ওরা সবাই ঠিক আর আমিই অন্ধকারে হাতড়াচ্ছি।' এবার অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন বৃদ্ধ। তারপর সখেদে বললেন, 'হয়ত সংকট দেখতে আমি বেঁচে থাকবো না। অবশ্য সত্যিই যদি ভারতের স্বাধীনতার সংকট দেখা দেয় তবে ইতিহাস যেন সাক্ষী দেয় যে এই বুড়োটা সেই চিন্তা নিয়েই গেছেন।'

২রা জুন তারিখে ভাইসরয়ের স্টাডি রুমে গান্ধীজী ঢুকলেন দেড়ঘণ্টা পরে। নেতারা আগেই খসড়া প্ল্যানের কপি নিয়ে গেছেন। ওঁদের মতামত অনুমান করতে পারেন ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন। কিন্তু গান্ধীজী কি মতামত দেন তা শুনতে আগ্রহী তিনি। ওঁদের সংগে আসতে চান নি গান্ধীজী। কারণ তিনি নাকি দলের কোনো পদাধিকারী নন। তাই তাঁকে আলাদা ডেকে পাঠিয়েছেন মাউন্টব্যাটেন। তাঁর ভয় হচ্ছিল, না জানি কি শুনবেন! গান্ধীজীর আত্মিক বাণীর কি নির্দেশ হয়! যদি সেই অনিশ্চিত 'ইনার ভয়েস' সংঘর্ষের মধ্যে টেনে নিয়ে যায় তাঁকে? অপেক্ষা আর অপেক্ষা। সত্যিই যেন এক দুর্মর আশঙ্কায় মুহূর্ত অতিবাহিত হচ্ছিল মাউন্ট-ব্যাটেনের।

গান্ধীজী ঢুকলেন কাঁটায় কাঁটায় বেলা সাড়ে বারোটায়। বস্তুত, গান্ধীজীর

www.pathagar.com

জীবনে এই সময়ানুবর্তিতা এমন এক অবলম্বন ছিল যেখানে কখনো ভ্রষ্টাচার হয় নি। মাউন্টব্যাটেনের ঘরের ফায়ারপ্লেসের মাথায় সুদৃশ্য তাকের ওপর সোনার ঘড়িতে যেমনি সাড়ে বারোটা বাজলো অমনি গান্ধীজী ঢুকলেন। দরজার ফ্রেমে তাঁর দেহমূর্তির কাঠামোটা দেখেই মাউন্টব্যাটেন এগিয়ে গেলেন তাঁকে অভ্যর্থনা করতে। কিন্তু তাঁর মুখের হাসি আর সাদর অভ্যর্থনা মাঝপথেই থমকে গেল গান্ধীজীর দুষ্টুমিভরা মুখের দিকে চেয়ে। মাউন্টব্যাটেনকে আসতে দেখেই গান্ধীজী তাঁর ঠোঁটের ওপর ডান হাতের তর্জনী রেখে দুষ্টু একটু হাসলেন। গান্ধীজীর এই ভঙ্গী দেখে আশ্বস্ত হলেন মাউন্টব্যাটেন। স্বস্তির একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে মনে মনে বললেন, 'আঃ! আজ তাহলে ওঁর মৌন দিন! ভগবান বাঁচালেন।'

ভগবান সত্যিই বাঁচিয়ে দিলেন মাউন্টব্যাটেনকে। দিনটা সোমবার। অনেক দিন ধরেই এই দিনটি তিনি 'মৌন দিবস' হিসেবে পালন করছেন। অনর্গল বাক্যালাপ থেকে সপ্তাহে একটা দিন কণ্ঠস্বরের নির্বিচার ব্যবহারকে তিনি বিরাম দিতেন। একরকম ব্রতপালনের মতন এই আচারটি তিনি মেনে চলতেন। সুতরাং যে নির্ভীক কণ্ঠস্বর সাধারণ ভারতীয়দের মাউন্টব্যাটেনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে পারতো, সেই কণ্ঠস্বর সেদিন শুনতে পেল না কেউ। অবশ্য যে কথাটা জানতে প্রায় অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন মাউন্টব্যাটেন সেটাও আজ জানা গেল না।

গান্ধীজী ঘরে ঢুকে আর্মচেয়ারে বসলেন। তারপর কোমরের খুঁট থেকে খানকয়েক পুরনো খাম আর ক্ষয় হয়ে যাওয়া একটা ছোট্ট ইঞ্চি দুই লম্বা পেন্সিল বার করলেন। গান্ধীজীর জীবনে কোন বস্তুই অপ্রয়োজনীয় নয়। কিছুই তিনি ফেলে দেন না। এমনকি চিঠি পড়ার পর খামগুলো জমিয়ে রাখতেন নোট লেখার প্যাড করতে।

মাউন্টব্যাটেন তাঁর কাছে খসড়া প্রস্তাবটা আগাগোড়া ব্যাখ্যা করার পর, গান্ধীজী একটা পুরনো খামের উল্টোপিঠে তাঁর প্রথম যে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন তা আমরা জানতে পারতাম না, যদি না যত্ন করে সেগুলো সংগ্রহ করে রাখতেন মাউন্টব্যাটেন। মোট পাঁচখানা পুরনো খামের উল্টোপিঠে পেন্সিল দিয়ে গান্ধীজী তাঁর মন্তব্য লিখে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন। তিনি বেরিয়ে যাবার পর মাউন্টব্যাটেন সেগুলো একত্র করে পড়লেন, 'কথা বলতে পারছি না। তাই দুঃখিত। যখন সোমবারটা মৌনী থাকার সিদ্ধান্ত নিই তখন দুটো ক্ষেত্রে মৌনব্রত ভাঙার কথা ভেবেছিলাম। হয় এমন কোন জরুরী সভা যেখানে আমার কথা বলা দরকার নয়ত কোন রোগকাতর মানুষকে সান্ত্বনা জানানো। দুটোর কোনটাই নয় বলে আপনি নিশ্চয়ই আমার ব্রত ভাঙতে অনুরোধ করবেন না। অবশ্য একটা দুটো ব্যাপারে আমায় কিছু বলতেই হবে। তবে আজ নয়। আবার যেদিন দেখা হবে সেদিন।'

লাটভবনের অন্ধকার করিডোরটা থমথম করছে। কার্পেটপাতা লম্বা করিডোরের ওপর দিয়ে মাঝে মাঝে এক আধজন সাদা উর্দি পরা আর্দালী হাতে কাগজপত্র নিয়ে নিঃশব্দে যাতায়াত করছে ভূতের মতন। তবে করিডোর অন্ধকার হলেও মাউন্টব্যাটেনর খাস স্টাডি রুমটা তখনও ঝলমল করছিল আলোয়। মাঝরাত হবে তখন! দিনের শেষ বৈঠকের বিবর্ণ অভিজ্ঞতাটা ঢাকা দিতেই যেন এই আলোর ঝলকানি।

www.pathagar.com

ঘরের মধ্যে মাউন্টব্যাটেন ছাড়া আর একজনই মানুষ বসে আছেন তাঁর নাম জিন্না। এই মানুষটির দিকেই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন মাউন্টব্যাটেন। এমন একটা অবিশ্বাস তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠেছে যা বোঝানো যায় না। মাউন্টব্যাটেন সত্যিই যেন থমকে গেছেন। খানিক আগে কংগ্রেস এবং শিখ নেতারা সায় দিয়ে গেছেন তাঁর প্রস্তাবে। বাকী আছেন শুধু জিন্না। অথচ তাঁর জন্যেই এত তোড়জোড়। এই মানুষটির জিদের জন্যেই ভারত ভাগ আজ এমন অনিবার্য। কিন্তু আশ্চর্য! এই মানুষটাই আজ ছুতোনাতায় সময়হরণ করে চলেছেন। এখনো পর্যন্ত প্রস্তাবের পক্ষে তাঁর দলের সায় দিতে পারেন নি। মাউন্টব্যাটেন বুঝতে পারছেন না কেন এই কুণ্ঠা, দ্বিধা। সারাজীবনে যে মানুষটা কখনো 'হ্যাঁ' বলে নি, সর্বক্ষেত্রে 'না' হুমকি দেখিয়ে যে মানুষটা জীবনকে সফল করে গড়ে তুললেন, শেষ সময়েও কি এই মন্ত্রটাই অবলম্বন করে ফেরাতে চাইছেন মাউন্টব্যাটেনকে?

বেশ ধন্দে পড়েছেন মাউন্টব্যাটেন। কিন্তু সামনে বসে থাকা ওই মানুষটা কী আশ্চর্য রকমের উদাসীন! কেমন নিস্পৃহ হয়ে পাথরের হোল্ডারের মধ্যে একটার পর একটা 'ক্র্যাভেন এ' সিগারেট ঢুকিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে চলেছেন। আকারে ইঙ্গিতে একটাই কথা বলেছেন জিন্না। তিনি বলেছেন যে মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সমর্থন ছাড়া 'হ্যাঁ' বা 'না' কোনটাই বলতে পারবেন না তিনি। সুতরাং তাঁর সময় চাই। অন্তত এক সপ্তাহ সময়। কাউন্সিলের সব সভ্যদের দিল্লিতে জড়ো করতে এই সময়টা তাঁর লাগবেই।

মাউন্টব্যাটেন স্তম্ভিত। জিন্নাকে নিয়ে এতদিন ধরে যত হতাশা জমা হয়েছে সেগুলো যেন প্রবল হয়ে ফুঁসে উঠলো তাঁর মনে। পাকিস্তান হাতে পেয়ে এ কি আবদার করছেন জিন্না!? এ ত অবিশ্বাস্য! যা তিনি চাইছিলেন তাই তিনি পেলেন। শিখেরাও মেনে নিয়েছে তাঁকে। এখন শেষ মুহূর্তে সব কিছু ভেঙেচুরে দিতে চাইছেন কেন? 'হ্যাঁ' বলার যোগ্যতা নেই বলে?

কিন্তু মাউন্টব্যাটেনকেও জিন্নার সম্মতি আদায় করতেই হবে। লন্ডনে এ্যাটলী অপেক্ষা করে আছেন। আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই হাউস অব কমন্স সভায় ভারতের হাতে স্বায়ত্বশাসন দেবার ঐতিহাসিক ঘোষণা করবেন তিনি। এ্যাটলী এবং তাঁর সরকারের কাছে মাউন্টব্যাটেন কথা দিয়ে এসেছেন যে, শেষ মুহূর্তে তাঁর প্রস্তাবটা বানচাল হয়ে যাবে না। তাদের বুঝিয়ে দিয়ে এসেছেন যে ভারতের নেতারা তাঁর প্রস্তাবে সায় দেবেন। অবশ্য প্রথম পর্যায়ে কংগ্রেসের নেতারা কিছুটা অনিচ্ছুক ছিল। শেষমেশ তাঁদের রাজী করাতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে তাঁকে। অন্তত গান্ধীজীও সাময়িকভাবে চোখ বুজে থাকতে সম্মত হয়েছেন। এখন জিন্না যদি ভ্রষ্টাচার করেন তবে কংগ্রেসীরা মনে করতে পারে যে চাপ দিয়ে জিন্না অতিরিক্ত অনুগ্রহ পেতে চাইছেন। সেক্ষেত্রে এত যত্ন নিয়ে তৈরি করা পরিকল্পনাটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যেতেই পারে।

সুতরাং শক্ত হলেন মাউন্টব্যাটেন। জিন্নার দিকে চেয়ে বললেন, 'মিস্টার জিন্না! আপনি যদি ভেবে থাকেন যে সাতদিনের মধ্যে কাউন্সিল সভ্যদের জড়ো করতে না পারা পর্যন্ত আমি চুপচাপ বসে থাকবো তবে ভুল করবেন। আর অপেক্ষা করা যায় না, কারণ ধৈর্যের শেষ সীমায় এসেই আমরা এই প্ল্যান তৈরি করেছি।'

একটু চুপ করে মাউন্টব্যাটেন ফের বললেন, 'আপনি যা চেয়েছিলেন সেই পাকিস্তান আপনি পেয়েছেন। একটা দিন ছিল যখন কেউ ভাবতেও পারে নি যে

www.pathagar.com

পাকিস্তান হতে পারে। কিন্তু হয়েছে। আমি জানি, আপনি কি বলবেন। আপনি বলবেন পোকায় খাওয়া দেশ। হয়ত তাই। তবুও স্বাধীন পাকিস্তান বৈকি! তবে সবটাই নির্ভর করছে কাল কর মধ্যে আপনার রাজী হবার ওপর। আপনার কথায় আস্থা রেখেই কংগ্রেস এই প্রস্তাবে সায় দিয়েছে। এখন যদি তাদের সন্দেহ হয় যে এ ব্যাপারে আপনি গড়িমসি করছেন, তাহলে তখুনি সমর্থন ফিরিয়ে নেবে তারা। এক ভয়ঙ্কর এলোমেলো অবস্থার মধ্যে পড়ে যাব আমরা সবাই।' তখনও মাথা নাড়ছেন জিন্না। বললেন, 'সবই বুঝলাম। কিন্তু আমাকেও আইন মোতাবেক কাজ করতে হবে। কারণ আমি একা মুসলিম লীগ নই।'

মাউন্টব্যাটেন ক্রমেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিলেন। জিন্নার শেষ কথায় তাঁর ধৈর্যের বাঁধ প্রায় ভেঙে গেল। তবুও শান্ত থাকবার চেষ্টা করলেন। বরফের মতন ঠাণ্ডা গলায় শুধু বললেন, 'মিঃ জিন্না, আমায় আপনি ভোলাবার চেষ্টা করবেন না। সারা পৃথিবীর মানুষকে আপনি যা খুশি বোঝাতে পারেন। কিন্তু আমি জানি কে মুসলীম লীগ! কাদের নিয়ে মুসলিম লীগ!'

তবুও জিন্না জিদ ধরে রইলেন। যেন পাথরের দেওয়াল। তখন মাউন্টব্যাটেন অন্যভাবে কথাটা পাড়লেন। জিন্নার দিকে সরাসরি চেয়ে বললেন, 'একটা কথা আপনাকে বলতে চাই মিঃ জিন্না। আপনার নিজের তৈরি এই প্রস্তাবটা আমি নষ্ট হতে দেব না। ভাবুন ত, এই প্রতিকারের রাস্তা বের করতে কত পরিশ্রম করতে হয়েছে আপনাকে! সুতরাং আমার অনুরোধ ব্যক্তিগতভাবে এটা আপনি মেনে নিন।'

মাউন্টব্যাটেন আরও বললেন, 'কাল মিটিংয়ে আমি বলবো যে সামান্য কিছু অংশ ছাড়া প্রস্তাবের সবটুকুই কংগ্রেস মেনে নিয়েছে। যেটুকু সম্বন্ধে ওদের দ্বিধা আছে তা আমিই নিষ্পত্তি করে দিতে পারবো বলে আমার বিশ্বাস। শিখরাও মেনে নিয়েছে এই প্রস্তাবটা। এরপর বলবো যে মিঃ জিন্নার সঙ্গে খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে আমার। উনি ব্যক্তিগতভাবে আমায় কথা দিয়েছেন যে প্রস্তাবটা সম্বন্ধে ওঁর কোন অমত নেই। সেই মুহূর্তে আমি আপনার দিকে তাকাবো। তখন আপনি একটাই কাজ করবেন। কোন কথা বলতে হবে না আপনাকে। আপনি শুধু ঘাড় নেড়ে সায় দেবেন আমার কথায়।'

এবার মাউন্টব্যাটেন চুপ করে জিন্নার মুখের দিকে চাইলেন। ওঁর মুখের ভাবটুকু বোঝবার চেষ্টা করছিলেন তিনি। তারপর হঠাৎ গলার স্বর কঠিন করে বললেন, 'মিঃ জিন্না, আপনি যদি আমার কথায় সায় না দেন, তাহলে আমার পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব হবে না। সমস্ত প্ল্যানটাই ভেঙে পড়বে তখন। এতদিনের সব পরিশ্রম বিফল হয়ে যাবে। ভাববেন না যে আপনাকে ধমক দিচ্ছি। আমি ভবিষ্যৎ দেখতে পাই। এ আমার ভবিষ্যদ্বাণী। এই মুহূর্তে আমার কথায় সায় না দিলে আমার দ্বারা কিছুই আর করা যাবে না। আপনারও হাতছাড়া হয়ে যাবে পাকিস্তান। আর আমার কথা যদি শুনতে না চান তো বলবো যে আপনি চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবেন।'

পরের দিন যে বৈঠকে ভারত ভাগের প্ল্যানটা আনুষ্ঠানিকভাবে মঞ্জুর হলো সেটি নির্দিষ্ট সময়েই বসেছিল। যথারীতি মাউন্টব্যাটেনই একমাত্র বক্তা। আর একবার তিনি ভারতীয় নেতাদের এক নিবিড় নৈঃশব্দের মধ্যে নিমজ্জিত করে নিজেই সভার কাজ চালাতে লাগলেন। শুধু নিজের নয়, অন্যদের কথাও তিনিই

www.pathagar.com

বললেন সেদিন। মাউন্টব্যাটেন বললেন যে প্রত্যাশা মতই কিছু কিছু অনুপপত্তি সত্ত্বেও তাঁর ভারত ভাগের প্ল্যান তিন দলই মেনে নিয়েছেন। এজন্য তিনি কৃতজ্ঞ। কংগ্রেস এবং শিখরা ইতিমধ্যেই সম্মতি দিয়েছেন। দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর জিন্নাও তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন যে প্ল্যানটা মেনে নেওয়া যায়।

কথাগুলো বলেই তাঁর ডান পাশে থাকা জিন্নার দিকে তাকালেন মাউন্টব্যাটেন। ঠিক সেই মুহূর্তে মাউন্টব্যাটেন জানেন না যে জিন্নার মনোভাব কি। জিন্না কি তাঁকে সায় দেবেন? কি অনিশ্চিত অবস্থা! মনের মধ্যে চলেছে আলোছায়ার খেলা। কে বলবে এই মানুষটাই ক'টা বছর আগে 'কেলী' ভেস্ট্রিয়ারের অমন দুর্ধর্ষ; নির্ভীক ক্যাপ্টেন ছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুপ্রীম কম্যান্ডার হিসেবে এই মানুষটাকেই সেনাবাহিনী সমেত ইম্ফলের সমতলে জাপানী শত্রুপক্ষরা বন্দী করে রেখেছিল। সেদিন একটুও বিচলিত হন নি মাউন্টব্যাটেন। আজ কিন্তু তাঁর অটল আত্মবিশ্বাস অনেক শিথিল। সর্বদাই "কি হয়, কি হয়' ভাব। তাঁর তখনকার মনের অবস্থা সেইভাবেই ব্যক্ত করেছেন মাউন্টব্যাটেন। বলেছেন, 'আমার জীবনের সবচেয়ে রোমহর্ষক মুহূর্ত।' মুহূর্ত ত নয়, যেন যুগ। অপেক্ষার সেই অনন্ত মুহূর্তের কি শেষ নেই? কি করুণ সেই প্রত্যাশ্যার মুহূর্তগুলি! আর আশ্চর্য ওই জিন্না নামক মানুষটির ভাবলেশহীন আত্মম্ভরি মুখখানা! কি আছে ওই অতলস্পর্শী মনের গভীরে: অবশেষে ধীরে ধীরে ওই তীব্র অনিচ্ছার আবরণ ভেদ হলো। শরীরের সমস্ত লোমকূপ ছিন্ন করে যেন বিন্দু বিন্দু কান্নার মতন ক্ষরিত হলো জিন্নার সম্মতি। থুতনিটা মাত্র আধ ইঞ্চিটাক নীচে নামিয়ে সায় দিলেন জিন্না। অনুমান করা যায় যে স্বল্প দূরত্বের এই আনতি হয়ত তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে অপ্রিয় মুহূর্ত।

সেদিন পাকিস্তান নামক নতুন রাষ্ট্রজনকের এই সংক্ষিপ্ত এবং প্রায় অলক্ষ্য আনতিই যেন এই উপ-মহাদেশের সাড়ে চার কোটি মানুষের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারিত করে দিয়েছিল। যত কদাকারই হ'ক এর চেহারা, যত দুস্তরই হ'ক এর দুই খণ্ডের মধ্যে ব্যবধান, তবুও এক 'অসম্ভব স্বপ্ন' যেন সার্থক হয়েছিল সেদিন। এগিয়ে যাবার পথে আর কোন বাধা রইল না মাউন্টব্যাটেনের। বৈঠকে উপস্থিত নেতারা পাছে আর কোন নতুন উপসর্গ সৃষ্টি করেন, তাই সাত তাড়াতাড়ি মাউন্টব্যাটেন সবাইকে জানিয়ে দিলেন যে এখন থেকে এই উপ-মহাদেশের যাবতীয় সমস্যার মীমাংসা করবে এই প্ল্যান।

বলাবাহুল্য, এতবড় সাফল্যের রেশটুকু মিলিয়ে যাবার আগেই মাউন্টব্যাটেন আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেন। আগে থেকেই বন্দোবস্ত করা ছিল। তাঁর ইঙ্গিতে সিঙ্গল স্পেসে টাইপ করা ৩৪ পৃষ্ঠার একটা পুস্তিকা দুম করে পড়লো প্রত্যেক নেতার সামনে। মাউন্টব্যাটেন হাতে তুলে নিলেন শেষ কপিটা। তারপর দু হাত দিয়ে কপিটা মাথার ওপর তু'ল ধপ করে ফেললেন টেবিলের ওপর। কাঠের টেবিলের ওপর শব্দ করে যা পড়লো সেটিও আর একটি ঐতিহাসিক দলিল। সবাই চমকে তাকিয়ে রইল পুস্তিকার প্রথম পাতার টাইটেলের দিকে। কি অদ্ভুত নাম বইটার! দ্য য়্যাডমিনিসট্রেটিভ কনসীকোয়েন্সেস অব পার্টিশন' অর্থাৎ দেশভাগজনিত প্রশাসনিক সমস্যা। এত জটিলতা? হ্যাঁ তাই। অতি সূক্ষ্ম প্রশাসনিক সমস্যাগুলি বাছাই করেছেন মাউন্টব্যাটেনের সচিবালয়ের কর্মীরা। .

www.pathagar.com

সন্দেহ নেই যে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গেই তৈরি করা এই ৩৪ পাতার বইটা বিশদভাবে বর্ণিত সমস্যাগুলোর ধারাবাহিক আলোচনায় সমৃদ্ধ। এই নতুন 'সওগাত'টা ভারতীয় নেতাদের কাঁধে যেন এক গুরুভার দায়িত্ব অর্পণ করলো। পাতার পর পাতা জুড়ে নীরস কেজো গদ্যে খুঁটিনাটি আলোচনা করা হয়েছে কত না প্রশাসনিক সমস্যার যার বিন্দু বিসর্গ জানা ছিল না নেতাদের। রীতিমত ভীতিকর সেই ফিরিস্তি। সুতরাং মাউন্টব্যাটেন যখন পুস্তিকার পাতা ওল্টাচ্ছেন তখন এর প্রাথমিক ধাক্কার ঢেউ সামাল দিতে হিমসিম খেয়ে গেলেন নেতারা। তাঁরা বেশ বুঝতে পারলেন যে তাঁদের সামনে পড়ে আছে অনেক কাজ। এর ব্যাপ্তি এত বিপুল যার মুখোমুখি হবার দুঃসাহস অনেক জাতিরই হয় নি এবং যার বিশালতা কল্পনাকেও অনায়াসে হার মানায়। সত্যিই নেতাদের কাঁধে এখন অনেক দায়িত্ব। তিন হাজার বছর ধরে পাশাপাশি বাস করার দরুন সংস্কৃতিতে যে মিশ্রণ হয়েছে তার জাল কেটে আলাদা করতে হবে। টুকরো টুকরো করে ভাগ করতে হবে তিনশ' বছরের প্রযুক্তির ফসল। এর ওপর আছে ব্যাঙ্কের আমানতের হিসাব, ক্যাশ টাকার হিসাব, ডাকটিকিট, লাইব্রেরির বই, যাবতীয় সম্পদ আর ঋণের দায়, পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম রেলপথের ভাগাভাগি, জেলখানার বন্দীদের ভাগবন্টন ইত্যাদি। সবই যেমন আছে তেমনি থাকবে। হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাকেন্দ্র, সেবা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। সঙ্গে এক ব্যাপক পরিষেবার বিভাজন হবে। এছাড়াও আছে দোয়াত, কলম, ঝাঁটার ভাগ বাটোয়ারা। রীতিমত মাথায় হাত দেবার মতন অবস্থা।

এই প্রথম নেতারা উপলব্ধি করলেন যে বিচ্ছেদের দায় কত জটিল। নেতারা স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে আছেন ৩৪ পাতার বইটার দিকে। থমথম করছে পরিবেশ। বলতে কি, খুবই যোগ্যতার সঙ্গে নাট্যমঞ্চের এই দৃশ্যপটটি সাজাতে পেরেছেন মাউন্টব্যাটেন। যা তিনি আশা করেছিলেন ঠিক তাই-ই হলো। অকাজের এই কুম্ভীপাক থেকে নিষ্কৃতি পেতে নেতারা যেন নিবিষ্ট হয়ে গেলেন। এটাই চেয়েছিলেন মাউন্টব্যাটেন। এখন তিনি নিশ্চিন্ত যে, নতুন করে আর কোন বাহানা করবে না ওরা। ছুতা ওজর দেখিয়ে অভিযোগের নতুন নতুন ফর্দ পেশ করার সময় বা উৎসাহ কোনটাই ওদের নেই। ওরা এখন বিহ্বল। অন্তত যে ক'টা দিন ওদের একসঙ্গে থাকতে হবে সেই ক'টা দিন তাঁর শান্তিতেই কাটবে। মাউন্টব্যাটেন নাকি তাঁর সহকর্মীদের কাছে সে কথা বলেছিলেনও। সময়টা যদি স্বাভাবিক হতো তাহলে অমন জাঁদরেল নেতাদের মুখচোখের ওই করুণ অসহায় অবস্থাটা দিব্যি উপভোগ করা যেত।

৩রা জুন ১৯৪৭। গান্ধীজী দেশভাগের সিদ্ধান্তের কথা শুনলেন সন্ধ্যে সাতটায়। সান্ধ্যভ্রমণ শেষ করে সবে ফুটবাথ নিচ্ছেন। একজন সেবিকা ঝামা দিয়ে পা ঘষে দিচ্ছিল। ছুটতে ছুটতে এল আর একজন মহিলা ভক্ত। সেই-ই বললো কথাটা। বড়লাট নাকি নেতাদের সঙ্গে দ্বিতীয় বৈঠকের পর এই দেশ ভাগের সিদ্ধান্তটা পাকা করে নিয়েছেন। গান্ধীজী চুপ করে শুনলেন। একটি কথাও বললেন না। শুধু তাঁর সারা মুখখানি বেদনায় ম্লান হয়ে গেল। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন তিনি। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'ভগবান ওদের রক্ষা করুন, ওদের চৈতন্য দিন!'

সন্ধ্যে সাতটার কিছু পরে দিল্লির আকাশবাণী থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে

www.pathagar.com

ঘোষণা করা হলো এই চরম মীমাংসার কথা। নেতারা একের পর এক বলে গেলেন যে এই উপ-মহাদেশকে দুই পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্রে ভাগ করতে ঐকমত্য হয়েছেন তাঁরা। প্রথমে বললেন ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন। খুবই সংক্ষিপ্ত সংযত ভাষণ। যে ক'টি কথা বললেন সবই প্রত্যয়নিষ্ঠ। ওঁর পরের বক্তা নেহরু। আবেগে যেন কণ্ঠরোধ হয়ে যাচ্ছিল তাঁর। দেশবাসীকে হিন্দিভাষায় উনি বললেন যে, 'ভারত নতুন ভাবে তার ভাগ্য গড়তে চলেছে। অনেক ক্লেশ বেদনার মধ্যে যেতে হয়েছে দেশকে। তবে দেশবাসী যেন আবেগে অভিভূত না হন। এখনো অনেক কঠিন পথ পেরোতে হবে সবাইকে।' আরও বললেন যেন দেশবাসী দেশভাগ মেনে নেয়। এ এক চরম বাস্তব সত্য। অবশ্য একথাও ঠিক যে সকলের মতন তাঁর হৃদয় মথিত হচ্ছে এই দেশভাগের কথাটা বলতে। দেশবাসী তাঁকে যেন ভুল না বোঝেন। আহ্লাদ করে তিনি তাদের এতবড় সত্যটা জানাতে আসেন নি।

এর পরের বক্তা জিন্না। তবে আকাশবাণী থেকে তাঁর সেই ভাষণ যেন তাঁর কীর্তির চেয়েও বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল সেদিন। বলতে কি, এমন মহান অসংগতির দৃষ্টান্ত সচরাচর দেখা বা শোনা যায় না। যাদের জন্যে এত মান অপমান সয়ে তিনি পাকিস্তান গড়লেন তাদের প্রাণের ভাষায় বক্তৃতা দেবার যোগ্যতা তাঁর ছিল না। জিন্না তাঁর এই ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন ইংরিজিতে। ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মুসলমান তাঁর মুখ থেকে সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী ভাষায় সেদিন শুনতে পেল যে তাদের মাথা গোঁজার আলাদা ঠাঁই করে দিয়েছেন জিন্না। জিন্নার দুর্ভাগ্য যে এই উপ-মহাদেশে পাকিস্তান নামক ইসলামিক রাষ্ট্র তৈরির খবরটা ঘোষক অনুবাদ করা ভাষণ থেকে দেশবাসীকে শুনতে হয়েছিল সেদিন। সেদিন জিন্না একটাই উর্দু কথা বলেছিলেন, 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ।' এই বলেই ভাষণ শেষ করেছিলেন জিন্না।*

পরের দিন, অর্থাৎ ৪ঠা জুন। গান্ধীজী যেন তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর আবার ফিরে পেয়েছেন। অহিংসার পূজারী গান্ধীজীর মাত্র একটা দিনের মৌনতা মাউন্টব্যাটেনকে যে অবকাশটুকু দিয়েছিল তা শেষ হয়ে গেছে। গান্ধীজী তাই মনে মনে যেন গর্জে উঠতে চাইছিলেন। বিকেল চারটে নাগাদ মাউন্টব্যাটেন একটা জরুরী খবর পেলেন যে গান্ধীজী নাকি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যাবার কথা মনস্থ করেছেন। সেদিনের সান্ধ্য প্রার্থনা সভায় এই ঘোষণাটাই করবেন এবং পার্টিশন প্ল্যানের নিন্দা করে ভাষণ দেবেন। খবরটা শুনেই মনে মনে চিন্তিত হলেন মাউন্ট-ব্যাটেন। তাড়াতাড়ি একজন ঘনিষ্ঠ সহকারীকে পাঠিয়ে গান্ধীজীকে আসতে অনুরোধ করলেন তিনি।

গান্ধীজী এলেন ঠিক ছ'টায়। স্টাডি রুমে অপেক্ষা করছিলেন মাউন্টব্যাটেন।

---

* 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' উর্দু কথা। সেদিন অনেক মুসলমান শ্রোতাই জিন্নার গলায় এই উর্দু কথাটা বুঝতে পারেন নি। ইংরিজি ভাষা থেকে হঠাৎ এমনভাবে উর্দুতে সরে আসায় অনেকেরই ধাঁধা লেগে গিয়েছিল। জিন্না যখন আড়ষ্ট উর্দুতে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলে ভাষণ শেষ করলেন, তখন অনেকেই ভেবেছিল তিনি বলছেন, 'পাকিস্তানস্ ইন দ ব্যাগ' অর্থাৎ পাকিস্তানকে থলের মধ্যে পোরা হয়েছে।

www.pathagar.com

গান্ধীজীকে দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন যে মানসিকভাবে কতটা উতলা তিনি। গান্ধীজীর প্রার্থনাসভা বসবে ঠিক সাতটায়। অর্থাৎ মাউন্টব্যাটেনের হাতে এক ঘন্টা সময়ও নেই। এর মধ্যেই আসন্ন দুর্যোগটুকু কাটিয়ে উঠতে হবে তাঁকে। শুধু উতলা নয় গান্ধীজী যেন নিবিড় চিন্তামগ্ন। আর্মচেয়ারে ছোট্ট শরীরটা দুমড়ে কুঁচকে বসে আছেন যেন 'ডানা ভাঙা একটা পাখির মতন' (লাইক আ বার্ড উইথ আ ব্রোকেন উইং)। মাঝে মাঝে ডান-হাতটা ওঠাচ্ছেন নামাচ্ছেন আর অস্ফুট স্বরে বলছেন 'ইট্স্ সো অফুল, সো অফুল!'

বৃদ্ধ মানুষটির এই খেদোক্তির মানে মাউন্টব্যাটেন বুঝতে পারেন। এই নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণার সময় যা খুশি করতে পারেন তিনি। একটিবার যদি জনসভায় দাঁড়িয়ে দেশভাগের নিন্দে করেন তাহলেই উত্তাল হবে সারা দেশ। সে এক উৎকট অবস্থার সৃষ্টি হবে তখন। কে সামলাবে সেই দুর্বারতরঙ্গ? ভেসে যাবেন নেহরু, প্যাটেলের দল। হয় তাঁরা গান্ধীজীকে ত্যাগ করবেন নয়ত তাঁর এই প্ল্যানটাকে ছাড়তে হবে তাঁদের। সেক্ষেত্রে ছেঁড়া কাগজের সামিল হবে তাঁর সঙ্গে ওদের চুক্তিটা। সুতরাং খুবই সতর্কতার সঙ্গে যুক্তি দিয়ে গান্ধীজীকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন মাউন্টব্যাটেন। তিনি যে গান্ধীজীর মানসিক যন্ত্রণাটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন প্রথম সূত্রেই সে কথা বললেন। আরও বললেন, যে অখন্ড ভারতের জন্যে গান্ধীজী দীর্ঘদিন সংগ্রাম করে এসেছেন সেটা যেন ধূলিসাৎ করে দিল এই প্ল্যানটা। মাউন্ট-ব্যাটেন তাই যেন মরমে মরে আছেন গান্ধীজীর কাছে।

হঠাৎ এক অন্তর-উদ্ভাস হলো মাউন্টব্যাটেনের। নবীন এক প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হলেন তিনি। মাউন্টব্যাটেনের মনে হল উজানে ভাসার চেষ্টা করছেন তিনি। যা সম্ভব নয়। তিনি জানেন সাংবাদিকরা এই প্ল্যানের নামকরণ করেছে 'মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান'। কিন্তু এ ত তাঁর প্ল্যান নয়? ওদের বলা উচিত 'গান্ধী প্ল্যান'। কারণ গান্ধীজীই এর মালমসলা উপকরণের যোগান দিয়েছেন। তিনিই আসল কারিগর। মাউন্টব্যাটেনের এই নবীন যুক্তির কথা শুনে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেলেন গান্ধীজী। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন মাউন্টব্যাটেনের দিকে।

হ্যাঁ তাই। মাউন্টব্যাটেন তখন একের পর এক তুরুপের তাস দেখিয়ে চলেছেন বিমূঢ় গান্ধীজীকে। গান্ধীজী বলেছিলেন যে ভারতের জনগণের হাতেই পছন্দ অপছন্দের পাট্টা তুলে দিতে হবে। মাউন্টব্যাটেনের প্ল্যানেও তাই আছে। তিনি বলেছিলেন, নির্বাচিত প্রাদেশিক প্রতিনিধি সভাই ভারতের ভবিষ্যৎ স্থির করবে। মাউন্টব্যাটেনের প্ল্যানে সে কথাও আছে। গান্ধীজীর কথা মতন প্ল্যানের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কে কোন্ পক্ষে যোগ দেবে, সেই শেষ কথাটা বলবে প্রাদে-শিক প্রতিনিধি সভা। আরও আছে। গান্ধীজী চেয়েছিলেন ইংরেজরা তাড়াতাড়ি এদেশ ছেড়ে যাক। সেই 'কুইট ইণ্ডিয়ার' প্রেক্ষিতেই পরিকল্পিত হয়েছে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের প্ল্যান। অর্থাৎ এর দ্বারাই কার্যকর হবে 'ভারত ছাড়' ধ্বনি।

মাউন্টব্যাটেন এবার একটু চুপ করলেন। তারপর গান্ধীজীর দিকে চেয়ে বললেন, 'যদি কোন অলৌকিক ব্যাপার ঘটে এবং প্রাদেশিক প্রতিনিধি সভার সভ্যেরা অখন্ড ভারতের পক্ষে সর্ববাদিসম্মত রায় দেন তবে আপনি যা চাইছিলেন তাই হবে। কিন্তু তাঁরা যদি ভারতভাগের পক্ষে মত দেন, তাহলে ধরে নেব যে জোর করে তাদের সিদ্ধান্ত বদলানোর চেষ্টা আপনি করবেন না।'

এইভাবে যুক্তি দিয়ে, অনুরোধ করে বা তাঁর ব্যক্তিত্বের যাদু দিয়ে মাউন্টব্যাটেন

www.pathagar.com

এমনভাবে বৃদ্ধ গান্ধীজীকে অভিভূত করে দিলেন যার সঙ্গে তুলনা করা যায় একজন চতুর সেলসম্যানের। বস্তুত, বিক্রেতা যেমন পণ্যের পসরা সাজিয়ে ক্রেতাকে নাকাল করে তাকে জয় করে, তেমনি কথার যাদু আর ব্যক্তিত্বের শক্তি দিয়ে গান্ধীজীকে মুগ্ধ করে দিলেন মাউন্টব্যাটেন। পরবর্তীকালে গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা এই ঘটনার উল্লেখ করে যা বলেছিলেন তা ভারী উপভোগ্য। তাঁরা বলেছিলেন, 'সেদিন তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব দিয়ে মাউন্টব্যাটেন এমনভাবে গান্ধী-জীর মন কেড়ে নিয়েছিলেন যা হয়ত 'হাউ টু উইন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্স পীপল-এর লেখককেও ঈর্ষাপ্রণোদিত করবে।'

যদিও ভারতবিভাজনে গান্ধীজীর তীব্র আপত্তি ছিল তবুও মাউন্টব্যাটেনের বলিষ্ঠ যুক্তি তাঁকে বিপুলভাবে নাড়া দিল যেন। আটাত্তর বছরে পা দিয়েছেন তিনি। এই বয়সে নতুন করে জনমত যাচাই করার মনোবল তাঁর নেই। তিরিশ বছরের রাজ-নৈতিক জীবনে এবারই প্রথম এক দারুণ সংকটে পড়েছেন গান্ধীজী। তাঁর মনে হচ্ছিল সাধারণ মানুষের ওপর তাঁর প্রভাব ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। এই বয়সে দলের নেতাদের সঙ্গে বিরোধ করার সাধ্য তাঁর নেই। ফলে নিরাশায় ঢাকা পড়লো তাঁর চৈতন্য। কি করে মুক্তি পাবেন এই নৈরাশ্য থেকে? আকুল হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন সেই অন্তর্বাণীর জন্যে। এই 'ইনার ভয়েস' যেন তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা। অনেক সঙ্কটময় মুহূর্ত থেকে তাঁকে উতরে দিয়েছে এই ইনার ভয়েস বা অন্তর্বাণী। কিন্তু কোথায় সেই উচ্ছ্বাস? বস্তুত জুন মাসের সেই দিনের সান্ধ্য প্রার্থনা সভায় গান্ধীজীর ইনার ভয়েস কোনই সাড়া দিল না। এবং সংশয়ের পীড়নে অবশ হলো তাঁর চেতনা। তাঁর কেবলই মনে হতে লাগলো তবে কি প্রকৃতির ঝোঁক ভারত-বিভাগের বিরোধিতা করে সারা দেশে বিশৃঙ্খলা ডেকে আনার দায় নিতে হবে তাঁকে? নাকি মাউন্টব্যাটেনের গোঁড়া যুক্তি মেনে নেবেন?

মাউন্টব্যাটেনের সব কথা তখনও বলা হয় নি। আরও কিছু বলার ছিল তাঁর। কিন্তু গান্ধীজীরও সময় নেই শোনার। প্রার্থনাসভায় তাঁকে ঘড়ির কাঁটা ধরে পৌঁছতেই হবে। অতএব মাউন্টব্যাটেন যেন তাঁকে ক্ষমা করেন।

এই ঘটনার পর এক ঘন্টাও কাটে নি। নোংরা ভাংগী বস্তির একটা চাতালে উঁচু মঞ্চ করা হয়েছে। মঞ্চের ওপর পা মুড়ে বসে আছেন গান্ধীজী। তাঁর চারপাশে হরিজনরা বসে। গান্ধীজী তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন সবাইকে। আজ অনেকে এসেছে তাঁর মুখ থেকে বিপ্লবের বাণী শুনতে। মাউন্টব্যাটেনের প্ল্যানের বিরোধিতা করে কেমন ভাবে ভারতভাগ ঠেকানো যায় তার নির্দেশ পেতে। সবাই প্রার্থনা করতে আসে নি। কিন্তু এ কি নির্ণয় জানালেন গান্ধীজী? যিনি চিরকাল দেশভাগের বিরোধিতা করেছেন, নিজের দেহ ব্যবচ্ছিন্ন করে দেশভাগ ঠেকাতে চেয়েছেন, তিনি এ কি বিধান দিলেন?

গান্ধীজী যেন হিতোপদেশ দিলেন সবাইকে। বললেন যে, দেশভাগের দায় বড়লাটের একার নয়। এ সকলের পাপ, তোমার আমার পাপ। তাই সবাইকে এর দায় বইতে হবে। শেষ পর্যন্ত মাউন্টব্যাটেনই জয়ী হলেন সেদিন। জয়ী হলো তাঁর অখণ্ড যুক্তি।

আর গান্ধীজী! সেদিন তাঁর অমন অক্ষম নীরবতা অনেক ভারতীয়ই কখনো ক্ষমা করে নি। তবে ইতিহাস জানে সেদিন ওই বৃদ্ধ মানুষটি কি দারুণ মানসিক দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিলেন। আর তাই বোধহয় এর চরম দাম দিতে হয়েছিল

www.pathagar.com

তাঁকে।

ভারতীয় সাংসদদের আলোচনা, বাদানুবাদ যেখানে অনুষ্ঠিত হয়, সেই সুন্দর হলঘরটা বোধহয় অতীতে এমন কীর্তিকল্প অনুষ্ঠান দেখে নি, যার সংগে তুলনা করা যায় এই ঐতিহাসিক অধিবেশনের। কোনরকম লিখিত নোট ছাড়াই মাউন্টব্যাটেন সেদিন যে ভাষণ দিলেন এককথায় তা অনবদ্য। যেমন দায়িত্ববোধ তেমনি সুস্পষ্টতা। অথচ কত নির্ভীক ! সম্ভবত মাউন্টব্যাটেনের যাঁরা ঘোর সমালোচক তাঁরাও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন সেই ভাষণ শুনে। মাউন্টব্যাটেন বললেন যে সমস্ত বিশ্বের সামনে যে শিশু রাষ্ট্রের জন্মপত্রটি তিনি পেশ করলেন সেই শিশুই ভবিষ্যতে এক নতুন মানবজাতি সম্মেলনের উদ্যোক্তা হবে যার নাম থার্ডওয়ার্ল্ড।

ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছেন। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ভাইসরয়ের ডাকা এই সম্মেলন বোধহয় দ্বিতীয়বার অনুষ্ঠিত হলো এবং বড়লাটের ডাকা এটাই শেষ সাংবাদিক সম্মেলন। সারা পৃথিবী থেকে মোট তিনশ' জন সাংবাদিক এই সম্মেলনে এসেছেন। এসেছেন এ দেশের ছোটবড় এবং আঞ্চলিক পত্র-পত্রিকার সাংবাদিকরাও। নানা ভাষা, নানা ধর্মের সাংবাদিকদের এই সমাহার যেন এক বিচিত্র নকশার কারুকাজ। বড়লাট মাউন্টব্যাটেনের ঐতিহাসিক আত্মভাষণটি এ'রা সবাই শুনলেন তীব্র মনোযোগ দিয়ে।

বড়লাট মাউন্টব্যাটেনের কাছে এই সাংবাদিক সম্মেলন যেন ঈশ্বরের কাছে এক পবিত্র উৎসর্গের মতন। যেন এক দুঃসাহসী অভিযানের সার্থক পরিণতিতে পৌঁছে গেছেন তিনি। তুর দ্যফোর। বস্তুত তাই। দুমাসেরও কম সময়ের মধ্যে প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন তিনি। পৌঁছেছেন এক অখণ্ড পূর্ণতার লক্ষ্যে। একের পর এক অন্তরায় দূর করে নেতাদের ঐকমত্যে এনেছেন। একটা সুস্পষ্ট সমাধানের প্রেক্ষিত নির্মাণ করেছেন একার চেষ্টায়। শুধু তাই নয়। ছুটে গেছেন লণ্ডনে। যাতে সরকার এবং বিরোধী, দুপক্ষের কাছেই সমাধানসূত্রটা গ্রহণীয় হয়।

এই দীর্ঘ অভিযানে অত্যন্ত দক্ষতার সংগে, হয়ত কিছুটা ভাগ্যদেবীরও সাহায্য পেয়ে তিনি এড়িয়ে যেতে পেরেছেন কিছু কিছু চোরা গর্তের আতংক। ব্যস ! আর কোথাও থামতে হয় নি তাঁকে। এমনকি অভিযানের শেষ পর্যায়ে, যখন যাত্রাপথ সবচেয়ে দুর্গম, তখনও পদস্খলন হয় নি তাঁর। চার্চিল নামক ওই বৃদ্ধ সিংহের খাঁচার মধ্যে তাঁর উদ্যত থাবার অধিকার থেকে ছিনিয়ে এনেছেন লক্ষ্যবস্তুটা। খাঁচা থেকে বৃদ্ধকে রাজী করিয়ে যখন বেরিয়ে এসেছেন মাউন্টব্যাটেন, তখন থাবা গুটিয়ে নিয়েছেন চার্চিল। আর ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছেন মাউন্টব্যাটেনের কথায়।

হ্যাঁ, মাউন্টব্যাটেনের এই সাফল্য এক ঐতিহাসিক কীর্তি। তাই সাংবাদিক সম্মেলনে শেষ কথাটা বলার সংগে সংগেই উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনে ঢাকা পড়ে গেলেন তিনি। সাংবাদিকরা ঝাঁপিয়ে পড়লো তাদের অসংখ্য কৌতূহল আর প্রশ্ন নিয়ে। ঠিক এতটার জন্যে বোধহয় তৈরি ছিলেন না মাউন্টব্যাটেন। পরবর্তী কালে সেই ঘটনার কথা তিনি এইভাবে ব্যক্ত করেছেন: 'আমিই ওখানে একমাত্র ব্যক্তি ছিলাম যে ঘটনার সবটুকু দেখেছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ঘটনাটা শুধু প্রত্যক্ষ করা নয়, তার স্পন্দনটুকু অনুভব করার অভিজ্ঞতা একজনেরই ছিল। সাংবাদিকরা সেদিনই প্রথম এমন একজনকে পেয়েছিল যার নখদর্পণে আছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ঘটনার তন্ন তন্ন বিবরণ।'

অবশেষে ক্ষীণ হয়ে এল অবিরাম প্রশ্নস্রোত। বিন্দু বিন্দু ক্ষরণও যখন প্রায়

www.pathagar.com

থেমে এসেছে, তখন সবাইকে সচকিত করে একজন ভারতীয় সাংবাদিকের শেষ প্রশ্নটা সশব্দে আছড়ে পড়লো সংসদ কক্ষের দেওয়ালে। প্রশ্নটা শুনেই মাউন্টব্যাটেন বুঝতে পারলেন যে এটাই শেষ প্রশ্ন যার উত্তরটা তিনি তখনও দেন নি। ধাঁধাঁর এই শেষ ঘরটাই তখনও শূন্য পড়ে আছে, ছ'মাস আগে যেটা তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল।

উৎকর্ণ মাউন্টব্যাটেন প্রশ্নকারীর মুখের দিকে তাকালেন। প্রশ্নকারী একজন ভারতীয় সাংবাদিক। মাউন্টব্যাটেনের দিকে চেয়ে প্রশ্নকারী বললো, 'স্যার! আপনারা সবাই যখন আজ এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের শেষ দিনের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে আনতে রাজী হয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই মনে মনে একটা দিন তারিখ বেছে রেখেছেন?'

মাউন্টব্যাটেন বললেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

প্রশ্নকারী মাউন্টব্যাটেনের দিকে চেয়ে বললেন, 'সেই তারিখটা কবে, বলবেন?'

মাউন্টব্যাটেন চুপ। সতর্ক মন তখন উথালপাথাল হচ্ছে তারিখের সন্ধানে। মনে মনে দ্রুত অংক কষে চলেছেন মাউন্টব্যাটেন। কোন্ সেই তারিখ যেদিন এই অনুষ্ঠানটা তাঁরা সম্পন্ন করবেন? আসল কথা হলো যে দিন তারিখটা তখনও বাছা হয় নি, যদিও ব্যাপারটা তাড়াতাড়িই মিটিয়ে ফেলতে চাইছিলেন তিনি। তাঁর সেদিনের মনের অবস্থাটা পরবর্তীকালে এইভাবে বর্ণনা করেছেন মাউন্টব্যাটেন. 'দ্রুত নিষ্পত্তি করতে চাইছিলুম আমি। আমি জানতাম যে চাপ দিয়ে পার্লামেন্ট থেকে গ্রীষ্মবকাশের আগেই বিলটা পাস করানো দরকার. নইলে দুটো অবস্থাকে মেলাতে পারবো না। আসলে আমরা যেন আগুন পাহাড়ের গায়ে বসেছিলুম। বসেছিলুম একটা এমন বোমার ঘাড়ে যার ফিউজটা যে কোন মুহূর্তেই পুড়ে যেতে পারে।' তখন বিভীষিকাময় (হরর্) কোন ছায়াছবির আবছা মূর্তির মতন পাঞ্জাবের সেই কাহুটা গ্রামের আগুনে ঝলসান শবমূর্তিগুলো যেন মাউন্টব্যাটেনের চোখের ওপর ভেসে উঠেছে। যদি তেমন মর্মন্তুদ ঘটনার পুনরাবৃত্তি তাঁকে এড়াতে হয়. তবে এর দ্রুত নিস্পত্তি করতেই হবে। এই উপ-মহাদেশের সুদীর্ঘ তিনহাজার বছরের ইতিহাস শেষ হয়ে গেছে। অতিক্রান্ত হতে চলেছে ব্রিটিশ শাসনের (প্যাক্স ব্রিটানিকা) মেয়াদ। কিন্তু দেশ আর নৈরাজ্যর মধ্যে ব্যবধানও যেন ক্রমেই কমে আসছে। বাকী আছে মাত্র ক'টি সপ্তাহ আর।

সাংবাদিকদের দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রইলেন মাউন্টব্যাটেন। ওরাও তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। একটা দারুণ নৈঃশব্দ ঘিরে রেখেছে হলঘরটা। পাখা ঘোরার ঘ্যাসঘ্যাসে শব্দটুকু ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। মনে হলো এবার কিছু একটা ঘটবে। মাউন্টব্যাটেনের পরিষ্কার মনে আছে প্রতীক্ষার সেই মুহূর্তটা। মনে আছে. তখনই সংকল্প করেছিলেন. 'আমি নিশ্চিত জানতাম. প্রমাণ আমায় করতেই হবে যে সমস্ত ঘটনার আমিই নায়ক।'

সুতরাং. ক'টি নীরব মুহূর্ত কাটিয়েই মাউন্টব্যাটেন বললেন. 'হ্যাঁ. নিশ্চয়ই। ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন আমি ঠিক করেই রেখেছি।'

মাউন্টব্যাটেন যখন জবাব দিচ্ছেন তখনই নম্বর আঁটা চাকতির মতন ক'টা সংখ্যা যেন বন্‌বন্ করে চরকির মতন ঘুরতে লাগলো তাঁর চোখের ওপর। কিন্তু কোন সংখ্যাটা বাছবেন তিনি? সেপ্টেম্বরের গোড়া না মাঝামাঝি? না কি আগস্টের মাঝামাঝি একটা দিন? হঠাৎ যেন গোল চাকতিটা থেমে গেল। আর ধক্ করে চোখের সামনে যে সংখ্যাটা জেগে উঠলো সেটা এমন সমীচীন মনে হলো যে তখনই

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন মাউন্টব্যাটেন। তাঁর জীবনের একটা গৌরবজনক স্মৃতি যেন জড়িয়ে রেখেছে সংখ্যাটাকে। জীবনের এতবড় কীর্তির ঘটনাটা তাঁর অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে আছে। এই স্মরণীয় দিনটিতেই বর্মার জঙ্গলে তাঁর বিজয়াভিযান শেষ হয়েছিল। কারণ এই দিনেই জাপানীরা বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করেছিল তাঁর কাছে। সুতরাং গণতন্ত্রী নতুন এশিয়ার জন্মদিন এর চেয়ে উপযুক্ত আর কি হতে পারে? হ্যাঁ, জাপানী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আত্মসমর্পণের দিনটিই হ'ক গণতন্ত্রী নবীন এশিয়ার জন্মদিন।

হঠাৎ আবেগে অভিভূত হয়ে গেলেন মাউন্টব্যাটেন। 'ভাগ্যের খেলা কি বিচিত্র! সেদিন ব্রহ্মদেশের ঘন জংগলে জাপানী শত্রুপক্ষকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছিল যে হাত, সেই হাতই ভারতের মুক্তির দিন নির্দেশ করলো যেন। প্রশ্নকারীর মুখের দিকে চেয়ে মাউন্টব্যাটেন ঘোষণা করলেন, '১৫ আগস্ট, ১৯৪৭ তারিখে ভারতের জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে ব্রিটিশ সরকার।'

দুম্ করে নিজের দায়িত্বে স্বাধীনতার দিনক্ষণ ঘোষণা করে মাউন্টব্যাটেন যেন মৌচাকে ঢিল ছুঁড়লেন। হঠাৎ বিস্ফোরণে সবাই হতচকিত হয়ে গেল। হৈ হৈ পড়ে গেল সর্বত্র। সবাই তখন বিষয়টা নিয়ে উত্তপ্ত আলোচনা করছে। রাজার প্রাসাদ থেকে শুরু করে রাস্তার ফুটপাত পর্যন্ত, একই আলোচনা। লন্ডনের হাউস অব কমন্স্, বাকিংহাম প্যালেস, ডাউনিং স্ট্রীট, কেউ বাদ রইল না এই আলোচনা থেকে। কেউ ভাবতেও পারে নি যে এত তাড়াতাড়ি ইংরেজ তার সাম্রাজ্যবাদী অধিকারের ওপর ঝাঁপ ফেলে দেবে। দিল্লিতেও মাউন্টব্যাটেনের ঘনিষ্ঠ মহল এর বিন্দুবিসর্গ-টের পায় নি। এমনকি, যে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে তাঁর নিত্য ওঠাবসা, যাদের সঙ্গে এই নিয়ে কত না আলাপ আলোচনা, তারাও এতটুকু আঁচ পায় নি যে এত তাড়াতাড়ি ভারত স্বাধীনতা পেতে চলেছে।

তবে মাউন্টব্যাটেনের এই আচমকা সিদ্ধান্তে যারা সবচেয়ে আশ্চর্য এবং কিছুটা ক্ষুব্ধ হলো তারা ব্রিটিশ রাজশক্তি নয়। এমনকি কংগ্রেস বা রাজন্যবর্গও তারা নয়। তারা অন্য এক সম্প্রদায়ের মানুষ। লক্ষ লক্ষ হিন্দুর ভাগ্যাধিপতি হয়ে তারা এই সনাতন সমাজের শিরোমণি। নিজের দায়িত্বে স্বাধীনতার দিনক্ষণ ঘোষণা করে মাউন্টব্যাটেন যেন এই সম্প্রদায়ের কাছে এক ক্ষমাহীন অপরাধ করে ফেলেছেন। বস্তুত, জটিল, দুজ্ঞেয় এবং গুহ্য জ্ঞানসম্পন্ন (অক্কালট বডি) এই জ্যোতিষীরা যে ভারতীয় সমাজে এত মহাশক্তিধর সম্প্রদায় মাউন্টব্যাটেন সম্ভবত তা জানতেন না।

যথার্থই তাই। ভারতীয়রা ছাড়া পৃথিবীর আর কোন দেশের মানুষ এমনভাবে জ্যোতিষীর গণনানির্ভর হয়ে তাদের শাসন মেনে নেয় নি। এদেশের প্রতিটি সাধারণ মানুষ, প্রত্যেক রাজামহারাজা, প্রতিটি গ্রাম, ধর্মস্থান বা হিন্দু মন্দির যেন তাদের ভালমন্দ বিচারের দায় এদের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত হয়ে আছে। এদের সায় ছাড়া লক্ষ লক্ষ হিন্দু ঘরের বাইরে পা বাড়াতে মুষড়ে পড়ে। ভারতীয়দের আসল শাসন-কর্তা এইসব ক্ষুদে ডিক্টেটররা। এদেরই নির্দেশে ব্যবসায়ীরা মূলধন নিয়োগপত্রে দস্তখত করে, শিকারে বেরোয়, অতিথিদের নেমন্তন্ন করে, নতুন জামাকাপড় বা গয়না পরে, ছেলেমেয়ের বিয়ে দেয়, গোঁফদাড়ি কামায়, এমনকি নিজের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়াও সম্পন্ন করিয়ে রাখে অগ্রিম। মোটকথা দৈনন্দিন জীবনধারণের প্রতি পদক্ষেপেই একজন জ্যোতিষীর দরকার হয় এদেশের মানুষের।

এই জ্যোতিষীরা দাবি করেন যে আকাশীয় গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থান ইত্যাদির

www.pathagar.com

সঠিক বিচারের দৈবী ক্ষমতার অধিকারী তাঁরা। তাই লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাগ্যাবধাতা হবার যোগ্যতা এঁদের আছে। এঁদের বিধানে কোন সদ্যোজাত শিশু গ্রহবৈগুণ্যে অভিশপ্ত হয়ে হতভাগ্য বাপমায়ের কোলছাড়া হয়ে যায়। আবার এমনও ঘটে যখন গ্রহনক্ষত্রের শুভযোগের কল্যাণে কেউ কেউ বিশেষ মুহূর্তে আত্মহননে প্ররোচিত হয় এঁদের বিধানে। সপ্তাহের কোন দিনটা শুভ আর কোনটা অশুভ তার নির্ণয় করেন এঁরাই। হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রমতে রবিবার এবং শুক্রবার নাকি অশুভ। তাই কোন শুভকর্মের অনুষ্ঠান ওই দিনে করা হয় না। ঘটনাচক্রে ১৯৪৭ সনের ১৫ আগস্ট দিনটিও যে শুক্রবার ছিল তা আমরা জানি। অবশ্য এই আবিষ্কারের জন্যে কোন গুহ্যবিদ্যা আয়ত্ব করার দরকার হয় নি। পুরনো ক্যালেণ্ডারের পাতা উল্টেই এই তথ্যটি সংগ্রহ করা গেছে।

সুতরাং আকাশবাণী মারফত স্বাধীনতার দিনটি ঘোষণা হবার সংগে সংগে জ্যোতিষ মহল তোলপাড় হয়ে গেল। সারা ভারতের জ্যোতিষীরা হুমড়ি খেয়ে পড়লো তাদের জ্যোতিষ সারণীর (চার্ট) ওপর। কাশী থেকে কাঞ্চি—সর্বত্রই জ্যোতিষ মহল হায় হায় করে উঠলো এই অশুভ দিন ঘোষণায়। তাঁরা সমস্বরে বলে উঠলেন যে, ১৫ই আগস্ট একটা অপয়া দিন। তাঁরা বিধান দিলেন, 'সেও ভাল হয় যদি আরও একটা দিন ইংরেজ রাজত্ব চলে' নতুবা পাপদোষপুষ্ট দিনটা চিরকালের জন্য দেশকে নিরয়গামী করে দেবে।

কলকাতার জ্যোতিষ সম্রাট স্বামী মদনানন্দও দিন ঘোষণা শুনে তার "াংশ চক্রটা বার করলেন।

এটা এক বৃহৎ বৃত্তাকার জ্যোতিষ সারণী যার মধ্যে ক্রম পরম্পরায় অনেকগুলো এক-কেন্দ্রিক বৃত্ত আঁকা আছে। বৃত্তের মধ্যে দেখানো আছে দিন, মাস, রবি, চন্দ্র ইত্যাদি গ্রহাদির আবর্তন, সাতাশটি নক্ষত্রের অবস্থান। পৃথিবীর ওপর প্রভাবটি নির্ণয় করছে এরাই। চক্রের কেন্দ্রস্থলে আছে পৃথিবীর একটা মানচিত্র। এবার জ্যোতিষীমশাই বৃত্তগুলো এমনভাবে ভাঁজ করলেন যে, ১৫ই আগস্ট তারিখটার ওপর নির্বাধিত করা যায়। তারপর মানচিত্রে ভারতবর্ষের স্থান থেকে কয়েকটা সমান্তরাল রেখা বৃত্তের ধার পর্যন্ত টানলেন। এই অনুশীলনটি করেই জ্যোতিষী মশাই কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন যে তাঁর গণনা বিপর্যয়ের ইঙ্গিতবাহী। তিনি দেখলেন, ওই ১৫ই আগস্ট তারিখে ভারতবর্ষ মকররাশিতে অন্তর্গত হবে। মকররাশির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য তাঁর জানা। কেন্দ্রোপসারী (সেন্ট্রি-ফিউগ্যাল) নানা বিপরীত অশুভ শক্তির ক্রিয়ার প্রকাশ হয় এর দরুন। অর্থাৎ, তাঁর মনে হলো যে দেশ যেন অনিবার্যভাবে বিভাজনের দিকে ধাবিত হচ্ছে এর ফলে। আরো খারাপের কথা যে, ওই দিনটা রাহুদ্বারা নিয়ন্ত্রিত পাপগ্রহ শনির ক্রিয়ার অন্তর্গত। জ্যোতিষী যথেষ্ট চিন্তিত হলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রে রাহু অত্যন্ত অশুভ গ্রহ। এর 'মুণ্ডহীন' দেহটি ভারী অনিষ্টকারী। ১৪ই আগস্টের মধ্যরাত থেকে ১৫ই আগস্টের সারা দিনটি শনি, বৃহস্পতি এবং শুক্র গ্রহ তাদের স্বর্গীয় স্থান থেকে ভ্রষ্ট হয়ে কর্মস্থানের নবমে অর্থাৎ সম্পূর্ণ পাপস্থানে অবস্থান করবে। সুতরাং সারা দেশের অসংখ্য জ্যোতিষীদের মতন ইনিও আশু বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখে মনে মনে শঙ্কিত হলেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে স্বামী মদনানন্দ চীৎকার করে উঠলেন, 'এ ওরা কী করলো ? কী করলো।'

স্বামীজীর এত সাধনভজন, এত তন্ত্রমন্ত্র সবই বৃথা হয়ে গেল। কিছুতেই

www.pathagar.com

নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। একখণ্ড কাগজ টেনে নিয়ে এই সমূহ বিপর্যয়ের জন্যে দায়ী মানুষটির উদ্দেশ্যে একটা জরুরী বার্তা লিখে ফেললেন। তিনি লিখলেন, 'মঙ্গলময় ঈশ্বরের নামে আপনাকে অনুরোধ করছি যে ১৫ই আগস্ট তারিখে ভারতকে স্বাধীনতা দেবেন না। যদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে, বন্যা, খরা, মহামারী বা নিষ্ঠুর দাঙ্গায় অনেক লোকের জীবনহানি হয়, তবে জানবেন যে পাপগ্রহের প্রভাবে স্বাধীন ভারতের জন্ম হয়েছিল বলেই দেশের এই অনিষ্ট হলো।

www.pathagar.com

একটি জটিল ঐতিহাসিক বিচ্ছেদ

নিউ দিল্লি, জুন ১৯৪৭

ঠিক এইরকম কোন ঘটনার তোড়জোড় আগে কখনও নেওয়া হয় নি। এর যেমন কোন নিয়মনীতি নেই তেমনি পুরনো নজিরও নেই। এমনকি ইতিহাসের গর্ভ থেকে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়ে কেউ যে এমন বৃহৎ কাজটা সম্পন্ন করবেন তারও উপায় ছিল না। ব্যাপারটা ত চাট্টিখানি নয়! কয়েক শতাব্দী ধরে একান্নবর্তী পরিবারের মতন দুই সম্প্রদায় পাশাপাশি ঘর-সংসার করেছে। তাদের আলাদা হাঁড়ি হলেও বিষয়-সম্পদ আছে মিলেমিশে। জমিজমা, ক্ষেতখামার এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে মনোমতভাবে তাদের ভাগ করা এক বিষম দায়। অথচ একটা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা দরকার।

১৫ই আগস্টের তখনও তিয়াত্তর দিন বাকি। এর মধ্যেই সেরে ফেলতে হবে যাবতীয় ভাগবাটোয়ারা। তৈরি করে ফেলতে হবে ভাগাভাগির সব কাগজপত্র। তাই কর্মচারীদের মধ্যে যাতে কোনরকম ঢিলেমি না আসে তার উদ্যোগ নিয়েছেন মাউন্টব্যাটেন স্বয়ং। ফরমান্ দিয়েছেন যে এ ব্যাপারে এতটুকু শৈথিল্য তিনি বরদাস্ত করবেন না। একটা বিস্তৃত কর্মতালিকা তৈরি করে সচিবালয়ের সব দপ্তরে টাঙাবার ব্যবস্থা করেছেন। এবং ক্যালেন্ডারের প্রত্যেক পাতায় লাল বৃত্তের মধ্যে ১৫ আগস্ট থেকে উল্টো গণনা করে অবশিষ্ট দিনের সংখ্যাটা লিখিয়ে দিয়েছেন যাতে প্রতিটি কর্মচারীই একটা দায়বদ্ধতার মধ্যে থাকেন।

ব্যাপারটা যে চাট্টিখানি নয় সে কথা বলেছি। বস্তুত দায়টা বিপুল এবং অকল্পনীয়ভাবে জটিল এর সমাধান। বিচ্ছেদের মামলায় পৈত্রিক সম্পত্তি ভাগাভাগির বেলায় যেমনটি হয়ে থাকে ঠিক সেইরকম জটিল এর নিষ্পত্তি। অথচ সব দায়টা ঘাড়ে পড়লো দুজন মানুষের। এঁরা যেন বাদী বিবাদী দুপক্ষের উকিল। এই মানুষ দুজন হলেন দুজন বিউরোক্রাট। সরকারী মহলে দুঁদে আমলা হিসেবেই এঁদের হাঁকডাক। একজন হিন্দু, অন্যজন মুসলমান। এদেশে শতাধিক বছরের প্রাচীন ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের দুটি শৌখিন ফুল।

প্রায় একই ধাঁচের দুটি সরকারী বাংলায় এই দুজন থাকেন। একই রকম দেখতে দুখানা শেভ্রলেট গাড়ি চড়ে এঁরা দুজন দপ্তরে আসেন। একই রকম বেতন পান দুজন এবং ইংরেজ মনিবের কাছে এঁরা দুজন সমান মাপের বিশ্বস্ত।

জুন থেকে আগস্ট, এই তিন মাসের প্রতিটি দিন লাল ফিতে বাঁধা ফাইলের পাঁজা খুলে চমৎকার ছাঁদে এঁরা যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তির লিস্ট তৈরি করেছেন আর চুলচেরা হিসাবে ভাগাভাগি করেছেন। এঁদের হাতিয়ার বলতে যা তা হলো নিপুণ কর্মপদ্ধতি আর নিরপেক্ষতা, যার পাঠটুকু তাঁরা পেয়েছেন ইংরেজ আমলাতন্ত্র থেকে। কি করে ফিতে বাঁধতে হয়, পক্ষপাতশূন্য হয়ে কি করে সরকারী প্রতিবেদন লিখতে হয়, এ সবের পাঠাভ্যাস আগেই হয়ে গেছে চৌধুরী মহম্মদ আলীর বা এইচ. এম. প্যাটেলের। সম্মানের সংগে উত্তীর্ণ হয়ে এই কাজে নিয়োজিত

www.pathagar.com

হয়েছেন এই দুজন আমলা। তবে ভাগ্যের প্রহসন, যে ভাষায় তাঁরা তালিকা প্রণয়ন করছেন তা কোন দিশি ভাষা নয়। এতদিন ধরে এদেশটাকে যারা উপনিবেশ করে রেখেছিল, সেই উপনিবেশ স্থাপনকারী কলনাইজারদের খাস ভাষা ইংরিজিতেই তাঁরা তালিকা বানাচ্ছেন। এই দুজনের অধীনে আরও শতাধিক আমলা বিভিন্ন কমিটি বা সাব কমিটিতে কাজ করছেন। এইসব কর্মসমিতি বা উপসমিতির তৈরি করা পাঁজা পাঁজা রিপোর্ট প্রতিদিন আসছে চৌধুরী মহম্মদ আলি ও প্যাটেলের কাছে এবং এ'দের সুপারিশ নিয়ে চলে যাচ্ছে বড়লাটের সভাপতিত্বে গঠিত পার্টিশন কাউন্সিলের কাছে।

প্রায় শুরুতেই ধাক্কা খেল কাউন্সিল। সবচেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি যেটা সেটাই চেয়ে বসলো কিন্তু কংগ্রেস। তাদের দাবি ইণ্ডিয়া নামটি। স্বায়ত্তশাসিত অংশের নামকরণ 'হিন্দুস্তান' হ'ক এ তারা চায় না। কারণ পাকিস্তান পৃথগন্ন হয়েছে নিজের স্বার্থে। সুতরাং বিশ্বের কাছে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দরবারে ইণ্ডিয়া নামেই ভারতের পরিচিত হওয়া যুক্তিযুক্ত।

শুধু এইটুকুই নয়। দু পক্ষের মধ্যে তিক্ততার আরও কারণ ছিল। অবশ্য প্রধান যেটা তা হলো কাঁচা টাকার ভাগবাটোয়ারা। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ভারতের কাছে ব্রিটেনের জমে থাকা বিপুল ঋণ। ঋণের পরিমাণ সত্যিই বিপুল প্রায় পাঁচশ' কোটি ডলার। এত বিপুল অঙ্ক? হ্যাঁ তাই। দীর্ঘদিন ধরে ভারতকে শোষণ করার জরিমানা স্বরূপ এই বিপুল অঙ্কের টাকা পরিশোধ করে ব্রিটেনকে তার সাম্রাজ্যাভিযানের উপর যবনিকা টানতে হবে। তবে তার মুক্তি। অবশ্য ঋণের টাকা লাফিয়ে বেড়েছে গত মহাযুদ্ধের সময়। যখন তার বিকল অর্থনীতি ব্রিটেনকে প্রায় দেউলিয়া করে দেয় তখন ভারত থেকে শোষণ করে ব্রিটেন তার ঠাটবাট বজায় রেখেছে। বলতে কি, এই ঋণভারগ্রস্ততারই ফল হলো ভারতকে তড়িঘড়ি স্বাধীনতা দেবার ঐতিহাসিক ব্যবস্থাপনার শুরুয়াত্।

এ ছাড়াও আছে বিপুল পরিমান চলিত সম্পত্তির (লিকুইড অ্যাসেট) হিসাব। ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার ভল্টে জমা রাখা সোনার বাট থেকে শুরু করে সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য বিহিত অর্থ, এমনকি নাগা উপজাতির জেলা কমিশনারের দপ্তরে পড়ে থাকা কুঁচকে যাওয়া ডাকটিকিট পর্যন্ত, এই হিসেবের অন্তর্ভুক্ত।

জটিলতার দরুন কিছুতেই যেন সমস্যাটাকে বাগে আনা যাচ্ছিল না। এদিকে সময়ও বয়ে যায়। অতঃপর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল মনস্থির করে ফেললেন। তাঁর শোবার ঘরের মধ্যে আমলা দুজনকে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দিলেন। স্থির হলো যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা কোন সমঝোতায় না আসবেন, ততদিন তাঁদের বন্ধ ঘরে থাকতে হবে। এরপর বন্ধ ঘরে শুরু হলো দুই আমলার দর কষাকষি। লাহোর বাজারে যেমন দরাদরি চলে ফেরিওলার সঙ্গে অনেকটা সেইরকম। শেষমেশ মহম্মদ আলী এবং এইচ. এম. প্যাটেল একমত হলেন যে ব্যাংকে মজুত কাঁচা টাকা এবং স্টারলিং ব্যালান্সের সাড়ে সতোরো ভাগ পাবে পাকিস্তান। পরিবর্তে ভারতের জাতীয় ঋণের শতকরা সাড়ে সতেরো ভাগের দায় নিতে হবে তাদের।

এ'রা আরও সুপারিশ করলেন যে প্রশাসনিক অস্থাবর তৈজসসামগ্রী যেমন চেয়ার, টেবিল, টাইপরাইটার মেশিন, ঝাঁটা ইত্যাদির আশি ভাগের মালিকানা পাবে ভারত এবং অবশিষ্ট বিশ ভাগের স্বত্বাধিকারী হবে পাকিস্তান। অবশেষে সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা প্রশাসনিক সামগ্রীর গনাগাথা শুরু হয়ে গেল। কোথাও কোথাও

www.pathagar.com

এদের সংখ্যাধিক্য একটু দৃষ্টিকটু ছিল। যেমন, এই গোলার্ধের অন্যতম দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশ ভারতবর্ষের কৃষি ও খাদ্য-দপ্তরের আসবাবপত্রাদির সংখ্যাধিক্য। ৪২৫টা কেরানী টেবিল, ৮৫টা বড় টেবিল, ৮৫টা অফিসারদের চেয়ার, ৮৫০টা সাধারণ চেয়ার ৫০টা টুপি রাখার আঙটা, ৬টা আয়নাওয়ালা টুপি রাখার আঙটা, ১৩০টা বুক শেলফ্, ৪টা লোহার সিন্দুক, ২০টা টেবিল ল্যাম্প, ১৭০টা টাইপ-রাইটার মেশিন, ১২০টা সিলিং ফ্যান, ১২০টা দেওয়াল ঘড়ি, ১১০টা সাইকেল, তিনখানা স্টাফ্ কার, ২ সেট সোফা এবং ৪০টা মূত্রাধার।

তা শুধু বাকবিতণ্ডা নয়, রীতিমত হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল এইসব আসবাব সামগ্রীর ভাগাভাগি নিয়ে। বিভাগীয় প্রধান থেকে শুরু করে দপ্তরের পিয়ন খানসামা পর্যন্ত সামিল হলো এই চক্রান্তে। রাতারাতি পুরনো অকেজো এবং ভাঙাচোরা টেবিল, চেয়ার বা টাইপ যন্ত্র অন্য পক্ষে চালান করতে লাগলো তারা। দেখা গেল অত্যন্ত নীচ এই মনোবৃত্তির শিকার হয়েছে শুধু পিয়ন খানসামা নয়, কোট-টাই পরা খাতিরের বাবুরাও। একটা দোয়াতদান, একখানা জলের সোরাই বা একটা ছাতার মালিকানা নিয়ে তুলকালাম করতে লাগলো তারা। সবচেয়ে হিংস্র হয়ে উঠলো অপেক্ষাকৃত দামী জিনিসের অধিকার নিয়ে। কাঁচের তৈরি পেয়ালা পিরিচ, রুপোর রেকাবি বা দেওয়ালে টাঙানো দামী ফ্রেম বাঁধানো ছবির অধিকার নিয়ে ঝগড়া বিবাদ হলো চরম। শুধু একটা দ্রব্য নিয়েই কোন তক্রার হলো না। মদের ভাঁড়ারের দখলীস্বত্ব রইল হিন্দু ভারতের পক্ষেই এবং পাকিস্তানী মুসলমানরা পেল এর আনুপাতিক মূল্য।

ভাগাভাগি নিয়ে এই টানাহেঁচড়া কখনও কখনও এত নীচ হতো যে স্তম্ভিত হতে হয়। তখন লাহোরের পুলিস সুপার ছিলেন প্যাট্রিক রীচ। তাঁর দুই সহকারীর মধ্যে একজন ছিলেন হিন্দু অন্যজন মুসলমান। প্যাট্রিক রীচ তাঁর দুজন ডেপুটির মধ্যে আসবাবপত্রাদি সমানভাবে ভাগ করে দিলেন। লাঠি, পাগড়ি, বন্দুক, পায়ের ফেট্টি ইত্যাদি ভাগ করার পর পড়ে রইল পুলিস ব্যাণ্ডের বাদ্যযন্ত্রগুলো। ফ্লুট, ট্রাম্পেট, ড্রাম, করতাল ইত্যাদিও ভাগ হলো। কিন্তু বিবাদ বাধলো পড়ে থাকা ভেঁপুটা নিয়ে। পুলিস ব্যাণ্ডে ওই একখানা ভেঁপুর অধিকার নিয়ে রীতিমত ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল দুই ডেপুটির মধ্যে। অথচ ক'দিন আগেও এই দুজন সহকারী হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে গেছেন।

দিনের পর দিন কেটে গেলেও সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়া নাবিকদের বিধবা পত্নীর ভাতা দেবার ব্যাপারটা কিছুতেই মীমাংসা হচ্ছিল না। মুসলমান বিধবাদের পেনশন দেবার দায় কি শুধু পাকিস্তানের ? অথবা পাকিস্তান ভূখণ্ডে বসবাসকারী হিন্দু বিধবাদের পেন্শন্ কি ভারতকে দিতে হবে ? ভারতের মোট ১৮০৭৭ মাইল রাজ-পথ এবং ২৬৪২১ মাইল রেলপথের মধ্যে পাকিস্তানের ভাগে পড়ছে ৪৯১৩ মাইল রাজপথ আর ৭১১২ মাইল রেলপথ। সুতরাং বুলডোজার, একচাকা হাত-গাড়ি (হুইলব্যারোজ), রেলইঞ্জিন, যাত্রীগাড়ি বা মালগাড়িগুলো কোন্ পদ্ধতিতে ভাগ হবে ? শতকরা ৮০/২০ হারে নাকি মোট রেল ও সড়কপথের শতকরাভাগের হিসাবে ?

ঝাঁজালো তর্কাতর্কি হলো লাইব্রেরির বই ভাগাভাগি নিয়েও। এন্সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার খণ্ডগুলো খুবই কড়া নিয়মে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে ভাগ করা হলো পর্যায়ক্রমে। অভিধানের গ্রন্থখণ্ডগুলোর আদ্যাক্ষর এ থেকে কে পর্যন্ত পেল

www.pathagar.com

ভারত এবং বাকীটা দেওয়া হলো পাকিস্তানকে। যেখানে বইয়ের সংখ্যা একটি সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে ভাগে অধিক সংখ্যক অনুরাগী পাঠক আছে তারাই বইটি পড়ার সুযোগ পাবে। এর ফলে 'অ্যালিশ ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' অথবা 'উথারিং হাইট্স্' নামক উপন্যাস দুটির অনুরাগী পাঠক সংখ্যা নির্ণয় করা নিয়েও প্রায় হাতাহাতির উপক্রম হলো দুই রাষ্ট্রের শিক্ষিত মহলে।

তবে এমন কিছু বিষয় ছিল যার যথার্থ ভাগাভাগি হয় না। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনে দায়িত্ব নিয়ে ঘোষণা করা হলো যে, দেশভাগজনিত ঘটনার সঙ্গে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের গুরুত্বের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। সুতরাং এই সরকারী দপ্তরটির ভাগাভাগি হবে না এবং এখানকার কর্মচারীদের দোয়াতদান বা নথিপত্রের মতন পাকিস্তানে পাঠানো হবে না।

সারা উপ-মহাদেশে তখন একটাই ছাপাখানা, যেখানে ডাকটিকিট বা টাকা ছাপাবার উপযুক্ত সরঞ্জাম ছিল। ভারত এটি হাতছাড়া করতে চাইল না। তাই নানা অঙ্কের অসংখ্য নোট ছাপিয়ে তার গায়ে 'পাকিস্তান' মোহরের ছাপ এঁকে দেওয়া হলো হাজার হাজার পাকিস্তানী মুসলমানদের ব্যবহারের জন্যে।

অনিবার্যভাবেই এই উপ-মহাদেশের প্রাচীনতম যে ব্যাধি সেই ক্ষুধাব্যাধির প্রতিফলন হলো কৃষিজ উৎপাদনের বেলায়। পূর্ববাংলা তখন প্রস্তাবিত পাকিস্তানের অঙ্গরাজ্য হতে চলেছে। কিন্তু সে রাজ্যে তখন খুব অনটন চলছে চাল গমের। প্রায় সত্তর হাজার টন চাল আর তিরিশ হাজার টন গমের ঘাটতি মেটাতে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ ভারতকে পাঠানো এগারো হাজার টন উদ্বৃত্ত চাল ফেরত চাইল। সিন্ধু-প্রদেশে উৎপন্ন এই উদ্বৃত্ত চাল নাকি আগেই দিল্লি পাঠানো হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান সেই চাল ফেরত পেল না। এর কারণ অবশ্য হিন্দু ভারতের নীচতা নয় ; এর কারণ সেই চিরন্তন ক্ষুধাব্যাধি যার দরুন নাকি এই চাল উদরস্থ হয়ে যায়।

আমলা ছাড়াও দুই রাষ্ট্রের তরফে কিছু কিছু উগ্র দাবিদার ছিল। তাদের হুমকির ফলে অতিরিক্ত সংকট তৈরি হয়। এরা এক্স্ট্রিমিস্ট্ বা চরমপন্থী। মুঠি প্যাকিয়ে এরা আস্ফালন করলো যে মোগল সম্রাটের তৈরি তাজমহল ভেঙে টুকরো করে পাকিস্তানে পাঠাতে হবে। নইলে আগুন জ্বলবে। তেমনি জঙ্গি হিন্দু সাধুরা দাবি তুললো যে কোন উপায়ে সিন্ধুনদের উপত্যকা তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে, কারণ আড়াই হাজার বছর আগে নাকি এই নদীরই তীরে বসে পবিত্র বেদ মন্ত্র রচনা করেছিলেন আর্য ঋষিরা।

দুই রাষ্ট্রের কেউই কিন্তু চটকদার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রতীকগুলো ছেড়ে দিতে চাইল না। লাটসাহেবের সেই জমকাল এবং বিলাসবহুল ট্রেনখানা যেমন ভারত চেয়ে বসলো, তেমনি কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ এবং পাঞ্জাবের গভর্নরের গাড়ি দুখানা দেওয়া হলো পাকিস্তানকে।

তবে ভাগাভাগির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নজির লাটভবনের আস্তাবলেই দেখতে পাওয়া গেল। সমস্যা ছিল ঘোড়ায় টানা বারটা ল্যাণ্ডোগাড়ি নিয়ে। সোনাচাঁদির ভূষণে ঝলমল করছে ঘোড়ার সাজ। ঘোড়ার পিঠে ফুলকাটা জরিদার রেশমী বস্ত্র। সব মিলিয়ে এমন একটা রাজসিক দম্ভ জড়িয়ে আছে, যা উপেক্ষা করা যায় না। সাম্রাজ্যবাদী এই রাজমহিমাই একদিন ভারতবাসীদের কাছে শ্রদ্ধা আর উষ্মার কারণ ছিল। কারণ এককালে প্রত্যেক বড়লাট আর পরিদর্শনকারী সম্রাটরা এর যে কোন একটায় চড়ে রাজধানী দিল্লির রাস্তায় বেড়াবার সময় রাজমহিমা প্রচার

www.pathagar.com

করতেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে, দুটো রাষ্ট্রই এই দাম্ভিক সাম্রাজ্যবাদী প্রতীকগুলো তাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্যে চেয়ে বসলো। বড়লাটবাহাদুরের খাস পরিচর্যার এই ল্যান্ডো গাড়িগুলোর মধ্যে ছ'খানা ছিল সোনার কাজ করা আর বাকি ছ'খানা রুপোর কাজ করা। যেহেতু সেট্‌টা ভাঙা বাঞ্ছনীয় নয়, তাই স্থির হলো যে এক রাষ্ট্র পাবে সোনামোড়া ছ'খানা স্টেজকোচ এবং অন্য রাষ্ট্র পাবে রুপোয় মোড়া ছ'খানা কোচ।

এখন প্রশ্ন হলো কোন রাষ্ট্র কোন সেটের গাড়িগুলোর অভিভাবক হবে? মাউন্টব্যাটেনের এ.ডি.সি. পীটার হয়েস সবচেয়ে সহজ প্রস্তাব দিলেন। অর্থাৎ টসের দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করতে বললেন, কোন পক্ষই অসন্তুষ্ট হলো না। ভাগ্য পরীক্ষার সময় দুই রাষ্ট্রের দুজন সাক্ষী রইল। একজন পাকিস্তানের পক্ষে, মেজর ইয়াকুব খান এবং অন্যজন মেজর গোবিন্দ সিং।

পীটার হয়েস রুপোর টাকাটা শূন্যে ছুঁড়লো। গোবিন্দ্‌ সিং চেঁচিয়ে উঠলো 'হেড্‌স্‌!' তিনজনেই হাঁ করে তাকিয়ে আছে রুপোর টাকার দিকে। পাক খেতে খেতে টাকাটা টেবিলের ওপর পড়লো। সবাই ঝুঁকে পড়লো টাকার দিকে। তারপরেই সোল্লাশে চেঁচিয়ে উঠলো গোবিন্দ্‌ সিং। হ্যাঁ, ভাগ্যদেবী প্রসন্ন হয়েছেন। তিনি নির্ণয় করে দিলেন যে, এখন থেকে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের সোনামোড়া গাড়ি চড়েই ভারতের সদ্যোবিকশিত সোশ্যালিস্ট নেতারা শহরে ঘুরে বেড়ানোর অধিকারী হবে। ইতিহাসের এই উল্টোরথের যাত্রা কি কৌতুককর!

এর পরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। হয়েস নিজেই উদ্যোগ নিয়ে ঘোড়ার সাজোপকরণ ভাগ করতে বসলো। কোচোয়ানের জুতো, চাবুক, পরচুলা, উর্দি ইত্যাদি। কিন্তু বিঘ্ন হলো বড়লাটের প্রধান কোচোয়ানের শিঙাটা নিয়ে। এই শিঙা বাজিয়েই প্রধান কোচোয়ান ঘোড়াগুলো চালায়। মুশকিল হলো শিঙার সংখ্যা নিয়ে। বড়লাটের গেরস্থালিতে একখানাই শিঙা আছে এবং তাকে দুভাগ করাও যাবে না, কারণ শিঙা বাজবে না। তাহলে? আবার কি পুরনো পদ্ধতিতেই ভাগ্য পরীক্ষা করতে হবে? আর কোনরকম উন্নত প্রথা নেই? হঠাৎই আলোকোদ্ভাস হলো নবীন এ.ডি.সি.র। দুই রাষ্ট্রের দুই সামরিক অফিসারের দিকে চেয়ে হয়েস বললো, 'বুঝতেই পারছেন যে এটাকে দুটুকরো করা যাবে না। সেক্ষেত্রে সমাধান একটাই।' তারপর মুচকি হেসে শিঙাটা বগলদাবা করে হয়েস বললো, 'এটাকে আমিই নিয়ে যাচ্ছি।'*

শুধু যে বই, টাকা আর আমলাদের চেয়ার টেবিলই ভাগ হলো তা নয়। ভাগ হলো প্রশাসনের অন্য সচল যন্ত্রাংশগুলোও। হাজার হাজার সরকারী তক্‌মাধারী মানুষ। ওপরওলা থেকে শুরু করে বাবু বেয়ারা মায় ধাঙড় মেথর পর্যন্ত। তাদের দেওয়া ইচ্ছাপত্র (অপ্‌শন্‌) অনুযায়ী দুই ডোমিনিয়নের কোন একটায় প্রায় বস্তাবন্দীর মতন চালান করে দেওয়া হলো তাদের।

---

* সেই থেকে পিটার হয়েসের শোবার ঘরের চুল্লির তাকে (ম্যান্টেলপীস) শিঙাটা রাখা আছে। তারপর বয়স বেড়েছে পীটারের। সে এখন অবসরপ্রাপ্ত অ্যাড্‌মিরাল। মাঝে মধ্যে লোকজন এলে পীটার হয়ত তাদের শিঙাটা দেখায়। পুরনো দিনের কথা বলে। তখন হয়ত খেলাচ্ছলে শিঙায় ফুঁ দিয়ে সেটা বাজিয়েও শোনায় অতিথিদের।

www.pathagar.com

এই ভাগাভাগির মধ্যে সবচেয়ে দুরূহ এবং বেদনাদায়ক হলো সেনাদলের ভাগাভাগি। ভারতীয় সেনাদলে কর্মরত হিন্দু, শিখ, মুসলমান এবং ইংরেজরা জড়াজড়ি করে দীর্ঘদিন সম্মানের সঙ্গে কাজ করেছে। ভারতের মাটিতে ইংরেজ যত্ন করে যে ক'টি প্রতিষ্ঠান গড়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে আদরের ধন বোধহয় ভারতীয় সেনাদল বা ইণ্ডিয়ান আর্মি।

স্বভাবতই ভারতীয় সেনাদল সম্বন্ধে ইংরেজের একটু দুর্বলতা ছিল। তাই সেনাদলের ভাগাভাগি ঠেকাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন মাউন্টব্যাটেন। জিন্নার কাছে একটা বিকল্প প্রস্তাবও দেন। তিনি চেয়েছিলেন যে, একজন ব্রিটিশ সুপ্রীম কম্যাণ্ডারের অধীনে থেকে যৌথভাবে ভারত ও পাকিস্তানের শান্তি শৃঙ্খলার তত্ত্বাবধান করুক ইণ্ডিয়ান আর্মি। কিন্তু জিন্না রাজী হন নি। অথচ ১৫ই আগস্টের মধ্যেই পাকিস্তান তার নিজস্ব সীমানার মধ্যে সার্বভৌম রাজ্যরূপে গড়ে উঠবে। তখন সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্যেই তার নিজস্ব সৈন্যবাহিনী থাকা বাঞ্ছনীয়। সেক্ষেত্রে ইণ্ডিয়ান আর্মির ভাগাভাগি অনিবার্য বাস্তবসত্য হয়ে উঠলো এবং একটা মেদুর গল্পকথার মতন মানুষের স্মৃতির মধ্যে জেগে রইল ইণ্ডিয়ান আর্মি নামক একটা অভঙ্গ প্রতিষ্ঠান।

ঠিক তাই। ইণ্ডিয়ান আর্মি বা ভারতীয় সেনাদল যেন এক লেজেণ্ড! যেন শতাব্দী প্রাচীন রোমান্টিকতা লুকিয়ে আছে এর মধ্যে! সেখানে কত না রোমাঞ্চ, পুলক, ভয় আর বিস্ময়! গঙ্গা দীন, নাইট রানার্স অব বেঙ্গল, হোয়াইট ফেদার্স ইত্যাদি নামগুলো যেন কল্পলোকের বিস্ময়। রোমাঞ্চকর চলচ্চিত্রের খ্যাতনামা নট গ্যারি কুপারের নেতৃত্বাধীন সেই দুঃসাহসিক বেঙ্গল ল্যান্সারস—সঙ্কীর্ণ পাথুরে গিরিপথে তাদের দুঃসাহসিক অভিযান, এসব যেন নবীন ইংরেজের প্রাণে এক দুঃসাহসিক মাত্রা আরোপ করতো। ঠাণ্ডা, হিমশীতল ক্লাস-ঘরের মধ্যে বসে কিশোর ইংরেজ স্বপ্নজাল রচনা করতো এদের নিয়ে। রুক্ষ, কঠিন শৈলময় পরিত্যক্ত ভূমি বা বৃষ্টিস্নাত কোন জলাজঙ্গল-সৈন্যবাহিনী যেন ভ্রূক্ষেপ-হীন। দিনের পর দিন এইভাবে চলেছে একা এবং নিঃসঙ্গ। কী রোমান্টিক সেইসব নাম: স্কীনার্স অ্যাণ্ড হড্‌সন্‌স্, ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রাইফেল্‌স, ফার্স্ট শিখস, রাজপুতানা রাইফেল্‌স্ ইত্যাদি। নামগুলো যেন গৌরব এবং অ্যাড্‌ভেঞ্চারের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে।

ভারতে ভিক্টোরীয় আদর্শের এমন অকুণ্ঠিত সফল প্রকাশ বোধহয় ভারতীয় সেনাদল ছাড়া আর কোথাও মূর্ত হয়নি। সেনাদলের সেই কালো কালো সাহসী মুখগুলোয় প্রতিবিম্বিত হয়েছে কোন্ দূরবর্তী এক মহারানীর প্রতি অনড় আনুগত্য। এদের নেতৃত্ব দিত যেসব তেজী নির্ভীক ইংরেজ যুবক তাদের যেন কিছুতেই ভয়ডর ছিল না। পাঠানদের আক্রমণের সামনে তারা যেমন নির্ভীক, তেমনি দুঃসাহসিক নানারকম খেলাধুলাতেও। এইসব নির্ভীক ইংরেজ ও ভারতীয় সেনানীদের নিয়ে গড়ে উঠেছে কত না গল্পকথা বা লেজেণ্ড!

আরকট দুর্গ অবরোধের সময় ভারতীয় পদাতিক বাহিনী একটা দারুণ দুঃসাহসিক কাজ করে। সেদিন তারা তাদের বরাদ্দের চাল ইংরেজ অফিসারদের হাতে তুলে দিয়েছিল পাছে তারা অনাহারে কষ্ট পায়। ১৮৫৭ সালে যখন মিউটিনি চলছে তখন দিল্লি অভিমুখে ছুটে গিয়ে তারা বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করে।

www.pathagar.com

শুধু কি এই দেশটার ভারতীয় সেনাদলের বীরত্বকাহিনী ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। সিক্সথ্ গোর্খা বাহিনীর সেনানীরা সংকীর্ণ গিরিপথ ধরে ঝাঁকে ঝাঁকে লাফিয়ে পড়েছিল তুর্কী সেনাদের ওপর। মনে পড়ে যায় যুবরাজ এ্যালবার্ট ভিক্টরের নিজস্ব অশ্বারোহী বাহিনীর বীরত্বকথা। সেকেণ্ড রয়্যাল ল্যান্সার্স্ এবং এইটীন্থ্ ল্যান্সারস্-এর সংগে মিলিত হয়ে মেকীলির মরুভূমিতে তারা রোমেলের সাঁজোয়া আক্রমণ রুখে দিয়েছিল। সেদিন তারা ফীল্ড মার্শালের আত্মসমর্পণের আবেদন অগ্রাহ্য করেছিল বলেই সারা মিশরদেশকে রক্ষা করতে পেরেছিল।

ভারতীয় সেনাদল শুরু হয়েছিল অনেকগুলো ব্যক্তিগত সেনাদলের সমষ্টি থেকে। একসময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রয়োজনেই এইসব প্রাইভেট আর্মি তৈরি হয়। প্রথম দিকে এইসব প্রাইভেট আর্মির নেতারা ছিল ভাঁড়া করা বোম্বেটে (ফ্রী বুটার)। এরাই স্বাধীনভাবে সেনাদল গড়ে কোম্পানির কাজে ভাড়া খাটাতো। দিন যত অতিবাহিত হতে লাগলো ততই এদের নাম নিয়ে নানারকম গল্পকথা চালু হয়। এরা সাধারণত লোভী, নিষ্ঠুর, চরিত্রহীন হতো এবং লুঠপাট করে অনেক ধনসম্পত্তি তৈরি করতো। এমনি একজন চীফটেন বা দলপতি ছিল উইলিয়ম হড্সন। হড্সন্স্ হর্স তারই তৈরি সেনাদল। লোকটা লম্পট হলেও ভারী দুঃসাহসী ছিল। বেছে বেছে ধনীঘরের ছেলেদের তার সেনাদলের সামান্য সেনানী হিসেবে নিয়োগ করতো। তাদের কাছ থেকে মোটা অংকের কর্জ নিত কিন্তু ফেরত দিত না। এইভাবেই প্রভূত ধনসম্পদ জমিয়ে ফেলে হড্সন। শোনা যায় একবার নাকি ছেলের হাত ধরে একজন ভারতীয় সেনা ধারের টাকা ফেরত চাইতে যায়। তখন দুজনকেই নাকি পিস্তলের গুলিতে হত্যা করে তাদের দেনা শোধ করেছিল হড্সন। লখনউ রেসিডেন্সি অবরোধ ছাড়াতে গিয়ে হড্সন মারা যায় ১৮৫৮ সালের ১১ মার্চ তারিখে। তার এই দুঃসাহসিক বীরত্ব দেখে ভক্তরা এত অভিভূত হয়ে যায় যে তার সমাধিশিলার গায়ে লেখা হয়, 'ইউলিয়ম স্টিভেন হড্সনের সমাধির নীচে প্রোথিত হলো তার সব বীরত্ব।'

মিউটিনি যেমন ভারতের অনেক কিছুরই চেহারা বদলে দিয়েছিল তেমনি বদলে দিয়েছিল ইণ্ডিয়ান আর্মির চরিত্রও। সেই থেকেই শুরু হয় ভারতীয় সেনা-দলের গৌরবের যুগ। বীরত্বকাহিনীর এক ধারাবাহিক ইতিহাস গড়ে তোলে ইণ্ডিয়ান আর্মি। তারপর থেকে পরবর্তী ৭৫ বছর স্যাণ্ডহার্স্টের সেরা ছাত্রদের টেনে এনেছে এই সেনাদল। মধ্যবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত ইংরেজ পরিবারের যুবকরা সফল সামরিক জীবনের লোভেই ছুটে আসতো ভারতে। ব্রিটিশ সেনাদল তাদের কাছে নিষিদ্ধ ফলের মতন। সেখানে মাইনের টাকায় মেসের থাকা খাওয়ার খরচ কুলাতো না। তাই ধনীর ঘরের ইংরেজ দুলালরা যখন 'গার্ডস' বা সম্রাটের দেহরক্ষক সেনাদলে শখের চাকরি করতে যেত, তখন স্যাণ্ডহার্স্টের সেরা ছাত্ররা ভারতীয় সেনাদলে যোগ দিয়ে পেশাদার সৈন্য হতো। এই ফৌজি জীবনে যেমন অ্যাডভেঞ্চার ছিল তেমনি তাদের উচ্চাভিলাষও সিদ্ধ হতো। এখানকার জীবনযাপন ছিল ঢের আরামের। বেতনের যে টাকা তারা পেত বাজারদরের তুলনায় তা পঞ্চাশ শতাংশ বেশি। সুতরাং প্রোফেশন্যাল সৈনাবৃত্তিতে তাদের এতটুকু অনাসক্তি ছিল না।

ব্রিটিশ আর্মি যখন শুধু ড্রিল আর প্যারেড করে ব্রিটিশরাজের স্বার্থ (প্যাক্স্ ব্রিটানিকা) পাকা করেছে, তখন ইণ্ডিয়ান আর্মি এই স্বার্থ কায়েম করেছে নিরন্তর লড়াই করে। এই লড়াই হয়েছে বিরামহীন। কখনও সীমান্ত-

www.pathagar.com

প্রদেশের পাহাড় চূড়ায়, কখনও বা ল্যান্ডি কোটাল কিংবা খাইবার গিরিপথের সংকীর্ণ মেরুদণ্ডে। পরিত্যক্ত এইসব অঞ্চল যেমন জনমানবহীন তেমনি উদ্ভিজ্জ-হীন। গাছপালা, লতাগুল্ম, ঝোপঝাড় কিছুই জন্মায় না সেখানে। ন্যাড়া এবং মরুভূমির মতন শুকনো উপত্যকা খাঁ খাঁ করছে। ফলে শীতের দিনে যেমন বৃষ্টির ধারার মতন বরফ পড়তো তেমনি গরমের দিনে রোদের তাপে ঝলসে যেত শরীর। গা বাঁচাবার মতন একটা আশ্রয়ও জুটতো না তাদের। আর শত্রুপক্ষও ছিল অতি নিষ্ঠুর পাঠানরা, যাদের হাতে বন্দী হলে শাস্তি ছিল একটাই, হত্যা।

দুশমন হলেও প্রতিপক্ষ পাঠানরা ছিল সাহসী, নির্ভীক, অতিশয় চতুর এবং শঠ। এমন প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করেও তৃপ্তি পাওয়া যায়। তাই ইংরেজদের মনে পাঠানদের সম্বন্ধে একটা শ্রদ্ধাভাব ছিল। সীমান্তের এই লড়াইগুলো ছিল মরণ-খেলা। ন্যায় নীতির বালাই নেই। কুণ্ঠিল হিংস্রভাবে শত্রুনিধন করাই একমাত্র নীতি। তবুও কেমন এক খেলোয়াড়ি উত্তেজনা ছিল এই মরণখেলায়। সাধারণত এইসব চোরাগোপ্তা লড়াইয়ে সামিল হতো ছোট ছোট দল। একজন অফিসার এবং অল্প কিছু সেনা নিয়ে হয় কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিতে চৌকি দেওয়া কিংবা অনুচ্চ কোন টিলার মাথায় উঠে চব্বিশ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণ করতো। এসব কাজে যা বেশি দরকার তা হলো সাহস, উপস্থিতবুদ্ধি আর নেতৃত্ব। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো দল এবং নেতার মধ্যে একটা নির্ভরযোগ্য বোঝাপড়ার সম্পর্ক।

ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে চৌকিপাহারার ধকল যতই ভয়াবহ হ'ক না কেন কোয়ার্টার্সে ফেরার পর অফিসারদের জীবন অনেক সহজ হয়ে যেত। সেখানে দেদার আরাম স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা। সাহেব অফিসারদের ফাইফরমাশ খাটছে অগুন্তি চাকরবাকর। থাকা খাওয়ার খরচ নামমাত্র। এর ওপর আরও নানারকম বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হতো তাদের। ফলে ইন্ডিয়ান আর্মির এইসব অফিসাররা নিজেদের প্রায় জেন্‌ট্‌ল্‌ম্যান মনে করতো। মাউন্টব্যাটেনের চীফ অব স্টাফ, ইস্‌মের বেশ মনে পড়ে যায় প্রথম দিনের কথাটা। তাঁর রেজিমেন্টের মেসে ইস্‌মে যখন এসে পৌঁছলেন, তখন গরমে আর ধুলোয় প্রায় আধখানা হয়ে গেছে শরীর। মেসে ঢুকেই ইস্‌মে দেখলেন রঙচঙা পোশাক পরে তাঁর সঙ্গী অফিসাররা কেমন নিশ্চিন্ত মনে টেবিলের চারপাশে গোল হয়ে বসে আছে। টেবিলের ওপর পাতা আছে সাদা চাদর। আর প্রত্যেক অফিসারের পেছনে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ফরমাশ খাটার জন্যে একজন করে সাদা উর্দিধারী মেস্‌ ভৃত্য। টেবিলের ওপর দুটোতিনটে কাঁচের পাত্রের মধ্যে কয়েকটা লাল গোলাপ রাখা আছে। ফায়ারপ্লেসের তাকের ওপর শোভা পাচ্ছে এই রেজিমেন্টের চীফ কর্নেলের তৈলচিত্র। ঘরের চারদিকের দেওয়ালে টাঙানো আছে শিকারলব্ধ বাঘ, চিতা আর সিংওয়ালা বুনো ছাগলের মাথা (আইবেক্‌স্‌)।

সে এক যুগ যখন সেনাবিভাগের অফিসারদের যাত্রাদলের নটের মতন রঙচঙা পোশাক পরতে হতো। স্কিনার্স হর্স-এর 'ইয়েলোবয়েজ' অফিসাররা পরতো ঘোর কমলা রঙের পোশাক। অন্যদের 'মেসকিটের' রঙ নানারকম ছিল। কেউ পরতো টকটকে লাল, কেউ গাঢ় হলুদ, কেউ আকাশ নীল, কেউ বা পুদিনা পাতার মতন ঘন সবুজ রঙের পোশাক। প্রতি মাসে একদিন রেজিমেন্টে খানাপিনার আয়োজন হতো। সেই 'ডাইনিং-ইন' বা নৈশভোজে সদ্য রেজিমেন্টে আসা একজন অফিসারকে ভরপুর মদ খাইয়ে বেহুঁস করে দেওয়া হতো। অথচ পরদিন সকাল ছ'টার মধ্যেই

www.pathagar.com

মর্নিং প্যারেডের জন্যে তাকে ধোপদুরস্ত হয়ে হাজির থাকতে হতো। পানভোজন শুরু হতো শিঙা বাজিয়ে। তারপর চীফ কর্নেলের পিছনে পিছনে সবাই এসে হাজির হতো মেসের টেবিলে।

খানাপিনার টেবিলে তখন সারি সারি মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলোয় ঝকঝকে স্ফটিক পাত্র, রুপোর বাসনে আলো পড়ে ঝিকমিক করছে। খাদ্যবস্তু অতি উৎকৃষ্ট। শেষ পদটি হতো মিষ্টান্ন। এই ডেজার্টটি পরিবেশন হবার পরেই আসতো ডিকান্টার ভরা পানীয়। সাধারণত 'পোর্ট' পানীয় পরিবেশিত হতো এইসব আসরে। কর্নেল সাহেবের হেড্ টেবিল থেকে ডানদিক থেকে পানীয় পরিবেশন করা হতো। এটাই রীতি এবং রীতির ব্যতিক্রম হলে অশুভ লক্ষণ মনে করা হতো। হাতে মদের পাত্র নিয়ে চীফ কর্নেল তিনজনের স্বাস্থ্য কামনা করতেন। মহামান্য সম্রাট, বড়লাটবাহাদুর এবং রেজিমেন্ট। ৭ম ক্যাভ্যালরিতে অন্যরকম রীতি। সেখানকার কম্যান্ডিং অফিসার প্রতিবার 'টোস্ট' শেষে পানপাত্র উঁচুতে তুলে ধরতেন। তাঁর ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে মেস্ সার্জেন্ট। কঠিন ভাবলেশহীন মুখ তার। লোকটা এবার বুটজুতোর তলায় মড়মড় করে পানপাত্র ভাঙতো তারপর এ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াতো। মেসের মধ্যে নানারকম পানীয় থরে থরে সাজানো থাকতো। যে কোন অফিসার একটা চিরকুট পাঠিয়ে সেলার থেকে হুইস্কি, শ্যাম্পেন বা ক্লারেট মদ আনাতে পারতো। তবে কৃপণরা স্বভাবতই মদ্যপানের অনিয়মিত ব্যয় এড়িয়ে চলতো। একজন ইতিবৃত্ত লেখক (ক্রনিকলার) এমন অফিসারদের সম্বন্ধে সরস মন্তব্য করে বলেছেন, 'ওরা পেটভরে জল খেত।'

বিভিন্ন রেজিমেন্টের মধ্যে যথেষ্ট রেষারেষি ও প্রতিযোগিতা ছিল। সবাই চাইত তাদের শ্রেষ্ঠ স্মারকগুলো সাজিয়ে রাখতে। এইসব বিজয়চিহ্নগুলো নানারকম প্রতিযোগিতা থেকে পাওয়া পুরস্কার। এদের প্রতিটির সংগেই জড়িয়ে আছে একটা অলিখিত ইতিহাস। ট্রফির দিকে চাইলেই মনে পড়ে যায় সেসব। তিরিশের দশকে একটা রুপোর কাপ পেয়েছিল ৭ম ক্যাভালার। বেশ বড়সড় পাত্র। এর নাম দেওয়া হয়েছিল ওভারফ্লো কাপ। এই নামকরণের পিছনেও কাহিনী আছে। বেশ মজাদার গল্প। শোনা যায় এক উন্মত্ত পানভোজনের আসরে অফিসারদের শখ হয় যে টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে কাপের মধ্যে প্রস্রাব করবে। মাতালের কান্ড। যা মনে করেছে তা-ই করলো। দেখতে দেখতে পাত্রটি ছাপাছাপি হয়ে ভরে উঠলো এবং উপচে পড়লো প্রস্রাব। সেই থেকে এর নাম হলো 'ওভারফ্লো কাপ' বা উপচেপড়া পাত্র।

সকালবেলার ফৌজি ব্যায়াম আর কুচকাওয়াজ বাদ দিলে দিনের বাকিটা অফিসারদের নিজস্ব। সেই অবসরের সময়টাকে কাজে লাগাবার পথ একটাই। যে কোন খেলায় মেতে থাকা। সব রকম খেলাধুলোর ব্যবস্থা আছে সামরিক জীবনে। ক্রিকেট, হকি, পোলো, শিকার, ঘোড়ায় চড়া যে কোন একটার মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে যেত সবাই এবং যৌবনের স্বাভাবিক সম্ভোগেচ্ছা দূর করতো। কারণ, ইন্ডিয়ান আর্মির অফিসাররা মধ্য তিরিশের আগে বিয়ে করতে পারতো না। মধ্যযুগের গোঁড়া ধর্মযাজকরা বরফগলা জলে স্নান করে যেমন যৌন ইচ্ছা দমন করতো অনেকটা সেইরকম। ইন্ডিয়ান আর্মির অফিসারদের এই সংযত যৌন জীবন বাধ্যতামূলক হয় মিউটিনির পর থেকেই। তখন এদেশীয় ললনাদের সংগে ভাবসাব বা মেলামেশা করাও কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। এমন কি সাধারণ ফৌজির মতন গণিকালয়ে যাওয়াও অফিসারদের বারণ ছিল। ফলে সারাদিন ঘোড়ার পিঠে চড়ে ছুটোছুটি

www.pathagar.com

করেই তারা ইন্দ্রিয়দমন করতে বাধ্য হত।

প্রত্যেক অফিসার বছরে দুমাস ছুটি পেত। সীমান্তপ্রদেশে হাঙ্গামা না থাকলে আরও বেশি দিনের ছুটি পেত তারা। ছুটি পেলেই তারা নানা অভিযানে বেরোত। কেউ শিকার করতে মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে যেত। কেউ যেত হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে। যারা কাশ্মীর যেত তাদের আর একটা বিলাসিতা ছিল ওখানকার ক্ষিপ্রগতি নদীতে বসে মাছ ধরা। ইস্মে ছুটি কাটাতে যেতেন কাশ্মীরের রাজধানী শহরে। প্রথম ছুটির আমেজ উপভোগ করতেন ডাল লেকের ওপর হাউসবোটে বাস করে। গ্রীষ্মকালের ছুটিতে ৮০০০ ফুট উঁচু পাহাড়ি গ্রাম গুলমার্গে চলে যেতেন। ঘাসে ছাওয়া ওখানকার পোলো খেলার মাঠটা নাকি সব দিক দিয়েই একটা আদর্শ বিলিতি মাঠের মতন ছিল। গুলমার্গের পোলো মাঠে একটা ক্লাব ছিল। সেখানে বসে গুলতানি করতে করতে বিশ্বের যাবতীয় ব্যাপারস্যাপারের ফয়সালা করে ফেলতো সবাই।

তা বিশ্বের তাবৎ সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে না পারলেও তারাই যে এতবড় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বড় খুঁটি তা তারা জানতো। হাতে উদ্ধত রাইফেল নিয়ে বাঘ শিকারে যাওয়া বা দুর্ধর্ষ পাহাড়ি উপজাতিদের পিছনে ধাওয়া করার মধ্যেই সেই দম্ভটা প্রকাশ পেত। প্রকাশ পেত অবসরের সময় যখন পোলো স্টিক নিয়ে তারা ছুটতো কিংবা খুশীর মেজাজে হাতে হুইস্কির 'বড়া পেগ' নিয়ে বেসুরো গলায় বারাকের গান গাইত।

ইন্ডিয়ান আর্মির দ্বিতীয় বড়সড় রূপান্তর হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে। ১৯১৮ সাল থেকেই স্যান্ডহার্স্টে ভারতীয় ক্যাডেটের জন্যে দশটা আসন সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা হয়। ১৯৩২ সালে স্যান্ডহার্স্টের আদলে দেরাদুনে ইন্ডিয়ান মিলিটারি এ্যাকাডেমি তৈরি হলো। এখান থেকে ভারতীয়দের যে সামরিক শিক্ষা দেওয়া হতো তা হুবহু একইরকম। আর যাই হ'ক, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ অন্তত সামরিক বিভাগ থেকে সাম্প্রদায়িকতার বিষ পুরোপুরি শুষে নিয়েছিল এবং সেনাদল বা রেজিমেন্টের প্রতি তাদের আনুগত্যের ব্যাপারে ইংরেজ বা ভারতীয়দের মধ্যে কোনরকম ইতরবিশেষ ছিল না।

১৯৪৫ সালের মধ্যে ইন্ডিয়ান আর্মির কলেবর অনেক বড় হয়ে যায়। তখন তার ফৌজ সংখ্যা আড়াই লক্ষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সর্বত্রই তারা সম্মানের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছে। কিন্তু তাদের চরিত্রের সবচেয়ে প্রধান যে গর্ব সেই অসাম্প্রদায়িক ভাবটাই একটা হটকারী রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের জন্যে যে ভাঙচুর হতে চলেছে, এটাই সবচেয়ে বেদনাদায়ক।*

---

* ভারতীয় সেনাদলে এই ভ্রাতৃত্ববোধের উৎস হলো নির্বিচার আজ্ঞানুবর্তিতা। বস্তুত, ভারতীয় সেনাদলের ওপর দিয়ে অনেক ঝড়ঝাপটা বয়ে গেলেও এই নির্বিচার অজ্ঞানুবর্তিতার কখনও ব্যত্যয় হয় নি। একটা ঘটনা বলি। দেশভাগের পঁচিশ বছর পরের কথা। ভারত ও পাকিস্তান তৃতীয়বার সামনাসামনি লড়াই করছিল বাংলাদেশ যুদ্ধে। অতঃপর শেষ হলো এই আত্মহননের পালা। পাকিস্তানের সাঁজোয়াবাহিনীর অফিসাররা তখন সমান মর্যাদার এক ভারতীয় বাহিনীর প্রধানকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল যার কাছে অস্ত্র ফেলে তারা আত্মসমর্পণ করতে পারে। সদ্য অধিকার করা এক ক্লাবের পানশালায় তাকে পাওয়া গেল। তখন ভারতীয় সেই ফৌজি অফিসার তাদের এক রাউণ্ড মদ্যপানের

www.pathagar.com

জুলাই মাসেই একটা ফর্মের প্রতিলিপি ইণ্ডিয়ান আর্মির প্রত্যেক অফিসারের হাতে পৌঁছে গেছে। অতঃপর এই ফর্মটা দিয়েই শুরু হলো ভাঙার কাজ। কে কোন রাষ্ট্রের অধিবাসী হবে তা জানাতে হবে ফর্মে সই করে। সেনাদলে হিন্দু বা শিখদের নিয়ে কোন জটিলতাই হলো না। কারণ তারা সরাসরি ভারতের পক্ষে থাকবার মতামত দিল। তা ছাড়া জিন্নাও তাঁর পাকিস্তানের সেনাদলে শিখ বা ভারতীয়দের নিতে চাইলেন না। কিন্তু বিপত্তি হলো সেইসব মুসলমান অফিসার-দের নিয়ে যাদের ঘরবাড়ি ক্ষেতখামার ইত্যাদি দেশভাগের পরেও ভারতের দিকে থেকে যাবে। এখন প্রশ্ন হলো যে শুধু মুসলমান বলেই কি পৈত্রিক ঘরদোর জমি-জেরাত ছেড়ে তারা অন্য দিকে চলে যাবে? নাকি মাটি আর পারিবারিক বন্ধনের টানে হিন্দু ভারতে থেকে সাম্প্রদায়িকতার শিকার হবে?

ইণ্ডিয়ান আর্মির এনায়েত হাবিবুল্লাও ঠিক এইরকম সংকটে পড়েছিল। কিছুতেই মনস্থির করতে পারছিল না এই শিক্ষিত মুসলমান যুবকটি কি সে করবে? শেষমেশ এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে লখনউ চলে গেল এনায়েত। এখানেই তার পৈত্রিক ঘরবাড়ি। এনায়েতের বাবা শিক্ষাজগতের মানুষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। মার পরিচয় যে তিনি ঘোরতর পাকিস্তানপন্থী।

দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে বাপের গাড়িখানা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো এনায়েত। লখনউয়ের সারা রাস্তা ঘুরে বেড়ালো গাড়ি নিয়ে। এখানেই তার ছেলেবেলা কেটেছে। এখানেই রয়েছে তার পূর্বপুরুষদের কত উজ্জ্বল স্মৃতি। স্বপ্ন দেখতে লাগলো সেই সব ঘটনার। মনে পড়লো ১৮৫৭র মিউটিনির সময় তার পূর্বপুরুষেরা কেমনভাবে বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। এনায়েত শুনেছে তার নবাবী খানদানের কথা। নবাব হলেও রেসিডেন্সির দেওয়ালে এখনও তাদের গুলির দাগ লেগে আছে। এরই জন্যে প্রাণ আহুতি দিয়েছিলেন তাঁরা। সুতরাং? মনস্থির করে ফেললো এনায়েত। এই ভারতের স্বপ্নই সে বিলেতের ইস্কুলে পড়ার সময় দেখেছে। যুদ্ধের সময় পশ্চিমী মরুভূমি অঞ্চলে শত্রুপক্ষ জার্মানদের সঙ্গে লড়াই করার সময় দেখেছে এই ভারতের ছবি। অতএব এনায়েত ভাবলো 'এই আমার আসল ঘর। এই মাটিরই মানুষ আমি। এখানেই আমি থাকবো।'*

কিন্তু যত তাড়াতাড়ি এনায়েত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তেমনটি পারে নি মেজর ইয়াকুব খান। বড়লাটের দেহরক্ষী বিভাগের এই মুসলমান যুবকটির সমস্যাও এক রকম। এবং জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটা তাকেও নিতে হয় ক'টা

নেমন্তন্ন করলো। পানোৎসব শেষ হবার পর আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র সমর্পণ করলো পাকিস্তানের জওয়ানরা। এরপর যে ঘটনা ঘটলো তা একটু অভিনব। ক'টা দিন আগেও যারা খুনোখুনি করেছে, তারাই তখন নিজেদের মধ্যে প্রীতি ক্রিকেট আর ফুটবল খেলার আয়োজন করলো। ব্যাপারটা রীতিমত রীতিবিরুদ্ধ। সুতরাং আতঙ্কিত জরুরিবার্তা পৌঁছে গেল ইন্দিরা গান্ধীর সচিবালয়ে। সেখান থেকে ভারতীয় কম্যাণ্ডারের নামে সেদিন যে বার্তা এসেছিল তাতে কম্যাণ্ডারকে মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে 'ক্রিকেট নয়', তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছে 'যুদ্ধে'।

* আশ্চর্যের ব্যাপার! এনায়েত হাবিবুল্লার ভাইরা এবং বোন-ভগ্নীপতি সবাই পাকিস্তানে চলে গেলেও কট্টর জিন্নাপন্থী মাকে নিয়ে হবিবুল্লা ভারতেই থেকে গিয়েছিল।

www.pathagar.com

দিনের মধ্যেই। ফর্মটা হাতে নিয়ে সে-ও ছুটলো রামপুরের দিকে। রামপুর স্টেটের নবাব ছিলেন তার কাকা আর নবাবের প্রধান অমাত্য ছিলেন তার বাবা।

রামপুরে তাদের বাড়ির পাশেই নবাবের প্রাসাদোপম ভবন। এখানে এসে যেন সবকিছু নতুন করে মনে পড়ে যেতে লাগলো ইয়াকুবের। এখানেই তার ছেলেবেলা কেটেছে দুই বাড়িতে দাপাদাপি করে। মনে পড়ে গেল আরও কত কথা। বড়-দিনের সময় শতাধিক নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে সেইসব পানভোজনের আমোদ! কৈশোর আর প্রথম যৌবনের সেই সব হল্লা ও ফুর্তি! বিশ-তিরিশটা হাতী নিয়ে বনে জংগলে ঘুরে বাঘ শিকার, নবাবের প্রাসাদের বিলিতি বাজনার ঐকতান, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা রোলসরয়েস গাড়ির লম্বা লাইন, সেই অফুরন্ত ফুর্তির মেজাজে শ্যাম্পেন পানীয়ের ছড়াছড়ি ইত্যাদি। আরও কত স্মৃতি! জংগলে যখন শিকারে যেত তখন তাঁবুর সে কি বাহার! মেঝেয় কার্পেট পাতা, সিল্কের গদি, আর খাবার-দাবারের কত বৈচিত্র্য! মনে পড়লো, ছেলেবেলায় আপন মনে নবাবের প্রাসাদে ঘুরে বেড়ানোর কথা। মনে পড়লো নবাবের সুইমিং পুলের উষ্ণ জলের ছোঁয়া লাগার সেই শিহরন। কি বিশাল ছিল নবাবের ব্যাংকোয়েট হলটা! তার দেওয়ালে ঝোলানো সম্রাট পঞ্চম জর্জ আর সম্রাজ্ঞী ভিকটোরীয়ার পূর্ণাংগ তেলছবি দুটো আজও তেমনি অক্ষত। কিন্তু হায়! সেই পুরনো ফেলে আসা চিত্রটা কি নতুন ভারতে অক্ষত থাকবে? না, থাকবে না। পার্টিশনের পর নাকি এক নতুন ভারতের জন্ম হবে। সোশ্যালিস্ট ভারত। তখন সেই নতুন ভ ত নবাবী খানদানের নীলরক্তের এই মুসলমান যুবকটির ভাগ্য কী হবে? আর কি সে ফিরে যেতে পারবে পুরনো দিনে?

সুতরাং মনস্থির করে ফেললো ইয়াকুব। সন্ধ্যেবেলায় মার কাছে গিয়ে জানিয়েও দিল তার সিদ্ধান্ত। বৃদ্ধা আকুল হয়ে তাকালেন ছেলের দিকে? এ কি বলছে ইয়াকুব? সবকিছু ছেড়েছুড়ে পাকিস্তান চলে যাবে সে? কিন্তু কিসের টানে? 'এত বিষয়সম্পত্তি আর পুরনো স্মৃতি ফেলে চলে যাবি, বাবা?'

'হ্যাঁ মা, তাই।'

'কিন্তু...'

মেজর ইয়াকুব খান বিধবা মায়ের দিকে তাকালো। তারপর বললো, 'মা, তোমার জীবন কেটে গেছে, কিন্তু আমার জীবনের সবটাই পড়ে আছে এখনও। আমার ধারণা, পার্টিশনের পরে এদেশে মুসলমানদের আর কোন ভবিষ্যৎ থাকবে না।'

বৃদ্ধা ক্ষুব্ধ হলেন। কিছুটা অবিশ্বাস আর ক্ষোভ নিয়ে তাকালেন ছেলের দিকে। যা শুনছেন তা কি সত্যি? বললেন, 'এসব আমি বুঝি না বাবা। আমি বুঝি, দুশ বছরের এই প্রাসাদে আর ঘরানায় এমন অনেক স্মৃতি ছড়িয়ে আছে, যা মুছে ফেলা যায় না।' উর্দুতে বললেন, 'হম্ হাওয়া কি লাখোঁ দরারা আয়ী!' আরও বললেন, 'এই ভারতের মাটিতে হাওয়ার ডানায় ভর দিয়ে আমরা নেমে এসেছি। দেখেছি কত ঘটনা। দিল্লির পতন, মিউটিনি, আরও কত কি! মিউটিনির সময় তোমার প্রপিতামহদের বিচার করে হত্যা করা হয়েছিল। কত লড়াই করেছি আমরা। একটার পর একটা লড়াই। তবে এই মাথা গোঁজার ঘর-টুকু পেয়েছি। এখানে এই মাটিতেই কবর দেওয়া হয়েছে তোমার পূর্বপুরুষদের। সে সব ভুলে তুমি আর একটা দেশে চলে যেতে চাও?' শেষের কথাগুলো অত্যন্ত বিষণ্ণ শোনালো বৃদ্ধার মুখে। একটু চুপ করে আরও বললেন, 'আমি বুড়ো

www.pathagar.com

হয়েছি বাবা। দিন আমার ঘনিয়ে আসছে। রাজনীতি আমি বুঝি না। আমি তোমার মা। তোমায় ঘিরেই আমার স্বপ্ন। বলতে পার, এ-আমার স্বার্থপরতা। কিন্তু বাবা! তোমার সিদ্ধান্ত যদি পাকা হয়, তবে আমরা আলাদা হয়ে যাবই। তখন তোমায় ছেড়ে আমি থাকবো কি করে?' কিন্তু ইয়াকুব তার সিদ্ধান্ত পাকা করে নিয়েছে। বুড়ো মায়ের দিকে তাকিয়ে সে বললো, 'আলাদা কেন হবো? আলাদা হবো না। দিল্লি যা করাচিও তাই। কতটুকু তফাত রাস্তার?' রাস্তার তফাত যে অনেকটা যুবক ইয়াকুব তা জানতো না। জানতেন বৃদ্ধা।

যাই হ'ক। পরদিন সকালেই রামপুর থেকে বিদায় নিল ইয়াকুব। ভারী সুন্দর সেই গ্রীষ্মের সকালটা। ঝকঝকে আলোয় ভরে আছে চতুর্দিক। মিষ্টি হাওয়া বইছে মৃদু মৃদু। বৃদ্ধা মায়ের পরনে সাদা সাটিনের শাড়ি। স্বামী গত হয়েছেন অনেকদিন হলো। সেই থেকে সারা বাড়িটা শূন্য, খাঁ খাঁ করছে। বেলে পাথরের দেওয়ালে থমথম করছে একটা গম্ভীর বিষণ্ণতা। ছেলের মাথায় কোরাণ রেখে আশীর্বাদ করলেন বৃদ্ধা। তারপর ছেলের হাতে পবিত্র কোরাণটা দিয়ে চুমু খেলেন। দুজনে গলা মিলিয়ে কোরাণ থেকে আবৃত্তি করলেন। বিদায় বেলার প্রার্থনা মায়ের। তারপর দুগাল ফুলিয়ে ফুঁ দিলেন ছেলের উদ্দেশে, যাতে বিদায় বেলায় মায়ের আশীর্বাদ ছেলেকে ছেড়ে না যায়।

বাড়ির দোরে অপেক্ষা করছে প্যাকার্ড গাড়িখানা। এটাই ওদের পরিবারের গাড়ি। দরজা খুলে ভেতরে ঢোকার মুখে ঘুরে দাঁড়াল ইয়াকুব। সবাইকে সালাম জানিয়ে বিদায় নেবে মায়ের কাছ থেকে। বৃদ্ধা মায়ের ঋজু শরীরটা টান টান, স্তব্ধ। কেমন বিস্ময়কর একটা সম্ভ্রমবোধ ঘিরে আছে ওই ঈষৎ কৃশ শরীরটাকে। ছেলের দিকে চেয়ে মাথাটা একটু হেলালেন মাত্র। আর কোন উচ্ছ্বাস দেখা গেল না তাঁর চেহারায়। বৃদ্ধার পিছনে বিশাল বাড়িটার সব জানলা খোলা। জানলায় দাঁড়িয়ে আছে উর্দিপরা চাকরবাকররা। ওরাও শেষ সালাম জানাচ্ছে ইয়াকুবকে। ইয়াকুবের দৃষ্টিতে যেন স্মৃতির ক্ষুধা। সব জানলা পেরিয়ে দৃষ্টি স্তব্ধ হয়ে আছে একখানা ঘরের দিকে। ওটাই তার নিজস্ব ঘর। ঘরখানা বোঝাই হয়ে আছে যৌবনের কত মধুর দিনের স্মারকবস্তুতে। ক্রিকেটের ব্যাট, ছবির য়্যালবাম্ আরও টুকিটাকি কত কি! পোলো খেলার স্টিক, খেলায় জিতে নেওয়া কাপ। সবই তার যৌবনের স্মরণীয় স্মারক। এ সবকিছুই ছেড়ে যেতে হবে ইয়াকুবকে। তা হ'ক। ওসব এখন এখানেই থাক। তাড়া নেই। পাকিস্তানে গিয়ে একটু গুছিয়ে বসার পর এসব নিয়ে যাবে। তখন মায়ের সঙ্গেও দেখা করে যাবে সে।

কিন্তু ইয়াকুব ভুল করেছিল। আর যে সে কখনও ভারতে ফিরতে পারবে না বা মায়ের সঙ্গেও তার দেখা হবে না, তা সে বোঝে নি। সে জানতো না যে, পাকিস্তানী সেনাদলে যোগ দেবার কয়েক মাসের মধ্যেই এক ব্যাট্যালিয়ন পদাতিক সেনাবাহিনী নিয়ে তুষারাবৃত কাশ্মীরের উপত্যকায় হানা দিতে হবে তাকে। শুধু হানা দেওয়া নয়, ভারতীয় সেনাবাহিনী-অধিকৃত সেই অঞ্চলটা কেড়ে নিয়ে আরও এগিয়ে যাবে তারা। কিন্তু ওদের এই অগ্রগমনকে ঠেকিয়ে দেবে যে গারওয়াল রেজিমেন্টের কম্যান্ডার, সে তারই মতন আর একজন মুসলমান যুবক। ১৯৪৭এর জুলাই মাসে এই মুসলমান যুবকটি জন্মভূমি ভারতে থাকার পক্ষেই চরম মতামত দিয়েছিল সেদিন। ইয়াকুবের মতন এই ছেলেটির গায়েও ছিল রামপুরের নবাব পরিবারের খুন। সেও ছিল একজন খান্ ইউনুস খান্। আর তার পরিচয়?

www.pathagar.com

ইয়াকুবের খানের বড় ভাই ছিল সে এবং এই ভারতীয় সেনাদলের কম্যাণ্ডারের হাতেই অবরুদ্ধ হতে হয়েছিল ইয়াকুব খান্‌কে।

* * *

পার্টিশন নামক এই দুরূহ এবং বিপুল কাজে ভারার্পিত নিঃসঙ্গ মানুষটি জুন মাসের দুপুরেও তাঁর ৩ নম্বর নিউ স্কোয়ার, লিনকন্‌স্‌ ইন, লণ্ডনের অন্ধকার চেম্বারে বসে মাথা গুঁজে কাজ করে চলেছেন একা। অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'গ্রেসট্‌' এবং 'অল সোল্‌স্‌ ফেলোসিপ'-এ প্রথম হওয়া এই মানুষটিকে ঘিরে ঝলমল করছে। একটা বিস্ময়কর প্রতিভা। খুবই স্বাভাবিক ছিল এই জ্যোতি। কিছু মানুষকে দেখলেই যেমন সাধুপুরুষ বা নীচ মনে হয়, অনেকটা সেইরকম। নামকরা ধনী এবং খেলাধুলার জগতের এক দিকপাল ছিলেন স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের বাবা। বাপ যেমন তন্ময় স্পোর্টসম্যান ছিলেন তেমনি কৃত-বিদ্য আইনবিদ ছিলেন স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ। প্রায় নেশার মতন আবিষ্ট, তদগত হয়ে থাকতেন তার এই আইনজীবীর পেশায়, ঠিক যেমনটি আবিষ্ট হয়ে তাঁর বাবা বুনো মোরগ আর পাখি শিকার করতে সারা জীবন ছুটোছুটি করেছেন। কিছুটা শক্ত বাঁধুনির পুরুষ চেহারায় র‍্যাডক্লিফের ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা কপট সদয় ভাব ছিল। তৎকালীন সারা ইংল্যাণ্ডে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যারিস্টার।

স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফকে বলা হ'ত সচল অভিধান। বিশ্বের তাবৎ বিষয়ের আকরগ্রন্থ ছিলেন তিনি। জ্ঞানের খনি বললেও অত্যুক্তি হয় না। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার যে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রায় কিছুই তিনি জানতেন না। এতবড় দেশটা সম্বন্ধে কখনও কিছু লেখেন নি এবং কখনও এর জটিল আইনবিধির সংকটের মধ্যে জড়িয়েও পড়েন নি। বস্তুত, এতবড় উপমহাদেশে আগে কখনও আসেন নি বলেই বোধহয় ২৭শে জুন তারিখে তাঁকে লর্ড চ্যান্সেলরের অপিসে ডেকে পাঠানো হয়।

সেদিন বিকেলে র‍্যাডক্লিফকে কেন ডেকে পাঠানো হয়েছিল এখন তা সবাই জানেন। সেদিন কিন্তু কেউ জানতো না। মাউন্টব্যাটেন যে পার্টিশন প্ল্যান দেন তার মধ্যে মূল সমস্যাটার কোন সমাধানই করা হয় নি। পাঞ্জাব এবং বাংলার কোন্‌ জায়গা দিয়ে সীমারেখা টানা হবে তার কোন নির্দেশ মাউন্টব্যাটেন তাঁর প্ল্যানে দেন নি। বিভক্ত প্রদেশ দুটোর চৌহদ্দি কি হবে তা কেউ জানতো না। অথচ কাজটাও অসমাপ্ত রাখা যায় না বলে নেহরু এবং জিন্না, মতানৈক্য সত্ত্বেও রাজী হয়েছিলেন যে একটা সীমা-কমিশনের মাধ্যমে এই দুরূহতম ও জটিল কাজটা সম্পন্ন হ'ক। লর্ড চ্যান্সেলরের কথায় আরও জানা গেল যে ওই দুজন ভারতীয় নেতাই চান যে বাউণ্ডারি কমিশনের চেয়ারম্যান হন এমন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইংরেজ ব্যারিস্টার যিনি ভারত সম্বন্ধে কিছুই জানবেন না। কেন না তথ্যাভিজ্ঞ কেউ এই কমিশনের চেয়ারম্যান হলে ভারত বা পাকিস্তান, যে কোন দিকেই ঢলে পড়ে পক্ষ-পাতিত্ব দেখাতে পারেন। সুতরাং সব দিক বিচার করলে স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফকেই যোগ্যতম প্রার্থী মনে হবে কারণ তিনি যেমন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী তেমনি ভারত সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতাও অসাধারণ।

লর্ড চ্যান্সেলরের কথা শুনে প্রায় আঁতকে উঠলেন র‍্যাডক্লিফ। ভারতবর্ষের কোন দিকে পাঞ্জাব আর কোন দিকে বাংলা সে ধারণাও তাঁর নেই। সুতরাং ছুরি চালিয়ে দেশদুটো ভাগ করার দায়িত্ব নেওয়াটা হবে চরম অবিমৃষ্যকারিতা তাঁর পক্ষে। তাছাড়া দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু জ্ঞান তাঁর হয়েছে যে, সাধারণত এসব

www.pathagar.com

কাজ খুবই মর্যাদাহীন হয়ে যায় ইতিহাসের পাতায়। অতএব জেনেশুনে এ বিষ তিনি পান করবেন না। তবে র‍্যাডক্লিফ দায়িত্বজ্ঞানহীন নন। এই বয়সে তিনি তা প্রমাণ করতেও চান না। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতের এই দীর্ঘদিনের সুসম্পর্কের কথা তিনি জানেন। এও শুনেছেন যে, অনেক ব্যাপারে মতপার্থক্য সত্ত্বেও, ভারতের ওই দুজন নেতাই তাঁর মনোনয়ন মেনে নিয়েছেন। সুতরাং কাজ যতই দুরূহ এবং বিপুল হ'ক না কেন, এই দায়িত্বভার তাঁকে নিতেই হবে। নান্যঃ পন্থা!

লর্ড চ্যান্সেলরের সঙ্গে কথাবার্তা বলার ঘণ্টাখানেক পরের কথা। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া আপিসের একজন আণ্ডার সেক্রেটারির টেবিলের ওপর পাতা আছে এই উপ-মহাদেশের একটা মানচিত্র। দেশটার অন্ধিসন্ধি আর নাড়ীনক্ষত্রের খবর যাতে র‍্যাডক্লিফকে জানানো যায় তাই এই আয়োজন। টেবিল জুড়ে পেতে রাখা মানচিত্র-খানার দিকে অতন্দ্র প্রহরীর মতন চেয়ে আছেন র‍্যাডক্লিফ এবং গঙ্গা ও সিন্ধুনদের গতিপথ অনুসরণ করছেন। মানচিত্রের গায়ে ওই সবুজ অংশটা পাঞ্জাবের সমতলভূমি। আর ওই সাদা রেখাটা হলো হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গ। এই প্রথম তিনি মানচিত্রের গায়ে ওই মস্ত প্রদেশ দুটোর অবস্থান আবিষ্কার করলেন। এই বিশাল প্রদেশ-দুটো ভাগ করার কাজটা নিয়েছেন তিনি। কাজটা দুরূহ এবং বিপুল সন্দেহ নেই। দুটো প্রদেশের আট কোটি আশি লক্ষ মানুষের ঘরবাড়ি, জমিজমা, খেতখামার, কলকারখানা, রেলপথ, সড়কপথ এমন ভাবে ভাগ করতে হবে, যাতে কোন পক্ষই ক্ষুন্ন না হয়। মোট এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার বর্গমাইল সীমানার ওই রঙিন অংশটা মানচিত্রের গায়ে উৎকীর্ণ করা আছে। ঠিক ওইরকম আর একখানা কাগজের গায়ে দাগ টানবেন তিনি এবং নিপুণ অস্ত্রোপচার করে দুটো জাতির দেহ থেকে হাড় ও মাংসপেশী আলাদা করবেন। কাজটা খুবই কঠিন।

দিল্লির উদ্দেশে যাত্রা করার আগে এ্যাটলির সঙ্গে র‍্যাডক্লিফের শেষ মিটিং হ'ল ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটের বাগানে। র‍্যাডক্লিফ চলে যাবার পর মনে মনে যেন দারুণ আত্মপ্রসাদ পেলেন এ্যাটলি। তাঁর মনে হ'ল তিনশ' বছরের সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসে এই প্রথম একজন ইংরেজের কাজের প্রত্যক্ষ ফল পেতে চলেছে শুধু ভারতীয়রাই। এ্যাটলি জানেন যে ভারতের রাজনৈতিক আকাশের চেহারা আশংকা-জনক। তবুও একথা ভেবে তার গর্ব হচ্ছিল যে অবশেষে কয়েক কোটি বাস্তুহারা ভারতবাসীর মাথা গোঁজার একটা আস্তানার ব্যবস্থা করতে তিনি পারলেন।

* * *

এতবড় জয়ের সাফল্যের স্বাদ যে প্রাণভরে নেবেন সে ফুরসতও তখন মাউন্ট-ব্যাটেনের নেই। অথচ সাফল্যটা যে বিরাট তাতে কোনই সংশয় নেই। দু-তরফের ঝগড়াটে নেতাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে একটা সামঞ্জস্যের মধ্যে নিয়ে আসা একটুখানি ব্যাপার নয়। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য, সাফল্যের স্বাদটা ভোগ করার আগেই আবার একটা জটিল সমস্যা ঘাড়ে চেপে গেল। এবারকার সমস্যাটা যেন প্রাণান্তকর। লণ্ডনের ইনস্ অব কোর্টে শিক্ষানবিশি করা কয়েকজন নিরীহ আইনজীবী এরা নয়। এবার তাঁর কাছে অধিকার বুঝে নিতে আসছে হিজ্ হাইনেস্ যাদবেন্দ্র সিংহের নেতৃত্বাধীন ৫৬৫ জন রাজা, মহারাজা, নবাবের দল, যারা গিলটি করা ময়ূর।

এইসব ফূর্তিবাজ, দায়িত্বজ্ঞানহীন, রাজামহারাজার দল পাতিয়ালার মহারাজা

www.pathagar.com

যাদবেন্দ্র সিংকে নেতা বানিয়ে যে গোপন ষড়যন্ত্র করেছে, সেটাই এখন মাউন্টব্যাটেনের কাছে একটা দারুণ দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোনার পেখমধারী এই নকল ময়ূরের দল হুমকি দিয়েছে যে সারা দেশটাকে তারা টুকরো টুকরো করে দেবে। ওদের নাটের গুরু হ'ল যাদবেন্দ্র সিং। তার যুক্তি হ'ল যে রাজনীতির নেতারা যখন দেশটাকে ইতিমধ্যেই দুভাগ করেছে তখন তাদেরও অধিকার আছে আলাদা-ভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করার। তা এদের হাতে বজ্জাতি করার সেই হাতিয়ার আছে। জাত, ধর্ম, ভাষা যে কোন একটা নিয়ে হুলস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে দিলেই হল। ভারতের ক্ষীণজীবী ঐক্য চুরচুর হয়ে ভেঙে যাবে। এদের অনেকেরই নিজস্ব সেনাদল আছে। আছে যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন রেলপথ, সড়কপথ, টেলিফোন, ডাক ও তার বিভাগ ইত্যাদি। এমনকি বাণিজ্যিকভাবে বিমান পরিবহন ব্যবস্থাও আছে কোন কোন স্টেটে। সুতরাং ওরা স্বায়ত্তশাসনের হুমকি দিয়েছে। তবে তার কাছে নতি স্বীকার করার অর্থ হ'ল দেশটাকে টুকরো টুকরো করে দেওয়া। তখন কলহপ্রিয় কয়েকটা স্বস্বাধীন রাজ্যের সমষ্টি হয়ে উঠবে ভারত এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীনের ঈর্ষা উদ্রেক করবে।

স্যার কনরাড করফিল্ড তার গোপন লণ্ডন সফরের ফসলটা পুরোপুরি না হলেও খানিকটা ঘরে তুলতে পেরেছিল। ব্রিটিশ ক্যাবিনেট অন্তত নীতির দিক থেকে তার এটুকু যুক্তি মেনে নিয়েছে যে একটা বিশেষাধিকার পাওয়া দেশীয় রাজন্যরা তাদের ব্যক্তিগত বিশেষ অধিকার বা প্রেরগ্যাটিভ। যা একদা ইংল্যাণ্ডেশ্বরের কাছে জমা ছিল, সেগুলো আইনতঃ তারাই ফেরত পাবে। এই যে মুক্তি-পথটা তার পোষ্য রাজারাজড়াদের অনুকূলে সে খুলে রেখেছিল, এখন সেটাই কাজে লাগাতে চাপ দিতে লাগলো সে।

ব্যাপারটা ক্রমেই যেন মাউন্টব্যাটেনের কাছে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। লণ্ডনে পাঠানো তখনকার রিপোর্টে মাউন্টব্যাটেনের মনের উষ্মার কিছুটা আঁচ পাওয়া যায়। মাউন্টব্যাটেন লেখেন, 'আমি ঘুণাক্ষরেও টের পাই নি যে দেশীয় রাজারাজড়াদের ব্যাপারটা ব্রিটিশ ভারতের চেয়েও আমার পক্ষে এমন শক্ত বাধা হয়ে উঠবে।'

অবশ্য ভাগ্যগুণে মাউন্টব্যাটেন ছাড়া এইসব দেশীয় রাজন্যদের ঢিট করার ক্ষমতা আর কারও ছিল না। একথা সবাই জানতো যে রাজন্যরা মাউন্টব্যাটেনকে তাদেরই একজন মনে করে। এমন মনে করাটা অন্যায্যও নয়। মাউন্টব্যাটেনের সংগে ইউরোপের রাজতন্ত্রের সম্পর্কটা যথেষ্ট ধারাবাহিক এবং উপভোগ্য। দীর্ঘ-দিনের এই রাজগ্রন্থি সহজে উন্মোচিত হবার নয়। ইংল্যাণ্ডের রাজপরিবার ত বটেই, বলতে কি, প্রায় অর্ধেক ইউরোপের রাজতন্ত্রের সংগে তাঁর রক্তের সম্পর্ক ছিল। এসব কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এমনকি, কিংবদন্তীর এইসব রাজামহারাজা, আজ যাদের সিংহাসনচ্যুত করতে চাইছেন, তারাও তাঁরই আবিষ্কার। জ্ঞাতিভাই প্রিন্স অব ওয়েলেস-এর সহযাত্রী হয়ে এদেরই আশ্রয়ে থেকেছেন তিনি। সেই সব অ্যাডভেঞ্চারের সময় এই রাজামহারাজাই তাঁর আশ্রয়দাতা ছিল। এদেরই রাজ্যের বনে-জংগলে রাজার খাস হাতির পিঠে চড়ে বাঘ শিকার করেছেন। এদেরই রুপোর পানপাত্রে শ্যাম্পেনে চমুক দিয়েছেন, নানা উপাদেয় ভোজ্যবস্তুর স্বাদ নিয়েছেন। এইরকমই এক দেশীয় রাজার দরবারহলের মধ্যে ঝাড়বাতির নীচে বল্‌নাচ করেছেন ভাবী পত্নীর সংগে। যে গুটিকয়েক ঘনিষ্ঠ ইংরেজ বা ভারতীয় আড়ালে তাঁর ডাকনাম 'ডিকি' বলার অধিকার পেয়েছে, তাদের অনেকেই এইসব

www.pathagar.com

ভারতীয় রাজন্যরা।

তবে রাজন্যদের সঙ্গে তাঁর যত বনিবনা আর হৃদ্যতা থাকুক না কেন, মাউন্টব্যাটেন নামক মানুষটা ছিলেন ঘোর বাস্তববাদী অথচ সংবেদনশীল। ইংল্যাণ্ডের শ্রমিক সরকারের কাছে তাঁর কদর হয়েছিল এই গুণের জন্যেই। রাজন্যদের বাপ-পিতামহরা হয়ত একদা ব্রিটিশরাজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। কিন্তু দিন বদলাচ্ছে। এই বদলের দিনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে কংগ্রেসের সোশ্যালিস্ট শক্তির সঙ্গে বন্ধুত্বের হাত মেলাতে হবে। মিত্রতা স্থাপনের জন্যে তাঁকে কি করতে হবে তা তিনি জানেন। কোনমতেই ভারতের জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে এইসব কূপ-মণ্ডূক স্বেচ্ছাচারী রাজন্যদের, যারা কালাতিক্রম কাটিয়ে সময়ের সঙ্গে পা রেখে চলে নি, তাদের সঙ্গে নতুন করে বন্ধুত্ব পাতাবেন না।

তবে ওদের একটা উপকার তিনি করতে পারেন। ওই সব মূর্খ, কালহরণকারী, অলস এবং আত্মম্ভরি মানুষগুলোকে অলীক স্বপ্ন দেখা থেকে নিবৃত্ত করতে পারেন। একটা সময় ছিল যখন ওদের নিজেদের রাজত্বের নিরাপদ গণ্ডির মধ্যে অমন যা খুশি করা চলতো। কিন্তু এখন আর সেই নিরাপত্তা যে নেই তা ওদের বোঝা দরকার। তাঁর ছেলেবেলা থেকেই একটা ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের স্মৃতি তাঁকে অনবরত কষ্ট দিয়ে চলেছে। আজ এই ১৯৪৭ সালেও যখনই সেই ভয়ংকর ছবিটা মনের সামনে ভেসে ওঠে, তখনই তাঁর চোখ জলে ভরে ওঠে। ১৯১৮ সাল। এক্তেরীন্বার্গের সেই মাটির তলার আলোবাতাসহীন বীভৎস প্রকোষ্ঠ। এই ঘরের মধ্যেই তাঁর পিতৃব্য সম্রাট জার আর তাঁর (মাউন্টব্যাটেনের) খুড়তুতো ভাইরা, যাদের সঙ্গে ছেলেবেলায় খেলাধুলো করেছেন তাদের সবাইকে গুমখুন করা হয়েছিল। খুন করা হয়েছিল সুন্দরী ম্যারিকেও, যাকে মনে মনে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন মাউন্টব্যাটেন। কী ভয়ংকর সেই দৃশ্য! তিনি জানেন ভারতীয় রাজন্যদের মধ্যেও গোঁয়ার, হঠকারী রাজারাজড়া আছে যাদের মাত্রাজ্ঞান কম। প্রকৃতিস্থ হয়ে চলার শিক্ষাও তাদের নেই। আচম্বিতে একটা কিছু করে বসার ঝোঁক আছে অনেকেরই। তেমনটি ঘটে গেলে এরা কেউ রেহাই পাবে না। ওদের নিজেদের প্রাসাদগুলোই তখন ওদের কবরস্থান হয়ে উঠবে। কেউ ওদের বাঁচাতে পারবে না। মাউন্টব্যাটেন জানেন যে তাঁর রাজনৈতিক সচিব কনরাড করফিল্ডও এইসব দাম্ভিক অথচ মূর্খ রাজাদের ওই আত্মঘাতী রাস্তাতেই নিয়ে যাচ্ছে।

তিনি জানেন যে মূর্খের দল এখনও তাঁকেই ওদের পরিত্রাতা ঠাউরে বসে আছে। ওরা ভাবছে শেষ মুহূর্তে তিনি এমন কিছু ভেলকি দেখাবেন, যার ফলে বিশেষ অধিকার পাওয়া স্বাধীন রাজ্য হয়েই ওরা টিঁকে যাবে। কিন্তু ওরা ভুল স্বর্গে বাস করছে। তেমনটি কখনও হবে না। সে ক্ষমতা বা ইচ্ছা কোনটাই তাঁর নেই। তবে ওই বন্ধুরাজন্যদের সৎ বুদ্ধি দিয়ে বাস্তববাদী পথে চলবার পরামর্শ দেবার চেষ্টা তিনি করবেন। যাতে ওরা বুঝতে পারে যে পালাবদলের দিনে ওদের স্বাধীন সত্তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ওদের ভুলতে হবে যে ওরা স্বাধীন এবং অবস্থাটা শান্তভাবে মেনে নিতেও হবে। ১৫ আগস্ট তারিখের মধ্যে ভারত বা পাকিস্তান যে কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত হবার ঘোষণা করতে হবে। রাজন্যরা যদি তাঁর এই প্রস্তাব মেনে নেয়, তাহলে জিন্না এবং নেহরুর সঙ্গে নবাব বা রাজাদের ব্যক্তিগত পাওনাগণ্ডা নিয়ে আলাপ করতে পারেন যাতে নির্বিঘ্ন হয় ওদের ভবিষ্যৎ।

www.pathagar.com

ওদের সম্মতি নিয়ে মাউন্টব্যাটেন নিজেই উদ্যোগী হলেন। প্রস্তাব নিয়ে প্রথমে বল্লভভাই প্যাটেলের সংগে দেখা করলেন। কংগ্রেসের তরফে তিনিই তখন রাজন্যদের কেস্‌গুলো দেখাশোনা করছিলেন। মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব দিলেন যে, কংগ্রেস যদি রাজন্যদের খেতাব, উপাধি, প্রাসাদ-বাস এবং ভাতার দাবি মেনে নেন, যদি নির্বিচার গ্রেপ্তার করা থেকে তাদের অব্যাহতি দেন এবং তাদের আধা কূট-নৈতিক অধিকার স্বীকার করেন, তাহলে তিনও চেষ্টা করবেন যাতে স্বাধীনতার দাবি ছেড়ে দিয়ে তারা ভারতের পক্ষে যোগ দেয় এবং সংযুক্তি আইনে (অ্যাক্‌সেসন এ্যাক্ট) সই করে।*

প্রস্তাবটা সরদার প্যাটেলের কাছে এত লোভনীয় যে প্রায় লুফে নিলেন সেটা তিনি। এও বুঝলেন যে ভারতীয় রাজন্যদের সম্বন্ধে দায়িত্ব নিয়ে কথা বলার যোগ্যতা মাউন্টব্যাটেন ছাড়া আর কোন কংগ্রেস নেতার নেই। সুতরাং নির্বিঘ্নেই প্রস্তাবটা মেনে নেওয়া যায়। তবে সরাসরি মেনে নেবার আগে মাউন্টব্যাটেনকে একটু বাজিয়ে নিলেন প্যাটেল। বললেন, 'আমি রাজী, যদি সবাইকে আনতে পারেন। গাছের সবক'টা আপেল যদি ঝুড়িতে থাকে তবেই আমি কিনবো। নইলে কিনবো না।'

মাউন্টব্যাটেন মুচকি হেসে বললেন, 'ঝুড়ির এক ডজন আপেল আমায় দেবেন ত ?'

প্যাটেল ভুরু কুঁচকে তাকালেন, 'অতগুলো নিয়ে কি করবেন ? দুটো দিতে পারি।'

'মোটে !' মাউন্টব্যাটেনও ভ্রূকুঞ্চন করলেন।

তারপর দুজনের মধ্যে লাহোরের গালিচা বাজারের দর হাঁকাহাঁকি চললো বেশ কিছুক্ষণ ধরে। একদিকে ভারতের শেষ ধুরন্ধর বড়লাট আর অন্যদিকে ভাবী মন্ত্রীমশাই। দরাদরির পর একটা রফা হ'ল। ঠিক হ'ল যে, ছটি রাজ্য, যাদের জনসংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ, হিসাব থেকে বাদ দেওয়া হবে। অর্থাৎ ৫৫৬টি থেকে মোট ছ'টি বাদ গেলেও যতগুলি রাজ্য থাকে তার সংগে আরও কয়েকটা রাজ্য যোগ করা হবে যারা পাকিস্তানের সংগে সংযুক্ত হবে। মনে মনে প্রায় শিউরে উঠলেন মাউন্টব্যাটেন। তাঁকে সাড়ে পাঁচশ'র বেশি রাজামহারাজাদের রাজী করাতে হবে, যাতে তারা পাকিস্তান ও ভারতের সংগে সংযুক্ত হয়। কাজটা রীতিমত কঠিন। ১৫ আগস্ট আসতে আর মাত্র ক'টি সপ্তাহ বাকি আছে। এই সময়টুকুর মধ্যেই একটা অনিচ্ছুক ও প্রতিরোধী গাছ থেকে শর্তানুযায়ী সব ক'টি ফল তাঁকে পাড়তে হবে।

এরই প্রারিপ্রেক্ষিতে একটা চমকপ্রদ ঘটনা ঘটলো তখন। জওহরলাল নেহরুর একটা প্রস্তাব যেন চমকে দিল সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনকে। শুধু অসাধারণ নয়, কিছুটা

---

* অবশেষে মিলনের যে সব শর্ত ভারতীয় সংবিধানে নিষ্ঠার সঙ্গে গৃহীত হয়েছিল এবং যার ভরসায় রাজন্যরা সংযুক্তিতে রাজী হয় সেগুলি শেষমেশ মানা হয় নি। তখন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী। ১৯৭১ সালে অনেক কূটচাল করে তিনি শর্তগুলো এড়িয়ে যাবার একটা পন্থা খুঁজে বের করেন। সেই থেকে ভারতীয় রাজন্যদের বিশেষাধিকার চিরকালের মতন বন্ধ হয়ে যায় সংবিধান সংশোধন করে।

www.pathagar.com

দুঃসাহসিকও বলা যায় একে। অন্ততঃ উপনিবেশ মোচনের ইতিহাসে এমন ঘটনার নজির নেই বললেই হয়। ঔপনিবেশিক ইংরেজ সরকার ঠিক এতখানি উদারতা আশাও করে নি ভারতীয় নেতার কাছ থেকে। বড়লাটের স্টাডি রুমে জওহরলাল এসেছেন। নেহাতই মামুলী ঘটনা। সাক্ষী এই ঘরখানা জানে যে একদা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কত উৎকণ্ঠিত আলোচনা হয়েছে এই রুদ্ধদ্বার ঘরের বৈঠকে। কিন্তু সেদিন যে ঘটনা ঘটলো, তা অন্যরকম। এতকাল যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ভারতের জনগণ আপসহীন লড়াই করেছে, যে শক্তি সঞ্চিত আছে ওই প্রতীকী বড়লাট পদের মধ্যে, তার শেষ প্রতিনিধি লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে যখন স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেলরূপে আমন্ত্রণ করলেন নেহরু তখন যথার্থই চমকে উঠেছিলেন মাউন্টব্যাটেন।

অবশ্য ভেতরের কারণটা জানা গেল সামান্য চেষ্টাতেই। অদ্ভুত এই প্রস্তাবের জনক নাকি নেহরু নন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জিন্নাই এর জনক। মানুষটির আতঙ্ক হয়েছিল যে ভাগাভাগির পর পাওনা অংশ থেকে বঞ্চিত হতে পারে তাঁর দেশ পাকিস্তান। যাতে এমন দুর্ঘটনা না ঘটে তাই নিরপেক্ষ মাউন্টব্যাটেনকে মধ্যস্থ রাখতে চেয়েছিলেন জিন্না। জিন্না চেয়েছিলেন যে ১৫ আগস্ট থেকে যতদিন ভাগবাটোয়ারার কাজ সম্পূর্ণ না হচ্ছে ততদিন মাউন্টব্যাটেন গভর্নর-জেনারেল হয়ে থাকেন।

স্বাধীন ভারতের গভর্নর-জেনারেলের পদটি যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন তাতে কোন সংশয়ই নেই। তবুও প্রস্তাবটা পেয়ে আত্মহারা হয়ে উঠলেন না মাউন্টব্যাটেন। বরং এ নিয়ে যথেষ্ট ভাবনাচিন্তার অবকাশ আছে বলে মনে হ'ল তাঁর এবং তাঁর পত্নীর। যে কর্মদায়িত্ব নিয়ে এ দেশে চার মাস আগে তাঁরা এসেছেন তাতে একটার পর একটা সাফল্য জুটেছে তাঁর কপালে। সাফল্যের ভারে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তাঁর জীবনতরণী। ইচ্ছে ছিল তাঁর জীবনতরণী সেই সম্মানটুকু বহন করে নিয়ে যাবে গৌরবের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে সংকটের মেঘ ঘনায়মান হচ্ছে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে। যদি এই আবর্তে তিনি মুখ থুবড়ে পড়েন এবং অকারণে বিলম্ব করেন, তবে অচিরাৎ তাঁর সব সাফল্য এবং কীর্তি বিড়ম্বিত হতে পারে। তাছাড়া জিন্নার মনের কথাটাও তাঁর জানা দরকার। যদি তাঁকে যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তাহলে জিন্নার তরফ থেকেও অনুরূপ প্রস্তাব আসা উচিত।

ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেলের পদ নিয়ে কিছুটা টালবাহানা থাকলেও, মুমূর্ষু জিন্নার পক্ষে পাকিস্তানের এই পদের প্রলোভন এড়ানো সম্ভব ছিল না। রাষ্ট্রের এই সর্বোচ্চ পদটি ঘিরে যে দীপ্তি, যে সমারোহের ঘটা আছে তার টানে মোহগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিলেন জিন্না। বলতে কি, এই সর্বোচ্চ পদের জন্যেই এত পরিশ্রম করে পাকিস্তান সফল করেছেন। সুতরাং এ পদটিতে তিনিই উপযুক্ত প্রার্থী। বললেনও সে কথা মাউন্টব্যাটেনকে। স্বভাবতই একটু অবাক হলেন মাউন্টব্যাটেন। যে ব্রিটিশ শাসনপ্রণালীর ঢংয়ে এই দুটো দেশের শাসনতন্ত্র গড়া হয়েছে তাতে প্রধানমন্ত্রীই সব ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে সব ক্ষমতা। গভর্নর-জেনারেল পদটি নিছকই ক্ষমতাবিহীন রাষ্ট্রপ্রধানের পদ। কিন্তু মাউন্টব্যাটেনের কোন যুক্তিই গ্রাহ্য হল না এই মুমূর্ষু মানুষটির কাছে। বরং ঠাণ্ডা গলায় যা বললেন তাতেই তাজ্জব বনে গেলেন মাউন্টব্যাটেন। জিন্না

www.pathagar.com

বললেন, 'হ্যাঁ আমিই হব পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর-জেনারেল এবং আমি যা বলবো তাই করতে হবে আমার প্রধানমন্ত্রীকে।'

এ্যাটলি, চার্চিল এমনকি তাঁর জ্ঞাতিভাই স্বয়ং সম্রাটও যেন কিছুটা অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন এই প্রস্তাব শুনে। ইংল্যাণ্ডকে এই মর্যাদা ও সম্মানটুকু দিয়ে ভারত যে অনেক মহান হয়ে গেছে তাতে কোন সংশয়ই নেই। তাহলে মাউন্টব্যাটেনের মনের এই সংশয় কেন? যা স্বাভাবিকভাবে এসেছে তাকে মেনে নেওয়াই হল বুদ্ধিমানের কাজ। সুতরাং মাউন্টব্যাটেন মেনে নিন। জিন্নাও সেই পরামর্শই দিলেন।

সুতরাং মাউন্টব্যাটেন একটু দোটানায় পড়লেন। আরও একটা ভাববার কথা ছিল। 'হ্যাঁ' বলার আগে আর একজন মানুষের সম্মতি পাবার দরকার ছিল তাঁর। সম্মতি নয়, বরং বলা যায় আশীর্বাদ। বলাবাহুল্য, তিনি গান্ধীজী। ওই বৃদ্ধ মানুষটির মনের কথা তাঁর জানা দরকার। যে মানুষটি সারা জীবনব্যাপী অহিংসা-মন্ত্রে সবাইকে দীক্ষিত হতে বলেছেন এবং নিজেও সেইমত আচরণ করেছেন, তিনি কি রাজী হবেন তাঁর সাধের ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপ্রধানরূপে একজন সশস্ত্র যুদ্ধের সফল সেনানায়ককে বাছাই করতে? শুধু তাই নয়। ইতিমধ্যেই গান্ধীজী কিছুটা আজগুবী মতামত প্রকাশ করে ফেলেছেন এই মনোনয়নের ব্যাপারে। সারা পৃথিবী জেনে গেছে তাঁর পছন্দের কথাটা। ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেল পদে তিনি বাছাই করতে চান একজন হরিজন রমণীকে। তিনি যে শুধু শক্ত ধাতের মহিলা হবেন তা নয়। তিনি হবেন 'দুর্নীতিমুক্ত এবং স্ফটিকের মতন স্বচ্ছ ও নির্মল।'

গান্ধীজীর অনেক ব্যাপারই মাউন্টব্যাটেনের 'মন-পসন্দ' ছিল না। তা সত্ত্বেও একটা অচ্ছেদ্য টান ছিল এই দুজন অ-সমবয়সী মানুষের মধ্যে। বয়সে প্রায় তিরিশ বছরের ছোট হলেও মাউন্টব্যাটেন যেন কিছুটা মুগ্ধপ্রাণ ছিলেন এই বৃদ্ধ মানুষটির প্রতি। ওঁর সেই সরল হাসি, দুষ্টুমিভরা ছোট ছোট রসিকতা খুবই ভাল লাগতো মাউন্টব্যাটেনের। তাই এদেশে আসার পর থেকেই লাটসাহেবী রীতিনীতি আর ছাঁচে ফেলা যান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী সংস্কারগুলো দুহাতে সরিয়ে বৃদ্ধ মানুষটি এবং তাঁর উপলব্ধির আদর্শটা খোলা মন নিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছেন মাউন্টব্যাটেন। যতবারই তাঁদের দেখা হয়েছে তিনি যেন একটু একটু করে গান্ধীজীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছেন।

স্নেহ অতি বিষম বস্তু। গান্ধীজী বুঝেছিলেন যে মাউন্টব্যাটেন তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছেন এবং কোথায় তাঁর বাধছে সেটিও উপলব্ধি করেছিলেন বৃদ্ধ। সুতরাং জুলাই মাসের এক বর্ষণসিক্ত অপরাহ্নবেলায় গান্ধীজীর আগমন হ'ল বড়লাটের স্টাডি রুমে। দুজনের চোখে চোখে যে কথা হ'ল, তাতেই সব দ্বিধা কেটে গেল মাউন্টব্যাটেনের। গান্ধীজী অকপটে তাঁর আশীর্বাদ জানিয়ে গেলেন মাউন্টব্যাটেনকে। মাউন্টব্যাটেন বিহ্বল। মনের সব ভার কেটে গেছে তাঁর। ৩৫ বছর সংগ্রাম করে দেশকে বিদেশী শাসনমুক্ত করলেন গান্ধীজী এবং তার রাষ্ট্র-প্রধানের প্রথম সম্মান তাঁর ওপর দিলেন। শুধু বিহ্বলতা নয়। এ যেন তাঁর জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দ্বিধা, সংশয় কেটে গেল মাউন্টব্যাটেনের। সুতরাং আর কিসের ভয়!

সেদিন গান্ধীজী যেন অন্য মানুষ। পাঁচমুখে মাউন্টব্যাটেনের প্রশংসা করলেন। শুধু কি তাই! কথায় কথায় এসে গেল ব্রিটিশ জাতির মহানুভবতার কথা। তারও

www.pathagar.com

প্রশংসা করছেন পাঁচমুখে। স্টাডি রুমের সেই বিশাল আরামকেদারাং খোলের মধ্যে ঢুকে যাওয়া গান্ধীজীর ছোট্ট শরীরটার দিকে চেয়েছিলেন মাউন্টব্যাটেন। কেমন যেন অভিভূত হয়ে গেছেন তিনি। কেবলই মনে হতে লাগলো ওঁর নিজের জাত্যাভিমানের কথা। সাম্রাজ্যবাদী দম্ভ বজায় রাখতে এই মানুষটার ওপর কত জুলুমই না করেছেন তাঁরা! জেলে বন্দী করেছেন, অপমান করেছেন। অত্যাচার করেছেন। অথচ কত বড়, কত মহান উনি। মাউন্টব্যাটেনের তখন চোখ ফেটে জল আসার উপক্রম হয়েছে। কোনরকমে সে ভাব গোপন করলেন তিনি। গান্ধীজীর আশীর্বাণী পেয়ে সেদিন সত্যিই ধন্য হয়ে গিয়েছিলেন মাউন্টব্যাটেন।

গান্ধীজী কিন্তু ভ্রূক্ষেপও নেই। মাউন্টব্যাটেনের কৃতজ্ঞতার কথাগুলো কানে শুনলেন এই মাত্র। তাঁকে তখন লাটভবন আর সংলগ্ন নয়নাভিরাম মোগল উদ্যানের কথায় পেয়ে বসেছে। শীর্ণ ডান হাতখানা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তিনি তখন প্রাসাদ আর তার চৌহদ্দি বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন মাউন্টব্যাটেনকে। এই রমণীয় প্রাসাদের প্রতিটি কোণায় জমে থাকা এর রাজকীয় ঠাটবাট, জাঁকজমকের ঘটা, খানসামা, বেয়ারা থেকে শুরু করে বিলাসী খানাপিনা যা নাকি সব বড়লাটবাহাদুরের ভারী প্রিয়, সে সবই স্বাধীন ভারতের সম্পদ। গান্ধীজীর সবটুকু দুশ্চিন্তা যেন লাটপ্রাসাদের এই দাম্ভিক ভোগবিলাস নিয়েই। লাটপ্রাসাদের এই ধনমত্ততা আর তার উচ্ছৃংখল স্মৃতি যে ভারতের দীনহীন দরিদ্র জনসাধারণের চক্ষুলজ্জা, তাদের সামাজিক অবস্থার অপমান, এই চিন্তাই তখন তাঁকে অহরহ পীড়া দিচ্ছিল। কথাপ্রসংগেই গান্ধীজী তাই নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। নিঃসংশয়ে বললেন যে নতুন ভারতের নেতাদের একটা আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে যাতে প্রাসাদভবনের এই ধনমত্ততা চূর্ণ হয়। গান্ধীজীর ইচ্ছে মাউন্টব্যাটেনই সেই নেতৃত্ব দিন প্রথম গভর্নর-জেনারেলরূপে। অসংখ্য বেয়ারা খানসামা পরিবৃত এই বিলাসী প্রাসাদ-ভবন থেকে বেরিয়ে তিনি সহজ জীবনযাপন করুন একটা ছোট্ট বাড়িতে এসে এবং সুরম্য লাটপ্রাসাদটা রূপান্তরিত হ'ক গরিব মানুষের হাসপাতালে।

গান্ধীজীর কথা শুনে মাউন্টব্যাটেন স্তম্ভিত। আর সেই গদগদভাব নেই। বরং মনে হচ্ছিল বুড়োটা কী দারুণ ধূর্ত।' কেমন ইনিয়েবিনিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে ইতর মানুষের সংগে প্রথম গভর্নর-জেনারেলের বিশেষ পার্থক্য নেই। নিজের হাতে টয়লেট পরিষ্কার ছাড়া আর সবই করতে বললেন তাঁকে। এই দুশ্চিন্তাই তিনি করেছিলেন। এ্যাটলি বা স্বয়ং সম্রাট কিংবা নেহরু বা জিন্না যখন তাঁকে এই টোপটা দেন, তখনই এর ভবিতব্যের কথা তিনি জানতেন। তাঁর আশংকাই এখন ফলতে চলেছে। ওই খল বৃদ্ধ তাঁকে সেই বিপত্তির দিকেই টেনে নিয়ে চলেছেন। তাঁকে দিয়ে উদ্বোধন করাতে চাইছেন সোশ্যালিস্ট ভারতের। যেন তিনিই হবেন নতুন ভারতের প্রথম সমাজবাদী নেতা এবং নেটিভদের মতন রোজ সকালে নিজের হাতে বাসী ঘরদোর নিকিয়ে বিশ্বের এক পঞ্চমাংশ জনসাধারণের ওপর খবরদারি চালাবেন একটা লোকদেখান ছাউনির তলায় বাস করে।

মাউন্টব্যাটেনের সদ্য রঙ করা সাদা ঝকমকে এবং রোদঝলমলে স্টাডি রুমে বসে থাকতে থাকতে স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের মনে হ'ল যে, লণ্ডন শহরের সেই অন্ধকার শীতল ঘরখানার সংগে এর যতটা পার্থক্য, তেমনি আশমানজমিন ফারাক লণ্ডনে শোনা কাজের বহর আর দিল্লিতে সরেজমিনে দেখা কাজের ফিরিস্তি বুঝে নেবার

www.pathagar.com

মধ্যে।

মাউন্টব্যাটেনে তাঁকে বলেছিলেন যে শর্তানুযায়ী প্রত্যেক প্রদেশে চারজন বিচারপতি নিয়ে একটা করে প্যানেল তৈরি হবে। এদেরই সুপারিশ অনুযায়ী স্থির হবে কোথায় কিভাবে সীমানা লাইন টানা হবে। কাগজেকলমে ব্যবস্থাটা নির্ভুল। কিন্তু হাতে হাতে কাজ করতে গিয়ে দেখা গেল যে সীমানা লাইন টানার সব দায়টুকু নিতে হচ্ছে স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফকেই। সব ব্যাপারেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তিনিই কারণ পরস্পর বিরোধী দুই রাজনৈতিক দলের মনোনীত বিচারপতিরা দলের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে কখনই কোন ক্ষেত্রে একমত হতে পারছে না।

র‍্যাডক্লিফকে সীমানা লাইন টানতে হবে পাশাপাশি বসবাসকারী দুটো ভিন্ন ধর্মাবলম্বী জাতি অর্থাৎ মুসলমান ও অ-মুসলমানদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ যাচাই করে। এটা নিশ্চিত করতে তাঁকে আরও অন্য কারণ এবং উপসর্গের ওপর নির্ভর করতে হবে। কিন্তু সেই অন্যান্য অবস্থা বা ফ্যাকটরগুলো যে কি, অথবা কেমন তাদের গুরুত্ব, সেই তত্ত্ব জানতে দলের স্বারস্থ হয়েও লাভ হবে না। কারণ কোন পক্ষই সঠিকভাবে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। বরং তা করতে গেলে নেহরু ও জিন্নার মধ্যে বাদানুবাদেরও শেষ হবে না কোনদিন।

যখন নির্দিষ্ট কোন মানদন্ড না থাকার দরুন জটিলতা দেখা দিয়েছে তখন ভাগ্যের ফেরে একটা ভ্রান্ত অনুমান নির্ভুল মনে করে র‍্যাডক্লিফের ওপর চাপিয়ে দিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান স্যার ক্লড অকিনলেক। অকিনলেকের কেমন যেন ধারণা হয়েছিল যে ভারত ও পাকিস্তান মিত্র রাষ্ট্ররূপেই পাশাপাশি বাস করবে। সুতরাং কোন জাতির সীমান্তাঞ্চল নির্ধারণ করার প্রাথমিক যে শর্ত সেই প্রতিরক্ষার গুরুত্ব বিবেচনা করার দরকারটুকু উপেক্ষা করার পরামর্শ দিলেন র‍্যাডক্লিফকে।

তবে এহ বাহ্য। প্রাথমিক পর্যায়ের এই ধাক্কাগুলোর কোনটাই তেমন গুরুত্ব-পূর্ণ ছিল না। বরং যেটি আসল আঘাত সেটি তখনও টের পান নি র‍্যাডক্লিফ। কাজটা কঠিন জেনেই হাতে নিয়েছিলেন র‍্যাডক্লিফ এবং দিল্লি আসার সময় মনে মনে প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন যে, যত কঠিনই হ'ক সময় ও সুযোগ পেলে যোগ্যতার সঙ্গেই তিনি এটি সম্পন্ন করতে পারবেন। কিন্তু দিল্লি আসার পর মাউন্টব্যাটেন তাঁকে যা বললেন তা রীতিমত নৈরাশ্যজনক। মাউন্টব্যাটেন বললেন যে ১৫ আগস্টের মধ্যেই ব্যাপারটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতে হবে। অর্থাৎ আর মাত্র ক'টি সপ্তাহ তিনি হাতে পাচ্ছেন। এই সময়টুকুর মধ্যে দেশদুটো চোখের দেখাও হয়ে উঠবে না তার। অথচ দেশ দুটো তাঁকেই ভাগ করতে হবে। কাজটা শেষ করার জন্য এই বিশ্রী তাগিদের হেতু যে কী সেটি বোধগম্য হয়নি র‍্যাডক্লিফের। বরং তার মনে হয়েছিল এই অহেতুক তাড়াহুড়ার জন্যে বেশ বড়রকমের ভুলচুক ঘটে যাবার সম্ভাবনা থাকবে।

মাউন্টব্যাটেনও তা জানেন। কিন্তু তিনি অক্ষম কারণ তাঁর হাতে সময়ের বড় অভাব। ভুলত্রুটি যাই-ই হ'ক, র‍্যাডক্লিফের সিদ্ধান্তটাই চূড়ান্ত বলে ভারতকে মেনে নিতে হবে। সুতরাং র‍্যাডক্লিফের কাছে মাউন্টব্যাটেনের একটাই নির্দেশ এবং সেটি হ'ল যেন তেন প্রকারে, সীমারেখাটা ১৫ আগস্টের মধ্যেই তাঁকে টানতে হবে।

www.pathagar.com

কিন্তু জেদী এবং স্বাধীনচেতা মানুষ ছিলেন র‍্যাডক্লিফ। মাউন্টব্যাটেনের নির্দেশটা শেষ কথা হিসাবে মেনে নিতে রাজী হলেন না। নেহরু এবং জিন্নার সঙ্গে আলাদাভাবে দেখা করে তাঁর আশঙ্কার কথা জানালেন। জানতে চাইলেন যে ভুলচুক হলেও ১৫ আগস্টের মধ্যে সীমানারেখা টানা একান্ত অপরিহার্য কি না? আশ্চর্যের ব্যাপার। দুজনেই সায় দিলেন।

বলাবাহুল্য, এরপর আর র‍্যাডক্লিফের পক্ষে অমত করার উপায় রইল না। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন যে পাঞ্জাব ও বাংলার দেহব্যবচ্ছেদের জন্যে তাঁকে অস্ত্র ধরতেই হবে। তবে তাঁর যা দরকার তা অস্ত্রোপচারের ছুরি নয়। তাঁকে হাতে নিতে হবে একটি খাঁড়া।

পাঞ্জাব, জুলাই ১৯৪৭

বড়লাটের স্টাডি রুমের জানলা দিয়ে অন্যূন এক মাইল থেকেই শুরু হয়ে গেছে ধুধু চাষের জমি। ওখানেই আরম্ভ হয়েছে পাঞ্জাবের সীমানা আর র‍্যাড-ক্লিফের কসাই হাত ওই ভূখণ্ডটাই ভাগ করতে চলেছে দিনকয়েকের মধ্যেই। সমগ্র পাঞ্জাব সেবার যেন উথলে উঠেছে পাকা ফসলের ভারে। সোনার বরণ পাকা ধান, রোদে শুকানো যব আর রসালো আখের কাণ্ড। রাশি রাশি ঢেউ খেলানো ফসলের সে কী বাহার! দেখেই মনে হয় পাঞ্জাব দেশটা কত উর্বর। সার দিয়ে চলেছে বলদটানা গাড়ির দল। শস্যের ভারে যেন নুয়ে গেছে গাড়ির পাটাতন। ধুলোভরা রাস্তা দিয়ে ধীর মন্থর পায়ে হেলেদুলে চলেছে ভারবাহী বলদগুলো।

সামান্য একটু আধটু তফাত ছাড়া গ্রামগুলোর চেহারা প্রায় একরকম। পুরু সবুজ পানায় ভরা পুকুর। পাড়ে বসে মেয়েরা কাপড় কাচছে। কালো কালো মোষগুলোর কাদালেপা গা ধুইয়ে দিচ্ছে গ্রামের ছেলেরা। এক জায়গায় জড়ো হয়ে আছে অনেকগুলো মাটির ঘর। মধ্যে রয়েছে মাটির দেওয়াল ঘেরা উঠান। উঠানের এক হাঁটু কাদা মাড়িয়ে দাপাদাপি করছে কুকুর, ষাঁড়, গরু আর বাচ্চারা। কোথাও জমে আছে গরুর চোনা। চড়া রোদের তাত পেয়ে বাতাসে তার ভাপ উঠছে। একটা কুঁজো বলদ যেন অনন্তকাল ধরে মুখ বুজে ঘাঁতা ঘুরিয়ে চলেছে ক্লান্ত বিষণ্ণ পায়ে। গ্রামের মায়েরা টাটকা গোবর কুড়িয়ে দেওয়ালের গায়ে ঘুঁটে শুকাতে দিয়েছে।

পাঞ্জাবের হৃদয় বলতে যে শহর তার নাম লাহোর। একদা সাম্রাজ্যের রাজধানী লাহোর ছিল মোগল সম্রাটদের সবচেয়ে আদুরে বেগম। বাদশাদের হুকুমে শিল্পীরা যেন প্রাণ ঢেলে শহরটাকে সাজিয়েছে। ঔরংজেবের তৈরি ওই মহান মসজিদের গায়ে আঁকা নানা অলংকরণ যেন শতাব্দীর ধুলো অতিক্রম করে এখনও তেমনি অম্লান হয়ে আছে। মসজিদের স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে উৎকীর্ণ করা আছে আল্লাতালার ৯৯টি নাম। বাদশা আকবরের তৈরি ওই কেল্লার দিকে চাইলেই ওর ছড়ানো বিশালতার একটা আঁচ করা যায়। কেল্লার পালিশ করা টেরেস আর মার্বেল পাথরের জালির কাজ দেখবার মতন। ওই নিপুণ জালির কাজ দেখতে দেখতে মনে হয় যেন হাতে বোনা লেস। নুরজাহানের সমাধিমন্দিরটা দেখলে মনে পড়ে যায় যে, কোন

www.pathagar.com

এক কারারক্ষকের এই প্রিয়াই পরবর্তীকালে ভারতের সম্রাজ্ঞী হয়েছিলেন। আর আছে হতভাগিনী আনারকলীর শান্ত সমাধি। আকবরের হারেমের সবচেয়ে দামী এই রত্নটি অমার্জনীয় অপরাধ করে ফেলেছিল বাতায়ন থেকে আকবরপুত্র সেলিমকে প্রসাদকণার মতন এক টুকরা হাসি বিতরণ করে। সেই অপরাধে জীবন্ত পুঁতে ফেলা হয় এই হতভাগিনী সুন্দরীকে। আর আছে লাহোরের নন্দনকানন শালিমার বাগানের তিনশ' উচ্ছ্বল ঝরনা। তখন দিল্লির চেয়েও সার্বজাতিক, বোম্বাইয়ের চেয়েও অভিজাত আর কলকাতার চেয়েও পুরনো এই লাহোর ছিল অনেকেরই পছন্দের শহর। শহরের সবচেয়ে ইজ্জতদার মহল্লা ছিল এর ম্যাল। প্রশস্ত বুলেভাডের দুপাশের ছায়ায় গড়ে উঠেছে অসংখ্য বিপণি, রেস্তোঁরা, থিয়েটার হল ইত্যাদি। লাহোরের গোপন গর্ব হল এর পানশালা। সারা শহরে যত শৌণ্ডিকালয় ছিল তত বইয়ের দোকান ছিল না। ক্যাবারে নাচের টানে যত ভক্ত আসতো, ততটা ভক্তি নিয়ে কেউ মন্দিরে বা মসজিদে যেত না। লাহোরের নিষিদ্ধ পল্লী ছিল তৎকালীন ভারতের সেরা। তাই তখন থেকেই লাহোরকে আদর করে প্রাচ্যের প্যারিস বলা হ'ত।

একজন পর্যটক মন্তব্য করেছিলেন যে লাহোরের ছাত্ররা নাকি অভিনেতাদের মতন পোশাক পরতো। যুবক অভিনেতাদের পোশাক ছিল বয়স্কা মহিলাদের পুরুষ সঙ্গীর মতন। অভিজাত ঘরের মেয়েরা নাচনীদের মতন পোশাক পরতো আর বারাঙ্গানাদের পোশাক ছিল লন্ডনের বেশ্যাদের মতন। 'খাজাঞ্চি' নামে মেয়েদের সেই সূক্ষ্ম রেশমী কাপড়ের ঘাগরা ও পা আঁটা পায়জামা, শাড়ির বদলে মোগল হারেমের যুবতীরা যা পরতো, তার প্রথম প্রচলন শুরু হয় এই লাহোর শহরেই।

এই লাহোর শহরেই ইংরেজরা প্রথম লন্ডনের পাবলিক স্কুলের আদলে তাদের সেরা শিক্ষণপদ্ধতি গড়ে তোলে। এইসব 'হটহাউস' বিদ্যালয় থেকেই তৈরি হত ভবিষ্যতের উগ্রমূর্তি শাসক। এখানকার পাঠ্যক্রমের মধ্যে একটা কঠিন শাসনের বাঁধাবাঁধি ছিল। এদের গ্রীক-লাতিন পাঠ্যসূচি, ক্রিকেট খেলার আয়োজন, বেত হাতে শিক্ষকের আস্ফালন, নীতিবাক্য লেখা ছাত্রদের পরনের ব্লেজার ইত্যাদির মধ্যে থাকতো একটা খাঁটি বিলিতি পরিবেশ।

এই পরিবেশের মধ্যেই ধীরে ধীরে বেড়ে উঠতো হিন্দু, মুসলমান বা শিখ ছাত্ররা। পরিপূর্ণ সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব বজায় রেখে তারা গির্জায় যেত এবং গলায় গলা মিলিয়ে প্রার্থনা করতো। পাশাপাশি বসে চসার ও থ্যাকারের সাহিত্য পাঠ করতো আবার খেলার মাঠে যথার্থ প্রতিপক্ষ হয়ে লড়াই করতো বিপক্ষ দলের সঙ্গে। শাসকদের শেখানো এইসব পুরুষালি বিদ্যা আয়ত্ব করেই ছাত্ররা ক্রমে সাবালক হয়ে ওঠে। তারপর হঠাৎই একদিন শাসকদের কাছ থেকে এই উপ-মহাদেশে ঢোকার চাবিটি চেয়ে বসে।

তবে লাহোর অনেক সহিষ্ণু শহর ছিল। পাঁচ লক্ষ হিন্দু, ছ' লক্ষ মুসলমান এবং এক লক্ষ শিখ নিয়ে এই শহরটার সাম্প্রদায়িক বিভেদ নিয়ে তেমন মাথাব্যথা ছিল না। কারণ এদের তেমন ধর্মীয় বাতিক ছিল না। জিমখানা বা ওই জাতীয় কসমোপলিট্যান ক্লাবের নাচঘরে একসঙ্গে ফক্সট্রট বা রামব্রো নাচের অনুশীলন করতে করতে এদের ধর্মীয় বৈষম্য প্রায় ঘুচেই যায় এবং অনেক জায়গাতেই এই বৈষম্যটা একটা শাড়ির স্থূলত্বে এসে ঠেকে। নাচগান, খাওয়াদাওয়া বা বিভিন্ন রীসেপশনের আসরে হিন্দু-মুসলমান বা শিখেদের মেলামেশা এত সহজ ছিল যে

www.pathagar.com

মনেই হ'ত না যে ওদের ধর্ম আলাদা, সম্প্রদায় আলাদা। এমনকি শহরের উপকণ্ঠে বিলাসবহুল বাংলো বাড়ির মালিকানা নিয়েও হিন্দু, মুসলমান বা শিখেদের মধ্যে কোন পক্ষপাতিত্ব করা হ'ত না।

কিন্তু ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে লাহোরের চেহারা অন্যরকম হয়ে যায়। আর সেই সাম্প্রদায়িক প্রণয় নেই। জানুয়ারি থেকেই চলেছে রুষ্টভাব হিন্দু, মুসলমান আর শিখদের মধ্যে। বছরের শুরুতেই মুসলিম লীগের অন্ধ, গোঁড়া (জেলট্) সমর্থকরা পাঞ্জাবের নানা জায়গায় গোপন সভা করতে শুরু করে দেয়। সেই সব গোপন সভায় তারা অত্যুৎসাহে মড়ার খুলি বা কঙ্কালের ছবি টাঙিয়ে রাখতো যাতে সমর্থকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক আগুনটা উস্কে দেওয়া যায়। কখনো বা হাত পা কাটা একজন মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে সভায় সভায় ঘুরে বেড়াত তারা। ধীরে ধীরে পাঞ্জাবের মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলোয় রাজনৈতিক সাম্য নষ্ট হতে লাগলো। পাঞ্জাবের অনেক অঞ্চলে তিন সম্প্রদায় নিয়ে মিলিত কোয়ালিশন সরকার ভেঙে পড়লো সাম্প্রদায়িক চাপের দরুন। তখন বাধ্য হয়ে পাঞ্জাবের গভর্নর স্যার ইভান জেনকিনস শাসনব্যবস্থা নিজের হাতে তুলে নিলেন।

প্রথম দাঙ্গাটা শুরু হয় মার্চ মাসে। একজন শিখ নেতা মুসলিম লীগের পতাকাটা টেনে নামিয়ে যখন 'পাকিস্তান মুর্দাবাদ' ধ্বনি দিলেন, তখনই যেন শঙ্কিত হয়ে উঠলো সাধারণ মানুষ। সবাই বুঝতে পারলো কত ভয়ানক হবে এর প্রতিক্রিয়া। তাই-ই হ'ল। মুসলমানরা এর জবাব দিল রক্তাক্ত ভাষায়। প্রায় তিন হাজার শিখ কোতল হ'ল মুসলমানদের হাতে। সে যেন এক ভয়ংকর নারকীয় দৃশ্য। দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলগুলো ঘুরে এসে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নর্দার্ন কম্যান্ডের প্রধান লেঃ জেনারেল ফ্র্যাঙ্ক মেসারভী রিপোর্ট দিলেন যে, খুন হওয়া শিখেদের লাশগুলো যেন 'গুলি খাওয়া মরা পাখি।'

শেষ পর্যন্ত শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারলেও কর্তৃপক্ষের কাছে পরবর্তী দিনগুলো স্বস্তির হয় নি। কারণ, এপ্রিল মাসে কাহুতা গ্রামের সেই বর্বর তাণ্ডব প্রত্যক্ষ করে আসার পর মাউন্টব্যাটেনের যে অভিজ্ঞতা হয়, সেই নৃশংস ঘটনাই মুহুর্মুহু যেখানে সেখানে ঘটতে লাগলো।

অনিবার্যভাবে সাম্প্রদায়িকতার এই বিষ লাহোরের রাস্তাতেও গড়িয়ে পড়লো। যে মানুষটির হাতে এখানকার অদৃষ্ট গড়ার ভার পড়েছে সেই ভাগ্যবিধাতা স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ লাহোরের বর্ণময় জীবনের কোন স্পন্দনই পেলেন না। ইংল্যাণ্ডে বসে কত রঙিন কাহিনীই না শুনেছেন। সে সব যেন বানানো গল্প। কোথায় ঝলমলে বড়দিনের উৎসব, কোথায় সেই উদ্দাম নাচের আসর, তেজী ঘোড়ার মেলা বা ছন্দোময় জীবনযাপন? বরং যে লাহোর তিনি আবিষ্কার করলেন সেখানে শুধু পুরাতন ইতিহাসের প্রতিধ্বনি আছে। এখনকার লাহোর যেন 'ধুলো, উত্তাপ আর দাঙ্গার শহর' মনে হল র‍্যাডক্লিফের কাছে।

ইতিমধ্যেই লাখখানেক সন্ত্রস্ত মানুষ তখন শহর ছেড়ে পালিয়েছে। এমনকি পাঞ্জাবি প্রথা মেনে অমন দুরন্ত গরমের রাতেও কেউ বাইরে শুয়ে থাকছে না, পাছে সকলের অজ্ঞাতে আতাতায়ী এসে গলা কেটে দেয়। সারা শহর জুড়েই তখন নৈরাজ্য চলছে। কেউ নিরাপদ ভাবছে না নিজেকে। কোন কোন মহল্লায় মুসলমান যুবকরা রাস্তা জুড়ে তার ফেলে রাখতো। যখনই দেখতো দ্রুতগামী সাইকেলে চড়ে কোন আরোহী আসছে তখনই হেঁচকা টান দিত ফেলে রাখা তারে। সাধারণত শিখেরাই

www.pathagar.com

তাদের লক্ষ্য ছিল। কারণ তাদের ফাঁসে আটকে যাওয়া শিখেদের পাগড়ী বা লম্বা দাড়ির বেসামাল অবস্থা দেখে তাদের ভারী আমোদ হ'ত।

লাহোরের সবচেয়ে অশান্ত আর বিক্ষুব্ধ এলাকা হ'ল পাঁচিল ঘেরা মাইল সাত লম্বা একটা অঞ্চল। পাথর বসানো জায়গাটা বাদশা আকবরের আমল থেকেই পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এই অঞ্চলের বর্গমাইল প্রতি জনসংখ্যা সোয়া লাখ। জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা তিন লক্ষ এবং হিন্দু ও শিখ মিলিয়ে এক লক্ষ। দোকান, বাজার, মন্দির, মসজিদ, ভাঙাচোরা ঘরবাড়ি আর অসংখ্য আঁকাবাঁকা গলিপথের একটা গোলকধাঁধাঁ যেন অঞ্চলটা। সবাই ক্রুদ্ধ, সবাই চেঁচিয়ে কথা বলছে। নানারকম শব্দ, গন্ধ আর চিৎকারের বিশৃংখলার মধ্যে সর্বক্ষণই তেতে আছে গায়ে গায়ে লেগে থাকা মানুষগুলো, আর তারই গাঁজলায় ভারী হয়ে আছে বাতাস। কোথাও একটুকু ফাঁকা জায়গা নেই। যেখানেই ফাঁকা দেখছে সেখানেই গাঁটরি নিয়ে বসে গেছে অসংখ্য ফেরিওয়ালা। কারও সামনে লোহার পরাত, কেউ ঠেলাগাড়ির ওপর পণ্য সাজিয়ে চিৎকার করে ফেরি করছে। তেলে ভাজা, গরম ঝাল বড়া, চুড়ো করে সাজিয়ে রাখা কমলালেবু, স্তূপাকার করা চটচটে হালুয়া, বরফি, পেঁপে, কলা, রসে খাওয়া খেজুর ইত্যাদি। অসংখ্য কালো কালো মাছি ভনভন করে ঘুরছে এইসব খাবারদাবার ঘিরে। অপুষ্ট, শীর্ণ শরীর নিয়ে ছোট ছোট ছেলের দল মরচে-পড়া বিবর্ণ আখ মাড়াই যন্ত্র দিয়ে আখ পেষণ করে রস বার করছে। ট্র্যাকোমা অসুখে ভোগা ওদের নেত্র গোলক থেকে সাদা অংশটা শক্ত হয়ে যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

গলিপথের মধ্যেও দোকান-পসারের জটিল গোলকধাঁধাঁ। ছোট ছোট খুপরি ঘর বানানো হয়েছে ফুট দুই উঁচু করে যাতে বর্ষার জমা জল ঢুকতে না পারে। এক এক এলাকায় এক এক রকমের পণ্য, ফলে কোন বিপণিই অনধিকারী নয়। একপাশে চর্মকারের দোকান, অন্য পাশে কামারশালা। সোনাচাঁদির মহল্লা সম্পূর্ণ আদালা। আলাদা জায়গায়, সুগন্ধী মসলা, আতর, ধূপকাঠির দোকান। এক জায়গায় শুধু জুতা বিক্রি হচ্ছে। নানারকম চম্পল সাজিয়ে রেখেছে দোকানদার। সোনার জরি দেওয়া এই চম্পলের মুখগুলো যেন ছিল নৌকার (গেণ্ডোলা) গলুইয়ের মতন ছুঁচালো। একটা দোকানে সাজিয়ে রেখেছে কাচের মতন ঝকঝকে পাত্র। পাত্রের ভিতরে গায়ে রুপোর পাতলা চাদর। বার্নিশ করা দামী বারকোশ, চন্দনকাঠের গয়নার বাক্সে হাতির দাঁতের কাজ করা মুক্তা বসানো খোপ।

একজায়গায় বিক্রি হচ্ছে নানারকম অস্ত্রশস্ত্র। ছোরা, তলোয়ার, কৃপাণ ইত্যাদি। পাশেই ফুলের দোকান। বিক্রি হচ্ছে গোলাপ, যুঁইয়ের মালা। ছোট ছোট ছেলেরা দোকানের নীচে বসে মালা গাঁথছে। আছে চা পাটি। কালো কালো চা পাতা স্তূপ করে সাজিয়ে রেখেছে দোকানদার। কাপড়ের ব্যাপারীরা গাঁটরি নিয়ে দোকানের মেঝের ওপর থেবড়ে বসেছে। তাদের পেছনে থরে থরে সাজানো আছে নানা-রঙের কাপড়ের থান। কোথাও বিক্রি হচ্ছে শুধু বিয়ের পাগড়ির কাপড়। সোনার জরি বসানো এই কাপড়ের খুব প্রচলন বিয়ের বাজারে। একজায়গায় বিক্রি হচ্ছে ফোঁসা রেশম দিয়ে তৈরি ভেস্ট। তার গায়ে রঙিন চুমকি। খাটো এই জামা পরে গরিব মানুষের ভারী আহ্লাদ হয়। ভাবে চুনীমুক্তো বসানো জামা পরেছে। আর আছে নাপিত, কামার, ছুতার মিস্ত্রি। আছে টায়ার সারাইয়ের দোকান। পুরানো কাগজওলা, বোতল আর কাপড়ের দোকান। গলিপথ দিয়ে হাঁটার সময়

www.pathagar.com

মনে হয় যেন বিশ্বের তাবৎ পণ্যের কেনাবেচা হয় এখানে। সর্বক্ষণই শব্দের ঘোর লাগা জায়গাটা যেন মুখর হয়ে আছে অজস্র মানুষের চিৎকার, কোলাহলে।

কালো কাপড়ের বোরখায় সারা শরীর ঢেকে নিঃশব্দে চলাফেরা করছে মুসলমান মেয়েরা। পাতলা জালি কাপড়ের আড়ালে ঝকমক করছে ওদের কৌতূহলী চোখ। কেমন ক্ষিপ্র ত্বরিত পায়ে টঙ্গা, রিকশা, সাইকেল, ঠেলাগাড়ি আর বয়েলগাড়ির ব্যূহ ভেদ করে ক্রীশ্চান সন্ন্যাসিনীর মতন ওরা আঁকাবাঁকা রাস্তায় পথ করে চলেছে। বিশৃঙ্খল মানুষের এই জটলার দিকে বাজপাখির মতন শ্যেন চোখে তাকিয়ে আছে পুরানো লাহোরের সবচেয়ে ধনী সুদখোর মহাজন বুলাগী শাহ। এদিকটা হিন্দু-প্রধান অঞ্চল। সবাই জানে লক্ষপতি হিন্দু মহাজন বুলাগী তার জানলার কাঠের গরাদের ওধারে বসে তার ফাঁদ ছড়িয়ে রেখেছে। পাঞ্জাবের প্রায় এক পোয়া মানুষ এই মহাজনের ফাঁদে আটকে পড়ে আছে আজীবন এবং মুক্তির জন্যে হাঁকপাঁক করছে।

কে জানতো যে অলিগলির এই গোলকধাঁধাঁর মধ্যেই এমন নির্বিচার খুনোখুনি শুরু হয়ে যাবে একদিন। বুলাগী শাহর জানলার নীচেই শুরু হয়ে গেল এই উন্মত্ত খেলা। লোকগুলোর চোখের তারায় ভর করেছে একটা জান্তব প্রবৃত্তি। খুনের নেশায় কেমন যেন নির্বোধ পাশবিক হয়ে গেছে ওরা। নির্বিচার এই খুনের মহলায় কোন বাছবিচার নেই। মাথায় পাগড়ি বা চিবুকে দাড়ি থাকলেই হ'ল। চকচক করে উঠবে ওদের খুনী চোখ। সবাই জানে যে ওরা কেউ সাদামাটা নিরীহ মানুষ নয়। তিনটে সম্প্রদায়ের ভাড়া করা গুন্ডা ওরা। ছোঁকছোঁক করে ওরা প্রতিপক্ষ সম্প্রদায়ের মানুষের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তক্কেতক্কে আছে কখন প্রতি-পক্ষ সম্প্রদায়ের একটা নিরীহ মানুষের বুকে হাতের ধারাল ছুরিখানা আমূল বিঁধিয়ে দেবে, তারপর নিঃশব্দে গলিপথের গোলকধাঁধায় হারিয়ে যাবে।

একজন ব্রিটিশ পুলিস অফিসারের বেশ মনে আছে সেইসব বীভৎস দিনগুলোর কথা। তিনি লিখেছিলেন, 'তখন মৃত্যু যেন দোরগোড়ায় ওত্ পেতে থাকতো। ঠিক যেন বিদ্যুতের চমকের মতন অকস্মাৎ ছিল মৃত্যু। ছুরি কথাটা চেঁচিয়ে বলার আগেই হয়ত কেউ দেখতো যে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে একটা লাশ। সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের দোকানের ঝাঁপ পড়ে যেত। বন্ধ হয়ে যেত বাড়ির সদর দরজা। রাস্তা শুনশান। কেউ কোথাও নেই।'

শহরের ইন্‌স্‌পেক্‌টর জেনারেল জন্ ব্যানেটের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন খুনোখুনির একটা প্রতিযোগিতা চলতো দুই শিবিরে। খুনের সমতা বজায় রাখতে একটা কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। মুসলমানরা যদি একটা খুন আজ বেশি করে, তবে হিন্দু শিবিরে বাজি ধরা হ'ত 'সেই রাতেই কে এর বদলা নেবে ?' প্রতি শনিবার পুলিসকে দুটো ডাইরি তৈরি করতে হ'ত। একটা সাধারণ খুনের আর একটা রাজনৈতিক খুনের। দাঙ্গার খুন কতটা রাজনৈতিক এই প্রভেদ বিচার করা ব্যানেটের পক্ষে প্রায়ই কঠিন হয়ে পড়তো। তবে আমলাতন্ত্রে সার্থক শিক্ষণ পাওয়ায় এই সংকট কাটিয়ে উঠতে বেগ পেতে হয় নি ব্যানেটকে। দাঙ্গাজনিত খুনের রিপোর্ট দুটো ডাইরিতেই লিপিবদ্ধ করতো ব্যানেট।

স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফকে ঘিরে তখন সারা পাঞ্জাব জুড়েই নানারকম আলোচনা চলছে। তিনিই লাহোরের ভাগ্য নিরূপণ করবেন। সুতরাং লাহোরেও তাঁকে নিয়ে আলোচনার যেন শেষ নেই। ক্রমেই মানুষটি এমন বিতর্কিত হয়ে পড়লেন

www.pathagar.com

যে তাঁকে নিজের বাড়িতে অতিথি করতেও রাজী হলেন না পাঞ্জাবের গভর্নর। তখন নিরুপায় হয়ে লাহোরের ফ্যালেটী হোটেলে উঠলেন র‍্যাডক্লিফ। ১৮৬০ সালে একজন নেপলস্‌বাসী এই হোটেলটা বানায়। একজন ভারতীয় নাচনীকে বিয়ে করে এখানেই ঘর সংসার করতো এই বিদেশী। লাহোরে এসেই র‍্যাডক্লিফ মরিয়া হয়ে চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে তাঁর সাহায্যকারী বিচারকমণ্ডলী নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করে নেয়। কিন্তু দুই শিবিরের বিচারকরা তাদের আপন আপন ধর্মীয় স্বার্থ লঘু করে দেখতে না চাওয়ায়, কোন ঐকমত্য হ'ল না দুতরফে। নিষ্ফল হ'ল র‍্যাডক্লিফের চেষ্টা। তাঁর মনে হ'ল মাউন্টব্যাটেন ঠিক ভবিষ্যদ্বাণীই করেছিলেন।

লাহোরে এসে র‍্যাডক্লিফের যেন সসেমিরা অবস্থা হ'ল। কোথাও যাবার জো নেই। একদিকে প্রকৃতির রোষ, অন্যদিকে মানুষের। আগুনের হলকা বইছে ভোর থেকে। সারা শরীর যেন জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে। আর একদিকে মানুষের চাপ। যেখানেই যাচ্ছেন ছেঁকে ধরছে তাঁকে। র‍্যাডক্লিফ বুঝতে পারতেন তাদের মানসিক অবস্থার কথা। তাদের সারা জীবনের সঞ্চিত ধনসম্পদ যেন তাঁর কলমের আঁচড়ের জন্যে অপেক্ষা করে আছে। একটা অনিশ্চিত 'কী হয়' ভাব। তাই তাঁর ছায়া দেখলেই চারপাশে ভিড় করছে উৎকণ্ঠিত মানুষ। নানাভাবে খুসি করতে চাইছে; যাতে তাঁর ছিটেফোঁটা কৃপাদাক্ষিণ্য পেয়ে তাদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ হয়।

অতএব হোটেলে রাত্রিবাস নির্বিঘ্ন হবে না জেনে পাঞ্জাব ক্লাবে এসে আশ্রয় নিলেন র‍্যাডক্লিফ। লাহোরে তখনও 'ইওরোপীয়ান ওনলি' নামাঙ্কিত একটা সুরক্ষিত দুর্গ অক্ষত ছিল সাহেবদের জন্যে। আদর করে সভ্যেরা ডাকতো 'দ্য পিগ্' বলে। পড়ন্ত বিকালে ক্লাবের সুবিন্যস্ত লন্-এ সাহেব আমলা পরিবৃত হয়ে ক্লান্ত র‍্যাডক্লিফ যখন হুইস্কির গেলাসে ধীরে ধীরে চুমুক দিতেন, তখন গভীর বিষণ্ণ মানুষটির হয়ত মনে পড়ে যেত যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না। অথচ ভাগ্যের মোচড়ে আজ তিনিই এর ভাগ্যবিধাতা। হয়ত মনে হ'ত এই হিংসাদীর্ণ তাপদগ্ধ শহরটার অতীত ইতিহাসের সেই গৌরবময় দিনগুলো আবার ফিরে আসবে তাঁর সামনে। তিনি শুনতে পাবেন সেই মধুর দিনগুলোর কথা যখন মানুষ পুরোপুরি বিশ্বাস হারিয়ে বসে নি।

অন্যথায় এই লাহোর শহরটা এক বীভৎস শব্দ আর দৃশ্যের ভয়াবহ স্মৃতি হয়েই বেঁচে থাকবে তাঁর মনে। পাঞ্জাব ক্লাবের লন্ থেকে দেখা যাচ্ছে অন্ধকার দিগন্ত মাঝে মাঝে ঝলসে উঠছে আগুনের লাল শিখায়। হয়ত কোন বাজার পুড়ছে। সাইরেনের একটানা শব্দ যেন চাপা কান্নার মতন শোনাচ্ছে দূর থেকে। হঠাৎ ক্রুদ্ধ রাতের বুক চিরে আর্তনাদ দামাল হয়ে উঠলো। শোনা গেল একটা যুদ্ধোন্মাদী হুঙ্কার, 'আল্লাহ আকবর' বা 'সৎ শ্রী অকাল।' কিংবা ধর্মান্ধ জঙ্গি হিন্দুদের উচ্চৈঃস্বর ঢাকঢোলের রক্তলোভী শব্দ। র‍্যাডক্লিফ ক্ষুণ্ণ মনে তাকিয়ে রইলেন দিগন্তের দিকে।

লাহোর থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত পাঞ্জাবের দ্বিতীয় বড় শহরের নাম অমৃতশহর। এই প্রাচীন শহরের অলিগলির মধ্যে সমাহিত হয়ে আছে শিখেদের পবিত্র মন্দির, স্বর্ণমন্দির। স্বর্ণমন্দিরের চারপাশে রোদের আলোয় ঝিকমিক করা জলাশয়গুলো টলটল করছে। জলের বুকে ছায়া

www.pathagar.com

ফেলেছে সাদা মার্বেল পাথরের তৈরি এই স্বর্ণমন্দির। মার্বেল পাথর দিয়ে বাঁধান রাস্তার শেষপ্রান্তে অবস্থিত এই বিস্ময়কর ধর্মস্থানের গম্বুজটি সোনার পাতে মোড়া। এই মন্দিরের মধ্যেই সযত্নে রক্ষিত আছে শিখেদের পবিত্র 'গ্রন্থ সাহিব' ধর্মগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি। পাণ্ডুলিপির প্রতিটি পাতা রেশম কাপড় দিয়ে মোড়া এবং প্রতিদিন তাজা ফুল দিয়ে এই গ্রন্থটি ঢেকে রাখা হয়। এই ধর্মস্থান এত পবিত্র যে প্রতিদিন ময়ূরের পেখম দিয়ে এর বেদীমূল সম্মার্জন করা হয়।

শিখেদের কাছে এই পবিত্র ধর্মস্থানটি ঈশ্বরাধনা ও আধ্যাত্মিক উপাসনার এক আকর্ষণীয় পীঠস্থান। চুম্বকের মত এই ধর্মস্থানটি শিখধর্মাবলম্বীদের নিয়ত কাছে টানে। বস্তুত, ঈশ্বরময় ভারতের মাটিতে একমাত্র বিশুদ্ধ দিশি ধর্ম হ'ল শিখধর্ম যার জন্ম হয়েছে এই দেশের মাটিতে। এই পাগড়িধারী এবং শমশ্রুল এই যোদ্ধৃজাত দেশের মোট জনসংখ্যার দুই শতাংশ হলেও বীরত্ব, সাহস এবং জাতিপ্রীতির জন্যে এক উল্লেখযোগ্য ও বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছে ভারতীয় সমাজে।

একেশ্বরবাদী ইসলাম এবং বহুঈশ্বরবাদী হিন্দুদের মধ্যে পাঞ্জাবের উপদ্রুত সীমান্তপ্রদেশে যখন প্রথম সঙ্ঘর্ষ বাধে, তখনই শিখধর্মের উদ্ভব হয়। ধর্মদ্বেষী দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও মিলনের লক্ষ্য নিয়ে একজন হিন্দুধর্মগুরু (নানক) প্রচার করেছিলেন, 'হিন্দু বা মুসলমান বলে কেউ নেই। ঈশ্বর এক এবং তিনিই মহত্তম সত্য।' মোগল আমলে বর্বর পীড়নের মধ্যে এই ধর্মের বোধন হয়। পীড়নের দাপটে এই ধর্মবিশ্বাসের দশম প্রবক্তা ধর্মমতটিকে নিরীহ মিলনমন্ত্রে আবদ্ধ না রেখে তাকে যোদ্ধৃবেশে সাজিয়ে দেন। অতঃপর পাঁচজন ঈশ্বরনিষ্ঠ ও ঘনিষ্ঠ অনুগামীকে সামরিকমন্ত্রে দীক্ষিত করলেন দশমগুরু গোবিন্দ সিং। এই পাঁচ প্রিয়তম ভক্ত বা 'পাঁজ পিয়ারা' হ'ল নতুন ধর্মমন্ত্রের বিশ্বাসী প্রবক্তা। একটি পাত্রে শর্করাজল মিশিয়ে তার মধ্যে একখানি তীক্ষ্মধার ছোরা ডুবিয়ে পাঁচজনকে একই পাত্র থেকে জলপান করানো হল। এই জলপানের উদ্দেশ্য হ'ল পাঁচজনের জাতি-বৈষম্য দূর করা এবং নতুন ধর্মবিশ্বাসের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। অতঃপর শিখ সমাজকে 'খালসা' (পবিত্র) ভাবে উদ্বোধিত করা হয় এবং পাঁচজনের নতুন নামকরণ করা হয় নামের শেষে 'সিংহ' পদবী যুক্ত করে। তাঁদের বলা হয় যে সহস্র মানুষের মধ্যে থেকেও তাঁরা যেন কখনো ধর্মভ্রষ্ট না হন এবং সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে এই ধর্মসত্য পালন করেন।

দশম গুরুর নির্দেশ মতন শিখধর্মানুরাগীরা পাঁচটি প্রতীক নীতি মেনে চলেন। এই পাঁচটি নীতির আদ্যক্ষর 'ক'। 'কেশ, কাঙখা, কুচ্চা, কারা ও কৃপাণ।' অর্থাৎ আবশ্যিকভাবে শিখেরা কেশ ধারণ করবে এবং একটি চুলের মধ্যে 'কাঙখা' বা চিরুনি গুঁজে রাখবে, লজ্জা নিবারণের জন্যে পরবে ছোট অন্তর্বাস বা 'কুচ্চা', হাতে পরবে একটি লোহার বালা বা 'কারা' এবং ধর্ম ও আত্মরক্ষার জন্যে সর্বত্র 'কৃপাণ' নিয়ে ঘুরবে। তারা ধূমপান বা মদ্যপান করবে না এবং কোন যবনীর সঙ্গে যৌন সংগমে লিপ্ত হবে না। জবাই করা ছাগমাংস আহারও তাদের পক্ষে বারণ। এইভাবেই দশম গুরুর প্রেরণায় ধর্মশিষ্য থেকে ধর্মযোদ্ধায় পরিণত হ'ল শিখেরা।

এই আদর্শে সংহত শিখশক্তি মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর পাঞ্জাবের অধিকাংশ স্থানে তাদের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। কিন্তু ইংরেজের আগমনের পর এই স্বল্পকালীন রাজসম্মানের পরিসমাপ্তি হয়। অবশ্য ১৮৪৯ সালে শিখ সাম্রাজ্যের

www.pathagar.com

পতনের আগে অহংকারী শিখশক্তির হাতে ব্রিটিশ সেনা চিলিয়ানওয়ালার সম্মুখ-যুদ্ধে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। বলাবাহুল্য, এই হার সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে একটা কালো দাগ হয়ে আছে।

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ষাট লক্ষ শিখেদের মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ শিখ তাদের স্বভূমি পাঞ্জাবেই বসবাস করছিল। সমস্ত জনসংখ্যার মাত্র তেরো শতাংশ হলেও প্রায় চল্লিশভাগ জমির মালিক ছিল তারাই। শুধু তাই নয়, সমস্ত পাঞ্জাবে উৎপন্ন কৃষিশস্যের দুই তৃতীয়াংশ তারাই উৎপন্ন করতো। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন ছিল শিখ এবং গত দুটো বিশ্বযুদ্ধে যতগুলি স্মারক পদক ভারতীয় সেনাবাহিনী পেয়েছে, তার অর্ধেক পেয়েছিল শিখ সেনারা।*

পাঞ্জাবের দুর্ভাগ্য যে বিদেশীর শাসনাধীনে শিখ ও মুসলমানরা একসংগে বসবাস করলেও, অভিভাবকহীন হয়ে তারা কখনো মিলেমিশে থাকতে পারেনি। হয় শিখ শাসনে মুসলমানরা নিগৃহীত হয়েছে, নয়ত মুসলমান শাসকের অত্যাচার আর নিষ্ঠুর পীড়নে তোলপাড় হয়েছে শিখ সমাজ। শিখরাজত্বের সময় মুসলমান-দের ওপর তাদের ধারাবাহিক অত্যাচার যেন এক দুঃস্বপ্ন হয়ে আছে মুসলমানদের মনে। তখন অত্যাচারী শিখ শাসকের হাতে মসজিদ কলুষিত হয়েছে, নারী ধর্ষিতা হয়েছে, ধুলোয় লুটিয়েছে সমাধিশিলা এবং নির্বিচারে শিশু-নারী-বৃদ্ধদের হত্যা করা হয়েছে অমানুষিকভাবে ; হয় শ্বাসরোধ করে, নয়ত জীবন্ত পুড়িয়ে বা কেটে টুকরো করে।

তেমনি শিখেদের ওপর মোগল বাদশা নবাবের অত্যাচারের ঘটনাও ঢের। রক্তলাল সেই সব ঘটনা প্রায় কিংবদন্তী হয়ে আছে শিখজাতির মনে। নিষ্ঠুরতার সেই সব কাহিনী সমাজের সর্বত্র এমনভাবে শেখান হয়, যাতে বাচ্চারা বড় হয়ে বিধর্মী মুসলমানদের বংশপরম্পরা শত্রুরূপে চিনতে পারে। স্বর্ণমন্দিরের মধ্যে একটা স্মারক সংগ্রহশালা আছে। মুসলমানদের হাতে ধর্মপ্রাণ শিখদের নিগ্রহ বা পীড়নের প্রতিটি ঘটনা এমন অনুপুঙ্খ বিবরণে প্রদর্শন করা হয়েছে যে, দেখা মাত্রই শরীরের রক্ত তপ্ত হয়ে ওঠে। সেই সব নিগ্রহের ঘটনা বীভৎসভাবে আঁকিয়ে মিউজিয়ামের দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখেছে তারা। সেই ভয়ঙ্কর ছবিগুলো চূড়ান্ত বর্বরতার নিদর্শন। কোথাও ছড়ানো আছে হাত পা কাটা শিখ যুবকের মৃতদেহ। ইসলামধর্ম গ্রহণে আপত্তি করায় শাস্তিস্বরূপ তাকে করাত দিয়ে খণ্ডখণ্ড করে কাটা হয়েছে। কোথাও বা যাঁতায় পিষে চূর্ণ করা হচ্ছে কিংবা ঘূর্ণায়মান চাকার মাথায় ছুরির ফলা ঢুকিয়ে তাকে টুকরো টুকরো করা হচ্ছে। শিখ মায়েরা চোখের সামনে তাদের বাচ্চাদের মুণ্ডচ্ছেদের নারকীয় দৃশ্য দেখছেন অসহায়ভাবে।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার! মার্চ মাসে শিখেদের ওপর অমন অমানুষিক নিগ্রহের পরেও ওরা কেমন যেন নির্বিকার হয়ে রইল। ব্যাপারটা অনেকেরই চোখে

---

* শিখেদের প্রাযুক্তিক কুশলতার কথা আমরা জানি। এর মান এত উন্নত যে অবাক হবার মতন। যে কোন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের জটিল কারিগরি বিদ্যা তারা অনায়াসে আয়ত্ত করতে পারে। ট্রাক বা মোটরগাড়ির যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে তারা এত অভিজ্ঞ যে ভারতবর্ষের এমন কোন শহর নেই যেখানে ট্রাক বা ট্যাক্সির চালক শিখ নয়। এটা প্রায় গল্পকথার সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে যে শিখেদের মতন যোগ্য গাড়িচালক আর কোন প্রদেশের অধিবাসী হতে পারে না।

www.pathagar.com

পড়েছিল তখন। অনেকেই মুখটিপে হেসেছিল। সবাই ধরে নিয়েছিল যে শিখেরা আর যোদ্ধজাতি নেই। দুটো পয়সার মুখ দেখে ওরা বাবু হয়ে গেছে। এখন দিব্যি আপস করতে শিখেছে ওরা।

কিন্তু ওদের স্তব্ধতার ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছিল সেদিন। এটা যে নৈরাশ্য বা ক্লীবত্ব নয়, রাজনীতির এই প্রাথমিক পাঠটুকু বোধহয় অগোচর ছিল দিল্লি বা মুসলিম লীগের নেতাদের। সুতরাং আগুন পাহাড়ের চূড়ায় তাঁরা বেশ স্বচ্ছন্দেই পিকনিক করতে বসে গেলেন। মার্চ এপ্রিল নির্বিঘ্নে কেটে গেল। মে মাসেও কোন ঘটনা ঘটলো না। জুনের প্রথম দিকেই ভারত ভাগের ফয়সালা হয়ে গেল। দিল্লিতে বসে নেতারা যখন চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করছেন তখন সুদূর লাহোরের একটা হোটেলে গোপন মন্ত্রণাসভার কথা ঘুণাক্ষরেও কেউ টের পায় নি। হোটেলের সেই গোপন সভায় যে শিখ যুবকটির কণ্ঠস্বর সবচেয়ে উদ্ধত ছিল তাঁকে আমরা চিনি। একদিন এই ছেলেটিই তার কৃপাণ দিয়ে মুসলিম লীগের পতাকাটা কুচিকুচি করেছিল। মার্চ মাসের সেই ঘটনার আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল সারা পাঞ্জাবে এবং তারই আগুনে মরেছিল শিখেরা।

এই যুবকের নাম তারা সিং। মাস্টার তারা সিং নামেই তিনি শিখেদের মধ্যে পরিচিত। সেই দাঙ্গার সময় তাঁর পরিবারের অনেকেই খুন হয়েছে। তারা সিং ভোলেন নি সে কথা। তাই ক্রোধী এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ কণ্ঠস্বর ক্ষণে ক্ষণে সবাইকে সেদিন যেন উন্মত্ত করে দিয়েছিল। শিখজাতির উদ্দেশে তাঁর সেই আহ্বান সেদিন যে বিফল হয় নি, ইতিহাসই তার প্রমাণ। হোটেলের সেই ঘরখানা তখন গমগম করছে তারা সিংয়ের কণ্ঠস্বরে। 'হে আমার শিখ ভাইরা! জাপানী এবং নাৎসীদের মতন কোরবানির জন্যে তোমরা তৈরি হও। ওরা আমাদের জন্মভূমি কেড়ে নেবার ফন্দি করছে। আমাদের মায়েদের অপমান করার মতলব করেছে। তোমরা জেগে ওঠ এবং নির্বিচারে মুসলমান আততায়ীদের হত্যা কর। মাতৃভূমি রক্ত চাইছেন। মায়ের তেষ্টা মেটাও নিজেদের রক্ত দিয়ে আর শত্রুর রক্ত নিয়ে।'

নয়া দিল্লিতে তখন প্রায় প্রতিদিনই একটা না একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছিল। এদের চাপে বড়লাট ও তাঁর সচিবালয়ের কর্মচারীরা তখন হিমশিম খাচ্ছেন। আর সমস্যাও ত একটা বা একরকম নয়! ইতিমধ্যেই হাজার হাজার ব্রিটিশ কর্মচারী চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। তাঁরা কেউ স্বাধীন ভারতে কাজ করতে চান না। সুতরাং তাঁদের অবসরকালীন ভাতা দেবার প্রশ্নটা যেমন সমাধান করা দরকার, তেমনি সমাধান করা দরকার, যাঁরা পাকিস্তান বা ভারতের দিশি সরকারের অধীনে কাজ করতে চান তাঁদের সমস্যাটা।

মাউন্টব্যাটেনের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ মন্ত্রীদের অবস্থাও তথৈবচ। কোন কিছুরই কুলকিনারা করতে পারছেন না। সদাই শঙ্কিত হয়ে আছেন এই বুঝি সরকার ভেঙে যায়। অন্তত ১৫ আগস্ট পর্যন্ত যেমন তেমন ভাবেও এই ইনটারিম সরকার টিকিয়ে রাখতে উঠে পড়ে লেগেছেন মাউন্টব্যাটেন। নতুন নতুন রাজনৈতিক কৌশলের আশ্রয় নিয়ে ঠেকা দিচ্ছেন। কংগ্রেসের দাবি মেনে নিয়ে যেমন সব বিভাগেই তাদের মন্ত্রিত্ব দিয়েছেন, তেমনি নৈবেদ্যর চূড়ায় বাতাসার মতন প্রত্যেক কংগ্রেসী মন্ত্রীর ঘাড়ের উপর একজন মুসলিম লীগ প্রতিনিধি

www.pathagar.com

বসিয়ে দিয়েছেন। ওরাই খবরদারি করবে মন্ত্রীমশাইয়ের কাজের, যাতে পাকিস্তানের স্বার্থবিরোধী কোন কাজ তিনি করতে না পারেন। স্যার রবার্ট লক্‌হার্ট নামে একজন ব্রিটিশ জেনারেলকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের গণভোট তত্ত্বাবধানের কাজে নিযুক্ত করেছেন মাউন্টব্যাটেন। ওখানকার মানুষই স্থির করবে ভারত না পাকিস্তান কোন পক্ষে তারা যোগদান করবে। অবশ্য কংগ্রেস দাবি করেছিল যে ওদের স্বাধীন থাকার অধিকার দেওয়া হ'ক। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন সে দাবি মানেন নি, কারণ ইতিমধ্যেই কংগ্রেসের চাপে বাংলাকে স্বাধীন থাকার রাজনৈতিক অভিলাষ পূরণ করতে দেওয়া হয় নি।

তখন সবচেয়ে অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল স্বাধীনতার দিনটি নিয়ে। তড়িঘড়ি দিনক্ষণ স্থির করে ১৫ আগস্টের সিদ্ধান্তটা একটা আবেগের বশে করে ফেলেছেন মাউন্টব্যাটেন। অবশ্য জ্যোতিষীরা দলবেঁধে একটা ঐকমত্যে পৌঁছেছেন ইতিমধ্যে। ১৫ আগস্ট দিনটা যাত্রা শুরুর পক্ষে অশুভ হলেও ১৪ আগস্ট দিনটা তেমন নাকি 'অলক্ষুনে' নয়। ওদের এই ঐকমত্য সিদ্ধান্তে মাউন্টব্যাটেন অনেকটা স্বস্তি পেয়েছেন। তিনি স্থির করলেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য রুষ্ট গ্রহনক্ষত্রের তুষ্টিসাধন করতে কংগ্রেসী নেতাদের এই বিপুল আগ্রহ তিনি মেনে নেবেন এবং ১৪ আগস্টের মধ্যরাত্রে ভারত ও পাকিস্তানকে স্বাধীন স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যরূপে ঘোষণা করবেন।*

৩০ বছর ধরে হাতে বোনা খাদির এই ত্রিবর্ণ পতাকাটিই এযাবৎ রাজনৈতিক সভা-সমিতি ও মিছিলে ইউনিয়ন জ্যাকের বদলে ভারতের আকাশে উড্ডীন হয়েছে এবং মানুষের স্বাধীন হবার সাধ মিটিয়েছে। জঙ্গি কংগ্রেসের পতাকারূপে গান্ধীজী নিজেই একদিন এর পরিকল্পনা করেছিলেন। গেরুয়া, সাদা ও সবুজ এই তিন রঙের সমান্তরাল পটির ঠিক মাঝামাঝি স্থাপন করেছিলেন তাঁর নিজস্ব প্রতীক, চরকা। সেদিন তাঁর মনে হয়েছিল যে ভারতবর্ষের দীন-দরিদ্র ও মূক মানুষের যথার্থ মুক্তির হাতিয়ার হবে এই নিরীহ অহিংস যন্ত্রটি।

কিন্তু স্বাধীনতা যখন ভারতের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে তখনই কংগ্রেস দলের একাংশের প্রতিবাদ আছড়ে পড়লো দলের মধ্যে। তারা সংশয় ব্যক্ত করলো, যে নিশানটি জাতীয় পতাকার মর্যাদা পেতে চলেছে তার মধ্যস্থলে 'গান্ধীজীর খেলনাটি' অবস্থিত হবার যোগ্যতা পায় নি। কংগ্রেস দলের মধ্যে এই জঙ্গি মনোভাবসম্পন্ন তরুণ সভ্যের সংখ্যা তখন ক্রমেই বাড়ছে। তাদের অভিমত হ'ল যে চরকা হ'ল অতীতপ্রিয়তার নিদর্শন। মেয়েদের ব্যবহারের এই বস্তুটি প্রাচীন ভারতের নিদর্শন এবং প্রগতির দিক থেকে সে মুখ ঘুরিয়ে নিজের মধ্যে গুটিয়ে

---

* সাংবাদিক সম্মেলন শেষ করেই মাউন্টব্যাটেন স্টাফ মিটিং করতে ফিরে এসেছেন। কিন্তু মিটিংয়ে বসে পরম কৌতুকের সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করলেন যে অমন মর্যাদাসম্পন্ন জ্যোতিষীসভার মতামতের কোন প্রভাবই তাঁর কর্মচারীদের ওপর পড়েনি। ব্যাপারটা তাঁর কাছে বেশ মজাদার মনে হল যেন। তাই, 'আশু সমাধান' হওয়া উচিত মনে করলেন তিনি। যোগ্যতম প্রেস্ এ্যাটাশে এ্যালান ক্যাম্পবেল জনসনকে ডেকে তার ওপর একটা অতিরিক্ত দায়িত্ব দিলেন। তাঁকে বড়লাটের জ্যোতিষী নিযুক্ত করলেন মাউন্টব্যাটেন।

www.pathagar.com

যাচ্ছে ক্রমশ। সুতরাং এর বদল হওয়া দরকার।

এদেরই পীড়াপীড়িতে ত্রিবর্ণ পতাকার ঠিক মধ্যিখানে সন্নিবিষ্ট হ'ল একটি চক্র। এটি বীর সম্রাট অশোকের দিগ্বিজয়ের প্রতীক, যিনি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেছিলেন। বীর সম্রাট অশোক তাঁর দিগ্বিজয়ী সেনাবাহিনীর বর্মের গায়ে এটি স্থাপন করেছিলেন। শৌর্যবীর্যের প্রতীক এক জোড়া সিংহ হ'ল সম্রাট অশোকের শক্তি ও পরাক্রমের অহঙ্কারী নিদর্শন। এই-ই তাঁর ধর্মচক্র যা জগৎ সংসারের গতিময়তার প্রতীক এবং নতুন ভরতের প্রগতির চিহ্নস্বরূপ। এটিই সেদিন গৃহীত হয়েছিল।

গান্ধীজী যখন তাঁর তরুণ অনুগামীদের এই সিদ্ধান্তের কথা শুনলেন, তখন দারুণ মনোবেদনা পেয়ে তিনি লিখেছিলেন,'এর শিল্পকলা যত উৎকৃষ্টই হ'ক না কেন, যে পতাকা এমন দাম্ভিকভাব প্রচার করে তাকে আমি জাতীয় পতাকার মর্যাদা দেব না।'

হতাশ হবার ঘটনা শুধু একটাই নয়। দুঃখের ফসল থেকে একে একে আরও ঘটনা প্রকাশ হতে লাগলো যা এই বৃদ্ধ নেতার জন্যে অপেক্ষা করেছিল। শুধু যে তাঁর প্রিয় মাতৃভূমি দ্বিখণ্ডিত হ'ল তা নয়, মনের মাধুরী মিশিয়ে তিনি যে ভারত তৈরির স্বপ্ন দেখেছিলেন, যার জন্যে দীর্ঘকাল আপসহীন লড়াই করলেন, তার সঙ্গে এই খণ্ডিত ভারতের যেন কোনই মিল নেই।

গান্ধীজী স্বপ্ন দেখতেন যে তাঁর হাতে গড়া আধুনিক ভারত সমগ্র এশিয়াকে এক আদর্শ সমাজের দৃষ্টান্ত দেখাবে। কিন্তু কী তাঁর সমাজাদর্শ? যারা জানতো না তারা সমালোচনা করে বলতো, এসব গান্ধীজীর খামখেয়ালিপনা। বুড়ো মানুষের ভীমরতি, অবসেশন কিন্তু যারা তাঁর অনুগামী তারা জানতো যে হিতাহিত, জ্ঞানহীন এই উন্মাদ পৃথিবীর মোহের মধ্যে ডুবে যাওয়া মানুষকে বৃহত্তর মানবিক উত্তরণে পৌঁছে দিতে একজন প্রকৃত স্থিতধী মানুষের পাঠানো জীবনতরী হ'ল তাঁর এই আদর্শ।

যারা বলতো যে স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে যদি পশ্চিমের অনুকরণে শিল্পোন্নত প্রাযুক্তিক সমাজ গড়ে তোলা হয়, তাদের যুক্তির বিরোধিতা করতেন গান্ধীজী। তিনি বলতেন যে ভারতের যথার্থ মুক্তি হবে যদি বিগত 'পঞ্চাশ বছরে যা কিছু সে শিখেছে সেগুলি সে ভুলে যায়।' এটাই হ'ক দেশের শিক্ষা। পাশ্চাত্য যে আদর্শগুলো তখন ভারতের মাটিতে শিকড় গেড়ে বসেছে, তাদের প্রায় সবগুলির দিকেই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছিলেন গান্ধীজী। তিনি বলেছিলেন যে বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের মূল্যবোধ নিয়ন্ত্রণ করা যায় না এবং প্রযুক্তিবিদ্যা কখনও সমাজাদর্শ গড়তে পারে না। আরও বলেছিলেন যে সভ্যতার বিকাশের অর্থ এই নয় যে মানুষের অপরিমিত চাহিদার যোগান দেবে এই সভ্যতা। প্রকৃত সভ্যতা মানুষের অভাববোধ সংযত করবে, যাতে অপরিহার্য বস্তুগুলো সবাই মিলে ভোগ করতে পারে।

তিনি জানতেন যে তাঁর অনেক অনুগামীই পশ্চিমের এই উন্নত, প্রাযুক্তিক সমাজের আড়ম্বর দেখে মুগ্ধ। কিন্তু ওরা জানে না যে, এর ফলে কিছু মুষ্টিমেয় মানুষের হাতেই ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হয়েছে। ওদেশের গরিব মানুষের কাছে এই উন্নয়ন নিয়ে এখন সংশয় দেখা দিয়েছে। আর, যে সব অশ্বেতকায় দেশগুলি

www.pathagar.com

সম্পূর্ণ অনুন্নত, সেখানকার মানুষের কাছে এই শিল্পোন্নয়ন একটা ভয়াবহ অভিশাপ যেন।

গান্ধীজী যে সমৃদ্ধ ভারতের স্বপ্ন দেখতেন তার সমৃদ্ধির ভিত্তি ছিল ভারতের গ্রামগুলির উন্নয়ন। এদের বৈচিত্র্য আর বহুবর্ণময়তার মধ্যেই আসল ভারতবর্ষ লুকিয়ে আছে। গান্ধীজীর সেই ভারতবর্ষই চিনতেন এবং ভালবাসতেন। সেখানে আধুনিক প্রযুক্তির দাগ পড়েনি ; সেখানে দিনরাত্রির আবর্তন হয় সম্বৎসরের পূজাপার্বণ আর ধর্মোৎসবের মধ্যে ; সেখানে খরা আছে, অজন্মা আছে, আছে শতাব্দী প্রাচীন করাল দুর্ভিক্ষ, আকাল। তিনি চাইতেন যে প্রতিটি গ্রাম স্বাবলম্বী হয়ে উঠুক। তারা নিজেরাই উৎপন্ন করুক জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী। খাদ্যবস্তু, পরবার কাপড়, দুধ, আনাজপাতি। তরুণদের যথার্থ শিক্ষিত করুক যাতে তারা নিজেরাই দুরবস্থার অবসান ঘটাতে পারে। গান্ধীজী সবাইকে শুনিয়ে একদা যা বলেছিলেন এখনও তার প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই। তিনি বলেছিলেন, 'এশিয়া মহাদেশের অনেক বীভৎস যুদ্ধই এক বাটি বেশি ভাতের সংস্থান করে ঠেকানো যেতে পারতো।' তাই ভারতবর্ষের ক্ষুধার্ত চাষীর জন্যে তিনি সুসম খাদ্যবস্তুর পরিকল্পনা করেছিলেন সয়াবীন, মটরদানা আর আমের শাঁস দিয়ে। বি ভিটামিন সমৃদ্ধ খোসা ছাড়া কলে ছাঁটা চাল ব্যবহারের বিরুদ্ধে তিনি নিয়ত সাবধানবাণী শোনাতেন।

তিনি চেয়েছিলেন যে ভারতের কাপড়ের কলগুলি বন্ধ করে দেওয়া হ'ক এবং সেখানে তাঁত বসানো হ'ক। এর ফলে গ্রামের যুবকদের গ্রামের মধ্যেই কর্মসংস্থান হবে। গ্রামের জনসংখ্যা শহরাভিমুখী হবে না। তিনি যে অর্থনৈতিক ইস্তাহার প্রচার করেছিলেন তার আদর্শ ছিল সরল জীবনযাপনে ফিরে যাওয়া। কারণ সেখানেই আমাদের যথার্থ কল্যাণ ও বোধি। তাই হল, লাঙল ও চরকা ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছিলেন গান্ধীজী। তিনি বলেছিলেন যে, যদি তেমন একটি ট্র্যাকটর কখনও তৈরি হয় যা থেকে ঘি, দুধ ও গোবর পাওয়া যাবে, তবে অবশ্যই সেই যন্ত্রটি গরুর বদলে চাষীকে ব্যবহার করতে বলবেন।

তাঁর আশংকা ছিল যে সমাজ যদি যন্ত্রশাসিত হয় তবে গ্রামের মানুষের সমূহ সর্বনাশ হবে। তার শ্রুতি বধির হবে, দৃষ্টি আচ্ছন্ন হবে, চৈতন্য অমনস্ক হবে। এক দুর্বার লোভের টানে চোখে ঠুলি পরানো গ্রামের মানুষ তার নির্ভরতার আশ্রয় থেকে উৎখাত হয়ে ছুটে আসবে শহরের কলুষ-মলিন পরিবেশে। তখন সে পারিবারিক বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, তার ধর্মবোধ উৎসন্নে যাবে। তখন তার জীবনযাপন হয়ে উঠবে দুর্ভার, অসুখী। যে বস্তু জীবনধারণের জন্যে অপরিহার্য নয় তাদের সংগ্রহই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠবে তখন।

তবে কি সীমাহীন দারিদ্র আর বুভুক্ষাই সমাজের লক্ষ্য হবে ? এইরকম একটা অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায় তাঁর বিরুদ্ধে। কিন্তু অভিযোগটা ভিত্তিহীন, কারণ মানুষের চরম দৈন্যাবস্থা, ও তার দারিদ্র্যই যে নৈতিক স্খলনের কারণ এ কথাও তিনিই বলেছেন। বস্তুত মানুষের এই ভ্রষ্ট অবস্থা তিনি ঘৃণা করতেন। তিনি বলতেন যে শুধু চরম অভাবই নয়, সীমাহীন ভোগবাসনার মধ্যেও মানুষের নৈতিক স্খলনের বীজ নিহিত থাকে। রেফ্রিজারেটর ভর্তি খাবারদাবার, আলমারি ভরা পরিধেয়, মোটরগাড়ি, রেডিও, টিভির বহুল ও উচ্ছৃংখল ব্যবহারও মানসিক ভাবে মানুষকে পঙ্গু করে দেয়। তিনি চেয়েছিলেন, যেমন বিকৃত দারিদ্র্য নয় তেমনি

www.pathagar.com

অশাসিত ভোগবিলাসিতাও নয়। মানুষ যেন ভোগ ও দারিদ্র্যের মাঝামাঝি একটা ভারসাম্য খুঁজে নেয় এবং বজায় রাখে।

মানুষকে তিনি এমন শ্রেণীহীন সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যেখানে সকলের সমানাধিকার সাব্যস্ত আছে। কারণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকেই হিংসা ও নিষ্ঠুরতার জন্ম হয়। তিনি মনে করতেন যে সম্পত্তির মালিকানা নয়, কায়িক শ্রমের বিচারেই ভোটদানের অধিকার সাব্যস্ত হওয়া উচিত। শারীরিক অথবা বুদ্ধিবৃত্তিঘটিত যে কোন শ্রমের পারিশ্রমিক সমান হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভোট দানের অধিকার পেতে হলে সবাইকে কায়িক শ্রম দান করতে হবে। এই শ্রমদান থেকে কোন জীবিকার মানুষই অব্যাহতি পাবে না, সাধু-সন্ন্যাসীরাও নয়। বরং যে ব্যক্তি নর্দমা খনন করে তার অধিকার যত সহজ হবে, কোন কোটিপতি ধনী বা বুদ্ধিজীবীকে সেই অধিকার অর্জন করতে হবে কায়িক শ্রম দান করে।

নেতারা তাঁদের অনুগামীদের কাছে কেমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন সেটিই সব-চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি যখন বড়লাটবাহাদুরকে প্রাসাদ ছেড়ে একটা ছোট বাংলোয় যাবার পরামর্শ দেন, তখন সেটি কোন কথার ঘটা ছিল না। গান্ধীজী মনে করতেন যে বিশেষাধিকার খর্ব করার প্রথম সোপান হ'ল স্বত্ব ত্যাগ করার অনুশীলন করা।

বস্তুত, তাঁর শতাব্দীতে অন্য কোন মহান সমাজবিপ্লবী ও যুগনায়ক যেমন, লেনিন, স্তালিন বা মাও তাঁদের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জীবনযাপন করতেন না।*

তবে গান্ধীজীর আদর্শ ও আচরণের মধ্যেও অসংগতির তীব্র ঝাঁঝ ছিল। তিনি যন্ত্রের দাপটের নিন্দা করতেন বটে, তবে হাতে ধরা ছোট্ট মাইক্রোফন যন্ত্রটির সাহায্যেই প্রার্থনা সভায় অনুগামীদের কাছে তাঁর উপদেশ পৌঁছে দিতেন। তার প্রথম আশ্রমের পরিচালনার জন্যে যে ব্যয়াদি হ'ত তার সমুদায় ব্যয়ভার (বাৎসরিক পঞ্চাশ হাজার টাকা) যিনি বহন করতেন সেই জি.ডি. বিড়লা হলেন একজন প্রথমশ্রেণীর শিল্পপতি যাঁর তৈরি কাপড়কলগুলি গান্ধীজীর চোখের ওপর মূর্তিমান দুঃস্বপ্ন ছিল বলে কল্পনা করা যায়।

এদিকে স্বাধীনতার দিন যত ঘনিয়ে আসতে লাগলো ততই যেন গান্ধীজী জিদ করে তাঁর ভাবনাচিন্তাগুলো আঁকড়ে ধরে রাখতে শুরু করলেন। ব্যাপারটা নেহরুর মতন বিবর্তনবাদী সোশ্যালিস্ট (ফেবিয়ান সোশ্যালিস্ট) কিংবা প্যাটেলের মতন ধনীর কাছে রীতিমত অস্বস্তিকর হয়ে উঠলো। এঁরা উভয়েই শিল্পযোজনার মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের কথা ভাবতেন। পশ্চিম থেকে আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং প্রযুক্তি আমদানি করে পাঁচশালা পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশময় বড় বড় কলকারখানা

---

* গান্ধীজী এবং মার্কসবাদী নেতৃবৃন্দের মধ্যে পারস্পরিক কোন দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক নেই। অধিকাংশ মার্কসবাদীরা মনে করেন যে গান্ধীনীতি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। অন্যদিকে গান্ধীজীর দৃষ্টিতে কমিউনিজ্‌ম্ বা সাম্যবাদ তার উগ্র নিরীশ্বরবাদী ঝোঁক বা অন্তর্নিহিত চণ্ডপ্রকৃতির জন্যে অভিশাপ-তুল্য। গান্ধীজী মনে করতেন যে অধিকাংশ সোশ্যালিস্টই আরামকেদারায় বসা বিপ্লবী (আর্মচেয়ার সোশ্যালিস্টস্) যাঁরা তাঁদের কোট ছাড়তে চান না বা জীবনযাপনের ধারাটি বদলাতে চান না। এমনকি সোশ্যালিস্ট নির্বাণ বা মুক্তির জন্যে যখন তাঁরা হাহুতাশ করেন, তখনও ছোটখাট দু-একটা আরাম স্বাচ্ছন্দ্যের অভ্যাস ছাঁটবাদ দেন না।

www.pathagar.com

এবং শিল্পনগরী তৈরি করতে চেয়েছিলেন এ'রা। এমনকি গান্ধীজীর মানসপুত্র নেহরুও তখন লিখেছিলেন যে গান্ধীজীর চিন্তা অনুসরণ করতে হলে অতীতের দিকে পিছু হাঁটতে হবে এবং গ্রামগুলির নিরঙ্কুশ আধিপত্যাধীন হয়ে থাকতে হবে ভারতকে। উপরন্তু আরও একটি মানসিক উদ্বেগ দেখা দিল। গান্ধীজী গোঁ ধরলেন যে ভারতের নেতাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা পরিচালিত হবে তাঁর পরিকল্পিত নীতি মেনে এবং সেগুলি ঘোষণা করে দেশের মানুষকে জানিয়ে দিতে হবে।

নেতাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের যে মানদন্ড তিনি তৈরি করেছিলেন সেগুলি সহজ, সরল কিন্তু দুঃসাধ্য। তিনি বলেছিলেন যে প্রত্যেক মন্ত্রীকে খাদির পোশাক পরতে হবে। তাদের বাস করতে হবে সাধারণ বাংলোয়। তাদের ব্যক্তিগত সেবক, ভৃত্য থাকবে না, নিজস্ব ব্যবহারের গাড়ি থাকবে না। তাদের মন থেকে জাতপাতের বিদ্বেষবিষ নাশ করতে হবে। প্রতিদিন অন্তত এক ঘণ্টা তাঁত বয়ন অথবা খেত-চাষের কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে। বিদেশ থেকে আমদানি করা বিলাসী আসবাবাদি যেমন সোফা এবং টেবিল ও চেয়ার ইত্যাদি ব্যবহার করা চলবে না। নিরাপত্তার জন্যে তারা কোন দেহরক্ষী নিয়োগ করবে না। মোট কথা, গান্ধীজী ধরে নিয়ে-ছিলেন যে, স্বাধীন ভারতের কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ নিজের হাতে করবেন। এমনকি তাঁর স্নান পায়খানার ঘরটি নিজের হাতে পরিষ্কার করতেও কুণ্ঠাবোধ করবেন না।

গান্ধীজীর এই সরল অথচ প্রশ্নাতীতভাবে প্রজ্ঞাঋদ্ধ নির্দেশাবলীর মধ্যেই যেন গান্ধীভাবনার সংকটটি প্রকাশ হয়ে পড়ে। আসলে গান্ধীদর্শন এক পূর্ণাঙ্গ দর্শন। অথচ যে ছাঁচে ফেলে এই দর্শনটির পরিপূর্ণ আকার দেবার চেষ্টা হয়েছিল সেটি ত্রুটিহীন ছিল না। তাই একটি পূর্ণাঙ্গ রচনা অপরিণত অভিনেতাদের হাতে বিষণ্ন হয়ে গেল। নতুবা তাঁর দেহাবসানের মাত্র পঁচিশ বছরের মধ্যেই ভারতের দুরূহ যে রাজনৈতিক স্খলন সেই দুর্নীতি আর উৎকোচগ্রাহিতা এমন স্থূল, প্রকট হয়ে আবিষ্ট করতো না তাঁর পথানুসারী মন্ত্রীদের।

* * *

১৯৪৭-এর জুলাই মাস। ভারতের ভবিষ্যৎ নিয়ে গান্ধীজীর দুর্ভাবনার যেন শেষ নেই। সারা উপ-মহাদেশ পীড়িত করেছে যে ভয়ংকর দাঙ্গা তারই চিন্তায় দিনের পর দিন তাঁর কাটছে। ক'দিন ধরেই তাই ক্রমাগত জিদ করছেন, পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে আসা হিন্দু আর শিখ উদ্বাস্তুদের দুরবস্থাটা স্বচক্ষে দেখে আসবেন নেহরুকে নিয়ে। অবশেষে সেই ব্যবস্থাই হ'ল।

মুখোমুখি সাক্ষাৎটা স্তম্ভিত করে দিল গান্ধীজীকে। ওদের দেখে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেলেন তিনি। বত্রিশ হাজার মানুষ দিল্লি থেকে ১২০ মাইল দূরে একটা বন্ধ্যা খোলা মাঠে হা হা করা ধুলোট বাতাসের মধ্যে কোনরকমে মাথা গুঁজে আছে। ওদের দুরবস্থা বর্ণনা করা যায় না। কাহুতা গ্রামের যে বীভৎসতা দেখে মাউন্টব্যাটেন একদিন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, সেইরকম একশ'টা কাহুতা গ্রামের বীভৎসতা যেন দানা বেঁধেছে এখানে, এই প্রথম উদ্বাস্তু শিবিরে।

মানুষগুলো সবাই তখন ওঁদের গাড়িটা ঘিরে দাঁড়িয়ে মনের হতাশা জানাচ্ছিল। কেউ রাগ করে চিৎকার করছে। কেউ হাউমাউ করে কাঁদছে, মাথা চাপড়ে বিলাপ করছে। ওদের অপার দুঃখসাগরে একমাত্র দ্বীপভূমি যেন এই গাড়িখানা। গাড়ির আরোহীরাই ওদের রাগদুঃখ প্রকাশের একমাত্র লক্ষ্য। কেউ ক্ষোভ দেখাচ্ছে

www.pathagar.com

হাত মুখের নানা ভঙ্গি করে। ওদের কালো কালো মুখগুলো রাগ আর ঘৃণায় শক্ত হয়ে গেছে। কেউ কেঁদে আকুল হয়ে একটু সমবেদনা, মুখের একটা ভাল কথা যাচ্ঞা করছে। ভিক্ষা চাইছে একটু কৃপা আর দাক্ষিণ্য। দাঙ্গায় আহত মানুষগুলোর গায়ে এখনো দগদগ করছে ক্ষতস্থান। খোলা ঘায়ের ওপর ভনভন করছে কালো কালো মাছির দল। হাত দিয়ে ক্রমাগত তাড়াচ্ছে ওরা আর কৃপা চাইছে। দূর থেকে গাড়িখানা দেখেই ছুটতে ছুটতে এসেছে শ'য়ে শ'য়ে মানুষ। ওদের পায়ের চাপে পাউডারের মতন মিহি ধুলোয় ভরে গেছে ওদের গলা, নাক, মুখ। চারপাশে ঘিরে রাখা এতগুলো মানুষের গায়ের ঘাম, গন্ধ আর নিশ্বাস যেন শক্ত দেওয়ালের মতন চেপে ধরেছে গান্ধীজী আর নেহরুকে।

সারা দিনটাই ওদের সঙ্গে রইলেন গান্ধীজী। অব্যবস্থাগুলো দূর করতে ওদের সঙ্গেই হাতে হাতে কাজ করলেন। অন্তত বাসোপযোগী করতে যেটুকু সংস্কার করা দরকার সেইটুকু। ওদের দিয়েই ড্রেন কাটালেন। স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে দু-একটা উপদেশ দিলেন। সেবা শুশ্রূষার জন্যে একটা ঘরকে ডিসপেন্-সারী করার ব্যবস্থা করলেন। যতটা পারলেন নিজের হাতে অসুস্থদের সেবা করলেন। মোটকথা সারা দিনটাই ওদের সঙ্গে থেকে কিছুটা মানসিক তৃপ্তি কুড়িয়ে নিলেন গান্ধীজী। তারপর সন্ধ্যের মুখে যাত্রা করলেন দিল্লির দিকে।

সাতাত্তর বছরের বুড়ো মানুষটির সারাদিন অনেক ধকল গেছে শরীরে। তবুও, মানুষের এত কষ্ট নিজের চোখে না দেখলে উপলব্ধি হ'ত না তাঁর। কিন্তু কি করে ওদের এই কষ্টের উপশম করবেন ? দুশ্চিন্তা আর ক্লান্তিতে অবসন্ন শরীরটা গাড়ির পিছনের সীটে টানটান করে ছড়িয়ে দিয়েছেন গান্ধীজী। জানলার দিকে চুপ করে বসে থাকা নেহরুর কোলের ওপর রাখা তাঁর গ্রন্থিল দুখানি পা। গাড়ি চলছে। ঝিরঝির করে ঠাণ্ডা মিষ্টি হাওয়া গায়ে এসে লাগছে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন বৃদ্ধ মানুষটি টের পাননি নেহরু। কোলের ওপর পা দুখানা যত্ন করে নিয়ে বসে আছেন নেহরু। মনে পড়ে গেল ঠিক দুমাস আগের কথা। সেদিন এই মানুষটির দিক থেকেই অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন তিনি।

ঘুমন্ত গান্ধীজীর পা দুখানা কোলের ওপর নিয়ে সামনের দিকে চেয়ে আছেন নেহরু। মুখের ওপর আঁটা আছে সেই ছদ্ম অনুভূতির ভাবটি। এটাই ওঁর মুখোশ। চুপ করে সামনের দিকে চেয়ে আছেন তিনি। কোন কথা বলছেন না। খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল তাঁকে। হয়ত ভাবছিলেন যে ছবিটি একটু আগে দেখেছেন সেটাই ভারতের ভবিষ্যাভাস। এই অবস্থার মধ্যেই রাষ্ট্রের দায়িত্বভার নিতে চলেছেন তিনি।

মোটরগাড়ি ছুটছে। দিগন্তে সূর্য অস্ত গেল। ধীরে ধীরে আঁধার ঘনিয়ে আসবে এবার। গান্ধীজী ততক্ষণে জেগে উঠেছেন। গাড়ির দুপাশ দিয়ে উল্টো মুখে সরে সরে চলেছে ধান গমের ক্ষেত। হাতের চেটোর মতন সমতল ওই ক্ষেতের ওপাশে দিঙ্মণ্ডল। ওখানে যেন আকাশ ও মাটি একসঙ্গে মিশেছে। মনে হয় ওখানেই সমতল পৃথিবীর বুঝি শেষ। একটা মনোরম, রহস্যময় অস্পষ্টতা ছড়িয়ে আছে বিশাল প্রান্তর জুড়ে। এই কুহেলিকার আবরণ ভেদ করে চুঁইয়ে পড়ছে অস্তগত সূর্যের শেষ রক্তিম রশ্মি। এখন গোধূলি। গরুর পাল ধুলো উড়িয়ে ঘরে ফিরছে। সায়ংকালের এই ম্লান মুহূর্তটি যেন সুপ্রাচীন এই দেশটির মতন যা কখনও ভোলা যায় না। হাজার হাজার মাটির ঘরের আড়াল

www.pathagar.com

থেকে পাক দিয়ে উঠছে রসুইয়ের ধোঁয়া এবং পাঞ্জাবের বিস্তীর্ণ সমতল প্রান্তর আবৃত করছে। এই ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক। এই সময়টাতেই বাড়ির মেয়েরা কোল-কুঁজো হয়ে মাটির ওপর থেবড়ে বসে এবং চানে চাপাটি পাকায়। ওদের কাঁধের ওপর ফেলা থাকে রঙ ওঠা আঁচল। ওদের খোলা হাতে চুড়ির রিনঝিন শব্দ হয়। পবিত্র গাভীকুলের শেষ দান এই জ্বালানি ঘুঁটের আগুনে ওদের মুখগুলো লাল দেখায়। ধোঁয়ায় ঢেকে যায় সন্ধ্যার আকাশ। একটা তীব্র কটু গোবর পোড়া ধোঁয়ায় সুস্পষ্ট হয় ভারত মায়ের গায়ের গন্ধ।

হঠাৎ গাড়ি থামাতে ইঙ্গিত করলেন গান্ধীজী। বাইরে অন্ধকার জড়ো হচ্ছে। এখন তাঁর প্রার্থনায় সময়। গাড়ির দরজা খুলে রাস্তার ধারে আসনপিঁড়ি হয়ে বসলেন তিনি। বিষণ্ন নিম অশথ গাছের ছায়ায় ঢাকা তাঁর ঝুঁকে পড়া শীর্ণ বাঁকা চেহারাটা যেন ওই বিস্তীর্ণ প্রান্তরের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে। গাড়ির পেছনের আসনে স্তব্ধ নেহরু চোখে আঙুল চেপে স্থির হয়ে বসে আছেন। বৃদ্ধ গান্ধীজী তখন কাঁপা গলায় ভগবদ্‌গীতার স্তোত্র আবৃত্তি করছিলেন। একজন বুকভাঙা মানুষের সেই কাতর প্রার্থনা শুনতে পেলেন নেহরু। অমঙ্গলের যে ছায়া গান্ধীজী দেখেছেন তার করাল গ্রাস থেকে ভারতকে মুক্তি দেবার প্রার্থনা করছিলেন গান্ধীজী।

www.pathagar.com

'আমরা চিরকাল সহোদর হয়ে থাকবো'

লণ্ডন, জুলাই ১৯৪৭

আবলুস কাঠের কালো দণ্ডটা (স্টেভ্) সুপ্রাচীন পরিষদ ভবনের মেঝের ওপর ঠুকে কোন সরকারী বিলের উদ্বোধন করার এই প্রথাটা ব্রিটিশ পরিষদীয় গণতন্ত্রের একটা সুপ্রাচীন অনুষ্ঠান। শতাব্দী প্রাচীন এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্রধান প্রদর্শক বা জেন্টল্ম্যান অসার (Gentleman Usher) হলেন মহামান্য সম্রাটের মহান রাজপ্রতিনিধি। তিনিই হাতে করে কালো দণ্ডটি (ব্ল্যাক রড) পরিষদ ভবনে সগৌরবে বয়ে আনেন। তাঁরই নির্দেশে কমন্স্ সভার এক প্রতিনিধিদল লর্ডস সভায় উপস্থিত হয়ে সরকারী বিলের ওপর রয়্যাল এসেন্ট বা রাজানুমোদনের অনুষ্ঠানটি দেখতে আসেন। এইভাবেই যুগ যুগ ধরে যে কোন সরকারী বিল রাজানুমোদন পেয়ে আইনে পরিণত হয়। সেদিনও এর ব্যতিক্রম হ'ল না, যদিও মনে হ'ল যে কালো দণ্ডটি মেঝের ওপর ঠুকে জেনটলম্যান অসার যেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মৃত্যুর ঘণ্টা বাজালেন। ঠিক তাই। ১৯৪৭ সনের ১৮ই জুলাই তারিখটি ব্রিটিশ পরিষদীয় গণতন্ত্রে এইভাবেই চিহ্নিত হয়ে আছে। সেদিনই চিরকালের মতন ব্রিটিশের সঙ্গে ভারতের কুটুম্বিতা শেষ হয়ে গেল। রাজানুমোদনের জন্যে অপেক্ষারত বিলটি পেশ করে ব্রিটিশ তার সাম্রাজ্য থেকে ভারতকে আলাদা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করলো।

ব্রিটেন যখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শীর্ষে পৌঁছয় তখন অত ঘটা করে দেশশাসন করতে হয়নি তাকে। দুনিয়ার যে কোন উপদ্রুত অঞ্চলে হয় একটা ছোট কামানবাহী জাহাজ পাঠিয়ে বা লালকুর্তা পরা ক্ষীণ একটা সেনাবাহিনী পাঠিয়েই বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করেছে বা কোন প্রজাপীড়ক রাজাকে সিংহাসন থেকে টেনে নামিয়েছে। সে সব যদিও গল্পকথার শামিল তবুও ইতিহাস সাক্ষী দেবে যে ব্রিটিশ জাতিই বোধহয় শেষ পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যারা অন্য যে কোন শক্তির চেয়েও অনেক ভালভাবে দেশশাসন করে গেছে। অবশ্য এই গর্বটুকু ধরে রাখতে সরকারকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। অনেক সমুদ্রাভিযান, অনেক যুদ্ধজয়, অনেক প্রাণবলি এবং সরকারী ভাঁড়ার শূন্য করে টনটন পাউণ্ড বিলিয়েই এই গর্বটুকু বজায় রেখেছিল তারা। বোধহয় একটা নৈতিক কর্তব্যবোধ ওই ছোট্ট দ্বীপটির অধিবাসীদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। যেন তাদের মনে হ'ত যে 'শ্বেতকায় খ্রীশ্চানরূপে' মানুষ ও প্রকৃতির ওপর অধিকার বিস্তার করা তাদের একটা পবিত্র কর্তব্য।

সেই পবিত্র অধিকারটার ওপর যবনিকা টানতে চলেছে পরিষদের নতুন সভ্যরা। যে অনুপান দিয়ে তারা এটা করতে চলেছে নোট রাখা আছে কাজকরা একটা ছোট্ট আধারে। হলুদ সোনার ফিতায় বাঁধা আধারটা ইতিমধ্যেই রাজহস্তের ছোঁয়ায় ধন্য। আর পাঁচটা নথির সঙ্গে লম্বা টেবিলের ওপর থাক থাক করে সাজানো আছে ওই আধারের মধ্যে। লর্ডস সভার বর্তমান অধিবেশনেই এগুলি এখন পেশ করা

www.pathagar.com

হবে সভার অনুমোদনের জন্যে।

অন্য বিলগুলির সঙ্গেই আছে এই ইণ্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স বিলটা। বোধহয় আকারে এবং বিন্যাসে এটাই হ্রস্বতম। অনতিদীর্ঘ এই বিলের ভাষা সরল ও সহজ-বোধ্য। মাত্র ষোলটি টাইপ করা পাতা ও কুড়িটি ধারার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছে এর বিষয়-বস্তু। এটি রচনা করতে সময় লেগেছে মাত্র ছয় সপ্তাহ। এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি বিলের খসড়া এত কম সময়ে প্রণয়ন করার ঘটনা নজিরবিহীন। শুধু পাণ্ডুলিপি রচনা করাই নয়, ওই সময়সীমার মধ্যে সংসদের দুটি সভায় তার প্রথম পাঠ এবং সেটি নিয়ে বিতর্ক ও পরিমার্জনের কাজটাও শেষ হয়ে গেছে। বলতে কি, বিলটি নিয়ে কোনরকম উগ্র বিতর্ক বা মোটা দাগের কলহও সৃষ্টি হয় নি। সভ্যরাও শোভন, ভদ্র ও সংযত আলোচনার মধ্য দিয়ে বিলটির পাঠ সমাপ্ত করেছে। সংসদে ঐতিহাসিক এই বিলটি উত্থাপনের সময় সরকারপক্ষের নেতা ক্লিমেন্ট এ্যাটলি শুধু বলেছিলেন, 'তলোয়ারের ঘা মেরে একটা বিজিত রাষ্ট্রের মাথা নুইয়ে দেবার ঘটনা পৃথিবীতে ঢের আছে। কিন্তু স্বেচ্ছায় পরাধীন দেশের মানুষের হাতে শাসনভার তুলে দেবার নজির ইতিহাসে নেই।'

সত্যিই নেই। তাই উইনস্টন চার্চিলের মতন দাম্ভিক মানুষও বিষণ্ণ সম্মতি দিয়ে বিলটি রচনার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। বললেন, 'ভারী ছিমছাম অথচ সুরচিত।' সেদিন উইনস্টন আর একটি পরিষদীয় নিয়মবহির্ভূত কাজ করে-ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রশংসা করলেন। মাউন্টব্যাটেনকে শেষ ভাইসরয় পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেবার দরুন এ্যাটলির দূরদর্শিতার সুখ্যাতি করলেন। তবে এঁদের কারো মন্তব্যটাই বোধহয় খসড়া প্রণেতাদের শ্লাঘাবোধ উদ্দীপ্ত করেনি, যেমনটি করেছিল কমনস সভার সদস্য ভাইকাউন্ট স্যামুয়েলের একটা ঐতিহাসিক মন্তব্য। শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ নাটক থেকে একটা সময়োচিত উদ্ধৃতি দিয়ে স্যামুয়েল বলেছিলেন, 'থেন অব কউডর' সম্বন্ধে শেক্সপীয়রের মন্তব্যটাই ব্রিটিশ রাজ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হওয়া উচিত যে, "ত্যাগ না করা পর্যন্ত কোন কিছুই নিজের মতন হয় না।" (নথিং ইন হিজ লাইফ বিকেম হিম লাইক দ্য লিভিং ইট।)*

রাজপ্রতিনিধির নিমন্ত্রণ পেয়ে ক্লিমেন্ট এ্যাটলি তিরিশ জন কমনস সভায় প্রতিনিধিদল নিয়ে আজ শেষ দৃশ্যের অভিনয় দেখতে লর্ডস সভায় এসেছেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজানুমোদন পেয়ে বিলটির যাত্রাপথ শেষ হবে। একটা লম্বা টেবিলের ওপর থরে থরে সাজানো আছে আজকের অনুমোদনযোগ্য বিলগুলো। ওদের মধ্যে আছে ভারতের স্বাধীনতা বিলটাও। লর্ডস সভার এক প্রান্তে শোভা পাচ্ছে একজোড়া সিংহাসন। সোনার রঙ করা সিংহাসনের মাথার ওপর ঝুলছে বাহারি চাঁদোয়া। সিংহাসনের সামনে পশমের গদি মোড়া লর্ড হাই চ্যান্সেলরের আসন (উলস্যাক)। সম্রাটের প্রতিনিধি ক্লার্ক অব দ্য ক্রাউন বসেছেন লম্বা টেবিলের একধারে। তাঁর বিপরীত আসনে বসেছেন ক্লার্ক অব দ্য পার্লামেন্ট।

---

* ডানকানের উদ্দেশে ম্যালকমের কথাটা উদ্ধৃত হ'ল, 'Nothing in his life became him like the leaving it. He died as one that had been studied in his death to throw away the dearest thing he owed, as it were a careless trifle.' [অনুবাদক]

www.pathagar.com

ক্লার্ক অব দ্য পার্লামেন্ট হাত বাড়িয়ে জমা করা বিলগুলো থেকে প্রথম বিলটা নিলেন। তারপর ভাবগম্ভীর স্বরে বিলের বিষয়টা পড়লেন, দি সাউথ মেট্রোপলিটান গ্যাস বিল। ক্লার্ক অব দ্য ক্রাউন হেঁকে বললেন, 'Le Roi le veult।'

এইভাবেই শত শত বছর ধরে ক্লার্ক অব দি ক্রাউন প্রাচীন বিশুদ্ধ নর্মান বাগবৈশিষ্ট্যে রাজানুমোদন ঘোষণা করছেন এবং বিলগুলি কার্যকর আইনে পরিণত হচ্ছে। ক্লার্ক অব দ্য পার্লামেন্ট পরের বিলটি হাতে নিলেন। ঘোষণার পর ক্লার্ক অফ দ্য ক্রাউন জানালেন যে সম্রাট খুশি হয়ে অনুমোদন দিয়েছেন। অবশেষে ঘোষণা হল বহুপ্রতীক্ষিত সেই বিলটির, দি ইণ্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স বিল। উৎকর্ণ সব সদস্যবর্গ। স্তব্ধ, নিশ্চল বসে আছেন ক্লিমেন্ট এ্যাটলি। মহামান্য সম্রাটের প্রতিনিধি রূপে ক্লার্ক অব দ্য ক্রাউন পূর্বের মতই উচ্চারণ করলেন, 'Le Roi le veult।' হ্যাঁ, সম্রাট খুশী হয়ে অনুমোদন করেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে চাপা খুশীতে এ্যাটলির মুখখানা ঝিকমিক করে উঠলো। বুক থেকে যেন পাষাণভার নেমে গেছে তাঁর। মুখখানা নামিয়ে নিলেন তিনি। অতবড় ঘরখানা তখন থমথম করছে চাপা নিশ্বাসে। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল ক্লার্ক অব দ ক্রাউনের কণ্ঠস্বর। মাত্র চারটি কথার এই নাটকীয় ঘোষণাই যেন দাঁড়ি টেনে দিল একটা ঐতিহাসিক অধ্যায়ের ওপর। গ্যাস বিল আর মেছো ভেড়ি বিলের সঙ্গেই ইতিহাসের গর্ভে জমা পড়ে গেল ব্রিটেনের সাধের ভারত সাম্রাজ্য।

* * *

ভারতীয় রাজন্যদের ভ্রাতৃত্ববন্ধন যেন তাদের নিজস্ব ব্যাপার। অন্ততঃ সেই-রকমই তারা ভাবতো। সে যা হ'ক, ভ্রাতৃপ্রতিম এই সমাজের সেটাই ছিল শেষ মিলন-সভা। সভা বসেছে দিল্লিতে এবং যতরকম রাজসাজ আছে সব পরে এই সভায় এসেছে মানুষগুলো। গায়ে পদক আঁটা সিল্কের জোব্বা, মাথায় সোনাচাঁদির পাগড়ি এঁটে পাখার তলায় বসেও গলগল করে ঘামছে দিল্লির ভাদ্র মাসের গুমট গরমে। পঁচাত্তরজন রাজা, মহারাজা আর দেওয়ান, নবাবের দল চাতক পাখির মতন আকণ্ঠ তেষ্টা নিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছে ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেনের দিকে, তাঁর শ্রীমুখের বাণী শুনবে বলে। ওদের জন্যে ইতিহাসের গর্ভে কি লেখা আছে তা জানেন শুধু ওই একজন ব্যক্তিই।

মাউন্টব্যাটেন এলেন। রাজন্যদের এই সভাকক্ষে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন সভাকক্ষের অধ্যক্ষ বা চ্যান্সেলর, পাতিয়ালার মহারাজা। মাউন্টব্যাটেনের পরনে এ্যাডমিরালের সাদা পোশাক। মাউন্টব্যাটেনকে উঁচু মঞ্চ পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন পাতিয়ালার মহারাজা। মাউন্টব্যাটেন তাকালেন। দুশ্চিন্তার বোঝা মাথায় নিয়ে, ম্লান শুকনো মুখে সারি সারি বসে আছে সাজ-পোশাক পরা একদল অসুখী রাজামহারাজা। দেখেশুনে মনে হচ্ছে যেন ওদের কাছে জবাবদিহি চাওয়া হয়েছে।

মনে মনে মাউন্টব্যাটেন তৈরি হয়েই এসেছেন যে পাকা আপেলগুলো প্যাটেলের ঝুড়িতে ফেলবেন। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় বাধাটি আপনা থেকেই সরে গেছে। বাদ সাধার মানুষটা তাঁর চির শত্রুর স্যার কনরাড করফিল্ড এখন বিমানে চড়ে লণ্ডনযাত্রী। জোর করে অবসর নেওয়ানো হয়েছে তাকে দিয়ে। মাউন্টব্যাটেন খুশী যে লোকটা আর কোনভাবে রাজন্যদের ওপর প্রভাব ফেলার ফুরসত পাবে না। তাই শুধু খুশী হওয়াই নয়, করফিল্ড চলে যাওয়ায় অনেকখানি সোয়াস্তিও

www.pathagar.com

পেয়েছেন মাউন্টব্যাটেন। এখন তাঁর একটাই কাজ বাকি রইল। ওই অনিরুদ্ধক রাজামহারাজার দলকে একত্র করে প্যাটেলের বাড়িতে ফেলা।

তবে এ জন্যে তাঁকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। রাজন্যদের মনের ক্ষোভ ও যাতনা মেটাবার উদ্যোগ নিতে হবে। তাই সভায় মাউন্টব্যাটেনের বক্তব্য হ'ল খুবই সংক্ষিপ্ত ও আন্তরিক। কোনরকম লিখিত ভাষণ দিলেন না তিনি। কোন ভণিতাও করলেন না। সহজ সরল ভাষায় রাজন্যদের কাছে আবেদন করলেন যেন তারা অধিগ্রহণ আইন স্বীকার করে নেয় এবং ভারত বা পাকিস্তান যে কোন রাষ্ট্রের সংগে যুক্ত হয়। আর একটা কাজ করলেন তিনি। সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন যে যুদ্ধং দেহী মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। তাতে শুধু রক্তপাতই হবে। কাজের কাজ হবে না এবং রক্তপাতের দায় নিতে হবে তাদেরই। শেষমেশ বললেন, 'আপনারা দশবছর এগিয়ে ভাববার চেষ্টা করুন। চেষ্টা করুন ভাবতে যে ভারতবর্ষ বা দুনিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন কেমন হবে এবং সেই নিরিখে সিদ্ধান্ত নিন।'

কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। ইতিহাসের শিক্ষা নেবার মানসিকতা বা শিক্ষা ওদের নেই। ফলে রংবেরংয়ের ওই ভাঁড়ের দলের কাছে মাউন্টব্যাটেনের অমন মনোগ্রাহী বক্তব্য কোন ছাপই ফেললো না। তবে ওদের যেটা মনে ধরলো তা হ'ল মাউন্টব্যাটেনের পরের কথাটা। রাজন্যপ্রথা যে বিলুপ্ত হবেই এবং যে জীবনযাপনে ওরা অভ্যস্ত সেটা যে ভেঙে যাবে তা ওরা জানে। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন যখন বললেন যে রাজত্ব গেলেও রাজা মহারাজা খেতাব বজায় থাকবে, তখন মন থেকে অনেক ভার নেমে গেল ওদের। বস্তুত মাউন্টব্যাটেনের এই প্রতিশ্রুতিটা অনেকখানি কাজ করেছিল ওদের মনে। খেতাব বা উপাধিগুলো যে মহামান্য সম্রাট কেড়ে নেবেন না এবং প্যাটেল ও তাঁর কংগ্রেস যে খেতাবগুলো তাদের ব্যবহার করতে দেবে এটা দারুণভাবে উৎসাহিত করলো ওদের।

তাই বক্তব্য শেষ করেই মাউন্টব্যাটেন সকলের মতামত জানতে চাইলেন। বুঝতে কি, এটা ওদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন। সুতরাং কিছুটা সংশয় ওঁর মনে ছিল। কিন্তু সমবেত রাজন্যরা যখন হাস্যকরভাবে নানা আজগুবি প্রশ্ন তুলতে লাগলো, তখন রীতিমত স্তম্ভিত হলেন তিনি। তাঁর সন্দেহ হ'ল যে, এইসব রাজারাজড়া বা ওদের দেওয়ান মন্ত্রীরা বোধহয় পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারেনি। তাই তুচ্ছ প্রশ্ন করে নিজেদের এমন হাস্যাস্পদ করছে। যেমন, একজন রাজা জিজ্ঞেস করলেন যে অধিগ্রহণের পর তাঁর নিজস্ব এক্তিয়ারের মধ্যে বাঘ শিকারের অধিকার বজায় থাকবে কি না। আর একজন রাজের দেওয়ান সবিনয়ে জানালেন যে তাঁর মনিব ও প্রভু জুয়া খেলতে এবং নাচনীদের সংগে নাচতে বিলেত যাত্রা করেছেন। সুতরাং এ ব্যাপারে তিনি কোন মতামতই দিতে পারবেন না।

দেওয়ানের কথা শুনে মাউন্টব্যাটেন অসহিষ্ণু হয়ে গেলেন। বিষয়টাকে এমন খেলো করার স্পর্ধা তাঁকে রীতিমত ক্ষুব্ধ করলো। একমুহূর্ত চুপ করে একটু ভাবলেন। তারপর টেবিলের ওপর থেকে কাঁচের একটা পেপারওয়েট হাতে নিয়ে ত্রিকালজ্ঞ মুনিঋষির মতন সেটা চোখের ওপর রেখে বললেন, 'তাই বুঝি! তাহলে আমিই বলে দিচ্ছি আপনি কি করবেন।'

এই বলে কাঁচের কাগজচাপাটা চোখের ওপর রেখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন। সবাই উদগ্রীব। না জানি, এরপর কি ভেল্কি দেখাবেন মাউন্টব্যাটেন।

www.pathagar.com

অর্ধবৃত্তাকার সভাঘরখানা যেন রুদ্ধশ্বাস হয়ে গেছে তখন। সেই থমথমে পরিবেশে মোটাসোটা স্থূলকায় রাজন্যদের ভারী ভারী নিশ্বাস ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। তাদের সবারই মনে হচ্ছিল এমন একটা ব্যাপার-স্যাপার ঘটবে যা জ্ঞান-বুদ্ধির অগোচর। তাছাড়া, ভারতবর্ষের মতন মায়াবাদী দেশে এমন অতীন্দ্রিয় ঘটনা নিত্যই ঘটছে। সুতরাং মহারাজারাও এটাকে হালকা ভাবে নিতে চাইলেন না। যা হক, উদ্বিগ্ন অপেক্ষার প্রহর অতঃপর শেষ হ'ল। নাটকীয় কায়দায় মাউন্ট-ব্যাটেন কাগজচাপার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই ফিসফিস করে বলে উঠলেন, 'পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।' সবাই হাঁ করে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। সেই অবস্থাতেই মাউন্টব্যাটেন ফের বললেন, 'ওই ত আপনার রাজামশাই! জাহাজের ক্যাপ্টেনের টেবিলে বসে আছেন। কি যেন বলছেন উনি?...হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক। উনি বলছেন, "য়্যাকসেসনের কাগজে সই করে দাও।"

পরের দিন শেষবারের মতন অনুগত রাজামহারাজাদের নিয়ে মাউন্টব্যাটেন ভোজসভা করলেন। এই পুরনো রাজভক্তরাই ভারতে ব্রিটিশরাজের শেষ শুভাকাঙ্খী। সবাইকে নিয়ে শেষবারের মতন মহামান্য সম্রাটের স্বাস্থ্য কামনা করলেন মাউন্ট-ব্যাটেন। হাতে পানপাত্র নিয়ে মাউন্টব্যাটেন বললেন, 'একটা বিপ্লব ঘটতে চলেছে। এই বৈপ্লবিক বদলের মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস সংগ্রহ করুন কারণ এই বদল বাস্তবসত্য। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই চিরকালের মতন আপনারা সার্বভৌম অধিকার থেকে চ্যুত হবেন। দুঃখ করবেন না। বরং এই অনিবার্য বদল মেনে নিন। ১৫ আগস্ট তারিখে এক নবীন ভারত ভূমিষ্ঠ হতে চলেছে। সেই সদ্যোজাতর দিক থেকে অভিমান করে মুখ ঘুরিয়ে নেবেন না। দেশের বাইরে ভারতবর্ষের ভাবমূর্তি প্রচার করার যোগ্য মানুষ এই শিশুরাষ্ট্রের নেই। আপনাদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে দেশের সেই দায়িত্ব পালন করুন।' মাউন্টব্যাটেন তাঁদের বললেন যে দেশ গড়ার কাজে এখন অনেক ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, আইনজীবী এবং প্রশাসক দরকার। দরকার যোগ্য সেনাপতির। এতকাল আপন আপন রাজ্যের প্রশাসন এবং গঠনের কাজে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁরা যেন ভারতের উন্নয়নের কাজে নিজেদের উৎসর্গ করেন। হয়ত তাঁরা প্রমোদে মত্ত হয়ে নির্বিবাদে জীবন কাটিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু ধিক্ সে জীবন! এর বদলে যদি জাতির সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করেন, যদি জাতির এই নবরূপায়ণে রাজন্যরা তাঁদের ভূমিকা পালন করেন তাহলে ভারতীয় সমাজে একটা বিশিষ্ট স্থান তাঁরা অধিকার করবেন। এর-পর তিনি শেষ যে কথাটা বললেন তা ভারী ইঙ্গিতগর্ভ উক্তি। রাজন্যদের উদ্দেশে মাউন্টব্যাটেন মিনতি করে বললেন, 'ম্যারি দ্য নিউ ইণ্ডিয়া!'

কাশ্মীর, জুলাই ১৯৪৭

খরস্রোতা নদীর বুকে একখানা সরু শালতি যেমন নাচতে নাচতে ভেসে যায়, তেমনি উপল আকীর্ণ আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তায় নাচতে নাচতে ছুটে চলেছে স্টেশন ওয়াগনটা। পাশাপাশি ছুটে চলেছে ঝিলম নদী। গাড়ির চালকের আসনে যিনি বসেছেন তাঁর সন্দিগ্ধ চাহনি, পুরু ঠোঁট এবং মাংসল মুখমণ্ডলের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া থুতনির দিকে চাইতেই মানুষটার সঠিক চরিত্র আন্দাজ করা যায়।

www.pathagar.com

লোকটা দুর্বল ও নীতিজ্ঞানহীন এবং অত্র ভোগব্যসন ও অস্থিরচিত্ততা প্রায় সর্বজনবিদিত। অই ইতিমধ্যেই তাঁর নামকরণ হয়েছে হিমালয়ের বর্গিয়া দুর্গে* এঁর নাম হরি সিং। কাশ্মীরের মতন এক গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক স্টেটের বংশানুক্রমিক হিন্দু রাজা তিনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে যে মানুষটি ব্রিটেনের কিছু ইতর শ্রেণীর (পেনি প্রেস) সংবাদপত্রের শিরোনাম অলংকৃত করেছিল, সেই নাম ভাঁড়ানো লোকটা আর এখনকার হিন্দুরাজার মধ্যে অনেক তফাত। হরি সিং জানেন যে, মাপে বিশাল অথচ লোকসংখ্যায় বিরল কাশ্মীরের রাজনৈতিক অবস্থান এমন গুরুত্বপূর্ণ যে এই সম্মিস্থলে ভারত, চীন, তিব্বত বা পাকিস্তান কোন না কোনদিন মুখোমুখি হবেই।

সেদিন সকালে রাজা হরি সিংয়ের কাছে একজন মানী অতিথি এসেছেন। মহারাজার পাশের সীটেই বসেছেন দীর্ঘদেহী সুপুরুষ সেই সাহেব অতিথি। আমরা জানি যে ইনি লর্ড মাউন্টব্যাটেন। হরি সিং তাঁর অপরিচিত নন। জম্মুর পোলো খেলার মাঠে দুজনে একসঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে অনেক পোলো খেলেছেন। একরকম জোর করেই আজ মাউন্টব্যাটেন এখানে এসেছেন, যাতে অস্থিরচিত্ত মহারাজা কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্ত নিতে আর গড়িমসি না করেন।

কিন্তু কি সিদ্ধান্ত? কাশ্মীরী আপেলটা কি সরাসরি প্যাটেলের ঝুড়িতে ফেলতে চাইছেন মাউন্টব্যাটেন? না তা নয়। কারণ যুক্তি মানলে বলতে হয় যে কাশ্মীর পাকিস্তানেরই প্রাপ্য কারণ তার শতকরা ৯০ জন মানুষ মুসলমান। এমনকি রহমত আলী যখন প্রথম স্বতন্ত্র ইসলামিক রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করেছিলেন, তখনও কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত দেখানো হয়েছিল। পাকিস্তানের 'ক' বলতে নাকি কাশ্মীরকেই বোঝায়।

তা সে যাই হ'ক, মাউন্টব্যাটেন যুক্তিটা মেনে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, হরি সিং যদি কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করাতে চান, তাহলেও প্যাটেল বা ভারত সরকারের আপত্তি হবে না। এই আগাম প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছেন মাউন্টব্যাটেন। শুধু তাই নয়। জিন্নাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র হলেও কাশ্মীরের হিন্দুরাজাকে তিনি সসম্মানে তাঁর ঘরে ঠাঁই দেবেন।

হরি সিং সব শুনলেন। তারপর বললেন, 'কিন্তু পাকিস্তানে আমি যোগ দেব না।'

মাউন্টব্যাটেন চুপ। একটু পরে বললেন, 'কি করবেন না-করবেন আপনার ব্যাপার। কিন্তু আমার অনুরোধ যা করার ভেবেচিন্তে করুন। ভুলে যাবেন না যে আপনার স্টেটের শতকরা ৯০ জন অধিবাসী মুসলমান।' ফের চুপ করলেন মাউন্টব্যাটেন। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, যদি পাকিস্তানে না চান তবে

---

* নিকোলো মেকিয়াভেলী তাঁর সর্বাধিক পরিচিত 'ইল প্রিন্সিপ' (দ্য প্রিন্স) গ্রন্থে আদর্শ রাজা হিসাবে সীজার বোর্গিয়ার মতন একজন নীতিজ্ঞানবর্জিত অত্যাচারী, কিন্তু ঠাণ্ডামাথার রাজপুত্রকে কল্পনা করেন, যিনি ইতালির ঐক্যসাধন করতে পারেন। কাশ্মীরের রাজা হরি সিংকে সেইরকম নীতিজ্ঞানবর্জিত ভোগী রাজা কল্পনা করেছেন লেখক এবং তাঁর নামকরণ করেছেন হিমালয়ের বর্গিয়া।

[অনুবাদক]

www.pathagar.com

ভারতে যোগ দিন। আমি কথা দিচ্ছি যে আপনার নিরাপত্তা এবং আপনার স্টেটের সীমানারক্ষার ভার আমি নেব। এক ডিভিসন ইন্‌ফ্যান্‌ট্রি পাঠিয়ে দেব। তারাই আপনার সীমানা পাহারা দেবে।' কথাটা বলে মাউন্টব্যাটেন চেয়ে রইলেন হরি সিংয়ের দিকে। কিন্তু এবার মাথা নাড়লেন, হরি সিং। 'না, আমিও ভারতেও যোগ দেব না। আমি স্বাধীন, স্বতন্ত্র থাকবো।'

ঠিক এই উত্তরটাই শুনতে চাইছিলেন না মাউন্টব্যাটেন। সুতরাং জবাব শুনেই রাগে ফেটে পড়লেন তিনি এবং মনের ভাব গোপন না করেই বললেন, 'আমি দুঃখিত মহারাজা। আপনি চাইলেই স্বাধীন থাকতে পারবেন না, কারণ আপনার দেশ স্থলবেষ্টিত। শুধু তাই নয়। দেশটা যতটা বড় সেই অনুপাতে মানুষজন বাস করে না। সব থেকে দুশ্চিন্তা কি জানেন ? ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চিরকালের লড়াইয়ের কারণ হয়ে যাবেন আপনি এবং আপনার দেশ। আপনার দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র তখন পরস্পরের দিকে খাঁড়া উঁচিয়ে থাকবে আর আপনাকে নিয়ে দড়ি টানাটানি চালাবে। আপনার এই দেশটাই ওদের রণাঙ্গন হবে আর তাতেই জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাবে আপনার দেশ। শেষমেশ আপনার সিংহাসন ত যাবেই, প্রাণটাও যাবে যদি সাবধান না হন।'

নদীর পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কথা হচ্ছিল ওঁদের। মাউন্টব্যাটেনের শেষ কথায় অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন হরি সিং। তারপর লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলে মাউন্টব্যাটেনের কথায় সায় দিয়ে মাথাটা দোলালেন। একটা বিষন্ন নীরবতা আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাঁকে। একটা দারুণ মানসিক সংকট। কি করবেন তিনি ? নদী যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানেই মহারাজার লোকজন মানী অতিথির জন্যে মাছ ধরার ব্যবস্থা করেছে। ওঁরা দুজনে পথটুকু হাঁটলেন। তারপর সারাটা দিন এই বিনোদনের ফাঁদে জড়িয়ে রইলেন। আসলে মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎ এড়িয়ে যেতে চাইছিলেন মহারাজা হরি সিং। তাই-ই হ'ল। সারাটা দিন মাছধরা নিয়েই মেতে রইলেন মাউন্টব্যাটেন। পরের দিনও এইভাবে গেল। তৃতীয় দিনে মাউন্টব্যাটেন লক্ষ্য করলেন যে মহারাজা যেন কিছুটা দ্বিধা-গ্রস্ত। কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। এটুকুর জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন মাউন্টব্যাটেন। পরের দিন ভোরেই তাঁর দিল্লি ফেরার কথা। সুতরাং আর দেরি নয়। সকালেই যাত্রার আগে মহারাজার সঙ্গে একটা একান্ত বৈঠকের ব্যবস্থা করলেন মাউন্টব্যাটেন। একরকম জোর করেই রাজী করালেন মহারাজাকে। সঙ্গে থাকবে মহারাজার মন্ত্রী এবং তাঁর সচিবালয়ের সচিবরা। সেই বৈঠকেই একটা ঐকমত্য নীতি স্থির করতে চাইলেন মাউন্টব্যাটেন। চাপে পড়ে মহারাজার গত্যান্তর রইল না। অসহায় মানুষটা মাউন্টব্যাটেনের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'বেশ, তাই হ'ক !'

কিন্তু পরের দিন সকালে নির্ধারিত বৈঠক হ'ল না। গাছের পাকা আপেল গাছেই থেকে গেল। কেউ পাড়তে পারলো না। পরদিন কাকভোরেই মহারাজার এ.ডি.সি. মাউন্টব্যাটেনকে ঘুম থেকে তুলে জানিয়ে গেল যে মহারাজার শূলব্যথা উঠেছে। ডাক্তারের পরামর্শে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিচ্ছেন। সুতরাং সামান্য সময়ের জন্যেও বৈঠকে আসতে পারবেন না।

'দেখা করা যাবে ?'

'আজ্ঞে না। তাও বারণ।'

www.pathagar.com

মাউন্টব্যাটেন বুঝলেন অজুহাতটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। অসুখটা ভাঁড়ামো (baloney)। পুরোপুরির ছল। কিন্তু কিছু করারও নেই তাঁর। ফিরে যেতেই হবে শূন্য হাতে। তবে একটাই অনুতাপ নিয়ে তাঁকে ফিরে যেতে হচ্ছে। এই উপ-মহাদেশে দুটো যুযুধান রাষ্ট্রের মধ্যে বছরের পর বছর ধরে যে আবিলতা, যে তিক্ততা চলবে তার বীজবপন হ'ল মহারাজার ওই রাজনৈতিক পেটের বেদনা থেকে।

তবে কাশ্মীরে অসফল হলেও অন্যত্র যথেষ্ট সফল হলেন মাউন্টব্যাটেন এবং একটি একটি করে অনেকগুলো আপেলই প্যাটেলের ঝুড়িতে ফেললেন। অবশ্য কিছু কিছু রাজামহারাজার কাছে স্বাক্ষর অনুষ্ঠানটা রীতিমত নির্দয় হয়ে ওঠে। খুবই স্বাভাবিক। এতদিনের রাজঐতিহ্য এক আঁচড়ে ঘুচে যেতে বসেছে। একজন রাজা ত দস্তখত করার আগেই হার্ট ফেল করে মারা গেলেন। ঢোলপুরের রানা সই করতে গিয়ে কেঁদেই আকুল। হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে মাউন্ট-ব্যাটেনকে বললেন, 'সেই ১৭৬৫ সন থেকে আপনার আর আমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে প্রায় পারিবারিক সম্বন্ধ ছিল। আজ সেটা ঘুচে গেল।' সই করার সময় বরোদার গায়কোয়াড় ত ভি.পি. মেননের দু হাতের মধ্যেই কাঁদতে কাঁদতে শোকে পাথর হয়ে গেলেন। অথচ এরই এক পূর্বপুরুষ একদা এক ব্রিটিশ রেসিডেন্টকে হীরাভস্ম খাইয়ে মারতে চেয়েছিল। একটা ছোট্ট সামন্ত রাজ্যের রাজা ত অনেক টালবাহানার পর সই করলেও মনে মনে ধারণা করেছিল যে এই নিগ্রহ থেকে তাকে রক্ষা করতে শ্রীভগবানের আবির্ভাব হবেই। পাঞ্জাবের আটজন মহারাজা এই ঐতিহাসিক সনদে একত্রে স্বাক্ষর করলেন। অনুষ্ঠানটা হ'ল পাতিয়ালার মহিমময় মহারাজা স্যার ভূপীন্দরের ব্যাংকোয়েট হলের মধ্যে। নেহাতই সাদামাটা ম্যাড়ম্যাড়ে অনুষ্ঠান। দেখেশুনে একজন স্বাক্ষরকারী ত বলেই ফেললেন, 'মনে হচ্ছে শ্মশানে বসে শেষকৃত্য করছি।'

এরই মধ্যে কিছু কিছু রাজা একজোট হয়ে মাউন্টব্যাটেন, ভি.পি. মেনন ও প্যাটেলের মিষ্টি ব্যবহারের অপব্যাখ্যা করে স্বাক্ষর অনুষ্ঠানটা বানচাল করারও চেষ্টা করলেন। এদের নেতা হলেন মাউন্টব্যাটেনের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ ভূপালের নবাব। তিনি বলে বেড়াতে লাগলেন যে তাঁদের যথেষ্ট খাতির সম্মান করা হচ্ছে না। যোগ্য রাজকীয় মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না। উদয়পুরের মহারাজা তাঁর স্নেহ-বন্ধু রাজন্যদের নিয়ে একটা রাষ্ট্রমেল বা ফেডারেশন অব স্টেট্স্ গড়বার চেষ্টা করলেন। তাঁর দেখাদেখি গোয়ালিয়রের মহারাজাও এইরকম একটা ফেডারেশন তৈরির স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল যে তাঁর এ দাবি অন্যায্য নয় কারণ তাঁর রাজ্যে দুর্মূল্য ইউরেনিয়ামের অঢেল সঞ্চয় যেমন আছে তেমনি অত্যাধুনিক একটা সমুদ্র-বন্দরও আছে।

এদিকে ১৫ আগস্ট যত এগিয়ে আসতে লাগলো ততই যেন মাউন্টব্যাটেনের পক্ষে অনিচ্ছুক রাজন্যদের প্যাটেলের খোয়াড়ে চালান করা কঠিন হয়ে উঠলো। দেখেশুনে প্যাটেল শক্ত মনোভাব নিলেন। যেখানে যেখানে কংগ্রেস দলের সংগঠন আছে তাদের দিয়ে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করার নির্দেশ দিলেন। এতে দারুণ কাজ হ'ল। উড়িষ্যার মহারাজাকে প্রাসাদের মধ্যে আটক করে স্বাক্ষর করানো হ'ল। দেশের সাধারণ মানুষরাই এ কাজটা করলো মিছিল সমাবেশের মাধ্যমে

www.pathagar.com

জনমত গড়ে। ত্রিবাংকুর রাজ্যে একজন কংগ্রেস কর্মীর হাতে ছুরিকাহত হ'ল রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী। খবর পেয়ে প্রায় কাঁপতে কাঁপতে দিল্লিতে তার পাঠিয়ে স্বাক্ষরের অনুমোদন পাঠিয়ে দিলেন মহারাজা।

তবে ভারতভুক্তির ব্যাপারে যোধপুরের মহারাজা যে তুলকালাম কাণ্ডটি করলেন তেমনটি আর কোথাও হয় নি। পূর্বতন মহারাজা তখন সদ্য প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন বর্তমান রাজা। তবে শুধু সিংহাসনই নয়, রাজকীয় খেয়ালগুলোও ওয়ারিসী স্বত্ব রূপে লাভ করলেন সুযোগ্য রাজা। মেয়েমানুষ, ঘুড়ি আর বাজির শখও পৈত্রিক সম্পত্তির মতন তাঁর ওপর বর্তালো। বর্তমান রাজা দেখলেন যে সোশ্যালিস্ট কংগ্রেসীদের কাছে এইসব রাজোয়াড়ি বিনোদনের কোন আকর্ষণই নেই। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হ'ল যোধপুর রাজ্যটাকে ভারতের সংগে জুড়ে নেওয়া। যোধপুরের মহারাজা তখন অনন্যোপায় হয়ে দিল্লিতে বসেই জিন্নার সংগে গোপন সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন। এ কাজে তাঁর জুড়ি হ'ল জয়সলমীরের মহারাজা। দুই ষড়যন্ত্রী রাজা জিন্নার সংগে দেখা করে জানতে চাইলেন যে তাঁরা যদি পাকিস্তানের পক্ষে যোগ দেন তবে হিন্দু রাজা হিসাবে তাঁরা কেমন মর্যাদা আশা করতে পারেন। জিন্না রীতিমত পুলকিত। সর্বাংগে হিন্দুয়ানি ছোপ লাগানো দুটো স্টেটের অধিকার যদি কংগ্রেসের জিম্মাদারী থেকে ছিনিয়ে নিজের থলির মধ্যে পুরতে পারেন তবে ত বাজিমাত করবেন তিনি। সুতরাং তাড়াতাড়ি ড্রয়ার থেকে একটা সাদা কাগজ টেনে যোধপুরের মহারাজার মুখের সামনে মেলে ধরলেন জিন্না। তারপর বললেন 'আপনারাই শর্ত দিন। আমি দস্তখত করে দিচ্ছি।'

আনকোরা কাগজখানার দিকে চেয়ে দুই বন্ধু মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। তারপর ভাববার জন্যে এক রাত্তির সময় চাইলেন। হোটেলে ফিরে দুই মহারাজাই অবাক। হোটেলের রীসেপ্শন রুমে অপেক্ষা করছেন ভি.পি. মেনন। 'কি ব্যাপার?' ভি.পি. মেনন সবিনয়ে বললেন, 'ভাইসরয় এখুনি আপনাদের সংগে দেখা করতে চান।' দুই বন্ধু থতমত। তবে কি জানাজানি হয়ে গেছে ব্যাপারটা? ঠিক তাই। মেনন তাঁর কোন এক ভুতুড়ে উৎস থেকে সাকি সব জেনে গেছেন। শুধু তাই নয়। মেনন জেনেছেন যে এদের পিছনে লাইন দিয়ে অপেক্ষা করছেন আরও ক'টি সামন্ত রাজ্য যারা পাকিস্তানের সংগে গ্রন্থিবন্ধনে আগ্রহী। তাই সম্ভাবনাটার মূলোচ্ছেদ করতেই মেননের এই চেষ্টা। মহারাজারা একটু বিব্রত বোধ করলেন। তারপর মেননকে সংগে নিয়ে লাটভবনের উদ্দেশে যাত্রা করলেন যোধপুরের মহারাজা।

অবশেষে লাটভবনে এসে পৌঁছলেন ওঁরা। ওয়েটিং রুমে যোধপুরের মহারাজাকে বসিয়ে রেখে লাটসাহেব মাউন্টব্যাটেনকে খুঁজতে বেরোলেন মেনন। লাটপ্রাসাদের এ ঘর সে ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজেও পাওয়া গেল না তাঁকে। শেষ পর্যন্ত মানুষটিকে পাওয়া গেল প্রাসাদের গোসলখানায়। মাউন্টব্যাটেন কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের বিন্দুমাত্রও জানতেন না। তাড়াতাড়ি এবেলা পাঠিয়ে তাঁকে সব কথা খুলে বললেন মেনন। প্রায় হাতে পায়ে ধরলেন তাঁর। যেমন করে হ'ক জেদী একরোখা ওই দুই রাজাকে বশে আনতেই হবে। মাউন্টব্যাটেন ব্যাপারটা বুঝলেন। পোশাক বদলে যোধপুরের মহারাজাকে ডেকে পাঠালেন তাঁর স্টাডি রুমে। এখনকার মহারাজা বয়সে খুবই নবীন। এঁর সদ্য প্রয়াত বাবামশাই ছিলেন তাঁর

www.pathagar.com

অন্তরঙ্গ বন্ধু। বর্তমান মহারাজা কি সেকথা জানেন? ছাব্বিশ বছরের বন্ধুত্ব তাঁদের। জানলে হয়ত এমন আত্মঘাতির কাজ তিনি করতেন না। এ কি ঝুঁকি নিতে চলেছেন তিনি? শুধু ব্যক্তিগত শখ আর খেয়াল চরিতার্থ করতে তাঁর রাজ্যের হিন্দু প্রজাদের মুসলমান রাষ্ট্রের নাগরিক করতে চান? তাঁর বাবামশাই বেঁচে থাকলে যে কতখানি ক্ষুণ্ণ হতেন তা কি তিনি বোধ করতে পারেন? যাই হ'ক, এখন যেন এমন দুর্বুদ্ধি ছেড়ে দেন যুবরাজ। তিনি কথা দিচ্ছেন মেননকে নিয়ে প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনা করে একটা সম্মানজনক নিষ্পত্তি করে ফেলবেন যাতে যুবরাজের ব্যক্তিগত খেয়ালগুলো একটা শোভন মাত্রা পায়।

মাউন্টব্যাটেন আরও একটা কাজ করলেন। ঘর থেকে বেরোবার আগে মেননকে ইঙ্গিত করে বলে গেলেন যেন সেদিনই খসড়া চুক্তিপত্রে যুবক রাজাকে দিয়ে দস্তখত করিয়ে নেওয়া হয়। চুক্তিপত্রের একটা খসড়া তৈরি করাই ছিল। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই যুবক রাজা পকেট থেকে একটা হৃষ্টপুষ্ট কলম বের করলেন। কলমটা তাঁরই কারখানায় তৈরি। সেই কলম দিয়েই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলেন যুবক রাজা। তারপর কলমের প্যাঁচ খুলে সেটা তাক করলেন মেননের মাথার দিকে। স্তম্ভিত আতঙ্কিত মেনন হাঁ করে দেখলেন যুবক রাজার হাতে একটা ·২২ পিস্তল। যুবক রাজা তখন রাগে কাঁপছেন। মেননের দিকে পিস্তলটা উঁচিয়ে চিৎকার করে বললেন, 'আপনার ধমকের কাছে আমি হার মানছি না মিস্টার মেনন।' মেনন বিহ্বল। কি করবেন তিনি? সৌভাগ্য তাঁর। কাছেপিঠেই কোথাও ছিলেন মাউন্টব্যাটেন। চিৎকার শুনেই ছুটে এলেন। তারপর জোর করে যুবক রাজার হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিলেন।*

দিন তিনেক পরেই অন্তর্ভুক্তির পাকা সনদ তৈরি হয়ে গেল। যোধপুরের প্রাসাদে সইসাবুদের জন্যে সেটা পাঠিয়ে দিলেন মেনন। অতঃপর স্বাক্ষরপর্ব সমাপ্ত হ'ল। যুবক রাজা ভারী অনিচ্ছার সঙ্গে সনদে সই করলেন। তারপর অতীতকে ভোলবার জন্যে একটা বিপুল খানাপিনার ব্যবস্থা করলেন মেননকে নিয়ে। বেচারি মেননের আতঙ্ক তখনও কাটে নি। না জানি আরও কত নিগ্রহ তাঁর কপালে আছে। যুবক রাজা এক ব্যাপারে, তাঁর রাজত্ব হারিয়ে রীতিমত শোকার্ত। খানাপিনার দিন সারাটা সন্ধ্যে চললো আকণ্ঠ পানভোজন। মেননকেও গিলতে হ'ল মদ। এক পেট পানাহারের পরেও শ্যাম্পেনের পাত্রে চুমুক দিতে হ'ল বেচারা মেননকে। আজন্ম নিরামিষাশী মেননের তখন ধাত ছাড়ার অবস্থা। চোখ টেনে টেনে দেখতে হচ্ছে নাচনীদের ঝমঝম নাচ আর শুনতে হচ্ছে কর্ণপটহ-বিদারী জগঝম্প বিলিতি বাজনা। সারা সন্ধ্যেটা যেন দুঃস্বপ্নের মতন কাটতে লাগলো তাঁর। কিন্তু চরম হয়রানি, তখনও বাকি ছিল। হঠাৎ উন্মত্তের মতন রাগ করে পাগড়ি খুলে ফেললেন যুবক রাজা। চড়া সুরের গীতবাদ্য আর সইছিল না তাঁর। থেমে গেল নাচগান। সেই অবসরে মাতাল রাজা ঘোষণা করলেন যে মান্য অতিথি মেননকে তাঁর নিজস্ব বিমানে চড়িয়ে তখনই দিল্লি যাবেন। ঘোষণা

* বেশ কয়েক বছর পরের কথা। জাদুবিদ্যা সম্বন্ধে তখন খুব ঝোঁক হয়েছে মাউন্টব্যাটেনের। ম্যাজিক সমিতির নির্বাচনে জিততে নানারকম ভোজবাজির উদ্ভাবন করছেন। সেই সময় তাঁর দলের লোকজনের হাতে যোধপুরের ওই কলম পিস্তলটা দিয়ে সেটা মিউজিয়ামে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। সেই থেকে কলম পিস্তলটা ওই মিউজিয়ামেই থেকে গেছে।

www.pathagar.com

শুনেই মেননের হৃৎকম্প শুরু হ'ল। তিনি বুঝতে পারলেন যে এক ক্ষেপাটে মাতালের হাতে পড়ে এবার তাঁর নাকালের একশেষ হবে। যে কথা সেই কাজ। বিমান আকাশে উড়লো। মেননের মনে হ'ল যেন দোল খেতে খেতে মহাশূন্যে ভাসছেন। বিমান ত নয় যেন বাচাল ছেলের হাতে ঘুড়ি। যতরকম কায়দা কসরত জানা আছে সব দেখাতে দেখাতে বিমান ছুটছে আকাশে। মাথার যন্ত্রণা আর বমি-বমি ভাব নিয়ে মাথা তুলতে পারছেন না মেনন। অবশেষে বিমান যখন দিল্লি পৌঁছালো তখন সোজা হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতাও তাঁর নেই। সারা শরীর তখন আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে মেননের। কোনরকমে হামাগুড়ি দিয়ে বিমান থেকে নামলেন। কিন্তু তখনও হাতে ধরা আছে মাতাল রাজার সই করা সনদটা। এক-বারও হাতছাড়া করেন নি সেটা। এটাই তাঁর হাতিয়ার যার জোরে প্যাটেলের ঝুড়িতে আর একটা পাকা ফল সুনিশ্চিত হ'ল।

মোটকথা কিছু কিছু একগুঁয়ে রাজার পরিবর্তন-বিরোধী বেয়াড়া মনোভাব সত্ত্বেও মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে প্যাটেলের চুক্তির একটা ভদ্র নিষ্পত্তি হ'ল। ১৫ আগস্ট তারিখের মধ্যে প্যাটেলের ঝুড়ি যেন উপচে পড়লো। পাকিস্তানের সীমানাভুক্ত পাঁচটি স্টেটের রাজারা জিন্নার অনুগামী হলেও তিনটি ছাড়া আর সব ক'টি সামন্তরাজ্যই প্যাটেলের ঝুড়ির মধ্যে নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেল।

যে তিনটি রাজ্যকে দলে ভিড়ানো গেল না তাদের একটাও ছোট বা অপ্রধান রাজ্য নয়। একটা রাজ্য ত মাপে সর্বোচ্চ এবং জনবহুল। সেখানকার সংখ্যালঘু গোঁড়া মুসলমান প্রজারা নিজামকে বোঝালো যে হিন্দুভারতের সঙ্গে কোন চুক্তি করলে চিরকাল তাদের দাস হয়ে থাকতে হবে তাদের। কোন বিশেষ সুখসুবিধা বা এতকাল ভোগ করে আসছিল সেগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। হায়দ্রাবাদের নিজাম তা মেনে নিলেন। এবং মাউন্টব্যাটেনের কোন অনুরোধ উপরোধ বা পরামর্শ শুনতে চাইলেন না। নিজামের একটাই গোঁ। তাঁকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে ইংল্যান্ডেশ্বর ঘোষণা করুন। নিজাম তখন এমনই বিহ্বল যে প্রাসাদ থেকে পরের পর তারবার্তা পাঠাতে লাগলেন ইংল্যান্ডে। যেন আসন্ন বিচ্ছেদের চিন্তায় তিনি ব্যথিত এবং দীর্ঘদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের এমন তিক্ত পরিণাম দেখে ক্ষুব্ধ। সুতরাং তাঁকে রক্ষা করার নৈতিক দায় স্বয়ং ইংল্যান্ডেশ্বর যেন স্বীকার করে নেন। হায়দ্রাবাদের মতন কাশ্মীরের ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত থেকে গেল কারণ স্বাধীনতার দাবি নিয়ে অনড় হয়ে আছেন সেখানকার রাজা হরি সিং।

তবে যে কারণে তৃতীয় স্টেটকে ভারতের অংগভুক্ত করা গেল না সেটা একটু অন্যরকম। যখন ভারতভুক্তির ব্যাপারটা প্রায় স্থির হয়ে গেছে তখন মুসলিম লীগের একজন চর এসে জুনাগড়ের নবাবকে গোপনে জানিয়ে গেল যে, স্বাধীন ভারতের প্রথম কাজ হবে তাঁর অমন সাধের পোষা কুকুরগুলোকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা। এই শুনেই নবাব আঁতকে উঠলেন। তখনই স্থির করলেন যে, হয় স্বাধীন থাকবেন নয়ত পাকিস্তানে যোগ দেবেন যদিও তাঁর স্টেটটা হিন্দুপ্রধান এবং পাকিস্তানের সঙ্গে তাঁদের অভিন্ন সীমানা নেই।

একটু পিছিয়ে যাওয়া যাক। ৫ই আগস্ট। দিল্লিতে বড়লাটের স্টাডি রুমে নিচুস্বরে যে দুজন বিশিষ্ট রাজনীতিক নেতা আলোচনা করছিলেন তাঁদের আপনারা চেনেন। একজন হলেন মুসলিম লীগ দলের সর্বোচ্চ নেতা মহম্মদ

www.pathagar.com

আলী জিন্না অন্যজন তাঁরই ছায়াসঙ্গী লিয়াকত আলী খান। হঠাৎ ঘরে ঢুকলেন মাউন্টব্যাটেন। তারপর নাটকীয় ভাবে ওই দুজন শীর্ষ নেতার সঙ্গে একজন ইংরেজ কর্মচারীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। কর্মচারীটি মাউন্টব্যাটেনের ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন তখন। মাউন্টব্যাটেন বললেন, 'জেন্টলমেন, এ'র নাম মিস্টার স্যাভেজ। ইনি পাঞ্জাব সি.আই.ডি. বিভাগের একজন কর্মচারী। ইনি এমন কিছু বলবেন যা আপনাদের শোনা দরকার। এ'র মুখ থেকেই তা শুনুন।'

ঘরের মধ্যে যেন বাজ পড়লো। দুজন শীর্ষ নেতাই তখন নড়েচড়ে বসলেন। যে সরকারী বিভাগের সঙ্গে ওই কর্মচারীর নাম জোড়া হয়েছে, সারা ভারতবর্ষে সেই সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের কাজকর্ম সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। শুধু তাই নয়। নেতারা এও জানেন যে এদের চরশাখার জাল তাঁদের রাজনৈতিক দলের ওপরতলা পর্যন্ত এমন নিপুণভাবে বিছানো আছে যে অনেক গূঢ় মন্ত্রণাই এদের মারফত আগেভাগে জেনে ফেলে সরকার। সুতরাং এই লোকটির কথার ওপর যথোচিত গুরুত্ব দেওয়াই সমীচীন।

স্যাভেজের অবস্থা তখন বলির পাঁঠার মতন। সামনে বসে থাকা অমন ধুরন্ধর দুই রাজনৈতিক নেতার সামনে রীতিমত নার্ভাস হয়ে গেছে সে। কেশে গলার স্বর সাফ করে সে তার বক্তব্য যতটা সম্ভব গুছিয়ে বলতে লাগলো। লোকটার জবানবন্দি শুনে দুজন নেতাই তাজ্জব বনে গেলেন। খবরটা শুধু গোপন নয় দারুণ চাঞ্চল্যকর। লাহোরের পাগলা গারদের একটা অব্যবহার্য অংশে পাঞ্জাবের চরবিভাগ রাজনৈতিক বন্দীদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে একটা কেন্দ্র খুলেছে সম্প্রতি। খুবই গোপন কেন্দ্র। বন্দীদের জিজ্ঞাসাবাদের সময়েই খবরটা প্রকাশ হয়ে গেছে। খবরটা এতই গোপন যে সমস্ত তথ্যটুকু লাহোরে বসে মুখস্ত করে স্যাভেজ এখানে এসেছে। এ ব্যাপারে এক টুকরো কাগজও তার সঙ্গে নেই।

শিখ উগ্রপন্থীদের একটা দল মৌলবাদী রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এই অশুভ আঁতাতের নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা সিং নামে তৃতীয় শ্রেণীর একজন ইস্কুলমাস্টার। সম্প্রতি লাহোরে শিখেদের যে গোপন সম্মেলন হয়ে গেল, সেখানে এই লোকটা নাকি শিখজাতিকে হুঁশিয়ার করে বলেছে যে দেশ জুড়ে এবার রক্ত নদীর ধারা বইবে। হিন্দু ও শিখেদের দুটো উগ্রবাদী দলই তাদের সব সম্পদ ও শক্তি এই কাজে নিয়োগ করবে বলে শাসিয়েছে।

এটুকু শুনেই নেতা দুজন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। স্যাভেজের দেওয়া পরবর্তী তথ্যটা আরও ভয়ংকর। শিখেদের সন্ত্রাসবাদী দলটার কাজকর্ম অনেক সুশৃংখল। নানারকম অনুশীলন মারফত তারা ইতিমধ্যেই বিস্ফোরক বোমা নিয়ে নাড়াচাড়া করার শিক্ষা পেয়েছে। সুতরাং এদের ওপরেই পাকিস্তান স্পেশ্যাল নামক ট্রেন-খানা উড়িয়ে দেবার ভার পড়েছে। এই ট্রেনটাই পাকিস্তানের শীর্ষ নেতা এবং অন্যান্য সাজসরঞ্জাম নিয়ে দিল্লি থেকে করাচির উদ্দেশে যাত্রা করবে। এই সন্ত্রাস-বাদী দলটার নেতৃত্ব দেবে তারা সিং। লোকটা অত্যন্ত চালাক। ইতিমধ্যেই দিল্লি ও করাচিতে ওয়্যারলেস সেট বসিয়েছে। দুজন অপারেটর মারফত নিত্য এই দুই শহরের মধ্যে খবর চালাচালি হচ্ছে। ফলে দিল্লি ও করাচির মধ্যে ক'টা ট্রেন যাতায়াত করে এবং কোন রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে তার সম্পূর্ণ তথ্য শিখে-দের সন্ত্রাসবাদী দলটার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে নিয়মিত।

দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজটার ভার দেওয়া হয়েছে হিন্দু সাম্প্রদায়িক আর.এস.এস.

www.pathagar.com

দলের ওপর। এই উগ্রবাদী দলের হিন্দু সমর্থকদের আদেশ দেওয়া হয়েছে যেন সাজপোশাকে করাচির মুসলমান সমাজে মিশে যায়। প্রত্যেককে ব্রিটিশ আর্মির শক্তিশালী হাতবোমা দেওয়া হয়েছে। এদের এত গোপন রাখা হয়েছে যে একজন অন্যজনের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। ফলে একজন ধরা পড়লেও পুরো দলটি যেমন ধরা পড়বে না তেমনি ষড়যন্ত্রটাও ফাঁস হয়ে যাবে না।

১৪ আগস্ট তারিখে মহম্মদ আলী জিন্নাকে নিয়ে করাচির রাস্তায় যে বিজয় মিছিল বেরোবে, সেই রাস্তার ধারে হাতবোমা নিয়ে এই খুনে লোকগুলো দাঁড়িয়ে থাকবে। বিজয় মিছিল যাবে পাকিস্তানের পরিষদ ভবন থেকে জিন্নার সরকারী বাসভবন পর্যন্ত। এই যাত্রাপথের মধ্যেই হাতবোমা ছুঁড়ে হত্যা করা হবে পাকিস্তানের ভাবী রাষ্ট্রপিতাকে। ঠিক যেমন সার্বিয়ার একজন উগ্র জাতীয়তাবাদী দুর্বৃত্তের হাতে অস্ট্রিয়ার ভাবী রাজদম্পতি নিহত হবার দরুন সারা ইওরোপ বিশ্বযুদ্ধে নিমজ্জিত হয়েছিল, সেইরকম একটা ভয়ঙ্কর প্ল্যান তৈরি করেছে এই উগ্রবাদী দুটি দল। তাদের ধারণা যে জিন্না নিহত হলে যে ক্রোধের সঞ্চার হবে, তার ফলে সারা উপ-মহাদেশ জুড়ে এক বন্য গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে। তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরাই এর ফায়দা তুলবে এবং তারাই হিন্দুরাজ্য কায়েম করে অবিভক্ত ভারতের শাসনকর্তা হবে।

স্যাভেজের কথা শুনতে শুনতেই মহম্মদ আলী জিন্নার মুখখানা সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। পাশে বসে থাকা লিয়াকত আলী খান উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে প্রায় জবাবদিহি চেয়ে বসলেন মাউন্টব্যাটেনের কাছে। তিনি জানতে চাইলেন কেন শিখেদের জঙ্গি নেতাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না? মাউন্টব্যাটেন স্তম্ভিত। কি করা উচিত তা যেন ভেবে পেলেন না। তবে তাঁর মনে হ'ল যে শিখ নেতাদের বন্দী করলে আর.এস.এস. যা চাইছে সেই গৃহযুদ্ধের অবস্থাটাই এগিয়ে আনা হবে। হঠাৎ তিনি তাকালেন তরুণ সি.আই.ডি. অফিসারের দিকে। 'তুমি কি বলো?' অপ্রস্তুত স্যাভেজ সোজা হয়ে দাঁড়াল। সবিনয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপারে স্যার?'

'আমি যদি পাঞ্জাবের গভর্নরকে শিখ নেতাদের আটক করতে বলি?'

বুদ্ধিমান অফিসারটি তখনই মনে মনে ভেবে নিল এর কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে। তাকে সর্বক্ষণ তটস্থ হয়ে থাকতে হবে। সে জানে যে সন্ত্রাসবাদীরা স্বর্ণমন্দিরের ভেতরে দিব্যি নিরাপদ হয়ে আছে। কোন হিন্দু বা শিখ পুলিস মন্দিরের মধ্যে ঢুকবে না। আর মুসলমান পুলিসকে মন্দিরের মধ্যে পাঠাবার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং ওদের কোথাও আটক রাখা যাবে না। অতএব সেই কথাটাই একটু ঘুরিয়ে যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে নিবেদন করল স্যাভেজ। সে বললো, 'স্যার, কিছু মনে করবেন না। তবে আমাদের অধীনে এমন বিশ্বস্ত সেপাই নেই যাদের দিয়ে এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ করানো যায়। মানছি, এটা আমাদের লজ্জার কথা। তবুও জানাচ্ছি, কারণ আপনার আদেশ পালন করার অন্য কোন উপায় আমাদের জানা নেই।'

সি.আই.ডি. অফিসারের কথা শুনে মাউন্টব্যাটেন একমুহূর্ত ভাবলেন। তারপর দুই নেতার দিকে চেয়ে বললেন যে পাঞ্জাবের বর্তমান গভর্নর ইভান জেনকিনস এবং দুই পাঞ্জাবের দুজন ভাবী গভর্নরের পরামর্শ নিয়ে ১৫ আগস্টের পর যা করার করবেন। মাউন্টব্যাটেনের কথা শুনেই খাপ্পা হয়ে গেলেন লিয়াকত।

www.pathagar.com

উত্তেজনায় চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বললেন, 'তার মানে ? ততদিনে কায়েদ-ই-আজম যদি খুন হয়ে যান ? আপনি কি তাই চান ?'

মাউন্টব্যাটেন সত্যিই স্তম্ভিত হয়ে গেছেন তখন। কি বলতে চাইছেন লিয়াকত ? সরাসরি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে শান্ত স্বরে বললেন, 'আপনি যদি তাই-ই ভেবে থাকেন তাহলে জেনে রাখুন যে সেদিন মিস্টার জিন্নার সঙ্গে আমিও ওঁর গাড়িতে থাকবো এবং ও'র সঙ্গেই খুন হবো। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে গভর্নরদের মত না নিয়ে পঞ্চাশ লাখ শিখেদের নেতাদের বিনা প্ররোচনায় জেলে পাঠাতে পারবো না।'

সেই রাত্রেই হাতে ব্রিফ্‌কেস্‌ নিয়ে স্যাভেজ লাহোরে ফিরে এল। ব্রিফকেসের মধ্যে ঠাসা আছে অসংখ্য টয়লেট পেপার। এগুলো লোক দেখানো ব্যাপার যাতে তার অন্তর্বাসের মধ্যে লুকিয়ে রাখা জেনকিনসকে লেখা মাউন্টব্যাটেনের চিঠিখানার হদিস কেউ না পায়। স্যাভেজ যখন লাহোরে এসে পৌঁছান তখন ফ্যালেটি হোটেলের চত্বরে অতিথিদের আপ্যায়নে ব্যস্ত ছিলেন জেনকিনস। তাঁর হাতে চিঠিখানি দিয়ে এক পা পিছিয়ে দাঁড়িয়ে রইল স্যাভেজ। লক্ষ্য করতে লাগলো মানুষটার প্রতিক্রিয়া। কি আশ্চর্য ! পাঞ্জাব সম্বন্ধে অমন তথ্যাভিজ্ঞ মানুষটাও মাউন্টব্যাটেনের চিঠিখানা পড়তে পড়তে কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে গেলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন 'আমরা যাই করি না কেন ওদের কি করে ঠেকাবো ? বলতে বলতে সখেদে নিজের মাথা নাড়লেন স্যার ইভান জেনকিনস।

পাঁচদিন পরের কথা। ১১/১২ আগস্টের মাঝরাতে তারা সিংয়ের নেতৃত্বাধীন শিখ সন্ত্রাসবাদীরা তাদের প্রথম পর্যায়ের কাজটা দারুণ সাফল্যের সঙ্গে উতরে দিল। লাইনের ওপর পেতে রাখা দুটো বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দিল দিল্লি থেকে ছেড়ে আসা স্পেশ্যাল ট্রেনটা। ঘটনাটা ঘটলো ফিরোজপুর জেলার গিদ্দরবহা রেলরোড স্টেশনের ঠিক পাঁচ মাইল পূর্বদিকে।

* * *

ভাইসরয় ভবনের বিশাল চত্বরের একটেরে সদ্য কলি ফেরানো ও সবুজ খড়খড়ি ঢাকা একটা ছিমছাম বাংলোবাড়ি আছে। সেই ভবনের মধ্যে স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ টেবিলের ওপর পাতা রয়্যাল ইঞ্জিনীয়ার্স ম্যাপের গায়ে সীমানা লাইন টানছিলেন। ভাদ্র মাসের দুঃসহ গরম। গলগল করে মানুষটা ঘামছেন। সেই গলদঘর্ম অবস্থা দেখে মায়া হয়। অথচ সবাই কেমন যেন অবুঝের মতন ক্রমাগত চাপ দিয়ে চলেছে তাঁর ওপর। সবাই চাইছে কাজটা এখনই শেষ হ'ক। অনন্যোপায় র‍্যাডক্লিফ তাই রাতদিন কাজ করে চলেছেন যেহেতু কাজ ছাড়া অন্য বিকল্প নেই। লোকচক্ষুর আড়ালে বসে নিষ্ঠুর ঘাতকের মতন দেশটার শরীরের ওপর দিয়ে ছুরি চালিয়ে যাচ্ছেন। এ যেন শ্মশানে বসে নিভৃতে শব সাধনা করা। অথচ শুকনো ম্যাপ, পরিসংখ্যান আর পপুলেশন চার্টের সাহায্য নিয়ে যে সব এলাকাগুলির ওপর দিয়ে তিনি ভাগাভাগির ছুরি চালাচ্ছেন সেই সব অঞ্চলগুলো কত প্রাণচঞ্চল ও জীবনরসে ভরপুর।

প্রতিদিন বাধ্য হয়ে তাঁকে শিরাউপশিরার মতন ছড়িয়ে থাকা পাঞ্জাবের জলসেচ ব্যবস্থা খণ্ডখণ্ড করতে হচ্ছে। অথচ এই এলোমেলো আঁচড়ের ফল কি হচ্ছে তা তিনি প্রত্যক্ষ করতে পারছেন না। র‍্যাডক্লিফ জানেন যে পাঞ্জাবে জলই প্রাণ এবং এই জলের অধিকার যে পাবে সেই-ই নিয়ন্ত্রণ করবে জাতির জীবনস্পন্দন। তবুও

www.pathagar.com

আঁকাবাঁকা সেচনালাগুলোর সঠিক গতিপথ জরিপ করতে পারছেন না তিনি। কোথায় বাঁধ, কোথায় জলাধার, কোথায় স্লুইস গেট কিছুই হদিস হচ্ছে না তাঁর।

তিনি জানেন যে ধান বা পাটক্ষেতের বুক চিরে তিনি যে সীমা লাইন টেনেছেন সেই মাটির বুকের ওপর কোনদিনই হাঁটবেন না তিনি। কোনদিন এমন একটা গ্রাম চোখে দেখার সৌভাগ্য হবে না যা ভাগ করার দরুন গ্রামের হতভাগ্য গরিব চাষা উৎখাত হয়েছে তার বাস্তুজমি থেকে। হয়ত এর ফলে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তার চাষের জমি, রাস্তা বা গ্রামের কুয়া থেকে। মোটকথা তাঁর দেওয়া দাগের ফলে মানুষের দুঃখকষ্টের পরিসীমা নেই। কিন্তু তার তাপউত্তাপ তিনি আঁচ করতে পারবেন না কোনদিন, পারবেন না ওদের বিড়ম্বনার এতটুকু উপশম করতে। এ ধাষ্টামো হবেই। কারখানা আর গুদাম আলাদা হবে। আলাদা হবে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও বিদ্যুৎ সংযোগ। কারণ এক অস্বাভাবিক ব্যস্ততা পেয়ে বসেছে দিল্লির নেতাদের। সেই ত্বরাটা জোর করে ওঁর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওরা চাইছে যে দিনে অন্তত তিরিশ মাইল সীমানা লাইন তিনি টানুন।

যে উপকরণগুলি নিয়ে তিনি কাজ শুরু করেছেন তা ছিল হতাশ রকমের স্বল্প। এমনকি প্রমাণ মাপের একটা সরকারী জরিপ ম্যাপও তাঁর হাতে এসে পৌঁছয় নি। যেটি পেয়েছেন সেটিও নির্ভুল নয়। নদীনালা, পথঘাটের অনুপুঙ্খ বিবরণাদি তার মধ্যে পাওয়া যায় না। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে পাঞ্জাবের পাঁচটি প্রধান নদীই খাত থেকে প্রায় বারো মাইল সরে গেছে। কিন্তু মানচিত্রে তার সঠিক নির্দেশ নেই। আর একটি ঘটনাও বিস্ময়কর মনে হয়েছে তাঁর কাছে। প্রাথমিক গাইড হিসেবে জনসংখ্যায় যে তালিকা (পপুলেশন চার্ট) তিনি হাতে পেয়েছেন সেটিও অভ্রান্ত নয় কারণ প্রায়শই দুই প্রতিপক্ষ দলের চাপে তালিকার পরিসংখ্যান বদল হয়ে যাচ্ছে।

বরং বাঙলাভাগের কাজটি অপেক্ষাকৃত অধিক সহজ মনে হয়েছে তাঁর কাছে। একমাত্র কলকাতা শহর নিয়েই তাঁর কিছুটা সংশয় ছিল কারণ জিন্নার যুক্তিটি তিনি মনে মনে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন নি। ক্ষেত থেকে মিল এবং সেখান থেকে জাহাজঘাট পর্যন্ত পাট ফসলের একটা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ সুপারিশ করেছিলেন জিন্না। প্রথম দিকে জিন্নার এই দাবি আদৌ যুক্তিহীন মনে হয় নি তাঁর কাছে। কিন্তু পরে তাঁর মনে হয়েছে যে আর্থিক সংগতির প্রশ্নটি কখনই মানবিক দাবি ক্ষুণ্ন করতে পারে না। যে শহরে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে অন্য কোন বিচার অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য হয় না। মোটকথা, একবার এই সহজ সিদ্ধান্তটি নেবার পর অন্যান্য প্রশ্নগুলির উত্তর সহজ হয়ে গেল তাঁর কাছে। একথা অবশ্য ঠিক যে ম্যাপের গায়ে পেনসিলের দাগ টেনে তিনি সীমানারেখা এঁকেছেন। ব্যাপারটা হৃদয়বিদারক জেনেও তিনি বিরত হন নি কারণ খালবিলজলার এই বাঙলাদেশে সীমানা নির্দেশকারী কোন নদী বা পাহাড়শ্রেণীর সন্ধান তিনি পান নি।

তুলনামূলক ভাবে পাঞ্জাবের কাজটা বহুলাংশে দুরূহ। লাহোর শহরের কথাই ধরা যাক। শহরে হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় সমান হওয়ায় দুই সম্প্রদায়ের মানুষই আবেগের বশে শহরটাকে তাদের বলে দাবি করে চলেছে। শিখরাও দাবি করেছে যে মুসলমান অঞ্চল দ্বারা পরিবেষ্টিত হলেও পবিত্র স্বর্ণমন্দিরের শহর অমৃতসরকে তারা ভারত ছাড়া অন্য রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হতে দেবে না। এ ছাড়াও র‍্যাডক্লিফের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়াল অনেকগুলো

www.pathagar.com

ছোট ছোট সাম্প্রদায়িক পকেট। বাহারি নকশার মতন হিন্দু, শিখ ও মুসলমানের এই এলাকাগুলো এমন মিলেমিশে আছে যে এদের আলাদা করা প্রায় অসম্ভব। হয় জনসংখ্যা নয়ত ভৌগোলিক সীমানার মাপকাঠি দিয়ে এদের আলাদা করতে হবে। কিন্তু মিশ্র জনসংখ্যা আলাদা করার চেয়ে ভৌগোলিক সীমালাইন ধরে এলাকা ভাগ করা সহজ। এর ফলে সংখ্যালঘুরা আপনা থেকে আলাদা হয়ে যাবে এবং উগ্রবাদী সংখ্যাগরিষ্ঠদের সর্বক্ষণ অত্যাচারের তাড়স থেকে তাদের মুক্তি দিতে পারবেন।

সবার ওপরে ছিল তাপদগ্ধ দিনগুলোর দুঃসহ নিষ্ঠুরতা। প্রকৃতির এই বিরূপতায় র‍্যাডক্লিফের ধৈর্যের বাঁধ প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে তখন। বাংলোর তিনখানা ঘরেই এলোমেলো ছড়ানো আছে পাতলা, তুলতুলে দিশি কাগজে টাইপ করা অসংখ্য নথি, রিপোর্ট আর ছোটবড় অনেকগুলো ম্যাপ। শার্টের হাতা গুটিয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে কাজ করছেন র‍্যাডক্লিফ। হাতের ঘামের সংগে সেঁটে যাচ্ছে তুলতুলে পাতলা কাগজগুলো। হয়ত আলাদা করার সময় দেখা গেল টাইপ করা কাগজের গায়ে ঘামের দাগ ধরে গেছে। তিনি জানেন যে ঘর্মমলিন এইসব রিপোর্টগুলোর মধ্যেই লুকিয়ে আছে মানুষের আশা-আকাংক্ষার কথা আর তাদের ব্যাকুল মিনতি।

মাথার ওপরে ধীরে ধীরে ঘুরছে কাঠের ব্লেডওলা মান্ধাতার আমলের একটা সিলিং ফ্যান। ফ্যানটা যেমন বিশাল তার বাতাসটুকু তেমনি ঝিরঝিরে। বস্তুত এই ঝিরঝিরে বাতাসটুকু ছাড়া প্রকৃতির কোথাও বাতাস নেই। গুমট গরমে গাছের একটা পাতাও নড়ছে না। হঠাৎই যেন দৈব অনুগ্রহে উদ্দাম হয়ে উঠলো পাখার ঘূর্ণন। দমকা হাওয়া ছড়িয়ে পড়লো ঘরময় আর চৈত্রদিনের শুকনো ঝরাপাতার মতন টাইপ করা কৃশ রিপোর্টগুলো উড়তে লাগলো সর্বত্র।

কাজে হাত দেওয়া থেকেই র‍্যাডক্লিফ যেন জেনে গিয়েছিলেন যে. তাঁর এত পরিশ্রমের যোগফল শূন্যই হবে। যে সুপারিশই তিনি করুন না কেন, রিপোর্টটি প্রকাশ হবার সংগে সংগেই ধুন্ধুমার বেধে যাবে সমাজে। খুনোখুনি শুরু হয়ে যাবে দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে। প্রায় রোজই কোন না কোন পাঞ্জাবি গ্রাম থেকে এই খুনোখুনির চিঠি তিনি পাচ্ছেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল যে এতকাল যারা দিব্যি পাশাপাশি বাস করেছে. সীমানা চিহ্নিত হবার সংগে তারা যেন একে অপরের ঘোর শত্রু হয়ে গেল আর খুনোখুনি শুরু করে দিল।

মানুষের সংগে দেখাসাক্ষাৎ প্রায় বন্ধ করে দিয়েছেন র‍্যাডক্লিফ। এর আগে যেখানেই গেছেন ডিনার বা ককটেল পার্টি সেখানেই লোকজন তাদের নানা দাবি-দাওয়া নিয়ে তাঁকে ঘিরে ধরতেন। তাই পার্টিতে যাওয়া বন্ধই করে দিলেন শেষ পর্যন্ত। শুধু যখন দারুণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তখন পড়ন্ত বিকালে উঁচু বাঁধের ওপর একা একা পায়চারি করতেন। র‍্যাডক্লিফ জানেন যে এই উঁচু বাঁধের ওপরেই ব্রিটিশরাজ ১৮৫৭র বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে এখানে সৈন্য জমায়েত করেছিল। কিংবা মাঝরাতে কাজ করতে করতে অবসন্ন দেহটা শ্বাসরোধকারী ভ্যাপসাগুমট ঘর থেকে টেনে বাইরের লনে এনে ফেলতেন একটু স্বস্তির জন্যে। তখন হয়ত বাগানের ইউক্যালিপটাস গাছের সারির ভিতর দিয়ে হাঁটবার সময় গায়ে লাগতো ঠান্ডা ঝিরঝিরে বাতাস। দেহমন জুড়িয়ে যেত তাঁর। মাঝে মাঝে তাঁর তরুণ আই.সি.এস. সহকারীও সংগে থাকতো। কিন্তু ভুলেও তার সংগে কাজ-

www.pathagar.com

নিয়ে কোন আলোচনা করতেন না। যে মানসিক যন্ত্রণায় তিনি বন্দী ছিলেন তার আভাসটুকুও বাইরে প্রকাশ হতে দিতেন না। বিমর্ষ মনে চুপচাপ হাঁটতেন। তাঁর এই অসাধারণ সংযম ও ঔচিত্যবোধ নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে রাখতো তাঁর মনের উদ্বেগ। তাঁর সহকারীও অনধিকারীর মতন যেচে কোনরকম আলোচনার সূত্রপাত করতেন না। অবশ্য মাঝে মধ্যে তাঁরা যে আলোচনা করতেন না তা নয়। কিন্তু বিষয়বস্তু অন্যরকম হ'ত। হয়ত সেই গুমট রাত্তিরে তাঁরা অক্সফোর্ডের শীতল ছাত্রজীবনের কথা আলোচনা করতেন বা ওইরকম অন্য কোন নির্বিরোধী বিষয়।

ক্রমে একটু একটু করে কাজ এগোতে লাগলো। যেখানটা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং যা চোখে দেখা যায় সেই অংশের সীমানা চিহ্নিত করার কাজটাই আগে শেষ করলেন র‍্যাডক্লিফ। তবে যতই কাজ এগোতে লাগলো এবং নতুন ভাবে ভারতবর্ষের মানচিত্রে সীমানার দাগ পড়তে লাগলো, ততই একটা দুশ্চিন্তা তাঁকে যেন অহরহ পীড়া দিতে লাগলো। তখন মনে মনে তিনি বলতেন, 'যত তাড়াতাড়ি পারি এই প্রাণান্তকর কাজটা আমি শেষ করতে চাইছি। কিন্তু কি লাভ? যখনই কাজ শেষ করবো তখনই দেখবো ওরা ফের নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি শুরু করে দিয়েছে।'

বলতে কি সারা পাঞ্জাব জুড়ে তখনই খুনোখুনি শুরু হয়ে গেছে। পাঞ্জাবের মতন অমন সুশাসিত প্রদেশের রাস্তাঘাট আর তেমন নিরাপদ নয়। শিখ দুর্বৃত্তরা দল বেঁধে গ্রামের মধ্যে ঢুকে গুণ্ডামি করে বেড়াচ্ছে। যখন তখন হামলা করছে মুসলমানের গ্রামগুলোর ওপর। দুর্বৃত্ত শিখ যুবকরা এমন বর্বর, নিষ্ঠুর আর পাশবিক আচরণ করছে যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পুরুষদের পুরুষাঙ্গ কেটে হয় তাদের মুখে নয়ত নিহত মেয়েদের মুখে পুরে দিচ্ছে। ব্যাপারটা এমনিই বর্বর এবং অমানুষিক যে আলোচনা করতেই ভয় পাচ্ছে সবাই। একদিন লাহোরের একটা উপদ্রুত অঞ্চলে দারুণ চাঞ্চল্যকর একটা ঘটনা ঘটলো। একজন শিখ যুবক দ্রুতবেগে সাইকেল চালিয়ে একটা ব্যস্ত চা-কফির দোকানের সামনে এল। তার সাইকেলের কেরিয়ারে একটা বড়সড় তামার পাত্র। সাধারণত দুধ চালান করা হয় এই পাত্রে। পাত্রের গায়ে ঘণ্টা লাগানো এবং মুখটা বন্ধ। লোকটা গোল পাত্রটা গড়িয়ে দিল চায়ের দোকানের দিকে। বিকালের দিকে বলে দোকানে অনেক খরিদ্দার। দোকানের একটা কোণে একজন মুসলমান গুণ্ডা তার সাঙাতদের সঙ্গে পরামর্শ করছিল। পাত্রটা ঝমঝম শব্দে দোকানের দিকে যখন গড়িয়ে আসছে, তখন সবাই ভয় পেয়ে গেল। না জানি কি বিস্ফোরক পদার্থ এর ভেতরে আছে। কিন্তু পাত্রটা যখন ফাটলো না তখন সাহস করে একজন কর্মচারী পাত্রের ঢাকনিটা খুলে ফেললো। কিন্তু পাত্রের মধ্যে তাকিয়েই সভয়ে পিছিয়ে গেল। কি ব্যাপার? কি আছে ওর মধ্যে? কুখ্যাত ওই মুসলমান গুণ্ডার জন্যে পাত্র বোঝাই উপহার পাঠিয়েছে অমৃতসরের সন্ত্রাসবাদী শিখেরা। বিচিত্র উপহার। সদ্যকাটা মুসলমানের পুরুষাঙ্গ। বলাবাহুল্য, ঘটনাটা সেদিন সারা লাহোর শহর তোলপাড় করে দেয়।

শহর জুড়ে তখন অর্থহীনভাবে খুন বা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে আকছার। দেখে শুনে একজন পুলিস অফিসার নোট দিলেন যে মনে হচ্ছে সারা শহর যেন আত্মহত্যার নেশায় মেতে উঠেছে। কেন্দ্রিয় ডাক বিভাগে লক্ষ লক্ষ চিঠি জমা হয়ে

www.pathagar.com

গেছে। বেশিরভাগই পোস্টকার্ড। কে বা কারা বেছে বেছে হিন্দু ও শিখ মানুষদের নামে এইসব চিঠি লিখে খুন ও ধর্ষণের নানা কাহিনীর বিবরণ দিয়েছে। অতি ভয়াবহ সেই বিবরণ। সব শেষে সবাইকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে যাতে তারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। অন্যথায় অত্যাচারী মুসলমানের হাতে তাদেরও এই পরিণাম হবে। অনুমান হয় যে মুসলিম লীগের তরফ থেকে এইরকম জঙ্গি প্রচার চালানো হয়েছিল যাতে লাহোরের শিখ ও হিন্দু নাগরিকদের মধ্যে দাঙ্গার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

অবশ্য লাহোরের ভদ্র ও অভিজাত পাড়ার মুসলমানদের মনে তখনও সাম্প্রদায়িক প্রভাব পড়ে নি। তবে তারাও নিজেদের নিরাপদ মনে করে নি। তাই গেটের গায়ে সবুজরঙ দিয়ে অর্ধচন্দ্র এঁকে রাখতে শুরু করে। এখানকার একজন পারসী বণিক তার গেটের গায়ে কোরাণের বাণী লিখে রাখে যে হিন্দু, মুসলমান ও শিখেরা সহোদরের মতন। তারা ভাই ভাই।

লাহোর পুলিস বিভাগে মুসলমানের সংখ্যাই বেশি। ফলে সর্বত্রই যেমন ঘটেছে লাহোরেও তেমনি পুলিসের আনুগত্য ধীরে ধীরে আলগা হয়ে গেল। সুতরাং শহরের শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার দায়িত্ব এসে পড়লো অল্প কয়েকজন ব্রিটিশ পুলিসের ওপর। আবেগের গলা টিপে তারা নির্বিচারে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে লাগলো দুর্বৃত্তদের শায়েস্তা করতে। 'আগে গুলি, পরে কথা।' এইভাবেই অবস্থার মোকাবিলা করতে লাগলো প্যাট্রিক ফার্মারের মতন ইংরেজ পুলিস অফিসাররা। বিল রীচ নামে আর একজন ইংরেজ পুলিস অফিসারের স্পষ্ট মনে আছে সেই সব বীভৎস রাতগুলোর কথা যখন দাউ দাউ করে বাজার জ্বলেছে আর লকলকে সেই আগুনের শিখায় লাল হয়ে গেছে দিগন্ত। বাড়ির ছাতে ছাতে দাঁড়িয়ে আছে মুসলমানরা। তারা ফিসফিস করে কথা বলছে। সবাইকে হুঁশিয়ার করছে। ঠিক যেন ধূর্ত শেয়ালের মতন আচরণ করছে মানুষগুলো।

পাঠকের হয়ত জেরাল্ড স্যাভেজকে মনে আছে। ক'দিন আগে এই মানুষটিই জিন্না হত্যার ষড়যন্ত্রের কথাটা মাউন্টব্যাটেনকে জানিয়ে এসেছিল। একদিন সে লাহোরের একটা অতি হীন, দরিদ্র মহল্লায় মজুত অস্ত্র উদ্ধারের অভিযান করতে গিয়েছিল। একটা বস্তিঘরের মচমচে দরজার পাল্লা খুলে ভেতরে ঢুকেই স্তম্ভিত হয়ে গেল স্যাভেজ। আলোবাতাসহীন একটা হাঘরে বস্তিঘর। ভাঙাচোরা একটা চারপাইয়ার ওপর ময়লা ছেঁড়া কাঁথা মুড়ে একটা বুড়ো মানুষ শুয়ে আছে। ঘরের অন্ধকার একটু সয়ে যেতে স্যাভেজ বিস্ফারিত চোখে দেখলো সারা শরীরে বীভৎস পচা ঘা। দগদগে ঘায়ের ওপর থকথক করছে পুঁজ। পচা ঘায়ের গন্ধে ঘরটা ভরে গেছে। এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে লুকানো অস্ত্র উদ্ধারের বাসনা মিলিয়ে গেল তার। তাড়াতাড়ি দোর বন্ধ করে পালিয়ে বাঁচলো সে। তার মনে হচ্ছিল যে ভারতের এই চিরন্তন ব্যাধিও মানুষের আদিম প্রবৃত্তির কাছে হার মেনে গেছে। এটাই এই দেশের দুর্ভাগ্য।

পাঞ্জাব পুলিসে কর্মরত এইসব সৎ কর্তব্যপরায়ণ ইংরেজ অফিসাররা সেদিন সত্যিই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল মানুষের এই লজ্জাকর পরিণতি দেখে। সারা পাঞ্জাব প্রদেশটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এই নির্বিচার হত্যাস্পৃহা। সুশাসিত এই প্রদেশের আইন শৃংখলা নিয়ে তাদের কত গর্ব ছিল। এটুকু বজায় রাখতে

www.pathagar.com

কত ত্যাগস্বীকার করেছে তারা। আজ যখন সারা প্রদেশে নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়েছে তখন এর দায় নিতেই হবে কাউকে। হয় শিখ বা মুসলিম লীগ নেতৃবর্গ কিংবা স্বয়ং মাউন্টব্যাটেনকে, যাঁর নিন্দনীয় তাড়াহুড়া আর ব্যস্ততার জন্যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের এখনই শেষ হতে চলেছে।

প্রকৃতিও যেন ষড় করে বিরুদ্ধতা করতে শুরু করেছে। প্রকৃতি দেবী যদি সামান্য একটু অনুগ্রহ করতেন তাহলে হয়ত লাঞ্ছিত মানবিকতা একটু স্বস্তি পেত। দিনের পর দিন আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকেছে পাঞ্জাবের মানুষ। আকাশের বুক চিরে একখানা মৌসুমী মেঘ খুঁজে ফিরেছে চোখ। কিন্তু কোথায় সেই শ্যামলকান্তি নবীন জলধর যার অকৃপণ করুণাবারি আশীর্বাদের মতন শীতল করতে পারে মানুষের মনের আদিম জ্বালাটা ? শান্ত করতে পারে তার উগ্র উন্মত্ত ক্রোধ ? হ্যাঁ ঠিক তাই। এদেশের পুলিস বাহিনী জানে যে মানুষের ক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ করার সব অস্ত্র যখন ব্যর্থ হয় তখন বৃষ্টিপাতই একমাত্র অস্ত্র যা মানুষের রোষ প্রশমিত করতে পারে। এ এক মোক্ষম অস্ত্র। কিন্তু হায়! এই অমোঘ অস্ত্র ব্যবহারের অধিকার মানুষের হাতে নেই।

অমৃতসর শহরের অবস্থা আরও ভয়াবহ। রাস্তায়, অলিগলিতে মানুষ খুন হচ্ছে নিয়ম করে। মলমূত্র ত্যাগের মতন গাসহা হয়ে গেছে ব্যাপারটা। শহরের হিন্দুরা নানারকম ফন্দি ফিকির করে মানুষের হয়রানি করছে। পথ চলতে চলতে হয়ত কোন অসতর্ক মুসলমানের মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে দিল কিংবা যখন তখন যেখানে সেখানে আগুন লাগিয়ে দিল। মোটকথা শহরের কোথাও জীবনযাত্রা স্বাভাবিক ছিল না। কেউ নিজেকে নিরাপদ ভাবতো না।

শেষ পর্যন্ত শান্তি ফিরিয়ে আনতে কর্তৃপক্ষ ব্রিটিশ সামরিক বিভাগের সাহায্য চাইল। পুরো আটচল্লিশ ঘণ্টা সান্ধ্য আইন জারি করা হ'ল শহরে। হয়ত সাময়িক ভাবে অবস্থার উন্নতি হ'ল. কিন্তু হঠাৎ আবার দাউ দাউ করে দাঙ্গার আগুন জ্বলে উঠলো এবং খুনের নেশায় মেতে উঠলো মানুষ। শহরের পুলিসের কর্তা তখন নিরুপায় হয়ে ভাবছেন কি করবেন। পুলিসের শাস্ত্রে এমন কোন বিধান নেই যা তিনি প্রয়োগ করেন নি। কিন্তু কোন ফল হয় নি। শেষ পর্যন্ত শাস্ত্র বহির্ভূত একটা কৌশল অবলম্বন করলেন তিনি। পুলিস ব্যাণ্ডের অধিনায়ককে ডেকে পাঠালেন পুলিসের বড়কর্তা। তারপর শহরের সেন্ট্রাল পার্কে তাঁকে ঐকতান ব্যান্ড বাজাতে বললেন। একদিকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, ফটফট শব্দে পড়ছে বোমা পটকা, কিন্তু সেই শব্দকে ছাপিয়ে উঠেছে অর্কেস্ট্রার ঝমঝম বাদ্য। খ্যাপা শহরের গা থেকে পাগলামির বহির্বাসখানা খুলে ফেলতেই এই অভিনব আয়োজন করেছিলেন শহরের পুলিস সুপার যাতে মানুষগুলো কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়।

মাউন্টব্যাটেন স্থির করলেন যে ১৫ আগস্টের পর পাঞ্জাবে শান্তি শৃংখলা বজায় রাখতে একটা স্পেশ্যাল ফোর্স তৈরি করবেন। ভারতীয় সেনাবিভাগের গোর্খা বাহিনীর মতন শৃংখলাপরায়ণ বাহিনীর সেনা দিয়ে তৈরি হলো সেই স্পেশ্যাল ফোর্স। ধরে নেওয়া হ'ল যে জাতিগতভাবে অভারতীয় হবার দরুন তারা সাম্প্রদায়িক হবে না। মাউন্টব্যাটেন এর নামকরণ করলেন পাঞ্জাব বাউন্ডারি ফোর্স। এই ফোর্সের অধিনায়ক নিযুক্ত করলেন এমন একজন ফৌজি মানুষকে

www.pathagar.com

যার সামরিক কুশলতার পরিচয় তিনি আগেই পেয়েছিলেন। মেজর জেনারেল টি. ডব্লু. পেটি রীজ যখন তাঁর অধীনে ব্রহ্মদেশের নাইনটিনথ ইণ্ডিয়ান ডিভিসনের প্রধান ছিলেন তখনই তাঁর কর্মতৎপরতা মাউন্টব্যাটেনকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু দেখা গেল যে পাঞ্জাবের গভর্নরের সুপারিশের দ্বিগুণ সংখ্যক সৈন্য নিয়ে গড়ে তোলা এই বাউণ্ডারি ফোর্সও পাঞ্জাব ভাগের পরবর্তী অব্যবস্থা আয়ত্বে আনতে পারে নি। দামাল বন্যার মুখে কুটোর মতন ভেসে গেল তারা।

সেদিন নেহরু, জিন্না, বা গভীর রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন পাঞ্জাবের গভর্নর অথবা স্বয়ং বড়লাটও এই বিপর্যয়ের যথার্থ আয়তনের পরিমাপ করতে পারেন নি। ওঁদের এই ব্যর্থতাটা সত্য কিন্তু অত্যন্ত নির্বোধ সত্য। সুতরাং আগামী দিনের ঐতিহাসিক গবেষকদের কাছে এই ব্যর্থতা যে পায়ে পায়ে বাধা হয়ে দাঁড়াবে এবং সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু হবেন ভারতের শেষ ভাইসরয় ইতিহাসই তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবে। সহিষ্ণু এবং মুক্ত মনের মানুষ হবার দরুন নেহরু এবং জিন্না দুজনের কেউই এই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার হদিস ঠিকমতন আঁচ করতে পারেন নি। তাঁরা বোঝেন নি যে এই উত্তেজনা মানুষের মনে এমন এক সর্বনেশে আগুন ধরাতে পারে। তাঁরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে দেশভাগের পরে মানুষের মন থেকে ক্ষোভের জ্বালা ধীরে ধীরে জুড়োবে। কিন্তু তাঁরা দুজনেই দারুণ ভুল করেছিলেন। স্বাধীনতার স্বাদ পাবার আশায় মানুষ আত্মহারা হয়ে যায়। ফলে বাস্তব ঘটনার যুক্তিসম্মত প্রতিক্রিয়া তাদের হয়নি। বিচারবুদ্ধি হারিয়ে বসে তারা এবং অপেক্ষাকৃত নবাগত বড়লাটের কাছে এই স্থূল আবেগটাই পৌঁছে যায়।

আগামী দিনটাকে দেখতে না পাওয়ার এই ব্যর্থতা হয়ত প্রশমিত হ'ত যদি সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ, যার জোরে এতকাল দেশ শাসন করে এসেছে ইংরেজ, তারা আগাম অবহিত করতো প্রশাসনকে। কিন্তু এত হাঁকডাক সত্ত্বেও এমন সাধের গোয়েন্দা দপ্তর সতর্ক করে নি সরকারকে। ফলে বিপদ সম্বন্ধে একটুও ভয় বা আতংক হয় নি এবং সরাসরি বিপর্যয়ের সামনাসামনি এসে পড়ে সরকার।

সারা দেশে সেদিন একজনই নেতা ছিলেন যিনি এই বিপর্যয়ের ভয়ংকর চেহারাটা পূর্বাহ্নেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন আর সেইজন্যেই শেষ দিন পর্যন্ত ভারতভাগের বিরোধিতা করে গেছেন তিনি। তাঁর ভাবশিষ্যদের কাছে গান্ধীজী ছিলেন প্রাচীন মুনিঋষিদের মতন। সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্টের মধ্যে, তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের গ্লানির মধ্যে নিজেকে এমনভাবে নিমজ্জিত করেছিলেন যে তাঁকে কখনও আলাদা মনে হ'ত না। শীতের রাতে ধুনির পাশে বসে থাকতে থাকতে প্রাচীনকালের ঋষি যেমন হঠাৎ বলতেন, 'বাইরে গিয়ে দ্যাখ! অন্ধকারে একজন মানুষ শীতে বোধহয় জমে গেল।' ঠিক তাই। শিষ্যরা বাইরে সত্যিই দেখতে পেত যে একজন মানুষ শীতে কাঁপছে। গান্ধীজীর ইনটিউইশন বা সহজাতবোধশক্তি ঠিক ওইরকম সজাগ ছিল বলেই দেশের মর্মস্থলটি তিনি অমন নিবিড় করে জেনেছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা বলি। বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন তখন পাঞ্জাবে বাউণ্ডারি ফোর্স গড়ে তুলতে ব্যস্ত। সেইসময় নাগাদ গান্ধীজীর কাছে একজন মুসলমান মহিলা এলেন। তিনি সরাসরি গান্ধীজীকে বললেন, 'যদি দুই ভাই একবাড়িতে থেকে প্রতিনিয়ত লাঠালাঠি করে, তবে কি তাদের আলাদা হয়ে থাকার ব্যাপারে গান্ধীজী আপত্তি করবেন?'

www.pathagar.com

গান্ধীজী একটু হেসে বললেন, 'না, আপত্তি করবো না যদি ভাইভাই হিসেবে তারা আলাদা হয়। কিন্তু এখানে তা হবে না। এখানে মায়ের গর্ভের সন্তানকে দুটুকরো করে আলাদা করা হচ্ছে। এখানে তাই ভাগাভাগির পর রক্তের বন্যা বইবে।'

পাঞ্জাবের পাশাপাশি আর একটা দুশ্চিন্তা রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল মাউন্টব্যাটেনের। সেই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নটা কলকাতাকে নিয়ে। সৈন্য পাঠিয়ে কলকাতা সামলানোর চেষ্টা যে পণ্ডশ্রম হবে তা তিনি জানেন। জনাকীর্ণ বস্তি এলাকার থিকথিকে নোংরা পরিবেশে বা বাজারের মধ্যে যদি দাংগা বাধে তবে সেনাবাহিনীর সাধ্য হবে না তাকে সামাল দেওয়া। তাছাড়া পাঞ্জাবের জন্যে বাউন্ডারি ফোর্স তৈরি করতে সেনাবাহিনীর সমস্ত ইউনিট থেকেই বিশ্বস্ত এবং অসাম্প্রদায়িক সেনাদের তিনি নিয়েছেন। ধর্মীয় দাংগায় কোন পক্ষাবলম্বন করবে না এমন সেনা আর বিশেষ নেই। সুতরাং কলকাতার দাংগায় নিরপেক্ষ সেনা পাওয়া মুশকিল। তাঁর মনে হল যে তেমনটি যদি ঘটে তবে রক্তের প্লাবন বয়ে যাবে শহরের রাস্তায়। তুলনায় পাঞ্জাবের দাংগাটা মনে হবে 'পুষ্পিত পথ।'

তাই কলকাতার শান্তি বজায় রাখতে তাঁকে কূটচাল নিতেই হবে। খেলাটা বিপজ্জনক সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি নিরুপায়। এই জুয়াটা তাঁকে খেলতেই হবে নইলে কলকাতার বিপুল দুর্দশা তিনি ঠেকাতে পারবেন না। তাঁর সংগতি এত সীমাবদ্ধ এবং বিপদাশংকার আয়তন এত বিকট যে অলৌকিক কিছু না ঘটলে এই হতভাগ্য শহরটাকে বিপদমুক্ত করতে তিনি পারবেন না। সাম্প্রদায়িক দাংগার ঢেউ থেকে শহরটাকে বাঁচাতে যে শক্ত বাঁধের কথা তিনি ভেবেছেন সেই বাঁধ হবেন মহাত্মা গান্ধী। সুতরাং এই বিষণ্ণ ছোট্ট পাখিটাকেই এই কাজে লাগাতে চাইলেন মাউন্টব্যাটেন।

অতঃপর গান্ধীজীকে তিনি তাঁর মনের কথাটা জুলাই মাসের শেষাশেষি জানালেন। মাউন্টব্যাটেন বললেন যে বাউন্ডারি ফোর্সের সাহায্য নিয়ে তিনি পাঞ্জাবের অবস্থা আয়ত্বে আনতে পারবেন। কিন্তু কলকাতায় যদি দাংগার ঢেউ ওঠে তাহলে বন্যায় ভেসে যাবেন তিনি। কলকাতার জন্য যে ব্রিগেড ওখানে আছে তার সীমিত সেনাবল তিনি বাড়াতেও চান না। সুতরাং কলকাতায় যদি আগুন জ্বলে সে আগুন সহজে নিভবে না। গান্ধীজী সব শুনলেন। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ বন্ধু, ঠিক তাই। তোমাদের পার্টিশন প্ল্যানের এটাই পরিণতি।'

হয়ত তাই। কিন্তু বিকল্প কোন সমাধান ত গান্ধীজী বা অন্য কেউ তাঁকে দেন নি! সুতরাং এখন সে কথা ভেবে কি লাভ? বরং গান্ধীজী যদি চান তবে এই মুহূর্তে অন্য ভূমিকায় তাঁকে সাহায্য করতে পারেন। গান্ধীজী অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। লোকটা তাঁকে দিয়ে কি করাতে চাইছে? মাউন্টব্যাটেন সেকথা বুঝিয়ে বললেন গান্ধীজীকে। তাঁর অহিংসার আদর্শ আর ব্যক্তিত্ব দিয়ে এমন কিছু করতে পারেন যা সেনা নিয়োগ করে পাওয়া যাবে না। কলকাতার মানুষের চোখের ওপর গান্ধীজীর কৃশ চেরাহাটা তুলে ধরতে চান মাউন্টব্যাটেন। এতেই কাজ হবে। সেনাবল বাড়িয়ে যা পেতে চাইছেন তার দ্বিগুণ বেশি ফল পাবেন কলকাতায় গান্ধীজীকে আনিয়ে। আর সেই অনুরোধটাই করলেন মাউন্টব্যাটেন। গান্ধীজীকে বললেন, 'আমার অনুরোধ। আপনি কলকাতায় যান।

www.pathagar.com

আপনিই হবেন আমার বাউণ্ডারি ফোর্সের সেনা।'

অবশ্য যে ওজুহাতই মাউন্টব্যাটেন দিন না কেন, এখনই কলকাতায় যাবার কোন অভিপ্রায় হ'ল না গান্ধীজীর। তাঁর প্রোগ্রাম ঠিক করাই ছিল। স্বাধীনতাদিবসে নোয়াখালির বিপন্ন সংখ্যালঘু হিন্দুদের পাশে থাকবেন এবং সাহস দেবেন। সবাইকে নিয়ে চরকা চালাবেন এবং অনশন করবেন। এই শপথ নিয়েছিলেন বছরের প্রথম দিনটিতে যেদিন প্রায়শ্চিত্ত করতে এই তীর্থভূমিতে তিনি প্রথম আসেন। সুতরাং এ তাঁর নৈতিক দায় যা তাঁকে পালন করতেই হবে। তবে মাউন্টব্যাটেন একা নন। কলকাতার ভয়ত্রস্ত বস্তিবাসীর কাছে সামান্য একটু ভরসা, আশ্বাস পৌঁছে দেবার মিনতি জানিয়েছিল আর একজন মানুষও।

এই দ্বিতীয় যে মানুষটার আর্ত কণ্ঠস্বর গান্ধীজীর কানে গেছে সে লোকটা গান্ধীজীর রাজনৈতিক পরিবেশে একেবারেই বেমানান কারণ কোনদিনই গান্ধীজীর পথানুসারী ছিল না সে। বরং বিপরীত মেরুর এই মানুষটা যেন ইচ্ছাকৃতভাবে মূর্তিমান বিরোধ হয়ে গান্ধীজীর আদর্শগুলো জোর করে হত্যা করতে চেয়েছে। বলতে কি, সেদিন এতবড় উপ-মহাদেশে শহীদ সুরাবর্দী ছাড়া এমন দ্বিতীয় মানুষ ছিল না যে কথায়, আচরণে, স্বভাবে, ব্যসনে গান্ধীজীর নান্দনিক ও কল্যাণময় চেতনার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল।

গান্ধীজী ধরেই নিয়েছিলেন যে স্বাধীনোত্তর নবীন ভারতের প্রশাসন দখল করবে একদল দুর্নীতিপরায়ণ, ঘুষখোর মন্ত্রী। এদের কলুষ মলিন চেহারার যে ছবিটা তাঁর মনের মুকুরে ভাসতো তারই হুবহু নকল হ'ল ৪৭ বছরের সুরাবর্দী। এই নীচ, লোভী অর্থবশ এবং হীনচরিত্রের মানুষটার একটাই রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল। যেন তেন প্রকারে নির্বাচনে জেতা এবং ক্ষমতা দখল করা। কারণ এদেশে একবার ক্ষমতা হাতে এলে চট করে তা হাতছাড়া হয় না। সুতরাং সর্বক্ষণ গদিতে থাকার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে গুণ্ডাবদমাশ পুষে সরকারী তহবিল থেকেই সে অর্থ ব্যয় করেছে যেন তার রাজনৈতিক বন্দীদের মুখ বন্ধ করে রাখার এই দায় সরকারের।

১৯৪২ সালে বাংলাদেশে যখন দুর্ভিক্ষ মহামারী শুরু হ'ল, তখন অন্নহীন মানুষের জন্য পাঠানো হাজার হাজার মণ চাল কালোবাজারে বিক্রি করে কয়েক লাখ টাকা কামিয়ে নেয় লোকটা। তখন থেকেই রীতিমত ধনী ও বিলাসী হয়ে ওঠে সে। পোশাকে রুচিতে সে তখন সুবে বাংলার একচ্ছত্র নবাব। দিনে দুবার ক্ষৌরি করা প্রতিবার বেরোবার আগে পোশাক বদলান ইত্যাদি বিলাসিতা করা তার নিত্যকর্ম হয়ে যায়। গান্ধীজী চারদশক ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করে যখন যৌনবোধ নিঃশেষ করেছেন, তখন নির্বিচার নারীসংগম করে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে লোকটা। কলকাতার এমন কোন সুন্দরী বারবিলাসিনী ছিল না যার সংগে সে যৌনাচার করে নি। গান্ধীজীর যেমন পানীয় ছিল লবণ আর সোডার জল, লোকটার হাতে তেমনি শোভা পেত ফিনফিনে কাঁচের গেলাসে সফেন মদিরা। গান্ধীজী খেতেন সয়াবিন সেদ্ধ আর দই। এটাই তাঁর নিত্য আহার্য। লোকটা খেত ঝাল মসলায় গরগরে মাংস আর মদ। ফলে বুক থেকে কোমর পর্যন্ত তার দেহকাণ্ডটা যেন মেদ ও চর্বির একটা পিণ্ড হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু সবচেয়ে বীভৎস ছিল লোকটার খুনের নেশা। মানুষের রক্তে লাল হয়ে

www.pathagar.com

যায় লোকটার দুটো হাতে তখন। জিন্না যখন আগস্ট মাসে ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে ঘোষণা করলেন, সুরাবর্দী তখন কৌশল করে দিনটাকে ছুটির দিন ঘোষণা করে এবং ঠারেঠোরে মুসলিম লীগ দলের সমর্থকদের জানিয়ে দেয় যে পুলিসবাহিনী অন্যত্র ব্যস্ত থাকবে। সেদিন এই সুযোগটা পেয়েই মুসলমানরা এই শহরের বুকে নির্বিচারে হিন্দু হত্যা করেছিল। সেদিনের সেই জঘন্য গণহত্যার প্রতিশোধ নিতে হিন্দুরা যে তৈরি হচ্ছে সুরাবর্দী তা জানতে পারে। সেই আতঙ্কটাই আজ যেন স্থূল হয়ে ঢেকে দিয়েছে লোকটার বোধ। তাই হিন্দুরোষ থেকে রেহাই পেতে ছুটে এসেছে গান্ধীজীর কাছে।

সুরাবর্দী ছুটে এল সোদপুরের আশ্রমে। গান্ধীজী তখন নোয়াখালি যাবার জন্যে তৈরি। কিন্তু সুরাবর্দী কিছুতেই তা হতে দেবে না। ছলছল চোখে গান্ধীজীকে নিবেদন করলো যেন হিন্দুদের রোষ থেকে তিনি কলকাতার মুসলমানদের বাঁচান। একমাত্র তিনিই পারেন এ কাজটা করতে। শুধু তাই নয়, শহরময় ছড়িয়ে যাওয়া ঈর্ষাদ্বেষের আগুনটাও নেভাতে পারেন শুধু তিনিই। এরপর শেষ অস্ত্রটা প্রয়োগ করলো সুরাবর্দী। গান্ধীজীর দিকে করুণচোখে চেয়ে বললো, 'যেমন হিন্দুরা তেমনি মুসলমানরাও আপনার প্রিয়। আপনি নিজেই ত কতবার বলেছেন যে আপনি যেমন হিন্দুদের তেমনি মুসলমানদেরও।'

গান্ধীজী চুপ করে শুনলেন। তারপর তাকালেন অনেক দুষ্কর্মের নায়ক সুরাবর্দীর দিকে। গান্ধীজীর একটা বিস্ময়কর ক্ষমতা হ'ল যে মনশ্চক্ষু দিয়ে দুর্জন, দুরাত্মার মধ্যেও সদ্‌বস্তুটুকু খুঁজে বের করা এবং সেটাই আশ্রয় করা। গান্ধীজীর অন্তর্দৃষ্টি তাঁকে বুঝিয়ে দিল যেন যে সুরাবর্দীর এই আচরণটা রাজনৈতিক ছলনা নয়। মুসলমানদের জন্য লোকটা আন্তরিকভাবেই দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত। সুতরাং সুরাববর্দীর আবেদনটা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন না গান্ধীজী। কলকাতায় থাকতে রাজী হলেন শর্তসাপেক্ষে। দুটো শর্তের কথা বললেন গান্ধীজী। প্রথমটা হ'ল যে নোয়াখালির হিন্দুদের নিরাপত্তার জন্য ওখানকার মুসলমানদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি এনে দিতে হবে সুরাবর্দীকে। যদি একজন হিন্দুও নিহত হয় তাহলে তখুনি আমরণ অনশন শুরু করবেন গান্ধীজী। অর্থাৎ তাঁর নিজের জীবনের নৈতিক দায় চাপিয়ে দিলেন সুরাবর্দীর ওপর। সুরাবর্দী রাজী হওয়ায় দ্বিতীয় শর্তের কথা বললেন গান্ধীজী। এ শর্তটা আপাতচোখে গান্ধীবাদের অপরিজ্ঞাত। গান্ধীদর্শনের প্রেক্ষাপটে একটা মস্ত অসঙ্গতির মতন শোনাল যখন গান্ধীজী বললেন যে দিনেরাতে ছায়ার মতন সুরাবর্দীকেও তাঁর সঙ্গে থাকতে হবে। নোংরা বস্তির ঘরে নিরস্ত্র এবং নিরক্ষক সুরাবর্দী তাঁর পাশে পাশে থেকে শান্তির জন্য একত্রে জীবনপণ করবে। সুরাবর্দী তাতেও রাজী। গান্ধীজী লিখলেন, 'আমি এখানেই জড়িয়ে গেলাম। যত বিপজ্জনক হ'ক না কেন এই দায় আমায় নিতেই হবে।......ভবিষ্যতই বলবে কি হবে। তবে চোখকান খোলা রেখে চলো।'

* * *

কাঁটাগাছের খসে পড়া শুকনো পাতার মতন ফরফর করে উড়ছে মাউন্টব্যাটেনের কর্মপঞ্জিকার শেষ পাতাগুলো। কর্মব্যস্ত বড়লাট এবং তাঁর সচিবালয়ের কর্মচারীদের তখন যেন নিশ্বাস ফেলার ফুরসত নেই। কাজের চাপে ঘোরের মতন কাটছে ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিনগুলো। একটার পর একটা দিন কাটছে আর

www.pathagar.com

একটা করে সমস্যা জন্ম নিচ্ছে তখন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গণভোট সংগঠন করতে হবে। অনুরূপ গণভোটের ব্যবস্থা করতে হবে শ্রীহট্টেও। উপযুক্ত সমারোহের ব্যবস্থা করতে হবে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে। কংগ্রেস নেতৃবর্গ জিদ ধরেছেন যেন এমন ধুমধাম হয় যাতে প্রাচীন ব্রিটিশ রাজত্বের ঐতিহ্য বজায় থাকে। আগে সমারোহ বর্ণাঢ্য হ'ক পরে না হয় বিবর্ণ সোশ্যালিজম প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

কংগ্রেস থেকে হুকুম জারি হয়েছে যে ১৫ আগস্ট তারিখে সারা দেশের কসাইখানা বন্ধ রাখতে হবে। সেদিন সিনেমাহলে সকলের অবাধ প্রবেশাধিকার থাকবে এবং দিল্লির প্রতিটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা মিষ্টির বাক্স আর একখানা করে পদক পাবে। কিছু কিছু সমস্যাও দেখা দিল। লাহোরে সরকারী ঘোষণা মারফত জানানো হ'ল যে শহরে হাঙ্গামার দরুন স্বাধীনতার অনুষ্ঠানে জাঁকজমক আর উৎসব বাতিল করা হয়েছে। কট্টর দক্ষিণপন্থী হিন্দু মহাসভা দল হুংকার দিল যে দেশমাতার এই বিভাজনে তারা ক্ষুব্ধ। তাদের সঙ্গোপাঙ্গদের বলা হ'ল তারা যেন সেদিন সবরকম আনন্দানুষ্ঠান বর্জন করে এবং খণ্ডিত মাতৃভূমি জোড়া লাগাবার শপথ নেয়।

ওদিকে প্রোটোকলের ব্যাখ্যা নিয়ে কোঁদল শুরু হওয়ায় পাকিস্তানে স্বাধীনতা উৎসব বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা হ'ল। দাম্ভিক জিন্না গোঁ ধরলেন যে ভাইসরয়কে বাদ দিয়েই পাকিস্তানে স্বাধীনতা উৎসব করবেন। কিন্তু তা কি ভাবে সম্ভব ? মধ্যরাতের আগে ত স্বাধীনতা ঘোষণাই হচ্ছে না ! যা হ'ক জিন্না শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে বুঝলেন যে এটা তাঁর বে-আকেল্লে আবদার। তবে তাঁর ভাগ্যে যে আরও হতাশা অপেক্ষা করছিল তা কে জানতো ! বরাতের জোরে পাকিস্তানের ভাগ্যে যে স্টেট ক্যারেজখানা জুটেছে সেই রাজশকটের একটা ঘোড়া পংগু হয়ে পড়ে আছে। অতএব রাজশকট চলবে না। জিন্না বেজায় ক্ষুন্ন হয়েছেন। পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর-জেনারেলরূপে এটাই হবে তাঁর প্রথম স্বীকৃত যাত্রা। কিন্তু শকট-বিহীন যাত্রা কি করে সম্ভব হয় ? অতএব বড়লাটের কাছে আবেদন গেল। মাউন্টব্যাটেন তাঁর নিজস্ব ব্যবহারের রোলস্ রয়েস গাড়িখানা জিন্নার ব্যবহারের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। পাকিস্তানের জন্মলগ্নের অনুষ্ঠানসূচি জিন্না নিজে তৈরি করেছেন। অনুষ্ঠান শুরু হবে ১৩ আগস্ট বৃহস্পতিবার। সেদিন তাঁর ভবনে স্টেট লাঞ্চ হবার কথা। কিন্তু ভোজসভা শেষমেশ স্থগিত হয়ে গেল। জিন্নারই একজন বিশ্বস্ত পার্শ্বচর তাঁকে আড়ালে জানালেন যে ১৩ আগস্ট বৃহস্পতিবার দিনটা পবিত্র রমজান মাসের শেষ সপ্তাহে পড়েছে। সেদিন বিশ্বের সর্বত্র ধার্মিক মুসলমানরা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস করে। মজার কথা যে, বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইসলামিক রাষ্ট্রের যিনি কর্ণধার হচ্ছেন এমন একটা ধর্মীয় তত্ত্ব তাঁর জানাই ছিল না।

স্বয়ং ভাইসরয় এবং দুই রাষ্ট্রের নেতারা যখন অসংখ্য অনুষ্ঠানের ঠেলাঠেলির মধ্যে হারিয়ে গেছেন তখনই যেন পায়ে পায়ে এগিয়ে এল ভারতে সাড়ে তিনশ' বছরের ব্রিটিশ উপনিবেশের অন্তিম সময়। টলমল করে উঠলো এর বনেদ। অসংখ্য ককটেল পার্টির ফেয়ারওয়েল অনুষ্ঠানে স্নায়ু উত্তেজক জিন্ পানীয়র আবেগ বা শূন্যগর্ভ শপথের মধ্যে শোনা গেল তার বিষণ্ণ সুর। পানীয়র গেলাসে টুকরো টুকরো বরফের ঠুনঠান শব্দে সেই সব হাজার হাজার অনুষ্ঠানে বেজে উঠলো বিদায়বেলার গান। টি পার্টি ডিনার পার্টি কিংবা বিদায় সংবর্ধনার

www.pathagar.com

সেই সব অনুষ্ঠানে সূচিত হ'ল একটা যুগের প্রস্থান।

পূর্বপুরুষদের তৈরি করা বিভিন্ন কারবার বা ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যে সব ইংরেজ জড়িত ছিল তাদের অধিকাংশই স্থির করেছে যে কারবার গুটিয়ে তারা দেশে ফিরে যাবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে এল প্রায় হাজার ষাট ইংরেজের জীবনে যারা বেতনভুক সরকারী কর্মচারী। হয় সৈনিক, নয়ত ইঞ্জিনীয়ার, ক্লার্ক বা আই. সি. এস. অফিসার কিংবা পুলিস ইন্‌স্‌পেকটর। এই হঠাৎ অবস্থান্তর তাদের কাছে সত্যিই হৃদয়বিদায়ক। আবার ফিরে যেতে হবে মাতৃভূমির সেই ছোট্ট দ্বীপটায় যেটা এতকাল তাদের 'আউট হোম' ছিল। যেন রাত পোয়ালেই হঠাৎ ফকির হয়ে যাবে সবাই। স্বর্গ থেকে বিদায় হবে তাদের। অসংখ্য চাকরনোকর-পরিবৃত বিশাল বাংলোবাড়ির আরাম স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে ফিরে যেতে হবে ব্রিটেনের কোন গ্রামের এক ছোট্টকুটিরে। না থাকবে চাকর-বাকর, না থাকবে খোশামুদে জোহুজুরের দল। এদের মধ্যে ভাগ্যবান তারাই যাদের এদেশে একটা বহির্জগৎ ছিল। সোশ্যালিস্ট ব্রিটেনের পরিবেশে ফিরে ক্লাব, পোলো বা শিকারী জীবনের আমোদ-প্রমোদের মধ্যে তারা বেশ মিশে যেতে পারবে। তবে সম্বল ত পেন্‌সনের ক'টা টাকা যা আবার মুদ্রাস্ফীতির কল্যাণে ক্রমশ কৃশ হচ্ছে। ইদানীং তাই একটা ভারী উপাদেয় রসিকতা মুখে মুখে ফিরছে তরুণ ব্রিটনদের। ওরা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা করে বলাবলি করতো যে, বোম্বাই বন্দর থেকে ফিরতি জাহাজের পিছন থেকেই ভারতবর্ষটা দেখতে সবচেয়ে সুন্দর। হয়ত তাই। তবে কে জানতো যে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বিদায়ী ব্রিটেনবাসীকে ছলছল চোখে সেই করুণতম দৃশ্যটাই দেখতে হবে।

এদিকে তখন সারা উপ-মহাদেশে ছড়িয়ে থাকা কয়েকশ' বাংলোবাড়ি খালি করে সাহেব-মেমদের শৌখিন জিনিসপত্র লরি বোঝাই করা হচ্ছে। কত রকম শখের জিনিস সে সব। লেস্ বসানো রুমাল, দামী মেহগনি কাঠের আসবাব, বিয়ের সময় যৌতুক পাওয়া রুপোর বাসনকোসন, আরও কত কি। এই সঙ্গে ছিল নাইন্‌থ্ বেঙ্গল ল্যানসার বা স্কিনার্স বাহিনীর সগুম্ফ জেনারেলদের ঢাউস মাপের অয়েল পেন্টিং ছবিও। মোট কথা, চল্লিশ বছর আগে লণ্ডন থেকে জাহাজ বোঝাই করে এদেশে আনা ঘর সাজাবার উপকরণগুলো আবার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে তাদের।

একদা উইন্‌স্‌টন চার্চিল খেদ করে বলে ফেলেন যে ভারতবর্ষের ইংরেজদের সবচেয়ে বড় দোষ হ'ল যে এখানকার মূল স্রোত থেকে ওরা কেমন যেন আলাদা। অভিযোগটা মিথ্যে নয়। অন্তত ফিরে যাবার সময় ওরা যেন সেই অভিযোগটাই প্রতিষ্ঠা করে গেল। ওরা জানান দিয়ে গেল যে ওরা ছিল। হয়ত নতুন যুগের পদধ্বনি ওরা শুনতে পেয়েছিল। তাই এমন সাড়ম্বরে চলে যাওয়া স্থির করেছে ওরা। তা নতুন যুগ সত্যিই ভারতের সমাজ জীবনে তখন ঢুকে গেছে। একটা বড়সড় পোশাক বিপ্লব ঘটেছে সমাজে। শেরওয়ানি, কুর্তা আর খাদির পায়জামা তখন ঠেলেঠুলে জায়গা করে নিয়েছে প্যান্ট কোটের মধ্যে। অবশ্য সাহেবি পোশাক তখনও পুরোপুরি বর্জন হয় নি সমাজে। কাজেকর্মে বা সাহেবদের সঙ্গে ক্লাবে বা পার্টিতে তখনও সাহেবি পোশাকই চালু ছিল। ব্যাপারটা সত্যই বেশ উপভোগ্য। যাবার সময় ইংরেজ দেখে গেল যে শাসক আর শাসিতদের মধ্যে, অন্তত পোশাকের ক্ষেত্রে, বিশেষ ভেদাভেদ নেই। প্রীতি ও সখ্যতার এক অনুপম

www.pathagar.com

দৃষ্টান্ত স্থাপিত হ'ল যেন।

তখন প্রতিদিন পুরনো দিল্লির চাঁদনি চক বাজারে ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে ইংরেজবাবুর দল। তারা আসছে আর মোটরগাড়ি বা রেফ্রিজারেটরের বদলে নিয়ে যাচ্ছে পার্শিয়ান গালচে, হাতির দাঁতের কাজ করা জিনিসপত্র কিংবা বাঘ বা গন্ডারের চামড়া যা তারা কোনদিনই শিকার করতে পারে নি। তবে ফিরে যাবার সময় একটা সেন্টিমেন্টাল কারণে ওরা সবাই বিমর্ষ হ'ল। এই দেশের মাটিতে ওদের ফেলে যেতে হচ্ছে ওদের অনেক আপন জনের স্মৃতিস্তম্ভ। একদিন ওরা সবাই ছিল। কিন্তু ফেরার সময় ওদের অনেকেই সংগে নেই। ওদের সেই সব নিঃসংগ স্মৃতিস্তম্ভগুলোর দিকে তাকালে সেই সব কথাই মনে পড়ে যায়। সাড়ে তিনশ' বছরের ঔপনিবেশিক শাসনে প্রায় ত্রিশ লক্ষ ইংরেজের মৃত্যু হয়েছে এই দেশের মাটিতে। উদ্দেশ্যহীনভাবে এলোমেলো ছড়িয়ে আছে ওদের কবরগুলো। অস্কার ওয়াইল্ড যাকে বলেছেন 'বিচরণশীল কবর' বা 'ওয়ন্ডারিং গ্রেভ্স্'— কখনো দিল্লির পাঁচিলের পাশে কখনো বা আফগান সীমান্তে।

হয়ত বিদেশের মাটিতে যে কবরস্থানগুলো গড়ে উঠেছে তার অধিকার কখনও ইংল্যান্ডের হাতে আসবে না। তবে কবরগুলো সংরক্ষণের দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে কারণ বিদেশী সরকারের হাতে তার আত্মজনের মৃতদেহ এইভাবে ফেলে যাবার কথা সে ভাবতেও পারে না। তাই বিদেশের মাটিতে যত্রতত্র ছড়িয়ে থাকা কবরস্থানগুলো দেখাশোনা এবং সংরক্ষণের জন্য ইংল্যান্ডে একটা তহবিল গড়া হ'ল এবং ভারতের অবস্থিত ব্রিটিশ হাই কমিশনের হাতে এই দায়িত্ব তুলে দেওয়া হ'ল। ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ নিজেই উদ্যোগ নিয়ে এই বেসরকারী তহবিল গড়ে তুললেন।*

সিপাহী বিদ্রোহ যখন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে তখন কানপুরের একটা কুয়োর মধ্যে নানাসাহেব আর তাঁর বিদ্রোহী অনুচরেরা প্রায় ৯৫০ জন মৃত বা অর্ধমৃত ইংরেজ মহিলা এবং কচি বাচ্চাদের কাটা হাত পা ফেলে দিয়েছিল। এই হতভাগ্য ঘটনাকে স্মরণীয় করতে কুয়োটাকে একটা স্মারক করার সিদ্ধান্ত নেয় ব্রিটিশ রাজ। তাই অল্ সোল্স্ চার্চের তরফ থেকে হতভাগ্য মানুষগুলোর স্মৃতির উদ্দেশে একটা লিপি লেখানো হয় এবং কুয়োর গায়ে উৎকীর্ণ করা হয়। কিন্তু ১৫ আগস্টের আগেই ওই উৎকীর্ণ লিপি পাকাপাকি ভাবে ঢেকে দেওয়া হ'ল পাছে ভারতীয় স্বাদেশিকতা ক্ষুণ্ণ হয়।

ইংরেজকে চলে যেতেই হবে। তবে যাবার আগে প্রতিটি ঘটনাতেই যেন ব্রিটিশ

---

* চেষ্টাটা সাধু হলেও ফল স্থায়ী হয় নি। দিনকয়েক খুবই নাড়াচাড়া হ'ল তহবিল গড়া নিয়ে। তারপরই সব চুপচাপ। ঝিমিয়ে গেল বেসরকারী উদ্যোগ। টাকা পয়সা যা উঠলো তাও যৎসামান্য। মাদ্রাজ থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত যেখানেই যাও সর্বত্রই এক ছবি। বেদীর ওপর ঘাস গজিয়েছে। ঢেকে দিয়েছে খোদাই করা লিপি। বুনো ঘাস আর আগাছা ছাওয়া ইংরেজের গোরস্থানগুলো এমন পোড়ো হয়ে গেছে যে, সেগুলিকে ভ্রষ্টব্যবস্থ বলা যায় না। এইরকমই শোচনীয় হয়েছে ব্রিগেডিয়ার জন নিকল্‌সনের সমাধিটা। অমন জাঁদরেল জেনারেল, যিনি বিদ্রোহের পরে দিল্লীর বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করেছিলেন, তাঁর সমাধি বেদীর দুরবস্থা দেখলে যে কোন ইংরেজের চোখ ছলছল করবে। আগাছায় ঢেকে যাওয়া বেদীর ওপর দাঁত বের করা বাঁদরগুলো ছুটোছুটি করে তাড়া করছে গিরগিটিদের।

www.pathagar.com

দম্ভ আর আভিজাত্যের ছোঁয়া লেগে রইল। একটা দুটো ঘটনার কথা বললেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে! ধরা যাক পোলো খেলার টাট্টু ঘোড়াগুলোর কথা। পাছে তাদের টঙ্গা গাড়ির হাঁড়কাঠে জোতা হয় তাই সার্ভিস রিভলভারের গুলির ঘায়ে তাদের ভববন্ধন ঘুচিয়ে দেওয়া হ'ল। ঠিক একই রকম পরিণতি হ'ল কোয়েটার স্টাফ কলেজের কয়েকশ' শিকারী কুকুরেরও। কলেজের তখনকার অধ্যক্ষ কর্নেল নোয়েল স্মিথ কুকুরগুলোর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে অসমর্থ হয়ে এই নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এটাই নাকি তাঁর জীবনের সবচেয়ে বেদনাময় ঘটনা কারণ চিরক্ষণের এই সংগীদের এমন পরিণামের কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। বলাবাহুল্য, ইংরেজের সারমেয়-প্রীতির এ এক উৎকট দৃষ্টান্ত। তবে এই প্রীতির চরম উৎকর্ষ দেখা গেল এ দেশে কেনেল্ ক্লাবের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা তৈরি করার সময়। ভাইসরয়ের খাস দপ্তরের কর্মচারীকেও জরুরী সব কাজ ফেলে এই মিটিংয়ে যোগ দিতে ছুটে আসতে হয়েছিল।

মাউন্টব্যাটেন ইতিমধ্যেই কড়া হুকুম দিয়েছেন যে এখানকার কোন কিছুই সংগে নেওয়া হবে না। তা সে ক্লাইভ, হেস্টিংস বা ওয়েলেসলির তৈলচিত্র হ'ক বা প্রপিতামহী মহারানী ভিক্টোরীয়ার ভাস্করমূর্তি হ'ক। রেখে যেতে হবে অন্য দরকারী জিনিসপত্রও। যেমন সরকারী সীলমোহর, রুপোর বাসনকোসন, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং প্রশাসনিক নানা খুঁটিনাটি বস্তু। কাজে লাগার এইসব জিনিসগুলো ভারত ও পাকিস্তান কিভাবে ব্যবহার করবে সে সম্বন্ধে কোন নির্দেশও দিয়ে যাবে না তারা। মাউন্টব্যাটেনের চীফ্ অব স্টাফ্ লর্ড ইস্‌মে এর কারণটি ব্যাখ্যা প্রসংগে বললেন যে, ব্রিটেন চায় যে ভারত তার সংগে দুশ' বছরের ঐতিহ্য-পূর্ণ সম্পর্কটা গর্বভারে মনে রাখুক। হয়ত এর জন্য এইসব স্মারকবস্তুগুলো ফেলে যাবার দরকার নেই। কিন্তু সে কথা ভারতীয়রাই বলুক।

অবশ্য ভাইসরয়সাহেব যত কড়া নির্দেশই দিন না কেন, কিছু কিছু স্মারকদ্রব্য সংগে নিয়েই যেতে হয়েছিল তাদের। যেমন ধরা যাক ইণ্ডিয়ান আর্মির ব্রিটিশ অফিসারদের পাওয়া সামরিক রৌপ্যপদকগুলো। এগুলো তারা সংগে নিয়েই যায়। এই প্রসংগে একটা ঘটনার উল্লেখ করি। বোম্বাই শহরে শুল্কবিভাগের বড়কর্তা একদিন তাঁর ঘরে দুজন ব্রিটিশ ইন্‌স্‌পেকটরকে ডেকে পাঠালেন। ভদ্রলোকের নাম ভিক্টর ম্যাথুজ। ম্যাথুজ বেশ দুঁদে অফিসার। দুই ইন্‌স্‌পেকটরকে ডেকে ঘোঁত ঘোঁত করে বললেন, 'দ্যাখো বাপু, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তার কারবার গুটিয়ে এদেশ থেকে চলে যেতে পারে, কিন্তু তা বলে এই সম্পদটা আমরা কিছুতেই ভারতীয়দের হাতে ছেড়ে যাব না।' কথাটা বলে তাঁর পিছনে রাখা তালাবন্ধ একটা লোহার সিন্দুক দেখালেন। তারপর চাবিটা নিয়ে একজনের হাতে দিলেন।

যার হাতে দিলেন তার নাম জন ওয়ার্ড অর্। লোকটা খুবই ভয়ে ভয়ে সিন্দুকটা খুললো। না জানি কোন দুর্মূল্য বস্তু এর মধ্যে আছে! হয়ত কোন অমূল্য ভাস্কর্য মূর্তি, কিংবা মূল্যবান পাথর বসানো কোন বুদ্ধমূর্তি। কিন্তু ডালা খুলে লোকটা স্তম্ভিত। সিন্দুকের মধ্যে সযত্নে রাখা আছে খানকয়েক মোটামোটা ছবির বই। একখানা হাতে নিয়েই সে বুঝতে পারলো ঠিক কেমন সম্পদ সেটি। বলতে কি, আমলাতান্ত্রিক এবং অভিভাবকসুলভ মনোভাবের একটা বিচিত্র নিদর্শন হ'ল এই ছবির বইগুলোর সংরক্ষণ। কিন্তু মিথুনাসক্ত নর-নারীর এই অবাধ সংগমচিত্রগুলো এমন লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে রাখা কেন?

www.pathagar.com

এ দেশের মন্দিরের দেওয়ালেই তো এইসব সঙ্গমচিত্র সকলের চোখের ওপর অবাধে দেখানো হয়েছে! তাহলে এই চূড়ান্ত অশ্লীল ছবিগুলো ওই ডাকসাইটে শুল্ক বিভাগের অফিসারটি আগলে রেখেছেন কেন? উনি কি নাবালক ভারতীয়-দের অভিভাবক? যা হ'ক, একখানা বই হাতে নিয়ে খানকয়েক পাতা ওল্টাল লোকটা। ছবির বইয়ের নাম দ্য থার্টিনাইন পোজিশনস্ অব লাভ অর্থাৎ ঊনচল্লিশ রকমের কামক্রীড়া। য়্যালবামের ছবিগুলো যেন খাজুরাহো মন্দিরগাত্রে আঁকা হিন্দু দেবদেবীর আশ্চর্য সুন্দর এবং কাল্পনিক মিথুনমূর্তির এক অক্ষম ব্যবহারিক প্রয়োগ। কোন প্রখ্যাত ব্যালে নর্তকীর এক আঙুলের ওপর নাচ দেখে কোন বয়স্কা স্থূলাঙ্গী যেমন শরীর ঘোরানোর অক্ষম চেষ্টা করে, এও ঠিক সেইরকম।

মোটকথা ভিক্টর ম্যাথুজ নামে সেই শুল্ক অফিসারটির মনের উৎকণ্ঠা তখন কেটে গেছে। সিন্দুকের চাবিটা সহকারীর হাতে দিয়ে ম্যাথুজ ভাবলেন যে এবার তিনি নিশ্চিন্ত মনে দেশে ফিরতে পারবেন। কারণ তাঁর সিন্দুকের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদটা শেষমেশ ইংরেজের হেপাজতেই রেখে যেতে পারলেন।*

বোম্বাই, ১৯৪৭

অন্যদিনের মতন সেদিনও ভোরের নরম সূর্যালোক গায়ে মেখে নিঃসঙ্গ জিন্না পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালেন নির্জন কবরস্থানে। তারপর ফুলের তোড়াটা ছোট্ট

---

* বিখ্যাত সিন্দুকটা প্রায় একদশক ইংরেজের হেপাজতেই ছিল। উইচার নামে যে কর্মচারীর হাতে সিন্দুকের চাবিটা দেওয়া হয়, সে যত্ন করেই সেটা নিজের বাড়িতে রাখে। কিন্তু একদিন একটা অঘটন ঘটে। সিন্দুকের ডালাটি অসাবধানে খোলা থাকায় উইচারের সাধ্বী স্ত্রী কৌতূহলবসে ছবির বইগুলো দেখে ফেলে। প্রায় ধাত ছাড়ার অবস্থা হয় সেই যাজক কন্যার। অনন্যোপায় স্বামী বেচারার পক্ষে ট্রাঙ্ক বোঝাই অশ্লীল ছবির বইগুলো তখন আর নিজের ঘরে রাখা সঙ্গত মনে হয় না। এদিকে ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাবার সময় হয়েছে উইচারের। সুতরাং জন্ ওয়াড অর-এর কাছে সিন্দুকটা পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হয় উইচার। সেই থেকে সিন্দুকটা অর-এর কাছেই ছিল। কিন্তু ১৯৫৫ সালে তার দেশে ফেরার সময় আর একবার সংকট হ'ল সিন্দুকটা নিয়ে। তেমন সহৃদয় ইংরেজ কোথায় পাবে যে জেনেশুনে অশ্লীল ছবির সংগ্রহগুলো নিজের কাছে রেখে সংসারে অশান্তি ডেকে আনবে? অবশেষে সে স্থির করলো যে মূল্যবান এই সম্পত্তি ভারতীয়দের হাতেই তুলে দেবে সে। তাদের জিনিষ তারাই বুঝে নিক। এই ভেবে ফরাসী ভাষা শেখার জন্য দুখানা বই নিজের কাছে রেখে সম্পূর্ণ সিন্দুকটি বোম্বাইয়ের রাগবি ক্লাবের যুবকদের হাতে তুলে দিয়ে অর হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। কিন্তু দুর্ভোগ কাটলো না তার। ইংল্যাণ্ডে ফেরার পর একটা সরকারী চিঠি পেল অর। ইংল্যাণ্ডের শুল্ক বিভাগ থেকে সে জানতে পারলো যে অশ্লীল বই এবং ছবি রাখার অপরাধে তার জিনিসপত্র আটক করা হয়েছে।

www.pathagar.com

পাথরের বেদীর ওপর রেখে চুপ করে চেয়ে রইলেন কবরটার দিকে। আজই শেষ দিন। আর কোনদিনই এখানে এসে ফুল দিয়ে অন্তরের নিবিড় শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করবেন না তিনি। হায়! সেদিন কে জানতো যে আর কিছুদিনের মধ্যে ভাগ্যের মোচড়ে তিনিও মানুষের স্মৃতির মধ্যেই এইভাবে বেঁচে থাকবেন এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ এমনি করে তাঁকেও চিরকাল স্মরণ করবে।

এই উপ-মহাদেশে মহম্মদ আলি জিন্না যে একজন বিশিষ্ট নেতা সে কথা কে না জানে। তবে অনেকেরই যা জানা নেই তা হ'ল যে, এই বিশিষ্ট মানুষটির সমস্ত রাজনৈতিক গুণপনা ছাপিয়েই এমন এক বিস্ময়কর আবেগ এসেছিল যা তাঁকে মানায় না। বন্যার মতন এই আবেগ এসেছিল কঠোর মানুষটির হৃদয়ে। এত বড় মাপের এই মুসলমান নেতার জীবনে এমন দুর্বার প্রেম কদাচিৎ আসে। কিন্তু মহম্মদ আলি জিন্নার জীবনে এসেছিল এই প্রেম। যে নারীকে ঘিরে এই উন্দামতা তাঁরই নিষ্প্রাণ দেহটা শায়িত আছে কবরের তলায়। সেদিন এই দুটি মানুষের প্রেম সমাজের কোন নিষেধ বা ভ্রূকুটির তোয়াক্কাও করে নি। শুধু প্রেম করাই নয়, সকলের চোখের ওপরেই জিন্না তাঁকে বিয়েও করেন। অথচ বাধাটা মস্ত ছিল তাঁদের মধ্যে। মহিলাটি যে জিন্নার স্বধর্মানুরাগিণী ছিলেন না তা গোপন ছিল না সেদিন। মেয়েটি ছিলেন একজন জরথুস্ত্রপন্থী পার্শী, যাদের মৃতদেহ শকুন দিয়ে ভক্ষণ করানো হয়। তাই তাঁর মৃত্যুর পর মুসলমানের কবরস্থানে সমাহিত হবার যোগ্যতাও ছিল না তার মৃতদেহের।

যেদিন চুপি চুপি জিন্নার জীবনে প্রেম আসে সেদিন তাঁর জীবনের অপরাহ্ন-কাল। ধরেই নেওয়া হয়েছিল যে বাকী জীবন এমনিই নিঃসঙ্গ কাটবে এই কঠোরব্রতী মানুষটির।* কিন্তু কাটলো না। একচল্লিশ বছর বয়সে মদনাহত হলেন জিন্না। তাঁর নিষ্পত্র জীবন ছেয়ে গেল নতুন পাতায়। মেয়েটির নাম রুত্তী (রতনভাই)। সপ্তদশী রুত্তী জিন্নারই এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মেয়ে। দার্জিলিং বেড়াতে এসে মাউন্ট এভারেস্ট হোটেলে দেখা হল দুজনের। প্রথম সাক্ষাতেই নিবিড় প্রেমে আচ্ছন্ন হলেন জিন্না। রুত্তীর অবস্থাও তদ্রূপ। জিন্নাকে দেখেই যেন বিকারগ্রস্তা হ'ল সে। ব্যাপারটা জানাজানি হতে দেরি হ'ল না। রুত্তীর কোটিপতি বাপ বেজায় খাপ্পা হয়ে গেলেন। শেষপর্যন্ত আদালতের হুকুমনামা নিয়ে মেয়ে আর জিন্নার মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। প্রেমের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন ৪১ বছরের জিন্না আর ১৭ বছরের যুবতী রুত্তী। তারপর আঠার বছরের জন্মদিনের উৎসব যেদিন শেষ হ'ল, সেদিন কোটিপতি বাপের আশ্রয় ছেড়ে এক কাপড়ে বেরিয়ে এলেন রুত্তী। সংগে রইল কেবল কোলের কুকুরটা। বোধহয় জিন্নার সংগে তাঁর বিয়ের সাক্ষী হ'ল বাপের বাড়ির এই কুকুরটা।

* বস্তুত, জিন্নার যখন যুবক বয়স তখনই এক বালিকার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। লণ্ডনে পড়তে যাবার আগেই এই বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর আত্মীয়বর্গ। কিন্তু জিন্না তাঁর বালিকা বধূকে চোখেও দেখেন নি। কারণ, তাঁদের ধর্মীয় প্রথামত বিয়ের সময় বালিকার একজন পুরুষ প্রতিনিধির সঙ্গে বিয়ের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম পালিত হয়। তারপর ব্যারিস্টার হয়ে যখন তিনি দেশে ফিরে আসেন তখন সেই বালিকা বধূ বেঁচে ছিল না।

www.pathagar.com

ওঁদের বিয়ে কিন্তু দশবছরের বেশি টিকে থাকেনি। এই দশবছরে রতনভাই জিন্না ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছেন এক অসামান্যা সুন্দরী মহিলায়। তাঁর আকর্ষণীয় রূপৈশ্বর্য প্রায় গল্পকথার শামিল হয়ে দাঁড়ায়, বোম্বায়ের শৌখিন সমাজে। তাঁর ক্ষীণ দেহপটখানি ফিনফিনে, স্বচ্ছ শাড়ির আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখতেন রতনভাই বা রুত্তী জিন্না। একে অসামান্য সুন্দরী তার প্রাণরসে ভরপুর এই মহিলার স্পষ্ট এবং নির্ভীক কথাবার্তা শুনে অনেক পুরুষই কৃতার্থ হতেন। বলতে গেলে বোম্বাই শহরের নিষ্প্রাণ একঘেয়ে সমাজে এই রসিকা রমণী একটা মধুর উচ্ছ্বাস এনে দেন।*

দশটা বছর এমনি করে প্রেমের সাগরে নিঃশংক ভেসে বেড়ালেন তাঁরা। কিন্তু বয়স ও প্রকৃতিতে এই বৈষম্য কিছুতেই যেন খাপ খেল না। দুটি মন ক্রমেই দুর্বহ চাপে পিষ্ট হতে লাগলো। রুত্তীর নির্ভীক চালচলন, তাঁর তীক্ষ্ণ শ্লেষাত্মক বাক্‌চাতুরী প্রায়ই জিন্নাকে নানা অস্বস্তির মধ্যে ফেলতে লাগলো। ক্রমেই রুত্তীর নিঃসংকোচ ব্যবহারে একটার পর একটা নিষেধের পাঁচিল উঠতে লাগলো জিন্নার রাজনৈতিক জীবনে। রুত্তীর প্রতি তাঁর অমন উদ্দাম ভালবাসা সত্ত্বেও স্ত্রীর উচ্ছল আর তরল জীবনযাপনের সঙ্গে কিছুতেই সংগতি রেখে চলতে পারলেন না জিন্না। ক্রমশ এমন হ'ল যে দুজনেই যেন দুই বিপরীত মেরুর অধিবাসী হয়ে উঠলেন। তবুও জিন্না আশা করেছিলেন যে রুত্তী অন্তত তাঁকে বোঝার চেষ্টা করবে। কিন্তু তাঁর সে স্বপ্ন চুরচুর হয়ে ভেঙে গেল যখন ১৯২৮ সালে রুত্তী তাঁকে ছেড়ে গেলেন। এই নিদারুণ বিচ্ছেদের পর আর একবছর বেঁচে ছিলেন রুত্তী। ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শূল্যব্যথার অসহ্য দাপটে উন্মাদের মতন অধিক মাত্রায় মরফিয়া ইঞ্জেকশন নিয়ে ফেলেছিলেন রুত্তী। আর তাতেই তিনি মারা যান। এতবড় ঘটনাটা জিন্নার বুকে সেদিন শেলের মতন বিঁধেছিল। বউ পালানোর ব্যাপারে পাছে লোক জানাজানি হয় তাই মুষড়ে ছিলেন জিন্না। কিন্তু রুত্তীর এই হঠাৎ মৃত্যুতে শোকে যেন পাথর হয়ে গেলেন তিনি। যেদিন তাঁর কবরে প্রথম মাটি দিলেন জিন্না, সেদিন হাউহাউ করে কেঁদে-ছিলেন তিনি। অমন কঠিনহৃদয় ও আপাদমস্তক রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মানুষটাকে সকলের চোখের সামনে কাঁদতে দেখে সাধারণ মানুষ অবাক হয়ে গিয়েছিল সেদিন। ইনিই কায়েদ-এ-আজম্? ইনিই মুসলমানদের পরিত্রাতা? সেই দিনটি থেকেই এই উপ-মহাদেশের মুসলমানদের পরিত্রাণের জন্য প্রাণপণ করার সংকল্প নিলেন কায়েদ-এ-আজম্ জিন্না। একা এবং নিঃসঙ্গ এই লড়াইটা যেন তাঁর জীবনের ব্রত হয়ে গেল সেই দিনটি থেকে।

* ১৯২১ সাল। নিউদিল্লির এক সরকারী ভোজসভায় বড়লাট লর্ড রীডিংয়ের পাশে বসেছেন রতনভাই বা রুত্তী জিন্না। কথায় কথায় বড়লাট দুঃখ করে বললেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই জাতিতে জাতিতে এমন অবিশ্বাস ও অবজ্ঞার ভাব প্রকট হয়েছে যে তাঁর পক্ষে আর কোনদিনই জার্মানী যাওয়া হবে না। রুত্তী জিন্না একটু যেন আশ্চর্য হলেন। বললেন, 'কেন যাওয়া হবে না?' উত্তরে বড়লাট লর্ড রীডিং বললেন, 'জার্মানরা আমাদের মানে ব্রিটিশার্সদের আর চাইছে না তাদের দেশে। তাই যাওয়া হবে না।' জবাব শুনে রুত্তী জিন্না আরও আশ্চর্য হলেন। তারপর বললেন, 'আমরাও তো আপনাদের চাইছি না। তাহলে?'

www.pathagar.com

দিল্লি, আগস্ট ১৯৪৭

এক চোখের ওই চশমাটা (মোনোকল্) ছাড়া জিন্নার শরীরে তখন আর কোন খাঁটি বিলিতি দম্ভই অবশিষ্ট নেই। আজ তাঁর ঘরে ফেরার দিন। তাই গায়ের বিলিতি পোশাকটাও খুলে রেখেছেন জিন্না। একটু পরেই বিমানটা পেঁৗছে যাবে তাঁর ঘরের শহর করাচিতে। প্রায় পঞ্চাশ বছর হ'ল তিনি করাচি ছেড়েছেন। বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য এই শহরটা ছেড়ে যাবার দিন জিন্নার পরনে যে পোশাক ছিল, আজও সেই পোশাক। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা শেরওয়ানি, গোড়ালি ঢাকা আঁট চুড়িদার পায়জামা আর চপ্পল।

জিন্নার নতুন এ.ডি.সি.র নাম সৈয়দ আহ্সান। গতকাল পর্যন্ত সে বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেনের এ.ডি.সি. ছিল। বিমান বন্দরে দাঁড়িয়ে আছে ঝকঝকে সাদা রঙের 'ডি.সি.থ্রি' বিমানখানা। স্বয়ং ভাইসরয় উপহার পাঠিয়েছেন তাঁকে। এতে চড়েই আজ তিনি করাচি যাবেন। ছোকরা এ.ডি.সি.কে সংগে নিয়ে পায়ে পায়ে সিঁড়ি ভেঙে বিমানে উঠলেন জিন্না। তারপর ঘুরে তাকালেন বিমানবন্দরের দিকে। শেষ বারের মতন দিল্লি দেখা। ওই দূরে দিগন্তে যেখানে আকাশ আর মাটি মিশেছে ওখানেই দিল্লি শহর। ওখানে বসেই দিনের পর দিন ধরে ইসলামিক রাষ্ট্রের জন্য আপসহীন লড়াই করে গেছেন তিনি। হায়! ভাগ্যের কি অদ্ভুত মোচড়! এই শহরটাই আজ তাঁর কাছে পর হয়ে গেল। ক্ষুণ্ণ জিন্না মনে মনে বললেন, 'বোধহয় এই-ই আমার শেষ দিল্লি দেখা।'

জিন্নার এই আক্ষেপটা মিথ্যে নয়। ইতিমধ্যেই ঔরংগজেব রোডের দশ নম্বর বাড়ির হাত বদল হয়েছে। এই বাড়িতে বসেই জিন্না তাঁর লড়াইয়ের কৌশল ফেঁদেছেন ভারতবর্ষের একটা অতিকায় মানচিত্রের গায়ে সবুজ রঙ বুলিয়ে। তাঁর অসম্ভব স্বপ্নটা সফল করার পিছনে এই বাড়ির দান কম নয়। সেই বাড়ির বর্তমান মালিক একজন হিন্দু শিল্পপতি। তাঁর নাম শেঠ ডালমিয়া। বাড়িটা এখন গোহত্যা নিবারণী সমিতির সদর কার্যালয় হয়েছে। তাই সাদা আর সবুজ রঙের মুসলিম লীগের পতাকার বদলে এখন গো-মাতার ছবি আঁকা পতাকা উড়ছে বাড়ির পতাকাদণ্ডে।

যাত্রার লগ্ন এগিয়ে এল। বিমানের ব্রিটিশ চালক প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে। কিন্তু সৈয়দ আহ্সান দেখলেন বিমানের ওই ক'টা সিঁড়ি ভাঙতেই নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন জিন্না। কোনরকমে সীটে বসে হাঁপাচ্ছেন। যাই হ'ক আর দেরি করা যায় না। ইংরেজ চালক বিমানে স্টার্ট দিলেন। রানওয়ের ওপর দিয়ে ছুটে চললো বিমান। অবশেষে একসময় শূন্যে লাফিয়ে উঠলো ডি.সি.থ্রি বিমানটি। বিমান যখন শূন্যে ভাসতে ভাসতে চলেছে তখন কেমন এক নির্বেদ অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন জিন্না। একসময় নিজের মনেই বলে উঠলেন, 'এই-ই এর শেষ।'

দিল্লি থেকে করাচি পর্যন্ত উড়ো পথটুকু নিঃশব্দেই কাটালেন জিন্না। তাঁর আসনের বাঁ দিকে থাকথাক করে সেদিনের সংবাদপত্রগুলো রাখা আছে। সকাল-বেলা সব ক'টি খবরের কাগজে চোখ বুলানো তাঁর একটা নেশা। সুতরাং সেদিনও

www.pathagar.com

এক এক করে দৈনিক কাগজগুলোয় চোখ বুলিয়ে নিলেন জিন্না। তারপর পরিপাটি ভাঁজ করে ডানদিকের গাদায় সাজিয়ে রাখলেন। সব ক'টা কাগজেই তাঁর সাফল্যের বিপুল প্রশস্তি ছাপা হয়েছে। কিন্তু এত প্রশংসাতেই তাঁর মুখে আত্মশ্লাঘার কোন ছাপ পড়তে দেখলো না সৈয়দ আহ্সান। শুধু তাই নয়। সারাটা পথ একটাও কথা বললেন না জিন্না কিংবা কোনরকম আতিশয্য দেখালেন না। অথচ তাঁর এই বিমানযাত্রা কী দারুণ প্রতিশ্রুতিময় !

করাচি পেঁাছে জানলা দিয়ে নীচে তাকিয়েই অভিভূত হয়ে গেল আহ্সান। একটা অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখতে পেল সে। ছোট ছোট টিলা সমন্বিত বিশাল বালুকাভূমিটা যেন মানুষের ঝিলে পরিণত হয়েছে। ওদের পরনের সাদা পোশাকে সূর্যের আলোকচ্ছটা পড়ে সাদা ঝকঝক করছে জায়গাটা। জিন্নার বোন ফতিমা উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলেন সে দৃশ্য দেখে। জিন্নার হাতখানা ধরে বললেন, 'দ্যাখো জিন্ তাকিয়ে দ্যাখো একবার !' কিন্তু জিন্নার নিরুত্তাপ দৃষ্টিতে এতটুকু উল্লাসের আঁচ দেখা গেল না। অনড় মুখে চকিতে একবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন সেই জনসমুদ্রের দিকে। এদের নিয়েই তাঁর ভিন্ন রাষ্ট্র পাকিস্তানের দাবি। কিন্তু এখন আর তাঁর দৃষ্টিতে সেই আগ্রহ নেই। পরম অবহেলায় বললেন, 'হ্যা, দেখছি বটে, অনেক মানুষ !'

কিন্তু এটা কি তাঁর উপেক্ষা ? হয়ত নয়। বস্তুত, মানুষটা সেদিন এতই অবসন্ন ছিলেন যে চোখ তুলে তাকাবার ইচ্ছাও ছিল না। আসন থেকে শরীরটাকে যে টেনে তুলবেন সে জোরটুকুও তাঁর তখন নেই। এই করাচি বন্দরে বিমানটা থামতেই তাড়াতাড়ি একজন সহকারী এগিয়ে এল যাতে তার গায়ে ভর্ দিয়ে বিমান থেকে নামতে পারেন জিন্না। কিন্তু জিন্নার কাছে এটা খুবই আপসোসের ব্যাপার। তাই দুহাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিলেন লোকটাকে। না। কারও সাহায্য নিয়ে যে কায়েদ-এ-আজম্ করাচি আসেন নি একথা লোকে জানুক। তারা আরও জানুক যে এই উপ-মহাদেশে মুসলমানদের ভাগ্য গড়েছেন তিনিই। সুতরাং তাঁর এই পরমুখাপেক্ষা সাজে না। দুর্দমনীয় ইচ্ছাশক্তি দিয়ে এক ঝটকায় শরীরটাকে খাড়া করলেন জিন্না। তারপর শক্ত আড়ষ্ট পায়ে উত্তেজিত আর প্রমত্ত জনতার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে গাড়ি পর্যন্ত হেঁটে গেলেন।

মোটর গাড়ির সারাটা পথই তখন মানুষের ভিড়ে থিকথিক করছে। বিমানের জানলা থেকে দেখা এই জনসমুদ্রটা তখন যেন সাদা কম্বলের মতন মনে হচ্ছে। মাঝে মাঝে দমকা ধুলোঝড়ের মতন গায়ে এসে লাগছে ওদের উন্মত্ত খুশীর ঢেউ। ওরা চেঁচাচ্ছে, 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ !' শুধু একবারই এই রীতির লঙ্ঘন হ'ল যখন তাঁর গাড়িখানা হিন্দু পাড়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। সেখানে পরিবেশটা থমথমে। জিন্নাও সেটুকু লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু এটাই স্বাভাবিক। 'ওরা কেনই বা খুশী হবে ?' কোন প্রতিক্রিয়া ছাড়াই হিন্দুপাড়া পেরিয়ে এলেন জিন্না।

এমনকি করাচির নিম্নমধ্যবিত্ত মহল্লার ভিতর দিয়ে যখন তাঁর গাড়ির মিছিল চলেছে, তখন বেলে পাথরের তৈরি দোতলা বাড়িখানা দেখেও তাঁর মনে কোন উচ্ছ্বাস দেখা দিল না। জায়গাটা পেরিয়ে এলেন একটাও মন্তব্য না করে যদিও ওই পাথরের দোতলা বাড়িটাতেই ১৮৭৬ সালের বড়দিনের দিন তিনি প্রথম এই পৃথিবীতে আলো দেখেন। তবে এই নির্লিপ্তভাবটি শেষ পর্যন্ত বজায় রইল না। অতিকায় ও গম্ভীর বিষণ্ণ চেহারার গভর্নমেন্ট হাউসের চওড়া সিঁড়ি দিয়ে

www.pathagar.com

ওঠার সময়ই তাঁর মনের মধ্যে মৃদু আবেগের সঞ্চার হতে লাগলো। তাঁর নিষ্প্রাণ কঠিন বহির্ভাগের অন্তরালে যে আলোড়ন হচ্ছে তা টের পাওয়া গেল তাঁর চোখে মুখে। ওপরে উঠে দম নেবার জন্য তখন দাঁড়িয়েছেন। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ছোকরা এ.ডি.সি. সৈয়দ আহ্সান। তার চোখে চোখ পড়তেই চকিত বিদ্যুতের মতন একটুকরো খুশীর ঝিলিক খেলে গেল জিন্নার চোখে। ধরা গলায় ফিসফিস করে অভিভূত জিন্না বলে উঠলেন, 'একবারও ভাবিনি যে এ জীবনে পাকিস্তান দেখে যাব।'

* *

ক্রমেই এগিয়ে আসছে সেই মহান মুহূর্তটা যার জন্য পাঁচ মাস আগেই মাউন্টব্যাটেনকে ছুটে আসতে হয়েছে এই উপ-মহাদেশে। বলতে গেলে মুঠোর মধ্যে চলে এসেছে মুহূর্তটা। হাতে আর ছত্রিশ ঘণ্টা সময়ও নেই এবং এর মধ্যেই ভারতে তিনশ' বছরের ব্রিটিশ রাজত্বের যবনিকাপতন হবে। দীর্ঘ দিনের এই সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকার যে অবসান হতে চলেছে সেই বোধটুকু পাঁচ মাস আগেই টের পেয়েছিলেন ভারতের সর্বশেষ ভাইসরয়, লর্ড মাউন্টব্যাটেন। যেদিন ইংল্যান্ডের নর্থোল্ট বিমানবন্দর থেকে এক কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে তাঁর ইয়র্ক বিমানে চড়ে মাউন্টব্যাটেন ভারতের উদ্দেশে রওনা হন, সেদিনই যেন এই বাস্তব সত্যটা তাঁর জানা হয়ে গিয়েছিল। যেটুকু বাকী ছিল সেটুকু নেহাতই আনুষ্ঠানিক।

সুতরাং শেষ দৃশ্যের অভিনয় যত এগিয়ে এল, ততই যেন মাউন্টব্যাটেনের একটাই চিন্তা প্রধান হয়ে উঠলো। তখন তাঁর ধ্যানজ্ঞান হলো কি করে ব্রিটিশ-রাজের খ্যাতি ও গৌরবের ঝুলিটা পরিপূর্ণ রেখে তাকে মানে মানে বিদায় দেওয়া যায়। একথা ঠিক যে ব্রিটিশরাজকে ফিরে যেতেই হবে। তবে যাবার আগে যদি সদিচ্ছা ও বোঝাবুঝির একটা সুবাতাস বইয়ে দেওয়া যায় এবং ব্রিটেন ও নতুন উদ্ভূত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একটা কুটুম্বিতা গড়ে ওঠে, তবে যাবার বেলায় শূন্য ঝুলি নিয়ে ফিরতে হবে না অমন প্রবল প্রতাপশালী ব্রিটিশরাজকে।

মাউন্টব্যাটেন ঠিকই জানেন যে, এক বালতি দুধের মধ্যে এক ফোঁটা চোনা পড়লেই দুধের অমৃতস্বাদ ঘুচে যাবে। তাঁর এত যত্নে তৈরি করা ইমারত তাসের ঘরের মতন ভেঙে পড়বে। এই বিশেষ বস্তুটি হ'ল স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের ওই ঐতিহাসিক রায় বা এ্যাওয়ার্ড যা লোকচক্ষুর আড়ালে ওই সবুজ শার্সিটানা বাংলোবাড়ির মধ্যে বসে এক মনে রচনা করে চলেছেন র‍্যাডক্লিফ। মাউন্টব্যাটেন তাই সদা সতর্ক হয়ে আছেন যাতে কোন মতেই এই ঐতিহাসিক রায়ের বিন্দু-বিসর্গও ১৫ আগস্টের আগে প্রকাশ না হয়। তিনি এও জানেন যে ব্যাপারটা গোপন রাখার এই সিদ্ধান্তের কথাটা জানাজানি হলেও সমূহ বিবাদের আশঙ্কা রয়েছে। ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটো স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের উৎপত্তি হবে, কিন্তু ও রাষ্ট্রদুটোর রাজনৈতিক নেতৃবর্গ জানবেও না কতটুকু তাদের অধিকার, কিংবা কোন্ কোন্ অঞ্চলের নাগরিকের আনুগত্য পেয়ে তারা কৃতার্থ হলো। এমন কি, রাষ্ট্রশাসনের পক্ষে যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেই সীমানাঞ্চলও চিহ্নিত হবে না। পাঞ্জাব ও বাংলার হাজার হাজার গ্রামবাসীকে স্বাধীনতা দিবসের আনন্দানুষ্ঠানে উদ্বেগ আর অনিশ্চয়তা নিয়ে যোগ দিতে হবে কারণ তখন পর্যন্ত কেউ জানবে না যে কোন রাষ্ট্রের দায় তাদের কাঁধে চাপলো।

এ এক কিম্ভূত পরিস্থিতি যেন। এই ক'টা দিন না থাকবে কোন প্রশাসন,

www.pathagar.com

না কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা। কিন্তু সব জেনেও মাউন্টব্যাটেন নিরুপায়। যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা থেকে এক চুলও নড়তে তিনি রাজী নন। ১৫ আগস্ট পেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কিছুতেই হাটে হাঁড়ি ভাঙবেন না তিনি। কারণ, র‍্যাডক্লিফ যে রায়ই দিন তা প্রকাশ হওয়ার পর ধুন্ধমার বেধে যাবে দুই দলের মধ্যে। তাঁর সব পরিশ্রম পণ্ড হয়ে যাবে। সুতরাং তাঁর যুক্তি হ'ল যে দেশের মানুষ আগে আনন্দ করুক, পরে না হয় দুর্গতির মোকাবিলা করবে। সুতরাং লণ্ডনে যে নোট্ তিনি পাঠালেন তার মধ্যেও একই যুক্তি দেখালেন মাউন্টব্যাটেন। তিনি লিখলেন, 'আমি স্থির করেছি যে দুই রাষ্ট্রের নেতৃবর্গ ১৫ আগস্ট পর্যন্ত এই রায় সম্বন্ধে যেন কিছুই জানতে না পারে। তা যদি না করি তবে ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার এত পরিশ্রম পণ্ড হয়ে যাবে। তুলকালাম বেধে যাবে ওই ক্ষমতা হস্তান্তরের দিনটিতেই সুতরাং বাধ্য হয়েই এই ঝুঁকি আমায় নিতে হ'ল।'

এরপর ঠিক ঘড়ির কাঁটার মতন কাজ হ'ল। ১৩ আগস্ট সকালেই স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের আই.সি.এস. সহকারী মাউন্টব্যাটেনের হাতে মোহর করা দুটো মুখবন্ধ খাম দিল। মাউন্টব্যাটেনের নির্দেশে তখনই ওই মুখবন্ধ খাম দুটো চামড়া মোড়া সবুজ রঙের ভাইসরীগ্যাল ডেসপ্যাচ বক্সের মধ্যে তালাবন্ধ করে রাখা হ'ল। পরবর্তী ৭২ ঘণ্টা খামদুটো ওইভাবেই ডেসপ্যাচ বাক্সর মধ্যে তালাবন্ধ অবস্থায় রইল। তারপর সারা দেশ যখন স্বাধীনতা উৎসবে উদ্বাহু হয়ে নাচছে, তখন ডেসপ্যাচ কেসের মধ্যে বন্দী খামযুগল যেন প্যান্ডোরার বাক্সের সেই দুর্বৃত্তের মতন অধীর হয়ে রইল, কখন মুক্তি পেয়ে প্রমত্ত মানুষগুলোর কাছে তার নির্মম রায় শোনাবে।

দেশময় যেখানে যত সেনানিবাস আর ছাউনি আছে সর্বত্রই তখন হিন্দু, শিখ ও মুসলমান অফিসারদের মধ্যে বিদায় বেলার কোলাকুলি শুরু হয়ে গেছে। সবাই সবাইকে শেষ নমস্কার জানাচ্ছে। আর কিছুক্ষণ পরেই তারা ভাগাভাগি হয়ে যাবে দুই রাষ্ট্রে। দিল্লিতে শিখ ও ডোগ্রা স্কোয়াড্রনের তরফ থেকে মুসলমান স্কোয়াড্রন অফিসারদের সম্মানে এক বিশাল ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছে। এতকাল এই দুই স্কোয়াড্রন্ ঐতিহ্যময় প্রবীন্স্ হর্স-এর অন্তর্গত ছিল। ভোজের দেদার আয়োজন করা হয়েছে। একপাশে চড়-চড় করে রাখা আছে গরম ভাত, মুরগির মাংস, শিখ কাবাব আর কিশমিশ, বাদামের পায়েস। প্রথমে একত্রে কুচকাওয়াজ করলো হিন্দু, শিখ ও মুসলমান অফিসাররা। তারপর শুরু হ'ল ভাঙড়া নাচ। সবশেষে খাওয়াদাওয়া। রেজিমেন্টের ইতিহাসে এমন অভিনব অভিনব মিলনোৎসব আগে কখনও অনুষ্ঠিত হয়নি।

একই রকম মিলনোৎসব রাওয়ালপিণ্ডিতেও অনুষ্ঠিত হ'ল। হিন্দু ও শিখ কমরেডদের সম্মানে ভোজসভার আয়োজন করলো সেখানকার মুসলমান ক্যাভালরি। সেই বিপুল 'বড়াখানা' উৎসবে প্রত্যেক হিন্দু এবং শিখ অফিসার আলাদাভাবে সজল চোখে ওদের নেতা কর্নেল ইদ্রিসের কাছে বিদায় চাইল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনেক যুদ্ধাভিযানের এই সফল যুদ্ধনায়কের চোখদুটিও অশ্রুহীন ছিল না সেদিন। বিদায় ভাষণে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে কর্নেল ইদ্রিস বললেন, 'আমরা যেখানেই যাই না কেন, চিরকাল সহোদর হয়েই থাকবো, কারণ একসঙ্গে আমরা অনেক রক্ত

www.pathagar.com

ঝরিয়েছে। কর্নেল ইদ্রিস আর একটা দুঃসাহসিক কাজ করলেন। প্রস্তাবিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের একটা নির্দেশ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন। নির্দেশ ছিল যে বিদায়ী হিন্দু ও শিখ সেনারা যেন তাদের ব্যবহার করা অস্ত্রশস্ত্র রাওয়ালপিণ্ডিতে রেখে যায়। কর্নেল ইদ্রিস সে নির্দেশ মানলেন না। তিনি লিখে পাঠালেন যে এঁরা সৈন্য এবং অস্ত্র নিয়েই এসেছিলেন। সুতরাং অস্ত্রসহ ফিরে যাবেন এঁরা। ভাগ্যিস সেদিন শিখ ও হিন্দু সেনাদের নিরস্ত্র ফিরতে হয় নি। অন্যথায় দিল্লি ফেরার পথে মুসলিম লীগ জাতীয় রক্ষিবাহিনীর হাতে এঁদের কচুকাটা হতে হ'ত।

সবচেয়ে মর্মস্পর্শী বিদায় উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ল দিল্লি জিমখানা ক্লাবের জমকালো বলরুমে। একসময় সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদের খুবই নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল ছিল এই ঐতিহ্যপূর্ণ ক্লাবটি। একটা বিশেষ মর্যাদা ও অধিকারপ্রাপ্ত এই প্রতিষ্ঠানটা তখন ভারতীয় অফিসারদের কাছে নিষিদ্ধ ছিল। যা হ'ক, সেই সময় বিগত হয়েছে এবং জিমখানা ক্লাবও তার ইম্পীরিয়্যাল বা রাজকীয় খোলসটি হারিয়ে অবারিত হয়ে গেছে ভারতীয়দের কাছে। সেদিন এই ক্লাবের লন্ এবং বলরুমেই অনুষ্ঠিত হ'ল বিদায় সংবর্ধনা। চিত্রাংকিত এবং সুমুদ্রিত নিমন্ত্রণ-পত্র বিলি হ'ল ভারতীয় ডোমিনিয়নের আর্মড্ ফোর্সেস অফিসারদের নামে। নেমতন্ন পেলেন পাকিস্তান ডোমিনিয়নের বিদায়ী আর্মড্ ফোর্সেস অফিসারগণ।

আসন্ন বিচ্ছেদের ভারে খুবই ব্যথাম্লান ছিল সেদিনকার এই সংবর্ধনা উৎসবের মেজাজ। তখন দুপক্ষই অভিভূত হয়ে পড়েছে এক নিবিড় বিষণ্ণতায়। ওদের আলাপচারিতায় বোঝার জো ছিল না যে ওরা আলাদা। নিপুণভাবে ছাঁটা গোঁফ, স্যামব্রাউন ফৌজি বেল্ট এবং অসংখ্য পদক শোভিত সামরিক উর্দি পরা অফিসার-দের কথাবার্তা, তাদের উচ্ছ্বসিত গালগল্পের কাহিনী, ইত্যাদি শুনে মনে হচ্ছিল যে ওরা আলাদা ছাঁচে ঢালাই হয় নি। নাচঘরের আবছা আলোয় ওদের গৃহিণীদের ঝলমলে শাড়ির চেকনাইয়ের মধ্যেও আলাদা অস্তিত্বর বালাই ছিল না। সেদিন সবাই এমনভাবে মিলেমিশে গিয়েছিল যে বোঝাই যায় নি যে ওরা পৃথক হতে চলেছে।

তখন সবাই কথা বলছে, খুশীর মেজাজে ভরপুর হয়ে আছে সবাই। কারও হাতে খাবারের প্লেট, কারও হাতে পানীয়র গেলাস। গালগল্পেরও যেন শেষ নেই। মনে পড়ে মেসের সেই সব খুশীর দিনগুলোর কথা? কিংবা বর্মা মুলুকে শ্বাপদসংকুল জঙ্গলের মধ্যে আমাদের প্রাণপণ লড়াই? অথবা সীমান্ত-প্রদেশে বিদ্রোহী দেশবাসীদের ওপর চড়াও হবার সেই সব দুঃসাহসিক ঘটনা? মোটকথা সুখে-দুঃখে একই পোশাকের তলায় জাতিধর্মনির্বিশেষে ওরা একত্র হয়ে একটা বিশেষ ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি করেছিল যেন।

কিন্তু স্মৃতিরোমন্থনকারী সেদিনের বিষণ্ণ সন্ধ্যায় ওরা কেউ অনুমানও করতে পারে নি যে কি দারুণ ট্র্যাজেডি ঘনিয়ে আসছে ওদের জীবনে। বিদ্বেষবিষে জরজর রাজনীতির হাঁড়িকাঠে ওরা যে জবাই হতে চলেছে তার বিন্দুবিসর্গও আঁচ করতে পারে নি ওরা। তাই নির্বিকার মনে ওরা গলা জড়াজড়ি করে ঘুরে বেড়িয়েছে বলরুমে। আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে পরস্পরকে মনে করিয়ে দিয়েছে পরবর্তী কোন আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানের কথা। 'তাহলে সেপ্টেম্বর মাসে শুয়োর শিকারের সময় দেখা হচ্ছে ত।' অথবা 'লাহোরের পোলো খেলার কথা ভুলো না

www.pathagar.com

কিন্তু!' কিংবা, 'এবার কিন্তু কাশ্মীরে গিয়ে বুনো ছাগল শিকার করতেই হবে; গতবার আমরা খুব মিস্ করেছিলাম!'

অবশেষে অনুষ্ঠানের সমাপ্তিপর্ব এগিয়ে এল। বিসর্জনের বাজনা বেজে উঠেছে। যাবার সময় হ'ল বিহঙ্গের। এবার বিদায় নেবার পালা। কিন্তু এ বিদায় কি চিরদিনের? ডায়াসের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে হিন্দু ব্রিগেডীয়ার কারিয়াপ্পা বললেন, না, এ-বিদায় চিরকালের নয়। এ বিদায় 'আপাতত'(আ রেভ্যুর)। কারিয়াপ্পা বললেন, 'আজ আমরা আ রেভর্ (au revoir) বলতেই এখানে জড়ো হয়েছি। শুধুই আ রেভর্। কারণ বন্ধুর মতনই আবার আমাদের দেখা হবে।' একটু থেমে কারিয়াপ্পা ফের বললেন, 'এতকাল আমাদের ভাগ্য এমন অভিন্ন ছিল যে এই ইতিহাসটাকে আলাদা করা যায় না।' এরপর তিনি সেই সব ঘটনার কথা বললেন যেখানে সবাই মিলেমিশে লড়াই করে একই রকম ভাগ্য গড়েছে। অবশেষে যখন শেষ কথাটা বললেন তখন আবেগে গলা বুজে গেল যেন। কারিয়াপ্পা বললেন, 'আমরা চিরকাল সহোদর ভাই এবং যেখানেই থাকি ভাই হয়েই থাকবো। আমরা কখনও সেই মহান দিনগুলোর কথা ভুলবো না, যখন আমরা এক হয়ে বাস করেছি।'

বিদায় ভাষণ শেষ করে ডায়াস থেকে লাফিয়ে নামলেন ব্রিগেডীয়ার কারিয়াপ্পা। তারপর দ্রুত চলে গেলেন ব্যান্ডস্ট্যান্ডের পিছনে। ওখানেই রাখা আছে কাপড় জড়ানো রুপোর ট্রোফিটা। সেটা হাতে নিয়ে ব্রিগেডীয়ার আগা রাজার হাতে তুলে দিলেন কারিয়াপ্পা। হিন্দু ফৌজি অফিসারদের তরফ থেকে এই ট্রোফিটা উপহার দেওয়া হল বিদায়ী মুসলমান অফিসারদের। যথোচিত সামরিক মর্যাদার সঙ্গে স্মারকবস্তুটি গ্রহণ করলেন আগা রাজা। ঢাকা দেওয়া কাপড়টা খুলে দিলেন তিনি। তারপর উঁচু করে করে তুলে ধরলেন সকলকে দেখাবার জন্য। সবাই তখন অভিভূত হয়ে স্মারক ট্রোফির গায়ে আঁকা নকশাটা দেখছে। পুরনো দিল্লির একজন স্যাকরা তৈরি করেছে এটা। এর গায়ে আঁকা নকশাটা খুবই অর্থবহ। খোদাই করে আঁকা হয়েছে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা দুজন সৈনিকের মূর্তি। একজন হিন্দু, অন্যজন মুসলমান। দুজনেরই কাঁধের বন্দুক তাক্ করা আছে কোন এক অদৃশ্য শত্রুর দিকে।

এই অভিনব স্মারক উপহার পেয়ে সকলের পক্ষ থেকে কারিয়াপ্পাকে ধন্যবাদ দিলেন আগা রাজা। অর্কেস্ট্রায় তখন স্কটিশ বিদায় সংগীত 'ওল্ড লং সিন্স্' (Auld Long Syne) বা 'পুরনো সেই দিনের কথা'র সুর বেজে উঠেছে। গানের সুর কানে যেতেই সবাই হাত ধরাধরি করলো এবং গোল হয়ে দাঁড়িয়ে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে গেয়ে উঠলো বিদায় বেলার গান। অতঃপর সেই ঐকতান সুর যখন দিল্লির গুমট রাতের আকাশের গায়ে প্রতিধ্বনিত হ'ল তখন সারা শহর নিবিড় ঘুমে জড়িয়ে আছে।

ঐকতান সুর থেমে যাবার পরেও সবাই অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, পাছে অকারণ কথার ভারে বিব্রত হয় এর বিষণ্ণ রেশ। অনেকক্ষণ পর হিন্দু অফিসাররা হাতে পানীয় নিয়ে এক এক করে বলরুমের পাশের গলিপথ দিয়ে বাইরের খোলা চত্বরে এসে দাঁড়ালো। সবুজ ঘাসের লন্। ঝিরঝির করে বাতাস বইছে। চারপাশে বাউন্ডারি পাঁচিল। ফটক পেরিয়ে রাজধানীর রাজপথে চলে যাওয়া যায়। পিছনে পিছনে পাকিস্তানি অফিসাররাও তখন ঘাস মোড়া লন-এ এসে দাঁড়িয়েছে।

www.pathagar.com

সামরিক পদমর্যাদা অনুযায়ী ওরা লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে। হাতের গেলাস উঁচু করে তুলে ধরলো ভারতীয় অফিসাররা। নিঃশব্দে হাত নেড়ে বিদায় অভিবাদন জানালো তারা। বিদায়ী পাকিস্তানি অফিসাররা নীরব প্রত্যাভিবাদন জানিয়ে মিলিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে।

কিন্তু সেদিন কে জানতো যে 'জবান' রক্ষার প্রতিশ্রুতি এমন নির্মম ভাবে তাদের পালন করতে হবে। অতি সত্বরই তাদের আবার সাক্ষাৎ হ'ল, কিন্তু খুবই দুঃখজনক সেই পরিস্থিতি. ঘুণাক্ষরেও দুপক্ষের কেউ তার আঁচ করতে পারে নি সেদিন। লাহোরের পোলো খেলার মাঠ নয়, তাদের সাক্ষাৎস্থল হ'ল কাশ্মীরের রণাংগন। সেদিন জিমখানা ক্লাবে ব্রিগেডীয়ার আগা রাজার পাওয়া সেই স্মারক ট্রোফির গায়ে আঁকা দুই সৈনিকের কাঁধের বন্দুক কোন অদৃশ্য শত্রু নয়, তাক করা ছিল ওদের নিজেদের দিকেই।

www.pathagar.com

পৃথিবী তখন ঘুমিয়ে ছিল

কলকাতা, ১৩ আগস্ট ১৯৪৭

ভারতের স্বাধীন হবার তখনও ছত্রিশ ঘণ্টা বাকী আছে। নারকেলের কুঞ্জছায়ায় আশ্রিত ছায়াসুনিবিড় সোদপুরের আশ্রম থেকে গান্ধীজী মিরাকলের খোঁজে বেরোলেন। এ যেন তাঁর অলৌকিকের সন্ধানে নিরুদ্দেশ যাত্রা। অথচ দূরত্ব মাত্র দশমাইল তাঁর এই গন্তব্যস্থানের। কিন্তু দশমাইলের এই দূরত্ব কয়েক হাজার মাইল আলোকবর্ষের দূরত্বের মতন। প্রায় নরকের কাছাকাছি এমন একটা অঞ্চলে ওঁকে এখন পৌঁছতে হবে যা নাকি পৃথিবীর ভয়ংকর নিষ্ঠুর শহর, একদা রুডীয়ার্ড কিপলিঙ্ যার সম্বন্ধে বলেছিলেন দ্য সিটি অব ড্রেডফুল নাইট। সেই জরাজীর্ণ কদর্য এবং ভয়াবহ শহরে আসছেন প্রেম ও অহিংসার উপাসক ক্ষীণদেহী গান্ধীজী। সত্যই তাঁর এই আগমন কি অলৌকিক কিছু সাধন করতে পারবে, সেপাই পাঠিয়েও বড়লাট যা পারেন নি? হ্যাঁ তাই। বড়লাট সেপাই পাঠিয়েছিলেন শায়েস্তা করতে। গান্ধীজী আসছেন প্রেম ও মৈত্রীর বাঁধনে বাঁধতে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান শিল্পী ও কারিগর বার একবার আসছেন তাঁর জীবনটি উৎসর্গ করতে। কিন্তু তাঁর এই অর্পণ এবার ইংরেজের হাত থেকে দেশকে স্বাধীন করার জন্য নয়। এবার তিনি আসছেন মানুষের অন্তর থেকে বিদ্বেষ বিষ নাশ করতে।

কলকাতা শহরটা যে হিংসার শহর সে কথা মনে হয় তাকে ঘিরে উপখ্যান এবং দেবদেবী নির্বাচনের বহর দেখে। কলকাতার যিনি রক্ষিত্রী দেবী তিনি কালী। দেবীর গলায় নরমুণ্ড, দেহ ব্যাঘ্রচর্মে ঢাকা। ইনি দীর্ঘদন্তী। এঁর চক্ষুদুটি রক্তবর্ণ। এই মসীবর্ণা দেবী মারণের দেবী।* প্রতি দিন হাজার হাজার ভক্ত ষোড়শোপচারে তাঁর পুজো করে। নিরীহ ছাগশিশু বলি দেয় এবং কপালে রক্তের টিপ পরে। শোনা যায় এককালে শহরের কাছাকাছি অনেক নিভৃত মন্দিরে শিশুও বলি দেওয়া হত।

১৯৪৭ এর আগস্ট মাসে কলকাতার এই নিষ্ঠুর চেহারাটা লুকানো ছিল একটা মিথ্যে সমৃদ্ধির মধ্যে। ময়দানের চির সবুজ ঘাস, চৌরঙ্গী পাড়ার বড় বড়

---

* হিন্দু পুরাণ মতে কালী, তারা, ষোড়শী প্রভৃতি দশ দেবী মহাশক্তির দশ মূর্তি। এই দশ মূর্তিতে স্বামী মহাদেবকে বিভ্রান্ত করে সতী দক্ষরাজার যজ্ঞে যান। কিন্তু যজ্ঞস্থলে পিতা যক্ষের মুখে পতিনিন্দা শুনে সতী দেহত্যাগ করেন। তখন সতীর শোকে শিব ক্রুদ্ধ হলেন এবং সতীর মৃতদেহ কাঁধে তুলে ভীষণ নৃত্য শুরু করলেন। তাতে সৃষ্টি ধ্বংস হবার উপক্রম হল। তখন বিষ্ণু চক্র দ্বারা সতীর দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করলেন। সতীর দেহ একান্ন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে ভারতবর্ষের নানাস্থানে পতিত হ'ল। যেখানে যেখানে সতীর দেহখণ্ড পড়লো, সেই সব স্থান 'মহাপীঠ' নামে খ্যাত হ'ল। কলকাতার কালীঘাটে পড়লো সতীর ডানপায়ের পদাঙ্গুলি। সেই থেকে কালীঘাট হ'ল অন্যতম 'মহাপীঠ'।

www.pathagar.com

প্রাসাদভবন যেন এর বাহ্যরূপ, যার আড়ালে ছিল তার আসল চেহারাটা। শহরের এই বাইরের ঠাটবাট, তার রোশনাই ইত্যাদি ব্যাপারগুলো চলচ্চিত্রের তৈরি করা সেট-এর মতনই মিথ্যে, অলীক। এরই আড়ালে রয়েছে সেই জঘন্য বাস্তব ছবিটা। মাইলের পর মাইল খোলা নর্দমা। গাদাগাদি, ঠাসাঠাসি করে বাস করছে মানুষকীট। শহরের সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে নিষ্কর্মা ভিখিরীর দল। এদের সংখ্যা চার লক্ষাধিক। সুস্থ মানুষের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে হাজার চল্লিশ কুষ্ঠরোগী। বস্তি এলাকাগুলো যেন নোংরা দুর্গন্ধময় নরককুণ্ড। সারা শহর জুড়ে সরু সরু গলিপথ। রাস্তার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে খোলা ড্রেন। পচা পাঁক থকথক করছে ড্রেনে। পাশে বসে নির্বিবাদে মলমূত্র ত্যাগ করছে মানুষ। মশা, মাছি, পোকামাকড় ডিম পাড়ছে হাজারে হাজারে। এক বীভৎস চিত্র যেন। শহরের পাশ দিয়ে বয়ে চলা গঙ্গায় ভাসছে মরা পশুর শব। সরবরাহ করা পানীয় জলও দূষিত। এরই মধ্যে সপ্তাহান্তে জমিদারের লোক এসে এই নরককুণ্ডের অধি-বাসীর কাছ নির্দয়ভাবে ভাড়ার টাকাও নিয়ে যাচ্ছে।

ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি যখন প্রায় হাতের মুঠোয় এসে গেছে তখন কলকাতার প্রায় তিরিশ লাখ মানুষই অপুষ্টিতে ভুগছিল। তাদের দৈনন্দিন আহার্যর মধ্যে ক্যালোরির যে পরিমাপ তার হার নাৎসীদের হাতে বন্দীদের দেওয়া আহার্যর চেয়েও নিকৃষ্ট ছিল।

কলকাতার এইসব আলোবাতাসহীন বস্তিগুলোই হ'ল নানারকম পাপাচারের লালনভূমি। একটা সময় ছিল যখন বস্তির মানুষরা এক মুঠো চালের জন্য মানুষ খুন করেছে। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে সেই নেশাটাই একটা অতিরিক্ত মাত্রা পেল। উগ্র সাম্প্রদায়িক হিন্দু ও মুসলমান মৌলবাদী সমর্থকদের উসকানি থেকেই তখন শুরু হ'ল দাঙ্গা। সেই থেকে একটা দিনও কাটে নি যেদিন দাঙ্গায় কেউ খুন হয় নি। প্রত্যহই শহরের পথঘাট বা গলিঘুঁজি থেকে শোর্ উঠতো আল্লা হো আকবর্ বা বন্দেমাতরম। গা হিম হয়ে যায় সেই হুংকারধ্বনি শুনে। শহরের নামকরা খুনী, গুণ্ডা বদমাশেরা তখন রঙ বদলের রাজনীতির ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। ওদের রক্তপিপাসু হাতে জেল্লা দিচ্ছে রাজনীতির রঙ। হাতে উঠেছে ঠেংগা, ছোরা, পিস্তল বা বাঘনখ যা পরে প্রতি-পক্ষের গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে অনায়াসে তার চোখদুটি উপড়ে নেওয়া যায়। ভয় আর অবিশ্বাসে তখন দুপক্ষই পরস্পরের প্রতি হিংস্র। তাই সারা দেশ যখন স্বাধীনতার আনন্দোৎসবে মেতে উঠেছে, তখন কলকাতার এইসব বস্তিবাসী ঠেঙাড়ে গুণ্ডারা অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে কখন শুরু হবে নির্বিচার হত্যালীলা। এইভাবেই দাঙ্গা আর খুনখারাপির উত্তেজনার মধ্যে তাদের ঘৃণ্য জীবনের দুরবস্থাটা একটা আড়াল পেতে চেয়েছিল।

১৩ আগস্ট বিকাল। বেলা তিনটে বেজে গেছে তখন। বেলেঘাটা রোডের ধারে গোটাকতক বস্তিঘর পেরিয়ে একটা পাকা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো যুদ্ধ-পূর্ব আমলের একটা ঝরঝরে শেভ্রলেট। বাড়ির চারপাশে নিচু সীমানা-পাঁচিল। পাথরের পাঁচিলের গায়ে বাড়ির নম্বর লেখা ১৫১। বর্ষার জল আর নোংরায় থকথক করছে বাড়ির চারপাশ। একবার তাকালেই বোঝা যায় বাড়িটার সেই পুরনো ঐতিহ্য নেই। ভগ্নপ্রায়, শীর্ণ একজন বৃদ্ধের মতন ক্ষয়িষ্ণু চেহারা তার। ঠিক যেন টেনেসী উইলিয়ম্‌স্-এর কোন আধুনিক নাটকের মঞ্চসজ্জা।

www.pathagar.com

তবে এখন পরিত্যক্ত হলেও হায়দারী ভবনের যে একটা ঝলমলে অতীত ছিল সে কথা বাড়ির চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। চওড়া বারান্দা, মোটা থাম, বাঁকানো সিঁড়ি ইত্যাদির মধ্যে গ্রীক স্থাপত্যের একটা ছবি পাওয়া যায়। হয়ত এর মালিক ছিল কোন ইংরেজ বণিক এবং শখ মেটাতে গ্রীস থেকে তুলে এনেছিল তার স্বপ্নটা। ভাঙাচোরা বাড়িটার এখনকার মালিক একজন ধনী মুসলমান। লোকটার আর যা থাকুক না কেন, শিল্পপ্রীতি নেই। তাই বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের ভার ইঁদুর আরশোলার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে। অন্ধকার ঘুপচি বারান্দা আর সিঁড়িতে নির্ভয়ে ছুটোছুটি করছে তারা। সাবধানে পা ফেলে চলতে হয়। কোথাও হয়ত পড়ে আছে মানুষের শুকনো বিষ্ঠা। বিঁড়ের মতন গোল সেই বস্তুটা নির্বিবাদে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে এই পড়োপড়ো বাড়ির। পড়ো বাড়িই বটে কারণ মালিক এখানে থাকে না। তাই গান্ধীজী আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোদের এখানেই অবস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অবশ্য কিছু কিছু সংস্কার করা হয়েছে। চেষ্টা হয়েছে একটা অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার। তাই স্যাতোরা জমির ওপর পুরু করে ছড়ানো হয়েছে ব্লিচিং পাউডার। তার কটু গন্ধের সঙ্গে মিশেছে প্রস্রাবের গন্ধ। মোটকথা সেই বিকালটায় মহাত্মা এবং তাঁর অনুচরদের অভ্যর্থনা করার জন্য হায়দারী ভবন রীতিমত তৈরি হয়েই আছে কাদা, পাঁক আর পচা গন্ধের সঙ্গে। গান্ধীজী আসুন এবং শুরু করুন তাঁর অসাধ্যসাধনের কাজ, তাঁর মিরাক্যল্।

যাদের মধ্যে তাঁকে এই মিরাক্যল্ করতে হবে তারা ইতিমধ্যেই জড়ো হয়েছে বাড়ির চারপাশে। ধুতি আর শার্ট পরা মানুষগুলো রীতিমত ক্রুদ্ধ। এরা সবাই হিন্দু এবং এদের অনেকেরই আপনজন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন মুসলমানদের হাতে জবাই হয়েছে। লাঞ্ছিত হয়েছে এদের মা-বোন। গাড়িটা দেখেই ওরা চীৎকার করে আওয়াজ তুললো. 'গো ব্যাক !' বোধহয় গত তিনদশকে এই প্রথম গান্ধীজীর নামে কোন উল্লাসধ্বনি হ'ল না। গান্ধীজী চুপ। গাড়ির মধ্যে বসে স্থির হয়ে ওদের নিন্দাধ্বনি শুনলেন। ক্রুদ্ধ মানুষগুলো তখন চীৎকার করছে। গান্ধীজী শুনলেন ওরা কি বলছে। ওরা বলছে, 'আপনি নোয়াখালি গিয়ে হিন্দুদের বাঁচান।' 'মুসলমান বাঁচাতে হবে না আপনাকে। আপনি হিন্দু বাঁচান।' 'আপনি বিশ্বাসঘাতক, হিন্দুর শত্রু!' ততক্ষণে গাড়িটা ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু মানুষগুলো তখন আর মানুষ নেই। সারা পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ যাঁকে ঋষিপ্রতিম মনে করে, সেই মানুষটির অভ্যর্থনা হ'ল ভাঙা কাঁচ আর ইটের টুকরোয়।

গাড়ির দরজা খুলে গান্ধীজী নামলেন। সেই অতি চেনা ছবি। ক্ষীণ দুর্বল শরীর নাকের ডগা পর্যন্ত নেমে এসেছে চশমা। একহাত দিয়ে গায়ের চাদর চেপে অন্য হাত তুলে সবাইকে শান্ত হতে বললেন গান্ধীজী। তারপর ৭৭ বছরের ক্ষীণ শরীরটা টেনে টেনে এগিয়ে গেলেন রুষ্ট মানুষগুলোর দিকে। তখনও ইঁটের টুকরো এসে পড়ছিল তাঁকে লক্ষ্য করে।

গান্ধীজী কিন্তু একটুও উদ্বিগ্ন নন। হাসিমুখে মানুষগুলোর দিকে চেয়ে বললেন 'আপনারা আমায় মারতে চাইছেন। তাই আপনাদের কাছেই আমি এগিয়ে এসেছি।' মানুষগুলো ভাবতেও পারে নি যে অমন একটা পরিস্থিতি হবে। কিংবা গান্ধীজী অমন লঘু করে নেবেন ব্যাপারটা। তাই বিমূঢ় হয়ে গেল ওরা।

www.pathagar.com

ততক্ষণে আরও এগিয়ে এসেছেন গান্ধীজী। তারপর লোকগুলোর মুখের দিকে স্পষ্ট চোখে তাকালেন। তখন গান্ধীজীকে সাধারণ মানুষ মনে হচ্ছিল না। ঠিক যেমন নির্ভীক, স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে তিনি ইংল্যান্ডের সম্রাট বা ভাইসরয়ের সঙ্গে ভারতের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেইরকম নির্ভীক শোনাল তাঁর কণ্ঠস্বর। ক্ষুব্ধ লোকগুলোর দিকে চেয়ে গান্ধীজী সুস্পষ্ট স্বরে বললেন, 'শুধু মুসলমানের স্বার্থ রক্ষার জন্য আমি আসিনি। আপনাদের আশ্রয়ে থেকে হিন্দু-মুসলমান দুজনেরই স্বার্থ দেখতে আমি এসেছি। তাই আপনাদের ভরসা চাই। যদি না চান তবে ভরসা না দিতেও পারেন। আমার বয়স হয়েছে। জীবনের পথ চলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে আমার। আর বেশিদিন বাঁচতেও চাই না। কিন্তু আপনারা যদি প্রকৃতিস্থ না হন, তবে জানবেন যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি তা দেখবো না।'

এরপর গান্ধীজী বোঝালেন কেন তিনি কলকাতায় এসেছেন। তিনি বললেন যে এখানে এসেই তিনি নোয়াখালির হিন্দুদের রক্ষা করতে পারবেন। নোয়াখালির মুসলমানরা তাঁকে কথা দিয়েছে যে ১৫ আগস্ট তারিখে নোয়াখালির একজন হিন্দুও নিহত হবে না। তাঁর বিশ্বাস যে ওরা ওদের কথা রাখবে। কারণ প্রতিশ্রুতি না রাখলে তিনি আমরণ অনশন করবেন। ওদের এই প্রতিশ্রুতি পেয়েই গান্ধীজী কলকাতায় এসেছেন। নোয়াখালির হিন্দুদের রক্ষার জন্য মুসলমানদের যে প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন, সেইরকম প্রতিশ্রুতি হিন্দুদের কাছ থেকেও তিনি পেতে চান। তিনি বিশ্বাস করেন যে কলকাতার হিন্দুরা এই নৈতিক দায়িত্বটি পালন করবেন। এই আশ্বাসটুকু পেতেই তিনি রুষ্ট মানুষগুলোর কাছে ছুটে এসেছেন। ওরা যদি না পারে এবং নির্বিচার হত্যালীলায় মেতে ওঠে, তবে কলকাতার অসহায় মুসলমানদের রক্ষার জন্য তাঁকেই জীবন বিসর্জন দিতে হবে আমৃত্যু অনশন করে। গান্ধীজীর অহিংস নীতির এটিই প্রধান তাৎপর্য। যুযুধান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর নিজের জীবনের বিনিময়ে একটা চুক্তিবদ্ধতা নিয়ে আসেন তিনি। ফলে দুপক্ষকেই চুক্তির শর্ত মানতে হয়। সবশেষে ক্ষুব্ধ মানুষগুলোর দিকে চেয়ে গান্ধীজী বললেন, 'কি করে আপনারা ভাবতে পারলেন যে জন্মসূত্রে এবং আচার-আচরণে একজন হিন্দু হয়েও আমি হিন্দুর সঙ্গে শত্রুতা করবো?'

গান্ধীজীর নির্ভীক যুক্তি, তাঁর বক্তব্যের ঋজু সারল্য ক্ষুব্ধ মানুষগুলোকে যেন ধাঁধায় ফেলে দিল। ওদের সেই ক্রুদ্ধ মনোভাব তখন চলে গেছে। ওরা সত্যই বিপন্ন বোধ করছিল তখন। গান্ধীজী ওদের এই অবস্থাটা যেন উপলব্ধি করতে পারলেন। তিনি বললেন যে ওরা যদি চায় তবে ওদের প্রতিনিধির সঙ্গে তিনি আলাপ করতে পারেন। এই ব'লে শান্ত দৃঢ় পায়ে অনুচর এবং সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে তিনি হায়দারী ভবনে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

গান্ধীজী চলে গেছেন। কিন্তু মানুষগুলো তেমনি বিমূঢ়। কি করবে যেন স্থির করতে পারছে না তারা। এ কি বিভ্রম পড়লো তারা? হঠাৎই যেন একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হ'ল জনতার মধ্যে। সবাই দেখলো যে সুরাবর্দী আসছেন। তিনি আসছেন গান্ধীজীর চরণাশ্রয় পেতে। লোকটাকে দেখেই যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল আপাত শান্ত জনসমুদ্রে। ক্ষোভে, রাগে তোলপাড় হ'ল সবাই উন্মত্ত গর্জন করে উঠলো জনতা এবং ঘিরে ফেললো হায়দারী ভবন। তারা যেন নতুন

www.pathagar.com

করে হিংসায় মেতে উঠেছে। হঠাৎ একটা ঢিল এসে পড়লো সবে বসানো জানলার সার্সীর গায়ে। ঝনঝন শব্দে ছড়িয়ে পড়লো কাচের টুকরো। গান্ধীজী স্থির হয়ে বসে আছেন আসনের ওপর। সেই পরিচিত ভঙ্গি। আর একটা ঢিল লাগলো কাঁচের সার্সীতে। অচিরেই ইটের টুকরোয় বাকী জানলার কাচও চুর-চুর করে ভেঙে গেল। গান্ধীজী তখনও অবিচলিত। কাঁধ নুইয়ে, পা মুড়ে বসে চিঠির উত্তর লিখছেন এক মনে। দেখে মনেই হয় না যে উন্মত্ত মানুষগুলোর একমাত্র লক্ষ্য তিনিই। কিন্তু ইতিহাস জানে যে ঘটনাটা এক সন্ধিক্ষণ। বোঝাই যায় যে এগিয়ে আসছে একটা দারুণ বদলের পালা। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকী আছে ভারতবর্ষের স্বাধীন হবার। শেষ হতে চলেছে এক সুদীর্ঘ সংগ্রামের পথ। কিন্তু যে পথচলা শুরু হয়েছিল সেই সুদূর অতীতে ১৯১৫ সালের জানুয়ারিতে, তার এ কি পরিণতি তিনি দেখছেন ? যেদিন গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়ার খিলানের তলা দিয়ে তিনি নির্ভীকভাবে হেঁটে গিয়েছিলেন, সেদিন কি জানতেন যে ভারত স্বাধীন হবার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে তাঁকে এমনভাবে হেনস্তা হতে হবে ? কে জানে এই লোষ্ট্রনিক্ষেপ কি ইংগিত বহন করছে জাতির জীবনে! তবে একথা ঠিক যে গান্ধীজী, ভারতবর্ষ বা বিশ্বের কাছে হায়দারী হাউসের দেওয়ালে ছোঁড়া ইটের টুকরোগুলো যেন জনতার উদ্দীপ্ত রোষ হয়ে ফুটে উঠলো। সূত্রধারের প্রস্তাবনায় সেদিন যে নাটকের অবতারণা হ'ল তা বিয়োগান্ত এবং সেই ট্র্যাজিক পরিণতির দিকেই সবেগে ধাবিত হ'ল ঘটনা।

করাচি, ১৩ আগস্ট ১৯৪৭

'স্যর ! ওদের ষড়যন্ত্রের কথাটা সত্যি। অনেকটা এগিয়ে গেছে ওরা।' ফিসফিস করে যে লোকটা মাউন্টব্যাটেনের কানে কথাটা তুললো সে সি.আই.ডি. বিভাগের একজন অফিসার। গুপ্তচরের কথাটা কানে যেতেই মাউন্টব্যাটেনের শান্ত চেহারাটা কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল অনাগত বিপদাশঙ্কায়। একটা ম্লান ছায়া পড়লো তাঁর মুখে। তাড়াতাড়ি লোকটাকে টেনে আনলেন বিমানের ডানার তলায়। জায়গাটা অপেক্ষাকৃত নির্জন। চট করে অন্য কেউ তাঁদের আলাপ শুনে ফেলবে না।

অফিসারটি ততক্ষণে ষড়যন্ত্রের সবটুকুই স্বীকার করে নিয়েছে। তাদের বিভাগীয় গোপন রিপোর্টে এই চক্রান্তের কথাটা বলা আছে। দিল্লিতে এরই একটা ইঙ্গিত পেয়েছিলেন মাউন্টব্যাটেন। অফিসারটি এবার তন্নতন্ন করে পরি-কল্পনার কথাটা বললো। পরদিন ১৪ আগস্টের সকালে জিন্নার সঙ্গে মাউন্টব্যাটেন যখন খোলা গাড়িতে চড়ে মিছিলে যাবেন, তখন এক বা একাধিক হাতবোমা ছুঁড়ে উড়িয়ে দেওয়া হবে খোলা গাড়িখানা। কাজটার ভার পেয়েছে হিন্দু মৌলবাদী আর.এস.এস. দল। একথা ঠিক যে আর.এস.এস. দল ইতিমধ্যেই করাচি সহরে অনেক হিন্দু চালান করেছে। তবে চিরুনি অভিযান চালিয়েও এমন একজন উগ্র হিন্দুর খোঁজ পাওয়া যায় নি, যার ওপর এই কাজটার ভার দেওয়া হয়েছে।

মাউন্টব্যাটেন সবটুকু শুনলেন। তাঁকে তখন বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। এর

www.pathagar.com

মধ্যে কখন যে লেডি মাউন্টব্যাটেন এ'দের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন, মাউন্টব্যাটেন তা টের পান নি। অফিসারটির শেষ কথাটা কানে গেছে এডুইনার। স্বামীর দিকে চেয়ে আতঙ্কিত স্বরে বললেন, 'আমিও তোমার সংগে গাড়িতে যাব।' মাউন্টব্যাটেন প্রায় ধমক দিয়ে উঠলেন এডুইনাকে। বললেন, 'না, যাবে না। দুজনের এক সংগে টুকরো হয়ে যাবার মধ্যে কোন বাহাদুরি নেই।'

স্বামী স্ত্রীর এই নিভৃত বাক্যালাপের কোন আমলই দিল না সি.আই.ডি. অফিসারটি। সে জানালো যে জিন্না খোলা গাড়িতে মিছিলের সংগেই যেতে চান। সুতরাং গাড়ি চলবে অত্যন্ত ঢিমে তালে। তাঁদের দুজনকে আগলাবার যথেষ্ট সরঞ্জামও তাদের হাতে নেই। বিপদ এড়ানোর একটাই পথ আছে। 'সেটা কি ?' চিন্তিত মাউন্টব্যাটেনের মুখের দিকে চেয়ে সি.আই.ডি. অফিসারটি বললো, 'স্যর, জিন্নাকে মিছিলে যোগ দিতে নিষেধ করুন। যেমন করে পারেন ও'কে আটকান।'

এই শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ মহাত্মা গান্ধীর দিকে কলকাতার উন্মত্ত জনতা যখন ঢিল ছ'ুড়ছিল, তার আঠারো ঘণ্টা পরে ১৮০০ মাইল দূরবর্তী করাচি শহরে গান্ধীজীর প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী তখন আত্মহারা হয়ে অপেক্ষা করছিলেন কখন তাঁকে নিয়ে দেশের মানুষ মাতামাতি করবে।

স্বাধীনতার জন্য জিন্নার এই সংগ্রাম কিন্তু বিফল হয় নি। এই একটি ক্ষেত্রেই গান্ধীজীকে এক কদম পিছনে ফেলে দিলেন জিন্না। গান্ধীজী যা পারেন নি জিন্না তাতেই সফল হয়েছেন। অনেক বাধা সত্ত্বেও সফলতার জয়টিকা তাঁর মাথায় উঠেছে। অথচ বাধা ছিল অনেক। জিন্নার সবচেয়ে বড় বাধা ত স্বয়ং গান্ধীজী! তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর যুক্তিগ্রাহ্য চিন্তা! আর ছিল তাঁর নিজের অমন একটি ফুসফুসের রোগ। তবুও জিন্না পারলেন ভারত ভাগ করতে এবং গান্ধীজী পারলেন না এই বিভাজন ঠেকাতে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এই উপ-মহাদেশের জঠর থেকে ছি'ড়ে বেরোবে একটা স্বতন্ত্র ইসলামী রাষ্ট্র। বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল মুসলিম রাষ্ট্র হবে পাকিস্তান। তারই তোড়জোড় চলছে করাচির গণপরিষদ ভবনে। অর্ধ-গোলাকার পরিষদ ভবনের মধ্যে সারি সারি আসন। এতেই বসবেন এই গোলার্ধের সাড়ে চার কোটি মুসলমানের প্রতিনিধিরা। এতদিন এ'দেরই প্রতিনিধিত্ব করেছেন জিন্না। এরাই ছিল তাঁর সংগ্রামের হাতিয়ার। আজ তিনি সফল এবং তাঁর অনুগামীরা এখন থেকে একটা পৃথক জাতিতে পরিণত হ'ল।

পরিষদভবনের এই সমাবেশটি খুবই বর্ণময়। নানা জাতি ও ভাষার মানুষ একত্র হয়েছে এই সমাবেশে। আছে শেরওয়ানি পরা স্থূলবুদ্ধি পাঞ্জাবী। আছে রাগী চোখের পাঠান, ওয়াজিরি, মাহ্মুদ আর আফ্রিদি উপজাতিরা। ওদের মাথায় শোভা পাচ্ছে হলুদ রঙের পাগড়ি। এ'দের রোদেপোড়া তামাটে মুখের ছ'ুচালো গোঁফ তাকিয়ে দেখবার মতন। আছে কালো চেহারার খাটো বাঙালী যাদের অবিশ্বাস করতেন জিন্না এবং কখনও সে দেশ দেখতে যান নি। আর আছে বালুচি উপজাতিরা এবং বোরখা পরা সিন্ধু উপত্যকার মুসলমান রমণীরা। পাঞ্জাবের মেয়েরাও এসেছে এই সমাবেশে যোগ দিতে। তারা পরেছে সালওয়ার, কামিজ আর বেল্‌বট্‌ম্‌ কুলোতী বা ট্রাউজার।

জিন্নার পাশে বসেছেন ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন। এ'রই অনিচ্ছুক হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিয়েছেন মুসলিম স্টেটটি জিন্না। নৌবাহিনীর প্রধানের সাদা

www.pathagar.com

পোশাক পরে এসেছেন মাউন্টব্যাটেন। পোশাকের গায়ে ঝলমল করছে পদকগুলো। মাউন্টব্যাটেন ভালবাসেন এই পদকগুলো পরতে। পোশাক এবং চেহারায় সুপুরুষ এই মানুষটিকে খুবই ব্যক্তিত্বপূর্ণ মনে হচ্ছিল সেদিন। আর মাত্র ছত্রিশ ঘণ্টা দেরি। তারপরই শেষ হয়ে যাবে ব্রিটেনের মাতব্বরি এই উপ-মহাদেশে। আজকের এই অনুষ্ঠানটি যেন সেই ঘটনারই সূচনা।

মাউন্টব্যাটেনের শান্ত মুখে টানটান একটা হাসি ছড়িয়ে আছে। অন্য বৈলক্ষণ্য টের পাওয়া যায় না তাঁর আপাত শান্ত মুখে। মাউন্টব্যাটেন উঠে দাঁড়ালেন। মহামান্য সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে তাঁর শুভেচ্ছাবাণী শোনালেন। তারপর নিজের কথা শোনাতে গিয়ে বললেন যে এমন একটা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য তিনি আগে পান নি। মাউন্টব্যাটেন বললেন, 'পাকিস্তানের জন্ম ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কখনও আমাদের মনে হয় যে ইতিহাসের গতি বড় ধীর। ইতিহাস তখন হিমবাহের মতন শম্বুকগতিতে এগোয়। আবার কখনও তার গতি হয় বন্যার মতন ঊর্ধ্বশ্বাস। ঠিক এই মুহূর্তে, এই গোলার্ধে ইতিহাসের গতি হয়েছে বন্যার মতন। বরফ গলেছে, উপলবাধাগুলি ভেসে গেছে গতির টানে। এখন তাই এই ঊর্ধ্বশ্বাস প্রবাহের সংগে আমরা আগামী কালের দিকে ভেসে চলবো। আর আমাদের পিছন ফিরে তাকাবার সময় নেই। এখন শুধু এগিয়ে চলা।'

কথাগুলো বলে পাশে বসে থাকা জিন্নার মুখের দিকে মাউন্টব্যাটেন তাকালেন। কিন্তু নিরাশ হলেন। এই অবিস্মরণীয় মুহূর্তেও মানুষটার পার্চমেন্টের মতন শুকনো মুখে ঔদ্ধত্য ছাড়া আর কোন আবেগ দেখলেন না তিনি। বরং তার মনে হ'ল সারা মুখখানায় ঠাণ্ডা একটা মৃত্যুর মুখোশ জড়ানো। মাউন্টব্যাটেন বললেন, 'মিস্টার জিন্নাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমাদের নিবিড় ঘনিষ্ঠতা থেকে দুই দেশের মধ্যে যে পারস্পরিক প্রীতি ও সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছে সেটাই হয়ে উঠুক ভবিষ্যতের পাথেয়।'

এরপর যে দু-চারটি কথা মাউন্টব্যাটেন বললেন সেগুলো নেহাতই আনুষ্ঠানিক। তখন সর্বক্ষণই তাঁর মনে হচ্ছিল যে আর কয়েক মুহূর্ত পরেই একটা দারুণ ঝুঁকি নিতে হবে তাঁকে। অনেক চেষ্টা করেছেন তিনি। কিন্তু কিছুতেই একগুঁয়ে জেদী জিন্নাকে মিছিলে অংশ নেওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে পারেন নি। ঠিক যেমন পারেন নি পাকিস্তান তৈরির ব্যাপারে মানুষটার অন্যায় জিদ রোধ করতে। জিন্নার ধারণা যে ঢাকা গাড়িতে মিছিলে অংশ নেবার অর্থ হ'ল পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা। এমন কাপুরুষতার প্রশ্রয় তিনি দিতে চান না। পাকিস্তান তাঁর স্বপ্ন। এর জন্য তিনি উদয়াস্ত সংগ্রাম করেছেন। এতদিন পরে সেই স্বপ্ন যখন সার্থক হ'ল তখন এই মহান অভ্যুত্থানটি তাঁর ভীতত্রস্ত আচরণ দিয়ে তিনি হীন করতে পারবেন না। অতএব যা ঘটার তা অপ্রতিরোধ্য ভাবেই ঘটবে। মাউন্টব্যাটেনও তাই প্রস্তুত। অতঃপর খোলা গাড়িতে চড়েই তাঁকে যেতে হবে মিছিলের সংগে সংগে। পাশে থাকবেন সেই মানুষটি যাকে তিনি মনেপ্রাণে অপছন্দ করে এসেছেন এতদিন এবং কোন্ অলক্ষ্যে লুকিয়ে থাকা গুপ্তঘাতকের হাতের বোমাটা যখন তাঁদের দিকে নিক্ষিপ্ত হবে তখন তার আঘাতেই টুকরো টুকরো হয়ে যাবেন তাঁরা। এ সবই নিয়তি কিন্তু কি নিষ্ঠুর এর খেলা! যে পাকিস্তান রাষ্ট্র তিনি কখনও চান নি তারই উদ্বোধন দিবসে এমন একটা বিপর্যয়ের মুখো-

www.pathagar.com

মুখি হতে হবে তাঁকে।

সবশেষে মাউন্টব্যাটেন তাঁর ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন যে স্বশাসিত পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র দীর্ঘজীবী হ'ক এবং প্রতিবেশী ও বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সংগে প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সুসম্পর্ক গড়ে তুলুক।

এরপর জিন্নার পালা। সাদা শেরওয়ানিতে তাঁকে একজন ধর্মযাজকের মতন দেখাচ্ছিল তখন। গলা পর্যন্ত বোতামের সারির সবকটাই আঁটা। আচকানের তলায় শান্তিতে শয়ান তাঁর শীর্ণ বুকের খাঁচা থেকে ঘড়ঘড় শ্লেষ্মার আওয়াজ কানে যায়। জিন্নারও প্রত্যাশা যে এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়া ইংরেজ এবং তার সরকারের সংগে পাকিস্তানের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণই থাকবে। জিন্না সগর্বে ঘোষণা করলেন যে অন্য ধর্ম সম্বন্ধে পাকিস্তান তার তেরশ' বছরের সহিষ্ণু ঐতিহ্য রক্ষা করে চলবে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বন্ধুত্বের আহ্বান ফিরিয়ে দেবে না।

শ্রোতারা বোঝার আগেই ভাষণের পালা শেষ হ'ল। সন্নিকট হ'ল সেই ভয়ংকর মুহূর্ত। য়্যাসেম্ব্লি হলের বিরাট সেগুন কাঠের দরজা ঠেলে পাশাপাশি বেরিয়ে এলেন দুই নেতা। এ'রাই আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান দুজন ব্যক্তিত্ব এবং পাশা-পাশি থাকলেও অনেক ব্যাপারেই এ'রা ভিন্ন মত পোষণ করেন। হলের বাইরে অপেক্ষা করছে কালো রঙের একটা রোল্স্রয়েস গাড়ি। এই গাড়ি চড়েই তাঁদের অগ্নিপরীক্ষায় যেতে হবে। মাউন্টব্যাটেনের চকিতে মনে হ'ল ওটা 'মোটরগাড়ি নয়, মড়ার খাট।' এক মুহূর্তের জন্য এড্উইনার দিকে তাকালেন তিনি। শেষ পর্যন্ত এড্উইনার জিদ আংশিক মেনে নিয়েছেন মাউন্টব্যাটেন। তার গাড়িটা তাঁদের গাড়ির পিছনে পিছনে আসবে। কিন্তু স্ত্রীর গাড়ির ড্রাইভারকে পইপই করে তিনি বলে দিয়েছেন যেন তাঁদের গাড়ির অনেক পিছনে এড্উইনার গাড়িটা থাকে। তাঁর দৃঢ় ধারণা যে এড্উইনা নিশ্চয়ই আততায়ীদের বাধা দেবার চেষ্টা করবে।

গাড়িখানার দিকে যেতে যেতে মাউন্টব্যাটেনের মনের মুকুরে অনেকগুলো পুরনো ছবি জ্যান্ত হয়ে ভেসে উঠলো যেন। স্মৃতির এই ছবিগুলো কতকালের পুরনো, কিন্তু কি দারুণ স্পষ্ট আর উজ্জ্বল! আজকের মিছিলের সংগে এর কোন সম্বন্ধই নেই। কিন্তু পুরনো অনেকগুলো জীবন্ত ঘটনার অপচ্ছায়া যেন সেগুলো। তাঁর অভিজাত বংশাবলির পাতা জুড়ে আছে এই ঘটনাগুলো। অতীতচারণের সময় একের পর এক মনে পড়ছে সেগুলো। একটা নাম ভারী কুলীন। জার্ আলেকজণ্ডার II. তাঁরই পূর্বসূরী। ইনি নিহত হন ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে। সেন্ট পীটার্সবার্গের এক শোভাযাত্রায় তাঁর খোলা গাড়ির ওপর বিস্ফোরক হাতবোমা ছোঁড়া হয়। শরীর থেকে মাংসগুলো খসে খসে পড়েছিল অগ্নিদগ্ধ হয়ে। একই কুলধারায় আছে আর একটা নাম। গ্র্যান্ড ডিউক সার্জ। একইধরনের অপঘাত মৃত্যু হয় এই আত্মীয়টিরও। ১৯০৪ সালে একজন রাষ্ট্রদ্রোহীর হাতের বোমায় নিহত হয়েছিলেন গ্র্যান্ড ডিউক সার্জ। আর মনে পড়লো ভগিনী এনার জীবনের সেই মর্মন্তুদ ঘটনাটা। স্পেনের রাজা অলফান্সো XII-এর বাগদত্তা এনার বিয়ের কাপড় রক্তাক্ত হয়ে যায় তার গাড়ির চালকের রক্তে। বীভৎস এইসব পারিবারিক হত্যার ছবিগুলো প্রেতমূর্তির মতন তাঁর মনের আয়নায় ভেসে উঠেছে তখন। মাথা নেড়ে মনটাকে খাড়া করার চেষ্টা করলেন মাউন্টব্যাটেন। তারপর গাড়িতে উঠলেন।

গাড়িতে উঠেই জিন্নার সংগে চোখাচোখি হ'ল মাউন্টব্যাটেনের। তবে কথা

www.pathagar.com

বললেন না কেউ। জিন্নাকে অনেক পরিবেশে তিনি দেখেছেন। মানুষটাকে কখনও সহজ হতে দেখেন নি। সবসময়েই তাঁর মুখের ওপর টানটান একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে থাকে যেন। কিন্তু আজকের অবস্থাটা অন্যরকম। একটা তাড়স ভাব মুখখানায় এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যে বাইরের লোকের কাছেও সেটা বেশ গোচর হয়। বাস্তবিকই ভয় আর আতংকে কেমন যেন থমথমে হয়ে আছে জিন্নার মুখ। বড়লাটের সম্মানে ৩১ বার তোপধ্বনির পর মিছিলে সামিল হল তাঁদের ছাত খোলা রোল্স্রয়েস। করাচির রাজপথ তখন মানুষের ভিড়ে গমগম করছে। দুপাশের ফুটপাত জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল জনতা। কখন থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা। এই উদ্বেল জনতার মধ্যে কত হাজার লক্ষ মানুষের মুখ। সব মুখই অচেনা। এই অচেনা মুখের সমুদ্রে কোন্ মুখটা অপরাধী কে জানে? কোথায় কোন রাস্তার মোড়ে, জানলার কার্নিস বা ছাতের আলসের ওপর হাতে বিস্ফোরক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হয়ত। তাক্ করে রেখেছে তাঁদের দুজনকে এই তিন মাইল লম্বা রাস্তা জুড়ে। সারা পথ জুড়েই বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে রক্ষীবাহিনী। কিন্তু জনতার দিকে ওরা পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। ফলে দুর্ঘটনার পরে কিছুতেই ওরা আততায়ীকে সনাক্ত করতে পারবে না।

পরবর্তীকালে লুই মাউন্টব্যাটেনের মনে হয়েছিল যে সেদিন তাঁদের তিরিশ মিনিটের এই যাত্রাপথটি যেন চব্বিশ ঘণ্টার যাত্রাপথ হয়ে উঠেছিল। কাঁটা বিছানো পথে যেমন ভাবে পথ চলে মানুষ, প্রায় তেমনিই ছিল মিছিলের গতি। পায়ে পায়ে হাঁটার চেয়ে কিঞ্চিৎ দ্রুত ছিল গাড়ির গতি। যেমন, দুঃখের রাত সহজে শেষ হয় না অনেকটা তেমনি। প্রায় ছ'টা স্তরে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে দুপাশের ফুটপাতে। অনেকে উঠেছে রাস্তার ধারের ল্যাম্পপোস্টে। কেউ দাঁড়িয়েছে ছাতের আলসের ওপর। অতি উৎসাহী ওরা। উৎফুল্ল মানুষগুলো ভাবতেও পারছে না গাড়ির মধ্যে বসে থাকা মানুষ দুজনের মনের মধ্যে কি খেলা চলছে। দুজনেই থমথমে মুখে ইতিউতি চাইছেন। জনতার জয়ধ্বনিতে কলের 'পুতুলের মতন মাথা নাড়ছেন। উচ্ছ্বসিত মানুষগুলো যখন 'জিন্দাবাদ জিন্না' 'জিন্দাবাদ মাউন্টব্যাটেন' বা 'জিন্দাবাদ পাকিস্তান' বলছে তখনও তাঁদের অসাড় মনে কোন আবর্ত সৃষ্টি হচ্ছে না।

আতংক চেপে, লক্ষ লক্ষ মানুষের উৎফুল্ল মুখের টানেলের ভেতর দিয়ে এক বিচিত্র মানসিক নির্যাতন সয়ে চলেছেন ওঁরা। কে জানে কখন কার অদৃশ্য হাত থেকে বোমাটা তাঁদের দিকে উড়ে আসবে। দুজোড়া চোখ উৎকন্টায় ব্যাকুল হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই অদৃশ্য আততায়ীকে। এরই মধ্যে হাত নেড়ে ওদের আবেগে সাড়াও দিতে হচ্ছে ওঁদের। মাউন্টব্যাটেনের মনে হ'ল জীবনের এ এক হাস্যকর ধাঁধাঁ যেন। তাই শিয়রে সমন নিয়েও খুশীর অভিনয় করতে হচ্ছে তাঁকে। তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিরে চিরে দেখছেন কোথায় ওই নিষ্পাপ সরল মুখের ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে একটা অপরাধী মুখ ত্রস্ত চোখে ইতিউতি চাইছে। এমন একটা মুখ চোখে পড়লেই তিনি বুঝবেন কোন্ সেই সূত্র, যেখান থেকে বিপদটি ঘনায়মান হবে।

তবে মাউন্টব্যাটেনের জীবনে এমন ঘটনার অভিজ্ঞতা নতুন নয়। ১৯২১ সালের ৮ ডিসেম্বর। প্রিন্স অব ওয়েল্শ্-এর ভরতপুর টুরের সময়ই সরকারের সি.আই.ডি. ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা দারুণ ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেয়। কথা ছিল যে

www.pathagar.com

শোভাযাত্রার সময় প্রিন্সের গাড়ির ওপর হাতবোমা ছোঁড়া হবে। বিপন্ন প্রিন্সকে সেদিন মাউন্টব্যাটেনই পরিত্রাণ করেছিলেন। জাল প্রিন্স সেজে শোভাযাত্রার পুরো-ভাগের গাড়িতে চড়ে তিনি মিছিলে অংশ নেন। আজ মিছিলের সংগে যেতে যেতে যতই মুখগুলো দেখলেন, ততই মনে পড়ে গেল ১৯২১ সালের সেই ঘটনাটার কথা। সেদিনের মতন আজও তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে আততায়ী খুঁজে বেড়াতে হচ্ছে তাঁকে। 'ওই লোকটা কি? না তার পাশের লোকটা?' বলাবাহুল্য, ঘটনাগুলো মোটেই স্মরণযোগ্য নয়। তবুও মনে পড়ছিল তাঁর। আর একটা ঘটনার কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। বাংলার গভর্নরের মিলিটারী সেক্রেটারী নাকি গভর্নরকে তাক্ করে ছোঁড়া একটা হাতবোমা খপ্ করে লুফে নেন এবং নিক্ষেপকারীর দিকেই সেটা তখনই ফেরত পাঠিয়ে দেন। ঘটনাটা যতই উপভোগ্য হ'ক না কেন তিনি এমনটি পারবেন না। কারণ, জীবনে একটা ক্রিকেট বলও তিনি লুফতে পারেন নি। স্ত্রীর কথাটা সর্বক্ষণই মনে পড়ছে তাঁর। তার গাড়িটা পিছনেই আছে। কিন্তু একবারের জন্যও পিছন ফিরে তাকাবার অবকাশ তাঁর নেই। সর্বক্ষণই তাঁর চোখ দুটো আততায়ী খুঁজে বেড়াচ্ছে। বিরামহীনভাবে যেন রাডার যন্ত্র থেকে আলোক-সংকেত ফেলছে লোকগুলোর মুখের ওপর। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নজর করছে কখন অগণিত মানুষের মাথার ওপর থেকে একটা গোলাকার পদার্থ উড়ে আসবে তাঁদের গাড়িখানার দিকে।

শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে ভিক্টোরিয়া রোডের হোটেলটার কাছাকাছি এসে পড়লো। মিছিল চোখে পড়তেই হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা ইংরেজ ছোকরাটি টানটান আড়ষ্ট হয়ে গেল। ছোকরার ডানহাতটা কোটের পকেটের মধ্যে কোল্ট °৪৫ পিস্তলের ঘোড়ায় শক্ত করে ধরা। ছোকরাকে আমরা চিনি। ওর নাম জি.ডি. স্যাভেজ। পাঞ্জাব পুলিসের এই সি.আই.ডি. অফিসারটি মাউন্টব্যাটেনের কাছে সর্বপ্রথম এই ষড়যন্ত্রের কথাটা জানিয়ে দিয়ে আসে। ছোকরার চোখ স্থির হয়ে আছে রাস্তার ও পাশের বাড়ির জানলার দিকে। লোকগুলো হাত নেড়ে গাড়ির আরোহী দুজনকে অভিবাদন জানাচ্ছে। ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে আলতোভাবে পিস্তলের সেফ্‌টি ক্যাচটা খুলে দিল স্যাভেজ। কিন্তু স্যাভেজের হাতে এই অন্যেয়াস্ত্রটা থাকার কথা নয়। কারণ ২৪ ঘণ্টা আগেই পাঞ্জাব পুলিসের চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছে সে।

খোলা গাড়িতে স্তব্ধ হয়ে পাশাপাশি বসে আছেন মাউন্টব্যাটেন এবং জিন্না। দুজনেই যেন ভাবের ঘরে চুরি করে মনের আতংক ভাবটি চেপে রেখেছেন। দুজনেরই মুখখানা হাসি হাসি। মনের ত্রাস চেপে ক্রমাগত হাত নেড়ে জনতার আনন্দ উল্লাসের প্রত্যাভিবাদন জানাচ্ছেন। তবে উত্তেজনায় টানটান মানুষ দুজনের মধ্যে বাক্যালাপ নেই। মাউন্টব্যাটেন বোধহয় মনে মনে হাসছিলেন তখন। তাঁর মনে হ'ল দুর্মুখরা তাঁকে দাম্ভিক বলে যে দুর্নাম দেয় সেটাই এখন তাঁর নিরাপদ আশ্রয়। নিজের সংগে এইটুকু প্রবঞ্চনা তাঁকে আজ করতেই হচ্ছে। আত্মম্ভরিতার এই খোলসটুকুর মধ্যেই এখন তিনি সবচেয়ে নিরাপদ। তবে তাঁর মনের উত্তেজনা একটু কমেনি। তাঁর একটাই আত্মপ্রসাদ যে মানুষগুলো হয়ত তাঁকে হত্যা করবে না। কারণ ওরা জানে যে ওদের স্বাধীনতা তিনিই দিয়েছেন। তবে জিন্নাবধই যদি হিন্দুদের লক্ষ হয় তাহলেও তাঁর উপস্থিতি জিন্নাকে রক্ষা করবে। ওরা জিন্নাকে হত্যা করতে চাইবে না কারণ সেক্ষেত্রে তাঁকেও হত্যা করা

www.pathagar.com

হবে একত্রে।

অবশেষে বিশাল মিছিল হোটেলের ব্যালকনি পেরিয়ে গেল। স্যাভেজ তখনও পকেটের মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্রটা চেপে ধরে রেখেছে। প্রয়োজন হলেই গর্জে উঠবে তার আগ্নেয়াস্ত্র। কিন্তু প্রয়োজন হ'ল না। যতক্ষণ খোলা গাড়িটা গুলির আওতার মধ্যে রইল, ততক্ষণ এক মুহূর্তের জন্যও সে অন্যমনস্ক হ'ল না। অবশেষে গাড়িটা যখন নিরাপদ দূরত্বে চলে গেল তখনই স্বস্তি পেল স্যাভেজ। আরামের নিশ্বাস ফেলে হোটেলের ঘরের মধ্যে ঢুকলো।

গাড়ির আগে আগে 'জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতে দিতে চলেছে জনতা। হঠাৎ 'জিন্দাবাদ' ধ্বনি থেমে গেল। একটা ভীতিকর নৈঃশব্দ ছেয়ে ফেলেছে ওদের। কিন্তু কি ব্যাপার? সচকিত হ'ল গাড়ির দুই আরোহী। তবে কি একটা কিছু ঘটবে? হয়ত বা তাই। কারণ মিছিল তখন হিন্দু এলাকা দিয়ে চলেছে। দুপাশের দোকানপাট বন্ধ। এটা বাজার এলাকা। অধিকাংশ দোকানদারই হিন্দু। দেশভাগের সিদ্ধান্তে তারা প্রতিবাদ জানাচ্ছে দোকানপাট বন্ধ রেখে। সরু রাস্তার দুপাশের জনতার চোখ-মুখ উদ্বেগাকুল। শুকনো মুখে সব হারানোর বেদনা নিয়ে ওরা স্তব্ধ হয়ে চেয়ে আছে মিছিলের দিকে। মাউন্টব্যাটেন মনে মনে প্রমাদ গণলেন। তবে কি এই সেই জায়গা? কিন্তু ওদের চোখমুখের চেহারা দেখে তেমন কিছু অনুমান হয় না। মানুষগুলো ভীত, বিধ্বস্ত। আশপাশের মুসলমান প্রতিবেশীর উন্মত্ত বিজয়োৎসবই ওদের এমন জড়সড়, সন্ত্রস্ত করে দিয়েছে।

অবশেষে যন্ত্রণাদায়ক অপেক্ষার পালা শেষ হ'ল। পাঁচ মিনিটের পথটুকু নির্বিঘ্নে পেরিয়ে এল শোভাযাত্রা। আর কিছুটা এগিয়ে যেতেই চোখের সামনে ঝলমল করে উঠলো গভর্নমেন্ট হাউসের প্রাসাদোপম অট্টালিকা। ওঁদের গন্তব্য-স্থান ওই সরকারী ভবন। দারুণ স্বস্তি পেলেন মাউন্টব্যাটেন। সমুদ্রঝড়ে বিপর্যস্ত জাহাজের ক্যাপ্টেন যেমন লাইটহাউসের আলো দেখে নিশ্চিন্ত হয় অনেকটা সেইরকম সোয়াস্তি পেলেন মাউন্টব্যাটেন।

ওঁদের রোলস্‌রয়েস এসে দাঁড়ালো গভর্নমেন্ট হাউসের সামনে। এই প্রথম জিন্না সহজ হলেন। সারাটা পথ মুখে কুলুপ এ'টে একটা দুঃসহ অবস্থার মধ্যে কাটিয়েছেন তিনি। পাশে বসা মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে একটা বাক্যালাপও করেন নি। এখন তাঁর শীর্ণ মুখে ছড়িয়ে পড়েছে একটা ঝলমলে হাসির আলো। অস্থিসার হাতখানা মাউন্টব্যাটেনের জানুর ওপর রেখে ফিসফিস করে জিন্না বললেন 'যাক্ আল্লার দোয়ায় আপনাকে জীবিত নিয়ে আসতে পারলুম!'

জিন্নার দাম্ভিক কথাটা শুনেই মাউন্টব্যাটেন সোজা হয়ে বসলেন। মনে মনে বললেন, 'বলে কি এই অর্বাচীন বৃদ্ধ! লোকটার স্পর্ধা ত দারুণ! উনি আমায় না আমি ওঁকে জ্যান্ত ফিরিয়ে আনলুম এখানে?'*

---

* অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও ষড়যন্ত্র কেন ব্যর্থ হয়েছিল সেই রহস্যটা লেখকদ্বয় জানতে পারেন নি। তবে এই প্রসঙ্গে একটা জলজ্যান্ত প্রমাণ তাঁদের হস্তগত হয়। প্রীতম্ সিং নামে জলন্ধরের একজন সাইকেল মেরামতকারীকে পাঞ্জাবের সি. আই. ডি. পুলিস গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের পর তার সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, শিখ ষড়যন্ত্রীদের সঙ্গে লোকটা নাকি রেললাইন তোলার কাজে যুক্ত ছিল। আরও জানা যায় যে, আর. এস. এস. বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবিরা করাচি শহরে ঢুকলেও তাদের নেতার

www.pathagar.com

কলকাতা, ১৪ আগস্ট ১৯৪৭

অন্য দিনের মতন সে দিনও গান্ধীজী ঠিক সময়ে তৈরি। ১৪ আগস্ট, বিকাল পাঁচটা। হায়দারী হাউসের সদরের সামনে তাঁর ক্ষীণ শীর্ণ শরীরের কাঠামোটা দেখতে পাওয়া গেল। সেই অতিচেনা ভঙ্গি। শরীরটা সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পড়েছে। তাঁর অবলম্বন দুজন যুবতীর কাঁধে দুহাত রেখে দ্রুত পায়ে অপেক্ষারত মানুষগুলোর মধ্য দিয়ে হেঁটে গেলেন তিনি। তাঁর গন্তব্য সেদিনের প্রার্থনাসভা।

গান্ধীজীর প্রাত্যহিক কর্মসূচী যে পলদণ্ডের নির্দেশে চলতো আমরা তা জানি। আজ যে অপরাহ্নিক প্রার্থনাসভায় তাঁকে উপস্থিত থাকতে হবে তারও সময় নির্দিষ্ট হয়ে আছে। গান্ধীজীর জীবনে এই নিয়ম পালন কঠিন ব্রতপালনের মতন। জীবনে কখনও এর লঙ্ঘন হয় নি। লেনিন বিপ্লবের ষড়যন্ত্র করতেন একটা গুপ্ত ঘরে বসে। হিটলারের ফাসিস্ত আন্দোলনের সবটাই ছিল বাহুবলের প্রকাশ। নুরেমবার্গে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর জমজমাট র‍্যালির সামনে দাঁড়িয়ে হিটলার সদম্ভে আন্দোলনের কথা বলতেন। গান্ধীজীর যত কথা, যত আলোচনা সবই অনুষ্ঠিত হ'ত খোলামেলা প্রার্থনাসভায়। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই দীর্ঘপথে যতরকম পরিকল্পনা হয়েছে সবই ঘটেছে এই প্রার্থনাসভায়।

দিনরাতের আবর্তনের মতনই নিয়মিত ছিল গান্ধীজীর প্রার্থনাসভার এই অনুষ্ঠানটি। দেশেবিদেশে, হাটেগঞ্জে, শহরে গ্রামে, যখন যেখানে থেকেছেন, তা সে লণ্ডনের বস্তিপাড়া বা ইংরেজের জেলখানা হ'ক, সেখানেই প্রার্থনাসভার অনুষ্ঠান হয়েছে। বলতে কি, সারা জীবনে এই অনুষ্ঠানটি তাঁর জীবনধারণের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। অত্যন্ত অন্তরঙ্গ এই সভায় বসেই সাঙ্গোপাঙ্গ এবং ঘনিষ্ঠ ভক্তদের সঙ্গে তিনি কত গূঢ় বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। শুধু গূঢ় বা তাত্ত্বিক আলোচনাই নয়, নানা তুচ্ছ বিষয়ও তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। বস্তুত, অপরাহ্নিক এই প্রার্থনাসভা ছিল তাঁর গণসংযোগের এক সফল মাধ্যম। দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য যেমন খাদ্যাভ্যাস বা নিয়মিত মলত্যাগের কথা বলেছেন, তেমনি বলেছেন মানব সমাজে আনবিক বিস্ফোরণের কুপ্রভাবের কথা। যেমন ব্যাখ্যা করেছেন শ্রীভগদ্‌গীতার সূক্ষ্ম ভাববিচারটি ,তেমনি বলেছেন ইন্দ্রিয় সংযমের কথা। বুঝিয়ে দিয়েছেন অহিংস আন্দোলনের প্রয়োজনের কথা এবং মানব সমাজে তার তাৎপর্য। সেই সঙ্গে প্রচার করেছেন সাম্রাজ্যবাদের দুষ্ট ফল। তাঁর প্রতিদিনের উপদেশাবলীর এইসব মণিমুক্তাগুলি জনে জনে মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছে। দেশেবিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে সংবাদপত্র বা বেতার মারফত এবং এইভাবেই ভারতের মুক্তি আন্দোলনের ভূমিকাটি এক শক্ত ভিতের উপর সুদৃঢ় হয়েছে।

গান্ধীজীর সেদিনের এই প্রার্থনাসভাটি যেন অন্য এক মাত্রায় তাৎপর্যমণ্ডিত ছিল। ভয়, অবিশ্বাস, ঘৃণা ও হিংসায় জর্জরিত এই শহর তখন প্রায় মুমূর্ষু হয়ে গেছে। তাই বেলেঘাটার ভাঙাচোরা হায়দারী ভবনের খোলা চত্বরে অনুষ্ঠিত এই

সংকেতটি তারা জানতে পারে নি। কথা ছিল যে একটা বিস্ফোরক ছুঁড়ে সঙ্কেত জানানো হবে। কিন্তু নেতার সঙ্কেত জানা যায় নি, কারণ লোকটা এতই ভয় পেয়ে যায় যে, ঠিক সময়ে সঙ্কেত জানাতে পারে না। ইতিমধ্যে খোলা গাড়িখানাও তাদের সামনে দিয়ে চলে গিয়েছিল।

www.pathagar.com

প্রার্থনাসভায় তাঁকে আসলো দেখাতে হবে। তাছাড়া, আর এক কারণের জন্যও আজকের এই প্রার্থনাসভা ঐতিহাসিক। ব্রিটিশ ভারতে এটিই তাঁর শেষ প্রার্থনা-সভা। সারাটা দিন ধরেই নানারকম জীবিকার মানুষের সঙ্গে তাঁকে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করতে হয়েছে। তাঁর অহিংস আন্দোলনের স্বরূপটি তিনি ওদের বুঝিয়েছেন। গান্ধীজীর দৃঢ় বিশ্বাস যে তাঁর এই প্রয়াস বিফল হবে না। বস্তুত বিফল যে হয় নি তার প্রমাণ মিললো সভায় এসে। প্রায় হাজার দশেক সন্ত্রস্ত মানুষ সেদিন জড়ো হয়েছেন তাঁর সভায়। কলকাতার এই প্রার্থনাসভায় বিপুল মানুষের মধ্যে এই সাড়া জাগানীয়া প্রভাবটি গান্ধীজীর মনে একটা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এনে দিল যেন। তিনি নিঃসন্দেহ হলেন যে, তাঁর অহিংসার বাণী কিছুটা সার্থক সাড়া তুলতে পেরেছে।

প্রার্থনাসভায় গান্ধীজী ওদের বললেন, 'কাল থেকে আমরা স্বাধীন। ব্রিটিশ শাসনের বন্ধন থেকে আমরা মুক্তি পাব। কিন্তু আজ মধ্যরাতেই আমাদের এই প্রিয় জন্মভূমি ভারতবর্ষ দুভাগ হবে। সুতরাং আগামীকাল যেমন আমাদের আনন্দের দিন, তেমনি দুঃখেরও দিন।' এরপর সবাইকে সতর্ক করে গান্ধীজী বললেন যে স্বাধীনতার একটা দায় আছে। সবাইকে তার বোঝা বইতে হবে। বললেন, 'কলকাতার মানুষের মধ্যে মংগলইচ্ছা ফিরিয়ে আনতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে যে সবাই সহোদর। এই ভ্রাতৃত্ববোধের উপলব্ধি না হলে সারা দেশকে বাঁচানো যাবে না। সারা দেশ যদি সাম্প্রদায়িক বিষে আচ্ছন্ন হয় তবে সদ্যোজাত এই স্বাধীনতা কি করে বাঁচিয়ে রাখবে তারা?' তিনি বললেন যে স্বাধীনতা দিবসের কোন অনুষ্ঠানেই তিনি যাবেন না। সারাটা দিন তিনি অনশন করবেন, চরকায় সুতো কাটবেন আর প্রার্থনা করবেন। সবাইকে বললেন তাঁরাও যেন এইভাবেই স্বাধীনতা দিবস পালন করেন। তাঁরা যেন বোঝেন যে চরকার এই কাঠের চাকাটাই বিপন্ন দেশকে রক্ষা করবে।

সেদিন করাচির রাজপথে জিন্নার গাড়ির পুরোভাগের মিছিলে 'জিন্দাবাদ' ধ্বনির যত আস্ফালনই উঠুক না কেন, সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন উত্তাপহীন শীতল হয়ে যায়। জিন্না যতই বড়াই করুন যে, 'একখানা টাইপরাইটার আর একজন ক্লার্ক' নিয়ে তিনি পাকিস্তান নামক আলাদা মুসলমান রাষ্ট্র গড়েছেন, এই ঠান্ডা ভাবটা একটা যেন ধাঁধাঁর মতন মনে হয়। লন্ডনের দি টাইমস পত্রিকাও সেই মন্তব্যই করে। সম্পাদকীয়তে লেখা হয়, 'জনতার মধ্যে আবেগ নেই, উৎসাহ নেই। বিস্ময়কর এই উদাসীনতা। সারা দেশ জুড়েই ছড়িয়ে আছে এই উদাসী হাওয়া।' ব্যাপারটা ঠিক তাই। আশ্চর্য ঘটনা যে, এত আলোড়ন সত্ত্বেও কি একটা ফাঁপরে পড়ে সারা দেশের মানুষ তখন যেন ঠান্ডা হয়ে গেছে। মনে হয় কি এক অশরীরী বিপদ যেন উঁকি দিচ্ছে রাষ্ট্রের এই জন্মলগ্নে। তাই লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জিন্না যে সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সেদিন তা কেমন যেন অর্থহীন মনে হচ্ছিল।

এরই ঠিক বিপরীত চিত্রটা দেখা গেল পূর্ববাংলায়। পশ্চিমের বিষণ্ণতার লেশমাত্রও দেখা গেল না সেখানে। প্রস্তাবিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের এই পূর্বদিকের অংগরাজ্যটি, আগামী দিনে যা বাংলাদেশের রূপভূমিতে পরিণত হয়, দিব্যি খুশীর মেজাজে তা তখন মাতোয়ারা। আনন্দে আটখানা হয়ে আছে সে দেশের মানুষ।

www.pathagar.com

প্রস্তাবিত পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রীর কার্যভার নিতে কলকাতা থেকে ঢাকা রওনা হলেন খাজা নাজিমুদ্দিন। বর্ষার জলে স্ফীত গঙ্গার বুকে তাঁর ছোট্ট স্টীমারটা ধক্‌ধক্‌ করে চললো বদ্বীপ পেরিয়ে রাজধানী ঢাকা শহরের দিকে। স্টীমারের মাথায় পতপত করে উড়ছে মুসলিম লীগের পতাকা। সুদীর্ঘ যাত্রাপথে যেখানেই তার স্টীমার থেমেছে সেখানেই জীর্ণ জেটি বা ভাঙাচোরা জাহাজঘাট থেকে অসংখ্য মানুষ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছে। শালতি চেপে তাঁর জাহাজের কাছে এসে চিৎকার করে স্লোগান দিয়েছে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ।' সেদিন সবাই খুশীতে ভরপুর। তাদের গলায় গান আর চোখে মুখে আনন্দ। কিন্তু পাকিস্তানের জন্মলগ্নে যাত্রাপথের কোথাও এমনকি ঢাকা শহরেও, পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা উড়তে দেখা যায় নি সেদিন। সম্ভবত এই অভাবটাই সেদিন সারা পূর্ববাঙলায় সবচেয়ে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল।

দাঙ্গার দাপটে তখনও আড়ষ্ট হয়ে আছে লাহোর। একটা দারুণ অনিশ্চয়তায় থমথম করছে শহর। কেউ জানে না শহরের ভাগ্যে কি আছে। বাউণ্ডারি লাইনের দাঁড়িটা কোথা দিয়ে গেছে কে জানে! এই ডামাডোলের মধ্যেই শহরের পুলিসপ্রধান বিল রীচ কার্যভার হস্তান্তরের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর ঘুপচি অফিস ঘরে চুপ-চাপ বসে থাকা এই মানুষটিই হলেন এই শহরের শেষ ইংরেজ পুলিস সুপারিন্‌-টেন্ডেন্ট। তাঁর অফিস ঘরের বাইরে থেকে জানলায় ঝোলানো খসখস টাটির গায়ে জলের ঝাপটা দেবার একঘেয়ে শব্দ আসছে। একটা বাচ্চা মুসলমান ছেলে রোজ এইসময় জলের ঝাপটা দেয়। কালও দেবে। কিন্তু বিল্‌ রীচ কাল এ ঘরে থাকবেন না। খসখসের গায়ে জল পড়ে ভুরভুর সুগন্ধ ছড়াচ্ছে চতুর্দিকে। দাঙ্গা থামাতে অনেক চেষ্টা করেছেন বিল্‌ রীচ। কিন্তু পারেন নি। মোগলদের এই সোনার শহর লাহোর যেন দুর্দম গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সর্বনাশের আবর্তে। পুলিসের অর্ডার বুকে ইতিমধ্যেই এই দাঙ্গার একটা রেকর্ড তিনি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। রিপোর্টটা আর একবার পড়লেন বিল্‌ রীচ। তারপর তার মুসলমান উত্তরাধিকারীকে ডেকে পাঠালেন তাঁর অফিস ঘরে।

লোকটা ঘরে ঢোকার পর ড্রয়ার থেকে একটা ফর্ম বের করলেন বিল্‌। সাদা নিভাঁজ ফর্ম। দুভাগে ভাগ করা এই ফর্মটা দস্তখত করে কার্যভার গ্রহণ ও বর্জনের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। একদিকের ভাঁজে বিল্‌ রীচ লিখলেন 'দায়িত্বভার বুঝিয়ে দিলাম।' তারপর স্বাক্ষর করলেন। মুসলমান অফিসারটি অন্য ভাঁজে লিখলো 'কার্যভার বুঝে পেলাম।' তারপর সেও স্বাক্ষর করলো। ব্যস! অনুষ্ঠান শেষ। এরপর দুই অফিসার দাঁড়িয়ে উঠে করমর্দন করলেন। আশেপাশে যে ক'জন দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের সঙ্গেও করমর্দন করলেন বিদায়ী অফিসার বিল রীচ। তারা স্যালুট করলো বিল্‌কে। প্রত্যাভিবাদন করলেন বিল্‌। তারপর মাথা নামিয়ে অফিস ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

সেদিন অনুরূপ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হচ্ছিল লাহোর থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরের শহর অমৃতসরেও। ১৪ই আগস্টের বিকাল। রোদ পড়ে আসছে তখন। অমৃতসরের পুলিস সুপারের নাম রুল ডীন্‌। বিল্‌ রীচের সহকর্মী সে। অনুষ্ঠান শুরুর আগে সিন্দুক খুলে রাজনৈতিক এজেন্টদের নামের তালিকা সম্বলিত একটা গোপন খাতা বের করলো। অমৃতসরের পুলিস বিভাগ থেকে যে সব রাজনৈতিক এজেন্ট হাজার টাকার নীচে মাসোহারা পেত তাদের নাম লেখা আছে

www.pathagar.com

ওই রেজিস্টারে। স্থানীয় কংগ্রেস নেতার নামও ওই তালিকায় আছে। আর আছে স্বর্ণমন্দিরের একজন প্রসাদ (অমৃত্) প্রস্তুতকারীর নাম। বলাবাহুল্য এমন গোপনীয় রেজিস্টারটি তার স্থলাধিকারীর হাতে তুলে দিতে কোন দ্বিধা হল না মুদ্রে ডীনের। কারণ সে জানে যে কোন সৎ এবং বিশ্বাসযোগ্য পুলিস অফিসার, যে ধর্মবিশ্বাসই তার থাকুক না কেন, সে কখনও ইন্‌ফর্মারের গোপনতা প্রকাশ করে দেবে না।

লাহোর এবং অমৃতসরে যখন দায়িত্ব 'দেওয়া' এবং 'নেওয়া'র অনুষ্ঠান চলছে, তখন করাচির বিশাল রাজভবনের মধ্যে একা একা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন জিন্না। আজই মধ্যরাত্রের ঘন্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে এই বিশাল ভবনটি হয়ে যাবে জিন্নার সরকারী বাসভবন। কথাটা মনে হতেই শরীরে শিহরন হল জিন্নার। কিন্তু ঘরে ঘরে এমন ভাবে চৌকিদারী কেন করছেন তিনি? বলাবাহুল্য জিন্নার এই টহলদারী মোটেই উদ্দেশ্যহীন নয়। আসলে তিনি তখন রাজভবনের তৈজস-পত্রাদি ইন্‌ভেন্টরীর সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছিলেন। কিন্তু ফর্দ মেলাতে গিয়েই এক বিপত্তি হ'ল। জিন্নার নজরে পড়লো যে ক্রিকেট বল খেলার সবরকম সরঞ্জাম নেই। নেই এর ম্যালেট (গদা) এবং উইকেটগুলো। তখনই ডাক পড়লো ছোকরা এ.ডি.সি.র। আদেশ হ'ল যেখান থেকে পারে সে খুঁজে আনুক খোয়া যাওয়া সরঞ্জাম।

সেদিন আর একজন মানুষও এইরকম একা বিষণ্ণ মনে লন্ডনে তাঁর হাম্বারস্টোন কটেজের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। এ'রই চেষ্টায় পাকিস্তান নামক প্রায় অসম্ভব এই সুন্দর ফুলটি ফুটেছে। এর সৌরভের ঘ্রাণ নিচ্ছে কত মানুষ। আমরা এ'কে জানি। এ'র নাম রহমত আলি। করাচির রাজপথে এ'র নামে কোন জয়ধ্বনি দিচ্ছে না কেউ। খ্যাতিটা চুরি করে নিয়ে গেছেন আর একজন মানুষ। অথচ তাঁর স্বপ্নের কুঁড়িটি এই মানুষটির হাতে তুলে দিতে একদিন তাঁকে কত না গঞ্জনা সইতে হয়েছে। আজ করাচির রাস্তায় সেই মানুষটিকে নিয়েই যত সমারোহ তার স্পন্দনটুকুও রহমত পেলেন না। না পান ক্ষতি নেই। কিন্তু জিন্না বিশ্বাস হনন করেছেন। তাই ক্ষুব্ধ হয়েছেন রহমত আলি। স্বপ্নের কুঁড়ি বাস্তবরূপ পেয়েছে এ কথা ঠিক। কিন্তু ফুলটি যে ফোটার আগেই ঝরে পড়বে এবার : এ কি করলেন জিন্না? কেন তিনি পাঞ্জাব ভাগ মেনে নিলেন? রহমত আলি তাই বিষণ্ণ, ক্ষুব্ধ। নতুন করে ইস্তাহার রচনায় তিনি মন দিয়েছেন আজ। এর দণ্ড পেতে হবে জিন্নাকে। বাতাসের সঙ্গে অস্ফুটে সেই কথাই বলছেন রহমত। হায় কাল! তার গর্ভের লিখন তখনও কেউ জানে না। রহমত নিজেও জানেন না কী আছে ভাগ্যে। তাঁর ক্ষোভ শুনতে পায় নি কাল। দাগ পড়ে নি সেখানে। তাই জিন্নার মৃত্যুর পর উচ্ছ্বসিত মানুষের দাবির জোরে লক্ষাধিক মুদ্রায় লাহোরে তৈরি হ'ল তাঁর স্মৃতি সমাধি। আর যাঁর স্বপ্নকোরকটি হাতে নিয়ে মহম্মদ আলি জিন্না অনুপ্রাণিত হলেন, সেই হতভাগ্য রহমতের মৃতদেহটা বিলেতের যে কবরস্থানে নিভৃতে শায়িত হ'ল তার পাথরফলকের সংখ্যাটিও মনে রাখলো না কেউ।

www.pathagar.com

দিল্লি, ১৪ আগস্ট ১৯৪৭

সবে সূর্যাস্ত হয়েছে। নিউদিল্লির রাজপথে একটা অভিনব দৃশ্য দেখতে পেল সবাই। মানুষের ভিড়ের মধ্যে সন্ন্যাসীর মিছিল চলেছে। একটা খোলা গাড়ির মধ্যে বসে আছেন দুজন সন্ন্যাসী। তাঁদের বুকে-কপালে ভস্মলেপা। গাড়ির আগে আগে চলেছে একজন শিঙাবাদক। তার হাতে একটা বাঁকানো শিংগা। একশ' গজ অন্তর লোকটা একবার দাঁড়াচ্ছে তারপর শিঙায় ফুঁ দিচ্ছে। সন্ধ্যার বাতাস ভারী হচ্ছে ভেঁপুর বিচিত্র শব্দে। গাড়ির মধ্যে বসে থাকা সন্ন্যাসী দুজনের চোখ দুটিতে অপার্থিব উদাসীনতা। ঘর-সংসার আর ইহলোকের সুখ ঐশ্বর্য ছেড়ে এসেছেন তাঁরা। এসেছেন অধ্যাত্ম সাধনায় মগ্ন হতে। হিন্দুধর্মে সন্ন্যাসধর্ম এক মহান সাধন অবস্থা যখন তার ব্রহ্মোপলব্ধি হয়। ফলে এক জন্মেই এর পুণ্যফল প্রাপ্ত হয় সে যা কোটি জন্মেও কোন সাধারণ গৃহী পায় না। প্রাচীন ও শাশ্বত ভারতের এই ভিক্ষুপথিকদের নিজস্ব বলতে থাকে তিনটি বস্তু। সাত গ্রন্থিযুক্ত বাঁশের একটা লাঠি, একটা জলের পাত্র বা কমণ্ডুল আর একখণ্ড হরিণের চামড়া।*

যাঁরা সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন তাঁদের সাধনা খুবই ক্লেশকর ও কঠিন। নারী সাহচর্য দূরের কথা, নারীমুখ সন্দর্শনও তাঁদের কাছে অন্যায়াচরণ। তাই খোলা গাড়িতে চলার সময় যখনই কোন কৌতূহলী নারীমুখ তাঁদের চোখে পড়ছে তখনই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন সন্ন্যাসীরা। রোজ সকালে উঠেই ওঁরা সারা গায়ে ভস্ম মেখে নেন কারণ এই দেহ নশ্বর এবং এর পরিণতি হল ছাই। এ'রা ভিক্ষুপথিক। দিনে একবার ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে এ'রা জীবনধারণ করেন। সন্ন্যাসীরা বসে আহার গ্রহণ করেন না এবং নিয়মিত দুধ, দই, ঘি, গোমূত্র ও গোময় দিয়ে তৈর করা পঞ্চগব্য পান করেন।

সন্ন্যাসী দুজনের মধ্যে একজনের হাতে রয়েছে একটা মস্তবড় রুপার বারকোশ। বারকোশের ওপর রাখা আছে পটী বাঁধা একটা হলুদবস্ত্র, পীতাম্বর। অন্য সাধুর হাতে রয়েছে ফুট পাঁচেক দীর্ঘ একটা রাজদণ্ড, তাঞ্জোর থেকে আনা জলের পাত্র, খানিকটা ভস্মাবশেষ আর প্রসাদী ভাত।

রাজধানীর রাজপথ ঘুরে মিছিল এসে থামলো ছোট্ট একটা বাংলো বাড়ির সামনে। ১৭ নম্বর ইয়র্ক রোডের এই বাংলোয় থাকেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং সমাজবাদী ভারতের এই প্রতিনিধির সামনে সংস্কার ও ধর্মাচারী সনাতন ভারতের সন্ন্যাসীরা এসেছেন ধর্মীয় উপচার নিয়ে। প্রাচীন ভারতীয় রাজাদের যেমন অভিষেকের পর সিংহাসনে বসানো হ'ত, এ'রাও তেমনিভাবে আধুনিকযুগের এই প্রতিনিধিকে ক্ষমতায় অভিষেক করবেন যাতে তিনি আধুনিক ভারতের যোগ্য প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন।

জওহরলাল এসে দোরগোড়ায় দাঁড়ালেন। তাঁর গায়ে পবিত্র জল ছিটিয়ে দেওয়া

* হিন্দু সাধুরা বাঘ ও হরিণকে খুবই ধর্মাচারী পশু মনে করে। তাই পূজা বা ধ্যানের সময় ব্যাঘ্র ও মৃগচর্মাসনের ব্যবহারে কোন ভ্রষ্টাচার হয় না।

www.pathagar.com

হ'ল। পূণ্যাচারি সন্ন্যাসীরা এরপর একটি পীতাম্বর পরিয়ে দিলেন নেহরুকে এবং তাঁর হাতে রাজদণ্ডটি ধরিয়ে দেওয়া হ'ল। চিরকাল যে মানুষটি সংস্কার, ঈশ্বর এবং পরকালরূপী রীতিজনকে অস্পৃশ্যজ্ঞানে হেয় করেছেন, তাদের হাতে এইসব আনুষ্ঠানিক রীত্যাচার পালনের একঘেয়েমি তাঁকে সইতে হ'ল। কিন্তু বাধা দিলেন না জওহরলাল। কুসংস্কারমূলক ধর্মাচরণকে যিনি একদা ধিক্কার দিয়েছেন তিনিও আজ খুশী মনেই মেনে নিলেন এই উপদ্রবটুকু। সম্ভবত এই অহঙ্কারী, জড়বাদী এবং যুক্তিবাদী মানুষটি স্বাভাবিক ভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে কী ভয়ংকর এক দায়িত্বের বোঝা তাঁর কাঁধে ন্যস্ত হয়েছে। সুতরাং এই গুরুভার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোন ক্ষীণ সাহায্য, এমনকি এক কণা দৈবকৃপাও যদি জোটে, সেটিও তুচ্ছ মনে করবেন না তিনি।

তখনও কোন সামরিক ছাউনি, সেনা সদর দপ্তর, সরকারী বাসভবন বা প্রতিষ্ঠান থেকে ইউনিয়ন জ্যাক পতাকাটি অপসৃত হয় নি। ক্লাইভ নির্মিত কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ, মাদ্রাজের সেন্ট জর্জ ফোর্ট, সিমলার বড়লাট ভবন, কাশ্মীরের পাহাড়ি উপত্যকা, আসামের ঘন বন বা কোথাও তখন ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা অবনমিত হয় নি। তিনশ' বছর ধরে যে সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহ্য এই পতাকা বহন করে এসেছে তা যেন এই ভূখণ্ডে ব্রিটিশ শাসনের প্রতীক। তাই মাউন্টব্যাটেন সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে, যথাসাধ্য চেষ্টায়, এর আবেগটি যেন রক্ষা করা হয়। তিনি বলেছেন যে কোথাও কোন অনুষ্ঠান করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের প্রতীক এই ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা নামানো হবে না। মাউন্টব্যাটেন এই অভিমানটি স্পর্শ করেছে নেহরুকেও। তিনিও ঘোষণা করেছেন যে ইংরেজের জাতীয় অভিমান ক্ষুণ্ণ করে কোথাও কোন অনুষ্ঠান তিনি করবেন না। অবশেষে সেটাই করা হ'ল। ১৪ আগস্টের সূর্যাস্তের পর প্রায় লোকচক্ষুর আড়ালেই সব সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং সামরিক দপ্তর ও ছাউনি থেকে নামিয়ে আনা হ'ল ইংরেজের জাতীয় পতাকা, ইউনিয়ন জ্যাক।

খাইবার গিরিপথের চূড়ায় খাইবার রাইফেল্স্-এর এ্যাড্জুট্যান্ট্ ক্যাপ্টেন কেনেথ ডান্স উৎকর্ণ হয়ে তাঁর ঘরে বসে আছেন। সূর্যাস্ত হলেও গিরিচূড়ায় তখনও শেষ বেলার আলো। অন্ধকার নামছে খুব ধীরে ধীরে। একসময় গার্ডরুম থেকে ঢং ঢং করে সাতটা বাজার ঘণ্টা শোনা গেল। ঘণ্টাধ্বনি করে সময় জানাবার এই পদ্ধতি সাবেক কাল থেকেই চলে আসছে ইণ্ডিয়ান আর্মির সব সেনা ছাউনিতে। তখন অনেক সেপাইদের ঘড়ি কেনার সামর্থ্যও ছিল না। কেউ কেউ হাতঘড়ি দেখে সময় পড়তেও পারতো না। এদের জন্যই সব সেনা ছাউনিতে প্রতি ঘণ্টায় সময় জানানো হয়। শেষ ঘণ্টাটা শুনেই এ্যাড্জুট্যান্ট ডান্স তাঁর ল্যাণ্ডী কোটাল ফোর্টের ছাতে উঠলেন। পাশেই একজন বিউগ্ল্বাদক হাতে রুপোর বিউগল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ্যাডজুট্যান্ট ডান্সের পাশ দিয়েই নেমে গেছে আঁকাবাঁকা পাথুরে রাস্তা। এই ঢালু পথেই পাঁচ হাজার বছর ধরে পাঠান মোগল আক্রমণকারীরা ভারতে ঢুকেছে। এর প্রতিটি বাঁকেই সিমেন্ট ফলকের গায়ে খোদাই করা আছে অনেক স্মরণীয় যুদ্ধ। কত যুদ্ধের নায়ক ছিলেন স্বয়ং তিনি। হয়ত ভয়ঙ্কর সে সব যুদ্ধে হত হয়েছে তাঁর কত স্বদেশবাসী।

এ্যাডজুট্যান্ট ডান্সের ইসারা পেয়ে বিউগ্লার আড়ষ্ট হয়ে সোজা তুলে ধরলো

www.pathagar.com

তার বিউগ্‌ল। তারপর বিউগ্‌লে ফুঁ দিয়ে সুর তুললো—বিষণ্ণ বিদায়সুর। খাইবার গিরিপথের চূড়ায় চূড়ায় ধ্বনিত হ'ল সেই বিষণ্ণ রাগিণীটি সুর। এই পাহাড়ে তখন শেষ হতে চলেছে একটা ঐতিহাসিক অধ্যায়। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এখান থেকে চিরকালের মতন ইংরেজ অধিকার শেষ হয়ে যাবে। এ্যাডজুটান্ট ডান্স নিজের হাতে ধীরে ধীরে নামিয়ে আনলেন ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা। তাঁর মনে পড়ছিল কত কথা। বাতাসে ভাসছে বিষাদী সুর। ডান্স নিজের হাতে পতাকাটি ভাঁজ করলেন। তারপর সযত্নে সেটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। শেষ হ'ল নিরাভরণ অনুষ্ঠান। জাতীয় মর্যাদার প্রতীক এই ইউনিয়ন জ্যাক পতাকাটি এবার ইংল্যান্ডে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন তিনি। আর একটা কাজ করলেন এ্যাডজুটান্ট। বোম্বাইয়ের জাহাজঘাটে নোঙর করা পণ্যবাহী জাহাজ (শিপ্ চ্যান্ডলার) থেকে কিনে আনা একটা পিতলের ঘণ্টা গার্ডরুমের রক্ষীর হাতে উপহার দিলেন তিনি। ঘণ্টার গায়ে খোদাই করা তাঁর নাম, ক্যাপ্টেন কেনেথ্ ডান্স। নামের নীচে তারিখ লেখা, ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ সন।

ঠিক একই রকম নিরাভরণ অনুষ্ঠান হ'ল আর এক শহরে। লক্ষ্ণৌ শহরের রেসিডেন্সির টাওয়ার শীর্ষে যে ইউনিয়ন জ্যাক পতাকাটি উড়ছিল, সেটিও নামিয়ে আনা হ'ল লোকচক্ষুর আড়ালেই। স্মরণ করা যেতে পারে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ধ্বজাধারী এই পতাকাটি এর আগে কখনও নামানো হয় নি। এই সেই ঐতিহাসিক রেসিডেন্সি যার দেওয়ালে বিদ্রোহী সিপাহীদের বন্দুকের গুলির দাগ আজও অবিকৃত। মোট সাতাশি দিন অবরোধের পর মুক্তি পেয়েছিল এখানকার আটক পড়া হাজার ইংরেজ শিশু ও নারী। সেই থেকে রেসিডেন্সির এই ভবনের কোন মেরামত করা হয় নি। বুলেট প্রোথিত দেওয়ালগুলো আজও তেমনি যথাযথ রাখা আছে। কিন্তু কিসের এই প্রতীক? উদ্ধত ব্রিটিশের অনমনীয় মনোভাবের আস্ফালন না অসহায় বন্দী ইংরেজ নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী সেপাইদের আক্রোশের নিদর্শন? অবশ্য নিন্দুকেরা অন্য কথাও বলে। তাদের ধারণা এটা নাকি সাম্রাজ্যবাদী দম্ভের এক জাজ্বল্যমান ছবি।

সেদিন অর্থাৎ ১৪ আগস্টের রাত দশটায় রেসিডেন্সির কেয়ারটেকার ওয়ার্যান্ট অফিসার জে. আর. আয়ারল্যান্ড কেল্লার মাথা থেকে ইউনিয়ন জ্যাক পতাকাটা ধীরে ধীরে নামিয়ে নিলেন। আয়ারল্যান্ডের পাশে শাবল গাঁইতি নিয়ে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। পতাকা নামানোর সংগে সংগেই পতাকাদণ্ডটাও তুলে নিল তারা। তারপর গর্তের মুখটা সিমেন্ট বালি দিয়ে ভাল করে বাঁধিয়ে দিল যাতে আর কোনদিন রেসিডেন্সির মাথার ওপর অন্য দেশের জাতীয় পতাকা তোলা না যায়।

১৭ নম্বর ইয়র্ক রোডে জওহরলালের বাসভবনে তখন আর একটা বিপর্যয়ের ছবি ফুটে উঠেছে। রাতের ডিনারের জন্য তৈরি হচ্ছেন জওহরলাল। হাত মুখ থেকে প্রসাদী ছাই ধুয়ে খেতে বসলেন তিনি। সংগে রয়েছেন কন্যা ইন্দিরা আর সরোজিনী নাইডু। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো। জওহরলাল ছুটে গেলেন টেলিফোন ধরতে। দুজনেই শুনলেন চেঁচিয়ে কথা বলছেন জওহরলাল। খানিকটা উত্তেজিত তাঁর গলার স্বর। ভাঙাভাঙা যেটুকু শোনা গেল তাতেই বোঝা গেল যে জওহরলাল বেশ উদ্বিগ্ন। কিন্তু কি এমন ঘটলো খানিক পরেই ফিরে এলেন জওহরলাল। মুখখানা সাদা হয়ে গেছে। খানিকক্ষণ গুম্ হয়ে বসে রইলেন

www.pathagar.com

তিনি। কিন্তু কি ব্যাপার ? কথা বলছেন না কেন ? খানিক পরে বাষ্পাকুল চোখে মেয়ের দিকে তাকালেন জওহরলাল। দুজন মহিলাই দেখলেন মানুষটার দুচোখেই চিকচিক করছে জল। আবেগটা সামলে জওহরলাল জানালেন যে লাহোর শহরের পুরনো মহল্লায় হিন্দু ও শিখদের বাড়ি থেকে কলের জলের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে। ভাদ্র মাসের এই গুমট গরমে এক ফোঁটা খাবার জলও পাচ্ছে না বাচ্চারা। তাই তেষ্টা মেটাতে দোরে দোরে ঘুরছে শিশু ও মেয়েরা। এক বালতি জলের জন্য হাহাকার করছে তারা। আর তারই সুযোগ নিচ্ছে উন্মত্ত মুসলমান জনতা। তারা ঝাঁপিয়ে মারছে অসহায় শিশু ও নারীদের। পাড়ায় পাড়ায় আগুন লাগাচ্ছে। ইতিমধ্যেই শহরের বারো-তেরটা অঞ্চল দাউ দাউ করে পুড়ছে।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন জওহরলাল ঘটনার বর্ণনা দিতে দিতে। অসহায় নির্বাক তাঁর দৃষ্টি। মেয়ের দিকে চেয়ে কোনরকমে বললেন, 'আর খানিকক্ষণ পরেই স্বাধীন হবে দেশ। বেতার মারফত আমায় বলতে হবে যে আমি খুশী দারুণ খুশী। কিন্তু কি করে এমন একটা নির্জলা মিথ্যে বলবো যখন জানছি যে অমন সুন্দর লাহোর শহরটা জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে ? এটা যে চরম ভণ্ডামি ?

মনের মধ্যে সেদিন যে ভয়ংকর ছবি দেখে আঁতকে উঠেছিলেন জওহরলাল, বাস্তবে সেই ছবিটাই দেখতে পেল গোর্খা বাহিনীর তরুণ ক্যাপটেন রবার্ট এ্যাট্‌কীন্‌স। লাহোরের রেলব্রিজের ওপর দিয়ে জীপ চড়ে আসার সময় অবিকল সেই চিত্রটাই দেখতে পেল যুবক এ্যাট্‌কীন্‌স! রেলব্রিজের রাস্তা মসৃণ সমতল নয়। মাঝে মাঝে কুঁজের মতন উঁচু (hump backed) হয়ে আছে। তাই ব্রিজের ওপর দিয়ে নাচতে নাচতে চলেছে তার জীপ গাড়ি। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু আগুন লাগার দৃশ্য। দাউ দাউ করে জ্বলছে শহরের ডজনখানেক এলাকা। মনে হচ্ছে ফিনকি দিয়ে ছুটছে আগুনের ছড়া। আকাশের বুক লাল করে দিয়েছে। বীভৎস দৃশ্যটা দেখতে দেখতে চোখের ওপর ১৯৪০ সালে লণ্ডনের সেই ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ডের কথা মনে পড়ে গেল তার।

এ্যাটকীনসের পিছনে আসছে পুরো গোর্খা বাহিনী। ২০০টা ট্রাক আর ৫০টা জীপ গাড়ি চড়ে তারা আসছে। পাঞ্জাব বাউণ্ডারি ফোর্সের খানিকটা অংশও তার সংগে লাহোরে এসেছে। তবে বাউণ্ডারি ফোর্সের পুরো বাহিনীর সাহায্য সে পাবে না কারণ স্বাধীনতার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বাউণ্ডারি ফোর্সের পুরো বাহিনী লাহোরের জন্য নিযুক্ত করা যায় নি।

ওদের ছাউনি পড়েছে শহরের বাইরে জিমখানা ক্লাবের মাঠে। শহরের ভেতর দিয়ে আসার সময় সারা রাস্তায় একটাও মানুষ দেখলো না এ্যাটকীনস। সমস্ত শহরটা ঢেকে রেখেছে একটা শ্মশান-নৈঃশব্দ্য। মাঝে মাঝে শুধু দূর থেকে ভেসে আসছে উৎকট হল্লা।

এই তরুণ ইংরেজ অফিসারটির জন্ম ভারতেই। পুণার ক্যানটনমেন্টে তার জন্ম। জীবনে তার একটাই সাধ যে বাবার মতন সেও ফৌজি অফিসার হয়। তাই সে হয়েছে। বাবা এখন রিটায়ার্ড কর্নেল। মাদ্রাজে থাকেন। এ্যাটকীনস লাহোরে এসেছে চাকরি সূত্রে। সে নির্ভীক, বেপরোয়া। কিন্তু লাহোরের এই ভয়ংকর রাতটা আচ্ছন্ন করে দিয়েছে তাকে। বছরখানেক আগে বাবার সংগে মাদ্রাসের বিলিয়ার্ড ক্লাবে দেখা হয়েছিল। দেখতে দেখতে রাজনীতির কথা

www.pathagar.com

উঠলো। 'কিউ' টানতে টানতে সেদিন দারুণ একটা ভবিষ্যদবাণী করেছিলেন বাবা। ছেলেকে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, ভারত নিশ্চয়ই স্বাধীন হতে চলেছে। তবে দেখে নিও, স্বাধীন হবার পর রক্তের বন্যা বইবে এ দেশের মাটিতে।' বাবার কথার ইঙ্গিতটা সেদিন সে বোঝে নি। এ্যাটকীনস আজ বুঝতে পারে কত নিবিড়ভাবে তার বাবা এই দেশটাকে চিনেছেন। নতুবা এমন বাস্তব সত্য কথাটা বলতে পারতেন না।

১৪ আগস্ট ১৯৪৭, দিল্লি, মধ্যরাত

ভারতের সংবিধান পরিষদের সভাপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের বাসভবনে দাউ দাউ করে অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। তবে কি কোন দুষ্কৃতকারী আগুন লাগিয়েছে? না, এটা সাধারণ অগ্নিকাণ্ড নয়। বৈদিক অনুষ্ঠান পালনের জন্য হোম-কুণ্ড রচনা করা হয়েছে। যজ্ঞাগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে আছেন পুরোহিত ব্রাহ্মণ। হিন্দুধর্মে অগ্নি অতি পবিত্র দেবতা। তিনি যেমন পূজার বাহক, তেমনি ঋত্বিক। তিনি মনুষ্য ও দেবতাগণের দূতস্বরূপ। তিনি দেবতাগণের জন্য হবিঃ বহন করেন, তাই হব্যবাহন। পুরোহিত ব্রাহ্মণ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে অগ্নির বন্দনা করছেন। নৈরুক্তদের মতে দেব তিন জন, পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে ইন্দ্র বা বায়ু এবং আকাশে সূর্য। হিন্দুর প্রতি ঘরে তিনি আহূত ও স্তুত এবং প্রতি অনুষ্ঠানে তিনি অধিষ্ঠিত। অগ্নি অনির্বাণ এবং শুদ্ধিমান। মানুষের নশ্বর দেহ যে অবশেষে পরিণত হয় সেই অবশেষ থেকেই অগ্নি জাত হন।

অগ্নির বন্দনা করে ব্রাহ্মণ বললেন, 'হে বৈশ্বানর, তুমি দেব ও দানবের মধ্যস্থ। তুমি সর্বদেবের আননস্বরূপ, তুমি সর্বত্রব্যাপী। তুমি সর্বগুণান্বিত এবং সত্যস্বরূপ।'

ব্রাহ্মণ পুরোহিতের অগ্নিবন্দনা সমাপ্ত হবার পর ভাবী মন্ত্রীরা যজ্ঞাগ্নি প্রদক্ষিণ করলেন। প্রদক্ষিণের সময় অন্য এক ব্রাহ্মণ সকলের গায়ে শান্তিজল ছিটিয়ে দিলেন। প্রদক্ষিণ সমাপ্ত হবার পর সবাই এসে দাঁড়ালেন ঘট হাতে একজন যুবতীর কাছে। মেয়েটির হাতে চকচকে পিতলের ঘট। ঘটের মুখটি তালপাতা দিয়ে ঢাকা। পুণ্যঘটের মধ্যে সিঁদুর গোলা আছে। এক এক করে মন্ত্রীরা মেয়েটির সামনে এসে দাঁড়ালেন। সকলের কপালে সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিল মেয়েটি। জন্ম হ'ল তৃতীয় নয়নের। এই তৃতীয় নয়ন তার অন্তর্দৃষ্টি এবং এরই আশ্রয় নিয়ে হিন্দুরা দুষ্ট মানুষের অনিষ্ট চিন্তা থেকে আত্মরক্ষা করে। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা নিয়ে মন্ত্রীরা অতঃপর পরিষদ ভবনে ঢুকলেন।

ডেসপ্যাচবক্সের শেষ ফাইলে দস্তখত করছিলেন মাউন্টব্যাটেন। ভাইসরয়রূপে এটাই তাঁর শেষ স্বাক্ষর। আর কিছুক্ষণ পরে তিনি আর ভাইসরয় থাকবেন না। গুরুত্বপূর্ণ এই সচিবালয়ের আর কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব থাকবে না এরপর। তাই ভাইসরয়ের নাম লেখা সীলমোহর ও রবার স্ট্যাম্পগুলো চিরকালের মতন এখান

www.pathagar.com

থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। অনেক পুরনো কথা মনে পড়ছে এখন তাঁর। হঠাৎ একটা অদ্ভুত ইচ্ছা হ'ল মাউন্টব্যাটেনের। এখন তিনি বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষ। অনেক কিছুই করতে পারেন তিনি। মনে পড়লো এইচ. জি. ওয়েলস্ রচিত 'দি ম্যান হু কুড ডু মিরাকল্স্' বইটার কথা। অনেকদিন আগেই এই কল্প-কাহিনীটি তিনি পড়েছিলেন। একদিনের জন্য কাহিনীর নায়ক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল। আজ তিনিও এমনি প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন। তিনিও পারেন মিরাকল্ করতে। কিন্তু কি মিরাকল্ তিনি করবেন?

হঠাৎ যেন বিদ্যুৎচমক হ'ল তাঁর শরীরে। খাড়া হয়ে বসলেন মাউন্টব্যাটেন। তারপর নিজের মনেই চেঁচিয়ে উঠলেন। 'ওহো! ভুলেই গিয়েছিলাম সেই কথাটা!' কিন্তু কোন্ কথা? পালানপুর স্টেটের বিদেশিনী বেগমকে, 'হার হাইনেস' করার কথা? ঠিক তাই! মাউন্টব্যাটেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শেষ ভাইসরয় হিসাবে এই কাজটা তিনি নিশ্চয়ই পালন করে যাবেন। অতএব মন থেকে দ্বিধা ঝেড়ে ফেললেন তিনি। মুহুর্মুহু বেল বাজাতে লাগলেন। হুড়মুড় করে ছুটে এল দু-তিনজন সহকারী।

ওরা দেখলো মাউন্টব্যাটেন যেন আপন চিন্তায় ডুবে গেছেন। সত্যই তাই। তিনি তখন বিভোর হয়ে গেছেন পুরনো সুখস্মৃতির মধ্যে। পালানপুরের নবাবের সঙ্গে তাঁর অনেকদিনের বন্ধুত্ব। প্রিন্স অব ওয়েল্স্-এর সঙ্গে যখন ভারত-ভ্রমণে এসেছিলেন সেই তখন থেকে। তারপর ১৯৪৫ সালে সুপ্রীম কম্যাণ্ডাররূপে যখন তিনি এ-দেশে এলেন তখন নবাবের সুন্দরী বেগমের সঙ্গেও তাঁর আলাপ হয়। বেগম বিদেশিনী। অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসিনী সে। তখনই নবাবের অনুরোধটি পান মাউন্টব্যাটেন। স্টেটের ব্রিটিশ রেসিডেন্ট স্যার উইলিয়ম ক্রফ্ট্ তাঁকে অনুরোধ করেন যেন নবাবের বিদেশিনী বেগমকে 'হার হাইনেস' সম্মানে ভূষিত করার ব্যবস্থা করেন তিনি। মেয়েটি নাকি তখনই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমানী পোশাক পরা শুরু করে দিয়েছিল। মাউন্টব্যাটেন রাজী হয়েছিলেন বন্ধুকৃত্যটুকু সম্পন্ন করতে। কিন্তু তিনি তা পারেন নি।

ভারতের ভাইসরয় তখন লর্ড ওয়াভেল। তাঁর কাছেই সুপারিশ করেছিলেন মাউন্টব্যাটেন। কিন্তু কাজ হয় নি। ওয়াভেল বলেছিলেন যে প্রস্তাবটি কিছুতেই মেনে নেবে না লণ্ডন। কারণ একবার বাঁধের মুখ খুলে দিলে বন্যার মতন নবাবেরা মেম বিয়ে শুরু করে দেবে, যার ফলে রাজন্যপ্রথাটাই লুপ্ত হয়ে যাবে। সেই থেকেই স্থিতাবস্থা চলছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে মাউন্টব্যাটেনের জিদ বেড়ে গেল। তিনি স্থির করেছেন এই কৃত্যটুকু তিনি পালন করে যাবেন।

সহকর্মীরা অপেক্ষা করছিল আদেশের জন্য। মাউন্টব্যাটেন সকলের দিকে চাইলেন, তারপর তাঁর মনের বাসনার কথা জানালেন। সবাই অবাক হ'ল তাঁর কথা শুনে। একজন ত প্রতিবাদ করেই বসলো। বললো, 'আপনি তা পারেন না স্যর!'

'কেন পারি না? আমিই ত ভাইসরয়!' এই বলে তখনই একজনকে 'স্ক্রল' পেপার খুঁজে আনতে বললেন। আর একজনকে বাণীটি রচনা করতে বললেন। এই কাজগুলো শেষ হবার পর অভিনন্দনপত্রটি যখন তাঁর স্বাক্ষরের জন্য টেবিলে পাঠানো হ'ল তখন রাত ১২টা বেজে ৫৮ মিনিট। মাউন্টব্যাটেন কলম বের

www.pathagar.com

করলেন। তারপর শেষ ভাইসরয় হিসেবে স্বাক্ষর করলেন। তাঁর স্বাক্ষরের সংগে সংগেই পালানপুর স্টেটের বিদেশিনী বেগম 'হার হাইনেস' পদে অধিষ্ঠিত হলেন। সই শেষ করে মানপত্রের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন মাউন্টব্যাটেন। তখন সারা মুখখানি দারুণ তৃপ্তিতে ঝলমল করছিল তাঁর।*

সই শেষ হবার সংগে সংগেই ভাইসরয় হাউসের বাইরের ফ্ল্যাগস্টাফ্ থেকে ধীরে ধীরে নামিয়ে আনা হল ইউনিয়ন জ্যাক পতাকাটি। **

আবহমান কাল থেকেই, অর্থাৎ পুরাণের যুগ পেরিয়ে পাথুরে যুগে পৌঁছানোর আগে থেকেই সমুদ্রতীরে পড়ে থাকা শাঁখের আওয়াজে ভারতের ঘুম ভেঙেছে। এই প্রথা আজকের নয়। তাই নতুন যুগের প্রত্যুষও শঙ্খধ্বনিতে ঘোষিত

---

* মাউন্টব্যাটেনের এই প্রশংসনীয় কাজটা দারুণ সাফল্য পায়। দিনকয়েক পরেই পালানপুরের নবাবের ব্রিটিশ রেসিডেন্ট স্যর উইলিয়ম ক্রফ্‌ট্ উচ্ছ্বসিত ভাষায় একটি চিঠি লিখলেন মাউন্টব্যাটেনকে। রীতিমত কাব্যিক সেই ভাষা। ক্রফ্‌ট্ লিখলেন, 'আপনার এই উদারতার উপযুক্ত ধন্যবাদ দেবার ভাষা আমার জানা নেই। সামর্থ্যও নেই। এ শুধু আপনার অনুগ্রহ নয়, এ আরও কিছু। পালানপুরের প্রতি আপনার এই অনুগ্রহের ফল সুদূরপ্রসারী। তাই শুধু নবাব নন, আমিও আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। যদি কখনও ঋণ শোধের সুযোগ পাই তবে চেষ্টা করবো। তবে ইতিমধ্যে যদি আমার সাহায্যের দরকার হয়, অনুগ্রহ করে আমায় স্মরণ করবেন, দ্বিধা করবেন না।

তা তিন বছর পরেই দরকার পড়লো। ১৯৫০ সাল। মাউন্টব্যাটেন তখন নৌবিভাগের ফার্স্ট সী লর্ড। হিজ ম্যাজেস্টিসের নৌসেনারা অনেকদিন থেকেই কয়েকটি বিশেষ সুবিধা পেয়ে আসছিল। সিগারেট, মদ ইত্যাদি কয়েকটা ভোগ্যপণ্য তারা নিয়মিত সস্তাদরে পেত কিন্তু কালেক্টর অব কাস্টম্‌সের আদেশে সেই সুবিধাগুলি হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হয়, কারণ এর ফলে নাকি সরকারী রাজস্বের প্রভূত লোকসান হচ্ছিল। ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট জনসমর্থন পায় এবং এ্যাটলি সরকারও রাজস্ববৃদ্ধিতে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। ফলে কালেক্টরের সঙ্গে সব রকম আলোচনাই ব্যর্থ হয় এবং নৌবিভাগের সচিব জন্ ল্যাংও কালেক্টরকে বোঝাতে অক্ষম হন। এমনকি মাউন্টব্যাটেন যখন কালেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন, তাঁকেও আমল দিলেন না স্যর জন্ ল্যাং। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন নাছোড়বান্দা। সুতরাং শেষমেশ তিনি অনুমতি পেলেন। একদিন গেলেনও কালেক্টরের আপিসে। কিন্তু দোর ঠেলে ভেতরে ঢুকেই অবাক হলেন মাউন্টব্যাটেন। তাঁকে অভ্যর্থনা করতে যে মানুষটি দাঁড়িয়ে উঠেছেন তিনি স্বয়ং স্যর উইলিয়ম ক্রফ্‌ট্। তিনিই বর্তমান কালেক্টর অব কাস্টম্‌স্। প্রসন্নমুখে ক্রফ্‌ট্ বললেন, আপনাকে দেখে খুবই আনন্দ পেলাম। আপনি জানেন যে পালানপুরের বেগমের জন্য আপনি যা করেছেন তার কোন প্রতিদানই আমি দিইনি।

'এখন দিন।' স্মিত মুখে বললেন মাউন্টব্যাটেন। বাস, সমাধান হয়ে গেল এতদিনের টানা-পোড়েনের। কালেক্টর অব কাস্টম্‌স্ স্যর উইলিয়ম ক্রফ্‌ট্ আদেশ দিলেন যে নৌবাহিনীর সেনারা আগের মতনই স্বল্পদামে ভোগ্যপণ্যগুলো ভোগ করতে পারবে।

** স্টার অব ইণ্ডিয়া শোভিত এই ইউনিয়ন জ্যাক পতাকাটি বর্তমানে এ্যাবে অব্ রম্‌সের নর্মান গ্রীষ্টীয় মঠে রক্ষিত আছে।

www.pathagar.com

হ'ল। সাদা খাদির পোশাক পরা যে মানুষটা পরিষদ ভবনের গ্যালারির শেষ সারিতে দাঁড়িয়ে আছে তার হাতেও ধরা আছে মাঙ্গলিক শাঁখ। দুহাতের মুঠির মধ্যে ধরা শাঁখের গায়ে আলো পড়ে চিকচিক করছে যেন। তখন সভাকক্ষ কানায় কানায় ভরা। মনে হয় আজ কোন সভ্যই অনুপস্থিত নয়। শাঁখ হাতে মানুষটা নির্দেশ পেলেই শাঁখে ফুঁ দেবে। আজ এখানে ওর ভূমিকা হ'ল বিউগল বাদকের ভূমিকা। শাঁখ হাতে নিয়েই এতদিন ধরে কংগ্রেসের সেবাদলবাহিনীর স্বাধীনতা আন্দোলনে সে এই ভূমিকাটি পালন করে এসেছে।

লোকটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার নীচের সারির প্রধান আসনে উপবিষ্ট আছেন জওহরলাল নেহরু। ওঁর সাদা শেরওয়ানির বুকের বোতামঘরে লাগানো আছে সদ্য ফোটা একটা লাল গোলাপ ফুল। ইংরেজের কারাগারে ন'বছরের বন্দী-জীবনের দিন ক'টা বাদ দিলে গোলাপ হীন পোশাক তিনি একদিনও পরেন নি। জওহরলালের চারদিকের দেওয়ালে ঝোলানো আছে বিশাল মাপের সোনালী ফ্রেম। আগে এই ফ্রেমের মধ্যে আঁটা থাকতো প্রাক্তন ভাইসরয়দের তৈলচিত্র। আজ ছবি-গুলো সরিয়ে কংগ্রেসের তেরঙা পতাকা টাঙানো হয়েছে। জওহরলালের সামনের সারিতে ঠেসাঠেসি করে বসেছে গণপরিষদের পুরুষ ও মহিলা সভ্যরা। তারা কেউ পরেছে খাদির শাড়ি, কারও পরনে রাজসাজ বা ডিনার স্যুট। আর কিছুক্ষণ পরেই যে নতুন নেশনের জন্ম হবে তারই জনপ্রতিনিধি এরা। বিশাল এই জন-সমষ্টির মধ্যে অনেক ভাষা ও ধর্ম এবং সংস্কৃতির মেলবন্ধন হয়েছে। এ যেন যথার্থই বিবিধের মাঝে এক মহামিলনের চিত্র। একদিকে যেমন আধ্যাত্মিক উপলব্ধির চরম উৎকর্ষ ঘটেছে এই দেশে অন্যদিকে তেমনি আছে হীনতম দারিদ্র্য ও মানবাত্মার অনাদর। মনন ও চর্চার এই মহান বিবিধতাই (প্যারাডক্স্) এই সনাতন দেশটির প্রধান ঐশ্বর্য। তাই মনে হয় যে মাটি নয়, এদেশের অবহেলিত মানুষই অধিক উর্বর। বস্তুত তাই। ঈশ্বরনির্ভর এই দেশের মানুষের যেমন দৈনন্দিন বিড়ম্বনা আছে, যেমন আছে ক্রূর দারিদ্র্য আর নিষ্ঠুর প্রাকৃতিক তাণ্ডব, তেমনি আছে এক মহান অতীত। বলাবাহুল্য, দেশটার অতীত মহান হলেও, এর বর্তমানটাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং ভবিষ্যৎটাও অনিশ্চিত সংকটের সঙ্গে আপস করা। তবুও যেন এই বিস্ময়কর দেশটা তার সবরকম অভাব দৈন্য নিয়েও কালোত্তীর্ণ হয়েছে এবং বিশ্ব-মানবতার ঊর্ধ্বে উঠে জ্যেষ্ঠ স্থানটি অধিকার করে নিয়েছে।

এই নতুন রাষ্ট্রের জনসংখ্যার মধ্যেও এই মহান মিলনের ছবিটি পরিস্ফুট হয়। এর ২৭ কোটি ৫০ লক্ষ হিন্দুর মধ্যে ৭ কোটি হরিজন। এছাড়াও আছে সাড়ে তিন কোটি মুসলমান, ৭০ লক্ষ খ্রীশ্চান, ৬০ লক্ষ শিখ, এক লক্ষ পারসীক এবং ২৪ হাজার ইহুদি যারা সলোমনের মন্দির ধ্বংসের পর এ দেশে অভিযাত্রী হয়ে এসেছিল। এরা সবাই এই প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত থাকলেও মাতৃভাষায় আলাপ করতে পারে না। এটাই বিস্ময়কর যে এই বিবিধ জাতি ও ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে একমাত্র যোগাযোগকারী ভাষা হ'ল ইংরিজি। হয়ত সে কারণেই নতুন রাষ্ট্রে অনুমোদিত ভাষা হবে ১৫টা প্রধান ভাষা আর ৮৪৫টা আঞ্চলিক ভাষা। ভাষা বিভ্রাটই শুধু নয়, লিপিতেও বিভ্রাট আছে। পাঞ্জাবের উর্দু ভাষা লেখা হয় ডানদিক থেকে এবং হিন্দি বাঁ দিক থেকে। দক্ষিণের তামিল লিপির পাঠও অন্য-রকম। তাছাড়া এমন অনেক আঞ্চলিক ভাষা আছে যার হরফ সাঙ্কেতিক। উত্তর দক্ষিণের মধ্যে আচার ব্যবহারেও অনেক তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। তামিল ভাষী

www.pathagar.com

মাদ্রাজীরা যখন দুপাশে মাথা নেড়ে 'হাঁ' বলে, তখন এই ভঙ্গিটাই উত্তরাঞ্চলের মানুষের কাছে 'না' হয়ে যায়।

নবলব্ধ স্বাধীন ভারতে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা সুইজারল্যান্ডের মোট জনসংখ্যার সমান। বেলজিয়াম রাষ্ট্রে যত অধিবাসী আছে এ-দেশের পুরোহিতের সংখ্যা তার সমান। সারা দেশে যত ভিখারী আছে তাদের দিয়ে হল্যান্ড দেশটা ভরিয়ে দেওয়া যায়। এ ছাড়া আছে এক কোটির কিছু বেশি সাধু-সন্ন্যাসী, দু-কোটি উপজাতি সম্প্রদায় এবং সাপুড়ে, বাজিকর, গণৎকার ইত্যাদি পৈত্রিক পেশায় নিযুক্ত যাযাবর বেদেরা, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যাদের সংখ্যা দুকোটিরও অধিক। প্রতিদিন এদেশে আটত্রিশ হাজার শিশু জন্মায় যার এক চতুর্থাংশ পাঁচ বছর বয়সের আগেই মারা যায় আর অপুষ্টি বা আরও কঠিন রোগে ভুগে প্রতি বছর যত মানুষ মরে তার সংখ্যা এক কোটির মতন।

সারা পৃথিবীতে ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যার মাটিতে ছড়িয়ে আছে অধ্যাত্মবাদের বীজ। এ দেশ যেমন মহান বৌদ্ধধর্মের সূতিকাগার তেমনি হিন্দু-ধর্মেরও ধাত্রীভূমি। এমনকি ইসলাম ধর্মের প্রভাবটিও নিবিড় হয়ে ছড়িয়ে আছে এই উপ-মহাদেশের পরিমন্ডলে। এ দেশের অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবীরা নানা রূপে বিরাজ করেন। এঁদের সাধনানুষ্ঠানেও নানারকম রীতি। নিবিড় যোগসাধনা থেকে শুরু করে অর্বাচীন পশুবলি পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে এর ধর্মসংস্কারে। এমনকি বনের মধ্যে লুকানো এমন অনেক মন্দির আছে যেখানে অবাধে চলে নানা বিকৃত যৌনাচার। হিন্দুর দেবতামন্ডলীতে অধিষ্ঠিত আছেন অসংখ্য দেব-দেবী। প্রায় প্রতিটি পৌরাণিক উপখ্যানের সংগে যুক্ত হয়ে আছেন তাঁরা। নৃত্য, সংগীত, কাব্য ও চারুকলার সংগে যেমন তাঁরা অচ্ছেদ্য তেমনি মড়ক, দুর্যোগেরও লৌকিক দেবী আছেন। এঁদের তুষ্টিসাধনের জন্য যেমন পশুবলি দিয়ে রোগ সংক্রমণ রোধ করা হয়, তেমনি দেবরাজ ইন্দ্রের সম্মতি নিয়ে মন্দিরের গায়ে মিথুনলীলার নানা ভঙ্গির চিত্রাবলীও আঁকা হয়। এদেশের মানুষ যেমন বটগাছ পুজো করে, তেমনি পুজো পায় গোজাতি, সাপ, বানর ইত্যাদি। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ ছাড়াও আরও ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ এদেশে আছে। আছে, জরথুস্ত্রপন্থী পারসীক যারা অগ্নি উপাসনা করেন। আর আছেন হিন্দুর শাখা ধর্মাবলম্বী জৈন, যাঁরা জীব বধ অধর্মীয় জ্ঞান করেন এবং পাছে নিশ্বাস প্রশ্বাসের সংগে কীট পতংগের জীবননাশ হয়, তাই মুখে কাপড় বেঁধে রাখেন। এঁরা মাছ-মাংস ভক্ষণ করেন না এবং প্রায় সবকিছুর মধ্যেই প্রাণের অস্তিত্বে বিশ্বাসী।

এখানে যেমন বিশ্বের কিছু সেরা ধনী আছে তেমনি আছে অস্তিত্ব রক্ষাকারী এমন কিছু প্রান্তিক ক্ষেতচাষী, যাদের সংখ্যা বিপুল এবং যারা দারিদ্র্য সীমার প্রায় তলানিতে এসে পৌঁছেছে। অথচ এ দেশের মাটি কত উর্বর। কিন্ত এটাই বোধহয় ওদের ভবিতব্য নইলে এমন সোনা ফলানো ভূমি পেয়েও মানুষগুলো এমন হাঘরে গরিব কেন? এখানকার মোট জনসংখ্যার শতকরা তিরাশি জনই নিরক্ষর। এখানকার একজন মানুষের দৈনিক আয় আট আনার মতন এবং এর দুটো বড় শহরের ফুটপাতে শহরের সিকি ভাগ মানুষ ঘর-সংসার বিয়ে সাদি ও যাবতীয় নিত্যকর্মাদি পরম নির্বিঘ্নে সমাধা করছে। এখানে বছরে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১১৪ সেন্টিমিটার হলেও আকাশ থেকে বর্ষণের কোন ছিরিছাঁদ নেই। কোথাও যখন তখন অঝোরে জল ঝরছে আকাশ থেকে, বৃষ্টির জলে ধুয়ে যাচ্ছে মাটি এবং

www.pathagar.com

অপ্রয়োজনীয় সেই জলধারা প্লাবন হয়ে সমুদ্রে মিশছে। আবার কোথাও সারা বছরে এক ফোঁটাও বৃষ্টিপাত হচ্ছে না। আয়তনে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির সমতুল এক বিরাট, প্রায় তিন লক্ষাধিক বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলে যখন কোন বৃষ্টিপাতই হয় না, তখন অন্য এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অফুরন্ত বৃষ্টিপাতে ধুয়ে যাচ্ছে মাটি এবং এর নোনা স্তর (সল্ট টেব্‌ল্‌) ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে উঠে চাষ-আবাদের ক্ষতি করছে। বিড়লা, টাটা বা ডালমীয়া নামে যে তিনজন প্রধান শিল্পপতি পরিবার এদেশে আছে তাদের বিশ্বজোড়া খ্যাতি হলেও এখানকার অর্থনীতির প্রধানত সামন্ততান্ত্রিক। ফলে কিছু ধনপতি মহাজন ও রাজা, জমিদার ছাড়া এই অর্থনীতির সুফলটুকু আর কেউ পায় না।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসক এদেশে শিল্পোন্নয়নের কোন চেষ্টাই করে নি। তখন রপ্তানি পণ্য বলতে বোঝাত কাঁচা পাট, চা-পাতা, তুলা আর তামাক। বেশির-ভাগ যন্ত্রপাতিই তখন শিল্পোন্নত পশ্চিমের দেশগুলো থেকে আমদানি করতে হ'ত। তখন এ দেশের বিদ্যুৎ ব্যবহারের হার হাস্যকর রকমের কম ছিল। মার্কিন দেশের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার শতকরা আধভাগও ছিল না এই হার। সারা বিশ্বের আকরিক লোহার দশভাগের একভাগ এখানকার মাটিতে থাকলেও, বছরে ইস্পাত তৈরির পরিমাণ ছিল মাত্র দশলক্ষ টন। ভারতের তটরেখার (কোস্ট লাইন) সীমানা তিন হাজার আটশ মাইল বিস্তৃত হলেও এখানকার মৎস্য শিল্প এমনই আদ্যিকালের যে, সারা বছরে দেশের মানুষের পাতে আধ সের মাছও পড়তো না তখন।

মোটকথা, সেদিন এই গণপরিষদের সভ্যদের সামনে সমস্যাগুলো এমন একটা ভীতিকর চেহারা নিয়ে উপস্থিত হ'ল যে, তাদের হয়ত একসময় মনে হতে লাগলো যে বিদায়ী শাসক কলোনাইজারদের কাছ থেকে এই উৎকট দায়টুকু ছাড়া আর কোন অধিকারই তারা পায় নি। বস্তুত, অবস্থাটা সেইরকম মনে হলেও তাদের মনে এর তেমন বিষন্ন ছাপ পড়তে দেখা গেল না। বরং বিদায়ী শাসকদের সম্পর্কে সবাই বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগলো। অনেকে আবার অতি সরল বিশ্বাসে এমনও ভেবে বসলো যে ওরা বিদায় নিলেই সংকটগুলো যেন আপনা আপনিই সহজ হয়ে যাবে।

বলাবাহুল্য, যে মানুষটির কাঁধে এই সমস্যার জোয়াল চেপেছে সেই জওহরলাল নেহরু তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন এই ঐতিহাসিক সমাবেশে তাঁর বক্তব্য শোনাবার জন্য। কিন্তু কি বলবেন তিনি? খানিক আগেই লাহোর থেকে টেলিফোনে দাংগার খবর পেয়েছেন। সেই থেকেই দারুণ উৎকণ্ঠায় সময় কাটাচ্ছেন জওহরলাল। আজকের সমাবেশের উপযুক্ত ভাষণটাও লিখে ফেলতে পারেন নি তিনি। সুতরাং তাৎক্ষণিক ভাষণই দিতে হবে তাঁকে। তবে সেদিন যা তিনি বললেন, সেটি ছিল তাঁর হৃদয়ের কথা।

নেহরু বললেন, 'অনেক বছর আগে ভাগ্যের সংগে বোঝাপড়ার একটা সপথ নিয়েছিলাম আমরা। আজ সময় হয়েছে সেই শপথটা পালন করার। হয়ত হুবহু পালন হবে না। তবে তাৎপর্যমণ্ডিত হবে আমাদের এই চেষ্টা। যখন মধ্যরাতের ঘণ্টা বাজবে, ঘুমিয়ে থাকবে সারা পৃথিবী, তখন আমরা জেগে উঠবো। ফিরে পাবো আমাদের মুমূর্ষু জীবন। দেশ স্বাধীন হবে।' এইটুকু বলে থামলেন জওহরলাল। তারপর শুরু হলো উচ্ছ্বসিত বাক্যচ্ছটার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। কিন্তু তবুও জওহরলালের কাছে সেদিনের এই মহান মুহূর্তটা সর্বাংগীণ সফল

www.pathagar.com

হয় নি। পরবর্তীকালে ভগিনী বিজয়লক্ষ্মীর কাছে খেদ করে সে কথা বলেছিলেন জওহরলাল। তিনি বলেছিলেন, 'আবেগের বশে সেদিন কত কথাই বলেছিলুম। সে সব আমার মনেও নেই। তবে মনে আছে যে কতকগুলো অসার বাক্য জল-স্রোতের মতন আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু আমার মনটা পড়েছিল আগুন লাগা সেই লাহোর শহরে।'

নেহরু তখন বলে চলেছেন, 'কোন জাতির জীবনে এমন একটা মুহূর্ত ক্বচিৎ আসে যখন আমরা পুরনো থেকে নতুনের দিকে পা ফেলি ; যখন একটা যুগের শেষ হয় এবং একটা জাতির হৃদয়মন দীর্ঘদিনের পীড়ন থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। ইতিহাসের শুরু থেকেই নিরবচ্ছিন্নভাবে শতাব্দীর পথ মাড়িয়ে ভারত খুঁজে চলেছে তার লক্ষ্য। এই পথ চলায় কখনও সাফল্য এসেছে, তখন ঝলমল করেছে তার পথ। আবার কখনও ব্যর্থতার গ্লানিতে ম্লান হয়েছে তার পথ। তবে ভাল-মন্দ যাই-ই ঘটুক ভারত কখনও পথভ্রষ্ট হয় নি। কখনও বিস্মৃত হয় নি তার লক্ষ্য। ভাল-মন্দ সঙ্গে নিয়েই আদর্শের দিকে ছুটে চলেছে সে। আজ, এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে শেষ হয়ে গেল আমাদের এই দুর্ভাগ্য এবং ভারত আবার নিজেকে আবিষ্কার করলো যেন।' একটু থেমে নেহরু শেষ করলেন তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণ। তিনি বললেন, 'আজ আর ক্ষুদ্র স্বার্থদ্বন্দ্ব কিংবা সংকীর্ণ সমালোচনা নয়। নয় পরস্পরের প্রতি দোষারোপ। এখন স্বাধীন ভারতকে এমন এক মহান ভবনে পরিণত করতে হবে যেখানে সবাই, দেশের সব মানুষ, নিশ্চিন্ত আশ্রয় পায়।'

নেহরু প্রস্তাব করলেন যে মধ্যরাত্রির ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সবাই যেন উঠে দাঁড়ান এবং ভারত ও ভারতবাসীদের সেবার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হন। পরিষদ ভবনের বাইরে কয়েক হাজার মানুষ উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তখন। সারা আকাশ জুড়ে থমথম করছে মেঘ। নেহরুর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আকাশের বুক চিরে বিদ্যুতের ঝলকানি দেখা গেল। শোনা গেল গুরুগুরু মেঘের ডাক। গম্ভীর সেই ডাক যেন তরঙ্গ বিক্ষোভের মতন গড়িয়ে এল আকাশের গা বেয়ে। খানিক পরেই শুরু হ'ল ঝমঝম বৃষ্টি। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েক হাজার সেবাদল একহাতে সাইকেল ধরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ভিজছে। তাদের খদ্দরের জামাধুতি আর মাথার টুপি জলে ভিজে সপসপ করছে। ওদের সব উচ্ছ্বাস আজ স্থির হয়ে গেছে। ওরা শুধু অপেক্ষা করছে কখন সেই রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তটির আগমন হবে যখন জন্ম নেবে একটা নতুন জাতি।

গণপরিষদ ভবনের স্পীকারের আসনের ঠিক মাথার ওপরেই টিকটিক করে চলছে একটা বড় দেওয়াল ঘড়ি। ঘড়ির ছোট কাঁটাটা পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে রোমান হরফে লেখা XII সংখ্যার দিকে। সবাই মাথা নীচু করে পাষাণমূর্তির মতন স্থির হয়ে বসে আছেন যে যাঁর আসনে। দেখে মনে হচ্ছে সবাই যেন ধ্যান-মগ্ন। একসময় ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠলো দেওয়াল ঘড়িতে। ঘোষিত হ'ল ১৪ আগস্টের মধ্যরাত। বিদায় হ'ল একটা দিন। একটা যুগও যেন শেষ বিদায় নিয়ে চলে গেল। ঘড়িতে বারোটা বাজার ঘণ্টার শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতেই সারা হল্ ঘরখানা গমগম করে উঠলো শঙ্খধ্বনিতে। একটানা সেই ধ্বনি বাতাসে প্রতি-ধ্বনির ঢেউ তুলে আছড়ে পড়লো চারপাশের দেওয়ালে। অনন্তকাল ধরে এই শঙ্খধ্বনিই ভারতের আকাশ বাতাস মথিত করে ধেয়ে এসেছে শতাব্দী প্রাচীন পথ

www.pathagar.com

মাড়িয়ে নতুনের আবাহন নিয়ে। আজও এর ব্যতিক্রম হ'ল না। পরিষদ ভবনের সারি সারি আসনে উপবিষ্ট রাজনীতিকদের কাছে এই শঙ্খধ্বনি যেন এক নতুন জাতির জন্মলগ্ন, আর সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে এই ধ্বনি যেন এক যুগাবসানের সংকেত।

যথার্থই শেষ হ'ল একটা যুগ, যার শুরু হয়েছিল ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে এক উষ্ণ গ্রীষ্মদিবসে। স্পেন দেশের একটা অখ্যাত বন্দর থেকে একখানা অর্ণবপোত নিয়ে ক্রিস্টোফার কলম্বাস যেদিন নীল সমুদ্র পাড়ি দেন, সেদিন তিনি ভারত খুঁজতে গিয়ে ভুল করে আমেরিকা খুঁজে পান। সেই আবিষ্কার থেকেই শুরু হয় সাম্রাজ্যবাদী অভিযান। পরবর্তী ৪৫০ বছর ধরে একটানা চলেছে এই সাম্রাজ্যবাদী শোষণ সারা বিশ্বজুড়ে। শুধু অর্থনৈতিক কাঠামো নয়, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং দৈহিক শোষণের নাগপাশ বন্দী হয়েছে অসংখ্য অশ্বেতকায় এবং অনগ্রসর জাতি-পুঞ্জ। গোলাকার বিশ্ব পরিবেষ্টন করে থাকা এই অশ্বেতকায় জাতিপুঞ্জের তালিকায় কোন অনগ্রসর জাতিই বাদ পড়ে নি। এ্যাজটেক, সোয়াহিলি, মিশরী, ইরাকী, হটেনটট, অ্যালজীরিয়, বর্মী, সিংহলী ফিলিপিনো, মরক্কোবাসী, ভিয়েতনামী ইত্যাদি। এরা সবাই অশ্বেতকায় অখ্রীশ্চান এবং এদের কেন্দ্রস্থলে স্বমহিমায় বিরাজ করছে শ্বেতকায় খ্রীশ্চানরা। সাড়ে চারশ' বছর ধরে একটানা চলেছে এই শ্বেতকায় শোষণের ধারা। এর জয়টিকা কপালে এঁকে কোন জাতি স্বাতন্ত্র্য খুইয়েছে, কেউ অর্থনৈতিক ভাবে দরিদ্র হয়েছে, কেউ ধর্মান্তরিত হয়ে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে, কেউ বা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে গিয়ে নিঃশেষ হয়েছে। মোটকথা আর্থ-সামাজিক একটা দারুণ বদল এসেছে এই সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ফলে সারা বিশ্বের অশ্বেতকায় ও অখ্রীশ্চান জাতিপুঞ্জের মধ্যে।

এমনি এক ক্ষুধাপীড়িত ও অনাহারক্লিষ্ট জাতি এখন স্বাধীনতার দাবি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে সাম্রাজ্যবাদের এক দুর্ধর্ষ স্থপতির দোরগোড়ায়, যার সাম্রাজ্যের পরিধি সম্পদে ও গরিমায় রোম, কার্থেজ, ব্যাবিলন ও গ্রীসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 'ক্রাউন জুয়েলটি' হাত বদল হবে এবার। আর কোন সাম্রাজ্যই বেশিদিন টিকে থাকতে পারে নি এরপর। মিষ্টি কথায় বা বাহুবল প্রয়োগ করেও তেমন চেষ্টা নিষ্ফল হবে। কারণ কোন শাসকই ইতিহাসের অপ্রতিরোধ্য গতি ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। তাই যা অনিবার্য তাই-ই ভবিতব্য বলে মেনে নেওয়া সংগত। ভারতের স্বাধীনতা মানুষের সেই অভিজ্ঞতারই জয়জয়কার। একটা অধ্যায়ের ওপর দাঁড়ি টেনে দেওয়া হ'ল এই ঘটনা দিয়ে। গণপরিষদ ভবনের সেই দুর্যোগপূর্ণ মধ্যরাতের কম্বুধ্বনি, যেন যুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বের ইতিহাসে একটা নতুন যুগের শুরুয়াত ঘোষণা করলো।

ততক্ষণে বৃষ্টি থেমেছে। গণপরিষদ ভবনের বাইরে অপেক্ষারত জনতার মধ্যে একটা দারুণ খুশী ছড়িয়ে পড়েছে। পরিষদ ভবন থেকে সপারিষদ নেহরু বেরিয়ে এলেন। তাঁকে দেখেই উল্লসিত জনতা প্রবল আবেগে যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো। মুহূর্তের মধ্যে নেহরু এবং অন্যদের ঘিরে ধরলো তারা। একটা চেষ্টা হ'ল বটে প্রতিরোধের। কিন্তু পুলিসের বেষ্টনী এতই ক্ষীণ যে আবেগের সেই বন্যা ঠেকানো গেল না। তবুও নেহরু একটুও ক্ষুব্ধ হলেন না। তখন তাঁর সারা মুখখানা জুড়ে ঝলমল করছে খুশীর হাসি। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন সহচরের দিকে চেয়ে বললেন, 'তুমি হয়ত জান না, আজ থেকে দশ বছর আগে লর্ড

www.pathagar.com

লিন্‌লিথ্‌গোর সঙ্গে লণ্ডনে প্রায় ঝগড়াই হয়ে গিয়েছিল আমার। তখন তিনিই ভাইসরয়।' নেহরু চুপ করলেন। যেন পূর্ব স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে চাইছেন তিনি। সহচরটি অবাক হয়ে চেয়ে আছে নেহরুর দিকে। নেহরু বললেন, 'সেদিন প্রায় পাগলের মতন চিৎকার করে ওঁর সঙ্গে তর্ক করি। ওঁকে বলেছিলুম যে আগামী দশবছরের মধ্যে স্বাধীনতা আনতে না, পারলে লোকে ছিছি করবে।' সব শুনে লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো কি বলেছিলেন জানো? একমুখ হেসে নেহরু বললেন, ভদ্রলোক আমায় সেদিন বল্লেন "মিস্টার নেহরু, আমার জীবদ্দশায় ত নয়ই, মনে হয় আপনার জীবিতকালেও ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে না!'"

* * *

কিন্তু স্বাধীন হ'ল ভারতবর্ষ এবং ব্রিটিশরাজ নামক সম্ভ্রান্ত মহান অথচ পাপাচারী প্রতিষ্ঠানটি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো শেষমেশ। দিল্লির সংবিধান পরিষদ ভবনের বাইরে নবজাত দুটি রাষ্ট্রের সূচনা করলো যে কম্বুধ্বনি, লক্ষ লক্ষ উৎফুল্ল মানুষের হর্ষধ্বনিতেই তার জয়গৌরব যেন ঘোষিত হল। শুধু এই-টুকুই নয়। ছোট ছোট আরও নানা ঘটনার মধ্যেও বোঝা গেল যে বদল এসে গেছে। বম্বের অভিজাত 'ইয়াট' ক্লাবের গেটের গায়ে 'ক্লোজড্' লেখা একটা বোর্ড টাঙিয়ে দিল একজন সাধারণ পাহারাওলা পুলিস। এতদিন এই ক্লাবটাই ছিল সাদা চামড়ার সাহেব-মেমদের ঘোঁট গুলতানির নিরাপদ দুর্গ। তিনপুরুষ ধরে পাক্কাসাহেব আর মেমসাহেবরা নেটিভদের দৃষ্টির আড়ালে বসে হুইস্কির গেলাসে চুমুক দিয়েছে এতদিন। এখন থেকে শ্বেতকায় অভিজাত্যের সেই ধারাটি বদলে গেল। বম্বের অভিজাত 'ইয়াট' ক্লাব হয়ে গেল ভারতীয় নৌবাহিনীর ক্যাডেটদের মেস।

বদলের চিহ্ন ফুটে উঠলো অন্য শহরেও। কলকাতার ক্লাইভ স্ট্রীটের নাম পালটে হ'ল নেতাজী সুভাষ রোড। ঘড়িতে রাত বারটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সিমলার ম্যাল এলাকায় দলে দলে ভারতীয়রা দিশি পোশাক পরে অবাধে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কলকাতার ফিরপো, লাহোরের ফ্যালেটি এবং বম্বের তাজ হোটেলের রেস্তোঁরা ও নাচঘরে শ'য়ে শ'য়ে মানুষ দিশি পোশাক পরে খানাপিনা শুরু করে দিল।*

দিল্লি সাজলো আলোর মালায়। নিউদিল্লির কনট্ সার্কাস আর পুরনো দিল্লির অলিগলিতেও রঙিন বাল্ব দিয়ে সাজানো হ'ল। ঝলমল করে উঠলো রাজধানী শহরের মন্দির, মসজিদ আর গুরুদ্বারভবনগুলো। লালকেল্লার সারা পাঁচিল জুড়ে আলো দেওয়া হল। নতুন তৈরি হওয়া বিড়লা মন্দিরের বর্তুলাকার গম্বুজের গায়ে আলোর ঝলমলানি দেখে পুলকিত যাত্রীদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। অনেকের বিভ্রম হ'ল। যেন আলোকদীপ্ত লুড্উইগ প্রাসাদের কথা মনে পড়লো তাদের। দিল্লির ধাঙড় কলোনিও বঞ্চিত রইল না। তাদের অন্ধকার জীবনেও আলোর রোশনাই দেখা গেল। দিল্লির মহানুভব মিউনিসিপ্যালিটি বদান্যতায় ছোট ছোট তেলের কুপি আর মোমবাতি উপহার পেল হরিজন ধাঙড়রা। ক্ষীণ ভীরু মোমবাতির আলোয় তাদের ঘরের চাপচাপ অন্ধকার সরে গিয়ে আলোর

---

* সংবিধান পরিষদের একজন সভ্য দাবি করে বসলেন যে, ভারতীয় সংবিধানে এমন একটি ধারা অন্তর্ভুক্ত হ'ক যার ফলে কোন প্রকাশ্য ভোজনালয়ে 'ডিনার জ্যাকেট' পোশাকটি পাকাপাকিভাবে পরিত্যক্ত হয়।

www.pathagar.com

আভাস এনে দিল নবলব্ধ স্বাধীনতা। তখন দিল্লির রাজপথ মাড়িয়ে চলেছে সাইকেল, টঙ্গা আর হাতির মিছিল। থইথই করছে মানুষ। তারা নাচছে, গাইছে, খুশীর হুল্লোড় তুলে অভিনন্দন জানাচ্ছে নিজেদের। কনট্ সার্কাসের কাফে, রেস্তোঁরাগুলোয় উপচে পড়েছে ভিড়। এমনকি কুখ্যাত আমলাবাহিনীও ফুটপাতে নেমে নিজেদের সামিল করেছে এই আনন্দোৎসবে।

একদা শাসকদের আড্ডাস্থল ইম্পিরিয়্যাল হোটেলের পানশালাটিও বিখ্যাত ভারতীয়দের ভিড়ে গমগম করছে তখন। ঘড়িতে বারটা বাজার সংগে সংগেই হাতে পানপাত্র নিয়ে সবাইকে গলা মিলিয়ে জাতীয় সংগীত গাইতে বললো একজন। সবাই সায় দিল প্রস্তাবে। কিন্তু গানের কথাগুলো ত তাদের জানা নেই! শুধু জানা আছে জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতার নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পুরনো দিল্লির ময়দানের এক হোটেলে একটি সুন্দরী যুবতীকে হাতে লিপস্টিকের টিউব নিয়ে সকলের কপালে ফোঁটা কাটতে দেখা গেল। দেখা গেল কর্তার সিং দুগল্ নামে একজন শিখ সাংবাদিক যুবককে আয়েশা নামে একজন মুসলমানী যুবতীকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে। কনট্ সার্কাসের বাগানের গাছগাছালির আড়ালে অনুষ্ঠিত হ'ল এই ব্যক্তিগত প্রেমোপাখ্যান। কিন্তু ভারী অশুভ মুহূর্তে সূচনা হ'ল ওদের এই প্রেমোপাখ্যান। কারণ ওরা জানতো না যে আর কিছুক্ষণের মধ্যে সারা উত্তর ভারত জুড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়বে এবং শিখ যুবক ও মুসলমানী যুবতীর এই প্রেমোপাখ্যান জর্জরিত হবে সেই মন্থনবিষে।

ইতিমধ্যে রাজধানীর অনেক জায়গাতেই ছড়িয়ে পড়েছে এই মন্থনবিষ। প্রতিবেশী পুরনো দিল্লির অলিগলিতে শুরু হয়ে গেছে ফিসফাস গুঞ্জন। মুসলিম লীগের গোঁড়া সমর্থকরা কানাকানি করে শুনিয়ে যাচ্ছে নতুন একটা স্লোগান, 'লড়কে লিয়া পাকিস্তান, জুলুম সে লেগা হিন্দুস্তান।' পুরনো দিল্লির এক মসজিদের ইমাম তার অনুগতদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে দিল্লি ত্যদেরই অধিকারভুক্ত। কয়েকশ' বছর ধরেই এখানে তারা প্রতিষ্ঠিত আছে। সুতরাং আল্লার আদেশেই সেই অধিকারটি তারা ফিরে পাবে। অবশ্য পাঞ্জাব থেকে পালিয়ে আসা কয়েক হাজার হিন্দু ও শিখ শরণার্থী ইতিমধ্যে হুমকি দিয়েছে যে দিল্লির আশপাশের মুসলমান বহ্নুৎসব করে তারা স্বাধীনতা পালন করবে।

এই দুর্লক্ষণটি আঁচ করতে পেরেছিলেন মাত্র একজনই। তিনি ভি. পি. মেনন। একদিন এই মানুষটির দূরদর্শিতার জন্যই বেশ ক'টি স্টেট ভারতের সংগে জোটবন্ধ হতে পেরেছিল। মোটকথা, ভি.পি. মেনন পূর্বাহ্ণেই বুঝেছিলেন যে বিপদ আসন্ন। তাই মধ্যরাতের শাঁখের আওয়াজ যখন দিল্লির আকাশে ছড়িয়ে গেল, তখন তাঁর নিভৃত ঘরে বসে মেনন এতটুকুও বিচলিত হলেন না। তাঁর কিশোরী মেয়েটি আনন্দে লাফালাফি করলেও মেনন স্থির হয়ে বসে রইলেন। তাঁর তখন মনে হচ্ছিল যে, এবার বুঝি শুরু হতে চলেছে দুঃস্বপ্নের রাত।

অবশ্য একজন মানুষের কাছে ব্যাপারটা দুঃস্বপ্ন মনে হলেও সারা দেশ তখন মেতে উঠেছে উৎসবের খুশীতে। ১৪ আগস্টের মধ্যরাত যেন এই উপ-মহাদেশে এক উৎসব রাতের সূচনা করলো। উৎসব চলবে ২৪ ঘণ্টা ধরে। খাইবার গিরি-পথের ল্যান্ডি কোটাল দুর্গে আয়োজন হয়েছে ঢালাও ভূরিভোজের। এক ডজন চুল্লিতে সেদ্ধ হচ্ছে গোটা গোটা খাসি। এই ভূরিভোজের উৎসবে আত্মপর ভেদ

www.pathagar.com

নেই। চিরশত্রু পাঠান উপজাতিদের সঙ্গে নিয়েই খাইবার রাইফেল্‌স্‌ বাহিনী এই আনন্দোৎসব করছে। ভোজসভার সম্মানিত অতিথি ক্যাপ্টেন কেনেথ ডাস্সের পাতে সবচেয়ে উপাদেয় পদটিই (piece de resistance) পরিবেশিত হ'ল। মাঝরাতে খানাপিনা শেষ হবার পর উত্তেজিত পাঠান উপজাতিরা হাতে রাইফেল নিয়ে চীৎকার করে বলে উঠল, 'খাইবার আমাদের, খাইবার আমাদের।'

শুধু পাহাড় উপত্যকা নয়, সমতলভূমিতেও একই রকম উৎসবায়োজন চললো মাঝরাত থেকে। কানপুর, লক্ষ্ণৌ, আমেদাবাদ, মাদ্রাজ, বাঙালোর, পাটনা, বম্বে, কলকাতা—কোন বড় শহরেই এই উৎসবায়োজনের ত্রুটি হ'ল না। মিউটিনির শহর কানপুরের রাস্তায় রাস্তায় তখন প্রীতির ছড়াছড়ি। সকলের চোখের সামনেই ইংরেজ আর ভারতীয়রা আবেগে জড়িয়ে ধরছে পরস্পরকে। কে বলবে যে মিউটিনির সময় এই শহরটাই মেতে উঠেছিল রক্তাক্ত প্রতিহিংসায়। আমেদাবাদ শহরের সেই ইস্কুল মাস্টারটি, যিনি ১৯৪২ সালে জাতীয় পতাকা তোলার অপরাধে বন্দী হয়েছিলেন, তিনিই এসে টাউনহলে জাতীয় পতাকা তুললেন। লক্ষ্ণৌ শহরে রেসিডেন্সির মাথায় জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হ'ল বেশ ঘটা করে। ছাপানো নেমন্তন্ন পত্র বিলি হ'ল। সবাইকে অনুরোধ করা হ'ল যেন জাতীয় পোশাক পরে অনুষ্ঠানে যোগ দেন। জাতীয় পোশাক অর্থে ধুতি। এমন অনুষ্ঠানে সেটাই উপযুক্ত! কিন্তু কিছু নিমন্ত্রিত ক্ষুণ্ণও হলেন। যেমন প্রবীণ আই.সি.এস রাজেশ্বর দয়াল। তাঁর একখানাও ধুতি নেই। ইংরেজের আমলে সাদা টাই পরেই এ সব অনুষ্ঠানে এসেছেন। তাঁর মনে হ'ল যে তখনকার সেই সব অনুষ্ঠানগুলো খুবই কৃত্রিম হ'ত। প্রাণের ছোঁয়া থাকতো না সেই সব অনুষ্ঠানে। তাই মধ্যরাতে রেসিডেন্সির মাথায় যখন ভারতের জাতীয় পতাকা উড্ডীন হ'ল তখন একটা অদ্ভুত চিন্তার উদয় হ'ল দয়ালের মনে। তাঁর মনে হ'ল একটা দেশ শুধু শাসনই করে গেছে ইংরেজ। আপন করে নি। তাই ইংরেজ আমলে তাঁর চোদ্দ বছরের চাকরি জীবনে অনেক ইংরেজ সহকর্মী পেয়েছেন তিনি, কিন্তু একজনও বন্ধু পান নি।

শুধু বড় বড় শহরেই নয়, মধ্যরাতের এই উৎসব ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামের মধ্যেও। মন্দিরে মন্দিরে পুজো হচ্ছে। নতুন রাষ্ট্রের মঙ্গল কামনা করে পুজো দিচ্ছে দেশের মানুষ। কাশীর একজন মিষ্টান্ন বিক্রেতার হাতে তৈরি হয়েছে তিন রঙের একটা অভিনব স্বাধীনতা-সন্দেশ। বলাবাহুল্য খুব বিক্রি হচ্ছে সেই সন্দেশটা।

তবে বন্দর শহর বোম্বাইয়ের উচ্ছ্বাসটাই দেখবার মতন। একদা যে শহরের রাজপথগুলো ঔপনিবেশিক শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে উঠতো, লাঠিও গুলির নির্বিচার ব্যবহারে একদা যার সরণীগুলোয় রক্ত ঝরে পড়তো, প্রতিবাদী মানুষের ধর্মঘট আর হরতালের স্লোগানে গমগম করতো যার পথঘাট, সেইসব পথঘাট আর রাজপথ, সরণী যেন একাকার হয়ে গেছে উচ্ছ্বসিত মানুষের কলরবে। মেরীন ড্রাইভের প্রাসাদভবন থেকে শুরু করে প্যারেলের বস্তিঘর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে খুশীর হাওয়া। সারা শহর মেতে উঠেছে এই উচ্ছ্বাসে। আলোর বন্যায় ছেয়ে গেছে শহর। মনেই হয় না যে এখন মধ্যরাত। এ যেন বেলা দুপুর। দেওয়ালি, ঈদ, আর নববর্ষের উৎসব মিলিয়েই যেন স্বাধীনতা উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেখানে।

অবশ্য এমন পরিপূর্ণ আনন্দোচ্ছ্বাস সারা দেশের সর্বত্রই দেখা গেল না। ব্যতিক্রম দেখা গেল রাজন্যদের দেওয়া ভোজসভাগুলোয়। নেটিভ স্টেটের রাজা-

www.pathagar.com

মহারাজাদের আয়োজিত ভোজসভাগুলো আয়জনে পরিপূর্ণ হলেও কেমন যেন মিয়ানো। যেন মুখরক্ষার জন্যই এতসব আয়োজন। অতঃপর রাজারাজড়াদের দিনবদল যে আসন্ন, তাঁদের স্বাধিকার যে শেষ হতে চলেছে, সেই বাস্তব সত্যটুকু কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না তাঁরা। তাই ১৫ আগস্ট এঁদের কাছে শোকপালনের দিন। আনন্দের দিন নয়, কারণ ওই দিনটি থেকেই এঁদের যাবতীয় রাজগৌরব অপহৃত হবে। তাই আলো-ঝলমল ব্যাংকোয়েট হলে হায়দ্রাবাদের স্বভাব কৃপণ নিজাম বাহাদুর যখন ঢলঢলে স্যুট পরে বিদায়ী সাহেব প্রশাসকদের সম্মানে আয়োজিত ভোজসভায় উপস্থিত হলেন, তখন তাঁকে খুবই বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। সুবেশ সুন্দরীদের উপস্থিতি সত্ত্বেও সেই মধ্যরাতের ফেয়ারওয়েল ডিনারে কোন স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ছিল না। তারপর ডিনার শেষের পর নিজাম বাহাদুর যখন পানপাত্র হাতে নিয়ে ইংল্যান্ডেশ্বরের স্বাস্থ্যকামনা করলেন, তখন মানুষটার বিষণ্ণ মুখখানা দেখে ভারী বেদনাবোধ করলেন জন পেটন্ নামে একজন ইংরেজ সাংবাদিক। তাঁর মনে হ'ল, দুশ' বছরের এই ধারাবাহিক রাজগরিমার এ কি করুণ পরিণতি! কলমের এক আঁচড়ে যেন শেষ হয়ে গেল এই ইতিহাস।

অনেক ভারতীয়ের মনেই সেই রাতটা যেন এক আতঙ্কের রাত হয়ে উঠেছিল। যেমন হয়েছিল লেঃ কর্নেল সাতারাওয়ালার মনে। ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রাইফেল্স্-এর এই পারসী সেনাধ্যক্ষ সেদিন যে বীভৎস দৃশ্যটা দেখলেন সেটি তাঁর যুদ্ধের তাণ্ডব দেখা অভ্যস্ত চোখকেও অপ্রস্তুত করে দেয়। তাঁর চোখের সামনেই একটা পুরো হিন্দু পরিবারের সবাইকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়। এই অমানুষিক কাণ্ডটা ঘটে বালুচিস্তানের কোয়েটা শহরে। শুধু তাই নয়, যে সজ্জন মুসলমান পরিবারটি এই হিন্দু পরিবারটিকে আশ্রয় দিয়েছিল, তাদেরও সবাইকে এইরকম বন্যভাবে হত্যা করা হয়েছিল। ১৪ আগস্টের মধ্যরাতটা যেন একইরকম আরও অনেক নৃশংস ঘটনায় বোঝাই। সুশীলা নায়ারের অভিজ্ঞতার কথাই ধরা যাক। এই সুশ্রী যুবতী মহিলা ডাক্তারটিকে পশ্চিম পাঞ্জাবের এক বাস্তুহারা শিবিরের দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন গান্ধীজী। এই সংক্ষিপ্ত জীবনকালের মধ্যে দু বছরের হাজতবাসও করতে হয়েছে সুশীলাকে। তবুও স্বাধীনতা সংগ্রামী এই মহিলাটির কাছে ১৪ আগস্টের মধ্যরাত কোন আলাদা অনুভূতি তৈরি করলো না। যেমন আনন্দ হ'ল না তেমনি স্বাধীনতা পাবার উত্তেজনায় মনটা ভরেও উঠলো না তাঁর। সবাই যখন আত্মহারা তখন তাঁর মনটি ব্যাকুল হয়ে রইল বাস্তুহারা শিবিরের প্রতিটি হিন্দু অধিবাসীর দুঃসহ অসহায়তার কথা ভেবে। কারণ হতভাগ্য মানুষগুলোর প্রতিটি মুহূর্তই কাটছিল এক মর্মান্তিক প্রতীক্ষায়, এই বুঝি দুষ্কৃতকারীরা তাদের ওপর নিষ্ঠুরের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ে।

লাহোর শহরটা তখন ত লুঠ দাঙ্গার শহর হয়ে গেছে। সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে নরপিশাচের দল। ক্যাপ্টেন এ্যাটকীনস্ যখন গোর্খাবাহিনী নিয়ে শহরে ঢুকলেন তখন সবে সূর্য অস্ত গেছে। সেই আধোআলোয় সেনাছাউনিতে এসে এ্যাট্কীনস্ অবাক। সারা ছাউনি ঘিরে রেখেছে অসংখ্য অসহায় হিন্দু নারী-পুরুষ। এরা সবাই উদ্বাস্তু। ঘরদোর ছাড়া হয়ে ছাউনির মধ্যে নিরাপদ আশ্রয় চাইছে ওরা। মেয়েদের কারো কোলে বাচ্চা, কেউ মাথায় নিয়েছে জামাকাপড়ের পোঁটলা। এরা সবাই আশ্রয় চাইতে এসেছে এ্যাটকীনসের কাছে। শহরের পুরনো

www.pathagar.com

মহল্লার সেই পাঁচিল ঘেরা জায়গাটার মধ্যে আটক হয়ে আছে প্রায় লক্ষাধিক শিখ ও হিন্দু পরিবার। মুসলমান গুণ্ডারা ওদের কলের জলের পাইপ কেটে দিয়েছে। আশপাশের ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। প্রতিটি গলির মুখে শিকারী কুকুরের মতন ওত্ পেতে বসে আছে গুণ্ডাবদমাসের দল। কাউকে বেরোতে দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার ওপর। শহরের সবচেয়ে বড় শিখ গুরুদ্বারটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। আর গুরুদ্বারের মধ্যে আটকে পড়া শিখেদের আর্ত চিৎকার শুনে খলখল করে হাসছে এই নরপশুরা।

কিন্তু কলকাতা শহরের এ কি আশ্চর্য বদল? যে শহরটা খুন-দাঙ্গায় ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারতো তার এমন পরিবর্তন দেখে সবাই হতভম্ব। বদলটা শুরু হয়েছিল খুব সতর্ক পায়ে। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত একটা শান্তি মিছিল শহর ঘুরে হায়দারী ভবনে এসে শেষ হ'ল। সকাল থেকেই শহরের আবহাওয়ায় সেই তপ্ত ভাবটা নেই। শিয়ালদা স্টেশনের পূর্বদিকের ঝোপজঙ্গলের মধ্যে হিন্দু মুসলমান গুণ্ডারা তাদের মারাত্মক ছুরি-ছোঁরা লুকিয়ে ফেলেছে ততক্ষণে। ওরা এখন ল্যাম্পপোস্টের গায়ে বা উঁচু বাড়ির বারান্দায় জাতীয় পতাকা টাঙাতে ব্যস্ত। হিন্দুদের জন্য যেমন মসজিদের দরজা খুলে দেবার আদেশ হয়েছে, তেমনি কালী মায়ের মন্দিরেও মুসলমানদের প্রবেশ আর কোন নিষেধ রইল না। চব্বিশ ঘণ্টা আগেও নিজেদের মধ্যে যারা কাটাকাটি করেছে, তারাই এখন পরস্পরের গলা জড়িয়ে ধরছে। মেয়েরা নিজেদের মধ্যে মিঠাই দেওয়া নেওয়া করছে। বাচ্চা নিয়ে আদর করছে। আশ্চর্য কাণ্ড! সবাই যেন ভুলে গেছে গতদিনের কথাটা। আজ তারা সবাই আপন। বাস্তবিক তাই। একজন বাঙালী লেখক ত বলেই বসলেন যে, 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট' উপন্যাসের ক্রিসমাস ইভের সেই ঘটনাটাই যেন হুবহু ফুটে উঠেছে কলকাতার বুকে। বড়দিনের আগের দিন রাত্রে ফরাসী আর জার্মান সোলজাররা তাদের শত্রুতা ভুলে যেমন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছিল, কলকাতাতেও অবিকল সেই ঘটনা ঘটলো ১৪ আগস্টের রাত্রে।

সারা দেশ যখন খুশীতে নাচানাচি করছে, তখন ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পুঁজিঘর ভাইসরয় হাউসের অভ্যন্তরে নিঃশব্দে একটা দারুণ বিপ্লব ঘটে যাচ্ছিল। অতবড় ভাইসরয় হাউসের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত বেয়ারা চাপরাসীদের মধ্যে তখন হুড়োহুড়ি ব্যস্ততা পড়ে গেছে। তারা তখন তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে কোথাও এমন কিছু সাম্রাজ্যবাদী প্রতীক চিহ্ন, কোন সীলমোহর বা অন্য কিছু, পড়ে আছে কিনা, যা দেখে স্বাধীন ভারতীয় নাগরিকদের চক্ষুশূল হয়। যা দেখে অপ্রতিকর সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কথা তাদের মনে পড়ে যায়। নির্দেশটা মাউন্টব্যাটেনের। রীতিমত কড়া হুকুমনামা, যেন স্বাধীনতা দিবসে অরুচিকর কোন স্মারকবস্তু কোথাও পড়ে না থাকে।

তাই সকাল থেকেই একদল ব্যস্তবাগীশ বেয়ারা চাপরাসী ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং দোষাবহ কিছু দেখলেই ছোঁ মেরে সরিয়ে নিচ্ছে। টেবিলে পড়ে থাকা 'ভাইসরয় হাউস' ছাপা লেটার প্যাড সরিয়ে সেখানে রাখা হচ্ছে 'গভর্নমেন্ট হাউস' ছাপানো স্টেশনারী। একদল চাপরাসী বেয়ারা দরবার হল-এর মাথায় টাঙানো বিশালকায় সাম্রাজ্যবাদী প্রতীক সীলটিকে ঢাকা দেবার ব্যবস্থা করছে। হুলস্থুল পড়ে গেছে যেন সর্বত্র। তবে ভাইসরয়ের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসের কোন বদল হ'ল না। তাঁর মনোগ্রাফ, তাঁর সিগার ব্যাণ্ড, দেশলাই, সাবানদানি

www.pathagar.com

ইত্যাদির মাথায় ক্রাউন প্রতীকটাই ছাপা থাকলো।

এদিকে যখন বদলের কাজ চলছে তখনই সংবিধান সভার প্রেসিডেণ্ট ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল লাটভবনে এসে পৌঁছলেন। এঁরা অনুরোধ করতে এসেছেন যেন প্রাক্তন ভাইসরয় ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেল পদটি গ্রহণ করেন। আনুষ্ঠানিক এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন অভিভূত মাউণ্টব্যাটেন। খানিক আগেই আর একটি সুসংবাদ পেয়েছেন তিনি। তাঁর সুকৃতির স্বীকৃতি দিয়েছেন সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ। তাঁকে অভিজাত 'পীয়ারেজ'-এর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে তিনি হলেন আর্ল মাউন্টব্যাটেন।

মাউন্টব্যাটেন রাজী হতেই তাঁর হাতে মুখবন্ধ একখানা খাম দিলেন জওহরলাল। খামের মধ্যে অনেকগুলি নামের একটা তালিকা আছে। গভর্নর-জেনারেলের অনুমোদন পেলে এঁদের নিয়েই গঠিত হবে স্বাধীন ভারতের প্রথম সরকার। খামটা নিয়ে একপাশে সরিয়ে রাখলেন মাউন্টব্যাটেন। তারপর ডীক্যানটার থেকে 'পোর্ট' পানীয় নিজের হাতে সবাইকে পরিবেশন করলেন। পানীয়ভরা গেলাসটি উঁচু করে এক চুমুক পান করে মাউন্টব্যাটেন বললেন, 'টু ইণ্ডিয়া।' নেহরুও এক চুমুক পান করে গেলাসটি উঁচু করে বললেন, 'টু কিং জর্জ সিকসথ্।'

সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান শেষ। সবাই তখন বিদায় নিয়েছেন। কিছুক্ষণ পরেই মধ্যরাতের ঘণ্টা বাজবে। শুতে যাবার সময় হয়েছে মাউন্টব্যাটেনের। বিছানায় বসে খামটি খুলে ফেললেন মাউন্টব্যাটেন। তারপরেই হো হো করে হেসে উঠলেন তিনি। খামের মধ্যে একখানা সাদা কাগজ মাত্র। তাড়াহুড়োর মধ্যে তাঁর প্রথম মন্ত্রিপরিষদের নামগুলিই লিখতে ভুলে গেছেন নেহরু।

অন্ধকারে লাহোরের রেল রোড স্টেশনটা কেমন যেন হাহা শূন্য। নিঃসাড়ে পড়ে আছে একপাশে। কয়েকজন ইংরেজ যাত্রী ছাড়া আর কোথাও কেউ নেই। অন্ধকারের মধ্যে ভূতের মতন দাঁড়িয়ে আছে বম্বে একসপ্রেস ট্রেনটা। এই ট্রেনে চড়েই ওরা আজ বোম্বাই যাচ্ছে। বিয়োগান্ত নাটকের সফল অভিনেতারা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে আছে শেষ দৃশ্যের জন্য। দলের মধ্যে সব পেশার মানুষই আছে। প্রশাসক, পুলিস, সোলজার, ইঞ্জিনীয়ার। কয়েক পুরুষ ধরে এই সাম্রাজ্যবাদের বনেদ এরাই গড়ে এসেছে। এই উপ-মহাদেশে এদের সুকৃতির স্বাক্ষর ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। পাঞ্জাব প্রদেশটাও যত্ন করে গড়েছিল এরা। এর পথঘাট, ব্রিজ, জলসেচের খাল, রেলপথ ইত্যাদি। এইসব কৃতিত্বগুলো এখন তাদের ছেড়ে যেতে হচ্ছে।

দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনটার দিকে যাবার সময় ওরা দেখলো কেমন যেন কলের পুতুলের মতন রেলকর্মচারীরা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মটা হোস্ পাইপের জল দিয়ে ধুয়ে দিচ্ছে। ঘণ্টা কয়েক আগেই এই প্ল্যাটফর্মের ওপর একটা বীভৎস হত্যাকাণ্ড হয়ে গেছে। সন্ত্রস্ত, পলাতক কয়েকজন হিন্দুকে নিষ্ঠুরভাবে জবাই করে হয়েছে এখানে। প্ল্যাটফর্মে লেগে থাকা রক্তের দাগগুলো ধুয়ে ফেলছে ওরা। একটা কুলি ঠেলার মধ্যে মড়াগুলো বোঝাই করে গার্ডভ্যানের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যাত্রীদলের সঙ্গে আছে লাহোরের প্রাক্তন পুলিস সুপার বিল রীচ। একটু আগেই দায়িত্বভার স্থানীয় একজনের হাতে দিয়ে এসেছে বিল্। পড়ে থাকা একটা থেঁতলান মড়া টপকে বিল রীচকে ট্রেনের কামরায় উঠতে হ'ল। কিন্তু থেঁতলান

www.pathagar.com

মড়াটা ডিঙিয়ে যাবার সময়ও কোন ভাবান্তর হল না তার। মানুষটা কি নিরেট পাথর হয়ে গেছে? ঠিক তাই। পাঞ্জাবের খুনোখুনিগুলো দেখে দেখে সত্যিই পাথর হয়ে গেছে বিল রীচ।

ট্রেন ছাড়ার পর কামরার জানলায় আর একজনের চেনা মুখ দেখা গেল। অমৃতসর পুলিসের প্রধান রুল ডীন্ বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে ছেড়ে যাওয়া শহরটার দিকে। তার চোখে দারুণ হতাশা। দিগন্তের আকাশ লাল হয়ে গেছে আগুনের শিখায়। হয়ত গ্রামগুলো জ্বলছে, কিন্তু এই বহ্ন্যুৎসব থেকে বাঁচানো যাবে না গ্রামগুলো। রাতের কালো আকাশের বুকে আগুনের রক্তাভ আলো ছড়িয়ে পড়েছে। শিখ লুঠেরাদের ছায়াশরীরগুলো প্রেতাত্মার মতন নাচছে সেই আগুনকে ঘিরে। উঃ! কি বীভৎস ওদের এই খুশীর নাচ! রুল্ ডীনের সমস্ত মানবিক চেতনা যেন বিবস্ত্র হয়ে গেল এক দারুণ মর্মবেদনায়। তার মনে হ'ল. তারা বেইমানি করেছে এমনভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। অনেক শোভন হতে পারতো এই হস্তান্তর। এইভাবে শাসনভার ফিরিয়ে সারা পাঞ্জাবটাকে এলোমেলো করে দিয়ে গেল তারা। কিন্তু রুল ডীনের এই শৌখিন ভাবপ্রবণতা বেশিক্ষণ স্থায়ী হ'ল না। দিল্লির কাছাকাছি পৌঁছে ট্রেনের সংগে ডাইনিং কার জুড়ে দেওয়া হ'ল। তারপর সদ্য ধোয়া চকচকে রুপোর বাসনে পরিবেশিত ভোজ্যবস্তুর দিকে তাকিয়েই তার মনোজগৎ থেকে উধাও হয়ে গেল পাঞ্জাব।

মধ্যরাতের আর দেরি নেই। কিন্তু ১৫১ নম্বর বেলেঘাটা রোডের ভাঙাচোরা বাড়িখানায় তখন থমথম করছে নীরবতা। বাড়ির দোরগোড়ায় সতর্ক চোখে পাহারা দিচ্ছে গুটিকয়েক হিন্দু-মুসলমান স্বেচ্ছাসেবক। সারা বাড়িটা অন্ধকার। কোথাও এক চিলতে আলো চোখে পড়ছে না। এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ রাতেও এই ভবনের বাসিন্দারা বিন্দুবিসর্গও বিচলিত নয়। ঘড়ির কাঁটার মতন নিত্যকর্ম-গুলো সম্পন্ন করে ওরা এখন খড়ের বিছানায় শুয়ে গভীর নিদ্রামগ্ন। এরই একটায় শুয়ে আছেন যে ছোটখাট মানুষটি তিনিও দিব্যি ঘুমোচ্ছেন নির্বিঘ্নে। তাঁর পাশে রয়েছে প্রিয় বই একখণ্ড ভগবদ্‌গীতা, তাঁর নকল দাঁত আর নিকেলের চশমাটা। নিবিড় ঘুমে আচ্ছন্ন মানুষটি জানতেও পারলেন না কখন মধ্যরাতের ঘণ্টাধ্বনি হ'ল। সারা দেশ জুড়ে যখন স্বাধীনতা আর মুক্তির উল্লাস, যখন দেশ জেগে উঠেছে জীবনে, তখন নিবিড় ঘুমে নিবৃত্ত হয়ে আছেন ওই ছোটখাট মানুষটি যাঁর নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

www.pathagar.com

'কি মিষ্টি এই মুক্তির সকাল'

বারাণসী, ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭

ঝিরঝিরে ঠান্ডা বাতাস বইছে। গঙ্গাবক্ষ থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি কুয়াশা উঠতে শুরু করলো। এবার ভোর হবে। এর নাম ব্রাহ্মমুহূর্ত। সেই আদ্যিকাল থেকেই এই পুণ্যমুহূর্তে গঙ্গাস্নানের বিহিত আছে হিন্দুদের, কারণ ব্রাহ্ম-মুহূর্তে গঙ্গাস্নান করলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়। তাই ১৫ আগস্টের এই পুণ্যলগ্নে পবিত্র বারাণসীধামে গঙ্গাস্নান করতে কাতারে কাতারে পুণ্যার্থীরা সমবেত হয়েছে। বিশ্বের নবীনতম রাষ্ট্রের জন্মকালটি এইভাবে পালন করে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করবে তারা।

পুণ্যসলিলা গঙ্গার সঙ্গে হিন্দুর সম্পর্ক বড় নিবিড়। হিন্দুর ধারণা গঙ্গাস্নান স্বর্গারোহণসোপান স্বরূপ। হিন্দুর কাছে এই ধর্মীয় আবেগটি তাই যুগ যুগ ধরে জীবন থেকে জীবনে আবর্তিত হচ্ছে। তারা মনে করে, যে দুর্লক্ষ্য শক্তিগুলি মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের প্রসন্ন করতেই গঙ্গার সঙ্গে এই নিভৃত মিস্টিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। হিন্দু পুরাণে আছে যে, স্বর্গ থেকে অবতরণের পূর্বে হিমালয়ের কোলে ১০৩০০ ফুট উঁচু এক তুষার-গুহা থেকে জলধারা ক্ষরিত হয়। অতঃপর ১৫০০ মাইল বিস্তৃত সমভূমি প্লাবিত করে এই জলধারা বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। গঙ্গার এই দীর্ঘ প্রবাহপথে বিধৃত হয়েছে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল যা বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল। গঙ্গার অবতরণপথ ভারী খেয়ালী। চপলমতি বালিকার মতন তার স্বভাব। প্রবাহপথে এই ক্ষ্যাপা জলধারা কখনও চাষীর খেতখামার ভীতিকর প্লাবনে ডুবিয়ে দেয়, কখনও বা গতিপথ বদল করে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পরিত্যক্ত করে জনপদ। তখন সেই পরিত্যক্ত জনপদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কালের দিকে।

তবে যতই কোপন এর স্বভাব হ'ক না কেন, এই জলধারার প্রতিটি পদক্ষেপই সদয় প্রশ্রয়সিক্ত। বিশেষ করে বারাণসীধামে। এই প্রাচীনতম নগরীর কাছে গঙ্গার প্রবাহ শান্ত। তার চারমাইল দীর্ঘ অর্ধচন্দ্রাকার তটরেখা ছুঁয়ে গঙ্গা বয়ে চলেছে মানবসভ্যতার প্রত্যুষকাল থেকে। ব্যাবীলন, নিনেভ (প্রাচীন অ্যাসিরিয়ার রাজধানী) ও টায়ার (প্রাচীন ফিনিশিয়ার রাজধানী) নগরীর সমসাময়িক প্রাচীন বারাণসীধামে সেই সুপ্রাচীনকাল থেকেই হিন্দুরা ভক্তিভরে পুণ্যসলিলা এই প্রবাহিনীতে অবগাহন স্নান করে খেয়ালী ভগবানের তুষ্টি সাধন করছে।

গঙ্গা এখানে উঁচু, খাড়াই পাথুরে ঘাট ছুঁয়ে তিরতির করে বয়ে চলে উত্তরবাহিনী হয়ে। ভক্তেরা প্রদীপ হাতে জলে দাঁড়িয়ে থাকে পূর্বাস্য হয়ে। তাদের হাতে জ্বলন্ত প্রদীপগুলি যেন জ্ঞানবোধির আলো। এই আলোর শিখাই মন থেকে অজ্ঞানের আঁধার দূর করে। ভক্তদের কটিদেশ জলে ডোবানো এবং ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত থাকে। জলের মৃদুমন্দ স্রোতে প্রদীপ হাতে তাদের ভক্তিশুদ্ধ স্থির দেহপটখানি তিরতির করে নাচে। তখন বহুদূর থেকে প্রদীপের কম্পমান

www.pathagar.com

শিখাগুলি দেখে মনে হয় যেন জলের বুকে ঝিকমিক করছে অসংখ্য জোনাকি।

সেদিনও হাতে প্রদীপ নিয়ে ভক্তেরা সবাই চেয়ে রইল পূর্ব আকাশের দিকে। এখনই চোখের সামনে প্রতিভাত হবে এক অলৌকিক বিস্ময়। এই অলৌকিক বিস্ময় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। প্রতিদিনই পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে গোলাকার রক্তিম একটি চাকা ধীরে ধীরে পূব আকাশে ভেসে ওঠে। ভগবান বিষ্ণু জ্যোতির্ময় অবতাররূপে প্রতিদিনই পূর্ব দিগন্তে উদিত হন। বিষ্ণুর এই জ্যোতির্ময়রূপ সূর্যরশ্মির সঙ্গে ব্যাপ্ত। সূর্য আরোহণ করেন উদয়গিরিতে, তিনি স্থিত হন মধ্যআকাশে এবং অস্তাচলে অস্তগমন করেন। এই তিনটি হ'ল বিষ্ণুর পদবিক্ষেপ। সূর্যের আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ আলোকোদ্ভাসিত হয়। তখন সুন্দরী ঊষার কোলে দীপ্তি লাভ করেন সূর্য। তখন জেগে ওঠে স্থাবর, জঙ্গম সমস্ত প্রাণী। সহস্র কণ্ঠে সূর্যের স্তুতি-আবাহন শুরু হয়। তখন জলের বুকে ভাসিয়ে দেওয়া হয় ভক্তের অর্ঘ্য, প্রদীপ ও ফুল।

বারাণসীর স্বর্ণশীর্ষ মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবতা হলেন শিবের দ্যোতক লিঙ্গ-মূর্তি। তিনিই কাশীর প্রধান দেবতা। মন্দিরের বর্তমান বৃদ্ধ পূজারী পণ্ডিত ভবানীশঙ্করের কাছেও আগস্ট মাসের এই স্বাধীনতা দিবসের সকালটা খুবই পবিত্র। এই মন্দিরের গোপন ঘরেই কত স্বাধীনতাকামী জাতীয়তাবাদী নেতাদের ইংরেজের গুপ্তচর পুলিসের কোপদৃষ্টি থেকে তিনি লুকিয়ে রেখেছেন। স্বাধীনতা দিনের সকালে সেই সব কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। পণ্ডিত ভবানী-শঙ্করের এক হাতে রয়েছে গঙ্গাজলের একটা পাত্র, অন্য হাতে খানিক। চন্দনবাটা। সকালের ছায়া ছায়া অন্ধকারে গঙ্গোদক আর চন্দনবাটা নিয়ে মন্দিরের গর্ভগৃহে অধিষ্ঠিত পাথরের লিঙ্গমূর্তির দিকে এগিয়ে গেলেন ভবানীশঙ্কর। এই লিঙ্গমূর্তিই কাশীর প্রধান উপাস্য দেবতা। বংশপরম্পরায় তাঁর পূর্বপুরুষরাই আরঙ্গজেবের লুঠেরা অনুচরদের কোপদৃষ্টি থেকে রক্ষা করে এসেছেন শিবের এই দ্যোতক লিঙ্গমূর্তিটি। সুতরাং নতুন রাষ্ট্রের এই পবিত্র জন্মলগ্নে কৃতার্থ হয়ে এই মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবতার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন তিনি। বস্তুত, এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, লিঙ্গমূর্তির এই ধর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি প্রাচীনতম অনুষ্ঠানরীতি হিসাবে মানুষের কাছে গণ্য।

হিন্দুধর্মে শিবের প্রতীক মূর্তিরূপে লিঙ্গ পূজিত হন। শিবের এই জননেন্দ্রিয় (Phallus emblem) সৃষ্টির দ্যোতক ভাব। শিব যেখানে যেখানে লিঙ্গাকারে বাস করেন তার মধ্যে প্রধান পীঠ হ'ল কাশী। কাশীর প্রায় প্রতিটি ঘাট ও মন্দিরে লিঙ্গমূর্তিতে বিরাজ করেন শিব এবং নিত্য পূজা পান। সেদিন ঊষালগ্নে আকাশ যখন আলোকোদ্ভাসিত হ'ল, তখন হাজার হাজার ভক্তকণ্ঠের সঙ্গে ভবানীশঙ্করও সূর্যদেবের স্তববন্দনা করে এই সুপ্রাচীন ভারতবর্ষের নবজন্মের আবাহন করলেন। তারপর সুগন্ধ চন্দনবাটা গোময় আর ফুলবেলপাতা দিয়ে আবৃত করে দিলেন পাথরের লিঙ্গমূর্তি।*

---

* পুরাণে এই লিঙ্গতত্ত্ব এবং পূজাপ্রকরণ সম্বন্ধে এক চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণিত আছে। একদিন শিব ও দুর্গা যখন মদিরা পান করে সম্ভোগসুখে বিহ্বল, তখন জগৎপালয়িতা ভগবান বিষ্ণু অন্য দেবতাদের নিয়ে শিবালয়ে হাজির হলেন। কিন্তু সম্ভোগসুখে বিভোর শিব ও দুর্গা তাঁদের আগমনের

www.pathagar.com

আকাশে সূর্যের আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই বেলা বাড়তে লাগলো। আলোকিত হ'ল সুপ্রাচীন কাশীধামের পথঘাট। কাশীর শ্মশান ঘাটের নাম মণিকর্ণিকা। ঘাটের চাতালে কয়েকজন চাঁড়াল কাঠের বোঝা নিয়ে বসে আছে। এরা হরিজন। হিন্দুর মৃতসৎকার করে এরা। একটু পরেই রাম নাম উচ্চারণ করতে করতে চারজন বাহক কাঁধে বাঁশের তৈরি খাটিয়ার ওপর একটা শবদেহ নিয়ে এল। ওদের সামনের মানুষটির হাতে একটা কাঁসর। ঘাটের কাছে ইতস্তত দাঁড়িয়ে থাকা মানুষরা মৃতদেহকে নমস্কার করলো। সবাই ভাবছিল সাদা কাপড়ে মুড়ে তাদেরও শবদেহ একদিন ওরা বয়ে আনবে এই শ্মশানঘাটে।

কাশী ও তার ৩৬ মাইল পরিধির মধ্যে মরতে পারা প্রতিটি হিন্দুর কাছে এক পবিত্র কামনা। অনাদিকাল থেকেই এই পবিত্র সংস্কারটি শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে এসেছে সে। তার ধারণা, এখানে দেহ রাখলে আত্মার মোক্ষলাভ হয় এবং জন্মমৃত্যুর চক্রে তাকে ঘুরপাক খেতে হয় না। বলাবাহুল্য, এই ব্রহ্মজ্ঞানটি হিন্দুর আজন্ম সংস্কার। তাই বার্ধক্যে বারাণসীবাস তার কাছে এমন কাম্য। হিন্দুরা বেঁচে থাকার জন্য কাশীবাসী হয় না। তারা কাশীবাসী হয় মরতে।

সেদিন সকালে কাশীর এই বিশেষ আধ্যাত্মিক অধিকারটির প্রথম দাবিদার হ'ল সদ্যবাহিত এই মৃতদেহটি। বাহকরা ততক্ষণে শব মাটিতে নামিয়ে রেখেছে। একজন তার মুখটা খুলে কয়েক ফোঁটা গঙ্গাজল ঢেলে দিল। ততক্ষণে চিতা সাজানো সমাপ্ত হয়েছে। মৃতদেহ চিতায় রেখে ডোম চাঁড়ালরা মড়ার ওপর কাঠ চাপালো। চিতাশয্যা সম্পূর্ণ হবার পর মৃতের জ্যেষ্ঠপুত্র পাঁচবার চিতা প্রদক্ষিণ করলো। তারপর পাঁকাটির মুখে আগুন লাগিয়ে মৃতের মুখে সে অগ্নিস্পর্শ করালো।

দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো চিতা। চিতার চারপাশে তখন গোল হয়ে বসেছে শোকার্ত শবানুযাত্রীরা। কালো ধোঁয়ার কুণ্ডুলিতে আকাশ ছেয়ে গেছে। হঠাৎ ফট্ করে একটা শব্দ হ'ল। শোকার্ত মানুষগুলো কৃতজ্ঞ চোখে তাকাল চিতার দিকে। সবাই তখন বুঝেছে যে মৃতের খুলি ফেটে গেল। ১৫ আগস্টের সেই প্রথম প্রত্যুষেই দেহখোল ছেড়ে আত্মার মুক্তি হ'ল। মিশে গেল পরমাত্মার সঙ্গে। কাশীবাস সার্থক হ'ল এই মায়াবন্ধ মানুষটির।

তখন রাত দুটো। গান্ধীজীর শয্যাত্যাগের আরও এক ঘণ্টা দেরি আছে।

বৃত্তান্ত জানতে পারলেন না এবং তাঁদের যোগ্য অভ্যর্থনাও হ'ল না। ক্রুদ্ধ বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতারা মিথুনাসক্ত শিবপার্বতীকে অভিসম্পাত দিয়ে শিবালয় ত্যাগ করলেন।

সম্ভোগসুখ সমাপনান্তে শিব ও দুর্গা যখন সমস্ত বৃত্তান্ত জানতে পারলেন, তখন এত তীব্র লজ্জা হ'ল যে সেই অবস্থাতেই তিনি দেহ রাখলেন। লজ্জায় মরে গেলেন শিব, কিন্তু লিঙ্গমূর্তির মধ্যে পুনর্জীবন লাভ করলেন। শিব ভক্তদের জানালেন যে, এখন থেকে লিঙ্গমূর্তির মধ্যেই শিবের প্রতীকটি ভক্তেরা খুঁজে পাবেন এবং লিঙ্গপূজা করলেই তাঁর পূজা করা হবে। শিবের দ্যোতক এই লিঙ্গমূর্তির বর্ণ সাদা। এর তিনটি চোখ, পাঁচটি মুখ (শিবের আর এক নাম পঞ্চমুখ) এবং এর ভূষণ ব্যাঘ্রচর্ম। জগৎ সৃষ্টির আগে থেকেই এই লিঙ্গমূর্তি প্রাণ-পুষ্টির কারণস্বরূপ অবস্থিত আছে। লিঙ্গমূর্তির পূজা করলে ভক্তের মন থেকে ভয়শঙ্কা দূর হয় এবং ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়।

www.pathagar.com

কিন্তু বেলেঘাটার হায়দারী ভবনের কাচের জানলায় সেই অসাধারণ সময়েও আলোর কিরণ দেখা গেল। গান্ধীজী জেগে উঠেছেন। কিন্তু দিনটি মহান বলেই কি এই সময় তিনি জেগে উঠেছেন? তিনি জানেন যে, তাঁর অনুরাগী ভক্ত দেশবাসী স্বাধীনতা দিবসের পরিপূর্ণ স্বাদটি আস্বাদন করতে উন্মুখ। তাদের কাছে আজ তিনি দেবতাপ্রতিম। কিন্তু গান্ধীজী যেন অনাসক্ত। তাঁর দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের এই গৌরবময় পরিসমাপ্তিতে তিনি মোটেই উচ্ছ্বসিত হন নি। সারা বিশ্বের কাছে তাঁর জয়ের সাফল্য দারুণভাবে উদ্ঘাটিত হলেও গান্ধীজী আজ এতটুকুও বিচলিত নন। আনন্দের কণাটুকুও তাঁকে উদ্বেল করে নি। যে জয় পেতে তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন, তা থেকে কোন স্বাদই যেন পেলেন না তিনি। আসন্ন দুর্যোগের আশঙ্কায় তাঁর এই জয় কালিমাখা হয়ে গেল। আজ থেকে সাতমাস আগে বিক্ষুব্ধ নোয়াখালিতে পদযাত্রা করার সময় যেমনটি মনে হয়েছিল, ঠিক তেমনি আলোড়িত দেখালো অহিংসার প্রতিমূর্তি গান্ধীজীকে। তাঁর মন তখন দীর্ণ হয়ে আছে সংশয়ে। আগের দিন বিকালেই বন্ধুকে লেখা একটা চিঠিতে সেই সংশয়ের ভাবটি তিনি প্রকাশ করেছেন। গান্ধীজী লেখেন, 'অন্ধকারে আমি কানার মতন পথ হাতড়াচ্ছি। আমি কি দেশটাকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে গেলাম?' (আই অ্যাম গ্রোপিং। হ্যাভ আই লেড্ দ্য কান্ট্রি এ্যাস্ট্রে?)

আমরা জানি যে যখনই গান্ধীজীর মন বেদনার্ত হয় তখনই তাঁর চিরক্ষণের দোসর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা থেকে সান্ত্বনা গ্রহণ করেছেন। বিশ্বের এই মহান ধর্মগ্রন্থটি তাঁর জীবনের কত অন্ধকার মুহূর্ত আলোকিত করেছে, সত্যের পথে চালিয়ে নিয়ে গেছে, তার ইয়ত্তা নেই। আজও তার অন্যথা হ'ল না। খড়ের বিছানার ওপর খালি গায়ে পা মুড়ে বসেছেন গান্ধীজী। স্বাধীনতা দিবসের প্রত্যুষে এইভাবেই শোকদিবস পালন করবেন তিনি। তাঁকে ঘিরে বসে আছেন অনুরাগী ভক্তশিষ্যেরা। গান্ধীজী অস্ফুটে ভগবদ্গীতার প্রথম শ্লোকটি পাঠ করলেন। আত্মীয়পরিজনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, তাঁদের বধ করতে হবে, তাই অর্জুন খুবই বিমর্ষ। তিনি ছল খুঁজেছেন যাতে যুদ্ধ না হয়। ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক আকাশে যেন মহাভারতের সেই অবস্থারই অবিকল ছায়াপাত হয়েছে। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধের যাবতীয় বিষয় প্রত্যক্ষ করেছিলেন দিব্যদৃষ্টিপ্রাপ্ত সঞ্জয়ের বর্ণনা থেকে। গান্ধীজী ধীরে ধীরে পাঠ করলেন প্রথম অধ্যায়ের সেই অবিস্মরণীয় শ্লোকটি :

'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়। (হে সঞ্জয়! কুরুক্ষেত্রের পুণ্যভূমিতে একত্রিত আমার এবং পাণ্ডুর যুদ্ধেচ্ছু পুত্রগণ কি করলো?)

পাথরে পাথরে ঘষ্টানির ঘরঘরে আওয়াজটা বোধহয় মানুষের ইতিহাসের মতনই সুপ্রাচীন। দিল্লির কাছাকাছি ছাতারপুর গ্রামের এক দরিদ্র চাষীর ঘরেও সেদিন ভোর হ'ল এই শব্দে। উঠোনের ওপর চারপাইয়ের দড়ির ওপর টানটান শুয়ে থাকা মানুষটা চোখ মেললো এই শব্দে। উঠোনের কোলে দালানের কুলুঙ্গিতে রেড়ির তেলের একটা কুপি জ্বলছে। ম্যাড়ম্যাড় করছে তার হলুদ আলো। সেই আলোয় অতি চেনা একটা নারীদেহের বাঁকানো পিঠটা দেখতে পেল খাটিয়ায় শোওয়া লোকটা। জাঁতার দুটো পাথরের ওপর ঝুঁকে পড়া ওই শরীরটা তার

www.pathagar.com

জীবনসঙ্গিনীর। মাথায় কাপড় মুড়ি দিয়ে জাঁতায় গম পিষছে মহিলা। তাদের পরিবারের সেদিনের ক্ষুদকুঁড়োর সংস্থান করছে সে।

এই গরিব চাষীর নাম রঞ্জিতলাল। সে জাতে ব্রাহ্মণ। সময়টা তখন সূর্যোদয়ের আগের মুহূর্ত। হিন্দুরা বলে ব্রাহ্মমুহূর্ত। শয্যাত্যাগের আগে এই পবিত্র মুহূর্তে সব হিন্দুই ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করে। বাহান্ন বছরের রঞ্জিতও ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করে শয্যাত্যাগ করলো। তারপর হাতে জলপাত্র নিয়ে প্রাতঃকৃত্য সারতে তার মেটে ঘর থেকে বেরোল। ইতিমধ্যেই ছোট্ট ছাতারপুর গ্রামের মানুষ দলে দলে বেরিয়ে পড়েছে সর্বজনীন মলত্যাগের মাঠের দিকে। সেই প্রায়ান্ধকার আলোয় তাদের ছায়া শরীরগুলো লক্ষ্য করে রঞ্জিতলালও জলপাত্র হাতে নিয়ে মলত্যাগের মাঠে এসে পৌঁছাল।

কিন্তু ১৫ আগস্টের এই ব্রাহ্মমুহূর্ত থেকে বিদেশী শাসনের শেষ হতে চললেও ছাতারপুর গ্রামের মানুষের জীবনে তার সামান্য প্রভাবটিও দেখা গেল না। সবাই কেমন নিশ্চিন্ত মনে চুপচাপ প্রাতঃকৃত্য সারতে চলেছে। রঞ্জিতের জীবনও এই আলগা ছন্দে বাঁধা। সারা জীবনে বিদেশী শাসকদের একজনের সঙ্গেও তার বাক্যালাপ হয় নি। একজন সাহেবকেও বছরে একবারের বেশি দেখে নি সে। বৎসরান্তে জেলা কলেক্টর্ সাহেব যখন আদায়ী মাশুলের হিসেব নিতে আসে, তখনই কোন সাহেবকে সে চাক্ষুষ দেখেছে। এমনকি মলমূত্র ত্যাগের এই কৃত্যকর্ম, সাহেবরা যাকে 'কল্ অব নেচার' বলে, সেটুকুই সে উচ্চারণ করতে পারে।

তবে বিদেশী ভাষায় একে যাই-ই বলা হ'ক, হিন্দুদের কাছে এই কৃত্যকর্ম-গুলো ২৩টি শাস্ত্রবিহিত নিয়মে বাঁধা। শুধু তাই নয়, শুদ্ধাচারে এই নিয়মগুলোই তাকে পালন করতে হয়, নতুবা প্রত্যবায় হয়। নিয়মগুলো শাস্ত্রগ্রন্থে বিশদভাবে বলা আছে। যেমন বাঁ হাতে জলপাত্র নিয়ে মলত্যাগ করার বিধান আছে, তেমনি বিধান আছে বাসী কাপড় পরে যাওয়ার। মলত্যাগের মাঠটি পুকুর, নদীঘাট, মন্দির, কুয়া বা গ্রামের পুণ্য বটগাছ থেকে কত দূরে অবস্থিত হবে, সেই বিবরণ-টিও শাস্ত্রে দেওয়া আছে।

আরও আছে। রঞ্জিত জাতিতে ব্রাহ্মণ। তাই যজ্ঞোপবীত ধারণের সে অধিকারী। সুতরাং তার বামস্কন্ধে স্থাপিত তিন দণ্ডির যজ্ঞসূত্রটি সে ধারণ করলো ডান দিকের কানে, তারপর মাটির কাছাকাছি পা মুড়ে হাঁটুতলে বসলো। রঞ্জিত জানে যে মলমূত্র ত্যাগের সময় সে সূর্য চন্দ্র বা আকাশের দিকে তাকাবে না। সে উঁচু পাড় বা গাছের ডালে বসে মলমূত্র ত্যাগ করবে না। পরনের কাপড়ের খুঁট দিয়ে সে মাথা ঢেকে বসবে। মলমূত্র ত্যাগের পর জলপাত্র থেকে জল নিয়ে সে জলশৌচ করবে। তারপর নদীঘাটে গিয়ে মৃত্তিকা দিয়ে হাত-পা ধৌত করবে। মৃত্তিকা কোথা থেকে সংগ্রহ করবে, তারও বিধান আছে শাস্ত্রে। উই ঢিবি, নোনামাটি, মন্দির সংলগ্ন জমি, বটগাছের ছায়াঢাকা জমি গোচারণ মাঠ ইত্যাদি থেকে মৃত্তিকা সংগ্রহ করা নিষিদ্ধ। সব সময় বাম হাত দিয়ে জলশৌচ করাই বিধেয়।*

---

* নিষ্ঠাবান হিন্দু মনে করে যে শরীরের উত্তমাঙ্গ ও অধমাঙ্গ, এই দুই অঙ্গের প্রান্তদেশ হ'ল বহিশ্ছিদ্র। তাই অধমাঙ্গের অনুষ্ঠেয় কর্ম বাঁ হাত এবং উত্তমাঙ্গের অনুষ্ঠেয় কর্ম ডান হাতে সমর্পণ করাই শাস্ত্রসম্মত।

www.pathagar.com

রঞ্জিতও মলত্যাগের পর জলশৌচাদি সম্পন্ন করলো, তারপর প্রথমে বাঁ হাত ও পরে ডানদিকের পা পাঁচবার ধৌত করলো। এরপর হাতের কোষ থেকে পরিষ্কার জল নিয়ে আটবার কুলকুচা করলো এবং কুলকুচার জল শরীরের বাঁ দিকে ফেললো। সব শেষে প্রাতঃকৃত্য সমাপনের শেষ বিধিটি পালন করলো তিনবার গণ্ডূষ করে এবং 'ওঁ বিষ্ণোঃ' মন্ত্রটি উচ্চারণ করে।

এবার তার ঘরে ফেরার পালা। যে খেতীজমির পাশ দিয়ে সে ফিরে এল, তার বন্ধ্যা মাটি থেকেই পরিবারের সকলের সারা বছরের ক্ষুদকুঁড়া সংগ্রহ হয়। এই সংগ্রহ খুবই সামান্য। রঞ্জিত দেখলো চাষের জমি ছাড়িয়ে দূর-দিগন্তে দিনের প্রথম সূর্যালোক উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। নরম সেই সূর্যালোকের কিরণ ছড়িয়েছে ডালপালা মেলা তিনটা পাকুড় গাছের গায়ে। আকাশের গায়ে হেলান দেওয়া প্রকাণ্ড গাছগুলো ছাতার মতন ছায়া ছড়িয়েছে যে খণ্ডজমিটার ওপর, সেটাই ছাতারপুর গ্রামের শ্মশান। পাঁচশ' বছর ধরে এই গাছ তিনটের আড়ালে শুয়ে থাকা শ্মশানভূমিতে ছাতারপুর গ্রামের মানুষের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়ে এসেছে সাজানো চিতায়। বোধহয় ছাতারপুর গ্রামের চাষীর জীবনে এইটুকুই অনিবার্য সত্য যে এই সাজানো চিতায় একদিন তারও মরদেহ ভস্মীভূত হবে।

শ্মশান ছাড়িয়ে আরও দূরে আকাশের বুক চিরে দাঁড়িয়ে থাকা ওই রক্তনীল রঙের পাথরের দুর্গটা যেন প্রকাণ্ড একটা লিংগমূর্তি। দুর্গের বাঁ দিকে সুদৃশ্য দুটি গম্বুজ। তেরশ' শতাব্দীতে তৈরি সপ্তদ্বার সমন্বিত এই দুর্গনগরীর ধ্বংসস্তূপ এখনো ছড়িয়ে আছে এখানে। সুলতান আলাউদ্দিনের (খলজি) তৈরি এই দুর্গনগরীর অন্তর্ভুক্ত ছিল পুরানা দিল্লি। এই ধ্বংসস্তূপের পাশ দিয়ে চলে গেছে প্রশস্ত রাজপথ। অন্যূন বিশ মাইল পথ হাঁটলেই পৌঁছে যাওয়া যায় রাজধানী দিল্লি। সেদিন এই প্রশস্ত রাজপথ ধরে যাত্রা শুরু করলো রঞ্জিত আর তার সহযাত্রীরা। মানুষের এই মহামিছিল চলেছে রাজধানী শহরের দিকে এই ঐতিহাসিক দিনটিতে। রঞ্জিতও চলেছে ওদের সংগী হয়ে। তার বাহান্ন বছরের জীবনে আর মাত্র একবারই সে দিল্লি গিয়েছিল, তার বড় মেয়ের বিয়ের সোনার বালা কিনতে।

সেই সকালটিতে শুধু ছাতারপুর নয়, দিল্লির আশপাশের আরও কয়েকটি গ্রামের মানুষের কাছে এই কুড়ি মাইলের দূরত্ব যেন ধর্তব্যই মনে হয়নি। এ যেন মানুষের এক মহান জলস্রোত যা উন্মত্ত খুশীর আবেগে ছুটে চলেছে ওই আনন্দ-মুখর রাজধানী শহরের দিকে। ওখানেই উৎসব আর সমারোহ করে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটানো হবে। ওরা ভাগ নিতে চলেছে সেই সমারোহে যদিও উপনিবেশ কি সেই তত্ত্ব অনেকেই জানতো না।

নয়াদিল্লি, ১৫ আগস্ট ১৯৪৭

'ও আমার মুক্তির সকাল, তোমার মিষ্টি সোনালী রোদ/কেমন আবেশে জড়িয়ে ধরেছে প্রাচীন এই রাজধানী শহরকে।' বাস্তবিক তাই। রাজকবির আশীর্বাণী যেন নরম রোদ হয়ে তখন ঝরে পড়েছে শহরের বুকে উপচে পড়া মানুষের ওপর।

www.pathagar.com

দিল্লির আশপাশ থেকে দলে দলে মানুষ আসছে। কেউ আসছে টাঙ্গায় চড়ে। ঘোড়ার গলায় বাঁধা ঘন্টির শব্দ হচ্ছে টুংটাং। কেউ আসছে তেরঙা শিংওলা বলদগাড়ি চড়ে। হঠাৎ দেখা গেল একটা চাকাওলা কাঠের রথের ওপর অনেক মানুষ চড়েছে আর চাকাওলা গাড়িটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে আরও কয়েকজন। এ ছাড়া লরির মাথায় চড়েছে বেশ কয়েকশ' মানুষ। লরির সারা গায়ে চিত্রবিচিত্র ছবি আঁকা। সাপ, বাজপাখি, গাইগরু, পাহাড় আরও কত কি। অনেকে আসছে গাধা বা খচ্চরের পিঠে চড়ে। কেউ আসছে পায়ে হেঁটে, কেউ বা সাইকেল চেপে। ওরা কেউ দৌড়চ্ছে, কেউ হাঁটছে। অজস্র মানুষের ঢল নেমেছে তখন রাজধানীর রাস্তায়। কারও মাথায় রঙিন পাগড়ি। কেউ পরেছে রংবেরঙের জামা। মেয়েদের পরনের শাড়ির রঙও কত বাহার। তাদের হাত, কান বা নাকের গিলটি করা গয়নার গায়ে রোদ পড়ে ঝিকমিক করছে।

কিছুক্ষণের জন্য সেই একাকার মানুষের ভিড়ে আর কোন ভেদাভেদ রইল না। সবাই ভাই ভাই। বামুন, চাঁড়াল, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীশ্চান সবাই যেন ছোঁয়াছুঁয়ি ভুলে মাখামাখি হয়ে গেছে। এক জাতি, এক প্রাণ হয়ে গেছে। সবাই হাসছে, গাইছে, আনন্দে নাচানাচি করছে। আনন্দের আবেগে হুহু করে কেঁদে ফেলছে কেউ কেউ। কে বলবে এরা আলাদা। আলাদা জাতি, আলাদা ধর্ম, আলাদা পোশাক সত্ত্বেও কিছুক্ষণের জন্য ওরা সবাই এক। চার আনা দিয়ে একটা টাংগা ভাড়া করেছে রঞ্জিত। একখানা গাড়ির মধ্যে বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে সেও চলেছে শহরের রাস্তায়। যেতে যেতে সে শুনতে পেল নানান কথা। ছেলেমেয়েদের বোঝাতে ওরা বলাবলি করছে কেন এই মানুষের মেলা। আজ থেকে ইংরেজরা আর দেশের রাজা নয়। তারা চলে যাচ্ছে এদেশ থেকে। এখন থেকে স্বাধীন হ'ল দেশ। তাই স্বাধীন দেশের পতাকা তুলবেন নেহরুজী।

হঠাৎ শিঙার শব্দে গমগম করে উঠলো সকালের আকাশ। এখনই শুরু হবে ভিক্টোরিয়ান সমারোহের শেষ জলুস। নবলব্ধ স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেলরূপে তাঁর এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হবে ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ পর্ব। ঠিক করাচির মতন ভাবগম্ভীর এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে যাবে দীর্ঘদিনের কলোনি শাসন এবং এক অসাধারণ সম্মান শিরোপা দিয়ে তাঁকে ভূষিত করা হবে। মাউন্টব্যাটেনের কাছে দিনটি তাই বড় তাৎপর্যমণ্ডিত। প্রপিতামহী সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার বড় সাধের ধন এই ভারতসাম্রাজ্য এখন থেকে আর ইংরেজের কলোনি থাকবে না এবং প্রথম গভর্নর-জেনারেল রূপে এর সব দায়দায়িত্ব তিনি নিজের হাতে তুলে দেবেন এদেশের শাসকদের হাতে।

সিংহাসনের দিকে পায়ে পায়ে চলেছেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। পাশাপাশি চলেছেন তাঁর পত্নী। তাঁর পরনের গাউনের গায়ে ঝলমল করছে সোনা রুপোর জরি। বাদামি রঙের চুলের গায়ে ঝকমক করছে রানীর মুকুট। এই স্বাধীনতা দিবসটাকে অসাধারণ এবং স্মরণীয় করে রাখতে আয়োজনের ত্রুটি নেই। জাঁক-জমকের ওপর মাউন্টব্যাটেনের অনুরাগের কথা কে না জানে। সুতরাং বাহুল্য আছে সব ব্যাপারেই। মাউন্টব্যাটেন নিজে, এর খুঁটিনাটি তত্ত্বাবধান করছেন। যেখানে যেটি থাকা বাঞ্ছনীয় সেটি সেখানেই রেখেছেন। তাঁদের আগে আগে চলেছেন রঙচঙা পোশাক পরা একজন 'এসকর্ট।' সে-ই তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে

www.pathagar.com

চলেছে ঘোর রক্তবর্ণ সিংহাসনের দিকে। ওখানেই পাঁচ মাস আগে এই উপমহাদেশের সর্বশেষ বড়লাটরূপে তাঁর অভিষেক হয়েছিল। তাঁদের সিংহাসনের দুপাশে বসেছেন ভারতের নতুন শাসকরা, নেহরু এবং বল্লভভাই। নেহরু পরেছেন আঁটসাঁট যোধপুরী পায়জামা আর ঢিলা আচকান। সাদা ধুতি পরা বল্লভভাই পটেলের মুখখানা রোমান সম্রাটের মতন গম্ভীর আর ভ্রূকুটিকুটিল। কংগ্রেসের অন্য মন্ত্রীরা মাথায় সাদা গান্ধীটুপি পরে নির্বিকার মুখে বসে আছেন।

সিংহাসনে আরোহণ করেই বিচিত্র একটা চিন্তার উদয় হ'ল মাউন্টব্যাটেনের মনে। খুবই উপভোগ্য সেই চিন্তাটা। তাঁর দুপাশে বসে থাকা এই মানী মন্ত্রীরা কোন না কোন সময়ে ইংরেজের জেলহাজতে বন্দী ছিলেন। এই ব্যাপারে ওঁরা সবাই সমান। অথচ আজ তাঁকে ইংরেজের কারাপ্রশাসনাধীন এইসব কর্তাব্যক্তিদের সামনেই স্বাধীন ভারতের বিশ্বস্ত সেবকরূপে শপথ নিতে হচ্ছে। অতঃপর শেষ হ'ল তাঁর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। খুবই সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান। শেষ হ'ল মন্ত্রীসভার অন্য সভ্যদের শপথ অনুষ্ঠানও।

শপথ-গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পরিষদভবনের বাইরে ২১বার তোপধ্বনি হ'ল এবং এর সঙ্গে একাকার হয়ে গেল জনতার বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাস।* দরবারহল থেকে বেরিয়েই লাল কার্পেট মোড়া সিঁড়ির ধাপ। শেষ ধাপটির মুখে দাঁড়িয়ে আছে সোনালী রঙের স্টেজ ক্যারেজটি। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে লন্ডনের মেসার্স পার্কার অ্যান্ড কোম্পানির তৈরি করা এই রাজশকটটা সম্রাট পঞ্চম জর্জ এবং সম্রাজ্ঞী ম্যারীর ব্যবহারের জন্য এদেশে পাঠানো হয়েছিল। ছ'ঘোড়ার এই ক্যারেজের ঘোড়াগুলোর গায়ের রঙ লালচে বাদামি। ক্যারেজের দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে চকচকে কালো জুতো আর ধপধপে সাদা ব্রীচেস পরা ঘোড়সওয়ার গার্ডবাহিনী। একদা ভাইসরয়ের এই দেহরক্ষীরাই এখন গভর্নর-জেনারেলের বডিগার্ড।

মাউন্টব্যাটেন দম্পতি রাজশকটে আরূঢ় হলেন। ধীরে ধীরে বড়লাটভবনের 'ড্রাইভ্' দিয়ে এগিয়ে চললো এই জমকাল মিছিল। বডিগার্ডবাহিনীর হাতে ছোট ছোট পতাকা আর বল্লম। তার পিছনে চলেছে সারিবদ্ধ রক্ষীবাহিনী, সুসজ্জিত অশ্বারোহীবাহিনী, শিঙাবাদক ইত্যাদি। জমকাল মিছিলের ঘটা দেখে মনে হয় যেন বইয়ের পাতায় ছাপানো ব্রিটিশরাজের রাজকীয় প্যারেডের ছবি।

রীতিমত রাজকীয় মর্যাদায় মাথাটা ঈষৎ ঝুঁকিয়ে সেনাবাহিনীর সসম্ভ্রম কুর্নিশ কুড়িয়ে চলেছেন মাউন্টব্যাটেন দম্পতি। অবশেষে এসে পৌঁছলেন প্রাসাদের গেটের বাইরে। সেখানে অপেক্ষা করছিল ভারতের আমজনতা। বিপুল মানুষের সমাবেশ হয়েছে সেখানে। এ এমন এক সমাবেশ যা তিনশ' বছরের ঔপনিবেশিক শাসনে আর কোন ইংরেজ রাজপুরুষের দেখার সৌভাগ্য হয় নি। ওরা যে রাজকীয় মহিমার ভোজবাজি দেখতে কৌতূহলী হয়ে এসেছে তা নয়। আজকের পরিস্থিতি অন্যরকম। ভারতের আসল বিশালত্ব তার জনসংখ্যার ঘনত্ব। সেই ঘনবদ্ধ জনতাই লাটপ্রাসাদের দোরগোড়ায় তখন আছড়ে পড়েছে উল্লাসে। এরা সবাই মজে আছে দারুণ খুশীতে। কেউ নাচছে, গান গাইছে, আনন্দ

---

* আগে ভাইসরয়ের অভিষেকের সময় ৩১ বার তোপদাগা হলেও, ভারতের প্রথম প্রশাসনিক গভর্নর-জেনারেলের অভিষেকের বেলায় এই অনুষ্ঠানটি কমিয়ে ২১ বার করা হয়।

www.pathagar.com

লাফালাফি করছে। সবাই মিলে মাছির ঝাঁকের মতন ভনভন করছে মিছিলটাকে ঘিরে। এদের আদর আপ্যায়নের বাড়াবাড়িতে পণ্ড হয়ে গেল মাউন্টব্যাটেনের যাবতীয় প্রোটোকল। পুরনো রাজমহিমা অনুসরণ করে নতুন ভারতকে স্বাগত জানাবার সব আয়োজনই ভেসে্ত গেল উৎসাহের স্রোতে।

ভিড়ের মধ্যে সেই শিখ সাংবাদিককেও দেখা গেল। এই ছেলেটিই উৎসাহের আতিশয্যে মুসলমান যুবতীকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছিল আগের রাতে। ভিড়ের মধ্যে চলতে চলতে তার হঠাৎ মনে হ'ল শিকল ভাঙছে তার চারপাশে। তাই এই অবাধ্য মানুষের স্রোত। শাসন দিয়ে আর বাঁধা যাবে না তাদের। ছেলেবেলার একটা ঘটনা মনে পড়লো তার। একজন সাহেব বালকের সঙ্গে সেও ইস্কুল যাচ্ছিল পাশাপাশি হেঁটে। কিন্তু সাদা চামড়ার ছেলেটা তাকে ধাক্কা দিয়ে পাশে সরিয়ে দেয়। এমন অপমান, লাঞ্ছনা আর তাকে সইতে হবে না। এখন থেকে কেউ তাকে ঠেলে পাশে সরিয়ে দিতে পারবে না। উৎফুল্ল শিখ সাংবাদিক দেখলো মানুষের সেই মহামিলনে কোন জাতবেজাতের বাছাবাছি নেই। ধনী-দরিদ্র, মূর্খ-পণ্ডিত, বামুন-চণ্ডাল সব এক হয়ে গেছে। সবাই সবাইকে জড়িয়ে ধরছে আর আহ্লাদে কুটিকুটি হয়ে বলছে, 'সাহেব, আমরা আজাদী পেয়েছি!'

মনে হচ্ছে মানুষগুলো হঠাৎ তাদের ঘর খুঁজে পেয়েছে। এতদিন ওরা পরবাসী ছিল নিজের ঘরে। অন্তত এইরকমই অনুভূতি হ'ল একজন প্রত্যক্ষদর্শীর। অফিসার্স মেসে স্বাধীন ভারতের পতাকা উড়ছে দেখে মেজর দুবে আনন্দে আত্মহারা। তার মনে হ'ল এতদিন তারা ইংরেজের অধীন ছিল। তাদের ঘরদোর ছিল না। এখন তারা স্ব স্ব প্রধান হয়েছে। আপন আপন ঘর পেয়েছে।

সাধারণ মানুষের কাছে স্বাধীনতা যেন এক ভোজবাজি, এক নতুন জগৎ। যেখানে অভাব থাকবে না ; সবাই পেটপুরে খেতে পাবে। ছাতারপুর গ্রামের রঞ্জিতও ছেলেমেয়েদের এই আশ্বাস দিল। শুধু রঞ্জিত একাই নয়। সারা দেশটাই তখন হুজুকে মেতে উঠেছে। বাসের যাত্রীরা ভাড়া দিতে চাইল না। কোথাও কোন নিষেধবাধা মানলো না তারা। কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের বাসস্থানের জন্য ঘেরা বেষ্টনীর মধ্যে ঢুকে পড়েছিল একটা ভিখিরী। পরিচয়পত্র দেখাতে বললে সে লোকটা মহা খাপ্পা হয়ে গেল। কিসের পরিচয়পত্র? দেশ ত স্বাধীন? যে কেউ এখন যেখানে সেখানে যেতে পারে! ইত্যাদি ইত্যাদি।

তখন রাজধানী শহরের মতন সারা দেশজুড়েই হুল্লোফুর্তি চলছে। সকাল আটটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই দলে দলে মানুষ আছড়ে পড়লো কলকাতার রাজভবনের গেটের গায়ে। শেষ ইংরেজ গভর্নর স্যর ফ্রেডরিক বারোজ তখন সস্ত্রীক ব্রেকফাস্ট করছেন। তাঁর হুকুমে গেট খুলে দেওয়া হ'ল। হৈ হৈ করে জনতা ঢুকে পড়লো রাজভবনের বড় বড় ঘরগুলোর মধ্যে। তারপর শুরু হ'ল ওদের দাপাদাপি। শোবার ঘরের নরম গদির বিছানাপত্র ওলোটপালট করে নাচানাচি শুরু করে দিল ওরা। খাটিয়ার শুকনো শক্ত দড়ির ওপর শুয়ে যারা এতকাল কাটিয়েছে, তাদের কাছে এই নরম গদির বিছানা যেন স্বর্গতুল্য সুখ। বিছানাপত্রের এই ধামসানো চেহারা দেখে লেডি বারোজের চক্ষুস্থির! দেওয়ালে টাঙানো পূর্বতন গভর্নরদের বড়বড় তৈলচিত্রগুলো ছাতার বাঁট দিয়ে ছিঁড়ে দিল সবাই। শুধু রাজভবনের সর্বত্রই নয় সারা কলকাতা শহরটাই তখন এলোমেলো হয়ে গেছে। ট্রামে বাসে

www.pathagar.com

উঠে বিনাভাড়ায় সর্বত্র ঘুরছে। সবাই আজাদ। তবে একটাই সান্ত্বনা। খুশীর আধিক্যে বোমাবাজির বদলে পটকা ছুঁড়েই ওরা সবাই বিজয়োৎসব পালন করলো সেদিন।

শুধু কলকাতাই নয় বোম্বাই শহরেও একই রকম হুল্লোড় শুরু হ'ল সকাল থেকে। সেখানে সাম্রাজ্যবাদী গরিমার শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাজমহল হোটেল তখন হাট-বাজার হয়ে গেছে। শ্বেতকায়দের পরম স্পৃহনীয় এই নিরাপদ দুর্গটির মধ্যে মাছির ঝাঁকের মতন মানুষের ভিড় জমেছে। মাদ্রাজ শহরের চেহারাও এলোমেলো। দিনভর শহরের রাস্তা দিয়ে কালো কালো চেহারার দাক্ষিণীরা স্রোতের মতন সেন্ট জর্জ ফোর্টের দিকে ছুটে চলেছে। রীতিমত গর্ব করে তারা সেখানে স্বাধীন ভারতের পতাকা ওড়ানো দেখলো। এই দুর্গটাই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম দুর্গ। সুরাট বন্দরেও তখন অসংখ্য কৌতূহলী মানুষের ভিড়। সেখানে তখন সুসজ্জিত নৌকায় বাইচ খেলার তোড়জোড় চলছে। একদিন এই ছোট্ট বন্দরটিতে নোঙর করেই ক্যাপ্টেন হকিন্স্ তার সাম্রাজ্যবাদী অভিযান শুরু করেছিল।

তবে চোখকান দিয়ে স্বাধীনতার যথার্থ মর্মোপলব্ধি করতে পেরেছিল শুধু একটা বিশেষ শ্রেণীর মানুষ। এরা সবাই জেলহাজতে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদী। এদের মধ্যে ফাঁসির আসামীও আছে। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির ফলে এদের দণ্ড মকুব করে দেওয়া হ'ল। ফাঁসির কয়েদীও সাধারণ কয়েদীর মতন সেদিন মুক্ত হ'ল। সারা দেশময় ছড়িয়ে থাকা মিস্টিক ভারতের অগণিত সাধু, সন্ত, ফকিররাও উৎসবের খোলা হাওয়ায় মাতামাতি শুরু করলো। মনে হয়, দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত মন্দিরের রহস্যময় সেই সাদা পায়রা দুটি ব্রাহ্মণের হাত থেকে খাবার নেবার সময়ও মনের আহ্লাদে মুহুর্মুহু ডানার ঝাপট দিয়েছিল, এই খুশীতে। আরও কত আশ্চর্য ঘটনা-ঘটলো সেদিন। মাদুরার বনের মধ্যে সাধুবাবারা গায়ে আংটা বিঁধিয়ে বাঁশের গায়ে ঘুরপাক খেতে খেতে স্বাধীনতা দিবস পালন করলো। যারা দেখছিল তারা দুহাত উপুড় করে তাদের ভিক্ষা দিল।

ভারতের সর্বত্রই এই উৎসব পালনের অনুষ্ঠানগুলো বিষণ্ণ স্মৃতিচারণ হয়ে রইল ইংরেজদের কাছে। তবে উল্লসিত ভারতীয়দের হাতে হেনস্তা হতে হয় নি ইংরেজদের। সম্মানের সঙ্গেই তারা যোগ দিল এইসব অনুষ্ঠানে যদিও অনুষ্ঠান দেখার সময় ব্যথাম্লান হয়ে যাচ্ছিল তাদের মন। শিলং শহরে ইংরেজ কম্যান্ডিং অফিসার নিজেই সরে দাঁড়ালেন এবং তাঁর অধীনস্ত ভারতীয় অফিসারকে প্যারেড পরিচালনা করতে বললেন। একই ঘটনা অন্যত্রও দেখা গেল। ভারত ও ব্রহ্মদেশের সীমান্তে অবস্থিত বিশাল চা-বাগানের সাহেব ম্যানেজার তাঁর ১৫০০ কর্মীদের নিয়ে স্পোর্টস করলেন। অবশ্য কর্মীরা অনেকেই জানলো না কেন এই খুশীর উৎসব : কেনই বা সবেতন ছুটির দিন এটা। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে। সিমলার পুরনো বাসিন্দা মিসেস মড্ পেন্ মন্টেগুর কাছে দিনটা বড়ই বিষাদের। সারাটা দিন ঘরে বসেই শোকদিবস পালন করলেন তিনি। কোন উৎসবেই যোগ দিলেন না। বৃদ্ধা ভারতেই জন্মেছেন এবং ইংল্যাণ্ডে ইস্কুল জীবনের পাঁচটি বছর বাদ দিলে আর কখনও ভারত ছাড়েন নি। সুতরাং ভারত স্বাধীন হবার পর তিনি ইংল্যাণ্ডে ফিরতে চাইলেন না। বললেন, 'ইংল্যাণ্ডে ফিরে কি লাভ ? চায়ের জলটুকুও ফুটিয়ে নেবার মুরোদ আমার নেই।' তাই সিমলায় যখন

www.pathagar.com

স্বাধীনতা উৎসব পালিত হচ্ছে, তোড়জোড় চলছে সাধের ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা নামিয়ে স্বাধীন ভারতের পতাকা তোলার, তখন ঘরে বসে হাউ হাউ করে কাঁদলেন বৃদ্ধা।

পাকিস্তানীদের কাছে ১৫ আগস্ট দিনটা অতীব শুভ দিন। পবিত্র রমজান মাসের শেষ শুক্রবার এই দিনটা। রাষ্ট্রের আনন্দ উৎসবের সংগে রাষ্ট্রপিতার আনন্দোৎসবও পালিত হ'ল সারা দেশময়। সব জায়গায় জিন্নার ছবি টাঙানো হয়েছে এই উপলক্ষে। দোকান, বাজার, ঘর, জানলা সর্বত্রই ঝুলছে কায়েদ-এ-আজামের ছবি। রাস্তার মোড়ে মোড়ে সুদৃশ্য তোরণ সাজানো হয়েছে। পাকিস্তান টাইম্‌স্‌ অভিভূত হয়ে লিখলো যে লাহোরের চিড়িয়াখানার জন্তু জানোয়াররাও কায়েদ-এ-আজমের জন্য শুভেচ্ছা পাঠিয়ে বলেছে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ।' এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা শহরও প্রচারে পিছিয়ে পড়লো না। তাদের দেশে তিনি না এলেও সর্বত্রই তাঁর ছবি ঝলমল করতে লাগলো।

জিন্না নিজেও সর্বাধিনায়কের মতন দিনটা পালন করলেন। পদটা আনুষ্ঠানিক হলেও, সর্বাধিনায়করূপে তিনি ইতিমধ্যেই সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন। সুতরাং লণ্ডন থেকে পাশ করা এই কৃতী আইনজীবী সংসদীয় গণতন্ত্র সম্বন্ধে যতই গালভরা বুলি কপচান না কেন, এখন থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের তিনিই সর্বেসর্বা একনায়ক হয়ে উঠলেন। তবে যত ক্ষমতাবানই তিনি হ'ন, তাঁর অত্যন্ত আপনজনের উপস্থিতি এই মুহূর্তে তাঁর হা-হা শূন্য বুকে শান্তিবারি ছিটিয়ে দিতে পারলো না। সবচেয়ে নিকটতম যে মানুষটিকে কাছে পেলে জিন্নার বুক জুড়িয়ে যেত, সেও তখন করাচি থেকে ৫০০ মাইল দূরে বম্বের কোলাবা মহল্লার একটা সুদৃশ্য ফ্ল্যাটে একাকিনী। দুই পাশাপাশি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস পালন করছে নিঃসংগে। তার ফ্ল্যাটের বারান্দার দুমুখে ঝুললে দুটো রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা। একটা ভারত, একটা পাকিস্তান। এই মুহূর্তে জিন্নার একমাত্র মেয়ে দীনার কাছে দিনটা উভয় সংকটের। শ্যাম না কুল কোনটা রাখবে সে। কোন দেশের অধিবাসিনী সে হবে? তার জন্মের দেশ না বাবার তৈরি সদ্যোজাত এই ইসলামিক রাষ্ট্রের?

শুভ স্বাধীনতা দিবসের পিছনে ওত পেতে থাকা এই ভয়ংকর ট্র্যাজিক নাটকটা সেদিন দীনার মতন আরও অনেক ভারতীয়র মনই দ্বিধাগ্রস্ত করে দেয়। অন্যদের মতন সহজ সরল ভাবে তারা কেউই এই আনন্দে উদ্ভাসিত হতে পারে নি সেদিন। লক্ষ্ণৌ শহরের ইউনিশ কিদোয়াইয়েরও অনুরূপ মানসিক অবস্থা হ'ল। শহরের রাস্তা দিয়ে 'শোর্' তুলে ওরা যখন বিজয়োৎসব করে চলেছে তখন তাঁর মনে পড়ে গেল সেই সব হতভাগ্য মানুষদের কথা, যারা পাঞ্জাবের দাংগায় নিহত আত্মীয়র শোকে নিঃশব্দে কাঁদছে। আর একজন বিধ্বস্ত মানুষ হলেন খুশবন্ত সিং নামে লাহোরের এক শিখ আইনবিদ। দিল্লির রাস্তায় উচ্ছ্বসিত মানুষের ঢল দেখে তিক্ত স্বরে তিনি বলে ফেলেন 'আমার মতন লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে এই আজাদী ঝুটা হয়ে গেছে। পাঞ্জাবকে দুখানা করলো ওরা, আর সর্বস্ব হারালুম আমি।'

www.pathagar.com

পাঞ্জাব, ১৫ আগস্ট ১৯৪৭

স্বাধীনতা দিবসের সকালটা ভারতের অন্যত্র আনন্দমুখর হলেও পাঞ্জাবের বেলায় রীতিমত ভীতিকর চেহারা নিল। ঊষালগ্নে পূব আকাশের প্রধান রঙটা তখন আর গৈরিক নয় ; আকাশ তখন ঘোর রক্তলাল। অমৃতসরের সুপ্রাচীন মুঘল কেল্লার মাথায় দেশের নতুন কর্তাব্যক্তিরা যখন স্বাধীনতা উৎসবের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করছেন, তখন মাত্র এক মাইল দূরে একটা মুসলমান মহল্লায় ঢুকে শিখ দুর্বৃত্তরা বীভৎস কান্ড শুরু করে দিল। শুধু যে পুরুষদের কুপিয়ে মারা হ'ল তাই নয়, ঘরে আগুন লাগিয়ে, ভীতা ত্রস্তা মেয়েদের ধর্ষণ করে তাদের টেনে হিঁচড়ে জবাই করা হ'ল।

শুধু অমৃতসরই নয়। শিখ রাজ্য পাতিয়ালার শিখ দুর্বৃত্তরাও সীমান্ত দিয়ে পালিয়ে যাওয়া মুসলমানদের ধরে বেঁধে হত্যা করতে লাগলো। ওদের চেহারাগুলো তখন ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। এইরকম এক ভয়ংকর দলের সামনাসামনি হয়ে গেলেন পাতিয়ালার মহারাজার ভাই বালিন্দর সিং। তখন ফসল কাটার সময়। ক্ষেতখামার ঘন হয়ে গেছে নতুন শস্যে। বালিন্দার ওদের বললেন, 'এখন ফসল কাটার সময়, কোথায় চলেছ তোমরা ? যাও যাও, নিজের ক্ষেতে যাও।' হাওয়ায় খোলা কৃপাণ ভাসিয়ে ওরা বললো, 'আগে এই ফসলটা কাটি, তারপর ত অন্য ফসল !'

অমৃতসরের লাল ইঁটের স্টেশনটা তখন থিকথিক করছে উদ্বাস্তুদের ভিড়ে। পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা হাজার হাজার হিন্দু রিফিউজিদের আশ্রয় শিবির যেন এই স্টেশন প্ল্যাটফর্ম। ওয়েটিংরুম, টিকিটঘর সর্বত্রই ভনভন করছে মানুষ-মক্ষিকা। ঝাঁক বেঁধে এক একটা জায়গায় ওরা বসেছে আর পাকিস্তান থেকে আগত প্রতিটি ট্রেনের কামরাগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজছে হারিয়ে যাওয়া আত্মীয়-স্বজনদের।

একটু বেলাবেলি এলেন অমৃতসর স্টেশনের স্টেশনমাস্টার চানী সিং। তার হাতে লাল পতাকা আর মাথায় নীল টুপি। কয়েক হাজার হিস্টিরিয়াগ্রস্ত শোকাবিষ্ট উদ্বাস্তুদের মধ্য দিয়ে কোনরকমে তিনি এলেন। আর খানিক পরেই লাহোর থেকে টেন ডাউন এক্সপ্রেস ট্রেনটা এসে পড়বে। চানী সিং জানেন যে, ট্রেনটা এসে পৌঁছলেই কেমন হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে এই অপেক্ষারত মানুষদের মধ্যে। চানী সিং তাই তৈরি হয়েই এসেছেন। বস্তুত প্রায় একই দৃশ্য সব ট্রেনের বেলাতেই দেখা যাচ্ছে। ট্রেন এসে পৌঁছলেই হলুদ রঙের থার্ড ক্লাশ বগিগুলোর দরজা জানলার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে মেয়ে পুরুষ। প্রতিটি কামরায় ঢুকে তন্ন তন্ন করে খুঁজবে তাড়াতাড়িতে ফেলে আসা ছেলেমেয়েদের। তাদের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকাডাকি করবে। না পেলে একে ওকে জড়িয়ে ধরবে। বিকারগ্রস্ত রোগীর মতন দারুণ শোকে আছড়া-আছড়ি করবে। কেউ বা হাউ হাউ করে কাঁদবে। কেউ বা এক কামরা থেকে আর এক কামরায় ছুটোছুটি ক'রে কোন চেনা মুখ খুঁজে বেড়াবে যে তার হারিয়ে যাওয়া আত্মীয়র সন্ধান দিতে পারে। কত

www.pathagar.com

বাচ্চা বেওয়ারিস হয়ে গেছে এই নাড়ানাড়িতে। হাউ হাউ করে তারা কাঁদছে পোঁটলা-পুঁটলির ওপর বসে। কিন্তু এত নৃশংসতার মধ্যেও পৃথিবী নিষ্প্রাণ হয়ে যায় নি। তাই ছন্নছাড়া মানুষের ভিড়ের মধ্যেও সদ্য পোয়াতি মা ছেঁড়া শাড়ির আড়ালে কোলের বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ান।

প্ল্যাটফর্মের মাথায় পৌঁছেই চানী সিং দেখলেন ধক ধক শব্দ করে ইঞ্জিনটা আসছে। হাতের লাল নিশান উঁচিয়ে গাড়িটাকে থামালেন তিনি। কিন্তু ইঞ্জিনটা যখন তাঁকে ছাড়িয়ে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল, তখন কেমন অস্বাভাবিক মনে হ'ল তাঁর। ড্রাইভারের দুপাশে দুজন করে চারজন সশস্ত্র পুলিস দাঁড়িয়ে আছে। হিস্‌হিস্ শব্দ করে স্টিম ছেড়ে ইঞ্জিনটা থেমে যাবার পর চানী সিং দেখলেন, কেমন যেন থমথম করছে সারা ট্রেনখানা। বুঝতে পারলেন, কোথাও ভয়ানক কিছু ঘটেছে।

শুধু চানী সিং নয়, প্ল্যাটফর্মে বসে থাকা অতগুলো মানুষও কেমম যেন হাঁ হয়ে গেছে ট্রেনখানার বীভৎস চেহারা দেখে। পরপর আটখানা বগিরই চেহারা একই রকম। কামরার জানলাগুলো হাট করে খোলা। কিন্তু প্ল্যাটফর্মের ওপর একজনও উদগ্রীব হয়ে নেমে দাঁড়াল না। খোলা জানলায় একখানা মুখও ভেসে উঠলো না। চানী সিং কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন গাড়িখানার অবস্থা দেখে। তাঁর মনে হল তবে কি গাড়ি বোঝাই করে শুধু ভূতপ্রেত পাঠানো হ'ল তাঁর কাছে।

স্টেশনমাস্টারের কাছে ঘটনাটা অভূতপূর্ব। তাঁর মনে হ'ল ব্যাপারটা যাচাই হওয়া দরকার। সুতরাং দরজা খুলে প্রথম কামরায় উঠলেন। কামরায় আলো নেই। প্ল্যাটফর্মের আলোয় অন্ধকারটা সামান্য ফিকে হয়েছে মাত্র। সেই আবছা আলোতেই যা তিনি দেখলেন চক্ষুস্থির হয়ে গেল তাঁর। কামরা ভর্তি শুধু মড়া। সারা মেঝেয় গড়াগড়ি যাচ্ছে মানুষের শব। কারও গলাকাটা, কারও মাথায় খুলি ফেটে চৌচির হয়ে গেছে, বেরিয়ে পড়েছে মলমূত্র নাড়িভুঁড়ি। কামরার সামনের করিডোরে পড়ে আছে কাটা হাত, পা, ধড়। এরই মধ্যে একটা অতি ক্ষীণ আর্ত স্বর কানে এল চানী সিংয়ের। কেউ হয়ত এখনও কোনরকমে জীইয়ে রেখেছে প্রাণটুকু। তাকে আশ্বস্ত করতে চানী সিং চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কোন ভয় নেই ভাইসব। তোমরা অমৃতসরে পোঁছে গেছ। পুলিস আছে আমাদের সংগে। আর কোন ভয় নেই তোমাদের।' আশ্চর্য! চানী সিং দেখলেন তাঁর কথা শুনে কিছু মড়া যেন নড়েচড়ে উঠলো। চানী সিং যেন ভূত দেখার মতন চমকে উঠলেন। উঃ! কী বীভৎস! চিরকাল এই ছবিটা তাঁর মনে দুঃস্বপ্ন হয়ে আঁকা থাকবে। হঠাৎ দেখলেন পাগলীর মতন দেখতে একটি মেয়ে রক্ত জমে যাওয়া কামরার মেঝে থেকে একটা কাটা মুন্ডু কোলে নিয়ে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো। কাটা মাথাটা ওর স্বামীর। শুধু এইটুকুই নয়। চানী সিং স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন মায়ের কাটা ধড়ের সংগে লেপটে আছে শিশু। বোবা চোখে সে চেয়ে আছে। দেখলেন মড়ার স্তূপের ভেতর থেকে হাত পা কাটা শিশুর প্রাণহীন ধড়টা টেনে বার করছে হতভাগ্য বাপ-মা। প্ল্যাটফর্মের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো যখন ঘটনার বীভৎসতা উপলব্ধি করতে পারলো তখন একটা বিকারজ্বর যেন ছড়িয়ে পড়লো তাদের মধ্যে।

স্টেশনমাস্টার চানী সিংও তখন বোবা হয়ে গেছেন। একটার পর একটা

www.pathagar.com

কামরায় ঢুকছেন আর একই ছবি দেখছেন বয়স্ক মানুষটি। শেষ কামরাটা দেখার পর মানুষটা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর মাথা ঘুরতে লাগলো, গা বমি বমি করতে লাগলো। নাকে লেগে আছে বাসী মড়ার পচা গন্ধটা। হতাশ চানী সিং ভাবতে বসলেন, ভগবানের রাজত্বে এমনটা কি ঘটতে পারে আদৌ ? চানী সিং এবার শেষ কামরার পিছনে তাকালেন। খড়ি দিয়ে সেখানে বড় বড় হরফে লেখা আছে, 'নেহরু প্যাটেলের জন্যে স্বাধীনতার উপহার এই রেলগাড়িটা পাঠালাম।' •

যেন স্পর্শমণির ছোঁয়া পেয়েছে কলকাতা। তাই বাস্তবিকই অন্যরকম হয়ে গেছে কলকাতা শহর। প্রার্থনা আর চরকার প্রতিষেধক দিয়েই অবস্থাটা বদলে দিলেন ওই বিস্ময়কর বৃদ্ধ মানুষটি। সেদিন বস্তির মানুষগুলোকেও আর ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে না। অথচ কলকাতার যা অবস্থা ছিল তাতে পাঞ্জাবের চেয়েও বীভৎস হতে পারতো এই শহর। এর একটা আঁচ অবশ্য আগের দিন সন্ধ্যাতেই পাওয়া গিয়েছিল, যখন হায়দারী হাউস পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শান্তি মিছিলটা এসে পেঁছিল। একটা প্রত্যাশা খুঁজে পাওয়া গেল ওই মিলিত শান্তি মিছিলে। একবছর আগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের সেই সর্বনাশা ছবিটা অনেকেই ভুলে যায় নি। সেদিন শহরের রাস্তাঘাটগুলো গাদাগাদি হয়ে ছিল মানুষের মড়ায়। কিন্তু ভোজবাজির মতন সেই অবস্থাটা বদলে গেছে। তাই গান্ধীজীর ব্যক্তিগত সচিব পিয়ারীলাল নায়ার লিখলেন, 'একবছর ধরে জমে থাকা সেই প্রতি-হিংসার কালো মেঘটা সরে গেছে কলকাতার বুক থেকে। ফুটে উঠেছে প্রেমপ্রীতির নির্মল কিরণ। হঠাৎই কলকাতার আকাশ মেঘমুক্ত হয়ে গেল যেন।'

বাস্তবিক তাই। কলকাতার খোলামেলা স্বচ্ছ পরিবেশ সকাল থেকেই টের পাওয়া গেল যখন হায়দারী ভবনে এসে পেঁছিলো যুবতী মেয়েদের মিছিল। ওদের দেখেই একটা 'সাড়াজাগানিয়া' খুশীর আবেশ ছড়িয়ে পড়লো সবার মুখে। গতকালের রাত থেকে গান্ধীজীর দর্শনেচ্ছু হিন্দু-মুসলমানরা জমায়েত হয়েছেন হায়দারী ভবনের সামনে। ওঁরা একবার 'দর্শন' চান গান্ধীজীর যাতে ওই মহৎ মানুষটির মহান সত্তার সংগে একটা আত্মিক যোগাযোগ গড়ে ওঠে। তা গান্ধীজী ওদের নিরাশ করলেন না। প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর জপধ্যান বন্ধ রেখে বারান্দায় এসে সবাইকে 'দর্শন' দিলেন। সারা দিন ধরেই অবিরাম এই তীর্থদর্শন চললো হায়দারী ভবনে।

গান্ধীজী আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, দর্শনেচ্ছু মানুষদের জন্য তিনি কোন অভিনন্দনবাণী দেবেন না কারণ এটা তাঁর কাছে 'শোকের' দিন। তবে সাধারণ মানুষদের জন্য কোন বাণী না দিলেও দেশের নতুন শাসকশ্রেণীর জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবেই একটা উপদেশবাণী তাঁকে দিতে হ'ল সেদিন। সেদিন কয়েক-জন রাজনীতিক নেতা তাঁর আশীর্বাদ চাইতে এসেছিলেন। গান্ধীজী তাঁদের যা বললেন সেটাই তাঁর স্বাধীনতা দিবসের বাণী। গান্ধীজী ওঁদের বললেন, 'তোমরা ক্ষমতার লোভ করো না, কারণ ক্ষমতাই মানুষকে স্বেচ্ছাচারী, দুর্বিনীত করে। ক্ষমতার মোহ আছে, বৈভব আছে। সুতরাং তার হাতছানিতে ভুলো না। মনে রাখবে যে, গরিব মানুষের সেবা করতেই তোমরা ওখানে বসেছ।'

সেদিন বিকালেই আর একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। শাঁখের আওয়াজ শুনেই দলে দলে মানুষ এসে জমা হলো গান্ধীজীর অপরাহ্নিক প্রার্থনাসভায়। প্রায়

www.pathagar.com

হাজার তিরিশ মানুষ জমা হ'ল হায়দারী ভবনের ঘেরা প্রাঙ্গণে যা আগের দিনের সমাবেশের চেয়ে প্রায় তিনগুণ বেশি। গান্ধীজীর সেবাকর্মীরা তাড়াতাড়ি করে কাঠের পাটাতন সাজিয়ে একটা উঁচু মঞ্চ তৈরি করে ফেলেছে তখন। গান্ধীজী ঠিক সময়েই মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানালেন শান্তি বজায় রাখার জন্য। তারপর বললেন যে তাঁর আশা পাঞ্জাবের মানুষও বাংলার এই মহৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে।

গান্ধীজীর সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর শহীদ সুরাবর্দিও ভাষণ দিতে উঠলেন। চব্বিশ ঘণ্টা অনশনের পর সুরাবর্দির মুখচোখ বসে গেছে। চেহারাটাও ঝরে গেছে। সমবেত হিন্দু ও মুসলমান জনতার এই মিলিত শান্তি প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে সুরাবর্দি বললেন, 'জয় হিন্দ্।' তিরিশ হাজার মানুষের সমবেত প্রতিধ্বনি মেঘের ডাকের মতন গর্জে উঠলো বেলেঘাটার আকাশে। তারাও বললো 'জয় হিন্দ্।'

সভা শেষ। এরপর গান্ধীজীর পুরনো শেভ্রলেট গাড়িতে চড়ে দুই নেতা বেরোলেন পথ পরিক্রমায়। সেদিন অবশ্য কলকাতার রাস্তার মোড়ে মোড়ে জোট বাঁধা মানুষ ইঁট পাটকেল ছুঁড়ে তাদের ক্ষোভ জানালো না। বরং মনে হ'ল সবাই উৎসুক হয়ে গান্ধীজীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। গান্ধীজীকে দেখেই ওদের চোখে বন্যার মতন জল গড়িয়ে পড়লো। বৃষ্টির মতন ঝরে পড়লো গোলাপজল আর ফুল। সবাই তখন খুশীতে চীৎকার করে বলছে, 'গান্ধীজী, আপনিই আমাদের রক্ষা করলেন!'

পুণা, ১৫ আগস্ট ১৯৪৭

সেদিন পুণা শহরের একটা ফাঁকা মাঠে স্বাধীনতার যে উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ল তার চরিত্র কিছুটা অন্যরকম। বোম্বাই শহর থেকে ১১৯ মাইল দক্ষিণ-পূর্বের এই শহরটাও স্বাধীনতা উৎসবে পতাকা উত্তোলনের অনুষ্ঠান করলো। কিন্তু পাঁচশ' স্বেচ্ছাসেবীর সামনে পতাকাদণ্ডে যে পতাকাটি তোলা হ'ল তার আদল অন্যরকম এবং স্বাধীন ভারতের পতাকাও নয় সেটা। গাঢ় কমলা রঙের তিনকোণী এই পতাকার মধ্যে জ্বলজ্বল করছে যে প্রতীক, প্রায় তারই অনুরূপ এই স্বস্তিকা প্রতীকটাই একদা প্রায় এক দশক ধরে সারা ইওরোপকে আতংকে খাড়া করে রেখেছিল।

কমলা রঙের পতাকার মধ্যে উজ্জ্বল এই স্বস্তিকা প্রতীক খুবই প্রাচীন। পুণার এই মাঠে যে উদ্দেশে এই পতাকা তোলা হ'ল, ঠিক সেই লক্ষ্য নিয়েই হিটলার এই প্রতীকটি তাঁর থার্ড রীখ্ আমলের (১৯৩৩-৪৫ পর্যন্ত বিস্তৃত নাৎসীযুগ) জঙ্গি নিশানরূপে পরিচিত করিয়েছিলেন। স্বস্তিকা আর্য প্রতীক এবং ভারতে তাঁদের প্রথম অভিযানের সময় আর্যরাই সঙ্গে নিয়ে আসে এই প্রতীকটা। সেই থেকে অর্থাৎ সেই অস্পষ্ট কাল থেকেই সময়ের স্রোতে ভাসতে ভাসতে চলে এসেছে এই প্রতীক এবং যুগে যুগে বিজিতদের বশে রাখার প্রতীকরূপে চিহ্নিত করে। এই পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে সেদিন যারা জড়ো হয়েছে

www.pathagar.com

তারা সবাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের সভ্য। ভারতে আধা ফাসিস্ত আন্দোলনের উদ্যোক্তা এই আর.এস.এস.এস. বাহিনীরই কিছু দলীয় কর্মীর ওপর মাত্র আট-চল্লিশ ঘণ্টা আগেই করাচি শহরে জিন্না ও মাউন্টব্যাটেনকে হত্যার ভার দেওয়া হয়েছিল। এরা সবাই মৌলবাদী হিন্দু এবং এদের একমাত্র অহংকার যে সুপ্রাচীন মহান আর্যদের উত্তরাধিকারী তারা। পাশের রাজ্যের চশমাপরা পয়গম্বরের মতন তাদেরও একটাই আবেগ এবং সেটাই নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছে তারা। দেশভাগ হওয়ায় দারুণ মনোবেদনায় এরা এখন মরিয়া হয়ে গেছে। ফলে মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁর আদর্শের সঙ্গে একপ্রাণ, একমন হবার সুযোগও শেষ হয়ে গেছে তাদের।

তারা যে সঙ্ঘের সভ্য সেই সঙ্ঘের সবাই মনে মনে নতুন ভাবে হিন্দু সাম্রাজ্য গঠনের কথা ভাবে। তারা স্বপ্ন দেখে যেন সিন্ধু নদের অববাহিকা থেকে ব্রহ্মদেশের সীমান্ত এবং তিব্বত থেকে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে হিন্দু-রাজ্য স্থাপিত হয়েছে। জাতীয় নেতা গান্ধীজীর অহিংস নীতি তাদের কাছে আত্মসম্মানহীন এবং কাপুরুষোচিত। তারা মনে করে হিন্দুধর্মের পরম শত্রু তিনি এবং তাঁর এই ক্লীব নীতির জন্যই হিন্দুরা বলহীন, বীর্যহীন। তারা মনে করে এই উপ-মহাদেশে মুসলমানরা বহিরাগত, তারা আক্রমণকারী। বিদেশী অপহারক মুঘলদের বংশধর তারা। তাই সংখ্যালঘু মুসলমানদের কোন ঠাঁই হবে না স্বপ্নের এই হিন্দুরাজ্যে। আর্যদের যথার্থ উত্তরপুরুষ হিন্দুরাই। সুতরাং এই ভূখণ্ডের একমাত্র অধিপতি তারাই।

শুধু এইটুকুই নয়। ভারতের বয়োজ্যেষ্ঠ নেতার বিরুদ্ধে তাদের প্রধান অভিযোগ হ'ল যে দেশভাগ মেনে নিয়ে তিনি অন্যায় করেছেন। এই পাপকর্মের জন্য তারা কোনদিনই গান্ধীজীকে ক্ষমা করবে না। হায় নিয়তি! গান্ধীজীর জীবনের নিষ্ঠুরতম পরিহাস এটাই। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেশভাগের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও অনেকের চোখে আজ তিনিই এর প্রধান স্থপতি।

সমাবেশের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মধ্যবয়স্ক যুবকটির নাম নাথুরাম গড়সে। পেশায় সে সাংবাদিক। বয়স ৩৭ হলেও তার ফোলা ফোলা গাল দুটি দেখে তাকে বেশ যুবক ও সরল মনের মানুষ মনে হয়। নাথুরামের বড়বড় চোখ দুটো অসাধারণ। যখন তাকায় তখন দৃষ্টির মধ্যে একটা দুঃখী অথচ জবরদস্তি ভাব ফুটে ওঠে। এমনকি যখন সে ঘুমিয়ে থাকে তখনও তার মুখের ওপর একটা আলতো কঠোরতা ছড়িয়ে থাকে। মনে হয় যেন এমন কেউ তার পাশে আছে যার গায়ের গন্ধে তার নাকমুখ কুঁচকে গেলেও সেই অপ্রসন্ন ভাবটা প্রকাশ না করে শান্ত মুখেই মেনে নিয়েছে সে।

অবশ্য এখন তার মুখের ভাব মোটেই শান্ত নয়। আজ সকালেই তার সম্পাদিত 'হিন্দু রাষ্ট্র' পত্রিকার প্রথম পাতায় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সে তার রাজনৈতিক মনোভাবটি প্রকাশ করে দিয়েছে। তার 'হিন্দু রাষ্ট্র' পত্রিকার এই সম্পাদকীয় স্তম্ভে আজ কোন রচনা নেই। চারপাশে কালো দাগ টেনে জায়গাটা ফাঁকা রেখে সে আজ শোকপালন করেছে যেন। নাথুরাম তার সমর্থকদের বললো, সারা দেশ জুড়ে যে উৎসব সমারোহ চলছে আসলে তা প্রতারণা। হাজার হাজার হিন্দুর নিধন, মেয়েদের ধর্ষণ ইত্যাদি পশ্বাচারের ঘটনাগুলো আড়াল করে রাখতেই এই প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে নেতারা। সবশেষে হুংকার দিয়ে নাথুরাম বললো

www.pathagar.com

যে এই ভারত ভাগ লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে ঘোর দুর্যোগ নিয়ে আসবে। তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে এর ফলে। সবশেষে সে বললো, 'ভারতবাসীর এই দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী কংগ্রেস দল এবং বিশেষ করে তাদের নেতা গান্ধী।' এরপর ৫০০ সমর্থকদের সংগে নিয়ে হিন্দু সামরিক কায়দায় পতাকা সেলাম করলো নাথুরাম। তারপর আবেগরুদ্ধ স্বরে শপথ নিয়ে বললো, 'ও আমার দেশের মাটি...তোমার কোলে জনম আমার, মরণ তোমার বুকে। সুতরাং এই দেহ তোমাতেই সমর্পণ করলাম।'

দেশমাতার চরণ বন্দনার সময় অন্যদিনের মতন সেদিনও যেন এই পরিণত যুবকের সারা দেহ উদ্ধত আবেগে থরথর করে কেঁপে উঠলো। সারা জীবনে নাথুরাম কখনও সফলতা পায় নি। ইস্কুলের পরীক্ষা থেকে শুরু করে যতরকম জীবিকার সংগে সে যুক্ত হয়েছে সবেতেই অসফল হয়েছে সে। অবশেষে আর.এস.এস.এস. নামক এই চরমপন্থীদের দলের সংগে যুক্ত হ'ল নাথুরাম। সেই থেকে শুরু হ'ল তার নিরলস সাধনা। নিজেকে ভেঙে ভেঙে গড়ে তুললো সে। নিবিড় পাঠ ও অধ্যয়নের মধ্যে সে নিজেকে তৈরি করতে লাগলো। সে বক্তৃতা দিতে শিখলো, রচনা লিখতে শিখলো এবং ধীরে ধীরে প্রথম সারির নেতা হয়ে উঠলো এই চরমপন্থী দলের। হিন্দু জাগৃতির এক প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠেছে নাথুরাম আজ। আত্মবিস্মৃতি থেকে তার উত্থান হয়েছে এখন। এই নতুন ভূমিকায় সে এখন নিজেকে স্পর্ধিত শক্তিরূপে দেখতে পেল। তার ধারণা হ'ল যে এবার ভারতের শুদ্ধি হবে, রাহুমুক্ত হবে এই দেশ এবং জংগি হিন্দুর পুনরুত্থান হবে এবার। এই নতুন ভূমিকায় আর সে হেরে যাবে না। এবার তার জয় হবেই।

নিউ দিল্লি, ১৫ আগস্ট ১৯৪৭

১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট দিনটা যেন মানুষের এক মহামিলনের দিন। তাই অনেক দিন পর্যন্ত স্মৃতিতে অমলিন হয়ে থাকবে এই দিনের অনুষ্ঠান। সত্যই, এ যেন মানুষের এক মহাসমুদ্র। অসংখ্য মানুষের স্রোত চতুর্দিক থেকে আছড়ে পড়েছে এই জায়গাটায়, যেখানে এক নবীন জাতির স্বাধীনতা উৎসবের অনুষ্ঠান হতে চলেছে ঠিক বেলা পাঁচটায়। ইণ্ডিয়া গেটের পাশের খোলা জায়গায় ঠিক এই সময়েই স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলনের অনুষ্ঠান হবে এবং সেই অনুষ্ঠান দেখতেই সমবেত হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। জনস্রোতের মতন তারা আছড়ে পড়েছে ইণ্ডিয়া গেট নামক স্মৃতিতোরণের চারপাশে যেটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহত নব্বুই হাজার ভারতীয় সৈন্যর স্মৃতিতে নিবেদিত হয়েছিল।

বলতে কি, এই বিপুল জনসমাগম কোনভাবেই প্রত্যাশিত ছিল না লুই মাউন্টব্যাটেন কিংবা তাঁর পরামর্শদাতাদের কাছে। এর আগে অনুষ্ঠিত এই ধরনের রাজকীয় অনুষ্ঠানের আড়ম্বর, আয়োজনের ম্যানুয়েল দেখে তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে হাজার তিরিশ মানুষের সমাগম হবে। কিন্তু ব্রিটিশরাজ নামক সাম্রাজ্যবাদী উৎসবের হিসাব খাটো হয়ে গেল মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়ায়। ফলে মাত্র দু-এক হাজার নয় অন্তত পাঁচ লক্ষ বেশি মানুষ যোগ দিলেন এই অনুষ্ঠানে।

www.pathagar.com

অন্তত রাজধানী শহরে এমন জনসমাগম আগে কেউ দেখে নি।

পতাকাদণ্ডের পাশে কাঠের ভারা বেঁধে উঁচু মাচান বানানো হয়েছে। ওই ছোট্ট মঞ্চের চারপাশে দিয়ে প্রবল জলস্রোতের মতন মানুষ জড়ো হয়েছে এখানে। মানুষের সেই মহাসমুদ্রের মধ্যে বক্তৃতামঞ্চটাকে যেন 'দোল খাওয়া ভেলা'র মতন মনে হচ্ছিল। যতরকম কৃত্রিম বেষ্টনী দিয়ে মঞ্চটাকে ঘিরে রাখা হয়েছিল, যেমন ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ড, দর্শকদের গ্যালারি, দড়ির বেড়া ইত্যাদি সবকিছুই ভিড়ের চাপে তছনছ হয়ে গেল। শশব্যস্ত পুলিস প্রহরীরা অসহায় হয়ে চেয়ে রইল শুধু। তখন দড়ির বেড়া ছিঁড়ে গেছে। চেয়ারগুলো পায়ের তলায় মড়মড় শব্দে ভাঙছে। ছাতারপুর গ্রামের রঞ্জিতলালের অবস্থাও সঙ্গিন। তার ধারণা ছিল, স্নানযাত্রার সময় গঙ্গার ঘাটের মেলায় যেমন লোকসমাগম হয়, সেইরকম ভিড় হবে এখানে। কিন্তু এই বিপুল জনস্রোতের মধ্যে তার অবস্থা রীতিমত গুরুতর। ঠাসাঠাসি ভিড়ের চাপে সহজভাবে হাত দুটোও নাড়াতে পারছে না তারা। ফলে ঘর থেকে তৈরি করে আনা চাপাটিগুলোও খেতে পারলো না কেউ।

এলিজাবেথ কলিন্স আর ম্যুরীয়েল ওয়াট্সন্ নামে লেডি মাউন্টব্যাটেনের দুজন সহচরী সেজেগুজে এসে পড়লো পাঁচটার একটু আগেই। অনুষ্ঠানের উপযোগী সাজসজ্জা করে এসেছে মেয়ে দুটি। হাতে পরেছে সাদা দস্তানা, গায়ে চড়িয়েছে সর্বোৎকৃষ্ট কক্‌টেল পোশাক আর মাথায় পরেছে পালক গোঁজা টুপি। হঠাৎ দেখলো উচ্ছল মানুষের স্রোতের টানাটানির মধ্যে পড়ে গেছে তারা। তাদের চারপাশে শুধু মানুষ আর মানুষ। তাদের অনেকেরই গায়ে জামা নেই, রোদে গরমে ঘর্মসিক্ত মানুষের টানাটানির মধ্যে বিপর্যস্ত হয়ে গেল ওই দুটি বিদেশিনী। হাতের সাদা দস্তানা খুলে গেছে, মাথায় পালক গোঁজা টুপি উড়ে গেছে। হঠাৎ তাদের মনে হ'ল যেন শূন্যে ভাসছে তারা। পায়ের তলায় মাটি নেই! সেই অবস্থাতেই মানুষের হাতে হাতে এগিয়ে চললো তারা। কোনরকমে দুই সখী নিজেদের জাপটে ধরে খাড়া হবার চেষ্টা করলো বটে কিন্তু পারলো না। এই প্রথম দারুণ ভয় পেল মেয়ে দুটি। অথচ লেডি মাউন্টবাটেনের সঙ্গিনী হয়ে কত যুদ্ধক্ষেত্রেই এর আগে তারা গেছে। একজন ত বলেই বসলো, 'মানুষের পায়ের চাপে মরবো না তো? ভাগ্যিস ওদের পায়ে জুতো নেই!'

শুধু ওদের নয়, জুতো পরার সংকট প্যামেলারও হ'ল। মাউন্টব্যাটেনের সতেরো বছরের মেয়ে পামেলার অবস্থাও তথৈবচ। দুপাশে বাবার দুজন পার্সোনাল স্টাফ নিয়ে সে তখন প্রবল বিক্রমে সেই মহাসমুদ্র পাড়ি দেবার চেষ্টা করছে। কোনরকমে মঞ্চের কাছাকাছি পৌঁছবার সে কী আপ্রাণ চেষ্টা তার! আর কিছুটা গেলেই তীররূপী মঞ্চ পেয়ে যাবে বেচারী। কিন্তু মাত্র একশ গজের এই দূরত্বটুকুও যেন অনতিক্রম্য হয়ে উঠলো তার কাছে। ওইটুকু জায়গার মধ্যে কয়েক হাজার মানুষ ঠেসাঠেসি করে গায়ে গা লাগিয়ে এমনভাবে বসে আছে যে, নিশ্বাস ফেলার ফাঁকটুকুও ওখানে নেই। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল পামেলা। তার মনে হ'ল এই বাধা সে কিছুতেই পেরোতে পারবে না।

হঠাৎ মঞ্চ থেকে যেন কার ডাক শুনতে পেল সে। ভীত, অসহায় চোখে পামেলা দেখলো মঞ্চের ওপরে দাঁড়িয়ে অসহিষ্ণু নেহরু চীৎকার করছেন। 'অমনভাবে দাঁড়িয়ে থেক না। ওদের টপকে চলে এস!'

অসহায় পামেলাও চিৎকার করে জবাব দিল, 'কি করে? আমার পায়ে যে

www.pathagar.com

হাই হিল জুতো ?'

নেহরুও চেঁচালেন, 'জুতো জোড়া খুলে এস !'

পামেলা ধন্দে পড়লো। তার মনে হ'ল এ কি অদ্ভুত প্রস্তাব দিলেন নেহরু ? এমন মহান ঐতিহাসিক এক অনুষ্ঠানে হাতে জুতো নিয়ে কিছুতেই যেতে পারবে না সে। কিছুতেই নয়। ছিঃ ! এমন করা যায় ? সুতরাং সংগে সংগেই জবাব দিল সে, 'সে আমি পারবো না।'

এরপর সে যা শুনলো তার জন্যে তৈরি ছিল না পামেলা। নেহরু বললেন, 'তাহলে জুতো পরেই ওদের ওপর দিয়ে চলে এস। ওরা কিছু মনে করবে না।'

স্তম্ভিত পামেলা ভাবলো মনে না হ'ক শরীরে ত ব্যথা পাবে ওরা ! ওর পায়ে যে হাই হিল জুতো ! বললোও সে কথা নেহরুকে। নেহরু কিন্তু দমবার পাত্র নন। পামেলাকে ফের বললেন, 'বোকার মতন দাঁড়িয়ে থেক না। জুতো জোড়া খুলে ওদের ওপর দিয়ে চলে এস !'

তবে তাই হ'ক। জুতো জোড়া খুলে হাতে নিল পামেলা। তারপর সসংকোচে জ্যান্ত মানুষের গায়ের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগলো। যেন মানুষের কার্পেট বিছানো আছে তার পায়ের তলায়। টলমল করছে পা দুটো। কখনো এদিকে কখনো ওদিকে হেলে পড়ছে শরীর। তাই দেখে হি হি করে হাসছে সহজ সরল গ্রামের মানুষ। ওদের অনেকেরই গায়ে জামা নেই। পরনের ধুতিখানা হাঁটু পর্যন্ত তোলা। গরমে, রোদে মুখ-চোখ শুকিয়ে গেছে। তবুও এতটুকু বিকার নেই মনে। নির্বিবাদে জুতো হাতে করা পামেলাকে হাত ধরে দরিয়া পার করিয়ে দিল। অবশেষে শেষ হ'ল মানুষের বেড়া। দেহরক্ষীদের ঝলমলে পাগড়ি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মাউন্টব্যাটেনের স্টেজ ক্যারেজের চারপাশে। এবার লোকগুলো পামেলাকে প্রায় পাঁজাকোলা করে ছুঁড়ে দিল দেহরক্ষীদের দিকে। পামেলার মনে হ'ল সাগর থেকে উৎক্ষিপ্ত ঢেউয়ের মতন তাকে ছুঁড়ে দেওয়া হ'ল সামনের দিকে।

রাজশকটের নিরাপদ আশ্রয়ে এসে পড়লো পামেলা। মাউন্টব্যাটেন দম্পতিকে নিয়ে স্টেজ ক্যারেজখানা তখন ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। শকটের চারপাশে জড়ো হয়েছে বিশাল সমাবেশ। এ যেন এক অকল্পনীয় দৃশ্য। মানুষের সেই মহাসমুদ্রের মধ্যে হাজার হাজার মহিলা। কোলে বাচ্চা নিয়ে কেমন নির্ভাবনায় বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে। সে দৃশ্য দেখে শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হ'ল পামেলার। সামনে-পিছনে, আগে-পাশে হাজার হাজার মানুষের ভিড় উত্তরোত্তর বাড়ছে। শংকিত পামেলার মনে হ'ল মায়ের কোল থেকে স্খলিত হয়ে এই বুঝি জনতার পায়ের তলায় দলিত পিষ্ট হবে বাচ্চাগুলো। বোধহয় মায়েদের মনেও এই আশংকা ছিল। তাই এক একবার ভিড়ের ঢেউ আসছে আর মায়েরা কোলের বাচ্চাদের দুহাতে উঁচুতে ছুঁড়ে লুফে নিচ্ছে। আবার ছুঁড়ছে আবার লুফছে। যেন ওরা জীবিত মানুষের বাচ্চা নয়, রবারের বল। পুনঃপুনঃ এই কান্ড দেখতে দেখতে পামেলার দৃষ্টি যেন অসুস্থ হয়ে পড়লো। তার কেবলই মনে হতে লাগলো, 'কি আশ্চর্য ! এ যে দেখছি আকাশ থেকে বাচ্চা বৃষ্টি হচ্ছে !'

স্টেজ ক্যারেজের ওপর দাঁড়িয়ে সস্ত্রীক মাউন্টব্যাটেনও তখন বিহ্বল হয়ে গেছেন এই জনসমুদ্র দেখে। তখনই বুঝতে পারলেন যে এ অবস্থায় পতাকা তোলার সংগে অনুষ্ঠেয় অন্য ক্রিয়াকর্মগুলো সুষ্ঠুভাবে পালন করা অসম্ভব। তিনি নিজেও ক্যারেজ থেকে বেরোতে পারবেন না। সুতরাং আসল কাজটুকুই

www.pathagar.com

সেরে ফেলা যাক আগে। তাই ক্যারেজের ওপর দাঁড়িয়েই নেহরুকে চেঁচিয়ে বললেন, 'এখন শুধু ফ্ল্যাগ তোলাই হ'ক। ব্যাণ্ডম্যানদের অবস্থা তো দেখছেন। ওরা প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে ভিড়ে। গার্ডরাও নড়তে পারবে না।' নেহরুও রাজী হলেন মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাবে। লক্ষ লক্ষ উল্লসিত মানুষ দেখলো পতাকা দণ্ডের ওপর ভারতের স্বাধীন তেরঙা পতাকা ধীরে ধীরে উত্তোলিত হচ্ছে এবং স্টেজ ক্যারেজের ওপর সোজা খাড়া দাঁড়িয়ে সেই পতাকাকে সশ্রদ্ধ স্যালুট করছেন মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্রপৌত্র লর্ড মাউন্টব্যাটেন। ক্রমে লক্ষ মানুষের মাথার ওপর দিয়ে লাঠির মাথায় উঠলো স্বাধীন ভারতের পতাকা। লক্ষ মানুষের সহর্ষ কণ্ঠস্বরে প্রকম্পিত হ'ল রাজধানীর আকাশ। সে এক মহান স্মরণীয় মুহূর্ত, যখন মানুষ ভুলে গেল এই দেশের বেদনাময় অতীতের কথা। সেই পলাশী প্রান্তরের যুদ্ধ, ১৮৫৭ সালের সেই প্রতিহিংসাময় দিনগুলো, অমৃতসরের নারকীয় সেই গণহত্যা। এক মুহূর্তের জন্য ভুলে গেল সামরিক শাসনের অত্যাচার, স্বাধীনতা সংগ্রামী-দের ওপর শাসক ইংরেজের পীড়ন কিংবা লাঠি হাতে পুলিসের তাড়নার কথা। বলতে কি, এই আনন্দিত মুহূর্তটি পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে ওরা যেন তিনটি কঠিন শতাব্দীর বেদনাময় অভিজ্ঞতা একপাশে সরিয়ে রাখলো সেদিন।

শুধু মর্ত্যলোকই নয়, এই উজ্জ্বল মুহূর্তটি স্মরণীয় করে রাখতে স্বর্গ-লোকেও সাজসাজ রব পড়ে গেল সেদিন। যখনই পতাকাদণ্ডের শীর্ষে এসে পেঁছাল পতাকাটা, তখনই সারা আকাশের এপার-ওপার জুড়ে একটা বিশাল রামধনু দেখতে পেল সবাই। আকাশ জোড়া এই সাতরঙা বর্ণালী দেখে সবাই তখন অভিভূত। সবারই মনে হল এই অপার্থিব বস্তুটি যেন শুভ ইঙ্গিত বহন করে নিয়ে এল মহাকাশের ওপার থেকে। যে দেশের মানুষের কাছে আকাশীয় গ্রহনক্ষত্র দুর্জ্ঞেয় ভাগ্যনিয়ন্তা রূপে অভিহিত হয়, যে দেশের মানুষের মন অধিকার করে থাকে নানা অপার্থিব ভাবনাচিন্তায়, সে দেশে এমন আধিদৈবিক ঘটনা এক দারুণ সুলক্ষণ হিসাবে সূচিত হবেই। সবাই ভাবলো যে আকাশে ইন্দ্রধনুর উদয় ঈশ্বরেচ্ছারই প্রতীক। তাদের মনে হ'ল বর্ণালীর সাতরঙ, বেগুনি থেকে লাল রঙের মধ্যেই আছে স্বাধীন ভারতের তিনরঙা জাতীয় পতাকার তিনটি রঙ। সুতরাং আর কিসের ভয় ? তখন অবয়বহীন জনসমাবেশ থেকে উত্থিত হ'ল একটা গম্ভীর অভয়বাণী। হিন্দিতে কে যেন বলে উঠলো, 'আর কিসের ভয় ? ভগবানই ত লক্ষণ দেখিয়ে দিলেন ! আমরা এখন থেকে অজেয়।'

অনুষ্ঠান শেষ। হলুদ সোনারঙের রাজশকটে চড়ে লাটপ্রাসাদে ফিরছেন মাউন্টব্যাটেন দম্পতি। ফেরার সময় আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে পেলেন তাঁরা। লাখ লাখ মানুষের ভিড়ের মধ্যে তাঁদের ছোট্ট স্টেজ ক্যারেজখানা যেন তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্রের মধ্যে মোচার খোলার মতন দোল খাচ্ছে। এক জায়গায় এত মানুষের সমাগম আগে তাঁরা দেখেন নি। খানিক অবাক হয়েই উচ্ছল মানুষ-গুলোর কাণ্ডকারখানা দেখছিলেন তাঁরা। তাকিয়ে থাকতে থাকতে মাউন্টব্যাটেনের মনে হ'ল ব্যাপারটা যেন বড়সড় চড়াইভাতি যেখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনেক মানুষ আমোদ করছে, মজা করছে। হয়ত অবাধ্য মানুষগুলো অনিয়ন্ত্রিত কিন্তু ওদের এই উচ্ছ্বাস এত স্বাভাবিক যে তাঁর হিসাব করা অনুষ্ঠানের আড়ম্বরগুলো এখানে খুবই মেকী মনে হ'ত।

www.pathagar.com

তখন হাজার হাজার মানুষ উর্ধ্ববাহু হয়ে তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। মাউন্টব্যাটেন একবার চেষ্টা করলেন সেই হাতের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সমাবেশের একটা পরিধি মাপতে। কিন্তু পারলেন না। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু হাত আর হাত। এরই মধ্যে উন্দাম জনতা প্রায় পাঁজাকোলা করে নেহরুকে তুলে দিল মাউন্টব্যাটেনের স্টেজ ক্যারেজে। চলতে চলতে অন্তত বার তিনেক তাঁরা টাল খেয়ে যাওয়া তিনজন মহিলাকে শকটের চাকার তলায় পিষ্ট হওয়া থেকে বাঁচালেন। ক্যারেজের ওপর থেকে শরীর ঝুঁকিয়ে টেনে তুললেন তাদের। তারপর রাজা-রানীর সিংহাসনের ওপর তাদের বসতে দেওয়া হ'ল। কালো চামড়ায় মোড়া সিংহাসনে বসে তারা ভারী অবাক। হেলেদুলে চলেছে রাজশকট। আর শকটের ওপর বসানো সিংহাসনে বসে আছে মেয়ে তিনটি। অবাক হয়ে ইতিউতি চাইছে। তাদের চোখের তারায় উপচে পড়েছে রাজ্যের কৌতূহল। তাদের পাশে দাঁড়ানো স্বয়ং ইংরেজ বড়লাট এবং লাটগিন্নী। তাঁরা হা হা করে হাসছেন। আর সাহেব-মেমের হাসি দেখে কৌতুকে ভরে যাচ্ছে মেয়ে তিনটির মুখ। ময়লা শাড়ির আঁচল চাপা দিয়ে ঢেকে রেখেছে তাদের স্নিগ্ধ কৌতুক।

শুধু তাই নয়। এই খুশীর দিনটি লুই ও এডুইনা মাউন্টব্যাটেনের জীবনে এক মধুর স্মৃতি হয়ে রইল এবং উপরি পাওনা হ'ল মানুষের এই সম্মিলিত জয়ধ্বনি। বাস্তবিক এমন স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাস তাঁর আগে আর কোন রাজপুরুষের শোনার সৌভাগ্য হয় নি। মুহুর্মুহু মেঘ গর্জনের মতন মানুষের এই জয়ধ্বনি তখন সারা দিল্লির আকাশ ছেয়ে ফেলেছে যেন। ওরা বারংবার শ্লোগান দিচ্ছে 'মাউন্টব্যাটেন কি জয় !' সদর্পে বলছে তাঁর কীর্তির কথা। এই জয়ধ্বনি এতই স্বাভাবিক যে মনেই হয় না এর মধ্যে কোন ছলনা আছে। ভিড়ের চাপে দোলায়মান শকটের ওপর দাঁড়িয়ে পরম তৃপ্তির সঙ্গে এই স্তুতিবাক্য শুনছেন মাউন্টব্যাটেন। তখন আত্মশ্লাঘায় স্ফীত হচ্ছে তাঁর বুক। এক সময় তাঁর মনে হ'ল ভাগ্যবান তিনি কারণ তাঁর প্রপিতামহী মহারানী ভিক্টোরিয়া কিংবা তাঁর অন্য কোন বংশধর এমনভাবে ভারতের সাধারণ মানুষের আশীর্বাদ পান নি। মাউন্টব্যাটেনের মনে হ'ল সত্যই আজ সংবর্ধিত হলেন তিনি। সত্যই কীর্তিমান তিনি. তাই এমন জয়ধ্বনি পেলেন। অভিভূত মাউন্টব্যাটেন তখন প্রাণভরে সেই জয়ধ্বনি শুনছেন, 'মাউন্টব্যাটেন কি জয় !' 'লং লিভ্ মাউন্টব্যাটেন !'

জনতার উচ্ছ্বাসে দিল্লি যখন তোলপাড়. তখন এখান থেকে প্রায় ছ'হাজার মাইল দূরবর্তী স্কটল্যান্ডের পার্বত্য অঞ্চলের মাঝামাঝি বালমোরালে একটা দারুণ নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেল। বালমোরালের প্রাসাদদুর্গের কোর্টইয়ার্ডের মধ্যে প্রায় নিঃশব্দে একটা গাড়ি ঢুকছিল। গাড়িখানা দেখেই শশব্যস্ত হয়ে ছুটে এল একজন রাজকর্মচারী। গাড়ির মধ্যে বসে থাকা একমাত্র আরোহী ভারত সচিব আর্ল অব লিস্টওয়েল গাড়ি থেকে নামলেন। একটু যেন অন্যমনস্ক তিনি। ছুটে আসা রাজকর্মচারীটি পরম সমাদরের সঙ্গে তাঁকে নিয়ে চললো প্রাসাদের নিভৃত পাঠকক্ষে। সেই নিভৃত স্টাডিরুমে তখন রাজচক্রবর্তী সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ একা বসে আছেন। কিছুটা যেন বিষণ্ণ তিনি। আর্ল অব লিস্টওয়েল ঘরে ঢুকে প্রথমে সম্রাটকে অভিবাদন করলেন। তারপর সবিনয়ে জানালেন যে ভারতের নেতাদের হাতে এইমাত্র ক্ষমতা হস্তান্তরের অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। বিষণ্ণ সম্রাট শুনলেন

www.pathagar.com

সেই সংবাদ। আরও শুনলেন যে এখন থেকে সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ পদাধিকারবলে রেক্স্ ইম্প্যারেটর বা রাজচক্রবর্তী সম্রাট রইলেন না। এখন থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষচ্ছেদ হ'ল এবং উপ-মহাদেশের দুই পাশাপাশি ভূখণ্ডে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হ'ল। তাই ভারত সচিব লিস্টওয়েল এসেছেন প্রথানুসারে সম্রাটের নামাঙ্কিত সীলমোহরগুলি সম্রাটের তত্ত্বাবধানে ফেরত দিতে। কিন্তু এই আনুষ্ঠানিক রীত্যাচারটি তিনি পালন করতে অক্ষম। কারণ ব্রিটিশ ক্রাউনের সংগে ভারত সাম্রাজ্যের যোগসূত্ররূপী ব্যাজগুলি ভারত সচিবের অধিকার থেকেই কয়েক বছর আগে হারিয়ে যায়। সুতরাং ভারত সচিব আর্ল অব লিস্টওয়েল মহামান্য সম্রাট ষষ্ঠ জর্জকে তাঁর বিনম্র অভিবাদন জানানো ছাড়া উপস্থিত আর কিছুই প্রত্যর্পণ করতে পারছেন না।

সন্ধ্যা নেমেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের পায়ের ধুলোয় রাজধানী শহরেও নেমে এসেছে অন্ধকার। তবুও রাস্তায় রাস্তায় উৎসাহী মানুষের ভিড়ের শেষ নেই। লাল কেল্লার পাশের ময়দানে যেন মেলা বসেছে তখন। কোথাও বাজিকর খেলা দেখাচ্ছে, কোথাও বাঁদর নাচ হচ্ছে, কোথাও হচ্ছে কুস্তির লড়াই। আরও কত মজা এখানে ওখানে। মাছির মতন সেই সব মজার সংগে লেপটে আছে মানুষ। তবে দূর দূর গ্রাম থেকে আসা মানুষরা এবার ঘরে ফিরছে। রঞ্জিতও ফিরে যাচ্ছে ওদের সংগে। ফেরার সময় বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে হেঁটেই ফিরছে সে। টাঙ্গাওলা দুটাকা ভাড়া চেয়েছিল ওর কাছে। কিন্তু স্বাধীনতার জন্য এতটা দাম দেবার সামর্থ্য রঞ্জিতের নেই। তাই হেঁটেই ফিরে যাচ্ছে সে।

লাটপ্রাসাদের একটা নিভৃত ঘরে তখন লুই আর এডুইনা ছাড়া অন্য কেউ নেই। দুজনেরই চোখে টলটল করছে আনন্দাশ্রু। ওঁরা আলিংগনাবদ্ধ হলেন। ঝরঝর করে ঝরে পড়লো চোখের জল। অবশেষে তাঁদের জীবনের রথ শেষ করলো পরিক্রমণ। আজ থেকে ঠিক পঁচিশ বছর আগে এই শহরেই তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। আজ তারা সেই প্রথম ভালবাসার বিজয়োৎসব পালন করলেন। তাঁদের জীবনের এ এক দারুণ সাফল্য। এমন মহান উল্লাসের তাঁরাও অংশীদার হলেন। ক'জনাই বা জানে সেকথা! এ্যাডমীর‍্যাল মাউন্টব্যাটেনের জীবনে সাফল্যের স্বাদ আগেও এসেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানী শত্রুসৈন্যের আত্ম-সমর্পণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা তিনি ভুলে যান নি। কিন্তু আজকের এই সাফল্যের স্বাদ অন্যরকম। এ যেন স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ যা তাঁর সমস্ত সত্তা মথিত করেছে, অনুরণিত করেছে। এ যেন যুদ্ধজয়ের উৎসবের উন্মাদনা। যে যুদ্ধে দুপক্ষই জয়ী, কেউ বিজিত নয়।

পরের দিন সকালেই দিল্লি থেকে একজন প্রতিনিধি এসে পেঁছিলেন ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে। প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এ্যাটলী অধীর হয়ে এঁরই অপেক্ষায় ছিলেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের সব খুঁটিনাটি বৃত্তান্ত শুনে ভারী খুশী হলেন মানুষটি। ভারতকে স্বাধীন করার সাধ তাঁর পূর্ণ হ'ল। তবে এতবড় ঘটনায় সারা ব্রিটেনবাসীই খুশী। কত যে শুভেচ্ছাবাণী এসে পেঁছালো তার শেষ নেই। অথচ ছ' মাস আগেও এমন ঘটনা অসম্ভব ছিল তাঁদের কাছে। অন্য কলোনিগুলোয় কী অপশাসন চলছে সারা পৃথিবী তা

www.pathagar.com

দেখছে এখন। ইন্দোনেশীয়ায় ওলন্দাজ সরকার বা ইন্দোচীনে ফরাসী সরকারের ত নাজেহাল অবস্থা। সে তুলনায় ব্রিটেনবাসী ইংরেজরা অনেক প্রাজ্ঞ। একজন বিশিষ্ট ভারতীয় ত বলেই বসলেন সে কথা, 'ইংরেজদের সাহস এবং রাজনৈতিক বিচক্ষণতার প্রশংসা না করে পারি না আমরা।'

কথাটা নেহাত মিথ্যে নয়। কিন্তু তাই বলে স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে উৎসবের বাড়াবাড়িও যেন ব্রিটিশ সরকার না করে। অন্তত সেটুকু সংযম যেন পালন করা হয়। সেদিন ডাউনিং স্ট্রীটের বাগানে বেড়াতে বেড়াতে এ্যাটলীকে সেই কথাটাই বললেন মাউন্টব্যাটেনের প্রাক্তন সচিব জর্জ এ্যাবেল। একথা ঠিক যে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি ব্রিটিশ সরকার এবং সর্বশেষ ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনের কাছে এক মস্ত কীর্তি। কিন্তু এত তাড়াহুড়ো লোক জানাজানি করে যেন বিজয়োৎসব না করা হয়। কেন এই সতর্কতা? এতবড় সাফল্যের উৎসব ব্রিটিশ সরকার পালন করবে না কেন? কারণ একটাই। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি হয়েছে দেশভাগ করে এবং দেশভাগের অব্যবহিত যে প্রতিক্রিয়া তা বড় ভয়াবহ। হয়তো দাঙ্গা আর রক্তপাতের মধ্যে নিমজ্জিত হবে ভারত।

জর্জ এ্যাবেলের কথাগুলো মন দিয়ে শুনলেন এ্যাটলী। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বিষণ্ণ মুখে ঘাড় নাড়লেন তিনি। খানিক পরে এ্যাবেলকে আশ্বস্ত করলেন এ্যাটলী। বললেন, না, ঢোল শহরত করে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হবে না। লোক জানাজানিও করবে না ব্রিটিশ সরকার। ব্রিটিশ সরকারের এই কর্মকীর্তি সংগোপনেই রাখা হবে। এ ব্যাপারে তাঁর মনে কোন বিভ্রম নেই যে, যা তাঁরা অর্জন করেছেন তার উপযুক্ত মূল্য দিতেই হবে তাঁদের এবং বীভৎস রক্তপাতের মধ্যে ভারতকে ফেলে রেখেই সেই দাম তাঁরা দিলেন।

এবার সময় হয়েছে উপহারের বাক্স 'প্যাণ্ডোরাস বক্সটি' খোলার। যতই অপ্রিয় হ'ক এ কাজটি করতেই হবে মাউন্টব্যাটেনকে। এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন মাউন্টব্যাটেন তারপর ধীরে ধীরে ডালা খুলে দুটি মুখবন্ধ ম্যানিলা কাগজের খাম বের করলেন। মাউন্টব্যাটেন জানেন এই খাম দুটির মধ্যে কি উপহার রাখা আছে। দুই পাশাপাশি রাজ্যের দুপ্রস্থ মানচিত্র আর টাইপ করা দশবারো পাতার দুটি রিপোর্ট। এই সরকারী রিপোর্টটিই ব্রিটেনের শেষ দান। প্রথম এলিজাবেথের রাজত্বকালে ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে রয়েল চার্টার সনদ দান থেকে যে কুটুম্বিতা শুরু হয়েছিল তার যবনিকাপাত হ'ল এই ক'টি টাইপ করা পাতা দিয়ে। তবে এর আগে ব্রিটেনের দেওয়া আর কোন সরকারী দানের প্রতিক্রিয়া এমন নির্মম হয় নি যা এখন হতে চলেছে। মাউন্টব্যাটেন অনুমান করতে পারেন যে, খাম দুটি হাতে নিয়ে দুই অর্ধের দুই নেতার কি প্রতিক্রিয়া হবে। বস্তুত, জর্জ এ্যাবেল মারফত এই আশঙ্কার কথাটাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তিনি আগাম জানিয়ে দিয়েছেন।

দুই প্রধানমন্ত্রী নেহরু ও লিয়াকাত আলী খানের হাতে খাম দুটি তুলে দিলেন মাউন্টব্যাটেন। তারপর ঘন্টা দুই পরে তাঁর সঙ্গে একত্রে আলাপ করতে বললেন ওঁদের। কিন্তু দু ঘন্টা বাদে ও'রা যখন আলোচনাসভায় বসলেন তখন দুজনেই সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। চাপা ক্ষোভের আঁচে গনগন করছে দুজনের মুখ। চোখের কোণে দুই নেতার রক্তবর্ণ মুখ দুটি এক নজর দেখেই

www.pathagar.com

মাউন্টব্যাটেন অন্তত একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলেন। তিনি নিঃসন্দেহ হলেন যে সততা ও নিরপেক্ষতার সংগেই এই কৃতজ্ঞতাহীন কাজটা করতে পেরেছেন স্যর সিরিল র‍্যাডক্লিফ। গোপনে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন তিনি। তারপর সকৌতুকে তাকালেন দুই ক্ষুব্ধ নেতার দিকে। দুজনেরই আর তর সইছিল না। টেবিলে বসেই দুজনে যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁর ওপর। বাইরে তখন ভারতের স্বাধীনতা উৎসব সবে শেষ হয়েছে।

হ্যাঁ, স্যর সিরিল র‍্যাড্‌ক্লিফ অক্ষরে অক্ষরে সরকারী নির্দেশ পালন করেছেন। অবিভক্ত ভারতের মানচিত্রের বুকের ওপর তার হাতের ধারাল ছুরিটা এমনভাবে চালিয়েছেন যাতে সংখ্যাগুরুদের ধর্মীয় আবেগটি একটুও ক্ষুন্ন না হয়। সুতরাং যা আশা করা গিয়েছিল তার অন্যথা হ'ল না পাঞ্জাব বা বঙ্গভঙ্গের বেলায়। তবে তত্ত্ব বা নীতির দিক থেকে তাঁর এই বিধান নির্ভুল হলেও বাস্তব প্রয়োগের বেলায় এই নীতিটা সর্বনেশে হয়ে দাঁড়াল।

ধরা যাক বাংলার কথাই। র‍্যাড্‌ক্লিফের বিধান এমন হ'ল যার ফলে বিভক্ত দুই অংশই অর্থনৈতিকভাবে একে অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে দাঁড়ালো। বিশ্বের শতকরা পঁচাশি ভাগ উৎপন্ন কাঁচা পাটের দখলিকার হওয়া সত্ত্বেও অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা থাকলো না পূর্ব পাকিস্তানের। অন্যদিকে শতাধিক পাটকলের স্বত্বাধিকারী হয়েও কলকাতা বন্দর থেকে এক ছটাক শোধিত পাট রপ্তানির ব্যবস্থা থাকলো না।

অবশ্য পাঞ্জাবের সীমানারেখা নিয়েই র‍্যাড্‌ক্লিফের মনোযন্ত্রণা সবচেয়ে বেশি ছিল। এই সীমানারেখা টানা হয়েছে কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের সীমান্ত বরাবর দুর্গম অরণ্যানীর মধ্য দিয়ে যেখানে উজ্ নদী পাঞ্জাবে প্রবেশ করেছে। অতঃপর যতখানি সম্ভব রবি (ইরাবতী) ও শতদ্রু নদী দুটি অনুসরণ করেছে এই সীমানারেখা। এইভাবে অন্যূন ২০০ মাইল দক্ষিণে নেমে বিশাল থর মরুভূমির উত্তরভাগের প্রান্ত ছুঁয়ে গেছে এই সীমানারেখা। এইভাবে বিভক্ত হওয়ায় লাহোর পেল পাকিস্তান এবং বিখ্যাত স্বর্ণমন্দিরের শহর অমৃতসর পেল ভারত।

মোট কথা, গোড়া থেকেই যেটি নিন্দিত হয়েছে সেটাই যেন প্রতিফলিত হ'ল র‍্যাড্‌ক্লিফের টানা সীমানারেখায়। এই উপ-মহাদেশের ঘনসন্নিবদ্ধ সামরিক শিখ জাতি তাদের জমিজমা, ঘরবাড়ি এবং আত্মীয়স্বজন সমেত ভাগ হয়ে গেল এর দরুন এবং এতবড় ট্র্যাজিক নাটকের প্রধান কুশীলব হ'ল ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ, অপমানিত শিখরা।

র‍্যাড্‌ক্লিফ অ্যাওয়ার্ডের যেটি প্রধান বিতর্কিত বিষয় সেই জনগরিষ্ঠ নীতি বা মেজরিটি পপুলেশন প্রিন্সিপল অন্তত একটা ক্ষেত্রে লঙ্ঘিত হয়েছিল। পাঞ্জাবের উত্তর সীমান্তের ছোট, নোংরা শহর গুরুদাসপুরের বেলায় এই নীতি মানা হয় নি। এ ক্ষেত্রে ইরাবতীর স্বাভাবিক প্রবাহপথটিই এর সীমারেখা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে গুরুদাসপুর বা তাকে ঘিরে থাকা মুসলমান অধ্যুষিত গ্রামগুলো ভারতের মধ্যেই থেকে গেল। র‍্যাড্‌ক্লিফ বিচক্ষণতার সংগেই এই ব্যতিক্রমটি ঘটিয়েছিলেন কারণ, জনগরিষ্ঠ নীতি মেনে সীমান্তরেখা টানলে ভারতের সীমানার মধ্যে একটা পাকিস্তানী ঘাঁটি তৈরি করা হ'ত। মোটকথা, র‍্যাড্‌ক্লিফের এই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তটা পাকিস্তানী নেতাদের মোটেই মনঃপূত হয় নি। তাই লক্ষ লক্ষ

www.pathagar.com

পাকিস্তানী নাগরিক কোনদিনই র‍্যাড্‌ক্লিফকে ক্ষমা করবে না। কারণ, গুরুদাসপুর পেলে একটা নোংরা অপরিণত শহর নয়, জিন্নার পাকিস্তান পেয়ে যেত স্বর্গের সিঁড়িটাই। যে রূপসী কাশ্মীরের জন্য স্বয়ং সম্রাট জাহাঙ্গীর সারা জীবনটাই হেদিয়ে গেলেন এবং মরবার সময়ও দুঃখে বেদনায় 'হা কাশ্মীর জো কাশ্মীর' বলে চোখের জল ফেললেন, সেই সুন্দরী কাশ্মীর উপত্যকা হামেশার জন্য পাকিস্তানের হাতধরা হয়ে থাকতো। অন্যদিকে ভারতের কাছেও এই অন্তর্ভুক্তি রাজনৈতিকভাবে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, গুরুদাসপুর ছাড়া কাশ্মীরের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কও করা যেত না। অন্যতম প্রবেশপথ গুরুদাসপুর যদি ভারতের অন্তর্ভুক্ত না হ'ত, তবে কাশ্মীরের খেয়ালী রাজা হরি সিং কবেই পাকিস্তানের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতেন। তাই বলা যায়, অন্তত একটা ক্ষেত্রে র‍্যাড্‌ক্লিফের এ্যাওয়ার্ড কাশ্মীরকে হাতে রাখার ভারতীয় দাবিটা চিরকালের মতন জীইয়ে রেখেছে।

এই উপ-মহাদেশ সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না বলেই তাঁকে বাছা হয়েছিল দেশভাগের দুরূহ কাজে। সে কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এখন তাঁর ঘরে ফেরার পালা। কিন্তু মানুষটি আজ বড় বিষণ্ণ। বিমানের জানলায় চোখ রেখে বসে আছেন। দুচোখ ভরে এই বিস্ময়কর দেশটার রূপৈশ্বর্য দেখছেন। আপনারা জানেন এঁর পরিচয়; স্যার সিরিল র‍্যাড্‌ক্লিফ। আর খানিক পরেই তাঁর বিমান ছাড়বে। নিরাপত্তাকর্মীরা চোখে চোখে রেখেছেন তাঁকে। খানিক আগে তার আই.সি.এস. সহকারী তন্ন তন্ন করে তালাসী করে গেছে সারা বিমান। না, কোন চোরাগোপ্তা আক্রমণের আশঙ্কা নেই জেনে বিমান ছাড়া হ'ল। নিবিড় আত্মচিন্তায় ডুবে থাকা খ্যাতনামা ইংরেজ জুরিস্ট আবিষ্ট হয়ে চেয়ে রইলেন দ্রুত পিছনে সরে যাওয়া দিগন্ত জোড়া আখ আর গম খেতের দিকে। পাঞ্জাবের এই ভূখণ্ডের ওপর দিয়েই নির্মমভাবে পেন্সিলের দাগ টেনে চিরকালের মতন দুইভাগ আলাদা করেছেন তিনি।

র‍্যাড্‌ক্লিফ ভাল করেই জানেন যে তাঁর টানা এই দাগটাই লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে কী মর্মান্তিক দুঃখ-বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওদের চোখের জলে ভিজে গেছে এখানকার শক্ত রুক্ষ মাটি। কিন্তু আর কী করতে পারতেন তিনি? ওরা মোটেই জানে না যে যেখান দিয়েই দাগ টানা হ'ক না কেন, ওদের দুঃখের উপশম হ'ত না। এদেশে তাঁকে ডেকে আনার অনেক আগে থেকেই ট্র্যাজেডির উপকরণগুলো পাঞ্জাবের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। সুতরাং যে রায় তিনি দিন না কেন, তারই অনিবার্য পরিণতি হ'ত দাঙ্গা আর রক্তপাত। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে তা ঘটতো। যেমন এক ঋতুর পর আর এক ঋতু আসে, তেমনি স্বাভাবিকভাবেই এই রক্তপাতের দিন ঘনিয়ে আসবে পাঞ্জাবের বুকে এবং শেষমেশ তিনিই হবেন এর কারণ।

ভারত ছাড়ার আগে পুরনো দিল্লির বাজার থেকে তিনি এক জোড়া গালচে কিনেছেন অভিজ্ঞান হিসেবে। সঙ্গে নিয়ে চলেছেন যাতে দেশটার কথা তাঁর মনে পড়ে। কিন্তু এই বাহ্য স্মারকটা ছাড়াও আর একটা অভিজ্ঞান নিয়ে যাচ্ছেন তিনি। এটা তাঁর স্মৃতি। তাঁর বেশ মনে পড়ে কাজটা হাতে নেবার সময় জিন্না এবং নেহরু উভয়েই তাঁকে 'জবান' দিয়েছিলেন যে, ভালমন্দ যাই-ই ঘটুক, তাঁর

www.pathagar.com

বিচারটাই তাঁরা মেনে নেবেন। কিন্তু ওঁরা কেউ কথা রাখেন নি। যেখানে ও'দের মনঃপূত হয় নি সেখানে তড়িঘড়ি ছুটে গেছেন এবং এমন কিছু অশোভন আচরণ করেছেন যা তাঁকে হেয় করেছে। হায়, ভবিতব্য! তাঁর লণ্ডনে ফেরার দিন কয়েক পরের কথা। যে ল' চেম্বার থেকে ভারতভাগের দুরূহ কাজ হাতে নিয়ে তিনি যাত্রা করেছিলেন, সেই চেম্বারে বসেই সম্পূর্ণ মোহমুক্ত র‍্যাডক্লিফ একটা অসাধারণ ঋজু মানসিকতা দেখালেন পারিশ্রমিক হিসাবে পাওয়া ২০০০ পাউণ্ডের চেকটা ফেরত দিয়ে। ওই দুজন ভারতীয় নেতার অশিষ্ট ব্যবহারের যোগ্য জবাব দিতে এইটুকু ঔদ্ধত্য দেখানো ছাড়া সেদিন আর কী-ই বা করার ছিল তাঁর!

র‍্যাডক্লিফ যখন বিমানযাত্রা করেছেন তখন তাঁর চোখের আড়ালে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে এই শতাব্দীর সবচেয়ে নিষ্ঠুর অভিপ্রয়াণ। লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা মানুষের এই দেশান্তর গমন কী করুণ আর মর্মান্তিক! ইতিহাসের বৃহত্তম এই মহাযাত্রা যেন আসন্ন ঝড়ের পূর্বসূচনা। বিন্দু বিন্দু জলক্ষরণের মতন একটু একটু করে অসহায় মানুষ জড়ো হচ্ছিল ক'দিন ধরেই। তারপর মাথায় জীবন-যাপনের সামান্য পুঁজিপাটা নিয়ে তারা পথচলা শুরু করলো অলিগলি বেয়ে। পথ কোথাও দুর্গম, কোথাও শুধু চরণচিহ্ন, কখনও বা ধুধু অনাবাদী জমি পেরিয়ে যেতে হচ্ছে মাইলের পর মাইল। র‍্যাডক্লিফের প্রতিবেদনটা আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জানাজানি হয়ে যাবে। না জানি, তখন কি চেহারা নেবে মানুষের ক্ষোভ! পাকিস্তান গড়া নিয়ে যে সব মুসলমান গ্রামের মধ্যে দাপাদাপি, নাচানাচি করেছে, তারা যখন জানবে যে তাদের গ্রামটা পড়েছে হিন্দু ভারতের মধ্যে তখন তাদের মনের অবস্থা কি হবে বোঝাই যায়। একই রকম মর্মান্তিক অবস্থা হবে শিখদেরও যখন তারা জানবে যে ভারত নয় পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাদের গ্রাম। তখন সাহেবের টানা নিয়ন্ত্রণরেখার ওপারে যেতে হবে তাদের ঘরবাড়ি খেতখামার ছেড়ে।

রিপোর্টটা বেরোনোর পর একের পর এক আরও অনেক গরমিল দেখা দিতে লাগলো। এগুলোর কোনটাই অদৃষ্টপূর্ব নয়। অহেতুক তাড়াহুড়ার এই কুফল সম্বন্ধে আগেই সতর্ক করেছিলেন র‍্যাডক্লিফ। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী! ফলে যা আশংকা করা হয়েছিল সেটাই ঘটলো। কোথাও দেখা গেল সেচনালা যে অংশে পড়েছে, তার জলরোধী বাঁধ পড়েছে আর এক অংশে। কোথাও এই ভাগরেখা এমনভাবে একটা গ্রামের বুক চিরে গেছে যে তার অর্ধেক কুটীর ঘর পড়েছে ভারতের দিকে, অর্ধেক পড়েছে পাকিস্তানে। কোথাও বা এই ভাগরেখা হাস্যকরভাবে একখানা কুটীরকে এমনভাবে ভাগ করেছে যে তার সদর তার খিড়কি পড়েছে দুটো আলাদা দেশে। বিচিত্র এই ভাগাভাগির ফলে পাঞ্জাবের সব ক'টা কয়েদখানা পড়লো পাকিস্তানের মধ্যে। এমনকি সারা পাঞ্জাবে যে একটি মাত্র উন্মাদাশ্রম ছিল তাও দায়িত্ব পেল পাকিস্তান।

১৫ আগস্টের সকাল থেকে সেই উন্মাদাশ্রমের শিখ ও হিন্দু আবাসিকরা কেমন যেন স্বাভাবিক আচরণ করতে লাগলো কর্তৃপক্ষের সামনে। তারা কর্তৃপক্ষের হাতে পায়ে ধরে ভারতে ফেরত আসতে চাইলো। কিন্তু এই অদ্ভুত আবদার কেন ওদের? ওদের কি ধারণা যে মুসলমানরা ওদের জবাই করবে? হয়ত তাই কিন্তু এ ত পাগলের প্রলাপ? কর্তৃপক্ষ অনেক বেশি ধাতস্থ ওদের চেয়ে। তাঁরা জানেন যে ওদের এই ভয় 'অমূলক।' তাই ওদের আশ্বস্ত করলেন সেই কথা বলে।

www.pathagar.com

কিন্তু 'অমূলক' কোনটা? পাগলদের ভয় না দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন ডাক্তারদের আশ্বাস? তার বিচার ইতিহাসই করেছে।

'ওরা আর মানুষ নেই'

পাঞ্জাব, আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭

মানুষের এই নিষ্ঠুর আচরণের জুড়ি নেই, ইতিহাসেও নজির নেই এই নিষ্ঠুরতার। সম্পূর্ণ অকারণ বন্যতার যেন বিবশ হয়ে গেছে মানুষ। দুটো সপ্তাহ ধরে এই বন্যতা অব্যাহত রইল। বিচারহীন, বুদ্ধিহীন একটা স্থূল নগ্ন পাশববৃত্তি। খুনের একটা ঝোড়ো হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে গেল সারা উত্তরভারত। খুনের একটা বাতিক যেন পেয়ে বসেছে মানুষকে। কেন? কাকে? এ প্রশ্ন তখন অবান্তর। আসল কথা খুন। মধ্যযুগে যেমন ব্যাধি মহামারীর প্রকোপে ছারখার হ'ত পৃথিবী, ঠিক সেইরকম অবরোধহীন একটা বন্যতায় মাতাল হ'ল মানুষ। সংক্রামক রোগ-ব্যাধির জীবাণুর মতন খুনের ব্যাধি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। দেখতে দেখতে এই বিষে জরজর হয়ে গেল সবাই। তখন যেখানে সেখানে মানুষ মরছে। আঁদাড়-পাঁদাড়, অলিগলি কোথাও এর নিস্তার নেই। সারা উত্তরভারতটা একটা কসাইখানায় পরিণত হ'ল যেন, আর প্রায় অর্ধেক ভারতীয় সাবাড় হয়ে গেল সেই চকিত বন্য হিড়িকে। চার বছর ধরে লড়াই করে যত মার্কিন সেনা গত বিশ্ব-যুদ্ধে মরেছিল মাত্র দেড়মাসের মধ্যে তার অর্ধেক মানুষ এখানে নিঃশেষ হ'ল।

ব্যাপারটা সত্যিই যেন এক কাণ্ডজ্ঞানহীন অবস্থায় তখন পৌঁছে গেছে। বুদ্ধিভ্রংশ হলে যেমনটি হয় ঠিক সেইরকম আচরণ করছে মানুষ। অনেকে মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে অল্প কয়েকজনের ওপর। সশস্ত্র হয়ে চড়াও হচ্ছে নিরীহ, নিরস্ত্রের ওপর। নয়াদিল্লির অভিজাত ঔরংগজেব রোড থেকে শুরু করে পুরনো দিল্লি চাঁদনিচক পর্যন্ত সর্বত্রই এক ছবি। অমৃতসরের ঘিঞ্জিমহল্লা বা লাহোরের বড়লোক পাড়া, রাওয়ালপিণ্ডির বাজার এলাকা অথবা পাঁচিল ঘেরা পেশোয়ার শহর, সর্বত্রই দাপটের সংগে নিরীহ মানুষকে খুন করতে লাগলো সবল মানুষ। গরিব হিন্দু বা মুসলমান জনতা ইঁদুরের মতন বধ হতে লাগলো ধনী মুসলমান বা হিন্দুর হাতে। দোকান, বাজার, কুঁড়ে; পাকাবাড়ি; বড়রাস্তা; এঁদো গলি, কলকারখানা, খেতখামার, রেলইস্টিশন এতকাল যেখানে নির্বিবাদে পাশাপাশি বাস করেছে তারা, সর্বত্রই অমানুষিক হিংস্রতায় একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কী জঘন্য ঘৃণায় ওদের মুখচোখ বিকৃত! অথচ বহিঃশত্রুর সংগে এটা কোন যুদ্ধ নয়, এমন কি গৃহযুদ্ধ বা সরকারের বিরুদ্ধে গেরিলা লড়াইও নয় এটা। একটা দারুণ নাড়া খেয়ে সারা সমাজ-কাঠামোটাই নড়বড়ে হয়ে গেছে তখন। উত্তেজনা ছড়াচ্ছে একটা থেকে আর একটায়। একটা খুন আরেকটা খুনকে প্ররোচিত করছে, একটা হত্যা নিমন্ত্রণ করছে আর একটাকে, একটা নৃশংসতার অন্ধ নকল করছে আর একটা, যতক্ষণ না এই বিস্ফোরণের ধাক্কায় পাঞ্জাবী সমাজের ইমারতখানা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে।

তবে সমাজদেহের এই ক্ষয় কোন অকারণ আকস্মিকতা নয়। ভারত ও পাকিস্তান যেন দুই যমজ সন্তান এবং এক গর্ভে জাত এই দুই যমজসন্তান যেন

www.pathagar.com

পাঞ্জাব নামক একটা দুষ্ট টিউমার দিয়ে জোড়া ছিল। স্যর সিরিল র‍্যাডক্লিফ তাঁর হাতের স্ক্যালপল দিয়ে সেই দুষ্ট টিউমারটি কেটে দিয়েছেন। ফলে বিচ্ছিন্ন হয়েছে দুটি শিশুরাষ্ট্র। কিন্তু ক্ষতিকর ক্যানসার রোগের জীবাণুমুক্ত হয় নি তারা। ক্যানসার রোগের বিষাক্ত সেলগুলো দুদিকেই ছড়িয়ে পড়েছে এখন। দুদিকের মানুষই এ ব্যাধির সংক্রমণে পীড়িত হয়ে পড়েছে। একদিকে পঞ্চাশ লক্ষ শিখ ও হিন্দু অন্যদিকে পঞ্চাশ লক্ষ মুসলমানের ভাগ্য ঝুলছে একটা পলকা সুতোয়। জিন্না এবং মুসলিম লীগ নেতাদের মতলববাজি বাক্যচ্ছটায় পাকিস্তানের অধিবাসীরা প্রায় ধরেই নিয়েছিল যে, তাদের ঈপ্সিত দেশের মাটিতে তারাই রাজা। দেশ ভাগাভাগির সবটুকু 'ফায়দা' তারাই লুটে নেবে। শিখ ও হিন্দুর ঘরবাড়ি, জমিজমা, ব্যবসাপত্তর, মহাজনী কারবারের মালিক হয়ে যাবে তারাই। কিন্তু কার্যত বিপরীত হয়ে গেল ছবিটা। তারা দেখলো শিখ বা হিন্দুমহাজন, জমিদাররা দিব্যি ঘরসংসার করছে তাদের দেশে বসে। জমিদার খাজনা নিচ্ছে, মহাজন সুদ চাইছে, এমনকি দোকান-পসার ছেড়ে একজন হিন্দু বা শিখও ওদের দেশ থেকে চলে যায় নি। ব্যাপারটা যেন ওদের কাছে যথেষ্ট গোলমেলে মনে হতে লাগলো ধীরে ধীরে। দেশটা যদি ওদের হয় তাহলে ঘরদোর, জমিজমা, দোকান-পসারের মালিক তারা হবে না কেন? অন্যদিকে শিখরাও তাদের অংশ থেকে মুসলমানদের খেদিয়ে সেই পরিত্যক্ত ঘরবাড়ি খেতখামারে পাকিস্তান থেকে তাড়া খাওয়া শিখদের পুনর্বাসনের ফিকির খুঁজতে লাগলো।

ফলে যা স্বাভাবিক পরিণতি তাই ঘটলো। উন্মত্ত হিংস্র হ'ল তিন সম্প্রদায়ের মানুষই। তারপর নিষ্ঠুর প্রতিহিংসায় পরস্পরের ওপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো। ভারত নামে দেশটা চিরকালই ফেলাছড়ার দেশ। এই প্রাচুর্যের দেশে অপচয়ের মাত্রাটাও অনেক। তাই এই দেশে যখন গণহত্যা শুরু হলো তখন এই ফেলাছড়ার ট্র্যাডিশন বজায় রেখেই হাজারে হাজারে মানুষ খুন হতে লাগলো। মানুষের হাহাকার আর চোখের জলেরও অভাব হ'ল না এই প্রাচুর্যের দেশে। এই মানব-নিধন যজ্ঞে যে কত মানুষ বলি হ'ল, কত রক্ত ঝরলো তার লেখাজোখা নেই। আর মানুষ মারার ধারাটাও নেহাতই সাবেকপন্থী। ইওরোপে ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করা হয়। ঘুমন্ত শহরের ওপর বোমা ফেলে কিংবা হাসতে হাসতে গ্যাসচেম্বারে ঢুকিয়ে গণহত্যা করা হয় সেখানে। কিন্তু প্রাচীনতম এই দেশে হত্যার কলাকৌশলটা প্রাগৈতিহাসিক। বিজ্ঞান বা কারিগরি নিপুণতার কেরামতি নেই। হাতের কাছে যা আছে, পাকা বাঁশ, হকি স্টিক, হামানদিস্তার ডাঁটি, লোহার হাতুড়ি, পেন্সিলকাটা ছুরি, কৃপাণ, বাঘনখ যা পাওয়া যায় তাই দিয়েই মানুষ খুন হয় এদেশে। পাঞ্জাবেও এর ব্যতিক্রম হ'ল না। পরিকল্পনাহীন একটা জান্তব প্রবৃত্তির বশে পাঞ্জাবের মানুষ নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি শুরু করে দিল। হঠাৎ যে এইরকম এক নির্বোধ, কাণ্ডজ্ঞানহীন আবেগে ডুবে যাবে মানুষ, নেতারা বোধহয় তা ভাবেন নি। তাই এই বিপুল উৎকট প্রবৃত্তির নিরেট স্থূল চেহারাটা দেখে নেতারা সত্যিই প্রমাদ গনলেন। তাঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এর রাশ টেনে ধরতে। কিন্তু তখন লাগামহীন হয়ে গেছে মানুষের আবেগ। নরম নরম মিষ্টি মিষ্টি শান্তির বাণী তারা শুনলো না। ব্যর্থ পরিহাসের মতন সেগুলো ফিরে এল নেতাদের কাছে, কারণ সারা দেশ থেকে তখন বিবেকবোধ হারিয়ে গেছে। দেশটা পরিণত হয়েছে বিবেকবুদ্ধিহীন জড়পদার্থে।

www.pathagar.com

গোর্খাবাহিনীর ক্যাপ্টেন আর. ই. এ্যাটকীনস্ তাঁর পায়ের দিকে চেয়েই আঁতকে উঠলেন। কাব্য সাহিত্যে উপমা অলংকারের কথা তিনি শুনেছেন, যদিও এসব তাঁর কাছে অতিরঞ্জন মনে হয়েছে চিরকাল। কিন্তু সেদিন চাক্ষুস যা দেখলেন তা আর অত্যুক্তি মনে হ'ল না তাঁর। লাহোরের জলনিকাশী খোলা নালাগুলো যেন রক্তের নদী হয়ে গেছে। প্রাচ্যের প্যারিস এই লাহোর শহরের এ কি ভয়ঙ্কর চেহারা হয়েছে? বিষণ্ণ জনহীন এক ধ্বংসস্তূপ যেন! মুসলমান পুলিসের চোখের সামনেই দাউ দাউ করে জ্বলছে হিন্দু পাড়ার বাড়িগুলো। রাতের অন্ধকারে কোথায়, যেন লুটেরার দল হিন্দু বাড়িতে ঢুকে লুটপাট করছে। এ্যাটকীনস্-এর সদর দপ্তরে তখন কয়েকশ' হিন্দু ব্যবসায়ী তাঁকে ছেঁকে ধরেছে। যে কোন দামে এই নরকপুরী লাহোর থেকে তাদের নিরাপদে সীমান্ত পার করিয়ে দেবার ব্যবস্থা তিনি করুন। পঁচিশ, তিরিশ, পঞ্চাশ হাজার টাকা, তাদের মেয়ে বউয়ের গায়ের যাবতীয় গহনা সাহেবের পায়ের গোড়ায় ঢেলে দিতে তারা প্রস্তুত।

অমৃতসরের অবস্থাও একই রকম। শহরের সব চেয়ে ঘনবসতি মুসলমান এলাকার একখানা পাকা বাড়িও আস্ত নেই। অতবড় অঞ্চলটা ধু ধু শূন্য। ভাঙা ইটকাঠ ছড়ানো মাঠ মরুভূমির মতন পড়ে আছে শহরটা। মাথার ওপর শকুনের দল পাক দিচ্ছে। বাড়ির ভাঙা দেওয়ালের আড়ালে পড়ে থাকা মড়ার দিকে চোখ রেখে তারা ঘুরছে। আগুনে পোড়া মড়ার কটু গন্ধ বাতাসে ভর করে সারা শহরে ভেসে বেড়াচ্ছে। সারা পাঞ্জাবের সর্বত্রই একই চেহারা। তবে লায়ালপুরের অমানুষিক বর্বরতা যেন লাহোরকেও হার মানিয়ে দেয়। একটা সুতোকলের মুসলমান মজদুররা তাদের সহকর্মী প্রতিটি শিখ মজদুরকে জবাই করে সেচনালার জলে ভাসিয়ে দিল। চোখের সামনে এই প্রায় অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে ক্যাপ্টেন এ্যাটকীনস্ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কয়েক হাজার শিখ ও হিন্দুর কাটা লাশের রক্তে অতবড় সেচনালার জল টকটকে লাল হয়ে গিয়েছিল তখন।

সিমলার অবস্থাও একই রকম। মাউন্টব্যাটেনের প্রেস এ্যাটাশের পত্নী মিসেস ফে ক্যাম্পবেল জনসনের চোখের সামনে যে অমানুষিক হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল তা দেখে অসুস্থ হয়ে পড়লো সে। একদা ব্রিটিশরাজের বড় আদরের এই গ্রীষ্মাবকাশের সেই শৌখিন চেহারা আর নেই। সিমলার ম্যাল তখন রক্তাক্ত হয়ে গেছে। সিমলার বিখ্যাত সিসিল হোটেলের বারান্দা থেকে মিসেস ফে জনসন দেখলো, খোলা তরোয়াল নিয়ে শিখ যুবকরা রক্তপিপাসু নেকড়ের মতন তাড়া করে বেড়াচ্ছে ভয় পাওয়া নিরীহ মুসলমানদের। ওরা সভয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক। হঠাৎ হয়ত হাঁপিয়ে পড়া একজনকে' ধরে ফেললো শিখ দুষ্কৃতীরা। পরক্ষণেই কৃপাণের এক কোপে তার ধড় থেকে মুণ্ডুটা খসিয়ে দিল। চোখের সামনে এমন দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে গেল মিসেস ফে ক্যাম্পবেল জনসন। সিমলায় এমন বীভৎস দৃশ্য অন্য বিদেশিনীদেরও দেখতে হয়েছে। একজন দেখলো যে রাস্তার ওপর ফেজ্ পরা একটা কাটা মুণ্ডু গড়াচ্ছে এবং শিখ আততায়ী রক্ত মাখা কৃপাণ উঁচিয়ে চিৎকার করছে, আমি আরও খুন করবো আরও!'

তখন যে কেউ খুনী হয়ে যাচ্ছে। অজ্ঞাত বা অতি পরিচিতির মধ্যে কোন তফাত থাকছে না, কারণ খুনের নেশায় তখন সবাই মাতাল। নইলে মন্টগোমারি বাজারের শিখ দোকানদার নিরঞ্জন সিং অমন নৃশংসভাবে খুন হ'ত না। নিরঞ্জনের চা-বেচার

www.pathagar.com

ব্যবসা। রোজ সকালে সে তার খদ্দেরদের কাছে আসাম চা বিক্রি করে। সেই আগস্ট মাসের সকালে নিরঞ্জন যখন দাঁড়িপাল্লায় চা মাপছে, তখন সেই চেনা খাঁরদ্দারটাই মুখে রাজ্যের ঘেন্না আর প্রতিহিংসা নিয়ে নিরঞ্জনের দিকে আঙুল তুলে চেঁচিয়ে উঠলো, 'ওটাকে মার্! টিপে মেরে ফেল ওটাকে!' নিরঞ্জন অবাক হয়ে দেখলো যে, লোকটার কথা শুনেই যেন পাশের গলি থেকে প্রায় এক ডজন গুন্ডা হাতে খোলা তরোয়াল নিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। প্রথমে হাঁটুর তলা থেকে একটা পা কেটে দিল ওরা। তারপর খুন করলো নিরঞ্জনের নব্বুই বছরের বুড়ো বাপ আর বালক পুত্রকে। নিরঞ্জন তখনও জ্ঞান হারায় নি। সেই অবস্থায় হঠাৎ দেখলো, যে লোকটা তার যুবতী মেয়েকে কাঁধে তুলে পালাচ্ছে তাকে সে পনেরো বছর ধরে চেনে। মেয়েটার চোখ মুখ ভয় আতংকে সাদা হয়ে গেছে। এই দৃশ্য দেখেই অজ্ঞান হয়ে গেল নিরঞ্জন।

পাঞ্জাবের এমন কোন গ্রামগঞ্জ নেই যেখানে দাংগার আগুন ছড়ায় নি। সর্বত্রই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ এই আগুনের আঁচে দগ্ধ হয়েছে। ভয়ে আতংকে দিন কেটেছে তাদের। লাহোর থেকে করাচি রেলপথের ওপর মুসলমান প্রধান কারখানাশহর উকার্নার অবস্থাটাও একরকম। মদনলাল পহওয়া নামে একজন হিন্দু তার চাচীর ঘরে লুকিয়ে বাস করছে তখন। জানলার ফাঁক দিয়ে সে প্রতিদিন দেখতো শহরের মুসলমান যুবকদের জংগ মিছিল। ওরা নাচছে, গাইছে, পতাকা ওড়াচ্ছে আর চিৎকার করে বলছে, 'হাঁস কে লিয়া পাকিস্তান, লড়কে লেংগে হিন্দুস্তান।' মদনলাল উগ্র হিন্দু। মুসলমানদের সে ঘেন্না করে। দাংগাবাধার আগে আর.এস.এস. বাহিনীর খাকী পোশাক আর কালোডোরার জামা পরে মুসলমানদের সে শাসিয়ে এসেছে। এখন ভয় পাবার পালা তার। ওদের হাতে জবাই হবার জন্যেই অপেক্ষা করছে মদনলালরা।

তবে যে অঞ্চলে শিখরা সংখ্যায় বেশি সেখানে তাদের মতন সুশৃংখল এবং নিষ্ঠুর ঘাতক আর কোন ভারতীয় নয়। আহমেদ জাফরুল্লার জবানি থেকে এই নিষ্ঠুরতার একটা ছবি পাওয়া যায়। ফিরোজপুরের কাছে একটা ছোট্ট গ্রামের খেতমজুর ছিল আহমেদ। একদিন রাতে শিখ 'জাঠার' আক্রমণ হ'ল তার কুটিরে। আহমেদের জবানি থেকেই পরের ঘটনাগুলো শোনা যাক: 'আমরা বুঝতে পারলাম যে এবার ওরা ইঁদুরের মতন টিপে মারবে আমাদের। আমরা তাই চারপাই আর গোবরনাদের আড়ালে গিয়ে লুকোলাম। ওরা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে আমাদের তাক করে গুলি ছুঁড়তে লাগলো। আমার বাঁ হাতে গুলি লাগলো। আমার বিবি চারজায়গায় গুলি খেল। তার উরু দিয়ে তখন গলগল করে রক্ত ঝরছে। হঠাৎ দেখলুম যে আমার তিন বছরের ছেলেটা গুলি খেয়ে ঢলে পড়লো। আর উঠে দাঁড়াল না সে। সেই অবস্থায় আমার আর এক ছেলে আর বিবিকে কাঁধে নিয়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম ঘর থেকে মুসলমানদের টেনে বার করে শিখরা ওদের গুলি করছে। কেউ কেউ কাঁধে যুবতী মেয়ে নিয়ে চম্পট দিচ্ছে। মেয়েদের করুণ বিলাপে জায়গাটা হা হা করছে যেন। হঠাৎ একজন শিখ আমার বিবিকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর আমার ছেলেটার পেটে গুলি মেরে তাকে হত্যা করলো। আমার বিবি তখন মরে গেছে। এরপর আমায় ধাক্কা দিয়ে রাস্তার ওপর ফেলে ওরা চলে গেল। সেদিন আমি একটুও কাঁদি নি কারণ আমার চোখে একটুও জল ছিল না। সিন্ধুদেশের

www.pathagar.com

নদীগুলো যেমন গরমের সময় শুকনো খটখটে হয়ে যায়, তেমনি শুকিয়ে গিয়েছিল আমার চোখ দুটো। এরপর আমি অজ্ঞান হয়ে যাই।'

লাহোরের উত্তরে শেখপুরা একটা ছোট্ট ব্যাপারী শহর। শহরের একমাত্র গুদাম ঘরের মধ্যে শিখ ও হিন্দুদের ঢুকিয়ে মুসলমান সেপাইরা কামান চালিয়ে সবাইকে হত্যা করে। মেশিনগান-এর গুলিতে সেদিন একজনও হিন্দু বা শিখ প্রাণে বাঁচে নি। তখনও যে ক'জন ইংরেজ পাকিস্তান বা ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিল, এই বীভৎস কান্ড দেখে তারা হতভম্ব হয়ে যায়। তাদের ধারণা যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও নাকি এমন নৃশংস গণহত্যা অনুষ্ঠিত হয় নি।

'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্' পত্রিকার অভিজ্ঞ সাংবাদিক রবার্ট টার্নবুল যে প্রতিবেদন পাঠান, তাতে লেখেন, 'মানুষের এই নীচ হত্যাপ্রবৃত্তি দেখে এত বিচলিত হয়ে যাই যা স্তূপাকার মড়া দেখেও কখনও হই নি। এদেশে এখন বৃষ্টির জলের মতন রক্তের বন্যা বইছে। আমি এমন হাজার হাজার মানুষের লাশ দেখেছি যাদের চোখ উপড়ে ফেলা হয়েছে কিংবা হাত-পা কেটে দেওয়া হয়েছে। শুধু হাতুড়ি বা পাথরের চাঙড় মেরে কত কিশোর বা শিশুকে হত্যা করা হয়েছে তার হিসেব-নিকেশ নেই। যারা মরে নি, সেই অর্ধমৃত লাশগুলো রাস্তার ওপর ফেলে দিয়েছে যাতে রোদের তাত আর মাছির কামড়ে অবশিষ্ট প্রাণটুকু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়।'

দুই জঙ্গি সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন যেন পশ্বাচারের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। পাঞ্জাবের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর একজন ব্রিটিশ অফিসার একদিন আবিষ্কার করলো যে একটা শিখ গ্রামের চারটে মুসলমান বাচ্চাকে শুয়োর ছানার মতন আগুনে সেঁকা হচ্ছে। আর একজন ব্রিটিশ অফিসার দেখলো যে হিন্দুপাড়ায় ঢুকে মেয়েদের স্তন কেটে হত্যা করছে মুসলমান দুর্বৃত্তরা। কখনও বা সরাসরি হত্যা না করে হিন্দুদের কাছে ধর্মান্তরের প্রস্তাবও রাখা হয়েছে। লায়ালপুরের হিন্দুচাষী বাগদাস তিনশ' প্রান্তিক চাষী নিয়ে ধর্মান্তরিত হতে মসজিদের ইমামের কাছে এল। তারপর মসজিদ সংলগ্ন পুকুরে পা ধুয়ে তারা মসজিদের ইমামের সামনে পা মুড়ে বসলো। ইমাম তাদের কোরান থেকে কিছু পাঠ করে শোনাল। তারপর বললো, 'এখন তোমরা মুসলমান হয়ে এখানে সুখে বাস করবে না মরবে?' ওরা সবাই বললো যে, মুসলমান হয়ে বাঁচতে চায় সবাই। তখন প্রত্যেকের নতুন নামকরণ হ'ল এবং প্রত্যেককে কোরান থেকে কিছু পাঠ করতে দেওয়া হ'ল। তারপর সবাইকে নিয়ে মসজিদের উঠানে এল ইমাম। সেখানে গরুর মাংস সেঁকা হচ্ছে। প্রত্যেককে এক টুকরো করে সেঁকা মাংস খেতে দেওয়া হ'ল। আজন্ম নিরামিষাশী বাগদাস কোনরকমে নাক টিপে হিন্দুর নিষিদ্ধ গো মাংস খেয়ে সে যাত্রা প্রাণে বাঁচলো।

কিন্তু প্রাণের জন্যে সে ধর্ম বিসর্জন দিলেও, তার প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ এত সহজে ধর্মত্যাগ করে নি। বিয়ের যৌতুক পাওয়া থালায় গোমাংস খাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেই ব্রাহ্মণ তার বউ এবং ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘরে ফিরে আসে। তারপর ধুতির আড়ালে লুকিয়ে রাখা ছুরি বের করে প্রথমে বউ এবং ছেলেমেয়েদের হত্যা করে, পরে গলার নলি কেটে সে আত্মহত্যা করে। সেদিন এই সাহসী ব্রাহ্মণ প্রাণ দিয়ে তার ধর্ম রক্ষা করেছিল। হিন্দুর নিষিদ্ধ গোমাংস খেতে ব্রাহ্মণ বা তার পরিবারের কেউ মসজিদে ফিরে আসে নি।

তবে শুধু ধর্মীয় বাতিকই নয়, অন্য মতলবও কাজ করেছে। অনেকক্ষেত্রেই

www.pathagar.com

শিখ বা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ওপর মুসলমান আক্রমণের ঐকতান উদ্যোগ সংগঠিত হয়েছে ব্যক্তিগত লোভ বা ঈর্ষা থেকে। প্রতিবেশী শিখ বা হিন্দুর জমিজমা, ব্যবসাপত্র বা টাকা-পয়সা, সোনাদানা ইত্যাদি আত্মসাতের চেষ্টায় মুসলমানরা চড়াও হয়েছে সংখ্যালঘু শিখ বা হিন্দুর ওপর। সর্দার প্রেম সিংয়ের ঘটনাটাও এইরকমই এক ব্যক্তিগত অসূয়া থেকে জন্ম নেয়।

সর্দার প্রেম সিং যে কারবার করতো প্রতিবেশী মুসলমানরা তা ঘৃণা করতো। শিয়ালকোটের কাছাকাছি একটা গ্রামে ধনী সুদখোর মহাজন ছিল প্রেম সিং। একে সে বড় মানুষ, তার ফলাও তেজারতী কারবার করেও সে অনেকের ধন অপহরণ করেছে। গ্রামের একমাত্র দোতলা পাকা বাড়িটার মালিক সে। বাড়ির চারপাশে দেওয়াল এবং মাঝখানে লোহার বড় গেট। প্রেম সিং জানে যে গ্রামের প্রায় সব মুসলমানের সম্পত্তি তার কারবারে গচ্ছিত আছে বলে তাদের দুচোখের বিষ সে।

স্বাধীনতার দু-একদিন পরের কথা। একদিন সকাল বেলা প্রেম সিং দেখলো যে গ্রামের কয়েক শ' মুসলমান হাতে ছুরি ছোরা, লাঠি সোঁটা নিয়ে তার বাড়ির চারপাশে জমা হয়েছে। তারা গেট খুলে বাড়ির মধ্যে চড়াও হবার চেষ্টা করছে। প্রেম সিং দেখলো যে এরা সবাই তার খাতক। তারা সমস্বরে 'সিন্দুক চাই, সিন্দুক চাই' বলে চেঁচাচ্ছে। প্রেম সিং বুঝতে পারলো যে ওরা সিন্দুক লুট করতে এসেছে। কিন্তু সিন্দুকের মধ্যে আরও অনেকের বন্ধকী গয়না গচ্ছিত আছে, যেগুলো বাঁচানো তার কর্তব্য। অতএব ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেললো প্রেম সিং। সিন্দুক খুলে একটা দোনলা বন্দুক আর ২৫টা কার্তুজ বার করে দৌড়ে দোতলায় উঠে গেল সে। তারপর প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে এ জানলা ও জানলা থেকে গুলি ছুঁড়ে ওদের চড়াও হওয়াটা ঠেকিয়ে রাখলো। কিন্তু এইভাবে যখন সে ওদের ঠেকিয়ে রেখেছে তখন একতলায় যে করুণ আর শোকাবহ ঘটনা ঘটে গেল, তার বিন্দুবিসর্গও জানতে পারলো না প্রেম সিং। প্রেম সিংয়ের বউও তখন কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে। পাছে দুর্বৃত্ত মুসলমানের হাতে তার ও মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট হয়, তাই আগেভাগেই নিজের ও মেয়েদের গায়ে কেরোসিন ঢেলে সে আগুন ধরিয়ে দিল। দাউ দাউ করে যখন চারটি জীবন্ত প্রাণী সারা একতলায় দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে, তখন সম্বিৎ হ'ল প্রেম সিংয়ের। সারা একতলাটা তখন চামড়া পোড়া কটু গন্ধে ভরে উঠেছে এবং সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠছে ধোঁয়া আর কটু গন্ধটা। হঠাৎ নাকে পোড়া গন্ধ পেয়ে আর ধোয়া দেখে সম্বিৎ হ'ল প্রেম সিংয়ের। তখনও পাঁচটা কার্তুজ বাকি আছে। কিন্তু কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে সে গুলি ছোঁড়া বন্ধ করলো। তারপর হুড়মুড় করে এক-তলায় ছুটে এল। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে। ফতুর হয়ে গেছে প্রেম সিংয়ের দাপট। হায় হায় করে উঠলো সে। দেখতে পেল ডালা খোলা সিন্দুকের সামনে তার বউ আর তিন মেয়ের পোড়াশবগুলো স্থির চোখে চেয়ে আছে তার দিকে। উপহাস করছে সিন্দুকে পোরা সোনাদানা গয়নাগুলোকে। এইভাবে আত্মবলি দিয়ে ওরা যেমন নারীর ইজ্জত বাঁচালো তেমনি ব্যঙ্গ করে গেল তার বিষয়লোভকেও। প্রেম সিং তখন বুক চাপড়ে হাহা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রেতের মতন।

তবে সব হিন্দু বা শিখই যে ধনী তা নয়। চোদ্দ বছরের কিশোর কুলদীপ সিং এক ভাগচাষীর ছেলে। ছ'শ মুসলমান গ্রামবাসীর মধ্যে ওরা মাত্র পঞ্চাশ জন

www.pathagar.com

শিখ ও হিন্দু লাহোরের কাছাকাছি এই গ্রামে বাস করতো। কুলদীপরা খুবই গরিব। দু'খানা মেটে ঘরের একটা ছোট্ট কুঁড়েতে বাপ-মায়ের সংগে চরম দুরবস্থার মধ্যে দিন কাটাত তারা। সম্পত্তির মধ্যে ছিল দুটো এঁড়ে বলদ আর একটা গাইগরু। একদিন সকালে গ্রামের ছশ' মুসলমান তাদের মেটে বাড়ি ঘিরে ফেললো। তাদের দাবি, 'হয় পাকিস্তান ছেড়ে যাও নয়ত মরো।'

প্রাণের ভয়ে বাপ-মার সংগে কুলদীপ এসে আশ্রয় নিল গ্রামের এক সম্পন্ন শিখের বাড়ি। সমাজে তার খ্যাতি প্রতিপত্তি আছে। ততক্ষণে হাতে মশাল আর ছুরিছোরা নিয়ে দুর্বৃত্তরাও সেই শিখের বাড়ি আক্রমণ করেছে। আগুন ধরিয়ে দিয়েছে বাড়িটায়। শুধু তাই নয়, ঘরে ঢুকে একজন শিখের দাড়িতেও আগুন লাগিয়ে দিল ওই পাষণ্ডরা। সেই জ্বলন্ত অবস্থাতেই শিখটা একজন মুসলমান দুর্বৃত্তের মাথায় পাথরের বাড়ি দিয়ে মেরে ফেললো, তারপর নিজে মরলো।

কুলদীপ দেখলো মুসলমান গুণ্ডারা মানুষদের বাইরে টেনে এনে খুন করছে। ছাতের ওপর থেকে মেয়েরা সেই দৃশ্য দেখছে আর থরথর করে কাঁপছে। ওদের অনেকেরই কোলে বাচ্চা। কুলদীপের ভারী দুশ্চিন্তা হচ্ছিল ওদের দেখে। অমানুষগুলো নিশ্চয়ই ছাতে উঠে ওদের ধর্ষণ করবে। হঠাৎ সে দেখলো ছাতময় আগুন জ্বলছে। ছাতের ওপর মেয়েরা অগ্নিকুণ্ড বানিয়ে প্রথমে কোলের বাচ্চাদের ফেললো। তারপর নিজেরাই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে নারী জীবনের জ্বালা মেটালো। চোখের সামনে এমন বীভৎস দৃশ্য দেখে কুলদীপ তখন স্তম্ভিত হয়ে গেছে। তার মনে হ'ল এখনই সে অন্ধ হয়ে যাক। পাছে এমন দৃশ্য তাকে আরও দেখতে হয় তাই ছাত থেকে সে লাফিয়ে পড়লো অন্ধকার মাঠে। তারপর একটা বড় গাছে উঠে ডালপালা পাতার আড়ালে লুকিয়ে রইল আরও ছ-সাত ঘণ্টা। তখন মনে হ'ল তার বাবা-মাকে সে একবারও দেখেনি। বাড়ির ভেতর থেকে তখন মড়াপোড়া গন্ধ আসছে। কুলদীপের ধারণা দৃঢ় হ'ল যে তার বাবা-মা নিশ্চয়ই আগুনে ঝাঁপ দিয়েছেন কিংবা খুন হয়েছেন। এমন সময় দেখলো দুজন অচৈতন্য যুবতীকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে মুসলমান দুর্বৃত্তরা।

শেষ রাতের দিকে দুর্বৃত্তরা চলে যাবার পর কুলদীপ গাছ থেকে নামলো। শিখ মহল্লার কেউ আর বেঁচে নেই। বাড়িটা তখন ধ্বংসস্তূপ। এখানে ওখানে পড়ে আছে আগুনে পোড়া মানুষের লাশ। তখনও ধিকি ধিকি জ্বলছে আগুন। চোখের ওপর এতগুলো মড়া দেখেও কাঁদলো না কুলদীপ। তার চোখের জল শুকিয়ে গেছে মানুষের এই বীভৎসতা দেখে। তার বাবা-মা'র শবদুটো হয়ত এর মধ্যেই পড়ে আছে কোথাও। কুলদীপ খুঁজে পেল না তাদের। খুঁজে পেল রক্তলাগা একটা বড় ছুরি। কুলদীপ খপ্ করে তুলে নিল ছোরাটা। তারপর একটুও ভাবনাচিন্তা না করে মাথার লম্বা লম্বা চুলগুলো ছেঁটে সে তার শিখ জীবনের সমাপ্তি করে দিল। তখন ভোরের আলো ফুটেছে। কুলদীপ এখন নিঃশংক। নির্ভয়ে সে গ্রামের পথ ধরে হেঁটে চললো আর এক জীবনের উদ্দেশে।

ভয়ের কোন জাতিধর্ম নেই। সারা পাঞ্জাব জুড়ে আগস্ট মাসের সেই দিনটাতে যে তাণ্ডব চলেছিল তা ছিল নিক্তির ওজনে মাপা। খুন, রক্তপাত, হিংসা, নিষ্ঠুরতা, নারী ধর্ষণ সবই যেন তুল্যমূল্য বিচারে দুতরফে ঘটতে লাগলো। ফলে কুলদীপ বা মহম্মদ ইয়াকুবের দেখার বস্তুতে কোন ইতরবিশেষ হয় নি। তফাত যেটুকু হ'ল তা ওদের ধর্মীয় সংস্কারের। লাহোরের কুলদীপ

www.pathagar.com

যা দেখেছিল, অমৃতসরের ইয়াকুবও তাই দেখলো।

সকালবেলা ওদের মেটে ঘরের সামনে মার্বেল খেলছিল বালক ইয়াকুব। হঠাৎ দেখলো হাতে খোলা কৃপাণ নিয়ে রে রে করে তেড়ে আসছে কয়েকজন শিখ যুবক। ওরা এসেই -ওদের মেটে ঘরের ওপর চড়াও হয়ে বাবা-মা আর ভাই বোনদের টেনে বাইরে নিয়ে এল। আতঙ্কিত ইয়াকুব আর দাঁড়াল না। ছুটে গিয়ে গ্রামের শেষে আখের খেতের মধ্যে লুকিয়ে রইল। ইয়াকুব দেখলো যে অমানুষগুলো মেয়েদের স্তন কেটে দিচ্ছে। তারপর মেয়েরা যেন দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটোছুটি করছে যন্ত্রণায়, তখন তাদের ধর্ষণ করছে। গ্রামের অনেকেই তখন তাদের মা মেয়েদের খুন করে ইজ্জত বাঁচালো। শিখগুলো তার দুভাইকে সড়কি বিঁধিয়ে হত্যা করলো। কিন্তু এই বর্বর দৃশ্য চোখের সামনে সইতে পারলো না ইয়াকুবের আব্বাজান। একখানা খোলা তরোয়াল নিয়ে সে তখন পাগলের মতন মাঠময় ছুটে বেড়াতে লাগলো। শিখগুলো কিছুতেই ধরতে পারছিল না তার আব্বাজানকে। তাই গ্রামের কুকুরগুলোকে লেলিয়ে দিল ওরা। কুকুরগুলো তাড়া করে ধরে ফেললো তার আব্বাজানকে। তার পা দুটো কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিল। চলতে পারছিল না তার আব্বাজান। তখনও খোলা তরোয়াল চালিয়ে যাচ্ছে সে। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাকে ধরে ফেললো শিখগুলো। তারপর একটা গাছের সংগে বেঁধে তার শরীরটা টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললো। দেখতে দেখতে অতবড় মানুষটার হাত, পা, ধড়; মুণ্ড সব আলাদা হয়ে গেল। আতংকে ইয়াকুবের চোখ দুটো তখন ঠিকরে বেরোচ্ছে। ওই অবস্থায় দেখলো অমানুষ শিখগুলো তার বাবার শরীরের টুকরো টুকরো খণ্ডগুলো কুকুরদের খাওয়াচ্ছে আর উল্লাসে হা হা করে হাসছে।

সেদিন মুসলমান পাড়ার একশ'জনের মধ্যে পঞ্চাশ জনই শিখদের হাতে খুন হ'ল। বাকি পঞ্চাশজনও রেহাই পেত না যদি না পাঞ্জাব বাউণ্ডারি ফোর্সের টহলদার গাড়িটা এসে পড়তো। টহলদার গাড়ির গোর্খারা সারা মহল্লা থেকে জীবিত মানুষদের গাড়িতে তুললো। মহম্মদ ইয়াকুবও ওদের সংগে গাড়িতে উঠলো। তারপর নিরাপদে সীমানা পার করিয়ে ওদের বেহেশ্‌ত্‌ পাকিস্তানে পেঁৗছে দিল টহলদার বাহিনী।

ওই ভয়ংকর ঘটনার স্মৃতি পাঞ্জাবের লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে যে গভীর দাগ এঁকে দিয়েছিল তা যেন কোনদিনই মুছে ফেলার নয়। বোধহয় সমস্ত পাঞ্জাব মুলুকে এমন একটাও পরিবার নেই যাদের অন্তত একজন আত্মীয়ও এই নির্বোধ হত্যাকাণ্ডে বলি হয় নি। আগামীদিনে বছরের পর বছর ধরে পাঞ্জাব হয়ে থাকবে এই বীভৎস স্মৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার। একটা ঘটনা থেকে মনে পড়ে যাবে আরও একটা ভয়ংকর ঘটনার কথা। দেশের মাটি থেকে সমূলে উৎখাত হয়ে যাবার সেই একই বৃত্তান্ত মানুষ যুগ যুগ ধরে শুনবে। শুনবে ছিন্নমূল মানুষের মাটির নিবিড় আশ্লেষ থেকে উৎপাটিত হয়ে অজানা অচেনা লক্ষের দিকে পাড়ি দেবার করুণ কাহিনী। ঠিক একইরকম অনুভূতি হ'ল সন্ত্‌ সিংয়ের, যখন জোর করে তার ভিটে থেকে তাকে উৎখাত করা হয়।

তার বড় আপন ছিল এই মাটিটুকু, যা সে শরীরের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে গড়ে তুলেছিল নিজের মনোমত করে। সন্ত্‌ সিং একজন ফৌজি শিখ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের স্বার্থে লড়াই করে সে এই জমিটুকু উপহার পেয়েছিল

www.pathagar.com

ব্রিটিশরাজ থেকে। তার ষোলো বছর সময় লেগেছিল উপহার পাওয়া এই জমিটুকু আগাছা মুক্ত করে বাসোপযোগী করে তুলতে। তার মতন আরও কয়েক হাজার প্রাক্তন শিখ ফৌজি মানুষ শতদ্রু ও ইরাবতী নদীর অববাহিকায় এই নিষ্কর জমিটুকু উপহার পেয়েছিল ব্রিটিশরাজের কাছ থেকে। এখানেই তাঁবু খাটিয়ে সে বিয়ে করা বউ নিয়ে আসে এবং ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তোলে। এখানেই পাঁচ ঘরের একটা মেটে বাংলো তৈরি করে সে। এটাই তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার দিন দুই আগে সন্ত্ সিংয়ের অনুগ্রহভাজন একজন মুসলমান কৃষি মজুর তাকে চুপিচুপি একটা প্রচারপত্র দেখিয়ে গেল। প্রচারপত্রে লেখা আছে যে শিখ ও হিন্দুরা পাকিস্তানের মানুষ নয়। তারা এদেশের দুশমন। সুতরাং এদেশের মাটি থেকে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হ'ক।

এই ঘটনার ঠিক তিনদিন পর থেকেই মুসলমানরা চড়াও হ'ল তাদের ওপর। তখন সন্ত্ সিং আর গ্রামের অন্য শিখেরা স্থির করলো যে এখান থেকে তারা পালিয়ে যাবে। তার ওপর দায়িত্ব দেওয়া হ'ল মেয়েদের নিরাপদে সীমান্ত পার করিয়ে দেবার। তার সংগে রইল আরও পাঁচজন শিখ এবং আশি বছরের একজন প্রাক্তন সেনাপুলিস। যাত্রার আগে সন্ত্ সিং গ্রামের গুরুদ্বারে এসে দাঁড়াল। এই মন্দিরটি তৈরি করতে একদিন সেও অনেক মদত দিয়েছে। ধর্মস্থানে এসে গুরু নানকের ভজনা করলো সন্ত্ সিং। 'প্রভু আমি এখানে কিছু না নিয়েই এসেছিলাম। ফিরেও যাচ্ছি শূন্য হাতে। শুধু চাইছি তোমার কৃপাকরুণা।' বিপদতারণ গুরু নানকের কাছে বিদায় নিয়ে ট্রাকে চড়ে শুরু হ'ল ওদের যাত্রা। বীরওয়ালা গ্রামের সীমানা পর্যন্ত গুরুদ্বারের লোকজন পৌঁছে দিল তাদের। তারপর ট্রাক চললো চৌকি ছাড়াই।

ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। পাছে মুসলমানের চোখে পড়ে যায় তাই ট্রাক চলেছে রেলসড়কের পাশ দিয়ে। ওরা শুনলো যে গ্রামের রাস্তায় অবরোধ করেছে মুসলমানরা। সেই অবরোধে শিখ ও হিন্দুদের গাড়ি থামিয়ে কোতল করছে মুসলমানরা। কিন্তু নজর এড়িয়ে যেতে পারলো না সন্ত্ সিংরা। হঠাৎ একজন বয়স্ক মুসলমানের চোখে পড়ে গেল ওরা। লোকটা ছুটে গেল গ্রামের সবাইকে খবর দিতে। একটু পরেই হল্লা শোনা গেল। অনেক মানুষ হল্লা করতে করতে ছুটে আসছে তাদের ট্রাকের দিকে। ওদের দলের আশি বছরের বৃদ্ধ নেতা ততক্ষণে ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলেছে। কিছুতেই মুসলমান গুণ্ডাদের হাতে মেয়েদের লাঞ্ছিতা হতে দেবে না সে। বরং অপমানিতা হবার চেয়ে তারা মৃত্যুবরণ করুক। সবাই রাজী হ'ল নেতার সিদ্ধান্তে। তখন মেয়েদের চোখ বেঁধে লাইনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। সন্ত্ সিং হাতে নিল একটা দোনলা শট গান। অন্যরা নিল ৩০৩ রাইফেল, স্টেনগান আর রিভলভার। স্থির হ'ল যে সন্ত্ সিং তার হাতের সাদা রুমালটা তিনবার নাড়িয়ে এক দুই তিন বললেই গুলি ছোঁড়া হবে আগ্নেয়াস্ত্র থেকে। লাইনের মাঝখানে দাঁড় করানো হয়েছে সন্ত্ সিংয়ের বিবিকে। পাশে দাঁড়ালো মেয়ে, পুত্রবধূ আর নাতনিরা। একটি মেয়ের কোলে দুমাসের এক কচি বাচ্চা কেমন নিশ্চিন্ত মনে মায়ের বুকের দুধ খাচ্ছে। এবার সবাই প্রার্থনা করলো। মনে মনে বললো 'ঈশ্বর মঙ্গলময়।' তারপর পবিত্র গ্রন্থসাহিব হাতে নিয়ে সন্ত্ সিং পাঠ করলো, 'সবই মংগলময় ঈশ্বরের ইচ্ছা। সময় হলেই মানুষকে মরতে হবে।'

www.pathagar.com

অন্ধকার, নীরব রাত ছমছম করছে। একটা কিছু ঘটবে বলে সময় যেন স্থির হয়ে গেছে তখন। একপাশে দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যুপথযাত্রী কয়েকজন অসহায় শিখ মহিলা, অন্য পাশে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে তাদের পুরুষরা। সন্ত্ সিংয়ের হাতের সাদা রুমাল নড়ে উঠলো। শোনা গেল তার হুকুমত্, 'এক্'! এরপর দ্বিতীয়বার নড়ে উঠলো সাদা রুমাল। শোনা গেল পরের নির্দেশ। 'দো'! সর্বক্ষণই ঈশ্বরের স্মরণ-মনন করে চলেছে সন্ত্ সিং। 'হে করুণাময়। আমায় ছেড়ে যেও না!' হঠাৎ সেই ঘোর তিমির ভেদ করে আশার আলোকরেখার মতন একটা তীব্র আলোকচ্ছটা দেখতে পেল ওরা। কিসের আলো? কোন গাড়ির হেড্‌লাইট? দেখতে দেখতে উজ্জ্বল আলোর বৃত্তের মধ্যে এসে পড়লো সবাই। সন্ত্ সিং মনে মনে ভারী উল্লসিত। পরম করুণাময় তাঁর নিবেদন শুনেছেন। এই বিবিক্ত মুহূর্তেও তাকে ছেড়ে যান নি। তৃতীয়বার রুমাল নাড়া হ'ল না তার। বৃদ্ধ নেতাকে সে বললো যেন ওদের সাহায্য চাওয়া হয়। কিন্তু ওরা যদি মুসলমান হয়? তবুও একবার শেষ চেষ্টা করা হ'ক। বৃদ্ধ নেতার হুকুমে বন্ধ রইল হত্যালীলা। ততক্ষণে এক ট্রাক ভর্তি টহলদার সৈনিক এসে পড়েছে ওদের কাছে। সবাই মুসলমান সৈনিক। সার্জেন্ট অফিসারটিও মুসলমান, সাচ্চা মুসলমান। সব শুনে সার্জেন্ট অফিসারটি তখন আশ্বস্ত করলো সন্ত্ সিং আর অশীতিপর বৃদ্ধকে। কৃতজ্ঞচিত্ত সন্ত্ সিং সেই মুসলমান সার্জেন্ট অফিসারের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়লো আত্মহারা হয়ে। সেদিন করুণাময় ঈশ্বরের নির্দেশেই যেন আবির্ভূত হয়েছিল সেই তরুণ খাঁটি মুসলমান অফিসারটি। তাই নিরাপদেই ভারত সীমান্তে পেঁছে গেল শিখ অভিযাত্রীদল।

কলকাতা, ১৭ আগস্ট ১৯৪৭

প্রায় লাখখানেক মানুষ তখন জড়ো হয়েছে নারকেলডাঙা স্কোয়ারে। পাঁচটা থেকেই কাতারে কাতারে মানুষ আসছে গান্ধীজীকে দেখতে। আশপাশের বাড়ির ছাতগুলোয় থিকথিক করছে মানুষ। বাড়ির বারান্দায় তিল ধারণের জায়গা নেই। প্রতিটি বাড়ির জানলায় মানুষের মুখগুলো ছবির মতন স্থির হয়ে আছে। অনেকেই জানলার শিক ধরে দেওয়ালের গায়ে ঝুলছে। পার্কের ভেতরে নিষ্পত্র গাছগুলোর ডালে বসে থাকা মানুষদের দেখে মনে হয় যেন ফলভারে নুয়ে পড়েছে গাছের শুকনো ডাল। এখান থেকে আঠারোশ' মাইল দূরে পাঞ্জাব জুড়ে যখন তাণ্ডব চলছে, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় যখন হিংস্র শ্বাপদের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ছে পরস্পরের ওপর, অবলীলায় একে অপরকে খুন করছে, তখন এই নিষ্ঠুর কলকাতা শহরের বুকে যেন ভেলকি দেখিয়ে দিলেন ওই শীর্ণ শান্ত মানুষটি। আজ আর এই শহরে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন তিক্ততা নেই। সবাই সবাইকে বুকে জড়িয়ে ধরছে। হিন্দু-মুসলমান মিলে মিশে এক হয়ে অপেক্ষা করছে কখন আসবেন প্রেমের পূজারী, করুণাময় গান্ধীজী।

অবশেষে এসে পড়লেন তিনি। প্রার্থনামণ্ডের ওপর গান্ধীজীর ক্ষীণ শীর্ণ শরীরের কাঠামোটা দেখেই যেন রোমাঞ্চ তরঙ্গ খেলে গেল অপেক্ষারত মানুষের

www.pathagar.com

মধ্যে। যেন খুশীর দোলা লেগেছে গাছের শুকনো পাতায়, যেন জোয়ার এসেছে মরা গাঙে। গান্ধীজীও অভিভূত। কিন্তু একটু যেন উৎকণ্ঠিত তিনি। যা দেখছেন তা সত্য না বিভ্রম ? মনের এই সংশয় তিনি লুকিয়ে রাখলেন না। সবাইকে বললেন, 'কলকাতা আমায় অবাক করে দিয়েছে। আপনাদেরও করেছে। এর জন্য সবাই আমায় অভিনন্দন জানাচ্ছেন। আসুন, আমরা সবাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই তাঁর কৃপার জন্য। একথা যেন ভুলে না যাই যে, কলকাতায় এখনও কিছু বিপন্ন এলাকা আছে যেখানকার অবস্থা ভাল নয়।' তারপর উপস্থিত হিন্দু-মুসলমান জনতার কাছে নিবেদন জানিয়ে বললেন, 'আসুন ঈশ্বরের কাছে সবাই মিলে প্রার্থনা করি যেন এই অভাবিত বদল আমাদের ক্ষণিকউচ্ছ্বাস না হয়।'

বাস্তবিকই কলকাতার এই বদল অভাবনীয়। একজন নিরস্ত্র অহিংস মানুষ কলকাতায় একা বসে যে আলৌকিক কাণ্ডটি করলেন সেইটুকু কাজ ৫৫ হাজার সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী করতে পারলো না পাঞ্জাবে। অথচ সারা পাঞ্জাবে শান্তির এই পরিবেশটুকু ফিরিয়ে আনতেই পাঞ্জাব বাউন্ডারি ফোর্স নামক আধা সামরিক বাহিনী তৈরি করেছিলেন স্বয়ং ভাইসরয় এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর কম্যান্ডার-ইন-চীফ্। কিন্তু অত যত্ন ও সতর্কতার সংগে গঠিত পাঞ্জাব বাউন্ডারি ফোর্সের তখন বানচাল অবস্থা। শান্তি বজায় রাখা দূরের কথা, তারা নিজেরাই বিমূঢ় হয়ে গেল ঘটনার আকস্মিকতায়। কোথায় কী ঘটছে তার কিছুই আঁচ করতে না পেরে তারা যে ব্যতিব্যস্ত তা বেশ বোঝা যায়। পাঞ্জাবের বারটা জেলাই তখন অগ্নিকুন্ডে পরিণত হয়েছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে সব ক'টা জেলা। ধুলোভরা সরু রাস্তায় ভারীভারী ট্যাংক আর সেনাবাহিনীর ট্রাকগুলো অচল হয়ে পড়েছে। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত অশ্বারোহী বাহিনী নিয়োগ করা হয়। কিন্তু উপযুক্ত ঘোড়ার অভাবে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে তখন কোন ক্যাভালরি ইউনিটও ছিল না।

বাউন্ডারি ফোর্সের কাজ আরও কঠিন হয়ে পড়লো প্রশাসন ভেঙে পড়ায়। ডাক ও তার বিভাগ তখন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। দূরভাষ যন্ত্রও কাজ করছে না। বলতে কি, কোনরকম যোগাযোগ ব্যবস্থাই তখন নেই। উপযুক্ত বাসস্থান না থাকায় একখানা ঘরের মধ্যেই অফিস চালাতে হচ্ছে। রেডিও বা টেলিফোন যন্ত্রটাও রাখার জায়গা হয় নি ঘরের মধ্যে। কোনরকমে স্নান ও পায়খানা ঘরের মধ্যে সেটা রাখতে হয়েছে।

পাকিস্তানের অবস্থা আরও মন্দ। নতুন রাষ্ট্রের প্রায় সর্বত্রই নেই নেই অবস্থা। জিন্না তাঁর হারিয়ে যাওয়া 'ক্রিকেট' খেলার সরঞ্জাম খুঁজে পেলেও অন্য অনেক কিছুই পাওয়া গেল না। নতুন রাষ্ট্রের জন্য বরাদ্দ একশ'টা মালগাড়ি আর তাতে পাঠানো জিনিসপত্রের সবই প্রায় উধাও হয়ে বা হারিয়ে গেল। করাচি শহরে সরকারী কাজকর্ম তখন প্রায় শিকেয় উঠেছে। বসবার চেয়ার নেই, লেখবার টেবল নেই। কেরানীবাবুরা টাইপরাইটার যন্ত্র নিয়ে রাস্তার ফুটপাতে নেমে এসেছে। সেখানে বসেই ছাপা হ'ল বিশ্বের বৃহত্তম ইসলামিক রাষ্ট্রের পহেলা সরকারী নোট্। তখন হয়ত ঘরের মধ্যে মালের পেটির ওপর বসে উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসাররা প্রশাসন পরিচালনার খসড়া তৈরি করছেন।

পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কাঠামোটা তখন পুরোপুরি বেসামাল হয়ে গেছে। যদিও সারা পাকিস্তান জুড়ে কয়েক হাজার গুদামঘরের মধ্যে ঠাসা আছে গাঁটরি

www.pathagar.com

পার্টির কাঁচা পাট, চামড়া আর তুলো, কিন্তু তাদের পরিস্রুত করার উপযুক্ত কল-কারখানা একটাও না থাকায় গুদামজাত মাল নষ্ট হবার মুখে। অখণ্ড ভারতে যত তামাক উৎপন্ন হ'ত, তার চতুর্থাংশ তামাক এখন পাকিস্তানেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু সারা দেশে একটাও দেশলাই কারখানা না থাকায় সারা দেশে ধূমপানের অভ্যাসটাই বাতিল হবার জো হ'ল। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে মহাজনী কারবারটাও তখন সম্পূর্ণ পঙ্গু হয়ে গেছে কারণ ব্যাঙ্ক পরিচালনায় অভিজ্ঞ ম্যানেজার এবং কাজ জানা হিন্দু কেরানীরা সবাই তখন পাকিস্তান ছেড়ে পলাতক।

এমনকি তার প্রাপ্য পাওনাগণ্ডা নিয়েও ভারতীয় নেতাদের দুষ্টুমির মুখোমুখি হতে হ'ল পাকিস্তানকে। উদ্দেশ্যমূলকভাবে পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন করতেই প্রাপ্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হয় তাদের। পার্টিশন এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী পাকিস্তানের প্রাপ্য ১,৭০,০০০ টন ফৌজি রসদের বদলে তাদের জোটে মাত্র ৬০০০ টন রসদ। তিনশটা স্পেশ্যাল ট্রেন যোগে ভারত থেকে যে সেলাখানা আসার কথা তার বদলে পাকিস্তান পেল মাত্র তিনখানা স্পেশ্যাল ট্রেনের মাল। তায় বন্ধ ঝাঁপি খুলে পাকিস্তানের অফিসাররা যে বস্তুগুলো আবিষ্কার করলো তার কোনটাই সমরোপকরণ নয়। পাঁচহাজার ফৌজি জুতা, হাজার পাঁচেক অকেজো রাইফেল, নার্সের এ্যাপ্রন, কাঠের পেটি বোঝাই করে প্রতিষেধক ওষুধ এবং ইট। একেই বলে উপহাসের রাজভোগ।

তা এইসব হীন ফন্দিফিকির আর ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য যে কী সেটা বুঝতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়কদের কোন ধন্দ হ'ল না। যাতে আঁতুড়ঘরেই এই শিশু-রাষ্ট্রের গলা টিপে মারা যায়, তারই চেষ্টা করছে প্রতিবেশী ভারত। তাদের এই সন্দেহটা যে অমূলক নয় সেটা প্রমাণ হ'ল ফীল্ড্ মার্শ্যাল ক্লড্ অকিনলেকের গোপন প্রতিবেদনেও। ফৌজি রসদ বন্টনের ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত অকিনলেক তখন ভারতেই ছিলেন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছে গোপন নোট্ লিখে তিনি জানান, 'এটা স্বীকার করতে আমার কোন দ্বিধা নেই যে, বর্তমান ভারতীয় মন্ত্রি-পরিষদ যেন নির্দয়ভাবেই সংকল্প করেছেন যেন তেন প্রকারে পাকিস্তানের স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করা তাঁরা ঠেকিয়ে রাখবেন।'

তবে শুধু ভারতের দুরভিসন্ধিই নয়, পাকিস্তানের আতংকের আসল কারণ অন্যত্র ছিল। তবে এই বিভীষিকা শুধু পাকিস্তানের নয়, ভারতেও। নিয়ন্ত্রণরেখার দু অংশই তখন বন্যার প্লাবনের মতন মানুষের বিপুল ঢলে নিমজ্জিত হয়েছে। কার সাধ্য এই প্লাবন ঠেকায়! দুই পক্ষেরই কিছু কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষের ক্রিয়া-কলাপের অনিবার্য ফল হ'ল মানুষের এই অভিপ্রয়াণ বা মাইগ্রেশন। মানুষের ইতিহাসে এমন বিপুল প্লাবন আগে দেখা যায় নি। সারা পাঞ্জাবের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত মানুষের এই মহাযাত্রা বাঁধভাঙা বন্যার মতন ধেয়ে চলেছে একটু আশ্রয়ের খোঁজে। বলদগাড়ি, খচ্চর, সাইকেল; ট্রেন নিদেন হাঁটা পথেও লক্ষ লক্ষ ভীতত্রস্ত মানুষ, মাথায় বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে পাড়ি দিল একটা নিরাপদ গন্তব্যের দিকে। দুই অংশের মধ্যে এই বিপুল লোকবিনিময়ের মাত্রা-হীনতা ইতিহাসের পাতায় আগে লেখা হয় নি। সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি নাগাদ যখন উথলে উঠল মানুষের ঢল তখন সারা পাঞ্জাবের পথঘাট, মাঠ-ময়দানে নেমে পড়েছে অন্তত পঞ্চাশ লক্ষ গৃহহারা মানুষ। মাত্র তিনমাসের মধ্যে অন্তত

www.pathagar.com

দেড়কোটি বাস্তুহারা মানুষ, হাতে হাত লাগিয়ে মানবশৃংখল তৈরি করলে যারা কলকাতা থেকে নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত স্থূল স্তম্ভের আকার নিতে পারে, এই আলোড়নের আবর্তে পড়ে বিপন্ন হলো। বলতে কি, বিপন্ন মানুষের এই মহাযাত্রার কোন নজির ইতিহাসে নেই। মধ্য প্রাচ্যে যখন ইজরায়েল স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হ'ল, তখন যত মানুষ গৃহহারা বাস্তুহারা হয়েছিল তার দশগুণ বেশি মানুষ দুই পাঞ্জাবের মধ্যে বাস্তুহারা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব ইওরোপ থেকে পালিয়ে যাওয়া গৃহহীন মানুষের চেয়েও তিন-চার গুণ বেশি হলো এই এক্সডস্। হতভাগ্য বিতাড়িত মানুষের এই মহাবিদায় যে কতভাবে শুরু হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই।

বস্তুত, মানুষের এই বাস্তুত্যাগ যে যথার্থই বেদনাদায়ক কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করলেই তা টের পাওয়া যায়।

দিল্লির কাছাকাছি ছোট্ট শহর কারনালের মুসলমান পাড়ায় ঢোলশোহরত্ করে একদিন জানিয়ে দেওয়া হ'ল যে মুসলমানদের নিরাপদে পাকিস্তানে নিয়ে যাবার জন্য স্পেশ্যাল যাত্রীবাহী ট্রেন আনা হয়েছে। ঘোষণা শুনে এক ঘণ্টার মধ্যেই কুড়িহাজার মুসলমান অধিবাসী ঘরদোর ছেড়ে কারনাল স্টেশনে এসে হাজির হ'ল। ভারতীয় অংশের কশৌলি শহরের মুসলমান অধিবাসীদেরও একই রকম দুরবস্থা হ'ল এইরকম এক ঘোষণা শুনে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শহরের দু-হাজার মুসলমান অধিবাসীদের ঘরদোর জমিজমা ছেড়ে চলে যেতে বলা হ'ল। পরদিন সকাল থেকেই শুরু হয়ে গেল মানুষের পদযাত্রা। যার যতটুকু সম্বল কাঁধে ফেলে হতভাগ্য মানুষ যাত্রা করলো তার ঈপ্সিত দেশের উদ্দেশে।

চাচীর ঘরে বলির পাঁঠার মতন জিয়ানো থাকা মদনলাল পহ্ওয়ার ভাগ্যও অবশেষে প্রসন্ন হ'ল। তার এক জ্ঞাতি ভাইয়ের যোগাড় করা গাড়িতে টাকাকড়ি, জামাকাপড় মায় শিবঠাকুরের পটটাও সংগে নিয়ে পরিবারের সবাই গাড়িতে উঠলো। উঠলো না শুধু মদনলালের বুড়ো বাপ। তার এক চেনা জ্যোতিষীর মতে দিনটা নাকি শুভ নয়। তাই সকলের নিষেধ এবং এক মুসলমান বন্ধুর হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও সেই মুসলমানের গ্রামে ২৩শে আগস্ট সকাল পর্যন্ত থেকে গেল সেই বৃদ্ধ।

এই টানাপোড়েনে রেহাই পায় নি কেউ। কশৌলির লেডি লিন্‌লিথ্‌গো যক্ষ্মা হাসপাতালের মুসলমান রোগীদের এক ঘণ্টার নোটিশে স্বাস্থ্যাবাস থেকে চলে যাবার নির্দেশ দেয় হিন্দু ডাক্তাররা। এই অমানবিক নির্দেশ শুনে রোগীরা হতভম্ব। যে যেমন অবস্থায় ছিল সেইভাবেই স্যানাটোরিয়ম্ ছেড়ে যেতে বাধ্য হ'ল। কারও একটা ফুসফুস নেই, কেউ হয়ত অপারেশনের পর শয্যাশায়ী। কিন্তু এই বর্বর আদেশের নড়চড় হ'ল না। স্যানাটোরিয়ামের গেটের বাইরে ছেড়ে রেখে তাদের পাকিস্তান যেতে বলা হ'ল। এইরকম এক ঘণ্টার নোটিশ পেল পাকিস্তানের এক সাধুআশ্রম, লালবাবার আশ্রম। আশ্রমবাসী পঁচিশজন সাধুকে এক ঘণ্টার মধ্যে পাকিস্তান ছেড়ে যেতে বলা হ'ল। অথচ এই আশ্রমভবনে তারা দিনভর কত জপতপ করেছে। শাস্ত্রপাঠ করেছে, যোগ ব্যায়াম করেছে। আশ্রমের অধ্যক্ষ সুন্দরস্বামী গায়ে গেরুয়া কাপড় জড়িয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন আশ্রম-ভবন থেকে। তাঁর পিছনে পিছনে চললো আরও পঁচিশজন অনুচর। গান গেয়ে, মন্ত্রপাঠ করে তারা আনন্দিত মনে যাত্রা করলো দেবদেবীদের বিদায় দিয়ে। আশ্রমবাসী সাধুরা যখন অনেকখানি চলে গেছে, তখন গ্রামের মুসলমান অধি-

www.pathagar.com

বাসীরা আগুন লাগিয়ে দিল আশ্রমভবনে।

সেই মুহূর্তে অধিকাংশ রিফিউজির একমাত্র উৎকণ্ঠা হ'ল যাত্রার সময় যতটা সম্ভব নগদ টাকাপয়সা গুছিয়ে নেওয়া। মন্টোগোমারীর একজন হিন্দু ধনকুবের শুধু ঘুষ উৎকোচ দেবার জন্য তার কোমরের গেঁজের মধ্যে ৪০ হাজার টাকা সংগে নেয়। সে সময় অনেক হিন্দু ধনী শেঠ সোনাদানা উৎকোচ দিয়ে তাদের নিজেদের প্রাণ বাঁচায়। লাহোরের একজন ধনগৃধ্নু বণিক তার সারা জীবনের সর্বস্ব সঞ্চয় টাকাপয়সা, সোনাদানা ইত্যাদি একটা পেটিকার মধ্যে পুরে বাড়ির কুয়ার মধ্যে ফেলে দেয়। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল কোন একদিন ফিরে এসে এগুলো পুনরুদ্ধার করবে। রাওয়ালপিণ্ডির মতি দাস তার বাঁ হাতের মণিবন্ধে হাজার তিরিশ টাকা আর চল্লিশ ভরি সোনার একটা ছোট্ট প্যাকেট বেঁধে ভারতের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য ! এত সতর্কতা সত্ত্বেও এই সঞ্চয়টুকু ভোগ করতে পারে নি সে। একজন মুসলমান দুর্বৃত্ত তার বাঁ হাতটি কেটে এই অমূল্য সম্পদ হস্তগত করে নেয়।

মিঁয়াওয়ালি জেলার একজন গরিব চাষীবউয়ের যত দুশ্চিন্তা তার বুড়ো গরুটা নিয়ে। এমন মূল্যবান সম্পত্তিটা হাতছাড়া করে নিশ্চিন্ত হবার জো নেই। হয়ত এখুনি এটাকে কেটে খেয়ে ফেলবে ওই নরাধম পশুরা। আবার ওটাকে বহন করে নেওয়াও চলে না। অনেক ভেবে চিন্তে গরুর কপালে একটা সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিল চাষীবউ। যাতে অন্তত ওই অবোলা জীবটির অপঘাত মরণ না হয়।

লক্ষ্ণৌয়ের ধনী মুসলমান রমণী আলিয়া হায়দার বিমানের টিকিট কেটে মা আর বোনকে নিয়ে পাকিস্তান পাড়ি দেবার বন্দোবস্ত করেছে। কিন্তু গোল বাধলো পোশাক-আশাক আর গয়নাগাটি সংগে নেওয়া নিয়ে। মাত্র কুড়ি কেজি ওজনের মালপত্র সংগে নেবার অনুমতি আছে ওদের। সুতরাং সকাল থেকেই চাল গম মাপার দাড়িপাল্লায় জিনিসপত্র ওজন করার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। সে কি করুণ দৃশ্য। ডাঁই করা পোশাক-আশাক নিয়ে মাপামাপি চলছে। শেষ পর্যন্ত স্থির হ'ল যে বোন নেবে সোনার বুটি দেওয়া তার বিয়ের শাড়িখানা। মা নিলেন জপ করার নীল ভেলভেটের আসন আর আলিয়া নিল মুক্তো বসানো কাঠের বাক্সর মধ্যে রাখা 'কোরান'খানা। বাকী সমস্ত জিনিসপত্র লক্ষ্ণৌতেই পড়ে রইল।

মিঁয়াওয়ালির আর একজন ধনী হিন্দুর দুশ্চিন্তা হলো কি করে জমানো টাকাপয়সা বিধর্মীর কবল থেকে বাঁচানো যায়। পাছে অলস মুসলমানের হাতে লক্ষ্মীর অবমাননা হয়, তাই বলদেওরাজ আর তার ভাইরা ঠিক করলো যে ভিটে ছাড়ার আগে সিন্দুকের সব টাকাপয়সা নষ্ট করে দেবে। তাই করা হ'ল। সব ভাইরা মিলে সিন্দুকটা ছাতের ওপর তুলে নিয়ে গেল, তারপর তাড়া বাঁধা নোটের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিল। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো সিন্দুকের সব টাকা। তাদের সারা জীবনের সমস্ত সঞ্চয় এক মুহূর্তে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। হাউহাউ করে কেঁদে উঠলো বলদেওরাজ আর তার ভাইরা।

তবে কেউ কেউ ফিরে আসবে বলেই ভিটে ছেড়ে গেল। যেমন আহমেদ আব্বাস। পানিপথের এই মুসলমান সাংবাদিক গোড়া থেকেই পাকিস্তানের বিরোধী। তাই দাঙ্গার সময় সে এবং তার পরিবারের লোকজন জিন্নার স্বপ্নের দেশ পাকিস্তানে পালিয়ে গেল না। তারা কিছুদিনের জন্য আত্মগোপন করতে

www.pathagar.com

দিল্লি গেল। যাবার আগে একটা বোর্ডের গায়ে 'আবার ফিরে আসছি' লিখে সদর দরজায় টাঙিয়ে দিল।

কিন্তু ভিকি নুনের কাছে এমনভাবে পালিয়ে যাওয়া মোটেই বাঞ্ছিত হ'ল না। পাকিস্তানের জাঁদরেল নেতা ফিরোজ খাঁ নুনের এই সুন্দরী মেমসাহেব বউ তখন কুলু উপত্যকার মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অবসর কাটাচ্ছিল। এলাকাটা হিন্দু-প্রধান। একদিন ভিকির বাড়িতে একজন অচেনা লোক উপরচড়াও হয়ে জানিয়ে গেল যে সেদিন রাত্রেই তার বাড়িতে হিন্দুরা হামলা করবে। ব্যাপারটা ভিকির কাছে বেশ অস্বস্তিকর। কিছুটা শঙ্কিতও হ'ল সে। আত্মরক্ষার জন্য তার স্বামীর দেওয়া দুটো বন্দুক আর একখানা রিভলভার ছাড়া আর কোন আগ্নেয়াস্ত্র তার কাছে নেই। যাহ'ক, স্বামীর দুজন বিশ্বস্ত মুসলমান পরিচারকের হাতে বন্দুক দুটো দিয়ে ভিকি নিজের কাছে রিভলভারটা রেখে দিল। অবশেষে রাত হ'ল এবং রাত বাড়ার সংগে সংগে ঘন হ'ল অন্ধকার। ধীরে ধীরে অন্ধকার উপত্যকার সর্বত্র আগুনের স্ফুলিংগ দেখতে পেল ভিকি। ক্রমে নিকটবর্তী হ'ল সেই আগুনের স্ফুলিংগ। ভিকি বুঝতে পারলো যে তার প্রতিবেশী মুসলমান-দের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে হিন্দু দুষ্কৃতীরা এবং ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তার বাড়ির দিকে। এই আশঙ্কার কথা মনে হতেই ভয়ের শীতল স্রোত বয়ে গেল তার শিরদাঁড়া বেয়ে। ততক্ষণে আরও এগিয়ে এসেছে হামলাকারীরা। সেই মুহূর্তে বাইশ বছরের যুবতী ভিকির হঠাৎ মনে পড়ে দুজন সদ্য ধর্মান্তরিত আমেরিকান যুবকের কথা। বৌদ্ধধর্মমতে দীক্ষিত ওই দুজন আমেরিকান তাদের এক মহান উপলব্ধির কথা শুনিয়েছিল তাকে। ওদের সেই আন্তর উদ্ভাসের বাণীটি, যা ওদের উপলব্ধির ভিত্তিমূল, এই চরম মুহূর্তে ভিকির মনও আলো-কিত করে দিল। মনে মনে ভিকি বললো, 'এভ্রিথিং ইজ ট্র্যানসিটরি' (সবই ক্ষণস্থায়ী)। আকুল হয়ে বার বার এই বিবেকবাণীটি উচ্চারণ করলো ভিকি। হঠাৎই বদলে গেল অবস্থা। রাত তখন এগারোটা। ঝমঝম করে শুরু হ'ল বৃষ্টি। পাহাড়ি উপত্যকায় এই তান্ডব বর্ষা লন্ডভন্ড করে দিল হামলাকারীদের সব আয়োজন। বর্বর বৃষ্টির তোড়ে ভেসে গেল ওরা। আগুন নিভে গেল এক লহমায়। ঈশ্বরের কৃপায় আশ্চর্যভাবে বেঁচে গেল ভিকি। পরদিন সকালেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু মান্ডির হিন্দু রাজার প্রাসাদে এসে আশ্রয় নিল ভিকি। তবে সুন্দরী ভিকির জীবনে এই সোয়াস্তিটুকুও ক্ষণিক কারণ সেই থেকেই শুরু হ'ল তার দুঃসাহসিক ঝুঁকির জীবন।

ভয়, ক্রোধ, বিদ্বেষ বা ঘৃণার বিষ প্রথমে দেখা গিয়েছিল মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের মধ্যে। ক্রমে এই বিষ সারা পাঞ্জাবেই ছড়িয়ে পড়লো। পথঘাট, মাঠ-প্রান্তর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো দাংগাপীড়িত মানুষ। তখন দুটো দেশের সামনেই একটা ভয়ংকর সমস্যা হয়ে দাঁড়াল এই বৈরিতা। অথচ বাঁচার জন্য দুটো দেশেরই এখনো কত সংগ্রাম বাকি। দুর্ভিক্ষ মড়কের হিড়িক আছে, পুনর্বাসনের সমস্যা আছে। রীতিমত চিত্ত বিহ্বল করা এদের বিপুলতা। বিকারের ঝোড়ো বাতাসের মতন এর সংগে যুক্ত হয়েছে সাম্প্রদায়িক হাংগামা। এই মারাত্মক বিষ সারা পাঞ্জাব জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো বীভৎস আকারে। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘরদোর ছেড়ে পথে এসে দাঁড়াল। শুরু হ'ল আশ্রয়ের সন্ধানে মানুষের মূক পদযাত্রা। সারা পাঞ্জাবের চেহারাটাই বদলে দিল মানুষের এই গণপ্রয়াণ।

www.pathagar.com

একদিকে যেমন মুঘলদের কীর্তিস্তম্ভগুলো দেখবার জন্য একজন মুসলমানও থাকলো না, অন্যদিকে তেমনি লাহোর শহরের দু'লক্ষ অধিবাসীদের মধ্যে হাজার-খানেক শিখ বা হিন্দুও ভিটে কামড়ে পড়ে থাকলো না সেখানে। শুধু লাহোরের বিখ্যাত ভিক্টোরিয়ার স্ট্যাচুর নীচে কারা যেন রেখে গেল কালো রিং জড়ানো একটা পুষ্পস্তবক। সেই শেষ আগস্টে সারা পাঞ্জাব জুড়ে সাম্প্রদায়িক হানাহানি যখন তুংগ স্পর্শ করেছে, তখন পাঞ্জাবের সাধারণ মানুষ তাদের ভিটে ছাড়ার আগে শোকচিহ্নের প্রতীকরূপে এই স্মারকটি রেখে গেল মহারানী ভিক্টোরিয়ার পায়ের তলায়।

কলকাতা, আগস্ট ১৯৪৭

সেদিন প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্য। তারা অপেক্ষা করছে সেই বিস্ময়কর মানুষটির জন্যে যাঁর উপস্থিতিই বদলে দিয়েছে শহরের চালচিত্র। ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের নগরীতে ফিরে এসেছে দুর্লভ শান্তি। তাই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে দলে দলে মানুষ এসে জমায়েত হয়েছে এই সবুজ গালিচার মতন নরম ঘাসের গড়ের মাঠে, একদা যা পোলোঘোড়ার মনোরম ক্রীড়া-ভূমি ছিল। গান্ধীজী নিজেও ভাবতে পারেন নি এই বিপুল সমাবেশের কথা। তাঁর সদয় উদার দৃষ্টিও তাই যেন এই উচ্ছ্বাসে আপ্লুত হয়ে গেছে তখন। আজ মুসলমানদের পবিত্র ঈদ্ উৎসব। ওরা সবাই এই পবিত্র দিনটিতে তাঁর প্রার্থনা-সভায় এসেছে শান্তির ললিতবাণী শুনতে।

সকাল থেকেই তাঁর বেলেঘাটার সেই ইঁট বেরকরা ভাঙাবাড়ির সামনে দিয়ে দলে দলে মানুষ এসেছে। ওরা সবাই এসেছে ফুল আর মিষ্টি নিয়ে তাঁর আশীর্বাদ চাইতে। কিন্তু আজ সোমবার। তাঁর মৌনী থাকার দিন। তাই প্রায় সারাদিনই ওদের জন্য কিছু না কিছু বাণী লিখে পাঠিয়েছেন গান্ধীজী। জনতা তাতেই খুশী। রাস্তায় রাস্তায় শান্তি মিছিল বের করলো হিন্দু-মুসলমান একত্রে। ওরা স্লোগান দিল 'হিন্দু মুসলমান ভাইভাই।' সবাই সবাইকে আবেগে জড়িয়ে ধরলো, মিষ্টি বিলি করলো। অতি উৎসাহীরা ঝারি করে গোলাপজল ছিটালো সকলের গায়ে।

গান্ধীজী যখন ময়দানে এসে পেঁছলেন তখনো বেলা হয়নি। প্রার্থনামঞ্চের ওপর তাঁর ছোটখাট শীর্ণ শরীরটি দেখেই জনতা যেন বাঁধভাঙা জলের মতন উচ্ছল হয়ে উঠলো। গান্ধীজী তখন অভিভূত ওদের এই স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস দেখে। হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি, হাতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সামনে ভ্রাতৃপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে। তখন ঠিক সাতটা। গান্ধীজী দাঁড়িয়ে উঠলেন প্রার্থনা-মঞ্চের ওপর। বিপুল জনতার মধ্য থেকে উচ্ছ্বসিত হ'ল ওদের অভিবাদন। 'গান্ধীজী কি জয়!' হাতজোড় করে সবাইকে নমস্কার করলেন তিনি। তারপর মৌনব্রত ভেঙে সবাইকে সেদিনের প্রথম বাণীটি শুনিয়ে বললেন, 'ঈদ্ মুবারক!'

ওদিকের চেহারাটা অন্যরকম। হাজার হাজার বিপন্ন পাঞ্জাবী একটা নিশ্চিত

www.pathagar.com

আশ্রয়ের জন্য ছুটেছে লাল ইট আর টালিবসানো রেল ইস্টিশনের পাকা বাড়ির দিকে। সারা ভারতের প্রায় সব মফস্বল শহরেই ইস্টিশন নামক একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থল আছে এবং দাংগাপীড়িত মানুষেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এখানেই ছুটে এসেছে আশ্রয়ের সন্ধানে। ব্রিটিশ সরকারের প্রশাসনিক দক্ষতার প্রতীক এইসব রেল ইস্টিশনগুলো যেন বংশপরম্পরায় এ দেশের মানুষের জীবনযাত্রার সংগে জড়িয়ে আছে। কংক্রিটের তৈরি প্ল্যাটফর্ম মাড়িয়ে ঝিকঝিক শব্দ করে রেলগাড়িগুলো যখন চলে যায় তখন প্রায় রূপকথার গল্পের মতন তার রোমাঞ্চকর রেশ রেখে যায় ভারতবাসীর মনে। রীতিমত চিত্তবিমোহিত করা রোমান্টিক নাম এই সব রেলগাড়ির। পাঞ্জাব প্রদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। সেখানেও সব বিচিত্র নাম। ফ্রন্টিয়ার মেল, ক্যালকাটা-পেশোয়ার এক্সপ্রেস, বম্বে-মাদ্রাজ মেল ইত্যাদি। ঠিক যেন আন্তঃমহাদেশীয় ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস এবং ট্রানস-সাইবেরিয়ান ট্রেনের মতন এই উপ-মহাদেশটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে এইসব ভারতীয় রেলপথ এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফলগুলো ঘরে ঘরে পেৌঁছে দিচ্ছে।

তবে ১৯৪৭ এর এই আগস্টে রেলপথগুলো যেন হয়ে উঠেছে হাজার হাজার বিপন্ন মানুষের আতঙ্ক আর ত্রাস থেকে পালাবার একমাত্র বাহন কিংবা কোথায় বা চলন্ত শবাধার (রোলিং কফিন)। দূর থেকে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আসা ট্রেনগুলো চোখে দেখেই প্ল্যাটফর্মে পড়ে থাকা মানুষগুলোর মধ্যে একটা সাড়া পড়ে যায়। সমুদ্রের ঘন জলরাশি ভেদ করে জাহাজ যেমন এগিয়ে চলে তেমনি থইথই মানুষের সমুদ্র ভেঙে এগিয়ে চলেছে এই বাষ্পযান। সারা প্ল্যাটফর্ম জুড়ে অপেক্ষারত মানুষের মধ্যে শুরু হয়েছে হুড়োহুড়ি, মাতামাতি তান্ডব। সবাই ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে ওই বাষ্পযানের মধ্যে। হঠাৎই যেন এই আবর্তে কেউ একজন আলগোছে ছিটকে পড়লো ওই লৌহদানবের সামনে। সংগে সংগে হাড়গোড় থেঁতলে একতাল মাংসপিন্ড হয়ে গেল হতভাগ্য শরীরটা। খোলা আকাশের নীচে গায়ে রোদ ঘাম মেখে মানুষগুলো চোপর দিন বসে আছে এইভাবে। না জল, না খাবার। মাথার ওপর দাউ দাউ করে জ্বলছে সূর্য। তাই ট্রেন এসে থামলেই দরজায় দরজায় তারা মাথা খুঁড়ে মরছে একটু ঠাঁই পাবার জন্য। কিন্তু কোথাও তিল ধারণের ঠাঁই নেই। মাথায় পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে যে যেমন পারে কামরার ভিতরে ঢুকে পড়তে চাইছে। তাদের ধারণা যে কোনরকমে ভিতরে ঢুকলেই কামরার দুপাশ ভিড়ের চাপে প্রসৃত হবে এবং তাদের স্থান সংকুলান হবে। অনেকেই চেষ্টা করলো দুটো কামরার মধ্যের সংযোগকারী শিকলটা ধরতে। প্রতিটি কামরার গায়ে ততক্ষণে মাছির ঝাঁকের মতন লেপটে গেছে মানুষ। যখন ধরার কোন বস্তু থাকলো না, লোকগুলো তখন কামরার তপ্ত গড়ানে ছাদের ওপর উঠে গেল নির্বিকার। খানিকক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল যে প্রতিটি কামরার ছাতেই জটলা বেঁধে আছে অসংখ্য বাস্তুহারা মানুষ।

এইভাবে অষ্টাংগে দুর্গতির ভার নিয়ে হাঁসফাস করতে করতে অবশেষে ট্রেন ছাড়ার বাঁশি বাজলো। কামরার ছাতের ওপর মানুষগুলোর দুরবস্থার আর শেষ নেই। কয়লার ধোঁয়া, গায়ের ঘাম আর চিৎকার কোলাহলে ব্যতিব্যস্ত মানুষগুলো হঠাৎ অনুভব করলো নড়ে উঠেছে ট্রেন। বস্তুত তাই। আষ্টেপৃষ্ঠে মানুষ নিয়ে এবার গড়াতে শুরু করবে বাষ্পযান। কেউ জানে না মাথার ওপর এই বোঝা নিয়ে কোথায় চলেছে ট্রেন। তাই এই নিরুদ্দেশ যাত্রা কারও কাছে পরম ঈপ্সিত কারও

www.pathagar.com

কাছে বা স্রেফ মরণফাঁদ হয়ে দাঁড়াল।

যেমন ইস্কুলমাস্টার নিহাল ব্রান্বী কিংবা তাঁর বউ ছেলেমেয়ের কাছে এই যাত্রা মোটেই নিরাপদ হয় নি। বেচারা নিহাল। এই ছোট্ট পাকিস্তানি শহরে প্রায় বিশ বছর মাস্টারি করেছেন নিহাল। কত ছাত্র তৈরি করেছেন তিনি। তবুও এই শহরে তাঁর ঠাঁই হ'ল না। পাক্কা ছ'ঘন্টা ধরে প্ল্যাটফর্মের ওপর বসে থাকার পর কোনরকমে ট্রেনের মধ্যে একটু জায়গা পেয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু বাঁশি বাজিয়ে যখন শুধু ইঞ্জিনটা চলে গেল তখন কেমন যেন আতংক ছড়িয়ে পড়লো তাঁদের মনে। কামরার মধ্যে অপেক্ষারত মানুষগুলোর চোখে তখন ভয়ের ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে। তবে বেশিক্ষণ তাদের অপেক্ষা করতে হ'ল না। ইঞ্জিনটা চোখের আড়ালে চলে যেতেই মূর্তিমান বিভীষিকার মতন, 'আল্লা হো আকবর' বলতে বলতে একদল ভয়ঙ্কর চেহারার মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়লো ট্রেনের গায়ে। লোক-গুলোর হাতে চকচকে দা, সড়কি, বল্লম, লাঠি। তারা বেছে বেছে হিন্দুদের ধরে প্ল্যাটফর্মের ওপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো। সেখানে তখন সাক্ষাৎ যমের মতন আর এক দল পাষণ্ড হাতে ধারালো অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকজন হিন্দু পালাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু সবুজকুর্তা মুসলমানরা ওদের ধাওয়া করে ধরে ফেললো। তারপর নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে স্টেশনের সামনের পাতকুয়ার মধ্যে ফেলতে লাগলো। নিহাল আর তাঁর বউ ছেলেমেয়েরা তখন কামরার মধ্যে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। হঠাৎ কয়েকজন দুষ্কৃতী হাতে বন্দুক নিয়ে কামরার মধ্যে এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে লাগলো। গুলি লাগলো নিহাল আর তার ছেলের গায়ে। ছেলেটা কঁকিয়ে উঠলো 'জল' বলে। কিন্তু কোথায় জল? নিহালের বউ তখন দিশাহারার মতন সাহায্যের মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে। কেউ এগিয়ে এল না। ছেলেটা ধীরে ধীরে কেমন যেন নেতিয়ে পড়লো। আর কাঁদলো না সে।' নিহালও তখন নির্বাক হয়ে গেছেন। ঝরঝর করে রক্ত গড়াচ্ছে তাঁর মাথা থেকে। হঠাৎ তাঁর শরীরটা ঝাঁকিয়ে উঠলো। লাথি মারার মতন পাদুটো ছুঁড়লেন তিনি। তারপর স্থির হয়ে গেল তাঁর শরীরটা। নিহালের স্ত্রী বার দুই ঝাঁকালেন স্বামীর শরীরটা। কিন্তু প্রাণহীন শরীরটা আর সাড়া দিল না।

নিহালের স্ত্রীর চোখের সামনেই ঘটে গেল দুটো মৃত্যু। মেয়েরা তখন তাঁর শাড়ির খুঁট শক্ত করে চেপে ধরেছে। সেই অবস্থায় গুণ্ডাগুলো কামরা থেকে ওদের টেনে প্ল্যাটফর্মের ওপর নামালো। বড় মেয়ের মাথায় লোহার ডাণ্ডা মারলো একজন। কাটা কলাগাছের মতন মেয়েটা মাটিতে পড়ে গেল। একবার শুধু 'মা' বলে সে হাতটা বাড়িয়েছিল তারপরই স্থির হয়ে গেল। অমানুষগুলো ইতিমধ্যে নিহাল আর তার ছেলের মরা শরীরদুটো ট্রেন থেকে নামিয়েছে। কয়েক-জন লোক মড়া দুটো টানতে টানতে কুয়ার মধ্যে ফেলে দিল। চোখের সামনে এই বীভৎস দৃশ্য দেখে নিহালের বউ তখন যেন উন্মাদ হয়ে গেছে। পাগলিনীর মতন ছুটোছুটি করতে লাগলো সে। যে দুটি সন্তান তখনও বেঁচে আছে তারাও যেন মায়ের এই দাপাদাপি দেখে স্তব্ধ হয়ে গেছে আতঙ্কে। কি হ'ল ওদের মায়ের? সত্যিই তাই। নিহালের বউ তখন আর মানুষ নেই। অনুভূতিহীন একটা জড়বস্তু হয়ে গেছে সে।

সেদিন দুহাজার যাত্রীর মধ্যে মাত্র একশ'জন যাত্রী কোনরকমে রক্ষা পায় এবং

www.pathagar.com

শেষমেশ তাদের নিয়েই ট্রেনটা পাঞ্জাবের আর এক মুলুকের দিকে যাত্রা করে।

হিন্দুর জ্যোতিষশাস্ত্র যে নির্ভুল বিজ্ঞান নয় বোধহয় এই জ্ঞানটুকু পেতেই কাশ্মীরিলাল বেঁচে ছিল। শুভ দিন দেখে যাত্রা করলেও এ যাত্রা সে প্রাণে বাঁচতে পারলো না। ট্রেন ততক্ষণে ভারত সীমান্তের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। হঠাৎ এক জায়গায় ট্রেনের গতি মন্থর হতেই একদল মুসলমান দুর্বৃত্ত হাতে ছুরি ছোরা নিয়ে লাফিয়ে উঠলো মেয়েদের কামরায়। তারপর চুড়ি, বালা, হার, মাকড়ি যা পেল তাই ছিনিয়ে নিল এবং যুবতী মেয়েদের ট্রেন থেকে বাইরে ফেলে নিজেরাও লাফিয়ে নেমে পড়লো তাদের পিছুপিছু। কেউ কিছু বোঝার আগেই ঘটে গেল ব্যাপারটা।

ইতিমধ্যে আর এক দল দুর্বৃত্ত তখন কাশ্মীরিলালের কামরাতেও উঠে পড়েছে। খোলা তরোয়াল হাতে ওদের দেখেই ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠলো যাত্রীরা। কাশ্মীরিলালের সামনের সীটে বসে থাকা মেয়েটা তখন থরথর করে কাঁপছে। হঠাৎ একজন তার গলায় এক কোপ দিল তরোয়ালের। কি বীভৎস কাণ্ড! কিন্তু মেয়েটার গলা থেকে খসে পড়লো না মুণ্ডটা। ঘাড় নড়বড়ে পুতুলের মতন কেমন অদ্ভুতভাবে ঘাড়ের সঙ্গে শিরার বন্ধনীতে (টেন্ডন্) আটকে রইল। এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে কাশ্মীরিলালের মুখচোখ তখন বিস্ফারিত হয়ে গেছে। সবচেয়ে ভয়ানক লাগলো মেয়েটির কোলের বাচ্চাটার দিকে চেয়ে। একমুখ হাসি নিয়ে অবোধ বাচ্চাটা তখন মায়ের ঝুলে পড়া মাথাটার দিকে চেয়ে আছে। অবশ্য এই নির্মম দৃশ্য বেশিক্ষণ দেখতে হ'ল না কাশ্মীরিলালকে। এক জোড়া ছোরা তার পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল দুজন। সঙ্গে সঙ্গে কামরার মেঝের ওপর গড়িয়ে পড়লো কাশ্মীরি। তখনো তার ক্ষীণ জ্ঞান আছে। সেই অবস্থাতেই তার মনে হ'ল কারা যেন তার পা থেকে দামী নাগরা জোড়া খুলে নিচ্ছে।

মুদী ধানীরাম ব্যাপারটা আগেই আঁচ করতে পেরেছিল। তাই ছেলেমেয়েদের নিয়ে কামরার মেঝের ওপর মড়ার মতন শুয়ে পড়ে। ততক্ষণে দুমদুম করে আরও ক'টা মানুষের লাশ তাদের ঘাড়ের ওপর পড়েছে। কামরার মেঝেয় তখন গড়াগড়ি যাচ্ছে মানুষের মড়া। রক্তের বন্যায় ডুবে গেছে জ্যান্ত ধানীরাম আর তার ছেলে-মেয়েরা সেদিন এইভাবেই গায়ে মুখে মড়ার রক্ত মেখে ধানীরাম আর তার পরিবারের অন্যরা প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল।

সীমান্ত রেখার দুদিকেই তখন ট্রেন বোঝাই হয়ে মানুষ পালাচ্ছে। ফলে এইসব অসহায় নিরীহ মানুষরা দুর্বৃত্তদের কাছে সবচেয়ে নিরাপদ শিকার হয়ে দাঁড়াল। কোন স্টেশনে গাড়ি থামলেই সকলের অলক্ষ্যে এরা ট্রেনের মধ্যে ঢুকে পড়তো। তারপর হয় চেন টেনে কিংবা নির্জন মাঠময়দানের কাছে রেল-পথের ওপর পাথর ফেলে তারা ট্রেন দাঁড় করিয়ে দিত। কখনও বা চালকদের উৎকোচ দিয়ে বা ভয় দেখিয়েও ট্রেন থামানো হ'ত কোন নির্দিষ্ট জায়গায়। তার-পর শুরু হ'ত নির্বিচার খুন বা হত্যা। পুরুষদের বেলায় তার লিঙ্গটাই হ'য়ে দাঁড়াল হিন্দু বা মুসলমান চেনার একমাত্র নির্ভরযোগ্য চিহ্ন। ভারতে যেমন সুন্নত করা লিঙ্গ দেখে নির্বিচার মুসলমান বধ শুরু হ'ল তেমনি বিপরীত হলো পাকিস্তানের ক্ষেত্রে।

এইভাবে পরপর চার-পাঁচদিন ধরে লাহোর বা অমৃতসর স্টেশনে ট্রেন বোঝাই হয়ে হত বা আহত যাত্রী আসতে লাগলো। একদিন লাহোরের রেলরোড স্টেশনে

www.pathagar.com

এক অমানুষিক দৃশ্যের সাক্ষী হ'ল ইউ.সি. দুবে নামে এক ফৌজি অফিসার। স্বাধীনতা দিবসে ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই ফৌজি অফিসারটি তাদের মেস-এ ভারতীয় পতাকা উড়ান হতে দেখে উল্লাসে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেদিন সে জানতো না আর ক'টা দিন পরেই এই ভুয়া স্বাধীনতার কী কঠিন দাম তাদের দিতে হবে। লাহোরের রেলরোড স্টেশনে এসে যখন দাঁড়ালো গাড়িখানা তখন যেন ভয়ে আতঙ্কে ধুঁকছে। গাড়িখানা বোঝাই হয়ে আছে মৃত অর্ধমৃত মানুষের লাশে। দুবে তখন ভারতের যোগাযোগ অফিসার রূপে লাহোরে কর্মরত। স্তম্ভিত হয়ে সে দেখলো যে গরমকালে যেমন ট্রেনের রেফ্রিজারেটর কার থেকে জল চুঁইয়ে পড়ে, তেমনি প্রতিটি কামরার ভেজানো দরজা দিয়ে অবিরাম চুঁইয়ে পড়ছে রক্ত।

আক্রমণের কলাকৌশল আর খুনের নিষ্ঠুরতায় শিখ 'জাঠার' তখন খুবই হাঁকডাক। ইতিমধ্যেই ওরা নিজেদের আলাদা করে চিনিয়ে দিয়েছে, যদিও এর দরুন একটা সাহসী জাতির আচরণে কিছু কালো দাগ পড়ে গেছে। এইরকমই এক নিষ্ঠুর এবং সুপরিকল্পিত গণহত্যার ঘটনা ঘটে অমৃতসর স্টেশনে। ট্রেনটাকে থামিয়ে দেবার পর সেবাকর্মীর ছদ্মবেশে শিখরা ট্রেনের প্রতিটি কামরায় ঢুকে পড়ে। তারপর আহত মুসলমান যাত্রীদের শুশ্রূষা করার ছুতায় সবাইকে হত্যা করে। বকধার্মিক এবং শিখ 'জাঠা' দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছিল 'লাইফ্ ম্যাগাজীন' পত্রিকার আলোকচিত্রশিল্পী মার্গারেট বুর্কের। সে দেখলো, অমৃতসর স্টেশন প্ল্যাটফর্মের ওপর দাড়িওলা শিখরা বসে আছে ধ্যানী সন্ন্যাসীর মতন। গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা, মাথায় হালকা নীল রঙের পাগড়ি পরে শিরদাঁড়া খাড়া করে ওরা বসে আছে। দেখে বেশ শ্রদ্ধাভক্তি হয়। কিন্তু ওদের কোলের ওপর আলগোছে পড়ে থাকা খোলা কৃপাণগুলো দেখে গা শিউরে ওঠে। রোদের আলোয় চকচক করছে কৃপাণের ফলা। অধীর আগ্রহ নিয়ে ওরা তাকিয়ে আছে কখন মানুষভর্তি হয়ে পরের ট্রেনটা আসবে।

কামরার মধ্যে সামরিক গার্ড থাকলেও কাজের কাজ কিছু হ'ত না। স্বজাতি প্রীতির দরুন দুর্বৃত্তরা প্রায়ই রেহাই পেয়ে যেত। রক্ষীবাহিনীর হাতের বন্দুক হাতেই থেকে যেত। আবার সাহস, বীরত্বের ঘটনাও আছে। পাকিস্তান সীমান্তের কাছাকাছি এসে একবার একটা ট্রেনের গতি মন্থর হয়ে যায়। ট্রেন বোঝাই হয়ে মুসলমান উদ্বাস্তু যাত্রীরা পাকিস্তানের সীমান্ত স্টেশনের দিকে চলেছে। জায়গাটা আবার অমৃতসর স্টেশন থেকেও বেশি দূরে নয়। এমনভাবে হঠাৎ গতি কমে যাওয়ায় ট্রেনের সব মুসলমান যাত্রীরাই তখন বিপন্ন অসহায় বোধ করছে। সেই অবস্থায় আমেদ জাহুর নামে একজন রেলকর্মী সাহস করে, প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ইঞ্জিন চালকের কেবিনে পৌঁছে যা দেখলো তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে দেখলো দুজন দৈত্যকায় শিখ গাড়ির হিন্দু চালকের হাতে একতাড়া নোট গুঁজে দিচ্ছে। আমেদ জাহুর অনুমান করলো যে তাদের ট্রেনটাকে নিশ্চয়ই অমৃতসর স্টেশনে থামিয়ে দেবার নির্দেশ দিচ্ছে ওরা। সে সংগে সংগে ছুটলো ট্রেনের সংগে গমনরত সামরিক রক্ষী বাহিনীর ইংরেজ লেফ্টেন্যান্টের কাছে এবং ঘটনা ফাঁস করে দিল। এরপর যা ঘটলো তা যেন হলিউডের দুঃসাহসিক চলচ্চিত্রকেও হার মানায়। সেই যুবক ব্রিটিশ লেফ্টেন্যান্ট দুজন সংগী নিয়ে পিস্তল হাতে কামরার ছাতে উঠে পড়লো। তারপর চলন্ত ট্রেনের এক কামরা থেকে আর এক

www.pathagar.com

কামরায় লাফ দিতে দিতে এসে পৌঁছল ড্রাইভারের কেবিনের মধ্যে। ওদের দেখেই গাড়ির হিন্দু চালক প্রায় থামিয়ে দিয়েছিল ট্রেন। কিন্তু ব্রিটিশ ফৌজি অফিসারটি তাকে সে সুযোগ দিল না। পিস্তলের বাঁট দিয়ে তার মাথায় ঘা দিতেই লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। তার সংগী দুজন তখন সেই হিন্দু চালককে বেঁধে ফেলেছে। সেই অবস্থায় গাড়ির গতি ঘণ্টায় ষাট মাইল বাড়িয়ে দিল সেই ইংরেজ ফৌজি অফিসারটি। ব্যাপারটা এমন আচম্বিতে ঘটে গেল যে কেউই জানতে পারলো না। ট্রেনের হাজার তিন যাত্রী হঠাৎ অনুভব করলো যে গাড়ি যেন ঝড়ের বেগে ছুটছে। শুধু তারাই নয়, অমৃতসর স্টেশনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা রক্তলোলুপ শিখ 'জাঠা'ও তখন স্তম্ভিত হয়ে গেছে। হাতে খোলা কৃপাণ নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তারা। হঠাৎ দেখলো ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে তাদের চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল ট্রেনটা। সেদিন সারা ট্রেনের যাত্রীরা যখন নিরাপদে সীমান্ত স্টেশনে এসে পৌঁছল, তখন কৃতজ্ঞতায় তাদের চোখে জল এসে গেছে। ওই সাহসী তরুণ ইংরেজ অফিসারটিকে আবেগে জড়িয়ে ধরলো সবাই। তারপর নোটের মালা গেঁথে তার গলায় পরিয়ে দিল।

পাঞ্জাবের ট্রেনগুলো তখন মরণফাঁদ। সিমলা থেকে সেদিন যে ট্রেনটা দিল্লি আসছিল তার অধিকাংশ যাত্রীই মুসলমান। খোদ বড়লাটের এই নিজস্ব ভৃত্য-কুলের মধ্যে হিন্দুও আছে। দীর্ঘকাল ধরে পাশাপাশি কাজ করে বড়লাটের হেঁসেল সামলেছে তারা। কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড! শোন্‌পত্‌ স্টেশনের কাছে বোমা ফাটিয়ে ট্রেনটাকে যখন থামিয়ে দেওয়া হ'ল, তখন ওত্‌ পেতে দাঁড়িয়ে থাকা শিখেদের সংগে হিন্দুরাও ঝাঁপিয়ে পড়লো মুসলমানদের ওপর। একটা কামরার মধ্যে লর্ড ইসমের মেয়ে সারা ইস্‌মেও দিল্লি আসছিল। তার সংগে ছিল ফ্লাইট লেফ্‌টেন্যান্ট ওয়েণ্টি বুমণ্ট, তার প্রেমিক। ওদের কামরার মধ্যেই বড়লাটের খাস বেয়ারা আব্দুল হামিদও লুকিয়েছিল বাক্সপেঁটরার আড়ালে। শোন্‌পত্‌ স্টেশনে গাড়ি থামতেই দুজন সুবেশ হিন্দু ওদের কামরায় ঢুকলো। তারপর হামিদকে ওদের হাতে তুলে দিতে বললো। ওদের দাবি শুনেই সারা ইস্‌মে কর্তব্য স্থির করে ফেললো। স্মিথ্‌ এ্যাণ্ড ওয়েসন কোম্পানির রিভলভরটা ওদের দিকে তাক করে তখনই কামরা ছেড়ে ওদের বেরিয়ে যেতে বললো। বলাবাহুল্য ওই তেজী ইংরেজ মেয়েটির সাহসের জন্যই আবদুল হামিদ সেদিন প্রাণ নিয়ে দিল্লি পেঁছিতে পেরেছিল।

সেই সময় পাঞ্জাবের ট্রেনগুলোর নামকরণ হয় রোলিং কফিন্‌স্‌ বা চলন্ত শবাধার। বাস্তবিক তাই। প্রতিটি ট্রেনের মধ্যে তখন যেন হত্যার মচ্ছব শুরু হয়ে গিয়েছিল। সারা পাঞ্জাব জুড়েই চলেছে এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড চেহারা চরিত্রে যার প্রতিটি ঘটনাই আগের ঘটনার চেয়ে নিষ্ঠুর। অন্তত এইসব অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের কোন সংগ্রহগ্রন্থ থাকলে অনুমান করা যেত এদের নিষ্ঠুরতার। এইরকমই এক অমানুষিক ঘটনা চাক্ষুষ করার দুর্ভাগ্য হয় আমেরিকান ট্রেকটর কোম্পানির প্রতিনিধি রীচার্ড ফিগারের। সেদিন এই মার্কিন যুবক চোখের সামনে যে বীভৎস হত্যাকাণ্ড দেখেছিল তার স্মৃতি চিরকাল তাকে তাড়া করে বেড়াবে। কোয়েটা ও লাহোরের মাঝামাঝি একটা জায়গায় ট্রেনটা থামতেই অনেক মানুষের চিৎকার শুনতে পেল ফিশার। তারপর মুখ বাড়িয়ে সে যা দেখলো তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেল। একদল মুসলমান ট্রেনের কামরায় উঠে শিখদের ধরে

www.pathagar.com

প্ল্যাটফর্মের ওপর ছুঁড়ে দিচ্ছে। আর অন্য একদল মুসলমান হকি স্টিকের ঘা দিয়ে পিটিয়ে মারছে জ্যান্ত মানুষগুলোকে। ভয় পাওয়া ইদুঁরের মতন ছুটো-ছুটি করছে অসহায় শিখেরা আর হাতে হকিস্টিক নিয়ে তাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে মুসলমান দুর্বৃত্তরা। সে কি ভয়ংকর দৃশ্য! ফট্‌ফট্‌ শব্দে মাথার খুলি ফাটছে, মড়মড় শব্দ হচ্ছে হাড়ভাঙার। অসহায় মানুষের করুণ আর্ত হাহাকারের সঙ্গে তখন মিশে গেছে আর একদল মানুষের উন্মত্ত উল্লাস। এইভাবে মোট তেরজন শিখকে ওরা ধরাশায়ী করলো। যতক্ষণ একটা দেহও নড়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত স্টিক পেটা করেছে ওরা। তারপর পাশাপাশি তেরটা লাশ যখন স্থির হয়ে গেল, তখন ট্রেনটা আবার চলা শুরু করলো।

তবে ফিশারের অবাক হওয়া তখনও বাকি ছিল। লাহোর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে এই মার্কিন যুবকটি দেখলো যে ডাঁই করা মড়ার পাশে আলোকশিখার মতন জ্বলজ্বল করছে একটা স্মারকচিহ্ন। সুখের দিনের এই স্মারকচিহ্নটা পাঞ্জাবের সব স্টেশনেই রাখা থাকতো তখন। চিহ্নর তলায় লেখা, 'যাত্রীসাধারণকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, যাত্রীসেবার ক্ষেত্রে কোন অভিযোগ থাকলে স্টেশন মাস্টারের 'অফিসঘরে' রক্ষিত অভিযোগ পুস্তিকায় তাঁরা তা দায়ের করতে পারেন।' ফিশারের মনে হ'ল হায়! মানুষের মাত্রাবোধের কি নির্মম পরিণতি!

কলকাতা, আগস্ট ১৯৪৭

গান্ধীজীর প্রার্থনাসভায় সেদিন প্রায় দশলক্ষ মানুষের সমাগম হয়েছে। অধীর অপেক্ষা নিয়ে তারা বসে আছে কখন তিনি আসবেন। বলতে কি, প্রায় রোজই যেন জনসমাবেশ উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছিল। এই এক পক্ষকালের মধ্যে সারা পাঞ্জাব যখন খুনের নেশায় মাতাল হয়ে গেছে, তখন কলকাতার আরও আরও মানুষ আসছে তাঁর প্রার্থনাসভায়। কিছুকাল আগেও যে শহরটা ছিল দস্যিদানোর শহর, বর্বর নিষ্ঠুর আচরণের দরুন যা ঊষর মরুভূমি হয়ে গিয়েছিল, সেখানেই আজ যেন রঙিন ফুলের বাহার ফুটে উঠেছে। একজন ক্ষীণ শীর্ণ মানুষের হাতের ছোঁয়া পেয়ে শুকনো তাপদগ্ধ ধুধু মরু থেকে সুধা শ্যামলিম উদ্যান পরিণত হ'ল কলকাতা। এখানকার মানুষ ভুলে গেল তার হিংস্র অতীত। শান্তির ললিতবাণী আর যেন ব্যর্থ পরিহাসের মতন কানে শোনাচ্ছে না। কলকাতা শহরের এই অলৌকিক বদল দেখে সারা বিশ্ব তখন তাজ্জব বনে গেছে। নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্‌ পত্রিকা ত লিখেই দিল, কলকাতা যেন 'ওয়ান্ডার অফ ইন্ডিয়া!'

তা বিস্ময়কর এই বদলটা যিনি ঘটালেন তিনি কিন্তু তেমনি নির্বিকার। লোকের খাতির সোহাগে এতটুকু বিগলিত নন। সবাইকে বলে বেড়াচ্ছেন এ প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য নয়। 'হরিজন' পত্রিকায় লিখলেন, 'ঈশ্বরের হাতের খেলনা আমরা। যেমন তিনি নাচান তেমনি আমরা নাচি।' তবে অন্যে যে যা বলুক লুই মাউন্টব্যাটেন তাঁকে যোগ্য সম্মান জানাতে কার্পণ্য করলেন না। মহান সীজারের প্রাপ্য সম্মান জানালেন চিঠি মারফত। চিঠিতে লিখলেন, 'পঞ্চান্ন হাজার সেনাবল নিয়েও পাঞ্জাব অসহায়। ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে সেখানকার দাঙ্গার

www.pathagar.com

আয়তন। কিন্তু বাংলার সেনাবাহিনীতে একজনই সৈনিক আছেন ; একজন শীর্ণকায় মানুষ তিনি। আশ্চর্য ! বাংলার মাটিতে আজ কোন হিংসা নেই, দাঙ্গার ঘটনা একটাও নেই।' তাই ওই 'বিষণ্ণ, মনমরা চড়াই' পাখির কাছে (ডীজেক্‌টেড্‌ স্প্যারো) সর্বশেষ ভাইসরয়রূপে 'এই সম্মানপত্র পাঠিয়ে আমি ধন্য, কৃতার্থ।'

পাঞ্জাব, আগস্ট ১৯৪৭

খোলা গাড়িতে পাশাপাশি বসে চলেছেন দুই নেতা। পাশাপাশি অবস্থিত দুটি স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রের দুই প্রধানমন্ত্রী ওঁরা। তিন দশক ধরে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম করে ভারত ও পাকিস্তান নামক এই দুটি নবীন রাষ্ট্রশাসনের অধিকার তাঁরা পেয়েছেন। তাই এই জন্মলগ্নের জয়োল্লাসে দেশবাসীর শ্রদ্ধার শিরোপা মাথায় নিয়ে মেতে ওঠার হক্‌ তাঁদের আছে। কিন্তু জয়ধ্বনি শোনা যাচ্ছে না কেন ? ওঁদের যাত্রাপথের দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো অমন বিষণ্ণ, মনমরা কেন ? বস্তুত তাই। খোলা গাড়িতে পাশাপাশি বসে চলেছেন দুই রাষ্ট্রের দুই প্রধানমন্ত্রী, জওহরলাল নেহরু এবং লিয়াকাত আলী খান্‌। রাস্তার মানুষ স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে আছে ওঁদের দিকে। ওদের মুখে আর যা থাকুক স্বাধীন হবার আনন্দ বা খুশী নেই। কৃতজ্ঞতায় উদ্ভাসিত একখানা মুখও চোখে পড়লো না এই দুই নেতার। সারা পাঞ্জাবে এটা ওঁদের দ্বিতীয় সফর। ওঁরা বেরিয়েছেন একটা সূত্র খুঁজে পেতে যাতে পাঞ্জাবে শান্তি ফিরিয়ে আনা যায়। যাতে হিজিবিজি দাগ টানা ওই ভ্রষ্ট ল্যান্ডস্‌কেপের দৃশ্যচিত্রটা শ্রীময়ী করা যায়।

কিন্তু পাঞ্জাবে সবকিছুরই রাস তখন আলগা হয়ে গেছে। কোথাও সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই। সমস্ত বিভাগ ভেঙে পড়েছে। সেনাবিভাগের বিশ্বস্ততা যেন দায়সারা কর্তব্যপালন মাত্র। ওদের প্রশাসন এমনই নির্বিকার যে মনেই হয় না অস্তিত্ব আছে। কোথাও আবার ঠিক উল্টো। সরাসরিভাবেই কোন না কোন পক্ষ টেনে ওরা কাজ করছে। মোটকথা, সারা পাঞ্জাবে কেমন যেন জবুথবু আড়ষ্ট হয়ে গেছে শাসনপ্রণালী। ওঁদের গাড়ি তখন পরের পর বিধ্বস্ত গ্রাম ও জনপদগুলো ঝড়ের বেগে পেরিয়ে চলেছে। কোথাও বা মাইলের পর মাইল পড়ে আছে ধুধু বন্ধ্যা কৃষিজমি। আর সেই শুকনো মাঠের বুক চিরে চলেছে ছিন্নমূল মানুষের মিছিল। একদল হতাশ মানুষ নিঃশব্দে মুখ বুজে তাদের পূর্বপুরুষের পাপের ভার মাথায় নিয়ে চলেছে সামান্য একটু আশ্রয়ের খোঁজে। শিখ ও হিন্দু চলেছে পূবের দিকে আর মুসলমান চলেছে পশ্চিমের দিকে। শেষ হয়ে গেছে ওদের 'বন্দরের কাল।' তাই নতুন সমুদ্রতীরের দিকে চলেছে ওরা। অসহায় মানুষের এই মিছিল দেখে গাড়ির পিছনের সীটের মধ্যে যেন ঢুকে গেলেন দুই নেতা। একি দৃশ্য তাঁরা দেখছেন ? কার পাপের বোঝা বইছে ওরা ? **'এ আমার এ তোমার পাপ !'** মানুষের এই ভগ্নদশা দেখে দুই নেতাই ভেঙে পড়লেন যেন।

www.pathagar.com

শেষপর্যন্ত এই দুঃসহ নীরবতা নেহরুই ভাঙলেন। লিয়াকাত্ আলী খানের দিকে চেয়ে প্রায় বিড়বিড় করার মতন বললেন, 'দেশভাগ এ কি পাপ নিয়ে এল আমাদের জীবনে! এমন হ'ক এ ত আমরা কেউ চাই নি! আমরা ভাইভাই হয়েই থাকতে চেয়েছি। তবে কেন এমনটি হলো?'

লিয়াকত আলীও যেন নিজেকে শোনাতেই চাপা স্বরে বলে উঠলেন, 'বোধহয় আমার দেশের মানুষ আর মানুষ নেই। তারা পাগল হয়ে গেছে সবাই।'

সত্যই তাই। দেশের মানুষ আর মানুষ নেই। নইলে সবাই এমন উন্মত্ত হয়ে যাবে কেন? হঠাৎ সেই ছিন্নমূল মানুষের স্রোত থেকে একটা লোক ছিটকে বেরিয়ে এল ওঁদের গাড়ির দিকে। লোকটা হিন্দু। দুর্বহ মানসিক যন্ত্রণায় লোকটার মুখখানা বিকৃত হয়ে গেছে। থেকে থেকে কান্নায় কেঁপে উঠছে তার শরীর। লোকটা নেহরুকে চিনতে পেরেছে। তাই ছুটে এসেছে তাঁর গাড়ির দিকে। তার ধারণা নেহরু একজন মস্ত মানুষ। তিনি দিল্লির সাহেব। তিনি চাইলেই তাকে সাহায্য করতে পারেন। লোকটার দুচোখ দিয়ে তখন ঝরঝর করে জল ঝরছে। চোখের জল আর নাকের শ্লেষ্মা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। অচেনা লোকটা তখন তার দুহাতের দোমড়ান আঙুল দিয়ে বাতাসটা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছে। হাতের ভঙ্গিটা প্রায় যেন অনুগ্রহ চাওয়ার মতন। নেহরুর সাহায্য চায় লোকটা। একদল মুসলমান দুর্বৃত্ত তার দশ বছরের মেয়েকে লুট করে নিয়ে গেছে। বড় ভালবাসত সে এই মেয়েকে। নেহরু কি পারেন না তার মেয়েকে বাপের কোলে ফিরিয়ে দিতে?

না, পারেন না নেহরু। অসহায় নেহরু গাড়ির পিছনের সীটের মধ্যে তখন প্রায় নিমজ্জিত। কেমন যেন আচ্ছন্ন নেতিয়ে পড়া অবস্থা তাঁর। মানুষের এই চরম দুরবস্থার সংগে এমন মুখোমুখি সাক্ষাৎ আগে কখনও ঘটে নি তাঁর। তাই জানতেন না যে তিনি কত অসহায়। তিরিশ কোটি মানুষের প্রধানমন্ত্রী হয়েও তিনি ওই হতভাগ্য পিতার কোলে তার হরণ করা মেয়েকে ফিরিয়ে দিতে পারেন না। কোন অঘটন ঘটিয়েও তিনি তা পারেন না। সত্যই ভারী অসহায় তিনি। মনের তীব্র যাতনায় নেহরু তখন পীড়িত। সেই অবস্থায় দুহাতে মাথা ধরে গাড়ির মধ্যে মুখ লুকোলেন। আর সেই শোকার্ত পিতাকে শান্তভাবে সরিয়ে নিয়ে গেল নেহরুর দেহরক্ষী।

সে রাতটা নেহরুর নিদ্রাহীনই কাটলো। সকালের ঘটনা তখনও তাঁকে নাড়া দিচ্ছে। লাহোর শহরের যে বাড়িটায় তিনি আছেন, দুশ্চিন্তার বোঝা মাথায় নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত তার বারান্দায় পায়চারি করলেন। কে জানতো, এ দেশের মানুষ এত সাম্প্রদায়িক, এত নিষ্ঠুর! তাঁর জীবনের এক তীব্র ব্যথার উপলব্ধি এই সাম্প্রদায়িকতা। মানুষের এই অধঃপাতের বিন্দুবিসর্গও তাঁর জানা ছিল না। অবশ্য তিনি জানেন যে তাঁর এই দুর্বলতার কোন দাম তাঁর একমাত্র বন্ধুবেশী শত্রু (ফ্রেন্ডলি ফো) প্যাটেলের কাছে নেই। এ যেন কোন ধর্তব্যের ব্যাপারই নয় প্যাটেলের কাছে। দিব্যি কাঁধ ঝাঁকিয়ে প্যাটেল হয়ত বলে বসবেন 'এ ত জানাই ছিল!' কিন্তু নেহরু তেমনটি হতে পারবেন না। অনুভূতিগুলো অমনভাবে মন থেকে ঝেঁটিয়ে দূর করে দিতে পারবেন না। মানুষের প্রতি মানুষের এই ঘৃণাবোধ তাঁর সত্তার শিকড় ধরে নাড়া দিয়েছে। সারা পাঞ্জাব জুড়ে যে তাণ্ডব চলেছে তার ফলে আড়ষ্ট হয়ে গেছে তাঁর চেতনা। কিন্তু ভয়

www.pathagar.com

পেয়ে তিনি ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবেন না। যে ঘৃণার বিষ সারা পাঞ্জাবে ছড়িয়ে গেছে তার প্রতিরোধ তাঁকেই করতে হবে। এর জন্যে যদি দেশের মৌলবাদী হিন্দুরা তাঁকে সমর্থনা না করে, তাহলেও তিনি এর প্রতিরোধ করবেন।

মুশকিল হলো যে তিনি জানেন না কেমনভাবে দাংগার এই বিষ ছড়ালো। অথচ তাঁকেই এখন এই গুরুভার বইতে হচ্ছে। ফলে অপ্রস্তুতির দরুন নানারকম সংকটের মধ্যেও তাঁকে পড়তে হচ্ছে প্রায়ই। সেই রকম অবস্থায় মন মেজাজ ঠিক থাকছে না তাঁর। কারণে অকারণে অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছেন তিনি। তখন উত্তেজিত হয়ে একে ওকে ধমক দিচ্ছেন। সামান্য ত্রুটিও সইতে পারছেন না। গালমন্দ করছেন মানুষদের। যেমন সেদিন হলো। বিকাল নাগাদ খবর পেলেন যে, অমৃতসর শহরের কাছাকাছি এক শিখ গ্রামের অধিবাসীরা তাদের প্রতিবেশী মুসলমানদের হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছে। খবরটা শুনেই দারুণ খাপ্পা হয়ে গেলেন নেহরু। তখনই ডেকে পাঠালেন ষড়যন্ত্রী শিখ নেতাদের। তারপর মস্ত এক বটগাছের নীচে সবাইকে বসিয়ে হুমকি দিয়ে বললেন, 'আমি শুনেছি আজ রাত্রে আপনারা ওদের জবাই করার ষড়যন্ত্র করেছেন। আপনাদের সাবধান করে দিচ্ছি, যদি ওদের মাথার একটা চুলও কেউ ছোঁয়, তাহলে কাল ভোরেই সবাইকে দাঁড় করিয়ে আমার বডিগার্ড দিয়ে গুলি করাবো।'

নেহরুর প্রধান চিন্তা হ'ল কিভাবে খাপছাড়া, বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদগুলো একত্র করে একটা আন্দোলনের রূপ দেওয়া যায়। বিশ্বের এক বৃহত্তম জাতির জীবনে এই সংকটটা তখন এমনভাবে এসে দাঁড়িয়েছে, যা এর আগে কোন সদ্য স্বাধীন হওয়া জাতিকে ভোগ করতে হয় নি। তাই দুশ্চিন্তার অন্ত নেই নেহরুর। দিনে রাতে একই চিন্তা। নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতেও পারছেন না তিনি। রাত আড়াইটে নাগাদ এ.ডি.সি.কে ডেকে দিল্লির সঙ্গে ওয়ারলেশ মারফত যোগাযোগ করতে বললেন। সর্বত্রই একই অবস্থা। পরের পর দুঃসংবাদ আসছে এখান সেখান থেকে। ব্যতিক্রম শুধু কলকাতা। আশ্চর্য ! যে বৃদ্ধ মানুষটিকে দেশ বিভাগের প্রশ্নে দুহাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিলেন প্রেক্ষাপট থেকে, তিনিই এখন বুক দিয়ে আগলে রেখেছেন কলকাতাকে। উত্তরভারতে যখন আগুন জ্বলছে তখন তাঁর কোলে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমচ্ছে কলকাতা।

কিন্তু কে জানতো এ তাঁর আকাশকুসুম ! রাতটা নিশ্চিন্তে কাটলেও দিনের আলো ফুটে উঠতেই কলকাতা শহরের চেহারা যেন অন্যরকম হয়ে গেল। প্রথম ঘটনা ঘটলো পতিতোদ্ধারিণী গংগার কাছাকাছি বড় রাস্তা থেকে। বড় রাস্তার ওপর দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে হাঁটছে দুজন মাঝবয়সী মুসলমান। হঠাৎ একটা তীক্ষ্ম সিটির শব্দ শোনা গেল। তারপরই ওই মাঝবয়সী লোক দুজনের ঘাড়ের ওপর অতর্কিতে চড়াও হলো পাঁচ-ছ'জন কিশোর। বছর সতোরো-আঠারোর মধ্যে তাদের বয়স। হঠাৎ আক্রমণে ভয় পেয়ে ছুটে পালাবার চেষ্টা করলো ওরা। কিন্তু 'মুসলমান, মুসলমান' চিৎকার শুনে আরও কিছু ছেলেছোকরা তখন বধ্যভূমিতে এসে পড়েছে। তারাই ধাক্কা দিয়ে লোক দুজনকে ফেলে দিল মাটিতে। লোক দুজন তখন আর্তস্বরে হিন্দুত্ব প্রমাণের চেষ্টা করতে লাগলো। হিন্দু নাম, হিন্দু ঠিকানা আরও কি সব প্রমাণ দিল ওরা। কিন্তু কে শোনে ওদের কথা ! আরও জোরালো প্রমাণ চাই ওদের। হঠাৎ বছর সতোরোর একটা ছেলে লোক-

www.pathagar.com

দুটোর পরণের কাপড় ধরে টান দিল। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল ধুতি আর সবাই দেখলো যে ধর্মসংস্কার জনিত দুজনেরই পুরুষাঙ্গ সুন্নত করা। ব্যস! আর কোন প্রমাণের দরকার নেই। লোক দুজন যে হিন্দু নয় তার প্রমাণ তখনই হয়ে গেল ওই একটা চিহ্নে।

লোক দুজন তখন থরথর করে কাঁপছে। সতেরো-আঠারো বছরের ছেলেগুলো এমনভাবে ঘিরে রেখেছে, যেন ওরা পালাতে না পারে। দুটো গামছা দিয়ে ওদের মাথামুখ ঢেকে দেওয়া হয়েছে। এবার শক্ত করে ওদের হাতদুটোও বেঁধে দেওয়া হ'ল। তারপর লোক দুজনকে মাঝখানে রেখে মিছিল চললো বধ্যভূমির দিকে। ছোকরাদের হাতে নানারকম প্রাগৈতিহাসিক অস্ত্র। কাঠের গদা, লোহার ডাণ্ডা, ছোরাছুরি আরও কত কি। উন্মত্তের মতন 'রক্ত চাই রক্ত চাই' বলে চেঁচাচ্ছে ছোকরার দল। লোক দুটোর ছেলের বয়সী ওরা। কিন্তু কী ভয়ানক ওদের এই প্রতিহিংসা! আর দুশ'গজ যেতে পারলেই শহীদ ভূমিতে পৌঁছে যাবে সবাই। পতিতপাবনী গঙ্গা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানেই চুবিয়ে ওদের হত্যা করা হবে। হত্যাকারীদের ধর্মবোধ খুবই টনটনে। স্বাভাবিক অবস্থা থাকলে কিছুতেই এমনভাবে গঙ্গার পবিত্র জল মুসলমানের রক্তে কলুষিত করতো না ওরা। সকালবেলা গঙ্গায় কত পুণ্যার্থী আসে। তারা তীরে দাঁড়িয়ে জপতপ করে। হিন্দু মেয়েরাও গঙ্গায় স্নান করতে আসে। কিন্তু আজ ওরা নিরুপায়। এছাড়া আর কোন গতি নেই ওদের।

প্রথমে ধাক্কা দিয়ে জলে চুবিয়ে দেওয়া হলো ওদের। তারপর চকিতে একজনের মাথায় শাবল দিয়ে আঘাত করা হলো। এক ঘা দিতেই লোকটার মাথা ফেটে চৌচির। ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছে। কেমন দুমড়ে কুঁচকে গেল লোকটার শরীর। তারপর ডুবে গেল জলের তলায়। একটা লাল বলয় তৈরি হ'ল সেখানে। গঙ্গার ঘোলা জল রক্তের টকটকে লাল রঙের সঙ্গে মিশে পানসে হয়ে গেল। চোখের সামনে এমন নৃশংস খুন দেখেও ছোকরাদের একটু খেদ হ'ল না। বরং আর একটা খুনের জন্য লোলুপ হয়ে উঠলো ওদের চোখ। দ্বিতীয় লোকটা তখন প্রাণভয়ে পালাতে গেল। কিন্তু পারলো না। যে ছোকরা প্রথম লোকটাকে আঘাত করেছিল, সেই ছোকরাই আঘাত করলো হতভাগ্য এই লোকটাকেও। আরও অনেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। কেউ ইট ছুঁড়ে মারলো, কেউ ছোরার ঘা দিয়ে আঘাত করলো। একজন ওর ঘাড়ের ওপর ছোরা ঢুকিয়ে দিতেই লোকটা নেতিয়ে পড়ে গেল জলের মধ্যে।

পরপর দুটো খুন হলেও গঙ্গাঘাটের হিন্দুপুণ্যার্থীদের ধর্মসংস্কারে কোন বিঘ্ন ঘটলো না। মানুষগুলো যখন নির্বিকার মনে ধর্মচর্চা করছে, জাহ্নবী গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে ওরা যখন পরম ভক্তিভরে গঙ্গাস্তোত্র আবৃত্তি করছে, তখন লাথি মেরে হতভাগ্য লাশদুটো গঙ্গার মাঝামাঝি ফেলে দিল দুর্বৃত্তরা। তারপর উন্মত্ত খুনী গলায় হেঁকে উঠলো 'কালী মায়ী কি জয়!'

৩১শে আগস্টের ঠিক ভোরেই সেদিন এই দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল। অর্থাৎ ষোলটা দুর্লভ শান্তির দিন পেরিয়ে যাবার পরেও নতুন করে দাঙ্গার জীবাণু আবার যেন ছড়িয়ে পড়লো দুঃস্বপ্নের নগরী কলকাতায়। শহরের শান্তির পরিবেশ তখন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। এখান ওখান থেকে খুনের খবর যত কানে আসছে, ততই ছড়িয়ে পড়ছে বিষ। তখন নিত্য ট্রেন বোঝাই হয়ে দাঙ্গাপীড়িত

www.pathagar.com

মানুষ কলকাতায় আসছে। ওরাই ছড়ালো বীভৎস নানা গালগল্প। এক হিন্দু বালককে নাকি এক ট্রলি কারের মধ্যে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। অনেকে নাকি চোখেও দেখেছে এমন এক হতভাগ্য ঘটনা। হায়! এরই নাম গুজব!

সুতরাং সেদিনই রাত দশটা নাগাদ একদল ক্রুদ্ধ হিন্দু যুবক এসে চড়াও হলো হায়দারী ভবনের খোলা মাঠে। এদের দাবি যে গান্ধীজী এসে জবাবদিহি করুন। গান্ধীজী তখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁর শয্যার দুপাশে শুয়ে আছেন মনু ও আভা। লোকগুলোর আক্রোশ তখন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ব্যান্ডেজ বাঁধা একজন যুবককে সামনে রেখে ওরা দাবি করতে লাগলো যে সে নাকি মুসলমানদের হাতে প্রহৃত হয়েছে। অতএব গান্ধীজীকে কৈফিয়ত দিতেই হবে। ইতিমধ্যে অসহিষ্ণু জনতা হায়দারী ভবনের দিকে ইটপাটকেল ছুঁড়তে লাগলো। ইটের শব্দে মনু ও আভার ঘুম ভেঙে গেল। তারা ছুটে এল বারান্দায়। তারপর জনতাকে শান্ত করার চেষ্টা করলো। কিন্তু কে শোনে কার কথা! মনু ও আভাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল ওরা। তারপর ওই বিপুল জনতা হায়দারী ভবনের মধ্যে ধেয়ে এল। গোলমাল চেঁচামিচিতে গান্ধীজীও তখন জেগে উঠেছেন। বারান্দায় এসে ক্রুদ্ধ মানুষগুলোর দিকে চেয়ে গান্ধীজী বললেন, 'এ কি গোঁয়ারতুমি করছেন আপনারা? এই আমি আপনাদের সামনে এসে দাঁড়ালাম। আমায় মারুন।'

কিন্তু রুষ্ট জনতার চিৎকার চেঁচামেচিতে গান্ধীজীর কথাগুলো হারিয়ে গেল। এরই ফাঁকে দুটি মুসলমান ছোকরা কোনরকমে ওই ক্রুদ্ধ মানুষগুলোর দৃষ্টি এড়িয়ে ছুটে এসে দাঁড়ালো গান্ধীজীর ক্ষীণ শরীরের আড়ালে। একজনের সারা গা থেকে রক্ত ঝরছে। হঠাৎ জনতার ভেতর থেকে কেউ একজন একটা লাঠি ছুঁড়লো ওদের লক্ষ্য করে। একচুলের জন্য বেঁচে গেলেন গান্ধীজী। সশব্দে পিছনের দেওয়ালে এসে লাগলো লাঠিখানা।

ইতিমধ্যে গান্ধীজীর লোকজন পুলিস ডেকে এনেছে। অবস্থাটা তখনই আয়ত্বের মধ্যে এসে গেল। কিন্তু গান্ধীজী মনে মনে দারুন ব্যথা পেলেন। সারা শরীরে তখন কাঁপুনি ধরেছে। শুয়েও নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। অনবরত মনে হচ্ছে কি থেকে কি হয়ে গেল। গান্ধীজী লিখলেন, 'কলকাতার শান্তি যে মাত্র ন'দিনের বিস্ময় আজ তার প্রমাণ হয়ে গেল।' সত্যই তাই। কলকাতা ঘিরে গান্ধীজীর স্বপ্ন দেখা যে অলীকদর্শন তার আরও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল পরদিন থেকেই। দুপুরের একটু পর থেকেই শুরু হ'ল মুসলমান বস্তির ওপর পরিকল্পিত আক্রমণ। গান্ধীজীর শান্তি আন্দোলনে উৎসাহ পেয়েই ওরা আবার বস্তিতে ফিরে এসেছিল। আবার গুছিয়ে ঘরসংসার করার কথা ভাবছিল। ইতিমধ্যে, নতুন করে শুরু হয়ে গেল এই দাংগা। সবাই লক্ষ্য করলো যে আক্রমণের নেতৃত্ব দিচ্ছে উগ্রবাদী হিন্দু সংগঠন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সমর্থকরা, যাদের স্বস্তিকা শোভিত পতাকা উড়ান হয়েছিল পুণা শহরে স্বাধীনতা দিবসের সকালে। বেলেঘাটা রোডের ওপর গান্ধীজীর বাড়ির কাছেই একটা বিস্ফোরণ ঘটলো। ট্রাক বোঝাই করে মুসলমানদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। হঠাৎ দুটো হাতবোমা আছড়ে পড়লো ট্রাকের ওপর। বিস্ফোরণের শব্দ শুনে ছুটে এলেন গান্ধীজী। কিন্তু যে দৃশ্য দেখলেন তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বোমার ঘা লেগে দুজন গরিব দিনমজুর সংগে সংগেই প্রাণ হারিয়েছে। থকথকে গাঢ় রক্তের মধ্যে পড়ে আছে মৃতদেহ দুটো। একজনের গায়ের ময়লা জামার

www.pathagar.com

ভেতর থেকে একটা চারআনি গড়িয়ে এসেছে ফুটপাতের ওপর। চকচকে পয়সাটা দেখেই গান্ধীজীর মন দারুণ বিষন্ন হয়ে গেল। হয়ত লোকটার সেদিনের রোজগার এই পয়সাটা। এমন ঠান্ডামাথায় পরিকল্পিত হত্যাকান্ড দেখে গান্ধীজী এত অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে মুখ দিয়ে তাঁর কথা সরলো না। সারাদিন একটা কথাও বললেন না। কিছু খেলেনও না। কারো অনুরোধই শুনলেন না তিনি। ইংগতে জানালেন, এই নীরবতা তাঁর নিবিড় আত্মানুসন্ধান। অন্ধকারের মধ্যে আলোর পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছেন তিনি।

অবশেষে আলোর সন্ধান গান্ধীজী পেলেন। বিকালের দিকে খানিকক্ষণ পায়চারি করার সময় তাঁর কর্তব্য স্থির করে ফেললেন তিনি। ঘরে ফিরে খড়ের শয্যায় বসে জনসাধারণের উদ্দেশে একটা ঘোষণাপত্র লিখে ফেললেন গান্ধীজী। মনস্থির করে ফেলেছেন তিনি। যে সিদ্ধান্ত তিনি নিলেন আর তার নড়চড় হবে না। পরদিন সকাল থেকেই আমরণ অনশন করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন আটাত্তর বছরের বৃদ্ধ গান্ধীজী। তাঁর এই জীর্ণ দেহখোল ততদিন উপবাসী থাকবে যতদিন না মানুষের মনে কল্যাণইচ্ছা ফিরে আসে।

কলকাতায় শান্তি ফেরাতে গান্ধীজী যে প্রতিকারের পথ ঠাওরালেন এই ক্ষুধাপীড়িত দেশে সেটা যেন ঠিক মানানসই নয়। বুভুক্ষা হ'ল এই শতাব্দী-প্রাচীন দেশের এক চিরন্তন অভিশাপ এবং এর দন্ড যুগ যুগ ধরে ভোগ করে মানুষ ভুখায় মরেছে। তবুও গান্ধীজীর হাতিয়ারটি এই দেশের কাছে কোন নতুন প্রতিকার নয়। হিন্দুধর্মের প্রাচীন ঋষিরাও বলতেন, 'মাঃ!' অর্থাৎ করো না। 'যদি একাজ করো তাহলে আমার বিনাশ হবে।' ইত্যাদি। মোটকথা কোন না কোনভাবে বঞ্চিত মানুষকে নিবৃত্তিতে অনুপ্রাণিত করার এই কর্মকৃতিত্ব এ দেশের ঋষিরা অনেক পূর্বেই আয়ত্ব করেছিলেন। ১৯৪৭এর ভারতেও গরিব চাষী ধনশালী মহাজনের ঘরের দোরে অনশন করে পড়ে থেকেছে, যাতে তার ঋণ মকুব হয়। এমনকি পাওনাদার মহাজনও অনশন করেছে যাতে খাতক তার দায় মেটাতে বাধ্য হয়। মোটকথা, এ সবই ছিল কাজ হাসিলের কৌশল। গান্ধীজীর সাফল্য যে এই কার্যকর হাতিয়ারটি তিনি জাতীয় মাত্রায় টেনে তুলতে পেরেছিলেন। বলতে কি, তাঁর চাতুর্যের জন্যই এই হাতিয়ারটি এমন কার্যকর হয়ে উঠেছিল নিরস্ত্র এবং অপরিণত দেশবাসীর হাতে। কারণ 'অনশন' প্রতিপক্ষকে বাধ্য করে কোন সমস্যার সমাধান করতে। তাই যখনই তাঁর কার্যসিদ্ধির পথে কোন বাধা অনতিক্রম্য হয়ে উঠেছে তখনই অনশনের আশ্রয় নিয়েছেন গান্ধীজী।

সারা জীবনভর গান্ধীজীর প্রায় সব প্রধান সাফল্যের জিয়নকাঠি ছিল তাঁর দীর্ঘমেয়াদী অনশন। মোট ষোলবার তিনি অনশন করেছেন কোন পোষ্টাই খাদ্য না নিয়ে। মোট দুবার অনশন করেছেন দীর্ঘ একুশদিন ব্যাপী। এই দুবারই অনাহার হেতু তাঁর জীবন সংশয় হয়েছে, কারণ জীবনমরণের সীমানায় পৌঁছে গিয়েছিলেন তিনি। গান্ধীজীর অনশনের যে কারণই থাকুক তা সে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতির প্রতিবাদ হ'ক বা হিন্দুমুসলমানের সম্প্রীতি হ'ক, সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতা দূর করা হ'ক বা এদেশ থেকে ব্রিটেনকে খেদানো হ'ক, তাঁর অনশনে সারা পৃথিবীর মানুষ মনে মনে অস্থির হয়েছে। গান্ধীজীর অনশন যেন তাঁর হাতের লাঠি, পরনের ধুতি আর প্রায় কেশহীন মাথার মতন তাঁর কৃশ শরীরের এক অবিচ্ছেদ্য অংগ। অন্তত সেইরকমই এক ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছিল জন-

www.pathagar.com

মানসে। তাই দেশের শতকরা ৮৩ জন মানুষ পড়তে না জানলেও, ঘরে রেডিও না থাকায় বিশ্বের খবর না রাখলেও, গান্ধীজীর নীরব আত্মাহুতির খবর শুনে এক বিরল দুশ্চিন্তায় আকুল হয়ে উঠতো। অনশনের সময় যখন নিশ্চিতভাবে জীবনমরণের সীমায় পৌঁছে যেতেন তিনি, তখন নিবিড় বেদনায় ক্লিষ্ট হ'ত তারা।

গান্ধীজীর কাছে 'অনশন' হ'ল প্রধানত জপধ্যান। স্থূল দেহের ওপর মনের শাসন ছড়িয়ে দেবার একটা প্রক্রিয়া। ইন্দ্রিয় সংযমের মতন এই প্রক্রিয়াটা যেন মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির এক অপরিহার্য উপাদান। গান্ধীজী জোর দিয়েই বলতেন, 'আমি বিশ্বাস করি যে, স্থূল শরীরকে আত্মবশে আনতে পারলেই মনের শক্তি বাড়ানো যায়। আমরা সহজেই ভুলে যাই যে, শুধু রুচির বা তৃপ্তির জন্যই খাদ্যের দরকার হয় না। খাদ্যের দরকার হয় শরীরকে মনের দাস করে রাখার জন্য।' ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে অনশন হয়ে দাঁড়ায় কৃচ্ছ্রসাধনের সক্ষম হাতিয়ার। ক্রমে এই স্বেচ্ছাকৃত আত্মপীড়ন গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের এক মোক্ষম অস্ত্র হয়ে ওঠে। এমনকি এর প্রয়োগের ব্যাপারেও তাঁর পরামর্শই সবাই মেনে চলতো। গান্ধীজী মনে করতেন যে এই অস্ত্রকে কার্যকর করতে হলে কিছু শর্ত মানতে হয়। যেখানে সেখানে যার তার বিরুদ্ধে অনশন করা যায় না। প্রতিপক্ষ যদি দয়ামায়াহীন নিষ্ঠুর হয় তাহলে অনশন করা না করা দুই-ই সমান। বুখেন-ওয়াল্ডের কোন ইহুদি অধিবাসী যদি তার ইয়েমেন কর্তার বিরুদ্ধে অনশন করে কিংবা সাইবেরিয়ার কোন বন্দী যদি স্তালিনপন্থী রক্ষীর বিরুদ্ধে অনশন করে, তবে অনশনের কোন উদ্দেশ্যই সফল হবে না। গান্ধীজী স্বীকার করেছিলেন যে, ভারতের শাসক যদি ইংরেজ না হয়ে হিটলার বা স্তালিন হতেন তাহলে তাঁর অনশন কখনই ফলপ্রসূ হাতিয়ার হ'ত না।

অনশনের দরুন যে কোন সমস্যা একটা গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা পায়। মানুষকে নতুন করে ভাবতে শেখায়। চিরাচরিত পথ থেকে সরে এসে নতুন প্রত্যয়ের (কনসেপ্ট) মুখোমুখি হয় মানুষ। রাজনৈতিক স্বার্থে এর ব্যবহারকে কার্যকর করতে হলে উপযুক্ত প্রচার হওয়া দরকার। কেন না এ এক এমন অস্ত্র যার ব্যবহার ভেবেচিন্তে না করলে লোক হাসাহাসিতে দাঁড়িয়ে যায় শেষ পর্যন্ত। গান্ধীজী দুরকম 'অনশন' পালন করতেন। যেটা প্রথম এবং সবচেয়ে নাটকীয় তা হ'ল 'আমরণ অনশন।' অর্থাৎ, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। যাকে বলে অন্ন-জল ত্যাগ করা। দ্বিতীয়টা হ'ল এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অনশন করা। সাঙ্গোপাঙ্গদের ভুলের খেসারত দিতেও তিনি অনশন করতেন। তখন তা হ'ত তাঁর প্রায়শ্চিত্ত যাতে সমর্থকদের নিয়মবন্ধতার মধ্যে ফিরিয়ে আনা যায়।

গান্ধীজীর অনশন ব্রতের নিয়ম শৃংখলা খুব কঠোর ছিল। অনশনের সময় জলে এক চিমটে খাবার সোডা (বাইকারবনেট অফ সোডা) গুলে পান করতেন। অনশন শুরুর আগে কখনো বা জলে পাতিলেবু বা কমলালেবুর রস মিশিয়েও খেতেন। ১৯২৪ সালে যেবার প্রথম ২১দিন অনশন শুরু করলেন সেবার খুব কাহিল হয়ে পড়ায় মলদ্বারে গ্লুকোজ ইঞ্জেকশন (এনীম্যা) নিতে রাজী হন, কারণ সেটা তাঁর আমরণ অনশন ছিল না। তাঁর আটাত্তর বছরের জন্মদিনে গান্ধীজী আর একবার প্রকাশ্য অনশন করে প্রায়শ্চিত্ত করবেন স্থির করলেন। তবে এই সংঘাত নতুন রকম। বিদেশী ব্রিটিশ শাসক নয়, তিনি অনশন করতে চলেছেন তাঁর দেশবাসীর বিরুদ্ধে। মানুষের এই বিবেকহীন হিংস্রতার অবসান

www.pathagar.com

ঘটাতেই তাঁর এই আত্মবলিদান। কলকাতার হাজার হাজার গরিব নিরীহ মানুষের জীবনরক্ষার জন্যই তাঁর এই জীর্ণ প্রাণটাকে উৎসর্গ করার ব্রত নিলেন গান্ধীজী।

এই বয়সে এটা যে এক দারুণ ঝুঁকি নেওয়া হচ্ছে সবাই তা বুঝতে পারলো। অথচ করণীয় কিছু নেই। তাঁর শিষ্য সমর্থকরা কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারে নি। এই এক ভাবনাতেই হুলস্থুল পড়ে গেল সারা দেশময়। কিন্তু গান্ধীজী যেন হিমালয়ের মতন অবিচল। ছুটে এলেন তাঁর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক বন্ধু চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারি। সে কি কথা? বাপু কি গুন্ডাদের বিরুদ্ধে অনশন করবেন নাকি? বললেনও সে কথা। গান্ধীজী বললেন, 'গুন্ডাদের বিরুদ্ধে ত নয়!' পিছন থেকে যারা কলকাঠি নাড়ায় তাদের বোঝাতেই এই অনশন। রাজাগোপালাচারি বললেন, 'কিন্তু এর দরুন যদি আপনার ভালমন্দ কিছু একটা হয়ে যায়? তাহলে কি এই সর্বনাশা দাবানল নিভবে? আরও ছড়িয়ে যাবে এর আগুন।' গান্ধীজী দৃঢ়ভাবে বললেন, 'তখন আমি তা দেখার জন্য বেঁচে থাকবো না।'

সুতরাং গান্ধীজীকে বিরত করা গেল না। ১লা সেপ্টেম্বরের বেলাবেলি মনু ও আভাকে গান্ধীজী বললেন যে তাঁর অনশন শুরু হয়ে গেছে। হায়দারী ভবনের সামনে কয়েকজন মানুষ যখন নিহত হলো, তখনই দুপুরের আহার বন্ধ করে দিয়েছিলেন তিনি। সেই থেকেই শুরু হয়ে গেছে তাঁর অনশন। থ হয়ে গেল মনু ও আভা। তাদের হতভম্ব মুখের দিকে চেয়ে গান্ধীজী দৃঢ়স্বরে বললেন, 'হয় কলকাতা শান্ত হবে, নয় আমি মরবো।' দুজনেই তখন বাকহীন। অপলক চেয়ে রইল দ্রুত ভেঙে যাওয়া গান্ধীজীর জীর্ণ শরীরখানার দিকে। বছরের প্রথম দিনটা থেকেই একটানা অশান্তি চলেছে তাঁর ভাঙাচোরা শরীরের ওপর। এর ছাপ বোঝা যায় কাহিল শরীরটার দিকে তাকালে। কিন্তু ওরাই বা কী করতে পারে!

পরদিনই ডাক্তার দেখে গেলেন। বেশ গম্ভীর দেখাল তাঁকে। হৃৎস্পন্দন খুবই অনিয়মিত। প্রতি চারবারে একবার বুকের ধুকপুক হারিয়ে যাচ্ছে গান্ধীজীর। সারা দুপুর বুকের মাসাজ করা হ'ল। তারপর মলদ্বারে গরম জলের এনীম্যা দেবার পর একটু ধাতস্থ হলেন তিনি। এক লিটার সোডামেশানো জল খাওয়ানোর পর ফিসফিস স্বরে দু-একটা কথা বললেন। কিন্তু এতই ক্ষীণ সে স্বর যে শোনাই যায় না।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গান্ধীজীর আশংকাজনক শারীরিক অবস্থার কথাটা শহরময় ছড়িয়ে পড়লো। সবাই বুঝতে পারলো যে এই অনশন গান্ধীজীর একটা চ্যালেঞ্জ। 'হয় শহরে শান্তি ফিরিয়ে আনবো নয় মরবো।' গান্ধীজীর সেই পুরনো মন্ত্র, 'করেংগে ইয়া মরেংগে।' তখন দলে দলে উদ্বিগ্ন মানুষ এসে জড়ো হচ্ছে হায়দারী ভবনের সামনের মাঠে। তবে অশান্তির আগুন একদিনেই নেভানো গেল না। দিনভরই এখানে ওখানে অগ্নিকান্ড হলো, বোমা আর গোলাগুলির শব্দ শোনা গেল শহর জুড়ে। বোঝাই যাচ্ছিল আরও নিরীহ প্রাণ বলি হচ্ছে এই বীভৎস খুনোখুনিতে। ক্ষীণ হলেও গান্ধীজীও শুনলেন বোমা আর গোলাগুলির শব্দ এবং নিরীহ মানুষের আর্ত চিৎকার। মানসিকভাবে ক্রমেই নেতিয়ে পড়ছেন গান্ধীজী। ব্যাপারটা ক্রমেই যেন আশংকাজনক হয়ে

www.pathagar.com

উঠলো সকলের কাছে। এই অবস্থায় গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠরা স্থির করলেন যে শহরের উগ্রপন্থী হিন্দু নেতাদের কাছে তাঁরা আবেদন করবেন। গান্ধীজীর আশঙ্কাজনক শারীরিক অবস্থার কথা বলবেন। নোয়াখালির মুসলমান নেতারা গান্ধীজীর আবেদন শুনেছিল বলেই সেখানকার হিন্দুরা সেদিন রক্ষা পেয়েছিল। এখন যদি কলকাতার মুসলমানরা ক্রমাগত খুন হতে থাকে, তাহলে গান্ধীজীকে বাঁচানো যাবে না। তখন দেশ বাঁচবে না, বাঁচবে না নোয়াখালির লক্ষ লক্ষ হিন্দুরাও।

অনশনের দ্বিতীয় দিনের সকাল থেকেই অবস্থার হঠাৎ বদল হতে শুরু করলো। সবাই শুনতে পেল একটা নতুন শব্দ। গোলাগুলির শব্দের সঙ্গে মিলেমিশে একটা নতুন কিছু ধ্বনিত হ'ল যেন। সেই সাতসকালেই হিন্দু ও মুসলমান নেতারা শান্তি মিছিল নিয়ে হায়দারী ভবনের দিকে চলেছেন। শান্তির স্লোগান দিয়ে দলে দলে আসছে মানুষ। কলকাতার দাঙ্গাবাজ মানুষরা সবাই তখন ভাবছে কি করে বাঁচিয়ে তোলা যায় গান্ধীজীকে। তাঁর ক্ষীণ রক্তচাপ, প্রস্রাবে য়্যালবুমেনের পরিমাণ, অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন ইত্যাদি নিয়েও তাদের ভাবনার শেষ নেই। গান্ধীজীকে বাঁচানো যাবে ত এ যাত্রায়? রাজাগোপালাচারি এসে বললেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা শহরে শান্তি ফিরিয়ে আনতে আন্দোলনে নেমেছে। শহরের অনেক গণ্যমান্য হিন্দু মুসলমান নেতারা গান্ধীজীর শয্যাপাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁরা কাতর অনুনয় করলেন যেন তিনি অনশন তুলে নেন। একজন মুসলমান তাঁর পায়ের তলায় আছড়ে পড়লেন। কান্নায় ভেঙে পড়ে বললেন, 'আপনার কিছু একটা হলে এখানকার একজন মুসলমানও রক্ষা পাবে না।' সুতরাং গান্ধীজী অনশন তুলে নিন। কিন্তু কারো কোন অনুরোধ উপরোধ তিনি শুনলেন না। গান্ধীজীর ক্লান্ত অবসন্ন শরীরটার মধ্যে সংকল্পের যে আগুন জ্বলছে, কোন কিছু দিয়েই তা নিভিয়ে দেওয়া গেল না। দুর্বল শরীরেও গান্ধীজী দৃঢ়স্বরে বললেন, 'আমি অনশন তুলে নেব না। যতদিন না এই শহরে শেষ পনেরো দিনের শান্তি ফিরে আসছে, ততদিন আমার অনশন চলবে।'

তৃতীয় দিনের ভোর থেকেই গান্ধীজীর গলার স্বর ক্রমশ অস্ফুট হয়ে গেল। যতটুকু বলতে চান তার কিছুই বলা হয় না। নাড়ীর গতিও ক্ষীণ হয়ে আসছে। সবাই আশংকা করলো শেষের দিন ঘনিয়ে আসছে। তখন সারা শহরের মানুষ জেনে গেছে যে গান্ধীজী মৃত্যুশয্যায়। অনুতাপে পুড়তে লাগলো অনেক মানুষের মন। শহর ছাড়িয়েও ছড়িয়ে পড়েছে গান্ধীজীর রোগশয্যার কথা। সারা জাতির উৎকণ্ঠা যেন হায়দারী ভবনের দোরগোড়ায় এসে মাথাকুটতে লাগলো।

গান্ধীজীর শক্তিহীন, অবসন্ন শরীরে এখন ভাঁটার টান। প্রাণধারা যেন মরুবালির চড়ায় এসে ঠেকেছে। ঠিক এই সময়েই সারা কলকাতায় নতুন আবেগের ঢেউ উঠলো। প্রেমের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিল হিন্দু-মুসলমান নাগরিক। সকলের যিনি ত্রাতা সেই গান্ধীজীকে যেমনভাবেই হ'ক বাঁচিয়ে তুলতে হবে। কলকাতার যে সব বস্তিতে দাঙ্গার বিষ ছড়িয়েছে সেখানেই শান্তি মিছিল নিয়ে গেল ওরা। এই আন্তরিকতায় দারুণ কাজ হ'ল। সত্যিই যেন বদলে গেল মানুষের হৃদয়। এর জলজ্যান্ত প্রমাণ পাওয়া গেল দুপুর নাগাদ। শহরের সাতাশজন কুখ্যাত গুন্ডা গান্ধীজীর ঘরের সামনে মাথা নিচু করে এসে দাঁড়ালো। শুধু দাঁড়িয়ে থাকা নয়। ওরা স্বীকার করলো ওদের কৃতকর্মের কথা। ওরা তাই গান্ধীজীর কাছে

www.pathagar.com

ক্ষমা চাইতে এসেছে। গান্ধীজী ওদের ক্ষমা করুন। তিনি অনশন তুলে নিন।

বিকাল নাগাদ আর এক দল গুণ্ডা এসে দাঁড়ালো গান্ধীজীর দোরগোড়ায়। বেলেঘাটার যে বর্বর হত্যাকাণ্ড দেখে গান্ধীজী মুষড়ে পড়েছিলেন এরাই তার নায়ক। এরাও মাথা নিচু করে এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর শয্যার সামনে। গান্ধীজী ওদের শাস্তি দিন। তিনি যে শাস্তি দেবেন সেই শাস্তিই মাথা পেতে নেবে তারা। কিন্তু তিনি অনশন ভঙ্গ করুন। কথাগুলো বলে লোকগুলো তাদের কোঁচড় খুলে ঝন্ঝন্ শব্দে মাটির ওপর ফেললো অজস্র ছোরা, ছুরি, পিস্তল, বাঘনখ ইত্যাদি। মানুষ মারার এইসব হাতিয়ার দেখে সকলের চক্ষু স্থির হয়ে গেছে তখন। মুমূর্ষু গান্ধীজীও তখন স্তম্ভিত হয়ে গেছেন এই সম্ভার দেখে। কোনটার গায়ে লেগে থাকা রক্তের দাগ কালো হয়ে গেছে। এমনভাবে অস্ত্র সমর্পণের ঘটনা গান্ধীজীর জীবনে আগে ঘটে নি। অভিভূত গান্ধীজী তাঁর মৃত্যুশয্যা থেকে বিড়বিড় করে বললেন, 'তোমরা অত্যাচারিত মুসলমানদের কাছে যাও। তাদের মনে ভরসা ফিরিয়ে আন। তাদের বাঁচার আশ্বাস দাও। জেনো এটাই তোমাদের প্রাপ্য শাস্তি।'

সেদিনই সন্ধ্যায় নিজের হাতে একটা মেসেজ লিখে প্রচারের জন্য পাঠিয়ে দিলেন রাজাগোপালাচারি। তিনি লিখলেন যে শহরে শান্তি ফিরে এসেছে। এর কিছুক্ষণ পরেই ট্রাক বোঝাই নানারকম গুলিবারুদ, ছোরাছুরি আর পিস্তল ইত্যাদি এসে জমা পড়লো হায়দারী ভবনের গেটের কাছে। কলকাতার শিখ, হিন্দু আর মুসলমান নেতারা যৌথ ইস্তাহারে স্বাক্ষর দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন গান্ধীজীর কাছে। গান্ধীজী শুনলেন যে তিন সম্প্রদায়ের নেতারাই জীবন দিয়ে শান্তি বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। গান্ধীজী ভারী খুশী। ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত ন'টা পনেরো মিনিটে কয়েক চুমুক কমলালেবুর রস খেয়ে গান্ধীজী অনশন তুলে নিলেন। তবে অনশন ভাঙার খানিক আগে তাঁর খড়ের শয্যার চারপাশে ঘিরে থাকা হিন্দু, শিখ ও মুসলমানদের সতর্ক করে দিলেন গান্ধীজী। তাদের বললেন, 'আজ কলকাতার হাতেই ধরা আছে সারা ভারতের শান্তির চাবিকাঠিটি। এখানকার একটা ছোট্ট ঘটনাও অনেক বড় হয়ে প্রতিফলিত হয়ে দেশের অন্যত্র আগুন জ্বালাতে পারে। সুতরাং গ্রামাঞ্চলেও যদি দাঙ্গার আগুন জ্বলে ওঠে, তাহলে তোমাদের দেখতে হবে যাতে সেই আগুনের আঁচ কলকাতার গায়ে না লাগে।'

গান্ধীজীকে তাঁরা যে কথা দিয়েছিলেন তা রেখেছিলেন। সেবার কলকাতার গায়ে তাঁরা আগুনের আঁচ লাগতে দেন নি। কলকাতার মিরাক্ল শুধু কথার কথায় পরিণত হয় নি। যখন পাঞ্জাব জ্বলছে, জ্বলছে সীমান্তপ্রদেশ এবং করাচি, লাহোর বা দিল্লি তখন দুঃস্বপ্নের নগরী হয়েও কলকাতায় শান্তি বিঘ্নিত হয় নি। বৃদ্ধ গান্ধীজী তাঁর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যে শান্তি ফেরাতে চেয়েছিলেন তা বিফল হয় নি। অন্তত তাঁর জীবদ্দশায় কলকাতার ফুটপাতে আর কেউ দাঙ্গার রক্ত লেপে দিতে পারে নি। তাই গান্ধীজীর সবচেয়ে পুরনো বন্ধু চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারির মন্তব্যটি উল্লেখ না করে পারা যায় না। রাজাগোপালাচারি যথার্থই বলেছিলেন, 'গান্ধীজীর অনেক কীর্তি ছড়িয়ে আছে এই দেশে। কিন্তু কলকাতার বুকে দুষ্টের দমন করে তিনি যে অসাধ্যসাধন করেছেন তার চেয়ে আশ্চর্যের আর কিছু হয় না। দেশ স্বাধীন করার চেয়েও এ কৃতিত্ব অনেক মহান।'

www.pathagar.com

বাস্তবিক তাই। তাঁর কীর্তির চেয়েও মহান ছিলেন গান্ধীজী। তাই কারও কোন প্রশংসাতেই আত্মহারা হন নি গান্ধীজী। নীরব সেবাকর্মীর মতন বলেছিলেন, 'এবার পাঞ্জাবের পালা। ভাবছি কালই শুরু করবো আমার শান্তি সফর।'

নয়াদিল্লি, সেপ্টেম্বর ১৯৪৭

কিন্তু গান্ধীজী কখনই তাঁর পাঞ্জাব সফর শেষ করেন নি। সফরের মাঝামাঝি হঠাৎ নতুন করে দেশময় দাঙ্গা আর খুনোখুনি শুরু হয়ে যাওয়ায় গান্ধীজী থমকে গেলেন। এবার এই দাঙ্গার বাতিকটা চাগিয়ে উঠলো ভারতের স্নায়ুকেন্দ্র দিল্লিতে, যেখান থেকে এতকাল ভারত শাসন করে এসেছে অধুনালুপ্ত ব্রিটিশ-রাজ। এতকাল যে শহরটা শুধু ঠাটঠমক আর ভড়ংয়ের চোখ ধাঁধানো দীপ্তি দেখেছে, সারা জগতের বৃহত্তম আমলাবাজির সুরক্ষিত আশ্রয় ছিল যে শহরটা, সেই সোহাগিনী সুন্দরী দিল্লির আজ এ কি দশা! কলকাতা, করাচির বস্তিগুলোয় দাঙ্গার যে বিষ ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই বিষের জ্বালায় রূপসী দিল্লির সারা অঙ্গ খাক হয়ে গেল যেন।

দিল্লির ভৌগোলিক অবস্থানটা বড় বিচিত্র। পাঞ্জাবের সীমানায় অবস্থিত হওয়ার দরুন মোগল সংস্কৃতির ছাপটুকু সারা দিল্লি শহরের গায়েই বেশ ধরা পড়ে। তাই ভারতীয় ডোমিনিয়নের রাজধানী শহর হলেও, দিল্লিকে মুখ্যত মুসলমানী শহরই বলা যায়। কর্মচারী, চাকরবাকর বা পরিচারকরা তখন অধিকাংশই মুসলমান। তাছাড়া শহরের টঙ্গাওলা, ফেরিওলা বা কারিগর মিস্ত্রীরাও মুসলমান হওয়ায়, আশপাশ থেকেও দাঙ্গাপীড়িত অনেক মুসলমান এসে পড়ে দিল্লিতে। দিল্লির রাস্তাঘাট তখন থিকথিক করছে মুসলমান। শহরময় তখন দাঙ্গার গালগল্প ছড়াচ্ছে হাজার হাজার শিখ আর হিন্দু উদ্বাস্তুরা। তাদের মুখে বীভৎস অত্যাচারের গপ্পো শুনে আর শহরময় মুসলমানের ভিড় দেখে উগ্রপন্থী হিন্দু ও শিখরা হঠাৎ দাঙ্গার তাণ্ডব ছড়িয়ে দিল সারা দিল্লি জুড়ে। ঘটনাটা শুরু হলো ৩রা সেপ্টেম্বর সকাল থেকে, যেদিন গান্ধীজী কলকাতায় তাঁর অনশন ভঙ্গ করেন।

প্রথম ঘটনা ঘটলো দিল্লির রেল ইস্টিশনে। সাত সকালেই জবাই হ'ল এক ডজন মুসলমান মুটে। এই ঘটনারই কয়েক মিনিট পরে দিল্লির জনমুখর কনট্ সার্কাস অঞ্চলে একজন ফরাসী সাংবাদিক অভাবনীয় দৃশ্য দেখলেন। কনট্ সার্কাসের মুসলমানদের দোকানগুলো হিন্দু জনতা লুটপাট করছে। আর কংগ্রেসী সাদা টুপি পরা একজন চেনা মানুষ অসহিষ্ণু হয়ে ক্রমাগত লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে যাচ্ছেন লুঠেরাদের দিকে এবং তাদের বকাঝকা করছেন। সাংবাদিকের সবচেয়ে আশ্চর্য লাগলো যখন দেখলেন যে ভদ্রলোকটি যতই উত্তেজিত হ'ন না কেন, তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা পোশাক আঁটা ডজনখানেক পুলিস কেমন যেন নির্বিকার। ফরাসী সাংবাদিক পরে জানতে পারেন যে সাদা টুপি পরা অসহিষ্ণু মানুষটি ভারতের প্রধানমন্ত্রী, জওহরলাল নেহরু।

www.pathagar.com

সেদিন সকালের ওই লুটতরাজগুলো যেন একটা সংকেত। বস্তুত ওই ইশারাটুকুই দরকার ছিল ফিকে নীল পাগড়ি পরা আকালী শিখ আর কপালে সাদা রুমাল বাঁধা আর.এস.এস. কম্যান্ডো সমর্থকদের। পুরনো দিল্লির আনাজ, ফলের বাজারটা তখন দাউ দাউ করে জ্বলছে। লোদী কলোনিতে সম্রাট হুমায়ুনের মার্বেল পাথরের গম্বুজওলা সমাধিসৌধের পাশে মুসলমান আমলাদের বাংলোগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো শিখ দুর্বৃত্তরা। তারপর যাকে বাড়িতে পেল তাকেই হত্যা করলো। দুপুরের মধ্যেই দেখা গেল যে মুসলমান আমলাদের লাশ ক'টা সরকারী ভবনগুলো ঘিরে থাকা সবুজ ঘাসের মাঠে যত্রতত্র পড়ে আছে। রাত্রে ডিনার খেতে আসার সময় বেলজিয়ামের রাজদূত এইরকম সতেরটা লাশ পড়ে থাকতে দেখলেন। রাতের অন্ধকারে পুরনো দিল্লির গলিঘুঁজিতে তখন শিকারের সন্ধানে ছোঁকছোঁক করছে শিখ দুর্বৃত্তরা। মাঝে মাঝে তারা চেঁচিয়ে উঠছে 'আল্লা হো আকবর' বলে। তাদের মিথ্যে ডাকশুনে কোন অসহায় মুসলমান বেরিয়ে পড়লেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে শিখ দুর্বৃত্তরা। তারপর নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করছে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক বাহিনীর সমর্থকরা একজন বোরকা ঢাকা মুসলমান যুবতীর গায়ে পেট্রল ঢেলে তাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারলো প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের ফটকের সামনে। তাঁর অপরাধ তিনি নাকি হিন্দুদের কবল থেকে মুসলমানদের রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। নেহরু স্তম্ভিত হলেন এই দৃশ্য দেখে। তবে দমে গেলেন না। এক স্কোয়াড গোর্খার সাহায্যে কয়েকজন মুসলমান রমণীকে উদ্ধার করে তাঁর বাসভবনের বাগানে আশ্রয় দিলেন নেহরু।

দিল্লির শিখ ও হিন্দু দুর্বৃত্তরা তখন দাপটের সঙ্গে বলে বেড়াচ্ছে যে মুসলমানদের আশ্রয় দিলে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। হুমকি শুনে অনেকেই তাদের দীর্ঘদিনের আশ্রিত চাকরবাকরদের ঘরের বার করে দিল। এদের কেউ তখনই খুন হলো কেউ বা কাছাকাছি কোন শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় পেয়ে সে যাত্রা রেহাই পেল।

সেদিন দিল্লির দাঙ্গায় প্রকৃত লাভ হ'ল শৃঙ্খলমুক্ত টঙ্গার ঘোড়া আর ধর্মের ষাঁড়দের। দাঙ্গার কল্যাণে অধিকাংশ মুসলমান টঙ্গাওলাই তখন হয় পলাতক না হয় মৃত। সুতরাং মুক্তির খুশীতে তারা তখন মহাসমারোহে দিল্লির খোলামেলা ঘাসের মাঠে চরে বেড়াতে লাগলো।

দিল্লির এই দাঙ্গা তখন শুধু দিল্লি বা দু-একটা শহর নয়, সারা উপমহাদেশেই ছড়িয়ে পড়েছে। মনে হলো নতুন করে দাঙ্গাকবলিত হ'ল সারা দেশ। দিল্লি শহরে তখন আইন শৃঙ্খলার বালাই নেই। আর দিল্লির শাসন ভেঙে পড়াতে সারা দেশেই তার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো। দিল্লি পুলিস বাহিনীর অর্ধেকই মুসলমান। দাঙ্গা বাধতেই তারা পলাতক হয়েছে। মাত্র ৯০০ জন অবশিষ্ট আছে অতবড় বাহিনীতে। পাঞ্জাবের ভয়াবহ ঘটনার ধাক্কায় দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা নড়বড়ে হয়েই ছিল। এখন সেই প্রশাসনযন্ত্র যেন শব্দ করে থেমে গেল। অবস্থা এতই মন্দ হয়ে উঠলো যে নেহরুর ব্যক্তিগত সচিব এইচ.ভি.আর. আয়েঙ্গার নিজেই প্রধানমন্ত্রীর চিঠিপত্র বিলির ভার নিলেন।

৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে জানা গেল যে হাজারখানেক মানুষ ইতিমধ্যেই খুন হয়েছে। বেলার দিকে মাউন্টব্যাটেনের পার্টিশন প্ল্যানের মূল খসড়ালেখক

www.pathagar.com

ভি.পি. মেনন হাতে গোনা কয়েকজন ভারতীয় সিভিলিয়ানদের নিয়ে একটা গোপন সভা করলেন। সভায় ঐকমত্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল যে দিল্লি শহরে শাসন-শৃংখলা বলতে কিছু নেই এবং শুধু রাজধানী শহরই নয়, সারা দেশের প্রশাসনই ভেঙে পড়ার মতন। এর কয়েক ঘণ্টা পরে বিক্ষুব্ধ সীমান্তপ্রদেশের বহুদর্শী সেনানায়ক কর্নেল এম.এস. চোপড়াও একই রকম মন্তব্য করলেন। এক বন্ধুর বাংলোবাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন কর্নেল চোপরা। সারা দিল্লি কালো অন্ধকারে ডুবে আছে। শুধু মাঝে মাঝে অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে দুমদাম গুলি বা বোমার শব্দ। চকিত বিদ্যুতের মতন রাতের আকাশের গায়ে ফুটে উঠছে বিস্ফোরণের ছটা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অভিজ্ঞ চোপরার হঠাৎ মনে হ'ল যে, দিল্লিও এখন সীমান্তপ্রদেশ হয়ে উঠেছে।

সিমলা, ৪ঠা সেপ্টেম্বর

সেই মার্চ মাসে মাউন্টব্যাটেন যখন পালাম বিমানবন্দরে পা দিয়েছিলেন সেই থেকে তাঁর ফুরসত হয় নি। আজ এতদিন পরে এই প্রথম অবসরের মুখ দেখলেন তিনি। হপ্তা তিনেক আগে যখন মধ্যরাতের ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে ভারত স্বাধীন হয়, তখনই তাঁর ঘাড় থেকে এক দুর্ভর বোঝা নেমে গিয়েছিল। সেদিন তাঁর ঘাড় থেকে যে নিরেট চাপটুকুই উঠে যায় তা নয়। সেই সঙ্গে তাঁর এই দক্ষ, যোগ্য এবং ব্যস্ততম নিজস্ব দপ্তরটাও পরিণত হয় এক কর্মহীন অলস, বৃদ্ধ শার্দুলে। স্বাধীন ভারতে তাঁর এই ব্যক্তিগত দপ্তরটি এখন শুধুই এক প্রতীক দপ্তর। নিরীহ ও কর্তৃত্বহীন। পাঞ্জাবের বীভৎস দাংগার সব খবরই তাঁর কানে এসেছে। মনে মনে দারুণ ব্যাকুলও হয়েছেন তিনি। কিন্তু গভর্নর-জেনারেল হিসাবে আজ তাঁর কিছুই করার এখতিয়ার নেই। এই দুঃসহ দায় এখন চলে গেছে ভারতীয় নেতাদের হাতে। সুতরাং, সদ্য স্বাধীন হওয়া নেতাদের কাজকর্মের ওপর পাছে খবরদারি করতে হয়, তাই তিনি নিঃশব্দে পালিয়ে এসেছেন দিল্লি থেকে। এসে আশ্রয় নিয়েছেন হিমালয়ের কোলে দেবতাদের স্বর্গরাজ্য এই তুষার পাহাড় ঘেরা শান্ত সিমলা শহরে। সিমলার নিষ্পাপ গায়ে এখনও আঁচড় লাগে নি সমতলের খুনোখুনির। ফার গাছের গায়ে হেলান দিয়ে এখনও এখানে ফুটে চলেছে লিলি, ডাফোডিল আর রডোডেনড্রন গুচ্ছ। দূরে ঝলমল করছে তুষার মুকুট পরা হিমালয়ের গিরিশৃঙ্গ। শেষ গ্রীষ্মের বাতাসে লেগে আছে একটা ফুরফুরে হালকা শীতলতা। শহরের এ্যামেচার রঙ্গালয়ের চলতি নাটক, 'জেন্ স্টেপ্‌স্ আউট' এখনও তেমনি উপভোগ্য ও রোমান্টিক, যেমনটি উপভোগ্য ছিল ষাট বছর আগে যখন দর্শক আসনে বসেছিলেন কবি কীপ্‌লিঙ।

তা সেদিন প্রাক্তন ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন যেন কীপলিঙের যুগের সেই রোমান্টিক বিহ্বলতার মধ্যেই নিমজ্জিত হয়েছিলেন তাঁর বইঠাসা পাঠকক্ষে, যখন টেলিফোন বেজে উঠলো। রাত তখন দশটা। সিমলার লাটভবনের লাইব্রেরি ঘরের সব ক'টি আলো ঝলমল করছে। একটা বড় টেবিলের ওপর ছড়ানো আছে মাউন্টব্যাটেনের ঐতিহ্যময় পারিবারিক কুলুজিনামটা। আজ ৪ঠা সেপ্টেম্বর,

www.pathagar.com

বৃহস্পতিবার। মাউন্টব্যাটেনের বিহ্বল মনটা চলে গেছে সুদূর রাইন নদীর তীরে। পারিবারিক বংশলতার ডালপালাগুলো ধরে তিনি খুঁজে চলেছেন নিজেকে ওই হেস্, প্রুশিয়া ও স্যাক্স্-কোবার্গের জার্মানীতে। বড় প্রিয় তাঁর এই বিনোদন। তাই যখনই অবসর পান ডুবে যান নিজেকে খোঁজার এই খেলায়।

তখনই টেলিফোনটা ঝনঝন শব্দে বেজে উঠলো, আর ঘোর কেটে গেল মাউন্টব্যাটেনের। কিছুটা যেন বিরক্তও হলেন তিনি। এত রাতে কে তাঁর সংগে কথা বলতে চায়? মাউন্টব্যাটেন জানতেন না যে আহ্বায়ক হলেন ভি.পি. মেনন। সারা দেশে এই একজন মানুষ যাঁর পরামর্শ তিনি কখনও ঠেলতে পারেন নি। কিন্তু এত রাতে কি বলতে চায় মেনন? টেলিফোন ধরতেই ভি.পি.র উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন মাউন্টব্যাটেন।

'ইওর এক্সেলেন্সি, ইউ মাস্ট রিটার্ন টু ডেল্লি।'

মাউন্টব্যাটেন যেন আকাশ থেকে পড়লেন মেননের কথা শুনে। গোপন করলেন না মনের কথা। বললেন, 'সে কি কথা ভি.পি.? এই ত এলাম দিল্লি থেকে! মন্ত্রিসভার কোন সিদ্ধান্তে কি প্রতিস্বাক্ষরের দরকার আছে? তাহলে এখানে পাঠিয়ে দাও। কাউন্টারসাইন করে ফেরত পাঠাচ্ছি।'

কিন্তু এত সরল নয় ব্যাপারটা। একটু থেমে সেই কথাই বললেন মেনন। এক নিশ্বাসে মেনন বললেন, 'ইওর এক্সেলেন্সির দিল্লি ছাড়ার সংগে সংগেই অবস্থা খুব সঙ্গিন হয়ে গেছে। অবস্থা আরও কত খারাপ হবে আমরা কেউ জানি না। পি.এম. এবং ডেপুটি পি.এম. দুজনেই অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। ওঁরা মনে করছেন যে আপনি ফিরে না এলে অবস্থা সামাল দেওয়া যাবে না।'

'কেন তা মনে করছেন?'

'কারণ শুধু পরামর্শ নয়, ওঁরা আপনার সাহায্য চান।'

মাউন্টব্যাটেন সংগে সংগেই বলে উঠলেন, 'শোন ভি.পি.! ওঁরা কি চান আমি তা জানি। ওঁরা চাইছেন যে সাংবিধানিক প্রধানরূপে আমিও ওঁদের দুশ্চিন্তার অংশীদার হই। কিন্তু আমার দ্বারা তা হবে না। সুতরাং ওঁদের বলে দাও যে আমি দিল্লি যাচ্ছি না।'

ভি.পি. মেনন চুপ করে শুনলেন হিজ এক্সেলন্সির কথা। তারপর দৃঢ়স্বরে বললেন, 'বেশ তাই হবে। সেই কথাই ওঁদের বলবো। কিন্তু ইওর এক্সেলেন্সির মত যদি বদলে যায়?'

রীতিমত অস্বস্তিকর প্রশ্ন। কিন্তু উত্তরটা ভি.পি.ই যুগিয়ে দিলেন। বললেন, 'এখন থেকে ঠিক চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আপনি যদি দিল্লি পৌঁছতে না পারেন, তাহলে আপনার আর দিল্লি আসার দরকার হবে না। কারণ ভারতকে তখন আর বাঁচানো যাবে না।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন মাউন্টব্যাটেন। এই দীর্ঘক্ষণ নীরবতা ও পক্ষেও। শেষ পর্যন্ত মাউন্টব্যাটেনই নীরবতা ভেঙে বললেন, 'ঠিক আছে ভি.পি., ইউ ওল্ড্ সোয়াইন! তোমারই জয় হ'ক। ওঁদের বলো যে আমি আসছি।'

www.pathagar.com

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭

৬ই সেপ্টেম্বর, শনিবার। সকালেই মাউন্টব্যাটেনের স্টাডিরুমে গোপন সভা বসেছে। আটঘাট বন্ধ ঘরে সভা হবে যাতে এই গোপন সভার ফলাফল কাক-পক্ষীতেও জানতে না পারে। বস্তুত, আজকের এই সভার ব্যাপারটা গোপন রাখার দায় প্রাক্তন বড়লাটের। অন্তত আগামী ২৫ বছর এই সভার ফলাফল তাঁর জীবনের সবচেয়ে গোপন কথা হয়ে থাকবে, এটাই বাঞ্ছনীয়। কারণ, সেদিন হাটে হাঁড়ি ভাঙা হলে অন্তত একজন ভারতীয় রাজনীতিকের প্রাজ্ঞ ভাবমূর্তিটা নিশ্চয়ই ভাঙচুর হয়ে যেত। এমনকি পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে উল্লেখ-যোগ্য ব্যক্তিত্ব রূপে তাঁর আত্মপ্রকাশও হয়ত সম্ভব হ'ত না।

মোট তিনজনকে নিয়ে মিটিং বসেছে। মাউন্টব্যাটেন, নেহরু এবং প্যাটেল। দুই ভারতীয় নেতাই মুখ কালো করে বসে আছেন সভায়। দুশ্চিন্তায় আধখানা হয়ে গেছেন দুজনে। মাউন্টব্যাটেনের দিকে চেয়ে আছেন শাস্তি পাওয়া দুজন ইস্কুলের ছাত্রের মতন (এ পেয়ার অব চেসনড্ স্কুল বয়েজ)। এঁদের অপরাধ বহুবিধ। পাঞ্জাবের অবস্থা পুরোপুরি বেসামাল। এত মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে পথে নেমে পড়েছেন যা তাঁরা ভাবতেও পারেন নি। এখন দিল্লির অবস্থাও তথৈবচ। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে অবস্থা। কাঁচুমাচু মুখ করে সে কথা মেনে নিলেন নেহরু। হতাশ হয়ে বললেন, 'কিভাবে এই দাংগা থামাবো তা জানি না।'

দৃঢ়স্বরে মাউন্টব্যাটেন বললেন, 'কিন্তু এ ত আপনাদেরই থামাতে হবে।'

নেহরু এড়িয়ে গেলেন না তাঁর দায়। বললেন, 'সব বুঝলাম। কিন্তু কিভাবে ? একটু থেমে নেহরু ফের বললেন, 'আমাদের ত কোন অভিজ্ঞতাই নেই! জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলো কেটেছে ইংরেজের জেলখানায়। আমরা তখন লোক ক্ষেপিয়েছি। সেটুকই রপ্ত করেছিলাম তখন। কিন্তু কি ভাবে দেশ শাসন করতে হয় তা শিখিনি। স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা কাজ চালানো দেশশাসন করতে পারি। কিন্তু দেশ যখন অরাজক, দেশের আইন শৃংখলা যখন ভেঙে পড়েছে, তখন তার মোকাবিলা করার সাধ্য আমাদের নেই।'

মাউন্টব্যাটেন চুপ। কি বলবেন তিনি? হঠাৎ এক অবিশ্বাস্য অনুরোধ করলেন নেহরু। এমন অনুরোধ যে এই অহংকারী মানুষটির মুখ থেকে শোনা যাবে এ যেন আশা করা যায় নি। এ থেকেই প্রমাণ হয়ে গেল মানুষ হিসাবে নেহরু কত বড় মাপের। শুধু সেটুকুই নয়। দেশের বর্তমান অবস্থার গুরুত্বটিও যথাযথ বোঝার ক্ষমতা তাঁর আছে। অনেক আগেই মাউন্টব্যাটেনের সাংগঠনিক ক্ষমতা এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবার মানসিকতার প্রশংসা করেছেন তিনি। তাই তিনি ঠিকই বুঝলেন যে এই অরাজক বিশৃংখল অবস্থায় প্রশাসনের শীর্ষে তাঁর মতন যোগ্য মানুষই দরকার। এর জন্য যদি কিছুদিনের মতন নিজেকে পশ্চাদ্ভূমিতে সরিয়ে নিতে হয় তা তিনি করবেন। কোন অবস্থাতেই তাঁর ব্যক্তিগত অহংবোধকে আশকারা দিয়ে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ বিলিয়ে দেবেন না। নেহরু বললেন, 'যুদ্ধের সময় আপনি যখন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকার পেয়েছেন, আমরা তখন এক ইংরেজ জেলখানায় বন্দী। আপনি একজন প্রোফেশন্যাল প্রশাসক।

www.pathagar.com

খুবই দক্ষ আপনি এবং আপনার দৃষ্টিভংগিও পেশাদারী। আপনার যে বহুল অভিজ্ঞতা ও প্রশাসন জ্ঞান আছে তা আমাদের নেই। কারণ কলোনি শাসনের জন্য এসব আমরা শিখিনি। আপনারা ইংরেজরা অনুগ্রহ করার মতন দেশটাকে আমাদের হাতে ছেড়ে এখন সরে পড়তে চাইছেন। আমাদের এ সময় দুর্দিন চলছে। এই জরুরী সময়ে আমাদের সাহায্য করতে হবে আপনাকে। আপনাকে দেশ শাসনের ভার নিতে হবে। নেবেন ভার?'

সর্দার প্যাটেলের মতন নিরেট বাস্তববাদী মানুষটিও নেহরুর কথার প্রতিধ্বনি করলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক কথাই বলেছেন উনি। আপনাকে এখন দেশের শাসনভার বুঝে নিতে হবে।'

মাউন্টব্যাটেন স্তম্ভিত। দুজন শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় নেতার কথা শুনে আঁতকে উঠেছেন তিনি। 'মাই গড্! এসব কি বলছেন আপনারা? আপনাদের দেশ আপনাদের হাতে দিয়ে সবে হাঁফ ছেড়েছি। এখন আপনারাই আমার হাতে সেই ভার ফিরিয়ে দিতে চাইছেন?'

নেহরু মাথা নাড়লেন। বললেন, 'আমাদের অবস্থা বুঝে দায়িত্ব আপনাকে নিতেই হবে। কথা দিচ্ছি যেমন বলবেন করবো।'

মাউন্টব্যাটেন তখন যথার্থই হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন। বললেন, 'আপনার অবস্থা বুঝলাম। কিন্তু প্রস্তাবটা ত ভয়ংকর! এর পরিণাম কি হবে জানেন? যদি ঘুণাক্ষরেও জানাজানি হয়ে যায় যে, আপনাদের দেশ আমার হাতে তুলে দিয়েছেন, তাহলে আপনাদের রাজনৈতিক জীবনের দফারফা হয়ে যাবে। লোকে বলবে যে ইংরেজ বড়লাটকে জিয়ানো হয়েছিল তার হাতে শাসনভার তুলে দেবার জন্যে। না মশাই, এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়।'

নেহরু তখন মরিয়া হয়ে গেছেন। বললেন, 'যা হক একটা ফন্দিফিকির করে ব্যাপারটা চাপা দেওয়া যাবে'খন। কিন্তু আপনি যদি ভার না নেন, আমরা কিছুতেই সামাল দিতে পারবো না।'

নেহরুর কথা মন দিয়ে শুনছিলেন মাউন্টব্যাটেন। ব্যাপারটা তাঁকে ভাবাচ্ছে। কি করবেন তিনি এখন? মাউন্টব্যাটেন চ্যালেঞ্জ ভালবাসেন এবং এই চ্যালেঞ্জটা বেশ কঠিন। তবে নেহরু তাঁর শ্রদ্ধার মানুষ। ভারতবর্ষ নামে দেশটাকে তিনি ভালবাসেন। সবচেয়ে বড় কথা তাঁর নিজের দায়িত্ববোধ আছে। সব দিক ভেবেই মাউন্টব্যাটেন মনে মনে স্থির করলেন যে, তাঁর এড়িয়ে যাবার পথ নেই। মনস্থির করে মাউন্টব্যাটেন তাকালেন দুই নেতার দিকে। তারপর নৌসেনাধ্যক্ষ এ্যাডমিরাল মাউন্টব্যাটেন নেহরুর চোখে চোখ রেখে বললেন, 'ঠিক আছে, আমি দায়িত্ব নিলাম। কি করলে কি হয় সে জ্ঞান আমার আছে। সুতরাং ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। তবে আমাদের সবাইকে দেখতে হবে যাতে ব্যাপারটা জানাজানি না হয়। কাকপক্ষীতেও জানবে না যে আপনারাই আমায় এই অনুরোধ করেছেন।'

একটু চুপ করলেন মাউন্টব্যাটেন। তারপর বললেন, 'আপনারা এবার আমায় একটা ইমারজেন্সি কমিটি তৈরি করতে বলুন। কি হ'ল, বলুন?'

নেহরু ও প্যাটেল থতমত খেয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বললেন, 'বললাম।'

মাউন্টব্যাটেন খুশী হয়ে বলেন, 'তাহলে এবার আমায় চেয়ারম্যান হতে বলুন!'

দুই নেতাই আগের মতই মন্ত্রমুগ্ধ স্বরে বললেন, 'তাও বললাম।'

মাউন্টব্যাটেন খুব দ্রুত এগোচ্ছিলেন। দুই নেতাই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ওঁর

www.pathagar.com

কাজকর্মের ধারা দেখে। মাউন্টব্যাটেন বললেন, 'মন্ত্রিসভার এই ঈমারজেন্‌সি কমিটিতে কারা থাকবেন তা ঠিক করবো আমি।'

নেহরু যেন ক্ষুব্ধ হলেন। বললেন, 'সমস্ত মন্ত্রিসভাকেই আপনি এই কাজে লাগাতে পারেন।'

মাউন্টব্যাটেন যেন ভূত দেখার মতন আঁতকে উঠলেন নেহরুর কথা শুনে। তারপর বললেন, 'ক্ষেপেছেন! তাহলে ত সবই ভণ্ডুল হয়ে যাবে। কমিটিতে আমি কাজের লোক চাই।'

দুই নেতার মুখে তখন লাল হয়ে গেছে চাপা অপমানে। একটু অবাক হয়ে নেহরু বললেন, 'কাজের লোক?'

মাউন্টব্যাটেন এবার আরও স্পষ্ট করলেন তাঁর ব্যাখ্যা। বললেন, 'যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে কাজ করছেন, তাঁদের নিয়েই আমি কমিটি গড়তে চাই। আমার কমিটিতে থাকবেন অসামরিক বিমান পরিবহনের ডিরেক্টর, রেল পরিবহনের ডিরেক্টর এবং ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসেসের প্রধান। রেড ক্রস এবং অন্য স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম দেখবেন আমার স্ত্রী। এই জরুরী কমিটির সচিব হবেন আমার কন্‌ফারেন্স সেক্রেটারি জেনারেল আর্কস্‌কীন ক্রাম। কমিটির কার্যবিবরণী পালা করে টাইপ করবে ব্রিটিশ টাইপিস্টরা, যাতে মিটিং-এর সংগে সংগেই কার্যবিবরণী তৈরি হয়ে যায়।' একটু চুপ করলেন মাউন্টব্যাটেন। তারপর বিমূঢ় দুই নেতার মুখের দিকে পর্যায় ক্রমে তাকিয়ে বললেন, 'এবার বলুন, এভাবে আমায় কাজ করতে দেবেন তো?'

অবাক হয়ে শুনছিলেন ওঁরা। মাউন্টব্যাটেনের প্রশ্ন শুনে সম্বিৎ ফিরে পেলেন যেন। বললেন, 'হ্যাঁ। নিশ্চয় দেব। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাবেন আপনি।'

মনে মনে বোধহয় হাসলেন মাউন্টব্যাটেন। তারপর আসল রগড়ের কথাটা বললেন। দুজনের দিকে চেয়ে বললেন, 'মিটিংয়ের সময় আমার ডানদিকে বসবেন প্রধানমন্ত্রী এবং বাঁ দিকে বসবেন উপ-প্রধানমন্ত্রী। মিটিং যখন চলবে তখন মাঝে মাঝে আপনাদের সংগে পরামর্শ করার ভান করবো আমি। কিন্তু যে কথাই বলি না কেন, আপনারা তা মেনে নেবেন, আপত্তি করা চলবে না, কারণ আমাদের হাতে সময় নেই। ধরুন আমি বললুম, "তাহলে আমি এইভাবে কাজ করতে পারি?" আপনারা বলবেন, "নিশ্চয়ই পারেন!" আমার এইটুকু হলেই চলবে।'

মাউন্টব্যাটেন একটু থামলেন। তারপর সকৌতুকে তাকালেন দুজনের দিকে। প্যাটেল মনে মনে দারুন অসহিষ্ণু হয়ে গেছেন তখন। বললেন, 'কিন্তু আমরা কি...?'

মাউন্টব্যাটেন মাথা নাড়লেন। 'না, যাতে দেরি হয় এমন কিছুই করা চলবে না আপনাদের।' তারপর অভিজ্ঞ প্যাটেলের দিকে চেয়ে বললেন, 'এবার বলুন, এভাবে আমায় দেশশাসন করতে দিতে চান কি না?'

ক্ষুব্ধ প্যাটেল একটু যেন ভাবলেন। তারপর ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'ঠিক আছে। সে স্বাধীনতা আপনাকে দিলাম। আপনার যেমন খুশি তেমনিভাবেই দেশ চালান।'

মাউন্টব্যাটেন আর অপেক্ষা করলেন না। প্যাড টেনে নিলেন ড্রয়ার থেকে। তারপর তিনজনের উপস্থিতিতে পনেরো মিনিটের মধ্যেই জরুরী কমিটির সভ্যদের

www.pathagar.com

নামধাম স্থির হয়ে গেল। মাউন্টব্যাটেন বললেন, 'জেন্ট্ল্মেন, আমাদের কমিটির প্রথম সভা বসবে আজ বিকাল পাঁচটায়।'

নেহরু এবং প্যাটেল তখন মুখ চাওয়াচাওয়ি করছেন। যেন ভূতে পেয়েছে ওঁদের, এইরকমই মুখের ভাব। বাস্তবিক তাই। এতদিনের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ঘনঘন ধর্মঘট, হরতাল, বিলিতি কাপড় পোড়ানোর ধুম সবই এখন পন্ডশ্রম মনে হচ্ছে ওঁদের। এমনকি স্বাধীনতা পাবার তিন হপ্তা কাটার পর এই পুনরাবর্তন যেন ইতিহাসের এক নির্মম কৌতুক। আকাশপাতাল তোলপাড় করে স্বাধীনতা পাবার পর এই হ'ল পরিণাম ?. আবার একজন ইংরেজের হাতে ভারতের শাসনভার তুলে দিতে হ'ল শেষ মুহূর্তে ?

www.pathagar.com

ব্যাপারটা এমন হলো যেন চলতে চলতে জীবনরথের চাকা উল্টো ঘুরে গেছে এবং এই পিছন টানে সামনে এসে দাঁড়াল 'পশ্চাতের আমি'। মাউন্টব্যাটেন আবার ফিরে এলেন তাঁর পুরনো ভূমিকায়। স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হলেন সর্বাধিনায়ক-রূপে। আবার যেন সুপ্রীম কম্যান্ডার হলেন তিনি যেখানে তিনিই সর্বেসর্বা। আবার সেই ক্ষিপ্র ত্বরিত কর্মদ্যোগ যার মধ্যে তন্ময় হয়ে ডুবে গেলেন তিনি। বলতে গেলে, জরুরী কমিটির নেতৃত্ব পাবার এক ঘণ্টার মধ্যেই লাল বেলেপাথরের তৈরি লাটভবন যেন জড়তা কাটিয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠলো এবং যুদ্ধকালীন অবস্থায় সেনা-বাহিনীর সদর কার্যালয়ের মতন কর্মচঞ্চল হয়ে উঠলো।

সেই সজাগ কর্মতৎপরতার চেহারাটা যে কেমন, তার ধারণা পাওয়া যায় মাউন্টব্যাটেনের একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগীর দেওয়া বিবরণ থেকে। তিনি বলেই ফেললেন যে তখন নেহরু বা প্যাটেলের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল এই অরাজকতা। সারা পাঞ্জাবই তখন শয়তানের হাতে চলে গেছে। তাই মাউন্টব্যাটেনের স্টাডিরুম থেকেও তাঁরা কদাচিৎ বেরোতেন। মাউন্টব্যাটেনের নির্দেশে জরুরী কমিটির সভা বসতে লাগলো ভাইসরয়ের এক্সেকিউটিভ কাউন্সিলের সভাকক্ষে। ঠিক পাশের ঘরটাই ছিল লর্ড ইসমের অফিস। এখন সেই ঘরখানা পরিণত হয়েছে ইনটেলিজেন্স সেন্টার বা গোয়েন্দা দপ্তরে। ঘরের দেওয়ালে ঝুলছে পাঞ্জাবের সর্বোত্তম মানচিত্র। সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর থেকে পাঞ্জাবের এইসব পূর্ণাঙ্গ মানচিত্রগুলো আনিয়ে নিয়েছেন তিনি। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত শুরু হয়েছে সামরিক বিমানবাহিনীর আকাশ পর্যবেক্ষণ। টহলদারি বিমানের চালকরা উদ্বাস্তু মিছিলের আকার, আয়তন ও গতিবিধির খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়ে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেতারে রিপোর্ট পাঠাচ্ছে।

আকাশ পর্যবেক্ষণবাহিনীর টহলদারি বিমান নজর রেখেছে রেল সড়কের ওপরও। খুঁটিনাটি তুচ্ছ বিষয়ও তাদের নজর এড়িয়ে যাচ্ছে না। বলতে কি, তথ্য সংগ্রহের একটা তাড়স (প্যাশন) নিয়ে মাউন্টব্যাটেন যেন একটা জাল ছড়িয়ে দিয়েছেন। এমন নিখুঁত একটা নকশা এঁকেছেন যার ফলে লাটভবনের সঙ্গে পাঞ্জাবের সমস্ত উপদ্রুত ঘাঁটিগুলোর যোগাযোগ থাকে। গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান কর্মকর্তারূপে তিনি বাছলেন মেজর জেনারেল পেটী রীজ্‌কে। এঁরই নেতৃত্বাধীন পাঞ্জাব বাউন্ডারি ফোর্স বর্তমানে দুভাগ হয়ে গেছে এবং ভারত ও পাকিস্তানের আলাদা সীমানা ফোর্সে পরিণত হয়েছে।* দেশের এই সঙ্কটকালে

---

* দেশভাগের পর ভারত ও পাকিস্তান, এই উভয় সরকারের জেদাজেদিতেই পাঞ্জাবের বাউণ্ডারি ফোর্স দুভাগ হয়ে যায়। দুই সরকারই বায়না করে যে শান্তি ফেরানো দূরের কথা, এই ফোর্সের দ্বারা কোন কাজের কাজই হবে না, যদি তাদের বদলে এই ফোর্স এক তৃতীয় শক্তির হুকুম মেনে চলে। সুতরাং বাউণ্ডারি ফোর্স ভেঙে দেওয়া হ'ক। কিন্তু বাধ সাধলেন জেনারেল অকিন্‌লেক। তিনি

প্রায় সবাইকে উদ্বুদ্ধ করলেন মাউন্টব্যাটেন। মেয়ে পামেলাও বাদ গেলেন না। সপ্তদশী পামেলা হলেন মেজর জেনারেল পেটী রীজের সেক্রেটারি।

আপৎকালীন জরুরী কমিটির প্রথম সভাতেই একটা দারুণ চমক দিলেন মাউন্টব্যাটেন। দুই ভারতীয় নেতাকে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন বিভিন্ন মানচিত্রের সামনে। নেহরু এবং প্যাটেল স্তম্ভিত। বাস্তব অবস্থা যে কত ভয়াবহ তার কোন ধারণাই ছিল না ওঁদের। মানচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন হতবুদ্ধির মতন। শুধু ব্যাপক, বিশালই নয়। এত ভয়াবহ বাস্তব অবস্থা! ওঁদের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন মাউন্টব্যাটেনের প্রেস এ্যাটাশে এ্যালান ক্যাম্পবেল জনসন। দুই ভারতীয় নেতার স্তম্ভিতভাবটা নিজের চোখেই দেখেছেন। এ্যালান লেখেন, 'অজানা অন্তহীন সমস্যার সামনে নেহরু যেন দিশাহারার মতন তাকিয়ে আছেন। কেমন কাতর আর হতাশ দেখাচ্ছিল তাঁকে।' তবে প্যাটেল সম্বন্ধে এ্যালানের মন্তব্যটাই উপভোগ্য। 'রীতিমত বিচলিত তিনি, চাপা রাগ আর হতাশায়!'

কিন্তু মাউন্টব্যাটেন মোটেই হতাশ নন। তখন তীরের মতন এগিয়ে চলেছেন তিনি। পরবর্তী ক'টা দিনের মধ্যেই মাউন্টব্যাটেনের এই তুরঙ্গ গতিবেগ টের পেয়ে গেল সবাই। তাঁর মুখের সেই ছিমছাম মিষ্টি ভাবখানা চলে গেছে কোথায়। তার বদলে মুখে ফুটে উঠেছে কঠিন সংকল্প। শরীর যায় যাক, কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছতেই হবে তাঁকে কোন রফা আপস না করে। প্রথম দিনের সভার প্রধান সিদ্ধান্তগুলো সভা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিলি হয়ে গেল সভ্যদের কাছে। তাঁর দপ্তরের ইংরেজ টাইপিস্টরা তখনই টাইপ করে ফেলেছে সভার কার্যবিবরণী। মাউন্টব্যাটেন কথা দিলেন যে অবশিষ্ট সিদ্ধান্তগুলো এক ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাবে বাহক মারফত। মাউন্টব্যাটেন আরও জানিয়ে দিলেন যে পরবর্তী সভার প্রথম আলোচ্য বিষয় হবে সিদ্ধান্তগুলো কতখানি কার্যকর হয়েছে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা।

সেদিন সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সবাই উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তি। কিন্তু মাউন্টব্যাটেনের কাজের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলার ব্যাপারে তাঁদের সামান্য গাফিলতিও নজর এড়িয়ে যেত না তাঁর। সইতেনও না তিনি। এইরকমই একটা ঘটনার কথা বলেছিলেন নেহরুর প্রাইভেট সেক্রেটারি আয়াংগার। পাঞ্জাবের কোন এক উপদ্রুত অঞ্চলে নাকি বিমানের অভাবে ওষুধপত্র পৌঁছে দেওয়া যায় নি। রিপোর্ট পেয়েই গম্ভীর হয়ে গেলেন মাউন্টব্যাটেন। তারপর মিটিংয়ের মধ্যেই অসামরিক বিমান পরিবহনের ডিরেক্টরকে উদ্দেশ করে বললেন, 'মিটিং ছেড়ে আপনি এখনই এয়ারপোর্ট-এ চলে যান। তারপর নাওয়া খাওয়া বন্ধ রেখে

হুমকি দিলেন যে বাউণ্ডারি ফোর্স ভেঙে দেওয়া হলে তিনি পদত্যাগ করবেন। তাঁর ধারণা যে দুই সরকারই বাউণ্ডারি ফোর্সের কর্তৃত্ব হাতে রাখতে চাইছে যাতে তাদের নিজেদের সাম্প্রদায়িক প্রয়োজনে এই ফোর্সকে কাজে লাগাতে পারে। এই অবস্থায় লর্ড ইসমে, যিনি নিজেও এককালে ইণ্ডিয়ান আর্মির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, মন্তব্য করলেন যে, অকিনলেক যদি দুই ডোমিনিয়নের রাজনৈতিক কার্যকলাপ বুঝতে না চান তবে বরং তাঁকে পদত্যাগ করতে দেওয়াই শ্রেয়। মাউন্টব্যাটেন অবশ্য এতে রাজী হন নি। কারণ সবাই পরামর্শ দিলেন যে এই অবস্থায় অকিনলেককে পদত্যাগ করতে দিলে একটা দারুণ বিপর্যয় হবে দেশময়।

www.pathagar.com

ওখানেই বসে থাকুন, যতক্ষণ প্লেন ছেড়ে না যাচ্ছে। তারপর প্লেন ছেড়ে যাবার পর আমায় এসে রিপোর্ট করবেন। যান!' সেই প্রবীণ সরকারী কর্তাব্যক্তিটি সেদিন দারুণ অপমানিত হয়েছিলেন, একথা ঠিক। মনে আঘাতও পেয়েছিলেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে ওষুধপত্রের যোগান নিয়ে বিমানটাও উড়ে গিয়েছিল পালাম বন্দর থেকে।

প্রথম মিটিংয়েই মাউন্টব্যাটেনের অনমনীয় দৃঢ় মনোভাবের একটা চকিত কিরণ দেখা গেল। তখনই বোঝা গেল যে কর্তব্যপালনের প্রয়োজনে তিনি কত কঠিন হতে পারেন। মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব দিলেন যে, যখনই দুষ্কৃতীরা ট্রেনের ওপর হামলা করে সফল হবে, তখনই ট্রেনের নিরাপত্তা রক্ষীদের বন্দী করা হ'ক। তারপর আহত রক্ষীদের মুক্তি দিয়ে অন্য রক্ষীদের সামরিক বিচারে তখনই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হ'ক। তাঁর ধারণা, এই ব্যবস্থা কার্যকর হলে ফল শুভ হবে এবং নিরাপত্তা রক্ষী বাহিনীতে ডিসিপ্লিন ফিরে আসবে।

তবে দিল্লির অরাজক অবস্থাটাই তখন যেন তাঁর শিরঃপীড়ার প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর আঁচ পাওয়া গেল প্রথম মিটিংয়েই। মাউন্টব্যাটেন দৃঢ়ভাবে বললেন, 'আমরা যদি দিল্লিতে ভেঙে পড়ি, তাহলে সারা দেশ আমাদের সঙ্গে ভেঙে পড়বে।' অতএব সেটি হতে দেওয়া চলবে না। প্রথমেই দিল্লির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অতিরিক্ত সামরিক সংগতির দরকার। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে অতিরিক্ত সেনাবাহিনী আনবার আদেশ দিলেন তিনি। এমনকি তাঁর নিজস্ব বডিগার্ড বাহিনীকেও নিরাপত্তার কাজে বহাল করলেন। শহরের জন্য আরও অসামরিক যাত্রীবাহী বাস আনবার আদেশ দিলেন। রাস্তায় যত্রতত্র পড়ে থাকা মানুষের লাশ তুলে পোড়াবার ব্যবস্থা করলেন। রবিবার ও ছুটির দিন বাতিল করা হ'ল, সরকারী কর্মচারীদের দপ্তরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলেন, ভেঙে পড়া টেলিফোন ব্যবস্থা চালু করা হ'ল, ইত্যাদি। মোটকথা, সর্বস্তরে একটা টানটান কর্মোদ্যোগ ছড়িয়ে দিলেন তিনি। আরও একটা ব্যবস্থা তিনি করলেন। শহর থেকে উদ্বাস্তুদের বাইরে পাঠিয়ে দিলেন এবং নতুন অনুপ্রবেশ বন্ধ করে দিলেন। হয়ত বিশৃঙ্খল উত্তরভারতের উপর এর প্রভাব পড়তে একটু বিলম্ব হয়েছিল। কিন্তু একটা সুফল সবারই চোখে পড়লো তখনই। ভারতের স্নায়ুকেন্দ্র এই রাজধানী শহরের কাজকর্মের ধারা যেন হঠাৎ বদলে গেল। সেই সাবেককালের গরুর গাড়ির গতি থেকে লাফিয়ে জেট বিমানের গতিতে পরিণত হ'ল কাজকর্মের ধারা।

পরের দুটো মাস যেন বিপন্ন মানুষের ঢল নামলো পাঞ্জাবের বুক জুড়ে। এই ঢলের চেহারা যে কত ভয়ংকর তার আন্দাজ দিতেই তখন মানচিত্রের গায়ে ছোট ছোট লাল রঙের গোঁজ এ'টে দেওয়া হয়েছে। নিষ্প্রাণ এই লাল রঙের গোঁজগুলোর দিকে তাকালেই অনুমান হয় কি বিপুল এর আয়তন। সারা মানচিত্রখানার ওপর দিয়ে বুকে হে'টে চলেছে মানুষ-কীট সদৃশ লাল পিনগুলো। মানুষের অন্তহীন দুঃখ দুর্দশা তখন যেন মানুষের কল্পনা আর সহ্যশক্তিকেও ছাড়িয়ে গেছে। এই বিপুল জনপরিযানে যে কত মানুষ শামিল হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এইরকম একটা উদ্বাস্তু মিছিলের অন্তর্গত হয়েছে আট লক্ষাধিক ছিন্নমূল মানুষ, যা নাকি ইতিহাসে নজিরবিহীন। কিন্তু কোথায় চলেছে এই বিপুল মানুষের

www.pathagar.com

মিছিল? যেন মনে হয় হঠাৎ কোন দুর্ঘটনায় গ্লাসগো শহর থেকে পিলপিল করে প্রতিটি ছেলেমেয়ে বুড়োবাচ্চা পায়ে হেঁটে ম্যাঞ্চেস্টার চলেছে একটু আশ্রয়ের খোঁজে।

প্রথম প্রথম নেহরু, জিন্না এবং লিয়াকতরা চেষ্টা করেছিলেন এই ঢল থামাবার। কেননা মানুষের এই উন্মত্ত প্লাবন তাঁরা কেউ চান নি। সুতরাং সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা হ'ল যাতে তারা পাগলের মতন বাস্তু ছেড়ে না যায়। কিন্তু কে শোনে তাঁদের কথা! দিনে দিনেই বাড়তে লাগলো স্রোতের আকার। ক্রমে এমন অবস্থা হ'ল যে তিন নেতাই হতভম্ব। এর থেকে পরিত্রাণের একটাই পথ। দুই পাঞ্জাবের মধ্যে লোক বিনিময়। অগত্যা এই বিধানটাই মেনে নিলেন তাঁরা। তাঁরা তখন বুঝেছেন যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির এই দামটুকু তাঁদের দিতেই হবে। সুতরাং তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। দু পক্ষের অসামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে তাড়ঘাড় এই লোকবিনিময়ের দায়িত্ব দেওয়া হ'ল, যাতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন শীত পড়ার আগেই শেষ করে ফেলা যায়। লাটভবনের ম্যাপরুমে তখন জোর কদমে সামরিক তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। নিভাঁজ, কড়কড়ে সামরিক পোশাক পরা মেয়ে পুরুষ কর্মীরা যুদ্ধকালীন ব্যস্ততায় ছোটাছুটি করছে। প্রতিটি উদ্বাস্তু মিছিলের গতিপথ ম্যাপের গায়ে লাল গোঁজের অবস্থান দিয়ে বোঝানো হচ্ছে। যেমন মিছিল এগোচ্ছে তেমনি গোঁজগুলিও এক ইঞ্চি করে এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে।*

---

* গান্ধীজী মুগ্ধ হয়ে যান মাউন্টব্যাটেনের এই কর্মতৎপরতা দেখে। সারা গভর্ণমেন্ট হাউস যেন গমগম করছে কাজের লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রত্যাশায়। উদ্দেশ্যসাধনের তন্ময় মনোযোগ ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। ভারী ভাল লাগলো তাঁর। দিল্লি পৌঁছেই প্রাক্তন ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন গান্ধীজী। লাটভবনের সেই আগের চেহারা নেই। নতুন সাজে সেজেছে লাটভবন। যাবতীয় সামরিক কাজকর্মের সদর দপ্তর হয়ে উঠেছে এই ভবন। মাউন্টব্যাটেন তখন তাঁর এই 'ওয়ান ম্যান বাউণ্ডারি ফোর্স'কে যত্ন করে ভবনটি ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন। তারপর দুজনে এসে বসলেন তাঁর স্টাডিরুমে। ঘরে ঢুকেই একটা পুরনো কথা মনে পড়ে গেল গান্ধীজীর। একদিন এই ঘরে বসেই মাউন্টব্যাটেনকে তিনি দেশভাগ থামাতে অনুরোধ করেছিলেন। কথাটা মনে হতে মনে মনে হাসলেন গান্ধীজী। তারপর মাউন্টব্যাটেনকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আমি খুশী যে গান্ধার বদলে আপনি ঈশ্বরের কথা শুনেছেন।'

মাউন্টব্যাটেন একটু যেন থতমত। বৃদ্ধের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমি সবসময়ই ওঁর কথা আগে শুনতে পাই। কিন্তু হঠাৎ একথা বলছেন কেন? কোথায় আপনাকে অমান্য করে আমি ঈশ্বরের কথা শুনলুম?'

দুষ্টু একটু হেসে গান্ধীজী বললেন, 'ঈশ্বর নিশ্চয়ই আপনাকে এই বোকা বুড়োর কথা শুনতে বারণ করেছেন।'

মাউন্টব্যাটেন তখনও বিমূঢ়। গান্ধীজী বললেন, 'নইলে এই বুড়োটার কথা শুনে আপনি হয়ত এই প্রাসাদটা ছেড়েই দিতেন।' একটু চুপ করে গান্ধীজী ফের বললেন, 'এখন টের পাচ্ছি যে এই বাড়িটাই সারা দেশের হৃদয়। এখান থেকেই দেশ শাসন হচ্ছে, হেস্তনেস্ত হচ্ছে সব সমস্যার। যত

www.pathagar.com

সকালের আলো ফুটতেই উদ্বাস্তুদের অবিরাম পথ চলা শুরু হয়ে যায়। সারা দিনে আরও কয়েক মাইল হাঁটতে হবে তাদের। তবেই কিছুটা দূরত্ব কমিয়ে নিতে পারবে তারা। তখন মাথার ওপর উড়ছে টহলদারি বিমান। বিমানের ডানার নীচে বিপর্যস্ত, ছিন্নমূল মানুষের মিছিল চলেছে। এ এমন এক দৃশ্য যা দেখে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এই মিছিলের ছবিটা চিরকাল মনে থাকবে একজন শিখ বিমানচালকের। মানুষ নয় যেন পিঁপড়ের সার চলেছে মাটির ওপর দিয়ে। গবাদি পশুর পাল যেমন তাড়া খেয়ে চলে ঠিক সেইরকম। আগুন লাগা গ্রামের মধ্যে যেন উদ্ভ্রান্তের মতন ছুটোছুটি করছে অসহায় পশুর দল। আর একজন বিমানচালক ত টানা পনেরো মিনিট বিমান চালিয়েও এই মিছিলের লেজামুড়ো খুঁজে পায় নি। কোথাও শম্বুকগতি মানুষের মিছিল ঠেক্ খেয়ে দানা বেঁধে গেছে। কোথাও বা সরু জলধারার মতন গড়িয়ে যেতে যেতে কোন সড়কবাধার সামনে জটলা বেঁধে গেছে।

বেলা বাড়ার সংগে সংগে হাজার হাজার গবাদি পশুর পায়ের ধুলোর একটা ফ্যাকাসে চাদরে ঢাকা পড়ে যায় এই উদ্বাস্তু মিছিল। তখন চোখের দৃষ্টি দিগন্ত দেখতে পায় না ওই তপ্ত ধুলোর চাদর ভেদ করে। তারপর যখন রাত নামে, তখন এই চলন্ত মিছিল হাড়গোড় ভাঙা জন্তুর মতন হঠাৎ মুখ থুবড়ে রাস্তার পাশে বসে পড়ে। জ্বলে ওঠে হাজার হাজার চুল্লী। খুদকুঁড়ো যার যা আছে তাই পুড়িয়েই ক্ষুন্নিবৃত্তির আয়োজন হয়। তখন অনেক দূর থেকে চুল্লীর আগুনের মরা আলো ধুলোর চাদরের সংগে মিশে একটা লাল আভার মতন দেখায়।

মূক, বিপর্যস্ত মানুষগুলোর যথার্থ অবস্থাটা যে কত ভয়ঙ্কর এইবার তা বোঝা যায়। অমানুষিক কষ্ট আর ক্লান্তিতে কেমন যেন জবুথবু হয়ে গেছে ওরা। চোখ-গলা কিসকিস করছে ধুলোবালিতে। রাস্তার পাথরে ঠোক্কর লেগে পাদুখানা ক্ষতবিক্ষত। ক্ষিধে তেষ্টায় বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। চতুর্দিকে মানুষের মলমূত্র ছড়িয়ে আছে। দুর্গন্ধে গা পাক দিয়ে ওঠে। তবুও শরীরটাকে কোনরকমে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে ওরা। পুরুষদের পরনে শুধু একখানা ধুতি। অনেকেরই গায়ে কোন আবরণ নেই। মেয়েদের পরনে মলিন শতচ্ছিন্ন শাড়ি। অনেকেরই পায়ে জুতো নেই। যাদের আছে সেগুলোও ছেঁড়াখোঁড়া। বুড়ীদের ধরে নিয়ে চলেছে জোয়ান ছেলেরা। গর্ভবতী মেয়েরা স্বামীর হাত ধরে পায়ে পায়ে হাঁটছে। অক্ষম মা বউদের কাঁধে তুলে নিয়েছে সবল সক্ষম পুরুষরা। এইভাবেই চলেছে ওরা দিনের পর দিন। এক-আধ মাইল নয়। শতশত মাইল ধরে ওরা হাঁটছে ঘাম রক্ত ঝরিয়ে, এক ঢোঁক জল খেয়ে বা দুখানা শুকনো রুটি চিবিয়ে।

যারা খোঁড়া, রুগ্ন বা মুমূর্ষু তাদের বাঁকে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জোয়ান পুরুষরা। বোঝার ভারে কাঁধ পিঠ নুয়ে গেছে তাদের। মেয়েদের কাঁখে বাচ্চা, মাথায় ঘরকরনার যাবতীয় জিনিসপত্র, থালা, বাটি হাঁড়ি, কড়া ইত্যাদি। কেউ সংগে নিয়ে চলেছে ঠাকুরের পটখানাও। শিখেরা নিয়েছে গুরু নানকের ছবিখানা।

ঝড়ঝাপটাই উঠুক না কেন, এখানে এসে ঢুকে পড়তে পারলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তাই যেভাবে হ'ক এই আশ্রয়টুকু টিকিয়ে রাখা দরকার। শুধু আপনিই নন, যারা আপনার উত্তরাধিকারী হবেন, তাদের জন্যও এই আশ্রয়টুকু দরকার।'

www.pathagar.com

মুসলমানরা নিয়েছে পবিত্র কোরান। কেউ কেউ লাঠির আগায় চটের থলির মধ্যে কচি বাচ্চা নিয়ে চলেছে। লাঠির অন্য প্রান্তে থলির মধ্যে পোরা আছে মাটি খোঁড়ার খন্তা, শাবল আর শুকনো বীজ দানা।

ষাঁড়, বলদ, উট, ঘোড়া, ভেড়া; ছাগল কি নেই এই দলে! ওদের মালিকদের মতনই হালছাড়া অবস্থা তাদের। সবাই হাঁটছে দুর্দশার বোঝা মাথায় নিয়ে। ষাঁড় বলদে টেনে নিয়ে চলেছে কাঠের চাকাওলা শকট। কিম্ভূতদর্শন এই মহা-মিছিলের যাবতীয় জিনিসপত্র চূড়ো করে রাখা আছে শকটের ওপর। আছে চারপাই, খড়ের গদি, লাঙ্গল, আবাদী জমির শস্য তোলার উকুনঝাড়ি (রেক্), বড় গাঁইতি, আগের বারের ফসলের থলি। অতি প্রয়োজনীয় এই উপকরণের কোনটাই ফেলনা নয়। তাই পুরনো কাপড় দিয়ে কষে বাঁধা হয়েছে এগুলো। এরই মধ্যে উঁকি দিচ্ছে ঝলমলে জরির কাজ করা কারও বিয়ের শাড়িখানাও। আছে সুখের দিনের কিছু স্মৃতি। যেমন তামাক খাবার হুঁকোটা বা বিয়ের সময় যৌতুক পাওয়া বাসনকোসন ইত্যাদি। মুসলমানী মিছিলের সঙ্গে চলেছে পর্দা ঢাকা ছোট ছোট ঠেলাগাড়ি বা টঙ্গা। পর্দানশিন মুসলমান মেয়েরা আপাদমস্তক বোরকায় ঢেকে জবুথবু হয়ে বসে আছে গাড়ির মধ্যে। আর হাড়জিরজিরে ঘোড়া দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদের।

এটা প্রমোদভ্রমণ নয়। পাশের গ্রামে ক'দিনের জন্য বেড়াতে যাওয়া নয়। ভারতীয় বা পাকিস্তান যেই-ই হ'ক, সংসারের পাট চুকিয়ে এক মুলুক থেকে আর এক মুলুকে চলেছে ওরা। ঘর-বাড়ি, জোত-জমি ফেলে হতাশ মানুষের দল মাইলের পর মাইল হেঁটে চলেছে আর ফিরবে না বলে। এই পথচলায় ওদের সর্বক্ষণের সঙ্গী হ'ল রোগ, ব্যাধি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা। আরও কত বাধা আছে যা প্রতিকার করার সামর্থ্য তাদের নেই। হিন্দু, মুসলমান বা শিখ যে ধর্মেরই হ'ক না কেন, এদের আলাদা জাত নেই। এরা সবাই একরকম। সাধারণ গরিবগুরবো, নিরক্ষর চাষাভূষা শ্রেণীর মানুষ। তারা না চেনে বড়লাটকে, না জানে কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ দল। তারা শুধু চেনে তাদের জমিটুকু। আর জানে কি করে চাষ করতে হয়, কি করে ফসল ফলাতে হয়। দেশভাগ, সীমানা রেখা, স্বাধীনতা ইত্যাদি ঘটনাগুলো সম্বন্ধে তাদের কোন আগ্রহই নেই। অথচ ভাগ্যের ফেরে এরাই আজ হতভাগা। যে ব্যাপারগুলো নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা ছিল না কখনও, সেগুলোই এখন তাদের গভীর দুর্দশার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একটানা এই পথচলার সর্বক্ষণের সাথী হলেন নিষ্ঠুর মার্তণ্ড-দেব, যিনি মার্জনা করেন না, করুণা করেন না। গাছপালাহীন উদম, আঢাকা পথে-প্রান্তরে রোদেপোড়া মানুষগুলোর দুর্দশা দেখে কেউ দুঃখ পান না। না আল্লা, না হরি, না নানক। তাই জ্বলন্ত আকাশের বুক থেকে ঝরে পড়া গনগনে আগুনের ছেঁকায় সারা গা জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে গেলেও একটুকরো মেঘের ছায়া দিয়ে মানুষগুলোকে খানিকক্ষণের স্বস্তি আরাম দেন না তাঁরা।

বরং ওদের এই পথচলার দুর্দশা আরও বেড়ে যায় যখন লোলুপ মানুষের শ্যেন নজর ওদের সর্বস্বান্ত করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়ে। এইরকমই এক নিষ্ঠুর ঘটনার কথা বলেছিল লেফ্‌টেন্যান্ট রাম সর্‌দিলাল। এক মুসলমান উদ্বাস্তু মিছিলের নিরাপত্তা রক্ষী হয়ে থাকার সময় এই ঘটনাটা সে দেখতে পায়। শকুন যেমন ভাগাড়ের দিকে নজর রাখে তেমনি একদল লোভী শিখ এই মুসলমান

www.pathagar.com

উদ্বাস্তুদের ওপর সর্বক্ষণ হামলা করতে থাকে। নামমাত্র দাম দিয়ে এই দুর্বৃত্ত শিখগুলো মুসলমানদের যথাসর্বস্ব কেড়ে নিতে চাইছিল। শেষ পর্যন্ত খিদে-তেষ্টায় বেচারা মুসলমান উদ্বাস্তুদের এমন দুরবস্থা হ'ল যে, মাত্র এক গেলাস জলের বদলে তাদের যথাসর্বস্ব শিখদের হাতে তুলে দিল তারা।

তার গোর্খা রক্ষিবাহিনী নিয়ে ক্যাপ্টেন এ্যাট্কীন্স্কে বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে শিখ ও মুসলমান উদ্বাস্তু নিয়ে একই পথে যাতায়াত করতে হয়েছিল। তখন এ্যাট্কীন্স্ লক্ষ্য করে যে যাত্রা শুরুর সংগে সংগেই মানুষের উৎসাহে টান পড়তো। তখন ক্লান্তি আর খিদে তেষ্টায় তারা এমন অবসন্ন হয়ে যেত যে সংগের খাবার-দাবার ইত্যাদি নানা বস্তু আবর্জনার মতন পথে ফেলে দিত। শরীরটা ছাড়া আর কিছুরই ভার বহন করার ক্ষমতা তাদের থাকতো না। দেহমনের সেই অবসন্ন অবস্থায় হঠাৎ যখন উড়ন্ত বিমান থেকে শুকনো খাবারের প্যাকেট ছোঁড়া হ'ত, তখন সেগুলো নিয়ে কাড়াকাড়ি মারামারি শুরু হয়ে যেত। নিরাপত্তা বাহিনীর গোর্খা রক্ষীরা বন্দুক হাতে পাহারা দিত সেই খাদ্যবস্তুর। একবার এ্যাট্কীন্স্ স্তম্ভিত হয়ে দেখলো যে মুখে শুকনো রুটি নিয়ে পলায়নরত রাস্তার কুকুরের পশ্চাদ্ধাবন করছে এক দল ক্ষুধার্ত মানুষ। সবচেয়ে করুণ অবস্থা হ'ল শিশু, বুড়ো আর অক্ষমদের। তারা না পারে হাঁটতে না কারও ঘাড়ে চাপতে। তাছাড়া অন্য একজন মানুষের ভার বইবার ক্ষমতাও তখন কারো নেই। এমনকি কত অবুঝ বাচ্চাদের তখন বাপ মায়ের পিছনে হামা দিয়ে চলতে দেখা গেছে। গরম ধুলোর ওপর দিয়ে হামা দেবার সময় কচি বাচ্চারা যখন সেঁকা রুটির মতন আছড়া-আছড়ি করছে, তখন সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য চোখে দেখা যায় না। অক্ষম বুড়ো মানুষদের অনেকেই, তখন মনে মনে মৃত্যু কামনা করছে। এভাবে জ্যান্তে-মরার চাইতে পুরোপুরি মরে যাওয়া অনেক শ্রেয়। তবে মরার আগে একটুকরো গাছের ছাওয়া পেলে একটু শান্তি পেত শরীরটা। মার্কিন লেখিকা ও ফোটো-গ্রাফার মার্গারেট বুর্ক-হোয়াইট বোধহয় তাঁর দেখা একটা করুণ দৃশ্য কোনদিনই ভুলতে পারবেন না। তিনি দেখলেন যে একটা অবুঝ শিশু তার মৃত মায়ের অনড় হাতের ওপর আকুলি-বিকুলি করছে। সে যেন কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না কেন তার মায়ের নিথর হাতদুটো তাকে কোলে তুলে নিচ্ছে না।

ঠিক একই রকম মর্মস্পর্শী অভিজ্ঞতা হয়েছিল ভারতীয় সাংবাদিক কুলদীপ সিংয়েরও। কুলদীপ দেখলেন যে তাঁর চলমান জীপ গাড়ির ওপর এক বাচ্চা শিশুকে ছুঁড়ে দিল এক বৃদ্ধ শিখ। সাদা দাড়ির ঢেউ খেলেছে তার মুখে। চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ। কপালে অজস্র বলিরেখা। কিন্তু কি ব্যাপার? কাঁপা কাঁপা গলায় বৃদ্ধ শিখ বললো, 'অন্তত আমার নাতিটা বাঁচুক তার সাধের ভারতবর্ষ দেখার জন্য!' বৃদ্ধের কথা শুনে ধক্ করে উঠেছিল কুলদীপের বুকখানা। জওহরলালের প্রধান সচিব আয়াংগারের দেখা দৃশ্যটাও একই রকম করুণ। আয়াঙ্গার দেখলেন যে সবচেয়ে বড় উদ্বাস্তু মিছিলের পিছনে একটা স্টেশন ওয়াগন চলেছে। গাড়ির মধ্যে আছে একজন ধাত্রী আর দুজন লেফটেন্যান্ট। এরা লক্ষ্য করছে কোথাও কোন সন্তান সম্ভবা মহিলার প্রসববেদনা উঠেছে কি না। সংগে সংগে মহিলাকে গাড়িতে তুলে তার গর্ভমোচনের ব্যবস্থা করছে তারা। তারপর শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিয়ে জননীকে তার সদ্যোজাতকে কোলে নিয়ে আবার পথ চলতে হচ্ছে।

www.pathagar.com

লাহোর থেকে অমৃতসর পর্যন্ত পঁয়তাল্লিশ মাইল লম্বা রাস্তাটা তখন যেন শ্মশানভূমি হয়ে উঠেছে। এক গজ অন্তর পড়ে আছে মানুষের মৃতদেহ। কেউ খুন হয়েছে, কেউ রোগে মরেছে। পচা মড়ার দুর্গন্ধে গা ঘুলিয়ে ওঠে। নাকের ওপর সুগন্ধী লোশন মেশানো রুমাল চেপে ধরে পথ চলতে হচ্ছে ক্যাপ্টেন এ্যাট্‌কীন্‌স্‌কে। মাথার ওপর চক্রাকারে ঘুরছে শকুনের দল। মহাভোজের আয়োজন হয়েছে ওদের। রাস্তার মড়ার ওপর অধিকার সাব্যস্ত করতে কুকুর আর শকুনের মধ্যে শব টানাটানি হচ্ছে। সে এক বীভৎস বিশৃঙ্খল অবস্থা যেন।

এই অবস্থায় মাইলের পর মাইল ধরে পথেপ্রান্তরে ছড়িয়ে থাকা উদ্বাস্তুদের নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেবার কাজটা মানুষকে সত্যই বিমূঢ় করে দেয়। নিরাপত্তা রক্ষিবাহিনীর সামনেও সমস্যাটা তেমনি হতবুদ্ধিকর হয়ে ওঠে। চোরা-গোপ্তা আক্রমণের আশংকা ছিল যখন তখন। যেখান সেখান থেকে তারা তখন ঝাঁপিয়ে পড়ছে নিরস্ত্র অসহায় মানুষের ওপর। অন্যত্র যেমন, এখানেও তেমনি শিখ দুর্বৃত্তদের আক্রমণগুলোই সবচেয়ে নিষ্ঠুর আর বন্য। হয়ত রাস্তার ধারের গম বা আখের খেত থেকে হঠাৎ চীৎকার উঠলো। তারপরই তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো এক অসহায় মুসলমান মিছিলের ওপর এবং ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল একজন ঝিমিয়ে পড়া মুসলমানকে। পরমুহূর্তেই আখের খেতের আড়াল থেকে ভেসে এল সেই আক্রান্ত মানুষটার আর্তস্বর। এইরকমই একটা দুর্ঘটনার উল্লেখ করেছিল লেফ্‌টেন্যান্ট জি.ডি. লাল। এক মুসলমান উদ্বাস্তু মিছিলের সংগে কর্তব্যরত এই সেনাপ্রধানের চোখে দেখা ঘটনাটা খুবই মর্মান্তিক। তখন পাকিস্তান সীমান্ত শহরের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে উদ্বাস্তুরা। আর মাত্র দশ-বারো মাইল দূরত্ব সেখান থেকে। হঠাৎ এক বৃদ্ধ মুসলমানের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে তার আদরের ছাগশিশুটা পাশের আখের খেতের দিকে দৌড় দিল। ভারত থেকে নিয়ে আসা এই শেষ সম্বলটা হাতছাড়া হয়ে যায় দেখে বৃদ্ধও পাগলের মতন ছুটে গেল তার পিছু পিছু। তখনই অতর্কিতে আখের বন থেকে লাফ দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো একজন শিখ যুবক। তারপর তার হাতের খোলা কৃপাণ দিয়ে এক কোপে বৃদ্ধের মাথাটা ধড় থেকে নামিয়ে দিয়েই ছাগলটা কাঁধে তুলে চম্পট দিল।

তখন মাত্র মুষ্টিমেয় দুঃসাহসী কিছু শিখ সেনাবাহিনীর মানুষই অসহায় মুসলমানদের রক্ষা করেছে। স্বজাতিপ্রীতির সস্তা আবেগে আত্মহারা হয়ে তারা অন্তত মানবতাবোধ হারিয়ে ফেলে নি। এইরকম একজন কর্তব্যরত সাহসী ফৌজি হলেন লেফ্‌টেন্যান্ট কর্নেল গুরুবক্‌স্‌ সিং। ফিরোজপুর শহরের বাইরে একটা পুরো উদ্বাস্তু দলের মানুষদের দুর্বৃত্তরা অমানুষিকভাবে কোতল করে। সারা অঞ্চলটায় ছড়ানো আছে মুসলমানের মড়া আর শিয়াল শকুনে টানাটানি করছে তাদের শবদেহগুলো। দৃশ্যটা এমন মর্মান্তিক যে বিমূঢ় হয়ে গেলেন গুরুবকস। প্রায়শ্চিত্ত করাতে তখনই তাঁর অধীনের দুই পলটন সেনা মার্চ করিয়ে আনলেন সেখানে। তাদের দিয়ে মৃতদের উদ্দেশে সামরিক অভিবাদন জানালেন। তারপর সবাইকে উদ্দেশ করে বললেন, 'যারা এ কাজ করেছে তারা শিখ সমাজের কলংক। আমি আশা করবো যে এমন লজ্জার কাজ তোমরা হতে দেবে না। যারা তোমার কাছে শরণার্থী হয়ে এসেছে তাদের রক্ষা না করলে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাবে সমস্ত শিখ সমাজের।

www.pathagar.com

দুই বিপরীতমুখী উদ্বাস্তু মিছিল যখনই মুখোমুখি হয়েছে তখনই বিদ্বেষ আর প্রতিহিংসায় পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়েছে। আবার উল্টো ঘটনাও ঘটেছে। অনাসক্ত নির্বিকার মুখে ছেড়ে আসা ঘরবাড়ি, জোতজমির পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজ দিয়ে অন্য অংশ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের সাহায্যও করেছে। ছোকরা পুলিস অফিসার অশ্বিনীকুমারের চিরকাল মনে থাকবে এইরকম একটা ঘটনা। অমৃতসর থেকে জলন্ধরের মধ্যে হাইওয়ের ওপর মুখোমুখি দেখা হ'ল দুই উদ্বাস্তু মিছিলের। হিন্দুরা চলেছে ভারতের দিকে আর মুসলমানরা চলেছে পাকিস্তানের দিকে। এই পথ দিয়েই একদিন গ্রীক, মোগল আক্রমণকারীরা এই উপ-মহাদেশ অধিকার করতে এসেছিল। আশ্চর্য, দুই মিছিলের যখন মুখোমুখি সাক্ষাৎ হ'ল, তখন কোন বাক্যালাপ হ'ল না। এক বিষণ্ণ স্তব্ধতা যেন গ্রাস করেছে দু দলের হতভাগ্য মানুষদের। ওরা কেউ কথা বললো না, কেউ তাকালোও না। যেন কেউ কাউকে মানুষ বলে গণ্য করে না। তাই এত অবহেলা। বাস্তবিক, অশ্বিনীকুমারের কাছে ব্যাপারটা খুবই অভিনব মনে হয়েছিল সেদিন। শুধু বলদ দিয়ে টানা কাঠের চাকাওলা গাড়ির ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ আর হাজার হাজার বিপন্ন মানুষের ক্লান্ত পায়ের আওয়াজটুকু ছাড়া আর কিছুই কানে শোনেনি সে। তার মনে হয়েছে যেন দুই দলের সকল মানুষের দুর্গতি উপলব্ধি করেই এমন বাক্যহীন হয়ে গেছে সবাই।

তখন পূর্ব বা পশ্চিম দুদিকের মিছিলই জমা হচ্ছে পাঞ্জাবের তিন প্রধান নদী ইরাবতী, শতদ্রু ও বিপাশার তীরে। মানুষের এই মহাসরোবর তখন যেন কানায় কানায় ভরা। নদী পারাপারের সংকীর্ণ সেতুপথ ও বাঁধের ওপর থই থই করছে অপেক্ষারত মানুষ। স্যর সিরিল র‍্যাডক্লিফের সুপারিশ অনুযায়ী এই সংকীর্ণ সেতুপথই দুই পাঞ্জাবের নিষ্ক্রমণ পথ। এই পথ দিয়েই এক কোটি মানুষ দুই অর্ধে পারাপার করছে। সুতরাং এখান থেকেই শুরু হল মানুষের অনিশ্চিত ভাগ্যসন্ধান। এটা যেন তাদের জীবনের এক প্রকাণ্ড সন্ধিক্ষণ। কারও যাত্রা এখানে শেষ হয়েছে, কারও বা শুরু হ'ল। কিন্তু দুদলেরই এই ভাগ্যসন্ধান বড় অনিশ্চিত।

শতদ্রু পেরিয়ে যে ছিন্নমূল মানুষের মিছিল আসছিল তারই জনারণ্যে মিশে এসে পড়েছে এমন একটি হিন্দু যুবক যাকে আমরা চিনি। অবয়বহীন এই কবন্ধ মিছিলে তার আলাদা পরিচয় হয়ত নেই। কিন্তু বড় বড় কালো চোখ, এক মাথা ঘন চুল, মোটা ঠোঁট আর নাকের তলায় এক চিলতে কালো রেখার মতন গোঁফওলা ওই গাঁট্টাগোট্টা বিশবছরের যুবকটি আমাদের অপরিচিত নয়। ওর নাম মদনলাল পাওয়া। এই ছেলেটিই কয়েকদিন আগে পাকিস্তানের এক মফস্বল শহর থেকে তার এক জ্ঞাতি ভাইয়ের বাসে চড়ে ঘর সংসার গুটিয়ে যাত্রা করেছিল অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে। সেদিন অনেক চেষ্টা করেও তার বুড়ো বাবাকে ভিটে ছাড়াতে পারে নি মদনলাল। কারণ দিনটি নাকি হিন্দু পঞ্জিকা মতে শুভ ছিল না।

কিন্ত এত চেষ্টা সত্ত্বেও নিরাপদে ভারতে পৌঁছতে পারেনি মদনলাল। সেতুর পশ্চিম দিকে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লোকেরা তাদের বাস আটক করে এবং জামাকাপড়, আসবাব, সোনাদানা ইত্যাদি কেড়েকুড়ে নেয়। এমনকি শিবঠাকুরের পটখানাও কেড়ে নিয়েছিল ওরা। মদনলাল তখন নিঃস্ব

www.pathagar.com

হয়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ বিপন্ন মানুষের মতন, প্রায় এক জামাকাপড়ে সে যখন তার নিজের দেশে প্রবেশ করতে চলেছে, তখন তার পকেটে এক কানাকড়িরও সম্বল নেই। অবশেষে ব্রিজ পেরিয়ে সে যখন ভারতীয় ভূখণ্ডে পা দিল তখন সে যথার্থই 'রিক্ত'। ওরা তার সর্বস্ব লুট করে তাকে দূর করে দিয়েছে ঘর থেকে। সেদিনই প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠেছিল তার চোখ। ভারতের মাটিতে পা দিয়েই সে তাই প্রতিজ্ঞা করলো যে একজন মুসলমানকেও সে নিষ্কৃতি দেবে না। এক জামাকাপড়ে কপর্দকশূন্যভাবে তাকে ওপারে ফেরত পাঠাবে।

এমনি করেই সেই বিপন্ন ক্ষুব্ধ মুখের মিছিলে সেদিন যোগ হ'ল আর একটা রাগী মুখ। সে মুখটা মদনলালের। তবে এই সব ক'টা মানুষের মুখের আদল একরকম হলেও একটু কেন ইতরবিশেষ আছে কোথাও। হয়ত সকলের দুর্দশাই একরকম। তবুও ওই নামগোত্রহীন মানুষের যে ঢল গড়িয়ে এসেছে শতদ্রু নদীর ব্রিজ পেরিয়ে, সেই স্রোতে হারিয়ে যায় নি মদনলালের মুখখানা। সে যেন স্পষ্টতই আলাদা। অন্তত তার প্রতিশোধপরায়ণতার জন্যেও সে বিশিষ্ট হয়ে আছে ওই মুখের মিছিলে। যে দৈব নির্দেশে হিন্দুর অদৃষ্ট আলাদা করে লেখা হয়, সেই ভাগ্যদেবতাই তাকে এমনভাবে পৃথক করে দিয়েছে। তার ভূমিষ্ঠ হবার সময়ই ভাগ্যদেবতা তাকে আলাদা করে দিয়েছিল জনারণ্য থেকে। সদ্যোজাত শিশুটি দেখেই নাকি জ্যোতিষী সেদিন ভবিষ্যদবাণী করেছিলেন। বলেছিলেন, 'এ ছেলে সাধারণ ছেলে নয়। একদিন সারা দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়বে এর নাম।'

মদনলালের বাবার স্পষ্ট মনে আছে এই ঘটনাটা। তাঁর মুখ থেকেই শোনা যাক এই কাহিনী:

'সেটা ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাস। আমার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা পিওনকে আমি তখনও দেখি নি। আমার গায়ে হাত দিয়ে টেলিগ্রামখানা ধরিয়ে দিল লোকটা। বাবা পাঠিয়েছেন এই টেলিগ্রামটা। আগের রাতে আমার একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। খবরটা দেখেই আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠলাম। প্রথমেই পিওনকে খুশী হয়ে বকশিশ করলাম। সহকর্মীদের মিষ্টি খাওয়ালাম। তারপর সে রাত্রেই বাড়ির দিকে রওনা হলাম। তখন আমার বয়স মাত্র উনিশ।

'বাড়ি পেঁছে বাবাকে প্রণাম করতেই আমায় জড়িয়ে ধরলেন তিনি। সংসারে নতুন অতিথি এসেছে বলে সবাই খুশী। আত্মজকে কোলে নিয়ে আমার মনে তখন নানা রঙিন কল্পনার জাল বোনা শুরু হয়েছে। ওকে লেখাপড়া শেখাব। ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার করবো যাতে সে বংশের মুখ উজ্জ্বল করে। তারপর শুভদিন দেখে ঘরে নিয়ে এলাম এক পণ্ডিত জ্যোতিষীকে। শিশুর জন্মপত্রিকা তৈরি করলেন তিনি। তারপর তার শুভাশুভ বিচার করে নির্ণয় দিয়ে বললেন যে, শিশুর নামকরণ হ'ক 'ম' আদ্যক্ষর দিয়ে। আমি তার নাম রাখলাম 'মদনলাল'। এরপর শিশুর রাশিচক্র গণনা করে জ্যোতিষী বললেন, 'এ ছেলের দেশজোড়া নাম হবে'।

'জ্যোতিষীর কথা শুনে সেদিন আমার ভারী আনন্দ হয়েছিল। পুত্রগর্বে ভরে গিয়েছিল আমার বুক। কিন্তু শিশু একটু বড় হতেই যেন শুরু হ'ল গ্রহদোষ। তার জন্মের চল্লিশ দিনের মধ্যেই শ্লেষ্মাধিক্যে গত হলেন আমার গৃহিণী। তারপর শুরু হ'ল তার দুরন্তপনা। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই নষ্টামিতে পরিণত হ'ল তার সেই দুরন্তপনা। বালকের দৌরাত্ম্যে সবাই তখন অস্থির।

www.pathagar.com

ঘরে বাইরে সর্বত্রই সে হ'য়ে উঠলো এক উপদ্রব বিশেষ। সবাই ত্রস্ত তার দুর্বিনীত উদ্ধত স্বভাবে। পরিবারের, সমাজের কোন নিয়ম নিষেধই সে মানতো না। তারপর একদিন সে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল। সেটা ১৯৪৫ সাল। সারা পাঞ্জাব জুড়ে যত আত্মীয়স্বজন আছে সব জায়গায় তার খোঁজ করলাম। কিন্তু মদনলালের কোন হদিসই দিতে পারলো না কেউ। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে হঠাৎ একখানা চিঠি পেলাম তার। চিঠিখানা এসেছে বম্বে থেকে। চিঠি পড়ে জানা গেল যে ভারতীয় নৌবিভাগে নাম লেখাতে সে বম্বে গেছে। অবশ্য দিন-কয়েক পরেই সে ফিরে এল। কিন্তু তখন সে অন্য মানুষ। দেশে ফিরে আসার কয়েকদিনের মধ্যেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দলে নাম লিখিয়ে রাজনীতির কাজে সে নেমে পড়লো। ধীরে ধীরে অত্যন্ত মুসলমানবিদ্বেষী হয়ে উঠলো মদনলাল। তার ভাবগতিক দেখে তখন রীতিমত দুশ্চিন্তা শুরু হয়ে গেছে আমার। দুর্বিনীত ছেলেকে নিয়ে কি করবো কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। তখন ১৯৪৭ এর জুলাই মাস। স্থির করলাম দিল্লি গিয়ে আমার বন্ধুর শরণাপন্ন হব। বন্ধুর নাম সর্দার ত্রিলোক সিং। পণ্ডিত নেহরুর একজন ব্যক্তি-গত সচিবের কাজ করে ত্রিলোক। তাই আশা হ'ল ছেলের একটা গতি সে করে দিতে পারবে। তা, আমার কথা রেখেছিল ত্রিলোক। সঙ্গদোষ থেকে ছেলেকে মুক্তি দিতে সে আশাতীত সাহায্য করলো। দিল্লির পুলিস বিভাগে এ.এস.আই. পদের চাকরির জন্যে আমার নামে একটা সুপারিশপত্র লিখে দিল ত্রিলোক। তার এই বন্ধুকৃত্যে সেদিন আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম।'

*   *   *

ভারতের মাটিতে পা দিয়েই আত্মীয়দের কাছে বাবার খোঁজ পেল মদনলাল। তিনি নাকি দারুণ আহত অবস্থায় ফিরোজপুরের সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসা-ধীন হয়েছেন। খবর পেয়ে কালবিলম্ব করলো না মদনলাল। সোজা এসে উপস্থিত হ'ল ফিরোজপুর শহরের সামরিক হাসপাতালে। হাসপাতালের বিশাল ওয়ার্ডে ঢুকতেই ভক্ করে তার নাকে লাগলো রক্ত আর য়্যান্টিসেপটিক ওষুধের চড়া গন্ধ। বাবার আহত মুখখানা দেখতে পেল সে। তার মনে হ'ল যেন সারা ভারতের যন্ত্রণাক্লিষ্ট চেহারাটা ফুটে উঠেছে বাবার মুখে। স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইল মদনলাল। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা বাবার সারা মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তিরতির করে কাঁপছে তাঁর শরীরটা।

ছেলেকে দেখেও যেন অনেকখানি সোয়াস্তি পেলেন বৃদ্ধ। আশ্চর্যের ব্যাপার যে, যা তিনি চাইছিলেন তা তাঁর হাতে এসে পৌঁছেছে তখন। পাঞ্জাবের সাত-সতোরো হাঙ্গামা, উপদ্রবের বেড়া পেরিয়েই সুপারিশপত্রটা অক্ষতভাবে তিনি হাতে পেয়েছেন। সুতরাং ছেলের হাতে চিঠিখানা তুলে দিয়ে ভারী নিশ্চিন্ত হলেন বৃদ্ধ। তারপর কাঁপা কাঁপা গলায় ছেলের হাতটি ধরে বললেন, 'বাবা! এবার দিল্লি গিয়ে তুমি চাকরিটা নাও। তারপর নতুন করে জীবন শুরু করো।'

চিঠিখানা হাতে নিল মদনলাল। কিন্তু তখনই সে মনে মনে তার কর্তব্য স্থির করে নিয়েছে। এমন ছাপোষা সরকারী চাকরি নিয়ে সে নিজেকে নষ্ট করবে না। জ্যোতিষীর কথা যদি সত্যি হয় তাহলে এমন অবজ্ঞার পুলিসের চাকরি করার জন্য সে জন্মায় নি। সে একজন কেউকেটা হতে চায় যার নাম এক ডাকে সারা ভারতের মানুষ জানবে। কিন্তু বৃদ্ধের কাছে সে কথা ভাঙলো না

www.pathagar.com

মদনলাল। হাসপাতালের চত্বর থেকে সে যখন বাইরে এসে দাঁড়াল তখনও তার চোখের ওপর বাবার ক্ষতবিক্ষত চেহারাটা ভাসছে। হঠাৎ একটা বিপুল আবেগের তাড়না এল তার মনে। ভারতবর্ষের হাজার হাজার ছিন্নমূল মানুষের মন যে আবেগের তাড়নায় জর্জরিত হয়ে আছে তাতেই ক্লিষ্ট হয়ে গেল তার মন। এর সঙ্গে সরকারি চাকরির কোন সম্বন্ধ নেই। মন শুধু একটাই কথা বলছে, 'আমি প্রতিশোধ নেবই।'

শেষ পর্যন্ত ফিরোজ খাঁ নুনের রূপসী বিদেশী স্ত্রীর প্রাণ রক্ষা করলো জুতোপালিশের একটা ছোট্ট গোল টিন ! এই জুতো পালিশের কালি মুখে মেখেই সে যাত্রা বেঁচে যায় ভিকি নুন। ব্যাপারটা শুধু রগড়ের নয়, রীতিমত উত্তেজনা-পূর্ণও।

দুর্যোগের রাতে মাণ্ডির হিন্দুরাজার প্রাসাদে পালিয়ে এলেও এই নিরাপদ বাসস্থান খুব বেশিদিন ভিকির কপালে সইলো না। দু-একদিনের মধ্যেই কয়েকজন শিখ যুবক রাজাকে শাসিয়ে গেল যে ভিকিকে তাদের হাতে ছেড়ে না দিলে রাজার ছেলেমেয়েদের গুমখুন করা হবে। রাজা প্রমাদ গণলেন। কি করবেন তিনি এখন ? গৌতম সেহ্গল নামে একজন হিন্দু সিমেন্ট ব্যাপারীকে ফিরোজ খাঁ পাঠিয়েছেন ভিকির উদ্ধার কাজে রাজাকে সাহায্য করতে। তার সঙ্গে পরামর্শ করলেন মাণ্ডির হিন্দু রাজা। গৌতম পরামর্শ দিল যে জলে পটাশ পারম্যাঙ্গানেট গুলে ভিকিকে স্নান করানো হ'ক। তারপর বেশ করে তার মুখে জুতোর কালি মাখিয়ে দেওয়া হ'ক। সেই পরামর্শই গ্রাহ্য হ'ল। ভিকি নুনকে তখন আর শ্বেতাঙ্গিনী বলে চেনা যায় না। এমনকি সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর, নাকে নোলক আর শাড়ি পরিয়ে দিব্যি হিন্দু করে দেওয়া হ'ল তাকে। তারপর সূর্যাস্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে রাজার প্রাসাদ থেকে তাঁর রোল্‌স্‌রয়েস গাড়িখানা আপাদমস্তক পর্দানশীন হয়ে বেরিয়ে গেল। আসলে গাড়িখানা ছিল ফাঁকা। লোকের চোখে ধোঁকা দিতেই গাড়িটাকে এইভাবে বার করানো হয়েছিল। এর খানিক পরেই তার নিজস্ব ডজ গাড়ির মধ্যে হিন্দুবেশী ভিকি নুনকে সঙ্গে নিয়ে বেরোল গৌতম। প্রাসাদ থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যেতেই হাঁফ ছাড়লো গৌতম। যাক্, শেষপর্যন্ত একটা ফাঁড়া থেকে এবার মুক্ত হ'ল সে। কিন্তু ভাল কাজে অনেক বিঘ্ন। কিছুদূর যাবার পরই গাড়ি থামাতে বাধ্য হ'ল গৌতম। তখন মানসিক উদ্বেগ কেটে গেছে ভিকির। অনেক স্বচ্ছন্দ সে। তাই মূত্রত্যাগের দরকার হয়েছে তার। সেই-জন্যেই গাড়ি থামিয়েছে গৌতম। ঘুটঘুটে কালো রাত। একনাগাড়ে বৃষ্টি পড়ে চলেছে। হঠাৎ একটা অঘটন ঘটে গেল তখন। অন্ধকারে অনভ্যস্ত শাড়ির ভাঁজের মধ্যে লুকিয়ে রাখা কালির কৌটাখানা ভিকির কোল থেকে টুক করে মাটিতে পড়লো। তারপর গড়াতে গড়াতে পাশের খাদের মধ্যে হারিয়ে গেল। একে অন্ধকার রাত, তায় ঝমঝম বৃষ্টি। ভিকি যেন ভেঙে পড়লো হতাশায়। কি করবে সে ? কোথায় খুঁজবে ওই কালির কৌটাটা ? ওই কালির কৌটাটাই তার একমাত্র ভরসা। এর জোরেই তার আসল পরিচয় গোপন রেখে এতটা পথ সে নিরাপদে আসতে পেরেছে। সুতরাং মরিয়া হয়ে উঠলো ভিকি। গাড়ি থেকে নেমে পাগলের মতন সে টিনের কৌটার সন্ধান করতে লাগলো। বৃষ্টির তোড়ে

www.pathagar.com

তখন ছদ্মবেশ অন্তর্ধান করেছে। সারা মুখটা হয় জেব্রার গায়ের মতন সাদাকালো দাগ কিংবা মুখের রঙ ধুয়ে সাদা-চামড়া বেরিয়ে পড়েছে। তবুও খোঁজার বিরাম নেই। অন্ধকারে সে হাতড়াতে লাগলো ছোট ছোট পাথরের মধ্যে। অবশেষে হারিয়ে যাওয়া বস্তুটা তার হাতে ঠেকলো। আনন্দে চিৎকার করে উঠল ভিকি। তারপর দুহাতে সেই মহা মূল্যবান বস্তুটা আঁকড়ে ধরে গাড়িতে এসে উঠলো। গাড়িতে ওঠার পর গৌতম তার সারা মুখে আর এক পরত কালো রঙ বুলিয়ে দিল।

ছদ্মরূপ ধারণের প্রয়োজনটা বোঝা গেল খানিক পরেই। গুরুদাসপুরের খানিক আগেই রোডব্লক ফেলে কিছু শিখ দুর্বৃত্ত ওদের গাড়িটা আটক করে দিয়েছে তখন। ভিকি নুন সভয়ে দেখলো যে তাদের গাড়িখানা ঘিরে ফেলেছে ওরা। ভাগ্যক্রমে একজন চেনা মুখ দেখা গেল দলে। গৌতম সেহ্গলের চেনা লোকটা সিমেন্টের কারবারী। তাকে দেখেই মনে মনে আশ্বস্ত হ'ল গৌতম। তাকেই ডেকে জিজ্ঞেস করলো সে। 'কি ব্যাপার হে?'

লোকটা বললো, 'শোন নি? ফিরোজ খাঁ নুনের মেম বউ মান্ডির মহারাজার প্রাসাদ থেকে পালিয়েছে। তাকেই খুঁজছি সবাই।'

মনে মনে প্রমাদ গনলেও মুখে সে ভাব দেখাল না গৌতম। বরং ওদের আশ্বস্ত করতে সহজ ভাবে বললো, 'ও হ্যাঁ! আসতে আসতে দেখলুম বটে রাজার রোল্স্-রয়েসখানা। তা সেটা ত বিশ মাইল দূরে ফেলে এসেছি। আমার খুব তাড়া। এখুনি অমৃতসর পেঁছতে হবে। সংগে রয়েছেন আমার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী।' গৌতম সেহ্গেলের কথায় সেই চেনা লোকটা গাড়ির ভিতর উঁকি দিল। গাড়ির মধ্যে জড়সড় হয়ে বসে আছে ভিকি নুন। তার ভয়, এই বুঝি তাকে হিন্দিতে কিছু জিজ্ঞেস করে ওরা। লোকটা তার দিকে কেমন বিচিত্র চোখে তাকিয়ে আছে। রীতিমত দমবন্ধ করা অবস্থা তার। শেষ পর্যন্ত মিটলো তদারকির পালা। লোকটা জানলা থেকে সরে এসে রোডব্লকটা তুলে নিতে বললো এবং ওদের গাড়িটাও ছেড়ে দিল। গাড়ি তখন অনেকখানি এগিয়ে গেছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের কাছাকাছি পেঁছে গেছে তারা। গাড়ির মধ্যে খুবই নিশ্চিন্ত বোধ করছিল ভিকি। হেলান দিয়ে বসে আছে সে। কোলের ওপর পড়ে আছে জুতো পালিশের কৌটোটা। আঙুলের ডগা দিয়ে টিনের কৌটোর গায়ে ঠুনঠান আওয়াজ করতে করতে গৌতম সেহ্গেলের দিকে চেয়ে ভিকি বললো, 'জানো গৌতম! আমার স্বামী যত দামী হীরে জহরতই কিনে দিন না কেন, এই টিনের কৌটোর দাম আমার কাছে অমূল্য।'

ভিকি নুনের যে অভিজ্ঞতা হ'ল তা খুবই অস্বাভাবিক। তবে মেমসাহেব বলে যে সে ওদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছিল তা নয়। একজন নামকরা মুসলমানের স্ত্রী হওয়ায় শিখেদের নিশানা হয়েছিল সে। আসলে সেই সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের ভয়ংকর দাংগায় ইংরেজের গায়ে আঁচড়টুকু লাগে নি। তারা দিব্যি নাচগান করে এবং খেয়েদেয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করেছে। বোমা বারুদের বিস্ফোরণে যখন সারা পাঞ্জাবে আগুন জ্বলেছে তখন সেই খাঁ-খাঁ মরুভূমিতে মরূদ্যানের মতন বিরাজ করেছে লাহোরের ফ্যালেটি হোটেল। সেখানে নাচগান হয়েছে, হাত ধরাধরি করে চাঁদের আলোয় ঘুরে বেড়িয়েছে পুরুষ ও মহিলারা। হয়ত হোটেলের

www.pathagar.com

পাশেই কোন হিন্দুপাড়া পুড়ে খাক হয়ে গেল। কিন্তু তাতে কি ? সাহেব মেমদের গায়ে আগুনের ছেঁকা লাগলো না মোটেও।

তবুও যেন সেদিনের দাংগাজর্জরিত পাঞ্জাবের মাটিতে কোন শিখ, হিন্দু বা মুসলমান নয়, ইংরেজের আচরণটাই সবচেয়ে বেখাপ্পা লাগে। তাই দুটো বাস বোঝাই করে সব আগে তাদেরই সিমলার স্বর্গ থেকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়। আসলে সমতলের দাংগার আগুনের আঁচ সিমলার গায়ে না লাগলেও তাদের নিরাপত্তার জন্য কর্তৃপক্ষের মাথাব্যথার যেন অন্ত ছিল না। মনোরম কটেজের মধ্যে দিব্য আরামে দিন কাটছিল এই সব ব্রিটিশরাজের প্রতিভূদের। কটেজের নামগুলো যেমন রোমান্টিক তেমনি বাহারি তাদের অংগসজ্জা। 'ট্রেল্স্ এন্ড', 'সেফ্ হাভেন', ইত্যাদি। কটেজের বাইরে শোভা পাচ্ছে লাল, হলুদ গোলাপের কুঞ্জ। এদের অনেকেই জন্মেছে এই দেশের মাটিতে। এই সিমলাই তাদের লীলা-ভূমি। তাই অনেকেই থেকে যেতে চেয়েছিল এই দেশে। ব্রিটিশরাজের অতি অনুগত এইসব সেবককুলের অনেকেই প্রাক্তন সেনানায়ক, জজ সাহেব বা আই.সি.এস.। একদিন এরাই ছিল লক্ষ লক্ষ ভারতীয়দের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাই সিমলা বড় আপন এদের কাছে।

কিন্তু উপায় নেই। দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি। দিল্লি থেকে বাস এসেছে তাদের নিয়ে যাবার জন্য। নিরাপদে দিল্লি পেঁাছে দেবার দায়িত্ব নিয়েছে কর্তৃপক্ষ, কারণ সিমলাও নাকি মোটেই নিরাপদ নয়। সমতলের আগুনের হলকা এখানেও এসে পড়েছে। তাই এই তড়িঘড়ি ব্যবস্থা। একঘণ্টার মধ্যেই সংসার গুছিয়ে বাসে উঠতে হবে তাদের। এরই মধ্যে পেঁটরা গুছিয়ে, বাংলো বন্ধ করে বাসে ওঠার নির্দেশ পেল গৃহিণীরা।

বাসযাত্রীদের সবাই বুড়োবুড়ী। পঁয়ষট্টির ওপর বয়স তাদের। এই দলে চলেছেন মাউন্টব্যাটেনের প্রেস এ্যাটাশের গিন্নী ফে ক্যাম্পবেল জনসনও। সিমলা থেকে দিল্লি যেতে প্রায় প্রতি দুঘণ্টা অন্তর বাস দাঁড় করানো হচ্ছে। বৃদ্ধ যাত্রীদের প্রায় সবারই এক সমস্যা। মূত্রাশয় দুর্বল হয়ে যাওয়ায় ঘন ঘন মূত্রত্যাগের দরকার হচ্ছে ওদের। উপভোগ্য দৃশ্যটা দেখতে দেখতে মিসেস জনসনের মনে হ'ল যে এককালের দ'দে আমলাদের এ কি করুণ অবস্থা ! গোর্খা প্রহরীদের ঠাণ্ডা, কঠিন নির্লিপ্ত চাহনির সামনেই রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে এই অপকর্মটি করতে হচ্ছে তাদের। দেখতে দেখতে একটা মজার চিন্তা উদয় হ'ল তাঁর মনে। মিসেস জনসন নিজের মনেই বলে উঠলেন, 'ও হরি, এ দেখি সাদা চামড়ার মানুষটারও হাল ছাড়া অবস্থা !'

*   *   *

পেশোয়ারের তরুণ ব্রিগেড্ ইনটেলিজেন্স অফিসার ক্যাপ্টেন এড্ওয়ার্ড বের্-এর কাছে যে কোন রোববারের সকালই ভারী মধুর, রোমান্টিক। এই অস্পর্শ সকালটায় লুকিয়ে থাকে যেন কত কিছুর প্রত্যাশা। বলতে কি, দীর্ঘদিন ধরেই তরুণ ব্রিটিশ অফিসারদের চোখে রোববারের সকালগুলো এইরকমই মোহময়। কত প্রতিশ্রুতির স্বপ্নজালই যেন জড়িয়ে থাকে এইরকম ঝকঝকে সকালগুলোয়। পেশোয়ার হ'ল পাঠান উপজাতিদের শহর এবং এই শহরেই একদিন প্রায় লক্ষাধিক উদ্ধত পাঠানের মোকাবিলা করতে হয়েছিল মাউন্টব্যাটেনকে। তা সে যাই হ'ক। রোববারের সেই সকালটাকে উপভোগ্য করতে মনে মনে তৈরি

www.pathagar.com

হচ্ছিল ক্যাপ্টেন এড্‌ওয়ার্ড বের্‌। ইতিমধ্যে বাংলোর পরিপাটী লন্‌-এ ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে গেছে তার খানসামা। পাকা পেঁপে, ডিম সেদ্ধ আর কফি। খাসা সকালটা কেমন ভাবে কাটাবে মনে মনে তা গুছিয়ে নিয়েছে ক্যাপ্টেন বের্‌। প্রাতরাশ সেরেই সে ক্লাবে যাবে। স্কোয়াশ খেলবে। তারপর সাঁতার কেটে, চান করে বাংলোয় ফিরে জমিয়ে লাঞ্চ সারবে।

ক্যাপ্টেন বের্‌ সম্পূর্ণ দুশ্চিন্তামুক্ত। ভারত সাম্রাজ্যের এই পাহাড়ি প্রবেশ শহরের গায়ে দাঙ্গার এতটুকুও দাগ পড়ে নি। হয়ত পড়বেও না। পাঠান উপজাতিদের শহর হলেও ক্যাপ্টেন বের্‌ ভালবেসে ফেলেছে এই শহরটাকে। আর পাঁচটা তরুণ ব্রিটিশ অফিসারদের মতন সেও একটা দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। স্বাধীনতার পরেও সে এখানেই থেকে যাবে। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অধীনেই সে ফৌজি হয়ে থাকবে পেশোয়ারে। তখনও পর্যন্ত শান্ত হয়ে আছে পেশোয়ার। সে ভেবেছিল হয়ত এইরকমই শান্ত হয়ে থাকবে পেশোয়ার। কিন্তু যা ভাবা যায় তা ঘটে না। অন্তত এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমটি দেখা গেল। প্রাতরাশ টেবিলে বসেই তা বুঝতে পারলো ক্যাপ্টেন বের্‌। মুখে একটুকরো পাকা পেঁপে তুলেছে কি তোলে নি, ঝনঝন শব্দে টেলিফোন বেজে উঠলো।

টেলিফোনের আওয়াজ শুনেই বোঝা যায় যে গম্ভীর একটা কিছু ঘটেছে। কিন্তু সাতসকালে কী এমন ঘটতে পারে ? টেলিফোন ধরতেই ওপার থেকে বিব্রত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ক্যাপ্টেন বের্‌। আর্মি হেড্‌কোয়ার্টার্স থেকে একজন টেলিফোন করছে, 'ভীষণ কাণ্ড হয়েছে। আমাদের ব্যাটালিয়নের সেনারা নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করে দিয়েছে।'

ক্যাপ্টেন বের্‌ স্তম্ভিত। আরও হতবাক হ'ল যখন পুরো ঘটনাটা শুনলো। খুবই সাদামাটা ঘটনা। আর তাতেই ধুন্ধুমার বেধে গেছে সারা ব্যাটালিয়নে। ক্যাপ্টেন বের্‌ যখন প্রাতরাশের জন্য তৈরি হচ্ছিল তখনই এই ঘটনাটা ঘটে। ব্যাটালিয়নের অন্তর্গত শিখ ইউনিটের একজন শিখ সৈন্য ছাউনিতে বসে বন্দুক সাফ করছিল। এই শিখ ইউনিটটি তখনও ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ফিরে (রিপ্যাট্রিয়েট) যায় নি। বন্দুক সাফ করার সময় হঠাৎ এক রাউন্ড গুলি ছুটে গেল অসাবধানী শিখ সৈন্যর হাত থেকে। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে ! কারণ, আচমকা ছুটে যাওয়া রাইফেলের গুলি সোজা এসে লাগলো দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের ক্যাম্বিসের গায়ে। মুসলমান সৈন্যদের নিয়ে ট্রাকটা তখন সবে এসে দাঁড়িয়েছে। ব্যস ! আর যায় কোথায় ! ট্রাকভর্তি মুসলমান সৈন্যরা নিঃসন্দেহ হ'ল যে তাদের লক্ষ্য করেই গুলি ছোঁড়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ট্রাক থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লো তারা। তারপর ইউনিটের শিখ সেনাদের উদ্দেশে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুঁড়তে লাগলো।

ঘটনার বিবরণ শুনে একটা মুহূর্তও দেরি করলো না ক্যাপ্টেন বের্‌। পোশাক বদলেই জীপ নিয়ে ছুটলো ব্রিগেড কম্যান্ডার ব্রিগ্যাডীয়ার জি.আর. মরিসের কাছে। সাদা শার্ট আর খাটো প্যান্ট (শর্ট) পরে মরিস তখন প্রাতরাশের টেবিলে বসেছেন। প্রাতরাশ সেরেই টেনিস খেলতে যাবেন। আতঙ্কিত ক্যাপ্টেনের মুখ থেকে সব বৃত্তান্ত শুনলেন তিনি। তারপর কফিটুকু শেষ করে ব্রিগ্যাডীয়ারের টুপিখানা মাথায় পরে জীপ গাড়িতে চড়ে বসলেন সেই প্রাতরাশের পোশাকেই। দুজনে যখন ক্যান্টন্‌মেণ্টে এসে পৌঁছলেন, তখন সেখানে রীতিমত যুদ্ধ চলছে।

www.pathagar.com

প্যারেডের মাঠের একদিকে মুসলমান ফৌজ, আর একদিকে শিখ ফৌজ। পুরো ব্যাপারটা এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দেখলেন ব্রিগ্যাডীয়ার মরিস। তারপর জীপ গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে উইন্ডস্ক্রীনটা দুহাত দিয়ে ধরে আদেশ করলেন, 'প্যারেড গ্রাউন্ডের মধ্যিখানে নিয়ে চল জীপ।'

হুকুম শুনে হতভম্ব হয়ে গেলে ক্যাপ্টেন বেরু। মানুষটা কি উন্মাদ হয়ে গেলেন? টুপিটা ছাড়া মরিসের সারা শরীরে ফৌজি পোশাকের চিহ্নমাত্র নেই। এমনকি আত্মরক্ষার জন্য একটা বন্দুকও সংগে নেই ওঁর। এইরকম নিরস্ত্র অবস্থায় ওই গুলিবৃষ্টির মধ্যে দাঁড়ানো দুঃসাহস ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু মরিস অকুতো-ভয়। প্যারেড গ্রাউন্ডের মাঝামাঝি পেঁাছেই দুই বিবদমান গোষ্ঠীর দিকে হাত তুলে চীৎকার করে বললেন, 'সীজ্ ফায়ার!' হুকুম শুনে দুই দলই হাত নামিয়ে নিল। থেমে গেল গুলিবৃষ্টি। ক্যাপ্টেন বেরু অবাক হয়ে গেল এই কান্ড দেখে। তার মনে হ'ল ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই জাদুর টানের কাছে দুদলের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষও হার মেনে গেল।

কিন্তু অত অনায়াসে রেহাই পেল না পেশোয়ার। গুজবের বিষ তখন সারা শহরে ছড়িয়ে গেছে। সবাই নাকি শুনেছে যে শিখ সেনাদের হাতে কয়েক শত মুসলমান সৈন্য 'কত্ল্' হয়েছে। বলতে গেলে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের সেই পাঞ্জাবের দাঙ্গায় গুজবও একটা সফল উপাদান হয়ে উঠেছিল খুনের। তাই যত মানুষ সেদিন ছুরি, ছোরা আর বন্দুকের গুলিতে মরেছে তার চেয়ে অনেক বেশি মরেছে মারাত্মক গুজবের শিকার হয়ে। সুতরাং সেনাবাহিনীতে দাঙ্গা থামাতে পারলেও, ব্রিগ্যাডীয়ার মরিস অসহায় হয়ে উঠলেন যখন পাহাড় উপত্যকা ঝেঁটিয়ে উপজাতিরা পেশোয়ার শহরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ঠিক যেমনভাবে মাউন্ট-ব্যাটেনের সভায় তারা প্রতিবাদ জানাতে জড়ো হয়েছিল, তেমনিভাবেই বাস, ট্রাক বা ঘোড়ায় চড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পাহাড় কাঁপিয়ে সমতলের শহর পেশোয়ারে জমায়েত হ'ল সবাই। তবে এবার শুধু প্রতিবাদ জানাতে এল না তারা। তারা এল নির্বিচারে হত্যা করতে এবং বিনা বাধায় এই কুকর্মটি সম্পন্ন করলো কোন আত্ম-গ্লানি না রেখেই।

এক হপ্তারও কম সময়ে অন্তত দশহাজার মানুষ 'কত্ল্' হ'ল পাহাড়ি উপজাতিদের হাতে। হায় ভবিতব্য! কে জানতো যে একজন শিখ সেনার হাত থেকে দৈবাৎ ছুটে যাওয়া এক রাউন্ড গুলি এতবড় একটা গণহত্যার কারণ হয়ে দাঁড়াবে! সারা সীমান্ত প্রদেশটাই তখন আগুনের তাতে টগবগ করে ফুটছে। একটা থেকে ছড়িয়ে পড়ছে আর একটা হত্যাকান্ড। অচিরেই আরও একদল মানুষ নতুন ইহুদি হয়ে ভারত সীমান্তের দিকে পাড়ি দিল। এত তুচ্ছ একটা ঘটনা যে এমনভাবে মানুষের এই আদিম প্রবৃত্তি উসকে দিতে পারে কে জানতো! এই ঘটনাটাই বুঝিয়ে দিল যে কেমন অগ্নিগর্ভ হয়ে আছে বোম্বাই, করাচি, লক্ষ্ণৌ, হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর বা বাংলাদেশ। ওপর ওপর একটা শান্তভাব বজায় থাকলেও ঠিক নিম্নতল দিয়েই বহতা হয়েছে হিংসার তরল স্রোত। যেন ওত পেতে আছে কখন পেশোয়ারের মতন একটা গুলি ছোটার ঘটনা ঘটবে। তারপরই বন্য বিদ্বেষ দামাল হয়ে আছড়ে পড়বে সারা দেশে।

www.pathagar.com

দিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭

অনশনের ধকল তখনও ভাল করে কাটে নি। গান্ধীজী তাই বেশ দুর্বল। সেই অবস্থাতেই কোনরকমে দিল্লি এসে পৌঁছলেন ৯ তারিখে। এটাই তাঁর শেষবার দিল্লি আসা। এখান থেকে আর কোথাও যান নি সেবার। তখন শরীরের অবস্থাও খুব কাহিল। অচ্ছুত ভাংগী কলোনিতে আতিথ্য নেবার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া ওই অঞ্চলটা তখন পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দু শরণার্থীদের ভিড়ে থিকথিক করছে। হতাশা আর ক্ষোভে মানুষগুলো টানটানভাবে এমন উত্তেজিত হয়ে আছে যে, গান্ধীজীর চেহারাটাও সইতে পারবে না। একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড করে বসবে। সংগত কারণেই তাই সরদার প্যাটেল চিন্তিত। কোথায় রাখা হবে তাঁকে ? তাঁর ইচ্ছে যে ৫ নম্বর অল্‌বুকার্ক রোডের ওই নির্জন ভবনেই গান্ধীজী আতিথ্য নিন। জায়গাটা নির্জন ও শান্ত। এখানে থাকতে গান্ধীজীর ভাল লাগবে।

অবশ্য ভাল না লাগার কথাও নয়। উঁচু পাঁচিল ঘেরা এই অতিথিভবন তো এক বিলাসভবন! গান্ধীজীও থ হয়ে গেছেন এর বিলাসবৈভব দেখে। ভবনের চারপাশে ছোট করে ছাঁটা সবুজ ঘাসের লন। সামনে গোলাপের বাগান। সারা ভবনটি সাদা মার্বেল পাথর দিয়ে মোড়া। সেগুন কাঠের তৈরি দরজাজানলার পালিশ চকচকে রাখতে সর্বক্ষণ এক বাহিনী চাকর-নফর সদাব্যস্ত হয়ে আছে। বিলাসবহুল এই বিড়লাভবনের ঠিক উল্টোদিকেই সমাজ দর্পণে প্রতিবিম্বিত এক অপরিসীম দারিদ্র্য ভরা ধাঙড় ঝুপড়ি। যখনই দিল্লি এসেছেন এখানেই মাথা গুঁজে থেকেছেন গান্ধীজী। অথচ এবার যেন এই ধাঙড় কলোনি অস্পৃশ্য হয়ে গেছে তাঁর কাছে। বস্তুত গান্ধীজীর জীবনের এই জটিলতা এমন এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য যা সহজে উন্মোচিত হয় না। যে মানুষটি চিরকাল রেলের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় যাতায়াত করেছেন, যিনি আপন সম্পদ-ঐশ্বর্য স্বেচ্ছায় ছেড়ে এসেছেন, শুধু নেহরু ও প্যাটেলকে খাতির করে কেন তিনি কোটিপতি ধনীর বিলাসভবনে এসে আশ্রয় নিলেন ? গান্ধীজীর চরিত্রের এই আপাত বিরোধিতা এক আশ্চর্য অসংগতি।

ভারতের এই পহেলা শ্রেণীর শিল্পপতি পরিবারের মুখ্য কর্তার নাম জি.ডি. অর্থাৎ ঘনশ্যামদাস বিড়লা। এদেশে যে প্রধান দুটি শিল্পপতি পরিবার আছেন, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন বিড়লা পরিবার। এই ধনকুবের পরিবারটির শিল্প-দ্যোগের পরিধি বেশ ব্যাপক। এদের উদ্যোগ ছড়িয়ে আছে অনেকগুলি কারবারের মধ্যে। সুতিবস্ত্রের কারখানা, আমানত, রবার কারখানা, যন্ত্রাংশ নির্মাণ কারখানা, জীবনবীমা ইত্যাদি। বিড়লাদের কাপড় কলেই এদেশের প্রথম শ্রমিক ধর্মঘট সংগঠন করেছিলেন গান্ধীজী। তবে সে নিয়ে কোন মনোমালিন্য হয় নি দুজনের। ব্যক্তিগতভাবে ঘনশ্যামদাস বিড়লা প্রথম থেকেই গান্ধীজীর ভক্ত এবং অনুগত। শুধু তাই নয়, কংগ্রেস দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক রূপে দলের আর্থিক সংগতিরও প্রধান অবলম্বন এই মানুষটি। এখন তিনি তাঁর দিল্লির এই প্রাসাদ ভবনের একটা অংশ গান্ধীজীর ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। বড় বড় চার-খানা ঘর আছে তাঁর ব্যবহারের জন্য। অন্য ব্যবস্থাদিও রীতিমত রাজকীয়। বস্তুত, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফেরার পর এমন রাজসিক আপ্যায়ন গান্ধীজীর

www.pathagar.com

কপালে এইবার প্রথম জুটলো। তবে শুধু প্রথম নয়, এটাই তাঁর শেষবার দিল্লিবাস।

গান্ধীজীর এই নতুন বাসভবনের চত্বরটুকু বাদ দিলে রাজধানী দিল্লি এখন জ্বলন্ত অঙার হয়ে আছে যেন। যেমন অসংখ্য খুন হচ্ছে তেমনি সারা দিল্লির রাজপথে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য বেওয়ারিশ মড়া। দেখে শুনে দিল্লি পুলিসের একজন হোমরা-চোমরা মন্তব্য করেছেন, 'এর কোনটা মানুষ আর কোনটা জানোয়ার, তা চেনার জো নেই।' যথার্থই তাই। পচে ফুলে উঠে শবটা যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে। ঘন্টায় ঘন্টায় মড়াঘরে চালান হচ্ছে এইসব মড়া। পুলিস থেকে শক্ত নির্দেশ এসেছে প্রতিটি মড়া পরীক্ষা করে মৃত্যুর কারণ লিখতে হবে। পুলিসের এই নির্দেশ পেয়ে করোনার খুবই বিরক্ত। তাঁর ধারণা এসব নির্দেশ পুলিস কর্তৃপক্ষের আদিখ্যেতা। 'কেউ কি জানে না কেন তারা মরেছে?'

তা একটু আদিখ্যেতা হয়েই যায় এসব ক্ষেত্রে। নিয়মকানুন থাকলেই বাড়াবাড়ি হয়। যেমন ধরা যাক এই বেওয়ারিশ মড়াগুলোর কথা। রাজধানী শহরের বুকের ওপর দিনের পর দিন পড়ে আছে ত আছেই। মড়া তোলার লোক নেই। হিন্দুর বাছবিচার বড় গোঁড়া। যার তার মড়া ছোঁয়া নাকি শাস্ত্রে বারণ। অতএব রাস্তার মড়া রাস্তাতেই পড়ে পড়ে পচুক। একদিন এডুইনার নজরে পড়লো এইরকম এক বেওয়ারিশ মড়া। শহরের ঠিক মধ্যিখানে পচা মড়াটা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। স্বামীর নৌবিভাগের সহকারী পীটার হোয়েস সংগে ছিলেন তাঁর। তখন তাঁদের পাশ দিয়ে একটা ট্রাক যাচ্ছিল।

পীটার হাত নেড়ে তাকে দাঁড় করালেন। কিন্তু হিন্দু ড্রাইভার মুখ গোঁজ করে রইল। যার তার মড়া ছোঁবে না সে। অনন্যোপায় হয়ে ভারতের শেষ বড়লাটগিন্নী হোয়েসের সংগে হাতে হাতে মড়াটা ট্রাকের ওপর তুলে দিলেন; তারপর হতভম্ব ড্রাইভারকে হাত নেড়ে বললেন 'মর্গমে লে যাও!'

দিল্লির অধিকাংশ মুসলমানই তখন পাকিস্তানে পালিয়ে যেতে চাইছিল। সুখ না পাক অন্তত সোয়াস্তিতে তারা জিন্নার প্রতিশ্রুতির দেশে থাকতে পারবে। তাই সবাইকে জড়ো করে বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে রাখার ব্যবস্থা হলো সময়মত পাকিস্তানে চালান করার জন্যে। কিন্তু অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর ব্যংগ! লোক-গুলোকে খোয়াড়বন্ধ জন্তুর মতন এমন দুটি জায়গায় রাখা হ'ল, যে দুটো স্থান হ'ল দুই মহান ঐতিহাসিক কীর্তি। একদা এই সবেরই রোশনাইতে মোগল বাদশাদের সাধের দিল্লি পৃথিবীর সেরা নগরী হয়ে উঠেছিল। মোগল বাদশাদের সেই ক্ষণিক আড়ম্বরের দিল্লির জলুস তখন ঈর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল এই দুই প্রতীক কীর্তিতে। এদের একটা হ'ল বাদশা হুমায়ুনের স্মৃতিসৌধ আর অন্যটা হ'ল পুরান কিল্লা। এই দুই কীর্তিসৌধের চত্বরে তখন মাথাগুঁজে পড়ে আছে যথাক্রমে দেড়লক্ষ আর দুলক্ষ শরণার্থী মানুষ। ইসলামিক সংস্কৃতির এই দুই সুপ্রাচীন কীর্তি-সৌধের খোলা চৌহদ্দির মধ্যে তাদের তখন অবর্ণনীয় দুরবস্থা। নোংরা, দুর্গন্ধময় পরিবেশে রোদজলের পক্ষপাতহীন কৃপাবর্ষণে তারা বিপর্যস্ত। তবুও পাঁচিলের বাইরে যাবার দুঃসাহস হয় না তাদের। এমনকি কেউ মারা গেলে তার শবটাও পড়েই থাকে। পরে হয়ত কেউ কেউ পাঁচিলের ওপর থেকে র‍্যামপার্টে ছুঁড়ে দিল মড়াটা শেয়াল শকুনের ভোজের জন্যে। প্রথম দিকে পুরান কিল্লার মধ্যে তার পঁচিশ হাজার আবাসিকের জন্যে মাত্র দুটো জলের কল ছিল।

www.pathagar.com

যে একটা জলাশয় ছিল তার জলেই এ'টো বাসন ধোয়া, জলশৌচ করার কাজ করতো সবাই। কোথাও স্বাস্থ্যবিধি মানা হ'ত না, এমনকি ভারতীয় সমাজের যে বাধানিষেধ আছে সেগুলোও প্রবলভাবেই বিরাজ করতো। আবর্জনা আর দুর্গন্ধে ভরে গেলেও মলমূত্রাগারগুলো পরিষ্কার করতে চাইত না কেউ। সব-থেকে কৌতুক'কর ব্যাপার হলো যে, যখন সারা দিল্লি দাংগার আগুনে জ্বলছে, তখনও পুরান কিল্লার মুসলমান উদ্বাস্তুদের মলমূত্র সাফাই করতে একশ' জন হিন্দু ধাঙড়কে কড়া পাহারায় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হ'ল ইমারজেন্সি কমিটিকে।*

দিল্লির আর একটা অভিশাপ হ'ল তার লালফিতার ভ্রূকুটি। সরকারি কাজে এই আমলাবাজির তাড়নায় দিল্লির প্রশাসন তখন প্রায় অচল অনড় হয়ে গেছে। হুমায়ুনের স্মৃতিসৌধ চত্বরের আবাসিকরা নিজেরাই খোঁড়াখুঁড়ি করে কয়েকটা অতিরিক্ত মূত্রাগার বানাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু প্রতিনিধি পাঠিয়ে কাজ বন্ধ করার কড়া নির্দেশ দিলেন দিল্লির কমিশনার। এই খোঁড়াখুঁড়ির জন্য নাকি সমাধি চত্বরের অমন কেয়ারি করা সুন্দর লন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মোটকথা এমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে যা অনিবার্য তাই ঘটলো। কলেরা রোগ ছড়িয়ে পড়লো দুই শরণার্থী শিবিরে। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ষাটজন লোক মারা গেল পুরান কিল্লায়। সময়মত কলেরা সেরাম না পৌঁছানোর দরুন এই দুর্ঘটনা ঘটলেও স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে ব্যাপারটা ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা হ'ল। স্বাস্থ্য দপ্তর প্রচার করলো যে সাধারণ পেটের অসুখে ভুগেই ওরা মারা গেছে। শেষ পর্যন্ত সেরাম এসে পৌঁছলেও সিরিঞ্জ এল না। অতএব সেগুলি ব্যবহারও করা গেল না।

তবে ছোটখাট কিছু কিছু সমস্যা থাকলেও সর্বাংগীণ ছবিটা অতটা নৈরাশ্য-জনক রইল না। মাউন্টব্যাটেন, নেহরু এবং প্যাটেলের তৈরি করা কমিটির তদ্বারকির সুফল তখন ফলতে শুরু করেছে। শহরে আরও সৈন্যসমাবেশ করা হয়েছে। উপদ্রুত অঞ্চলগুলোয় চব্বিশঘণ্টার সামরিক আইন বলবৎ করা হ'ল। শুরু হ'ল অস্ত্র উদ্ধারের অভিযান। ধীরে ধীরে হত্যা ও লুণ্ঠনের উত্তাল স্রোতে ভাটা পড়লো।

সেই সব অগ্নিপরীক্ষার দিনগুলোয় মাউন্টব্যাটেন এবং নেহরু যেন আরও কাছাকাছি হয়ে গেলেন। দিনে অন্তত দু-তিনবার তাঁদের দেখা হ'ত। নেহরুই আগ্রহ নিয়ে দেখা করতেন। তখন প্রায়ই মাউন্টব্যাটেনের মনে হয়েছে যেন 'সংগ

---

* তখন এইরকম তামাসার ঘটনা অনেক ঘটেছে। পাকিস্তানের এক হিন্দু উদ্বাস্তু শিবিরের শিখ ও উদ্বাস্তু শরণার্থীরা কড়া দাবি করলো যেন সত্বর তাদের মলমূত্রাগারগুলো হিন্দু ধাঙড় মেথর দিয়ে সাফাই করার ব্যবস্থা করা হয়। পাকিস্তানের রাজধানী করাচিরও তখন সঙ্গিন অবস্থা চলেছে। শহরের হিন্দু মেথর ধাঙড়রা পাকিস্তান ছেড়ে পালিয়েছে। ঠেকাতে শহরের প্রশাসকরা তাদের তফসিল-ভুক্ত করে পৃথক জাতি হিসাবে গণ্য করলো। তবে হিন্দু সমাজ যেমন তাদের অবনত জাতিরূপে নির্দিষ্ট করেছে, তেমনভাবে চিহ্নিত না করে, বিশেষাধিকারের মর্যাদা দেওয়া হ'ল সরকারী ঘোষণায়। মুসলিম ন্যাশন্যাল গার্ডের রক্ষীবাহিনীর মতন তাদেরও সবুজ ও সাদা আর্মব্যাণ্ড পরতে দেওয়া হ'ল এবং পুলিস বিভাগের ওপর তাদের রক্ষণাবেক্ষণের কড়া নির্দেশ জারি করা হ'ল।

www.pathagar.com

পেতেই আমার কাছে ছুটে এসেছেন নেহরু।' এসেছেন মনের ভারটুকু হালকা করতে কিংবা সান্ত্বনা পেতে। তখন তাঁর লেখা অনেকগুলো চিঠিতেই নেহরু তাঁর মনের এই ভাবটি ব্যক্ত করেছেন। মাউন্টব্যাটেনকে লেখা কোন চিঠির শুরুতেই হয়ত লিখেছেন, 'কেন আপনাকে চিঠি লিখছি জানি না। শুধু মনে হচ্ছে কাউকে চিঠি লিখে বুক থেকে কষ্টের বোঝাটা নামিয়ে দিই।' সেই সব দুঃসহ দিনগুলোয় নেহরু ছুটে বেড়িয়েছেন ছন্নছাড়ার মতন। তাঁর তখনকার মনের অবস্থার কথা এক গুণগ্রাহিণীর একটা ছোট্ট মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, 'সেই কয়েক মাসের মধ্যেই নেহরু যেন সর্বস্ব খুইয়ে বসেছেন। আগে যাঁকে দেখে মনে হ'ত তেত্রিশ বছরের যুবক টায়রন্ পাওয়ার, এখন তাঁকেই মনে হয় যেন তিন বছর নির্বাসনে কাটিয়ে এসেছেন।' একদিন তাঁর ব্যক্তিগত সচিব আয়াংগার দেখলেন যে বুকের ওপর মাথাটা হেঁট করে ঘুমিয়ে পড়েছেন নেহরু। ঠিক পাঁচ মিনিট তাঁর তন্দ্রাঘোর ছিল। তারপর ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসে অপ্রস্তুত একটু হেসে বললেন, 'খুব ক্লান্ত হয়ে গেছি। রাত্রে ঠিক পাঁচ ঘণ্টা ঘুমোই। হায় ভগবান যদি অন্তত ছ'ঘণ্টা ঘুমতে পারতুম!' তারপর আয়াংগারের দিকে চেয়ে বললেন, 'তুমি কতক্ষণ ঘুমোও?'

'সাত-আট ঘণ্টার মতন।' আয়েঙ্গারের জবাব শুনে নেহরু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এইরকম অবস্থায় ছ'ঘণ্টা ঘুম খুব দরকার। তবে সাত ঘণ্টা ঘুম বিলাসিতা। আর আট ঘণ্টা ঘুম ত অপরাধ!'

বিড়লাভবনের অতিথি গান্ধীজীর কাছে দিল্লির এই ভয়ংকর দাংগা যেন এক নির্মম অভিজ্ঞতা হয়ে উঠলো। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, যে মানুষটি একদিন জিন্নার দেশভাগের গোঁড়া বিরোধিতা করেছেন, আজ তাঁকেই যেন এদেশের মুসলমানরা পরিত্রাতার আসনে বসালো। জিন্নাকে সরিয়ে তাঁর বিগ্রহ বসালো তাদের হৃদয়মন্দিরে। তাই তাঁর দিল্লি পেঁছানোর সংগে সংগেই মুসলমান প্রতিনিধিদল উপচে পড়লো বিড়লাভবনে। তারা এল এবং শিখ ও হিন্দুর হাতে তাদের অত্যাচারের ফর্দ শুনিয়ে গেল গান্ধীজীকে। তাঁকে অনুরোধ করলো যেন তাদের অনাথ করে গান্ধীজী দিল্লি ছেড়ে না যান। স্তম্ভিত গান্ধীজী তাদের কথা শুনলেন এবং কথা দিলেন যে দিল্লি শান্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি পাঞ্জাবে যাবেন না।

গান্ধীজী বোধহয় আর কখনও তাঁর আদর্শের প্রতি এতটা বিশ্বস্ত হননি, আর কখনও এমন নিবিড়ভাবে তাঁর আদর্শ প্রচারের প্রয়োজন বোধ করেন নি যেমনটি করলেন তাঁর জীবনের এই অপরাহ্ন বেলায়। জীবনের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তাঁকে বলতে হ'ল যে এই ভয়ংকর অবস্থার পূর্বাভাস তিনি টের পেয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি এতটুকু বিহ্বল হলেন না। একবারও মনে হয় নি যে ভুল পথে তিনি ভ্রষ্ট হয়েছেন। বরং দক্ষিণ আফ্রিকার সেই দিন-গুলি থেকে যে প্রেম, অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা এবং বিশ্বমানবতাবোধের আদর্শকে তিনি আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন, আরও নিবিড় আশ্লেষে সেই আদর্শই অটুট করে রাখলেন তাঁর জীবনের শেষ বেলায়। গান্ধীজীর জীবনে এই আদর্শের ভূমিকার এতটুকুও বদল হয় নি। শুধু বদলেছে ভারতের প্রেক্ষাপট।

হ্যাঁ, সত্যই তখন বদলে গেছে ভারতবর্ষের চালচিত্র। তাঁর দেখা সেই পুরনো

www.pathagar.com

চিত্রপটের কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না আর। একদিন তিনি প্রেম ও অহিংসার বাণী প্রচার করে দেশের মানুষকে বিদেশী শাসকশক্তির বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছেন। সে অন্য ভাব। কিন্তু মানুষ যখন চোখের সামনে নিজেদের ছেলেমেয়েদের খুন হতে দেখে, লাঞ্ছিত হতে দেখে তাদের মেয়ে-বউদের, যখন সব হারানোর বেদনায় তারা নিমজ্জিত হয়ে যায়। তখন তাদের কাছে প্রেম ও ক্ষমার বাণী প্রচার করা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। গান্ধীজী মনেপ্রাণে চাইতেন যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের চক্র থেকে মুক্তির সন্ধান এনে দিক তাঁর প্রেম ও অহিংসা। কিন্তু তাঁর এই আদর্শ ত সাধু মহাপুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট! আর সেদিনকার শরণার্থী শিবিরগুলোয় কি তেমন সাধু মহাপুরুষ একজনও ছিলেন?

শরীরের অবস্থা যত অনিশ্চিতই হ'ক না কেন, তখন প্রায় রোজই কোন না কোন শরণার্থী শিবিরে গান্ধীজী গেছেন। চেষ্টা করেছেন তাদের মন থেকে প্রতিশোধের কটুভাবটি উপড়ে ফেলতে। কিন্তু কে শুনছে তাঁর কথা? তাঁকে দেখেই উৎকট প্রতিশোধস্পৃহায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতো শিবিরের মানুষগুলো। তারা চীৎকার করে বলতো, 'আপনি ত অহিংসার পূজারী! বলতে পারেন কি করে আত্মরক্ষা করবো? আপনি আমাদের অস্ত্রত্যাগ করতে কেন বলছেন? আপনি কি জানেন না যে পাঞ্জাবের মুসলমানরা হিন্দু দেখলেই তাদের খুন করছে? আপনি কি চান যে নিরীহ ছাগল ভেড়ার মতন আমরাও জবাই হই?'

গান্ধীজী থ। তাঁর জীবননিষ্ঠ আদর্শের এ কি পরিণতি? তবুও বিহ্বল হন নি। ওদের চোখে চোখ রেখে নির্ভীক স্বরে বলেছেন, 'এটা জেনো যে পাঞ্জাবের সব মানুষ যদি একজনকেও না মেরে মারা যায়, তবে অমর হয়ে থাকবে সেই দেশ।' যেমনভাবে তিনি ইহুদি বা ঈথিওপিয়াবাসীদের উপদেশ দিয়েছেন সেইভাবে ক্ষুব্ধ হিন্দুদেরও বলেছেন, 'বরং ওদের হিংসার হাড়িকাঠে নিজেদের বলি দাও, তবুও নিজেরা কখনো হিংসার আশ্রয় নিও না।' যখন এসব কথা বলেছেন তখন সমস্বরে ওরা তাঁকে উপহাস করেছে। তীক্ষ্ন ব্যংগ বিদ্রূপে জর্জরিত করে বলেছে, 'পাঞ্জাবে যান। নিজের চোখে দেখুন। তারপর এসব কথা বলবেন।' মুসলমানদের শরণার্থী শিবিরেও একই রকম উপহাস্যের অভ্যর্থনা জুটলো তাঁর কপালে। কলকাতায় তাঁর কর্মকীর্তির অমন সাফল্যও তখন হেয় হয়ে গেছে। একটা শিবিরে গিয়ে দাঁড়াতেই সদ্য বাপ-মা হারানো একটা দুমাসের বাচ্চাকে তাঁর কোলের মধ্যে ছুঁড়ে দিল ওরা। গান্ধীজীর দু চোখ ভরে উঠলো জলে। তারপর অশ্রুসজল চোখে ওদের দিকে চেয়ে বললেন, 'যদি মরতে হয় আল্লার নাম নিয়ে মরো ; কিন্তু কখনও মনকে ছোট করো না।' গান্ধীজীর কথা শুনে লোকগুলো অবাক। এটা কি ওঁর শৌখিন চিন্তাবিলাস না ভণ্ডামি? প্রায় দুয়ো দিয়ে ওরা তাঁকে খেদিয়ে দিল।

একদিন পুরান কিল্লার শরণার্থী শিবিরে এসে পৌঁছতেই লোকগুলো তাঁর গাড়িখানা ঘিরে ফেললো। তারপর তাঁকে লক্ষ্য করে চললো গালিগালাজ। কেউ কেউ তখন গাড়ির দরজা খুলে তাঁকে টেনে নামাতে চাইছে। গান্ধীজী একটুও বিচলিত হলেন না। ধীরে ধীরে গাড়ি থেকে নামলেন। সেদিন ভারী দুর্বল তিনি। সবে অনশন ভেঙে এসেছেন। সকলের চিৎকারের মধ্যে তাঁর কথাও শোনা যাচ্ছে না দেখে, একজন এসে তাঁর কথাগুলো শুনিয়ে দিল ওদের। গান্ধীজী ওদের বললেন, 'হিন্দু মুসলমান, শিখ; খ্রীশ্চান যাই হও তোমরা; আমার কাছে

www.pathagar.com

সবাই সমান।' তাঁর কথা শুনে টিটকারি দিয়ে হো হো করে হেসে উঠল সবাই। উন্মত্ত মানুষগুলোর কাছে তাঁর ভ্রাতৃপ্রেমের এই শোচনীয় পরিণাম দেখে মাথা হেঁট হয়ে গেল গান্ধীজীর।

শুধু মুসলমানদের কাছে হেনস্থা হওয়া নয়, হিন্দুদের চোখেও গান্ধীজী ব্রাত্য হয়ে গিয়েছিলেন সেদিন। নিপীড়িত মুসলমানদের প্রতি তাঁর এই সহানুভূতির কদর্থ করে হিন্দুরা। অথচ গান্ধীজী পক্ষপাতদুষ্ট নন। তিনি শুধু চেয়েছিলেন যে আঘাতের বেদনা মুসলমান-হিন্দু সমানভাবে উপলব্ধি করুক। ধর্মের ভেদে যন্ত্রণার যে তারতম্য হয় না এ সত্যে ত বিরোধ নেই! তবুও ওরা কেন বুঝতে চায় না যে আঘাতের কষ্ট সব ধর্মের মানুষেরই একরকম হয়? হায় দুরাশা! গান্ধীজীর জীবনাদর্শের এটাই সবচেয়ে বড় অকৃতকার্যতা যে কলকাতার 'মিরাক্‌ল্' দিয়ে মুসলমানের হৃদয় ভরিয়ে দিতে পারলেও, সেদিন থেকে যে অনেক হিন্দুই তাঁর চিরশত্রু হয়ে যায় সে কথা গান্ধীজী ঘুণাক্ষরেও টের পাননি।

অবশ্য টের পেলেও গান্ধীজী আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হতেন না। কারণ, আদর্শের প্রতি সততায় তাঁর কোন মিথ্যা বিন্যাস ছিল না। তাঁর আদর্শবাদের আবেগটি বড় নির্মল। তাই চাপা উত্তেজনা থাকলেও তাঁর প্রার্থনাসভায় গান্ধীজী যেমন ভগবদ্‌গীতা থেকে পাঠ করতেন, তেমনি পবিত্র বাইবেল ও কোরান থেকেও উদ্ধৃতি দিতেন। কিন্তু একদিন এই বৈকালিক প্রার্থনাসভায় একটা অঘটন ঘটে গেল। যারা উপস্থিত ছিল তারাই চীৎকার করে তাঁকে শুনিয়ে দিল যে এইসব ধর্মোপদেশ স্রেফ নিষ্ফল, ধাপ্পা। নইলে তাদের মা বোনেরা ধর্ষিতা হচ্ছে কেন? কেন মরছে অসহায় হিন্দু? আক্রোশে চেঁচিয়ে উঠলো সবাই। বললো, 'গান্ধী মুর্দাবাদ!' শুধু একজন দুজন নয়। সমবেত জনতার এই ধিক্কারধ্বনি কানে শুনলেন গান্ধীজী। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন বৃদ্ধ মানুষটি। সারা প্রার্থনাসভা জুড়ে তখন উচ্ছৃংখল হট্টগোল শুরু হয়ে গেছে। চিৎকার করে ওরা থামিয়ে দিল গান্ধীজীকে। কথা বলতে দিল না তাঁকে। যে নির্ভীক মানুষটিকে অমন প্রবলপ্রতাপশালী ব্রিটিশ সরকার স্তব্ধ করতে পারে নি, তাঁকেই নির্বাক করে দিল তাঁরই দেশের মানুষ। সেবারই প্রথম তাঁর প্রার্থনাসভা শেষ করতে পারলেন না গান্ধীজী।

মদনলাল পহ্‌ওয়া নামে যে মানুষটির কুখ্যাতি একদিন সারা দেশে ছড়িয়ে যাবে, তার জয়যাত্রা শুরু হ'ল গোয়ালিয়র শহরের একটা ডাক্তারখানা থেকে। দিল্লি থেকে ১৯৪ মাইল পূর্ব-দক্ষিণের এই গোয়ালিয়র স্টেট কিছুদিন আগেও এক পাগলাটে মহারাজার অধীন ছিল। মানুষটার নেশা ছিল বৈদ্যুতিক ট্রেন। রসুইঘর থেকে তাঁর খাদ্যবস্তু আসতো বৈদ্যুতিক ট্রেনে চড়ে। তা সে যা হ'ক, বর্তমানে গোয়ালিয়র শহরের এই ডাক্তারখানার মালিক খুবই সাদামাটা চেহারা একজন খর্বকায় বৃদ্ধ। মানুষটার কেশহীন টাক মাথা আর ফোকলা দাঁতের হাসি দেখলেই কেমন যেন দুর্জ্ঞেয় মিল খুঁজে পাওয়া যায় গান্ধীজীর ক্ষীণ দেহপটের সংগে।

মানুষটি একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। এঁর নাম দত্তাত্রেয় পরচুরে। ব্রংকাইটিস ও নিউমোনিয়া রোগের অব্যর্থ 'টোটকা' আবিষ্কার করে ইনি সারা গোয়ালিয়র শহরে বিখ্যাত হয়েছেন। বাঁশের কোঁড়, এলাচদানা, পেঁয়াজের রস এবং চিনি ও মধু মেশানো এই 'টোটকা' ওষুধটি এঁর নিজস্ব আবিষ্কার। তবে

www.pathagar.com

শুধু 'টোটকা' আবিষ্কারই নয়। আর একটা ব্যাপারেও তাঁর ভারী নামডাক এবং সেই টানেই এই শহরে মদনলাল এসে হাজির হয়েছে তাঁর এই ডাক্তারখানায়। ডাক্তার দত্তাত্রেয়র প্রধান নেশা হিন্দুয়ানির রাজনীতি। গোয়ালিয়র শহরের হিন্দু মৌলবাদী প্রতিষ্ঠান আর.এস.এস বাহিনীর সর্বাধিনায়ক তিনি।

চেহারায় ছোটখাট নিরীহ হলেও এই বৃদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারটি অত্যন্ত উগ্র মুসলমান বিদ্বেষী। নিজের হাতে হাজার অনুচর নিয়ে এক সশস্ত্র রক্ষিবাহিনী গড়েছেন তিনি এবং এদের দিয়েই ভারত থেকে ষাট হাজার মুসলমানকে খেদিয়ে দেবার কথা বলে বেড়ান এই মানুষটি। রুগী দেখে যে ছ'আনা ফিস্ পান তার প্রায় সবটাই ছুরি ছোরা কিনতে ব্যয় করেন। ডাক্তারবাবুটি সর্বক্ষণই সন্ধানী চোখে শহরে নতুন 'আমদানি' খুঁজে বেড়ান। উপযুক্ত যুবকের খোঁজ পেলেই খাওয়া শোওয়ার বদলে তাঁর নিজস্ব বাহিনীতে জুড়ে দেন তাকে। বলাবাহুল্য, মদনলাল তাঁর নবতম সংগ্রহ (রীক্রুট)। এই গাঁট্টাগোট্টা যুবকটির মুসলমান বিদ্বেষ তাঁর ভাল লেগেছে। তাঁর মনে হয়েছে যে, এইরকম একজন বিদ্বেষপরায়ণ যুবকই তিনি খুঁজছিলেন, যার মনে সর্বক্ষণই প্রতিহিংসার ধিকি-ধিকি আগুন জ্বলছে। অতএব মদনলালকে নিয়োগ করতে তাঁর আর দ্বিধা রইল না। থাকা খাওয়ার বদলে মদনলালকে তাঁর নিজস্ব 'কম্যাণ্ডো' বাহিনীতে বহাল করলেন তিনি।

মদনলালও সানন্দে রাজী হ'ল ডাক্তারের প্রস্তাবে। পরের মাস থেকেই 'কম্যাণ্ডো' বাহিনী নিয়ে তার অভিযান শুরু হয়ে গেল। ভূপাল ছেড়ে যে সব মুসলমান দিল্লি পালাচ্ছিল প্রথমেই তাদের 'কত্‌ল্' করলো তার ঠাঙাড়ে বাহিনী। অসহায় মানুষগুলোকে হত্যার পদ্ধতিটা ঠিক ওদেরই মতন। ওর বাবা এবং আত্মীয়স্বজনের ওপর এইভাবেই চড়াও হয়ে 'কত্‌ল্' করতে চেষ্টা করেছিল মুসলমানরা। ঠিক সেই একই পদ্ধতি। স্টেশনে অপেক্ষা করছে সবাই। ট্রেন এসে থামতেই দলবল নিয়ে ওরা ট্রেনের কামরাগুলোয় উঠে পড়লো। তারপর একটুও অনুতপ্ত না হয়ে নির্বিচারে সবাইকে জবাই করে ট্রেন থেকে নেমে এল সবাই।

এইভাবেই চলতে লাগলো ঘৃণ্য হত্যালীলা। ব্যাপারটা এমনই ভয়ংকর যে দিল্লিতে বসে গান্ধীজীও সব শুনে আকুল হয়ে গেলেন। এসব কী অমানুষিক কাণ্ড করছে ওরা? প্রার্থনাসভায় রীতিমত ভর্ৎসনা করলেন তিনি। কথাটা গোয়ালিয়রের মহারাজার কানেও গেল। বৃদ্ধ ডাক্তারকে ডেকে তার লোকজনকে প্রতিহিংসার রাশ টেনে ধরতে বললেন গোয়ালিয়রের হিন্দু মহারাজা। মদন-লালের মনস্কামনা সিদ্ধ না হওয়ায় খুবই হতাশ হ'ল সে। গোয়ালিয়র ছেড়ে সে তখন বোম্বাই চলে গেল। তবে বোম্বাই শহরে এসে সে চুপ করে বসে রইল না। একটা উদ্বাস্তু শিবিরে নাম লিখিয়ে জনা পঞ্চাশ অনুচর নিয়ে সে একটা ছোট্ট দল গড়ে ফেললো। তারপর শুরু হ'ল তার নতুন অভিযান।

রোজ সকালে বম্বের মুসলমান এলাকার কোন বড় হোটেলে ঢুকে তারা পেটপুরে ভালভাল খাবার-দাবার খেতে লাগলো। খাওয়াদাওয়ার পর যখন দাম চাইতে আসতো, তখন হোটেলের আসবাবাদি ভেঙে চুরে পালিয়ে যেত। কখনো বা মুসলমান ফেরিওয়ালাকে মারধর করে তার টাকাপয়সা ছিনিয়ে নিত। কিংবা তার জিনিসপত্র অনাত্র বেচে টাকাপয়সা কেড়েকুড়ে নিত। তখন সারা দিনে যা

www.pathagar.com

আদায়উসুল হ'ত, সন্ধ্যেবেলায় ক্যাম্পে ফিরে মদনলালকে বুঝিয়ে দিত তারা সারা দিনের সংগ্রহ থেকে সমান ভাগে ভাগ হ'ত সেই রোজগার। একটা ভাগ মদনলালও নিত। এইভাবে বেশ নির্বিঘ্ন জীবনযাপন করতে লাগলো মদনলাল এবং কিছুদিনের মধ্যেই যথেষ্ট ধনী হয়ে উঠলো সে।

ধনাগম শুরু হতেই ছিঁচকে চুরিচামারি ইত্যাদি দুষ্কর্মের মধ্যে তার প্রতিভা সীমাবদ্ধ করে রাখতে চাইল না মদনলাল। তার মনে হ'ল নেতাগিরির পরিধি বাড়িয়ে দেবার জন্য কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ করা দরকার। সুতরাং মনে মনে কর্মপন্থা স্থির করে নিল মদনলাল। দুজন বিশ্বস্ত এবং সাহসী অনুচরের সঙ্গে কিছু হাত বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সে গিয়ে পৌঁছল আমেদনগর শহরে। এই মুসলমানপ্রধান শহরে সেদিন পরব উপলক্ষে মুসলমানদের মিছিল বেরিয়েছে। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ওরা হাতবোমা ছুঁড়লো ওই মিছিলের ওপর। সশব্দে বোমা ফাটতেই সারা মিছিলে একটা বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়ে গেল। সেই অবসরে অচেনা শহরের গলিগলি দিয়ে প্রাণভয়ে ছুটতে লাগলো মদনলাল। তার লক্ষ্য এমন একটা আস্তানা যেখানে কয়েক ঘণ্টা নিরাপদে থাকতে পারে। হঠাৎ একটা হোটেলের সাইনবোর্ড নজরে পড়লো তার। হোটেলের বাড়িটা ভাঙাচোরা হলেও নামটা বেশ জবরদস্ত—'ডেকান গেস্ট হাউস।' এরপরে সে যা দেখলো তার জন্যে তৈরি ছিল না মদনলাল। সে দেখলো, দোতলার বারান্দা থেকে ঝুলছে কমলা রঙের স্বস্তিকা আঁকা পতাকা। মদনলাল মনে মনে দারুণ খুশী হ'ল পতাকাটা দেখে। প্রায় দৌড়ে সে তখন হোটেলের মধ্যে ঢুকে গেছে। তারপর সামনে বসে থাকা মোটাসোটা মাঝবয়সী লোকটার দিকে চেয়ে বললো, 'আমায় বাঁচান। এখুনি আমি মুসলিম মিছিলের ওপর বোমা ফেলে পালিয়ে এসেছি।' মোটাসোটা লোকটা স্থির চোখে তাকিয়ে রইল মদনলালের দিকে। বছর সাঁইত্রিশ বয়সের এই মানুষটাই হোটেলের মালিক এবং আর.এস.এস. বাহিনীর স্থানীয় নেতাও সে। তার নাম বিষ্ণু কারকারে। মদনলালকে প্রায় চিরে চিরে দেখলো বিষ্ণু। তারপর দুহাত ছড়িয়ে তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল। মদনলালও অভিভূত। সেও বুঝতে পারলো যে, প্রতিশোধস্পৃহা মেটাতে ঠিক জায়গাতেই পৌঁছে গেছে সে। আরও বুঝতে পারলো যে এখন থেকে সে আর একা নয়।

নয়াদিল্লি, ২রা অক্টোবর ১৯৪৭

সাজসাজ রব পড়ে গেছে রাজধানী শহরে। সারা বিশ্বের সঙ্গে স্বাধীন ভারতও ভারতরত্ন গান্ধীজীর জন্মদিন পালন করতে চলেছে তুমুল উৎসাহের সঙ্গে। বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধ গান্ধীজীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছে সারা পৃথিবীর মানুষ। বিড়লাভবনের যে দিকটায় তিনি বাস করছেন সে দিকটা ভরে গেল হাজার হাজার শুভেচ্ছাপত্রে আর টেলিগ্রামে। সকাল থেকে শুরু হয়েছে মানুষের ভিড়: একে একে এসে পড়ল হিন্দু, মুসলমান আর শিখ শরণার্থীদের মিছিল। এল ফুল, ফল, মিষ্ঠান্নর ঝুড়ি। এলেন নেহরু প্যাটেল, মিসেস মাউন্টব্যাটেন অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ এবং বিদেশী কূটনীতিক নেতারা। সবাই মিলে

www.pathagar.com

দিনটাকে জাতীয় ছুটির দিন করে তুললেন।

কিন্তু আশ্চর্য ! গান্ধীজীর বাসভবনের কোথাও ছুটির খুশী নেই। বৃদ্ধ গান্ধীজীর শারীরিক অবস্থা দেখে সবাই বেশ উদ্বিগ্ন। তাঁর সেই স্বাভাবিক হাসিখুশি ভাবটি যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। খুবই বিষণ্ণ, বেদনার্ত দেখাচ্ছে তাঁকে আজ। তাঁকে দেখে কে বলবে যে একদিন এই মানুষটিই গর্ব করে ১২৫ বছর বাঁচবেন বলেছিলেন। শুধু বেঁচে থাকা নয়। অহিংসা আন্দোলনের সৈনিক হয়ে তাঁর আদর্শ পূর্ণ করার সংকল্প করেছিলেন গান্ধীজী। কিন্তু কোথায় গেল তাঁর সেই জীবনসংকল্প ? ভাঙা শরীর নিয়ে দিনটা আজ প্রার্থনা, অনশন আর চরকা কাটার মধ্যে নিমগ্ন রাখতে চাইলেন গান্ধীজী। মনে মনে চাইলেন যে বছরটা এইভাবেই কাটুক। মান্ধাতা আমলের এই চরকা যন্ত্রের মধ্যে নিহিত আছে ভারতের মঙ্গল। নিষ্ঠুর হত্যা আর বন্য পাশবাচারের দাপটে যা ভুলতে বসেছে স্বাধীন ভারত।

সন্ধ্যেবেলার প্রার্থনাসভায় ক্লান্ত গান্ধীজী বললেন, 'সবাই আমায় অভিনন্দন জানাতে আসছেন কেন ? উচিত কাজ হবে যদি সবাই শোকপালন করেন।' তারপর সবাইকে শুনিয়ে বললেন, 'তোমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো। এই সর্বনাশা আগুন তিনি নিভিয়ে দিন। আর তা যদি না পারেন তবে আমায় তাঁর কোলে টেনে নিন।' একটু থেকে বিষণ্ণ গান্ধীজী বললেন, 'এই অগ্নিগর্ভ ভারতে আর একটা জন্মদিন পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকতে চাই না।'

সেদিনের প্রার্থনাসভায় মনিবেন প্যাটেলেও উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষের পর গান্ধীজীকে দেখে এসে ডাইরিতে লিখলেন, 'কত আহ্লাদ করবো বলে গিয়েছিলুম সবাই। ফিরে এলুম বুকে ব্যথা নিয়ে।'

স্বাধীন ভারতের আকাশবাণী থেকে এক বিশেষ সান্ধ্য অনুষ্ঠান প্রচার করা হ'ল সেদিন। তাঁরই জন্মদিনের অনুষ্ঠান। কিন্তু তিনি শুনলেই না সেই অনুষ্ঠান। ঘরের মধ্যে একা বসে চরকা কাটতে লাগলেন আর ঘূর্ণমান চক্রের ঘড়ঘড় শব্দের মধ্যে তন্ময় হয়ে শুনতে লাগলেন 'ব্যথিত মানবাত্মার গুনগুন গান।'

পাঞ্জাব, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৪৭

দেশভাগের কোন ট্র্যাজেডিই যেন পরিপূর্ণ হয় না যদি তার সঙ্গে বর্বর নারী লাঞ্ছনা সংযুক্ত না থাকে। ইতিহাসের শুরু থেকেই প্রায় প্রতিটি অরাজকতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই জঘন্য অপরাধটি। মানুষের এই ব্যভিচারবৃত্তি যেন অরাজকতারই একটা অংগ, অন্তত ইতিহাসের সাক্ষ্য সেইরকমই। বলাবাহুল্য, হতভাগ্য পাঞ্জাবের বেলাতেও এই প্রবৃত্তির অন্যথা হ'ল না। সেখানকার প্রায় সব ক'টা হাঙ্গামাই ভূষিত হয়ে আছে নির্বিচার নারীধর্ষণে। হাজার হাজার বিপন্ন যুবতীকে হয় শরণার্থী শিবির, কিংবা চলন্ত রেলগাড়ি বা বিচ্ছিন্ন গ্রাম থেকে টেনে আনা হয়েছে এবং পুরুষের যৌন লালসার কাছে তাদের বলি দেওয়া হয়েছে। এমন ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক। বলতে গেলে সেদিনকার পাঞ্জাবে এই ব্যাপক নারী-হরণ যেন একটা দৃষ্টান্ত হয়ে আছে আধুনিক কালে।

www.pathagar.com

শুধু তুলে আনা নয়, হিন্দু বা শিখ হলে সংগে সংগে একটা নামমাত্র অনুষ্ঠান করে তাদের ধর্মান্তরিত করাও এই নির্যাতনের অংগ। তারপর অপহৃতা যুবতীর মুসলমান নামকরণ করে তাকে যে-কোন পুরুষের হারেমে ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ল সেই দুর্বৃত্তের ভোগদখলের জন্য। সারা পাঞ্জাব জুড়েই এই ঘটনা তখন নিয়মিত ঘটছিল। সন্তোষ নন্দলাল নামে একজন হিন্দু যুবতীর কপালেও একই বিড়ম্বনা জুটলো। মিঁয়াওয়ালা গ্রামের এই হিন্দু মেয়েটিকে হরণ করে আনার পর গ্রামের মোড়লের কাছে তাকে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেখানে বেশ কয়েকবার থাপ্পড় মারার পর তার মুখের মধ্যে একখণ্ড গোমাংস গুঁজে দেওয়া হ'ল। মেয়েটা তখন হাউ-হাউ করে কাঁদছে। এতকাল পর্যন্ত সে কখনও মাংস খায় নি। তার কান্না দেখে লোকগুলো তখন হো হো করে হাসছে। এমন সময় একজন মোল্লা এল। কোরান থেকে খানিকটা কি সব পড়লো। সন্তোষকেও পড়তে হ'ল তা। তারপর তার নতুন নামকরণ হ'ল। সন্তোষ হ'ল 'আল্লারাখী'। অর্থাৎ করুণাময় আল্লা যাকে রক্ষা করেন। তা, আল্লা রক্ষা করতে চাইলেও মুসলমানী সন্তোষের তখনই নিস্তার হ'ল না। গ্রামের পুরুষদের মধ্যে তার নিলাম হ'ল। সবচেয়ে অধিক দাম দিয়ে একজন কাঠুরে নিল তাকে। লোকটা কিন্তু মন্দ মানুষ ছিল না। আর কোনদিন সন্তোষকে নিষিদ্ধ মাংস দাঁতে কাটতে হয় নি।

শিখেদের দশম গুরুর বিশেষ নির্দেশ আছে যে শিখ পুরুষেরা যেন মসুলমান রমণীর সংগে যৌন মিলন না করে। পাছে এই ধর্মানুশাসন অমান্য হয় তাই প্রায় গল্পকথার মতন গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে রতিক্রিয়ায় বিশেষ পারংগম মুসলমান রমণীরা পুরুষদের বশ করে রাখে। তো, সারা দেশ জুড়ে তখন ডামাডোল চলছে, সর্বত্রই অনাচার। তখন গুরুর উপদেশের কথা কারও মনেই পড়লো না। মুসলমান যুবতী দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে শিখরা। তারপর খোলা হাটে তার কেনাবেচা চলছে আনাজ শাকসবজির মতন। ঠিক এইরকম সময়েই একটা দারুণ ঘটনা ঘটলো এক প্রৌঢ় শিখের জীবনে। পঞ্চান্ন বছরের এই শিখের নাম বুটা সিং। এককালে সে ফৌজি ছিল মাউন্টব্যাটেনের সামরিক বিভাগে। এখন অবসরপ্রাপ্ত বুটা সিং তার জমিতে খেতির কাজ করে এবং একক নিঃসংগ জীবন যাপন করে। একদিন বেলা পড়ে আসার আগে বুটা যখন জমিতে কাজ করছে তখন ভয়ার্ত একটা চীৎকার শুনলো সে। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলো যে একটি যুবতী মুসলমান মেয়ে পাগলের মতন ছুটে আসছে তার দিকে। ভয়, আতঙ্কে তার মুখটা কালো হয়ে গেছে। মেয়েটার পিছনে তাড়া করে ছুটে আসছে একটা শিখ পুরুষ। মেয়েটি তখন আকুল হয়ে 'বাঁচাও ! বাঁচাও !' বলে চেঁচাচ্ছিল।

বুটা সিং চকিতে ওদের দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লো। ব্যাপারটা বুঝতে তার এক মুহূর্তও দেরি হ'ল না। মুসলমান যুবতীটিকে ওই কালান্তক শিখটা নিশ্চয়ই লুট করে এনেছে উদ্বাস্তু শিবির থেকে। এবার তাকে বেচে সে মোটা টাকা রোজগার করতে চায়। তাই এমন লোভনীয় শিকার হাতছাড়া হয়ে যায় দেখে লোকটা এমন উন্মত্ত হয়ে গেছে। কিন্ত মুশকিল হ'ল বুটার। অবাঞ্ছিত ঘটনাটা অপ্রত্যাশিত হলেও তারই খেতিজমির ওপর গড়িয়ে এসেছে। তাকে যেন বাধ্য করতে চাইছে তার নিভৃতবাসের সংকল্পটা ওলটপালট করে দিতে। সে স্থির করেই রেখেছিল যে চিরকাল অনূঢ় থাকবে। কারণ, মেয়েদের ব্যাপারে সে চির-কালই লাজুক। তাছাড়া বিবাহিত জীবনযাপনের আর্থিক সংগতিও তার নেই।

www.pathagar.com

কিন্তু জীবনের অপরাহ্ন বেলায় এ কি অঘটন ঘটতে চলেছে তার জীবনে!

তবুও মনস্থির করতে দেরি করলো না বুটা। তার একদিকে দাঁড়িয়ে আছে একটা অপহারক। হিংস্র শার্দুলের মতন গজরাচ্ছে জানোয়ারটা। অন্যদিকে একটা তীরবেঁধা ছোট্ট পাখি। বুটা দুজনকেই দেখলো। তারপর লোকটার দিকে চেয়ে হেঁকে উঠলো, 'কত দিতে হবে?'

'পনরোশ' টাকা।'

আর কথা বাড়ালো না বুটা। গুনে গুনে টাকাটা লোকটার হাতে দিল সে। তারপর অসহায় মেয়েটাকে হাতে ধরে তুললো। সতেরো বছরের মেয়েটির নাম জেনীব। তার চেয়ে অন্তত আটত্রিশ বছরের ছোট। সুতরাং মেয়ের বয়সী জেনীবের সঙ্গে একটা বিচিত্র আদরের সম্বন্ধ গড়ে উঠলো তার। আসলে মেয়েটার অস্তিত্ব যেন বুটার জীবনযাপনের ধারা বিপর্যস্ত করে দিল। তার মনের স্নেহ-ধারা, যা অবরুদ্ধ ছিল এতদিন, এবার যেন বাঁধভাঙা বন্যার মতন আছড়ে পড়লো মেয়েটার ওপর। তার জীবনে মেয়েটা হয়ে উঠলো অর্ধেক কন্যা, অর্ধেক জায়া। কিন্তু জেনীব নারী। তাই যে কোন পুরুষের জীবনে তার অস্তিত্বময় উপস্থিতি পুরুষহৃদয়কে আলোড়িত করতে বাধ্য। বুটাও ব্যতিক্রম হ'ল না। একদিন অন্তর বাজার থেকে নানান উপহার কিনে আনতে লাগলো সে। কখনো শাড়ি, কখনো গায়ে-মাখা সাবান বা নকশা-আঁকা চপ্পল।

জেনীবের জীবনেও তখন আলোড়ন এসেছে। যৌবনোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে যে ধর্ষিতা হয়েছে, যার নারীত্ব লাঞ্ছিত হয়েছে প্রতি পদে তার জীবনে এই নিঃসঙ্গ প্রৌঢ় শিখটির স্নেহভালবাসা যেন সব অভাব পূরিয়ে দিল। নতুন করে তাকে নারীত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলো। অভিভূত জেনীবের মন থেকে তখন ধুয়ে মুছে গেছে সবরকম পুরুষবিদ্বেষ। নিঃসঙ্গ এবং বয়স্ক বুটার জীবনে স্রোত বদলের বাঁক এনে দিল যুবতী জেনীব। সেই-ই হয়ে উঠবে তার জীবনের ধ্রুবতারা। দিনের বেলায় সে হয়ে উঠলো কন্যা। মেয়ের মতন বৃদ্ধ বাপের সেবা পরিচর্যা করতো। তার ঘরকরনা সামলানো, তার গাই বলদ দেখা, দুধ দোহন করা, খেতির কাজে সাহায্য করা ইত্যাদি কাজে কোন আলসেমি ছিল না তার। কিন্তু রাত হলেই সে হয়ে উঠতো মোহিনী। তখন সে হ'ত বুটার শয্যাসঙ্গিনী। এমনি করে বুটার সংসারে নতুন জীবনের আবর্ত আনলো মেয়েটা। ষোল মাইল দূরবর্তী গ্র্যাণ্ড ট্র্যাংক রোড দিয়ে তখন বয়ে চলেছে বিপর্যস্ত আশ্রয়হীন মানুষের নিরবচ্ছিন্ন স্রোত। আর তারই পাশে পড়ে থাকা এই বারো বিঘার খেতিজমিটা যেন বিদ্বেষদীর্ণ মানুষের ওই ঢল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক অনন্য ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে বিরাজ করতে লাগলো। দুটি অসম বয়সী নরনারী তখন কোন ধর্মেরই অনুশাসনের তোয়াক্কা না করে স্বর্গ রচনা করলো সেখানে।

অবশেষে প্রেমেরই জয় হ'ল এবং সেই জয়কে স্বীকৃতি দিতে ধর্মকেই এগিয়ে আসতে হ'ল ওদের কাছে। একদিন শরতের কাকডাকা ভোরে শিখ ধর্মীয় রীতি অনুসারে সানাইবাদ্যি বাজিয়ে আত্মীয় প্রতিবেশীদের নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বুটা সিং বিয়ে করতে এল। কনে সেই মুসলমান মেয়েটা যাকে একদিন পনেরো শ' টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছিল বুটা। আগে আগে বরবেশে চলেছে পঞ্চান্ন বছরের বুটা সিং। তার পিছনে 'গ্রন্থসাহিব' নিয়ে চলেছেন তাদের গুরু। ঘরের মধ্যে মুখ ঢেকে বসে আছে সেই মুসলমান মেয়েটি। বুটারই কিনে দেওয়া শাড়ি পরে বসে আছে

www.pathagar.com

সে। একথা মনে হতেই খুশীতে ভরে উঠলো বুটার বুক। বুটার মাথায় লাল পাগড়ি। কনের পাশে বসলো সে। শিখ ধর্মগুরু বিয়ের মন্ত্রপাঠ করে বিবাহিত জীবনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন। তখন সবাই মিলে সমস্বরে সেই মন্ত্রপাঠ করার পর বুটাও বিবাহমন্ত্র উচ্চারণ করলো পবিত্র 'গ্রন্থসাহিব' থেকে।

মন্ত্রপাঠ শেষ করার পর দাঁড়িয়ে উঠলো বুটা। তারপর নকশা আঁকা ওড়নার একটা খুঁট সে ধরলো, অন্য খুঁটটা ধরলো মুসলমান মেয়েটি। চারবার ওরা পবিত্র গ্রন্থসাহিবটি প্রদক্ষিণ করলো দুজনে। শেষবার প্রদক্ষিণ সমাপ্ত হবার সংগে সংগেই ওরা দুজনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'ল সমবেত সবাইকে সাক্ষী রেখে। ঘরের বাইরে তখন সূর্যোদয় হয়েছে। ওদের খেতিজমির মাথায় সূর্য উঠে আর একটা দিনের আগমন ঘোষণা করলো।

এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই আর একটা পরম আনন্দের বার্তা শুনতে পেল বুটা। যখন পাঞ্জাব জুড়ে তাণ্ডব চলেছে শিখদের জীবনে, তখন করুণাময় ঈশ্বরের এই অযাচিত করুণা তাদের দুজনকেই অভিভূত করে দিল। বুটা শুনলো যে তার পত্নীর গর্ভে আসছে তাদের ভবিষ্যৎ বংশধর। আনন্দে কেঁদে ফেললো তারা দুজনে। যা কোনদিন আশাও করে নি, তাই ঘটতে চলেছে তাদের হাহাকারভরা জীবনে। ভাগ্য যেন বেছে শুধু তাদের দুজনকেই এই কৃপাদাক্ষিণ্য দিলেন। কিন্তু তা নয়। হতভাগ্য দম্পতি জানতো না যে দেশভাগের কী দীর্ঘ নির্মম পরিণতি অপেক্ষা করে আছে তাদের জীবনে।

ম্যাপের গায়ে লাল রঙের গোঁজগুলো তখন সাপের মতন লক্ষ্যবস্তুর দিকে এঁকেবেঁকে চলেছে। লক্ষ্যবস্তু হ'ল একটা রিফিউজি ক্যাম্প। বস্তুত, ভারত ও পাকিস্তান উভয় সরকারের কাছে এই উম্বাস্তু স্রোত এমন এক সমস্যা যা ইতিপূর্বে অন্য কোন দেশের সরকারকে ভোগ করতে হয় নি। দুটো রাষ্ট্রেরই সীমানা জুড়ে জট পাকিয়ে আছে লক্ষ লক্ষ বাস্তুহীন, আশ্রয়হীন মানুষ। ওরা সবাই হাঁ করে চেয়ে আছে কখন অলৌকিক একটা কিছু ঘটে তাদের জীবনের সব দুঃখকষ্টের অবসান এক লহমায় ঘুচিয়ে দেবে। যেমন অলৌকিকভাবে তারা স্বাধীনতা পেয়েছে তেমনি সর্বদুঃখহারক এমন কোন ম্যাজিক কি নেই যার ছোঁয়ায় সব জ্বালার নিরাময় হয় ? অন্তত নেতারা তো পারেন তাদের মনের ক্ষত দূর করতে !

বলতে গেলে তখন সবাই চাইছিল একটা মিরাক্‌ল্‌ ঘটুক। শরণার্থী শিবিরের প্রতিটি মানুষের মনেই ইচ্ছাপূরণের সেই আশা। বিশিষ্ট সাংবাদিক ডি. এফ্‌. কারাকা যখন জলন্ধরের শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করছেন, তখন এমন একজন মানুষের দেখা পেলেন যে তাকিয়ে আছে মিরাক্‌ল্‌-এর দিকে। একজন বর্ষীয়ান শিখ একদিন তাঁকে ছেঁড়া একটা পাতায় পাকিস্তানে ফেলে আসা সম্পত্তির হিসাব লিখে তাঁর সামনে মেলে ধরলো। ঘরবাড়ি, জমিজিরেত গাইবলদ, খাটিয়া, তোশক ইত্যাদির দাম ধরে মোট সাড়ে চার হাজার টাকা দাবি করতে চায় সে। সকৌতুকে কারাকা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কার কাছে দাবি করবেন ?' বর্ষীয়ান শিখটি বললো, 'কেন, আমার গভর্নমেন্টের কাছে?' লোকটার সরলতায় ভারী মনোকষ্ট পেলেন কারাকা। খানিক পরে লোকটা নিজেই বলে উঠলো, 'সাহেব, কোথায় গেলে আমার সরকারকে পাব দয়া করে বলে দেবেন ?'

শরণার্থী শিবিরের সর্বত্রই একই রকম দুর্দশার ছবি। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে

www.pathagar.com

সবাই অপরিসীম ক্লেশ ভোগ করছে। অমৃতসর শহরের একজন শিখ ফৌজি অফিসার তাঁর গ্যারেজটিকে প্রাইভেট ক্যাম্প করেছেন। ছোট্ট ঘরখানার মধ্যে কোনরকমে বাস করছে ছ'জন মানুষ। অথচ দুমাস আগে এই মানুষগুলোই ছিল পাকিস্তানের কোটিপতি ধনী। আর একজন ফৌজি অফিসারের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল শরণার্থীদের সংগে আসার সময়। ফৌজি অফিসারটি দেখলো যে ট্রেনের মধ্যে বসে একজন সুবেশ মানুষ হাউ হাউ করে কাঁদছে। কি ব্যাপার ? অমন করে কাঁদছেন কেন ?' ভাল জামাকাপড় পরা লোকটা এবার আরও জোরে কেঁদে উঠলো। বললো, 'আমি সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি। আমার সবকিছু কেড়ে নিয়েছে ওরা।'

ফৌজি অফিসারটির কেমন যেন সন্দেহ হ'ল। জিজ্ঞেস করলো, 'সত্যি আপনার কিছু নেই।'

লোকটা বললো, মাত্র পাঁচ লাখ টাকা আছে।'

অফিসারটি তাজ্জব হয়ে গেল লোকটার কথা শুনে। বললো, 'তাহলে ত' এখনও আপনি বেশ বড়লোক !'

লোকটা মাথা নেড়ে বললো, 'উহুঁ ! ও সব ত আমার টাকা নয় ! এই টাকার পাই পয়সা পর্যন্ত আমি দান করে দিয়েছি।'

'কিন্তু দান করে দিয়েছেন কেন।'

লোকটা স্পষ্ট করে বললো, 'নেহরু ও গান্ধীকে মারবার জন্যে।'

অতিকায় এই উদ্বাস্তু স্রোত সামলানো তখন এক অবিশ্বাস্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন। লক্ষ লক্ষ মানুষগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তখন দরকার হচ্ছে হাজার হাজার তাঁবু, কম্বল, প্রতিষেধক টিকা এবং খাবারদাবার। সুতরাং এদের যোগান নিয়মিত রাখতে যত স্বেচ্ছাসেবীর দরকার তাদের সংখ্যাও নগণ্য নয়। তাঁবুগুলোর মধ্যে বিপজ্জনকভাবে অনেক মানুষ আশ্রয় নেওয়ায় স্থান সংকুলান হচ্ছে না সকলের। মানুষের ভিড়ে উথলে পড়ছে এই সব আশ্রয়শিবির। দলে দলে মানুষ মরছে অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে বা বিনা চিকিৎসায়। জলের বুক থেকে ভেসে ওঠা সকালবেলার কুয়াশার মতন আকাশের গায়ে ছড়িয়ে পড়ছে পচা মড়ার গন্ধ। একজন শিখ ফৌজি অফিসার অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বললো, 'এ হ'ল স্বাধীনতার দুর্গন্ধ।' উদ্বাস্তু শিবিরগুলোয় পরিভ্রমণরত সাংবাদিকদের চোখে আরও কত বীভৎস ছবি ভেসে উঠেছে তখন। একজন দেখলো যে, মুমূর্ষু মায়ের পাশে বাজপাখির মতন প্রখর চোখে তাকিয়ে আছে তার ছেলে। শেষ সময়ে মায়ের সেবার জন্য যে সে বসে আছে তা নয়। সে বসে আছে কখন তার মা মরবে সেই অপেক্ষায়। মা মরলেই তার গায়ের কম্বলখানা ছোঁ মেরে টেনে নেবে সে।

গান্ধীজী ছাড়া দিল্লির আর কোন রাজনৈতিক নেতা তখন এই হতভাগ্য শিবিরবাসীদের কাছে আপনজন হতে পারেন নি. যেমন হয়েছেন বিদেশিনী শ্রীমতী মাউন্টব্যাটেন। বাদামী চুলের এই ইংরেজ মহিলাটি ওদের কাছে তখন মূর্তিমতী সেবিকা হয়ে উঠেছেন। টানটান করে পরা সেন্ট জন্ অ্যাম্বুলেন্সের পোশাকে এই শুশ্রূসাকারিণী যেন মায়ের মতন মহিমময়ী হয়ে উঠেছেন ভাগ্যহত মানুষগুলোর কাছে। দেশ বিভাগের আগে আগে সারাটা দিন যেমন চষে বেড়াতেন মাউন্টব্যাটেন ঠিক তেমনি দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন শ্রীমতী এডুইনা এই অগ্নিপরীক্ষার দিনগুলোয়। কখনও মনে হচ্ছে এই আত্মত্যাগের পরীক্ষায় হয়ত তাঁর স্বামীকেও তিনি ছাড়িয়ে যাবেন। দুরন্ত ঝড়ের মতন এক শিবির থেকে আর একটি শিবিরে ছুটে বেড়াচ্ছেন

www.pathagar.com

এড্‌ইনা। যেন অপরিচ্ছন্ন এবং দুর্গন্ধভরা শিবিরের মুমূর্ষু ও দুঃস্থদের সেবা করে তিনি তাঁর আত্মপ্রশ্রয়ী যৌবনের দীপ্তিটি সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিতে চান। শ্রীমতী এড্‌ইনা শুধু সেবাময়ী নন। তাঁর কর্তব্যবোধ, নিষ্ঠা এবং প্রতিভা মিলিয়ে হাজার হাজার পীড়িত মানুষের হৃদয়ে তিনি অম্লান দীপশিখার মতন জেগে থাকবেন চিরকাল।

রোজ সকাল ছ'টা থেকেই শুরু হয়ে যায় তাঁর কাজের ফর্দ। রাতের পাঁচঘন্টা ঘুমটুকু বাদ দিলে সারাটা দিনই তিনি হয় তাঁর নিজের টেবিলে বসে রিপোর্ট লিখতে নয়ত ক্যাম্পে ঘুরে বেড়াতে ব্যস্ত। 'পায়ে চাকা এ'টে সারা দিনটাই ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। হয় লিখছেন, পড়ছেন কিংবা কাজে অবহেলার জন্য লোকদের বকাঝকা করছেন বা তাদের কাজের ভুল শুধরে দিচ্ছেন। তখন যে কাজ করছেন তখন তার মধ্যেই নিবিড়ভাবে ডুবে যাচ্ছেন। তাঁর কাজের ধারা দেখলেই বোঝা যায় যে, এসব দায়সারা কাজ নয়। প্রতিটি শিবিরে প্রতি হাজার শরণার্থীর জন্য ক'টা জলের কল থাকা দরকার তা যেমন তিনি জানেন, তেমনি জানেন যে শিবিরের একজন আবাসিকেরও প্রতিষেধক টিকা নেওয়ায় যেন ভুল না হয়। শরণার্থী শিবিরের পরিবেশ কিভাবে স্বাস্থ্যসম্মত রাখা এবং কিভাবে আবাসিকদের মনে তার প্রয়োজন জাগিয়ে তোলা যায় সে ব্যাপারে সর্বদাই তিনি সচেষ্ট।

নেহরুর মুখ্য সচিব আয়েঙ্গার ত একটা ঘটনার কথা কোনদিনই ভুলবেন না। জরুরী কমিটির মিটিং বসবে ঠিক ছ'টায়। সারা দিন ক্যাম্প পরিদর্শন করে ঠিক ছ'টার সময়েই এড্‌ইনা এলেন সঙ্গে এ. ডি. সি. নিয়ে। ক্লান্তিতে অবশ হয়ে গেছে তাঁর দেহমন। কিন্তু এড্‌ইনার মনোযোগ একটুও শিথিল হ'ল না। পাশের ঘরে তাঁর এ. ডি. সি. তখন ঘুমে ঢলে পড়েছেন। কিন্তু ঘুম দূরের কথা মিটিংয়ের সময় এড্‌ইনাকে ঠিক আগের মতনই স্বাভাবিক মনে হ'ল। ক্লান্তি বা অবসাদের ছিটে-ফোঁটাও তাঁর শরীরে নেই। শান্তভাবে বিষয়ের গুরুত্ব বুঝে ছোট ছোট মন্তব্য করছেন। তাঁর বিস্তর অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে যে কোন সমস্যারই নিপুণ সমাধান-সূত্র বলে দিচ্ছেন। সেদিন তাঁর মতামত শুনে মনে হতে লাগলো যেন সমস্ত সমস্যার একটা বিশাল চালচিত্র তাঁর মনে সর্বক্ষণই জ্বলজ্বল করছে।

এড্‌ইনার ধাতে বিমানভ্রমণ মোটেই সয় না। তাই পারতপক্ষে বিমানে চড়তেন না তিনি। তবুও সময় বাঁচাতে প্রায়ই বিমানে চড়ে এখানে ওখানে গেছেন এবং বমির চিহ্ন লুকোবার জন্য প্রতিবার বিমান অবতরণের আগে ঠোঁটে মোটা করে লিপস্টিক লাগিয়ে নিয়েছেন। এমনকি দরকার বুঝে রাতের অন্ধকারেও রয়্যাল এয়ার ফোর্সের বীর বৈমানিকদের নিরাপত্তার নিয়মকানুনের পরোয়া না করে বিমান ছাড়তে বলেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর স্বামীর এ. ডি. সি. লেফ্‌টেন্যান্ট কমোডোর হোয়েসের মন্তব্যটাই সবচেয়ে উপভোগ্য। ঠাট্টা করে এয়ার কমোডোর হোয়েস বলেছেন, 'কোন ব্যাপারে "না" শুনলেই হার এক্‌সেলেন্‌সির জিদ বেড়ে যেত। তখন যা নিষিদ্ধ সেটাই তিনি আগে করতেন।'

এই অসাধারণ মহিলার কাছে কোন দৃশ্যই বীভৎস মনে হয় নি কখনও। কোন গরিব মানুষের ঘরদোর নোংরা অপরিচ্ছন্ন বলে তিনি এড়িয়েও যান নি। কোন কাজই যেমন তাঁর কাছে তুচ্ছ ছিল না, তেমনি কারও রোগযাতনাও তিনি ছোট করে দেখেন নি। কত কঠিন অবস্থার মধ্যেও তিনি যে কত সহজ হয়ে কাজ করেছেন, হোয়েস তা দেখেছেন। হয়ত কাদার মধ্যে গোড়ালি ডুবে গেছে

www.pathagar.com

তবুও কলেরায় আক্রান্ত মরণাপন্ন রোগীর পাশে থেবড়ে বসে তার শুশ্রূষা করেছেন। তার জ্বরে পুড়ে যাওয়া কপালে মমতাময়ীর মতন হাত বুলিয়ে তার বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছেন।

ভারত ও পাকিস্তান নামক দেশ দুটো তখন সেই বেদনাময় দিনগুলোতে যেন ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কালো মেঘের কোলেই বিদ্যুতের ঝিলিক দেখা যায়। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তের সেই ভয়ংকরতার গহ্বর থেকে কত যে মহাপ্রাণ মানুষের আবির্ভাব হয়েছে কেউ তার হিসাব রাখে না। এরা কেউ তথাকথিত মহামানব নন। কারো বীরত্বকথা নিয়ে মহাকাব্য রচিত হবে না কোনদিন। সময়ের পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত সবাই ভুলে যাবে এদের কত স্মরণীয় কাজের অনুষঙ্গ। তবুও এইসব অবজ্ঞাত মানুষের আত্মত্যাগে সমৃদ্ধ সেই কালো দিনগুলোই যেন মানুষের ইতিহাসের সবচেয়ে মহার্ঘ অংশ। তাই অমৃতসর শহরের হিন্দু পুলিস অফিসার অশ্বিনীকুমারের রিপোর্টে সেই মহার্ঘ অনুভবটিই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যখন তিনি লেখেন, 'সেই নরককুণ্ডে ধাতস্থ থাকার তখন একটাই পথ খোলা ছিল, আর সেটা হ'ল যে প্রতিদিন অন্তত একজন মানুষকে প্রাণে বাঁচানোর চেষ্টা করা।' অশ্বিনীকুমার নিজেও তাই করেছিলেন। অক্লান্তভাবে দিনের পর দিন আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে মানুষের জীবনরক্ষা করেছেন এবং সফল হয়েছেন। তাঁর এই সার্থক আত্মবিসর্জন যে বিফল হয় নি তার প্রমাণ অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও এই অমূল্য প্রত্যয়টি প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল সেদিন। এইভাবেই কত শিখ পুলিস কত মুসলমানের জীবনরক্ষা করেছে। হিন্দু বাঁচিয়েছে মুসলমানকে এবং মুসলমান বাঁচিয়েছে শিখকে। ফ্রন্টিয়ার রাইফেল্‌স্‌-এর একজন মুসলমান ক্যাপ্টেন তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের মানুষের রোষ থেকে একটা শিখ উদ্বাস্তুদলকে রক্ষা করতে গিয়ে যেমন জীবন দিলেন, তেমনি ২২ বছরের মুসলমান রেলকর্মী আহ্‌মেদ আনোয়ারকেও প্রাণে বাঁচাল কয়েকজন সুস্থ মনের হিন্দু।

ক্রমে ধীরে ধীরে সেই অরাজক অবস্থা কেটে গিয়ে শান্তিশৃংখলা ফিরে আসতে লাগলো। দুটো রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীতেও ধীরে ধীরে ডিসিপ্লিন ফিরে এসেছে তখন। শরণার্থী শিবিরের অসহায় মানুষদের রক্ষা করার ব্যবস্থাদি আরও সক্রিয় করা হলো। ইমার্‌জেন্‌সি কমিটির কাজকর্মের ভূয়সী প্রশংসা করলেন নেহরু। বললেন, 'যে কোন নতুন সরকারের কাছে প্রশাসনিক শিক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম হল এই কমিটি।' ধীরে ধীরে পাঞ্জাবের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হয়ে উঠতে লাগলো। উদ্বাস্তু স্রোতের সেই উগ্রতা তখন কমছে। বিপন্ন মানুষের সেই তাড়া খাওয়া বা আতঙ্কিত হয়ে ছুটে পালানোর ভাবটা আর নেই। যথার্থ অবস্থাটা বোঝা গেল ইনটেলিজেন্স বিভাগের রিপোর্ট থেকে। তারা লিখলো, 'অন্তত চলন্ত ট্রেনের কামরা থেকে মুসলমান রিফিউজিদের বাইরে ছুঁড়ে ফেলার ঝোঁক অনেকটা কমেছে।'

তবে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের জন্য যে শেষ অভিশাপটি অপেক্ষা করে ছিল এবার সেটি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো বিপন্ন লোকগুলোর মাথায়। এমনই নির্মম এই বিচার যে মনে হ'ল পাঞ্জাবের দেবতামণ্ডলী কুপিত হয়ে তাঁদের অভিশাপটি ছুঁড়ে দিলেন মানুষগুলোর দিকে। এতদিন আকাশের বুক থেকে আগুন ঝরে পড়ছিল। তখন মানুষ আকুল হয়ে কৃপাবারি চেয়েছে। সেই কৃপাবারি প্রবল হয়ে ঝরে

www.pathagar.com

পড়লো এবার। ভীমবেগে জল-স্থল-অন্তরীক্ষ কাঁপিয়ে বর্ষা নামলো। এ এমন বর্ষণ যা গত পঞ্চাশ বছরে পাঞ্জাবে দেখা যায় নি। মনে হল কুপিত দেবতারা মানুষের উদ্দেশ্যে শেষ অভিশাপটি ছুড়ে দিয়েছেন। আর সেই প্রবল জলস্রোতে উথলে উঠলো পঞ্চনদের শুকনো বুক। যে জলধারায় পুষ্ট হয়েছে এই ভূখন্ড, সেই জলধারাই যেন অভিশাপ হয়ে লন্ডভন্ড করে দিল মানুষের সব সম্বল। আধমরা মানুষগুলোকে হত্যা করার সর্বশেষ হাতিয়ার হল পঞ্চনদের জলস্ফীতি।

হিমালয়ের গা বেয়ে নামার সময় বরফগলা জলে স্ফীতকায়া নদীগর্ভ তখন আকাশ থেকে ঝরে পড়া বর্ষার জলে থইথই করছে। সমতলভূমিতে নেমে প্রায় একতলার সমান উঁচু হয়ে গেল জলরাশি। গ্রীষ্মের সময় যে জলধারা সরু খাতে বইছিল এখন সেখানে দুরন্ত বন্যা। ক্ষ্যাপা, উন্মত্ত জলরাশি যেন রুদ্রনৃত্যে করতালি দিতে দিতে দুকূল ছাপিয়ে ছুটে চলেছে। ব্রিটিশ সরকারের তৈরি করা বন্যারোধের সবরকম সংকেত সরঞ্জাম তখন বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। তাই হঠাৎই ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখের সন্ধ্যে নাগাদ একতলার সমান উঁচু-হয়ে বন্যার জল ঝাঁপিয়ে পড়লো সারা পাঞ্জাবের বুকের ওপর। নদীতীর ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়লো ক্রুদ্ধ জলরাশি। আর নদীতীরে আশ্রয় নেওয়া হাজার হাজার ছিন্নমূল মানুষকে গ্রাস করলো বন্যার ক্রুদ্ধ জল। তারা তলিয়ে গেল অথই জলে।

বিয়াস নদীর শুকনো তীরে রাতটুকু কাটাবার জন্য আশ্রয় নিয়েছে আবদুল রহমান আর ছেলেমেয়েরা। সঙ্গে গ্রামবাসীরাও রয়েছে। উদ্বাস্তু শিবিরগুলোয় তখন স্বস্তির হাওয়া বইছে। আর মাত্র পঞ্চাশ মাইল হাঁটতে পারলেই নিরাপদে পাকিস্তান সীমান্তে তারা পৌঁছে যাবে। মনে মনে সেই সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে তারা। হায় নিয়তি! কে জানতো আর খানিক পরেই বিয়াসের উন্মত্ত জলরাশি আছড়ে পড়বে তাদের ওপর এবং নির্মম নিষ্ঠুর অন্ধকারে তলিয়ে যাবে তারা।

শিবিরের বাইরে একখন্ড উচু জমির ওপর বলদ গাড়িখানা একটা খোঁটার সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল রহমান। মাঝরাত নাগাদ হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল তার। মেঘের ডাকের মতন একটা গম্ভীর আওয়াজ কানে গেল তার। খানিকটা শুনেই সে বুঝলো যে এটা মেঘের ডাক নয়। দূর থেকে ভেসে আসছে ফেনিল জলরাশির ক্রুদ্ধ গর্জন। ক্ষ্যাপার মতন উন্মত্ত হয়ে তেড়ে আসছে প্লাবন। এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করলো না আবদুল রহমান। তাড়াতাড়ি বউ ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রায় হাতড়ে হাতড়ে পৌঁছাল তার বলদগাড়ির কাছে। থমথম করছে কালো রাত চারপাশে। ততক্ষণে নদীতীর ছাপিয়ে জলরাশি ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। কোনরকমে সবাইকে নিয়ে সে তখন উঠে পড়েছে গাড়ির ওপর। দেখতে দেখতে বন্যার জল তখন ছাপিয়ে উঠেছে চাকার নেহাই পর্যন্ত। ক্রমে আরও বাড়লো বন্যার জল। প্রথমে পুরো চাকা ডুবলো। তারপর বলদগাড়ির পাটাতন। শেষমেশ মানুষগুলোর বুক পর্যন্ত বন্যার জল উঠে স্থির হল। সেই অবস্থায় দুদিন কাটলো তাদের। চারপাশে থইথই জল—চিত্ত বিকল করা জল। না খাবার না পানীয়। ঠান্ডায় কাঁপুনি ধরে গেছে শরীরে। প্রবল স্রোতে ভেসে যাচ্ছে অসংখ্য মানুষ তার পশুর শব, ভাঙা শকটের টুকরো, আরও কত কি!

সারা নদীটা তোলপাড় করে তখন বন্যার জল হিংস্র গর্জন করতে করতে ধেয়ে চলেছে। তাদের গর্জন শুনে মনে হচ্ছে বিয়াস নদীর সেতুটার থামগুলোর ঝুঁটি ধরে উপড়ে ফেলবে ক্রুদ্ধ জলরাশি। দেখতে দেখতে রেলসেতুটা ডুবে গেল প্লাবনের

www.pathagar.com

জলে। প্লাবনের জলে ভেসে যাচ্ছে বলদ, মানুষ কিংবা শকট। কোথাও বা প্রবল স্রোতে বাহিত হয়ে তীরের মতন ধেয়ে চলেছে আস্ত বলদগাড়িটা। তারপর সেতুর থামের গায়ে ধাক্কা লেগে দেশলাই বাক্সর মতন শতখান হয়ে গেল। মার্কিন সংবাদ-লেখিকা মার্গারেট বুর্ক হোয়াইট আশ্রয় নিয়েছিলেন ইরাবতী (Ravi) নদীর তীরে। কিন্তু হঠাৎ জল বেড়ে তাঁর কোমর ডুবে গেল। তখন ভারতীয় সেনা-বিভাগের একজন অফিসারের তৎপরতায় সে যাত্রা তাঁর জীবন রক্ষা পায়। পালিয়ে বাঁচলেন মার্কিন লেখিকা। দিন দুই পরে যখন বন্যার জল সরে গেল তখন ফিরে এলেন মার্কিন লেখিকা সেই পরিত্যক্ত নদীতীরে। কিন্তু যে দৃশ্য দেখলেন তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। রেলের উঁচু লাইন আর নদীর মধ্যে যে জমিটুকুর ওপর মুসলমান শরণার্থীরা আশ্রয় নিয়েছিল সেখানে জীবনের কোন স্পন্দন নেই। ঠিক যেন যুদ্ধক্ষেত্রের মতন হা হা করছে মাঠটা। এখানে ওখানে উল্টে পড়ে আছে ভাঙা গাড়ি আর ঘর গেরস্থালির জিনিসপত্র। দোমড়ানো মোচড়ানো অবস্থায় পড়ে আছে সেগুলো। জলে কাদায় তাল পাকিয়ে পড়ে আছে অসংখ্য মানুষের শব। সেদিন এই নিষ্ঠুর প্রাকৃতিক তান্ডবে মোট চারহাজার শরণার্থীর মধ্যে মাত্র একটি হাজার মানুষ কোনক্রমে প্রাণে বেঁচে যায়।

এই বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্যটি যেন নির্মম এক প্রতীক দৃশ্য। অন্তত গুরুচরণ সিং নামে শিখ পুলিস অফিসারের চোখে এই দৃশ্যটি এক নিবিড় ব্যথার প্রতীক হয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবে। অবশেষে রাত পেরিয়ে সকাল হ'ল। বন্যার জল তখন ক্রমেই সরছে। সকালের সেই নরম আলোয় গুরুচরণ সিং একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পেল। একটা প্রকান্ড গাছের ডালে একজন গোর্খা সৈন্যর শবদেহ ঝুলছে আর গৃধ্রশকুনের দল কেমন নিপুণতার সংগে তার শরীর থেকে মেদমাংস খাবলে খাচ্ছে।

*   *   *

ওই ক'টি ভয়ংকর সপ্তাহে ঠিক কতজন মানুষের জীবননাশ হয়েছিল তার সঠিক তত্ত্ব কারোরই জানা নেই। একে চতুর্দিকের অরাজক, বিশৃংখল অবস্থা, তায় ভাঙাচোরা প্রশাসন—সুতরাং সঠিক চিত্র পাওয়া প্রায় দুষ্কর হয়ে ওঠে। ঠিক কতজন মানুষ রাস্তায় পড়ে মরেছে, কতজনকে কুয়োর মধ্যে ফেলে বধ করা হয়েছে কিংবা ঘরে আগুন ধরিয়ে কতজনকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে, সঠিকভাবে সেই হিসাব জানার কোন উপায়ই নেই। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রেই কিছু অতিরঞ্জিত হিসাবের ওপর নির্ভর করতে হয়। যেমন, অসমর্থিত একটি হিসাব মতে আমরা জেনেছি যে, পাঞ্জাবের সেই সেপ্টেম্বরের দাংগায় নিহত মানুষের সংখ্যা দশবিশ লাখের মতন। নিঃসন্দেহেই হিসাবটিকে বিকৃত বলা যায়। কারণ গণহত্যার এই খতিয়ান কোন গবেষণা থেকে আহৃত হয় নি। এই প্রসংগে প্রথম যে সরকারি হিসাবটি পাই তা সংগৃহীত হয়েছে বিচারপতি গোপালদাস খোশলা রচিত 'স্টার্ন রেকনিং' গ্রন্থ থেকে। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি এই গণহত্যার একটি সঠিক খতিয়ানের চেষ্টা করেছেন। বিচারপতি খোশলার মতে সেদিনের দাংগায় মোট নিহতের সংখ্যা পাঁচ-লাখ। অবশ্য দুজন ব্রিটিশ ঐতিহাসিক গবেষকের মতে এই সংখ্যাটি যথাক্রমে দুই এবং আড়াই লক্ষ। এঁদের মধ্যে প্রথমজনের নাম পেন্ডেরেল মুন। তিনি তখন পাকিস্তানেই বসবাস করছিলেন। তাঁর রচিত 'ডিভাইড অ্যান্ড কুইট' গ্রন্থে মুন সাহেব নিহত মানুষের যে হিসাব দিয়েছেন তা দুলাখ। অন্য গবেষকের নাম এইচ.

www.pathagar.com

ভি. হড্‌সন্। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'দ্য গ্রেট ডিভাইড' গ্রন্থে এই সংখ্যাটি আড়াই লক্ষ। এই প্রসঙ্গে আর একজন ভারতীয়ের নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি হলেন স্বাধীন ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের প্রথম রাজ্যপাল। তাঁর নাম স্যর চন্ডুলাল ত্রিবেদী। তাঁর হিসাব মতে এই গণহত্যার সংখ্যা ২ লাখ ২৫ হাজার।

তবে নিহত মানুষের সঠিক সংখ্যা জানা না গেলেও শরণার্থী আগমনের সঠিক সংখ্যা অন্তত জানা যায়। সারাটা শরৎকাল এবং শীত মরসুম ধরে এই উদ্বাস্তু-স্রোত প্রবাহিত হয়েছে। এক হপ্তায় পাঁচ লক্ষ, পরের হপ্তায় সাড়ে সাত লক্ষ গৃহহারা মানুষ এই অভিপ্রয়াণে শামিল হয়েছে। এইভাবেই মোট এক কোটি পাঁচ লক্ষ মানুষ দেশভাগের পর এদেশে এসেছে। এর সঙ্গে যোগ করা যায় আরও দশ-লক্ষ বাংলাদেশী শরণার্থী।

মোটকথা, পাঞ্জাবের এই ভয়াবহ শরণার্থী সমস্যা অনিবার্য ভাবেই সর্বশেষ ভাইসরয় এবং ভারতীয় নেতাদের প্রায় কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিল। নিন্দের ঝড় বয়ে গেল সারা ইংল্যান্ডে। লন্ডন থেকে স্যর উইন্‌স্টন চার্চিল, যিনি বরাবরই ভারতকে স্বাধীনতা দেবার বিপক্ষে, পালাবদলের এই হটকারী সিদ্ধান্তে তুলকালাম কান্ড করলেন। লক্ষ লক্ষ বিপন্ন মানুষের হয়রানি দেখে আত্মসন্তুষ্টি আর চাপা দিতে পারলেন না ভদ্রলোকটি। সমালোচনার বর্শাফলকটি উদ্যত করে দাপিয়ে বলে বেড়াতে লাগলেন যে, 'ব্রিটিশ ক্রাউনের উদার, নির্ভীক এবং নিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থার অধীনে থেকে কত সুখেই না বংশপরম্পরায় ঘরসংসার করে এসেছে মানুষগুলো। আর এখন এদের দুরবস্থা দেখ! 'হিংস্র নরখাদকের মতন পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে।' হায়! কি কুক্ষণেই না ওরা স্বাধীন হয়েছে!

কিন্তু চার্চিলের কথা থাক। ক্লিমেন্ট এ্যাট্‌লী কি বলেন? তাঁর মনেও কি এই ধন্দ? হ্যাঁ, তাই। বস্তুত, সর্বক্ষণই তাঁকে সংশয়টা পীড়া দিয়েছে। তাই অক্টোবরের গোড়াতেই লর্ড ইস্‌মেকে ডেকে পাঠালেন তিনি। আচ্ছা! ভারতকে তড়িঘড়ি স্বাধীনতা দিয়ে কি ভুল পদক্ষেপ নিয়েছে ব্রিটেন? লর্ড ইস্‌মে চুপ। কি বলবেন তিনি? যা ঘটবার তা ঘটেছে। তড়িঘড়ি ব্যবস্থা না নিলে কি ঘটতো তার যথার্থ উত্তর হয় না। দেশকে সর্বনাশ থেকে বাঁচাতেই মাউন্টব্যাটেন এই ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। কিন্তু কে জানতো যে শিব গড়তে বাঁদর হবে। তাছাড়া, শুধু তিনি একা নন। তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নিতে সবাই পীড়াপীড়ি করেছে তাঁকে। জিন্না বার-বার চাপ দিয়েছেন। বলেছেন, আসল কথা হ'ল 'স্পিড'। অর্থাৎ যা করার এখনই করা দরকার। বল্লভভাই ত দর কষাকষি করে বলেই বসলেন যে, সত্বর ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা না করলে রাষ্ট্রমন্ডলের (কমনওয়েলথ) সভ্য হতে রাজী হবে না তাঁর কংগ্রেস দল। প্রায় হুমকি দিলেন নেহরুও। মাউন্টব্যাটেনকে সতর্ক করে বললেন যে গড়িমসি করলে দেশ রসাতলে যাবে। তখন সব দায় ঘাড়ে নিতে হবে তাঁকেই অর্থাৎ মাউন্টব্যাটেনকে। এমনকি স্বয়ং গান্ধীজীও, তাঁর দেশভাগের বিরোধিতা সত্ত্বেও, মাউন্টব্যাটেনের ওপর চাপ দিয়ে বললেন যে, একটাই রাস্তা খোলা আছে এবং সেটি হ'ল ইংরেজের সত্বর ভারত ত্যাগ। তাঁর পূর্ববর্তী বড়লাট লর্ড ওয়াভেলও এর গুরুত্ব বুঝেছিলেন। আর সেইজন্যই তাঁর বিখ্যাত 'অপারেশন ম্যাডহাউস' ছকটি সুপারিশ করে প্রদেশগতভাবে ইংরেজের ভারত-ত্যাগের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তবে মাউন্টব্যাটেন নিজেও গুরুত্ব বুঝেই এই কাজ করেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন যে ১৯৪৭ সালের যে ভারতবর্ষে তিনি পা

www.pathagar.com

দিয়েছেন, সেই অরাজক আর বিশৃংখল দেশে অন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া সুবিবেচনার কাজ হ'ত না। অন্য যে ব্যবস্থাই তিনি নিতেন দেশময় বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়তো। আর ব্রিটিশ রাজকোষের তখন এমন 'বাড়ন্ত' অবস্থা যে বিদ্রোহের আগুন নেভানোর মতন পুঁজি বা ইচ্ছে কোনটাই ছিল না ব্রিটিশ সরকারের।

অবশ্য দেশভাগ-চুক্তির যে প্রতিক্রিয়া আশা করা গিয়েছিল তার চেয়ে অনেক ভয়ংকর চেহারা নেয় পাঞ্জাব। সত্যি কথা বলতে কি, পরিণতি যে এতটা খারাপ হবে সে কথা ঘুণাক্ষরেও মাউন্টব্যাটেনের বিশেষজ্ঞরা টের পায় নি। পাঞ্জাবের অবস্থা সামাল দিতে পঞ্চান্ন হাজার সেনা নিয়ে যে বাউন্ডারি ফোর্স গঠিত হয়েছিল তাদের দ্বারা কোন কাজের কাজই হয় নি। ভীতিকর অবস্থার দাপটে প্রায় নেতিয়ে পড়েছিল তারা। তবুও এ যেন মন্দের ভাল। কেননা যত বীভৎস এর আকার হ'ক না কেন, মাত্র একটা প্রদেশের চৌহদ্দির মধ্যেই এই অরাজকতা সীমাবদ্ধ ছিল। সারা ভারতের মোট জনসংখ্যার মাত্র এক দশমাংশ মানুষ সরাসরি আক্রান্ত হয়েছিল এই সাম্প্রদায়িক আলোড়নে। মাউন্টব্যাটেন নিশ্চিত ছিলেন যে অন্য কোন পদক্ষেপের ঝুঁকি সারা দেশকেই পাঞ্জাবের মতন অরাজক ও বিশৃংখল করে দিতে পারতো।

পরের ক'টি মাস দেশভাগের হতভাগ্য বলি লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর কাছে নির্মম অপেক্ষার কাল। তীর্থকাকের মতন মানুষগুলো হাহাকার করছে একটু ঠাঁই পাবার আশায়। স্বাধীন হবার যথাযোগ্য মূল্য ত তারা দিয়েছে! আরও কত দাম দেবে তারা? হতাশা আর ক্ষোভে নেতিয়ে পড়া মানুষগুলোর মনে এই অভিজ্ঞতার ছাপ বড় কটু। তাই সেই শরতের কোন এক শরণার্থী শিবিরে বন্দী মানুষগুলোর বিদ্রোহী কণ্ঠস্বর যখন চীৎকৃত হ'ল, তখন চমকে উঠলো কর্তব্যরত একজন ব্রিটিশ অফিসার। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর মানুষগুলো তখন চিৎকার করে বলছিল, 'ইংরেজরাজ ফিরিয়ে দাও!'

www.pathagar.com

'কাশ্মীর শুধু কাশ্মীর।'

কাশ্মীর, ২২-২৪ অক্টোবর ১৯৪৭

শ্রীনগর শহরে মহারাজার ঝলমলে দরবার কক্ষে তখন ভারী ধুমধামের সংগে শতাব্দী প্রাচীন হিন্দু উৎসবের শেষ অনুষ্ঠান চলছে। কাশ্মীর রাজপরিবারে এই শারদ উৎসব খুবই শ্রদ্ধার সংগে শতাধিক বছর ধরে পালিত হয়ে আসছে। দেবী দুর্গার সংগে মহিষাসুরের ন'দিন ব্যাপী যুদ্ধের শেষদিনের অনুষ্ঠান আজ। ২৪শে অক্টোবর তারিখে নবরাত্রি উৎসবটি সমাপ্ত হবে অধীনস্থ রাজা ও ভূস্বামী-দের আনুগত্যের শপথপত্র হাতে পেয়ে। এটাই প্রথা। কাশ্মীরের মহারাজা সিংহাসনে আরূঢ় থাকবেন এবং অধীনস্থ জমিদার ও ভূস্বামীগণ একে একে হাজির হয়ে রাজানুগত্যের প্রতীকস্বরূপ রেশমী রুমালে মোড়া একখানি স্বর্ণখন্ড মহারাজার হাতে তুলে দেবেন। শারদ উৎসবের এই সর্বশেষ অনুষ্ঠানটিই সেদিন দরবারকক্ষে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল মহারাজা হরি সিংহর সামনে।

মহারাজা হরি সিং সত্যিই ভাগ্যবান। তাই এই ডামাডোলের মধ্যেও কাশ্মীরের তক্তাউসটি আঁকড়ে ধরে রাখতে পেরেছেন। দাম্ভিক রাজন্যকুলের মধ্যে তাঁরা মাত্র তিনজনই দেশীয় রাজা যাঁরা এখনও পর্যন্ত টিকে থেকে এই বিরল অধিকারটি ভোগ করে চলেছেন। অপর দুজন হলেন জুনাগড়ের নবাবসাহেব, যাঁর রাজ্যাধীনে মানুষের চেয়ে কুকুরের দাম বেশী। অন্যজন হলেন হায়দ্রাবাদের নিজামবাহাদুর। ভৌগোলিক বা তাত্ত্বিক কোন যুক্তির পরোয়া না করেই ভারতীয় পরিসীমার মধ্যে অর্গলবন্ধ জুনাগড় স্টেটটি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার সব চেষ্টা বিফল হয়ে যাওয়ায় ভারী হতাশ হয়েছেন নবাব সাহেব। ক্ষ্যাপাটে নবাবের নবাবিয়ানার দিন যে শেষ হতে চলেছে নবাব সাহেব তা বেশ বুঝতে পেরেছেন। হয়ত দিন পনেরোর মধ্যেই ভারতীয় সেনাবাহিনী অভিযান করে ঢুকে পড়বে এই ছোট্ট জুনাগড় রাজ্যটিতে। নবাব সাহেবকে সময়টুকু দেওয়া হয়েছে যাতে একখানা বিমান ভাড়া করে বেগম সাহেবা এবং সাধের সারমেয়বাহিনী নিয়ে তিনি পাকিস্তানে চালান হতে পারেন। হায়দ্রাবাদের নিজামবাহাদুরের অবস্থাও তথৈবচ। তাঁরও নবাবিয়ানার দিনক্ষণ বুঝি শেষ হতে চলেছে এবার। তাঁর সাধের হায়দ্রাবাদের স্টেটটিকে স্বাধীন, স্বশাসিত করার লম্বা লড়াইয়ের কোন সুফলই হয় নি। নিজামের এই বে-আক্কেলে বায়না কানেই তোলেনি ব্রিটেন বা ভারত। সুতরাং যা অনিবার্য তা-ই ঘটতে চলেছে। অর্থাৎ সর্বশেষ বড়লাট-বাহাদুরের ইংল্যান্ড ফেরার আগেই স্বাধীন ভারতের সংগে গাঁটছড়া বাঁধতে চলেছে হায়দ্রাবাদ।

কূটনৈতিক উদরপীড়ার গ্লানি থেকে অনেকদিনই আরাম হয়েছেন কাশ্মীরের রাজা হরি সিং। অবশ্য সেদিন এই রোগের বাহানাটুকু না করলে মাউন্টব্যাটেনের ফাঁদ থেকে কিছুতেই রেহাই পেতেন না রাজাসাহেব। সেক্ষেত্রে ১৫ আগস্টের মধ্যেই হয়ত ভারত বা পাকিস্তানের সংগে অংগীভূত হবার সিদ্ধান্ত নিতে হ'ত তাঁকে। ভাগ্যিস এই চাতুরীটুকু তিনি সেদিন করেছিলেন! এখন তাঁর মনে

www.pathagar.com

হচ্ছে সংকটটুকু বোধহয় কেটে গেছে। তাই পরম সোয়াস্তিতে রাজসিংহাসনের ওপর তিনি বসে থাকতে পারছেন। মাথার ওপর ঝলমল করছে সোনার ছাতা। ফোটা পদ্মফুলের মতন দেখতে এই সিংহাসনে বসে থাকাটা আজ আর তাঁর কাছে বিড়ম্বনা মনে হচ্ছে না। রাজাসাহেব মাথায় পরেছেন হীরকখচিত উষ্ণীষ। গলায় দুলছে বহুমূল্যবান একখানি মুক্তার হার। কণ্ঠভরণের ঠিক মধ্যিখানে ঝলমল করছে হলুদ রঙের একখানি মণি। কাশ্মীর রাজপরিবারের বড়ই গর্বের ধন এই মরকত মণিখানি। রাজসিংহাসনে আরূঢ় হয়ে রাজা হরি সিংহ মশগুল হয়ে আছেন তাঁর কল্পনায়। এখনো তাঁর ধারণা যে ত্রিকা নদীর তীরে পুরনো বন্ধু মাউন্টব্যাটেনের কাছে মনের যে বাসনা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন, এবার তা সফল হবে। মাত্র ষাট লক্ষ মুদ্রামূল্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে তাঁর পূর্ব-পুরুষরা যে পার্বত্য জমিদারিটুকু কিনে নিয়েছিলেন, তার অধিকার তাঁরই অক্ষুণ্ণ থাকবে। এমন নয়নাভিরাম পার্বত্য জমিদারির হাতবদল হবে না। তিনিই থাকবেন এর রাজামশাই হয়ে এবং বৎসরান্তে একবার পাহাড়ি ছাগের ঘাড়ের লোম থেকে তৈরি 'পশমিনা' পশমের তৈরি ছ'খানা শালবস্ত্র ভেট দিয়েই এই সুখের জমিদারিটুকু দিব্যি বজায় রাখতে পারবেন তিনি। হায় রাজামশাই ! এই মধুর সুখস্বপ্ন যে কত অলীক তার হদিসটুকুও জানা ছিল না তাঁর। আটচল্লিশ ঘণ্টা সময়ও কাটবে না। তার আগেই কল্পনার ঝুঁটি ধরে নাড়া দিয়ে এই অলীক স্বপ্নটুকু চুরচুর করে ভেঙে দেবে নির্মম বাস্তব।

বস্তুত তাই-ই হলো। আলোকোজ্জ্বল 'দরবার' কক্ষে সম্ভ্রান্ত জমিদার ও ভূম্যধিকারীরা যখন মহারাজা হরি সিংহর কাছে তাদের আনুষ্ঠানিক শিষ্টাচার নিবেদন করতে ব্যস্ত, ঠিক তখনই শ্রীনগর থেকে পঞ্চাশ মাইল পূবে ঝিলম নদীর তীরে একটা মস্ত বাড়ির মধ্যে অন্তর্ঘাতের দারুণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতে দেখা গেল কিছু মানুষকে। নানারকম ভারীভারী যন্ত্রপাতিভরা এই ভবনটিই হ'ল কাশ্মীরের পার্বত্য উপত্যকার একমাত্র পাওয়ার স্টেশন। শ্রীনগর থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী এই জায়গাটার নাম 'মহুরা'। বাড়ির মধ্যে ঢুকে একজন তখন যন্ত্রপাতির সঙ্গে ডিনামাইটের ছড় লাগাচ্ছিল। কাজটা শেষ হতেই চীৎকার করে সে সবাইকে সাবধান করে দিল আগে। তারপর পলতের মুখে আগুন ধরিয়ে বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে এল সে। ঠিক দশ সেকেণ্ড সময় পরেই সশব্দে ফেটে গেলো ডিনামাইট। টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল 'মহুরা' পাওয়ার স্টেশন এবং পাকিস্তান সীমান্ত থেকে লাদাখ্ পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল অন্ধকারে ডুবে গেল তখনই।

ওই একটা ভয়ংকর ধাক্কাতেই মুখ থুবড়ে পড়লো 'দরবার'কক্ষের ঝলমলানি। দপ্ করে নিভে গেল হাজার ঝাড়বাতির রোশনাই। তবে শুধু 'দরবার'ই নয়, একটা বোবা অন্ধকার তখন সারা শ্রীনগর শহরটাকেই গ্রাস করেছে। অমন রমণীয় শহরটার ঘাড়ের ওপর যেন লাফিয়ে পড়লো ওত্ পেতে থাকা অন্ধকারটা। সবাই অবাক। ডাল হ্রদের বুকের ওপর ফুলের সাজে সজ্জিত হাউসবোটগুলোয় প্রমোদভ্রমণরত বিদেশীরাও হতভম্ব। ব্যাপার কী ? হঠাৎ কেন এমন রহস্যময় অন্ধকারে ডুবে গেল শহরটা ? কয়েক শ' বয়স্ক ইংরেজ পুরুষ ও রমণী বেশ বিপাকে পড়ে গেল এই হঠাৎ অবস্থান্তরে। এদের অধিকাংশই অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মচারী বা সিভিলিয়ান চাকুরে। তাদের কাছেও কারণটা সুস্পষ্ট

www.pathagar.com

হ'ল না। তবে সহজাত বোধ দিয়ে এটুকু উপলব্ধি করলো যে এখন থেকে এই সুরম্য পাহাড়ি রাজ্যটি ইংরেজ বুড়োবুড়িদের নিরাপদ প্রমোদভ্রমণের উপযুক্ত থাকবে না। আজকের ঘটনা যেন তারই অশুভ ইংগিত। ফুলে ছাওয়া ভূস্বর্গ কাশ্মীরের নিবিড় হাতছানি, তার ঝলমলে সূর্যালোকে ডুবস্নান—এ সবেরই এবার বুঝি শেষ। মাসে মাত্র তিরিশ পাউন্ড ব্যয় করে সম্রাট জাহাংগীরের মতন সুখ-স্বপ্নে বিভোর হয়ে নির্ভার, নিরুপদ্রব জীবনযাপনের সুযোগ আর থাকবে না তাদের।

রাজপ্রাসাদের একখানা ঘরে বন্দী হয়ে আছেন পংগু যুবরাজ কর্ণ সিংহ। একখানা পা অস্ত্রোপচার করার দরুন নড়াচড়া বারণ তাঁর। মানুষটার কিছুই করার নেই এখন। তাই অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একটা চাপা গোঙানির শব্দ শুনে শিউরে উঠলেন যুবরাজ। অনেকদূর থেকে ভেসে আসছে এই চাপা কান্না। তিনি জানেন যে এ কান্না কার। হিমবাহ পেরিয়ে বহুদূর থেকে ভেসে আসা বাতাসের গোপন কান্না, বড় ব্যথা এই গুমরানো কান্নায়। কিন্তু শুধু বাতাসের চাপা কান্না নয়। আরও একটা অলক্ষুণে শব্দ শুনতে পেলেন যুবরাজ। শুধু তিনি নন। এ শব্দ শুনেছেন উপত্যকার অসংখ্য মানুষ। শব্দটা কানে যেতেই সর্বাংগ হিম হয়ে গেল তাঁর। তিনি জানেন এ ডাক হায়েনার। পাহাড় পেরিয়ে আসছে এই অশুভ ডাক। ওরা দল বেঁধে নেমে আসছে অন্ধকার শহরের দিকে।

শুধু ওই হিংস্র হায়েনার দলই নয়। উপত্যকার মানুষরা জানতো না যে, তখন আরও এক পাল হিংস্র শ্বাপদ শ্রীনগরের দিকে তেড়ে আসছিল অন্ধকারে। সেদিনই অর্থাৎ ২৪ অক্টোবরের রাত্রেই এক দল হিংস্র পাঠান উপজাতি কাশ্মীর উপত্যকায় ঝাঁপিয়ে পড়তে চলেছে। আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে থেকেই ওরা তৈরি হয়ে আছে। মহারাজা হরি সিংহের স্বাধীন হবার 'খোয়াব' চুরমার করতে সারা উপত্যকায় গড়িয়ে এসেছে তারা। মহারাজা আদৌ টের পান নি যে তাঁর নিজস্ব রক্ষিবাহিনীর লোকজন ইতিমধ্যেই তাঁকে বর্জন করেছে। অনেকেই পাঠান হানাদারদের দলে যোগ দিয়েছে। আবার কেউ বা প্রাণের দায়ে পাহাড়ের খানাখন্দে আত্মগোপন করেছে।

অঘোষিত এবং এই হঠাৎ অভিযানের একটু পূর্বেতিহাস আছে। মাস দুই আগে অর্থাৎ ২৪ আগস্টের ঘটনা সেটা। দিনটা শুক্রবার। এই পবিত্র দিনটিতে মহম্মদ আলি জিন্না একটা নিরীহ অনুরোধ পাঠালেন তাঁর মিলিটারি সচিব মারফত্। হপ্তাখানেক ধরে একটানা কূটনৈতিক আলোচনার চাপান-ওতরে বেশ ঠকে গিয়েছেন জিন্না। এর ওপর আছে দুর্বিষহ শ্বাসকষ্ট। তাই, শরীর মনের এই অবসাদ কাটাতে স্থির করলেন যে, ক'টা দিন কাশ্মীরের খোলামেলা নিরিবিলি পরিবেশে ছুটি কাটিয়ে আসবেন। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। ইংরেজ মিলিটারি সেক্রেটারি কর্নেল উইলিয়ম বারনীকে তলব করলেন কায়েদ-এ-আজম জিন্না এবং কাশ্মীরে তাঁর দুসপ্তাহের অবকাশ যাপনের ব্যবস্থাদি পাকা করে আসতে তাঁকে শ্রীনগরে পাঠালেন।

ফেসাদের শুরু তখনই। প্রশ্ন হ'ল যে অবসর যাপনের জন্য তিনি কাশ্মীর বাছলেন কেন? তৎকালীন রাজনৈতিক জটিলতার সংগে এই নির্বাচনের কি

www.pathagar.com

কোন সম্পর্ক আছে? বাছাইটা খুবই স্বাভাবিক ও সংগত তাঁদের কাছে, কারণ জিন্না বা তাঁর রাষ্ট্রের মুসলমান অধিবাসীর চোখে কাশ্মীরের সবটুকুই পাকিস্তানের অংশ যেহেতু এই উপত্যকার তিনচতুর্থাংশ অধিবাসীই মুসলমান।

যাহ'ক, জিন্নার ইংরেজ সামরিক দূত শ্রীনগর গেলেন মহারাজার সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে। কিন্তু অবাক কান্ড। দিন পাঁচেক পরে তিনি ফিরে এলেন মুখ ভার করে। জিন্নার অনুরোধে সায় দেন নি কাশ্মীরের হিন্দু রাজা হরি সিংহ। মহারাজা হুকুম দিয়েছেন যে কাশ্মীরের মাটিতে তাঁর অনুমতি ছাড়া পা দিতে পারবেন না জিন্না। এমনকি ট্যুরিস্ট হিসাবেও নয়। ফাঁপরে পড়লেন জিন্না। তাঁর অহংকারের ফানুসটা চুপসে গেল এক খোঁচায়। তিনি বুঝতে পারলেন যে আত্মতুষ্টির দরুন তাঁরা যা ভেবেছিলেন কাশ্মীরের পরিস্থিতি ততটা নির্বিরোধী নয়। কাশ্মীর উপত্যকাটি তাঁদের খাস দখলের জমিদারি ভেবে যে 'খোয়াব' তিনি দেখেছিলেন তা বুঝি এবার ভেঙে যায়। ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ জিন্না তখনই ডেকে পাঠালেন তাঁর ঘনিষ্ঠ অন্তরংগদের। গোপন আলোচনায় স্থির হ'ল যে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যেই পাকিস্তানের গুপ্তচর কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ করুক এবং মহারাজার আসল মতলবটি জেনে আসুক।

তাই-ই হ'ল। গুপ্তচর মারফত যা জানা গেল তা রীতিমত চাঞ্চল্যকর। পাকিস্তানের সংগে কাশ্মীরকে সংযুক্ত করার নাকি বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় মহারাজার নেই। মহারাজার এমন বাড় সইতে পারলো না পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় নেতারা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের তারাই জনক, স্রষ্টা। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই তাদের অহংকার পীড়িত হ'ল। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক নেতা লিয়াকাত আলি খান এক গোপন বৈঠক ডাকলেন। সহযোগীদের নিয়ে এই গোপন বৈঠকে মহারাজা হরি সিংহের দাম্ভিক হস্তক্ষেপ নিবৃত্ত করার উপায় ঠাওরানোর আলোচনা হলো লাহোর শহরে।,

খুবই গোপন এই আলোচনা বৈঠকে সব ষড়যন্ত্রী সভ্যরাই একমত হলো যে এখনই কাশ্মীর আক্রমণ করা হবে না। কারণ, এমন এক দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নিয়ে সরাসরি ভারতের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হবার দায় নিতে চাইবে না পাকিস্তানের সেনাবাহিনী। তবে অন্য দুটি সম্ভাবনার কথা খতিয়ে দেখা হ'ল সেই সভায়। প্রথম সম্ভাবনার সৃষ্টিকর্তার নাম কর্নেল আকবর খান্। স্যান্ডহার্স্ট সামরিক বিদ্যালয়ের এই প্রাক্তন গ্র্যাজুয়েট একজন দক্ষ চক্রী। ফন্দিবাজ ও কূটচক্রী আকবর প্রস্তাব দিল যে সরাসরি ফৌজি অভিযানের বদলে কাশ্মীর উপত্যকার মুসলমান অধিবাসীদের টাকাপয়সা ও অস্ত্রশস্ত্রের যোগান দিয়ে বিদ্রোহে উসকে দেওয়া হ'ক। হয়ত এই পন্থায় ফল পেতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হবে। অনেকগুলি মাস অপেক্ষা করতে হবে তাদের। কিন্তু পরিশেষে দেখা যাবে যে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার বিদ্রোহী কাশ্মীরি নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে শ্রীনগর শহরে জড়ো হয়েছে এবং পাকিস্তানের সংগে সংযুক্ত হতে মহারাজাকে বাধ্য করেছে।

দ্বিতীয় চক্রান্তটা আরও কূটকৌশলী। এর প্রস্তাবক এমন একজন মানুষ যিনি সীমান্ত প্রদেশের দুর্ধর্ষ পাঠান উপজাতিদের মুখ্য পরিচালক তাদের মুখ্যমন্ত্রী। দৌরাত্ম্যময় সীমান্ত প্রদেশের পাঠান উপজাতিদের মুখ্যমন্ত্রী প্রস্তাব দিলেন যে ইংরেজের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সীমান্ত সমস্যাটা পাকিস্তানের কাছে একটা বাড়তি অশান্তি। হাংগামাকারী দুর্ধর্ষ পাঠানদের

www.pathagar.com

শান্তশিষ্ট রাখতে যেমন ব্রিটিশ সরকারের নিগ্রহ হয়েছে, তেমনি নাকাল হবে নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রও। পাঠান উপজাতিদের আনুগত্য কোনদিনই প্রশ্নাতীত হবে না পাকিস্তান সরকারের কাছে। তাছাড়া সীমান্ত প্রদেশের সর্বশেষ ইংরেজ গভর্নর স্যর ওলাফ্ ক্যারো হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে, আফগান সম্রাটের চরবাহিনী ইতিমধ্যেই পাঠান উপজাতিদের মধ্যে স্বাধীন, স্বতন্ত্র পাঠান রাজ্য গড়ে তোলার এক লোভনীয় প্রস্তাব এমনভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে যে, তারা কোনদিনই করাচির বশ্যতা মেনে নেবে না। আফগান রাজ্যের সীমান্ত সিন্ধু নদের তীর বরাবর পেশোয়ার পর্যন্ত ছড়িয়ে দেবার এই প্রস্তাবে পাঠান উপজাতিদের সমর্থন চায় আফগানিস্তানের রাজা। সুতরাং এহেন সময়ে বিপজ্জনক পাঠান উপজাতিদের যদি হানাদাররূপে শ্রীনগরের দিকে চালান করা যায় তাহলে দুটো উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে। পাঠান হানাদারেরা যেমন মনের সুখে কাশ্মীরের দোকানবাজার অবাধ লুঠ করার সুযোগ পাবে এবং পেশোয়ার ছেড়ে শ্রীনগরের দিকে ঝুঁকবে, তেমনি তাদের এই অভিযানে শশব্যস্ত হবে কাশ্মীরের মহারাজা। বলাবাহুল্য। সীমান্ত প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রস্তাবটা দারুণ সমাদর পেল গোপন সভায়। সভা শেষ হবার পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কঠোর নির্দেশ দিলেন যেন সভার সিদ্ধান্ত কাকপক্ষীতেও জানতে না পারে। আরও স্থির হ'ল যে কর্মকাণ্ড চালু রাখতে যে অর্থের দরকার হবে তার যোগান দেবে গোপন মজুদ তহবিল (সিক্রেট ফন্ড)। আরও স্থির হ'ল যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী, সরকারী প্রশাসক কিংবা পাকিস্তান সরকারের কর্মরত ইংরেজ ফৌজি অফিসাররা যেন ঘুণাক্ষরেও ব্যাপারটা জানতে না পারে।

তিনদিন পরের ঘটনা। পাঁচিল ঘেরা পুরনো পেশোয়ার শহরের এক জরাজীর্ণ বাড়ির মাটির তলার ঘরে গোপন বৈঠক বসেছে। একদল পাঠান উপজাতি নেতার সামনাসামনি বসে আছে এই কর্মকাণ্ডের দায়িত্বে থাকা আসল মানুষটি। নাম, মেজর খুরশীদ আনোয়ার। আনোয়ার ফৌজি মানুষ। তবে মেস্ ফাণ্ডের টাকা তছরুপের দায়ে তার চুক্তিবদ্ধ ফৌজি চাকরি অসম্পূর্ণ অবস্থায় শেষ হয়ে যায়। পাঠান হানাদারদের শ্রীনগর অভিযানের নেতৃত্ব দেবে সেই-ই। লোকটা ফূর্তিবাজ এবং কিছুটা অবিন্যস্ত জীবনযাপনের ওপর ঝোঁক বেশি থাকায় যথেষ্ট দায়িত্বপূর্ণ মনে হয় না তাকে। তাই এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্বে আনোয়ারের বাছাই হয়ত উপযুক্ত হয় নি। সেদিন তাকে ঘিরে বসে থাকা পাঠান উপজাতি নেতারা চায়ের বাটিতে সুগন্ধী চা খেয়ে এবং হুঁকো টেনে ভারী মশগুল হয়ে আনোয়ারের কথা শুনছিল। লোকগুলোর লম্বা ঢিলা জোব্বা আর জটপাকানো দাড়ির বহর দেখে মনে হচ্ছে ওরা বোধহয় সল্ ও ডেভিডের খাস যোদ্ধা। গম্ভীর মুখে আনোয়ার তাদের কাশ্মীরের অস্থির অবস্থার কথা বলছিল। কাশ্মীরের কাফের রাজা নাকি তার দেশটাকে হিন্দু ভারতের সঙ্গে জুড়ে দিতে চাইছে। সুতরাং এখনই যদি তারা রুখে না দাঁড়ায় তাহলে আগ্রাসী ভারত অধিকার করে নেবে কাশ্মীরকে এবং লক্ষ লক্ষ বিপন্ন মুসলমান ভাই হিন্দুর কুশাসনের কবলে পড়বে। তাই বিপন্ন মুসলমান ভাইদের রক্ষার জন্য পাঠান উপজাতিরা যেন এখনই সেনাদল সংগ্রহে নেমে পড়ে। তারপর কাশ্মীরের বিপন্ন মুসলমান ভাইদের উদ্ধারের জন্য শুরু হবে তাদের পবিত্র ধর্মযুদ্ধ। তবে আনোয়ারের প্রস্তাবের মধ্যে লুকিয়ে ছিল আরও একটা লোভনীয় দিক। নিছক

www.pathagar.com

ধর্মবাইয়ের চেয়ে যার আবেদন অনেক সুস্পষ্ট তাদের কাছে। এই অভিযানে পাঠান উপজাতিরা নির্বিচার লুটতরাজের অবাধ সুযোগ পাবে। বলাবাহুল্য হানাদারদের কাছে এই সুযোগ অনেক কাম্য।

পরামর্শসভা শেষ হবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সীমান্ত প্রদেশের গ্রামে গ্রামে সেই বার্তাটি রটি গেল ক্রমে। মাটির দেওয়াল ঘেরা উঠান থেকে শুরু করে ল্যাণ্ডি কোটালের শিবির আর গোপন আস্তানায়, যেখানে যুগ যুগ ধরে তারা আগ্নেয়াস্ত্র বানাচ্ছে কিংবা চোরা-চালানের কুঠুরি—সর্বত্রই শুরু হয়ে গেল আল্লা বিপন্ন' জিগির।

কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানের এই 'জিহাদ' বা ধর্মযুদ্ধে শামিল হলো হাজার হাজার পাঠান উপজাতি। অভিযানের প্রস্তুতি শুরু হ'ল বিভিন্ন মহল্লার বাজার ঘুরে। সংগ্রহ হলো পাঠানদের প্রিয় খাদ্য শুকনো গুড়পিঠা। সারা দিনে বার-দুতিন এক মুঠো খেয়েই বেশ ক'টা দিন অভুক্ত লড়াই করতে পারে তারা। গোপন আস্তানায় জমা পড়লো হাজার হাজার আগ্নেয়াস্ত্র। ধীরে ধীরে আগ্নেয়াস্ত্র আর গোলাবারুদ নিয়ে গোপন জায়গায় মিলিত হলো পাঠানরা। এখান থেকেই শুরু হবে বিপন্ন কাশ্মীরি ভাইদের রক্ষা করার অভিযান। সেই সংগে আরও একটা লোভনীয় উদ্দেশ্য সার্থক করার প্রতিশ্রুতি পেয়েছে তারা। অবাধ লুটতরাজের ছাড়পত্র পেয়েছে পাঠানরা। সুতরাং বিপন্ন মুসলমানদের রক্ষা করাই শুধু নয়, কাশ্মীরের ঘর-বাজার লুট করার আদিম তৃষ্ণাও একই সংগে মিটতে চলেছে তাদের।

টেলিফোনের দুপ্রান্তে যে দুজন মানুষের কথা হচ্ছিল তাঁরা দুজনে শুধু ইংরেজই নন, পাকিস্তানের দুজন হোমরাচোমরা মানুষ তাঁরা। এঁদের একজন হলেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর স্যর জর্জ কানিংহাম। তাঁর পেশোয়ারের দপ্তর থেকে তিনি কথা বলছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল স্যর ফ্র্যাংক মেসারভীর সংগে। কানিংহাম বললেন, 'বুঝলে হে! 'হাল হকিকত্' দেখে আমার ত মনে হচ্ছে একটা অদ্ভুত কিছু এখানে ঘটছে।' কানিংহাম আরও বললেন যে পেশোয়ারের ভেতর দিয়ে পাঠান উপজাতিরা গলা ফাটিয়ে 'আল্লা হো আকবর' জিগির তুলে চলেছে। এরা যে কোথায় যাচ্ছে তা বোধহয় শহরের তিনি ছাড়া আর সবাই জানে। তবে তাঁর সন্দেহ নাটের গুরু তাঁরই মুখ্যমন্ত্রী। পাঠানদের ক্ষ্যাপানোর আসল ষড়যন্ত্রী হ'ল সে। সব শেষে বললেন, 'তুমি কি ঠিক জানো যে কাশ্মীরে হানাদার পাঠানোর ব্যাপারে সরকারী নিষেধ এখনও বহাল আছে?'

কানিংহাম যখন টেলিফোন করলেন তখন ইংল্যাণ্ড সফরে যাবার তোড়জোড় করছেন পাকিস্তানের ইংরেজ সেনাপ্রধান। মতলব করেই পাকিস্তান সরকার অস্ত্র কিনতে তাঁকে লণ্ডন পাঠাচ্ছেন। ফলে কাশ্মীরে যখন হানাদার আক্রমণ শুরু হবে তখন ইংরেজ সেনাপ্রধান অন্তত ছ'হাজার মাইল দূরে থাকবেন। ঘটনাটা জানলেও কিছু করার ক্ষমতা তাঁর তখন থাকবে না। জেনারেল মেসারভীর কাছে দুঃসংবাদটা সত্যিই আনকোরা। তবুও গভর্নর স্যর জর্জ কানিংহামকে আশ্বস্ত করতে মেসারভী বললেন, 'আপনাকে এটুকু বলতে পারি যে এমন অঘটন ঘটছে. দেখলে আমি বাধা দেবই। তাছাড়া পি.এম. নিজেও আমায় আশ্বস্ত করে বলেছেন

www.pathagar.com

যে এরকম মতলব তাঁর সরকারের নেই।'

কানিংহাম চুপ করে সব শুনলেন। তারপর বললেন, 'ভাল, তাহলেও পি.এম.কে সব ব্যাপারটা এখনই খোলাখুলি জানিয়ে দাও।'

তাই হলো। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর প্রধান, জেনারেল মেসারভী লন্ডন যাবার পথে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকাত আলি খানের সংগে দেখা করলেন। মেসারভীর আশংকার কথা শুনে আকাশ থেকে পড়লেন লিয়াকাত। তখন তাঁকে ধ্যানী প্রশান্ত গান্ধারের বুদ্ধমূর্তির মতন দেখাচ্ছিল। আশ্বাসসূচক করভংগী করে লিয়াকাত বললেন যে এমন মন্দ কাজ কিছুতেই বরদাস্ত করবে না তাঁর পাকিস্তান সরকার। আরও বললেন যে এখনই মুখ্যমন্ত্রীকে টেলিফোন করে তিনি জানিয়ে দেবেন যে এই ধরনের প্ররোচনামূলক কাজকর্ম যেন সরকারীভাবে প্রশ্রয় দেওয়া না হয়। স্বয়ং পি.এম. তাঁকে আশ্বস্ত করায় জেনারেল মেসারভীর মনে আর কোন উদ্বেগ থাকলো না। খোলা মনে তিনি লন্ডনের উদ্দেশে আগ্নেয়াস্ত্র কিনতে পাড়ি দিলেন। কিন্তু কে জানতো যে মেসারভীর সংগ্রহ করা অস্ত্রগুলোই তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ দুটো দেশের লড়াইয়ের প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠবে।

পাকিস্তান-কাশ্মীর সীমান্ত

২২-২৪ অক্টোবর, ১৯৪৭

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগের মডেলের ফোর্ড কোম্পানির বড় স্টেশন ওয়াগনটা তখন আলো নিভিয়ে ইঞ্জিনবন্ধ অবস্থায় উপত্যকার ঢালু তুষাররাশির ওপর দিয়ে নিঃশব্দে গড়িয়ে চলেছে। এইভাবে চলতে চলতে গাড়িখানা এসে থামলো ঝিলম নদীর ব্রিজের শতখানেক গজ এপাশে। গাড়িখানার ঠিক পেছনে ততক্ষণে ভূতের মতন এসে দাঁড়িয়েছে অনেকগুলো মিলিটারি ট্রাক। ট্রাকগুলোর মধ্যে থমথমে মুখে বসে আছে হানাদাররা। ঠিক তলা দিয়েই নাচতে নাচতে চলেছে স্রোতস্বিনী ঝিলম। নিঃশব্দ রাতটা ভরে গেছে নদীর একটানা গর্জনে। কনকনে ঠান্ডা রাত। সেই দুর্মদ শীতে স্টেশন ওয়াগনের মধ্যে চুপ করে বসে আছে যে ছোকরাটি তার নাম সৈরব হায়াত্ খাঁন। ২৩ বছরের হায়াত্ হলো মুসলিম লীগের সবুজ বাহিনীর (গ্রীন শার্টস) একজন নেতা। ছোকরা হায়াত্কে এখন একটু বিচলিত দেখাচ্ছে। অন্যমনস্কভাবে তার জমকাল গোঁপ-জোড়া চুমরাতে চুমরাতে একমনে সে তাকিয়ে ছিল ব্রিজের ওপারে পড়ে থাকা বিস্তীর্ণ কাশ্মীর রাজ্যের সীমানার দিকে।

ছোকরা ঠায় চেয়ে আছে একটা সংকেতের জন্য। অপেক্ষা করছে কখন দপ্ করে জ্বলে উঠবে সংকেত আলোটা। এটাই ইংগিত। হায়াত্ তখনই জেনে যাবে যে মহারাজার মুসলমান রক্ষীরা বিদ্রোহ করেছে। তারা হিন্দু সেনাধ্যক্ষদের হত্যা করে সেনাবাহিনী ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে এবং শ্রীনগর পর্যন্ত সবরকম সংযোগ লাইন কেটে ব্রিজের ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা প্রহরী সৈনিককে বন্দী করেছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে এইসবই ভাবছিল হায়াত্। হঠাৎ নড়েচড়ে উঠলো সে।

www.pathagar.com

কালো আকাশের বুক চিরে ধকধক করে জ্বলছে একটা লাল আলোর বৃত্ত। ওই ত ইশারা! এটার জন্যই এতক্ষণ অপেক্ষা করছে সে। আর কোনরকম দুশ্চিন্তা নয়। তার স্টেশন ওয়াগনের পিছু পিছু ট্রাক-ভর্তি হানাদার নিয়ে ব্রিজ পেরিয়ে এল তারা।

হায়াত্ জানে যে সামনে আর কোন বাধা নেই। সুতরাং নিঃসংশয়ে ট্রাক ভর্তি হানাদার নিয়ে তার স্টেশন ওয়াগনখানা এগিয়ে যাচ্ছিল। ছোট্ট শহর মুজফ্ফরাবাদের শুল্ক ছাউনির সামনে দিয়ে যাবার সময় দুজন শুল্ক অফিসার হাত তুলে তাদের থামতে বললো। এত রাত্রে এ আবার কি আপদ এসে জুটলো! কিন্তু গুছিয়ে ভাববার আগেই ট্রাক থেকে পাঠান হানাদারেরা ঝাঁপিয়ে পড়লো লোক দুটোর ওপর। একজন ছুটে গিয়ে শেডের তলায় অকেজো টেলিফোনটা চালু করবার চেষ্টা করছিল। লোকটাকে টেলিফোনের কর্ড দিয়ে কষে বেঁধে ফেললো ক্রুদ্ধ পাঠানরা।

অভিযানে তার আগুয়ান বাহিনীর এমন কৃতকার্যতায় দারুণ খুশী হায়াত্ খাঁ। এর চেয়ে বেশী সাফল্য আর কী হতে পারে! এখান থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত পাকা রাজপথে আর কোন প্রতিবন্ধ নেই। শান বাঁধানো পথটুকু দিব্যি হাঁটতে হাঁটতে পেরিয়ে যাবে সবাই। তারপর ভোরের আলো ফোটার আগেই হাজার হাজার পাঠান ঝাঁপিয়ে পড়বে ঘুমন্ত রাজধানী শহরের ওপর। ধীরে ধীরে তারা সমস্ত রাজপুরীটাই ঘিরে ফেলবে। তারপর মহারাজার ব্রেকফাস্ট ট্রেটি নিয়ে হায়াত্ নিজেই তাঁর সামনে হাজির হবে দিনের প্রথম দুঃসংবাদটি নিবেদন করতে। মহারাজা স্বকর্ণে শুনবেন যে কাশ্মীর জয় করেছে পাকিস্তান। শুধু তিনি একা নন। সারা বিশ্ববাসী শুনবে যে ২২ অক্টোবরের কাকডাকা ভোরেই কাশ্মীর জয় করে নিয়েছে পাকিস্তান।

কিন্তু ছোকরা হায়তের এমন মধুর দিবাস্বপ্ন হঠাৎই ভেঙে গেল। যেন ভুলের স্বর্গ থেকে পতন হ'ল তার। কাশ্মীর উপত্যকায় এই আজাদির লড়াইয়ের ষড়যন্ত্রীরা যে নকশা বানিয়েছিল তাতে যে একটা মারাত্মক ভুল ছিল তার প্রমাণ মিললো হাতেহাতে। যখন আগুয়ান বাহিনীর পাঠান জঙ্গিদের নিয়ে শ্রীনগর অভিযান শুরু করার কথা, তখন স্তম্ভিত হায়াত্ খাঁ দেখলো যে তার স্টেশন ওয়াগনের আশেপাশে একজনও জঙ্গি পাঠান নেই। রাতের অন্ধকারে ওরা সবাই গা ঢাকা দিয়েছে। কারণ, ধর্মযুদ্ধের জিগির তুলে বিপন্ন মুসলমান ভাইদের মানইজ্জৎ বাঁচানোর চেয়ে মুজফ্ফরাবাদের হিন্দু বাজারগুলো অবাধ লুটপাট করা অনেক বেশী লোভনীয় তাদের কাছে।

তাই, সমস্ত পরিকল্পনাটাই এইভাবে বানচাল হবার' জো হ'ল। বাজারের হিন্দুপট্টিতে শ'য়ে শ'য়ে হিন্দু দোকানে তখন অবাধ লুট চলছে। এর ফল হ'ল একটাই। আর কোনদিনই মহম্মদ আলি জিন্নার পক্ষে কাশ্মীর ভ্রমণে আসার সম্ভাবনা রইল না। সারারাত ধরে চললো এই অবাধ লুণ্ঠন। প্রতিটি হিন্দু দোকানে হামলা করলো পাঠান লুটেরা। কুলুপ ভেঙে, দরজাজানলা উপড়ে হাতের কাছে যা দামী জিনিস পেল সেটাই আত্মসাৎ করলো দুর্বৃত্তরা।

হায়াত তখন হতাশায় হাত কামড়াচ্ছে। নাগালের মধ্যে পেয়েও হাতছাড়া হয়ে গেল গাছের পাকা ফলটি। এখন কি করবে সে? তবুও মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করলো। কয়েকজন সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে লুটেরাদের কাছা ধরে টানাটানি শুরু করে

২৭

www.pathagar.com

দিল। 'এই ! এ কি করছো তোমরা ? তোমাদের যে শ্রীনগর যেতে হবে ?' কিন্তু হায় ! চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। তার সব চেষ্টাই বিফল হলো। লোভী লোক-গুলোকে দেখে মনেই হ'ল না যে, পৃথিবীর আর কোন আকর্ষণ এই উৎকট ক্ষ্যাপামি থেকে তাদের নিবৃত্ত করতে পারবে। সুতরাং অক্টোবরের সেই শুনশান রাত্রে শ্রীনগর শহরটাকে পাঠান হানাদারদের অধিকারে আনা গেল না। ওদের লুটতরাজের রেশ বজায় রেখে আরও আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় লেগে গেল ৭৫ মাইল দূরবর্তী সেই পাওয়ার স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছতে যেটা উড়িয়ে দিয়ে মহারাজা হরি সিংহর প্রাসাদের সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেদিন।

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৭

উপজাতি হানাদারদের কাশ্মীর অভিযানের প্রথম খবরটা দিল্লি পেল ৪৮ ঘণ্টারও পরে। ততক্ষণে হায়াত্ খাঁর আগুয়ান বাহিনীর কব্জায় চলে গেছে ঝিলমের প্রধান সেতুর অধিকার। তাও, মহারাজার পাঠানো খবর দিল্লি পায় নি। যেখান থেকে দিল্লি এই খবরটা পেল সেটা অন্য উৎস। সম্পূর্ণ অপ্রচলিত সোর্স সেটা। যে হাইওয়ে দিয়ে বিগত আট সপ্তাহ ধরে পাঞ্জাবের বাস্তুহারা মানুষের অভিপ্রয়াণ চলেছে, যেখানে পড়ে থাকা পচাগলা মড়ার দিকে শ্যেন চোখ মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে শকুনের দল, সেই হাইওয়ে দিয়েই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যোগাযোগকারী একটা টেলিফোন লাইন টানা আছে। ভাগ্যক্রমে দিল্লি ও রাওয়ালপিণ্ডির মধ্যে যোগা-যোগকারী এই টেলিফোন লাইনটা তখনও অক্ষত ছিল। তাই রাওয়ালপিন্ডি ১৭০৪ ও দিল্লি ৩০১৭ নম্বর দুটির মধ্যে একটা ক্ষীণ যোগাযোগ বজায় রেখে-ছিলেন দুই রাষ্ট্রের দুই ইংরেজ সেনাপ্রধান। এই মানুষ দুজন যে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ তাই নয়, অবিভক্ত ভারতীয় সেনাবাহিনীতে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে অনেক লড়াইয়েরই সামিল হয়েছেন দুজনে।

২৪শে অক্টোবর শুক্রবার বিকাল পাঁচটার একটু আগে পাকিস্তানের সেনা-প্রধান মেজর জেনারেল ডগলাস গ্রেসী (জেনারেল মেসারভীর স্থলাভিষিক্ত) সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের গোপন রিপোর্ট থেকে কাশ্মীর অভিযানের সম্পূর্ণ খবরটা প্রথম জানতে পারেন। গোপন রিপোর্টটাতে তন্ন তন্ন করে হানাদারদের সংখ্যা, তাদের ব্যবহার করা হাতিয়ার এবং গমনপথের বিবরণ ছিল। তাই, গোপন রিপোর্টটি পড়েই আঁতকে উঠলেন ডগলাস গ্রেসী। এক মুহূর্তও দেরি করলেন না তিনি। তখনই ছুটে গেলেন জেনারেল মেসারভীর বাংলোভবনে। তারপর সেখান-কার প্রাইভেট ফোন থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি যাঁর কাছে ফাঁস করে দিলেন তিনি হলেন ইন্ডিয়ান আর্মির প্রধান সেনাপতি মেজর জেনারেল স্যর রব লকহার্ট। বলতে কি, এই গুরুত্বপূর্ণ খবরটা দুদে মানুষটির কাছে ফাঁস হয়ে যাক, তা বোধহয় জিন্নাও চান নি। কারণ, লকহার্টের সময়োচিত হস্তক্ষেপের জন্যই হানা-দারবাহিনীর কবল থেকে কাশ্মীরকে মুক্ত করা সেদিন সম্ভব হয়েছিল। সংবাদটা এমনই চাঞ্চল্যকর যে স্তম্ভিত লক্‌হার্ট কালবিলম্ব না করে তখনই খবরটা পাচার

www.pathagar.com

করে দিলেন আরও যে দুজন মানুষের কাছে ভাগ্যক্রমে তাঁরাও বিদেশী এবং ইংরেজ। একজন হলেন ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন এবং অন্যজন ফীল্ড মার্শাল অকিনলেক।

গ্রেসীর টেলিফোনবার্তা থেকেই সেদিন দুই ইংরেজ সেনাপতির মধ্যে শুরু হ'ল এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাধারা। বস্তুত, এই হঠাৎ বিস্ফোরণ দুই পক্ষের সামরিক অফিসারদের কাছে রীতিমত অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠলো যেন। একদিকে মানবতার দায়, হননশীল দুই সম্প্রদায়ের মানুষকে মারামারি থেকে নিবৃত্ত করা, অন্যদিকে রূঢ় কর্তব্যবোধ যা প্রতিমুহূর্তে মানবতা বিরোধী ভূমিকায় তাদের বিব্রত করতে উদ্যত। ফলে গ্রেসী ও লকহার্টের মধ্যে একদিকে যখন লড়াই থামাবার কথোপকথন চলছে, অন্যদিকে তখন কাশ্মীরের তুষার উপত্যকায় দুই আজ্ঞাধীন সেনাবাহিনী পরস্পরের ওপর হিংস্র প্রতিহিংসায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে। স্বভাবতই, বিদেশী সেনানায়করা তাই দারুণ মুশকিলে পড়লেন। ইতিমধ্যেই তাঁদের ভূমিকায় দুই সরকার যথেষ্ট অসন্তুষ্ট। হয়ত এর দরুন এই উপ-মহাদেশ থেকে তাঁদের বিদায় নিতে হবে তাড়াতাড়ি। তবুও দুটো দেশের মানুষ যে এই কাণ্ডজ্ঞানহীন খুনোখুনি ও সর্বনাশা যুদ্ধে পুরোপুরি লিপ্ত হয়ে যায় নি, তার জন্য রাওয়াল-পিণ্ডি ১৭০৪ ও নয়াদিল্লি ৩০১৭ নম্বর দুটির মধ্যে দুই ইংরেজ সেনাপতির গোপন কথাবার্তা অনেকটা দায়ী।

সেদিন মাউন্টব্যাটেন যখন এই গুরুত্বপূর্ণ খবরটা পেলেন তখন থাইল্যাণ্ডের বিদেশ মন্ত্রীর সম্মানে আয়োজিত ভোজসভায় যাবার জন্য তিনি সাজগোজ করছেন। ভোজসভা শেষ হবার পর যখন সর্বশেষ অতিথি বিদায় নিলেন তখন ব্যাংকোয়েট হলের একপাশে ডেকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে ব্যাপারটা জানালেন মাউন্টব্যাটেন। সব শুনে নেহরু থ। তাঁর তখনকার বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে মনে হ'ল যেন সেই মুহূর্তে আর কোন খবর তাঁকে এমন বিচলিত করতে পারতো না। কাশ্মীর তাঁর পৈতৃক ভিটেভূমি। স্বভাবতই পৈতৃক দেশের ওপর এই টান প্রায় সুন্দরী রমণীর ভালবাসার টানের মতন। তাঁর চোখে কাশ্মীর যেন অসাধারণ এক সুন্দরী রমণী। তবে এই ইন্দ্রিয়াতুর রমণীদেহ শুধু তাঁর একার ভোগের জন্য নয়। এ রূপ চেয়ে দেখার মতন। কামনার জন্য নয়। কাশ্মীরের মনোরম নদী, উপত্যকা, লেক, তার সবুজ সতেজ গাছপালা যেন রমণী দেহের সুবাসিত অংগ। স্বাধীনতা লড়াইয়ের সেই সব কঠিন দিনগুলোর কথা তাঁর মনে আছে। জীবনযাপন যখন একঘেয়ে হয়ে উঠেছে, তখন কতবার ছুটে ছুটে এসেছেন এই নদী পাহাড় ঘেরা সুন্দরী কাশ্মীরের কোলের কাছে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকেছেন পাহাড় শীর্ষের কিরীটি শোভিত শৃংগের দিকে কিংবা তুষারধবল হিমবাহ অথবা স্পর্ধিনী যুবতী নারীর উচ্ছৃংখল নৃত্যছন্দের মতন স্রোতস্বিনীর উন্মত্ত জলরাশির দিকে। মন নিবিড় আবেশে নিমগ্ন হয়ে গেছে তখন।

নেহরুর স্তম্ভিত মূর্তির দিকে তাকিয়ে ছিলেন মাউন্টব্যাটেন। তাঁর মনে হ'ল যেন অন্য মানুষ দেখছেন তিনি। বাস্তবিক, এ যেন তাঁর আবিষ্কার। কোথায় গেল সেই শান্ত, নির্বেদ, স্থির প্রজ্ঞা যা প্রায়শই মাউন্টব্যাটেনকে মুগ্ধ করেছে। তিনি লক্ষ্য করলেন যে সেই মানুষটাই আদ্যন্ত বদলে গেছে। হারিয়ে গেছে তাঁর চরিত্রের গুণগুলো। একটা বন্য আবেগ এমন ভাবে আচ্ছন্ন করেছে নেহরুকে যে নিজেকে শাসন রাখতে পারছেন না তিনি। অব্রাহ্মণের মতন মনের আবেগ প্রকাশ

www.pathagar.com

করে ফেলছেন কাশ্মীরের এই ব্রাহ্মণসন্তান। মনের সেই অসংলগ্ন অবস্থার কথা বোঝাতে গিয়ে নেহরু তাঁকে বলেই ফেললেন, 'আপনাদের কুইন মেরীর হৃদয়াসনে ক্যালের (Calais) যে স্থান, তেমনি আমার মনের সবটুকু জুড়ে আছে কাশ্মীর।'

মাউন্টব্যাটেনকে এবার আর এক প্রস্থ ঝড়ের মুখোমুখি হতে হল। একচোট কথা কাটাকাটি হয়ে গেল ফীল্ড মার্শাল অকিনলেকের সঙ্গে। ফীল্ড মার্শাল প্রস্তাব দিলেন যে আকাশ থেকে এখনই এক ব্রিগেড সোলজার কাশ্মীর উপত্যকায় নামিয়ে দেওয়া হ'ক। যাতে কাশ্মীরের ইংরেজ আবাসিকদের উদ্ধার করে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে দেওয়া যায়। নয়ত হতভাগ্য ইংরেজ ললনারা ভয়ংকর লাঞ্ছনার শিকার হয়ে পড়বে। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন গোঁ ধরে রইলেন। কিছুতেই অকিনলেকের প্রস্তাবে সায় দিতে পারলেন না। মাউন্টব্যাটেন বললেন, 'আই য়্যাম সরি, আই ক্যান নট এগ্রি।' যথার্থই তা। মাউন্টব্যাটেন পারেন না রাজী হতে। এই উপ-মহাদেশ এখন স্বাধীন। কোন স্বাধীন দেশের মাটিতে বিদেশী সেনা নামানো যায় না। সত্যই যদি কাশ্মীরে সাময়িক অবরোধের প্রয়োজন হয় তাহলে ভারতীয় সেনা-বাহিনীর সাহায্য নিয়েই এই কাজ করতে হবে। বিদেশী ব্রিটিশ সোলজার দিয়ে এ-কাজ করা যায় না।

কিন্তু মাউন্টব্যাটেনের যুক্তির কথা ক্রুদ্ধ অকিনলেক কানেই শুনলেন না। রীতিমত রাগ করে বললেন, 'যদি অসহায় মানুষগুলো দুবৃত্ত-গুণ্ডাদের হাতে খুন হয় তাহলে রক্তের দাগ আপনারই হাতে লাগবে।' মাউন্টব্যাটেন এড়িয়ে গেলেন না তাঁর দায়। বিমর্ষ হয়ে বললেন, 'তেমনটি হলে দায় আমায় নিতে হবে বৈকি!' একটু থেমে মাউন্টব্যাটেন ফের বললেন, 'এ আমারই দায়। কাজটা যখন আমিই নিয়েছি, তখন শাস্তি আমাকেই পেতে হবে। তবুও জানবেন এ-দেশের মাটিতে বিদেশী ট্রুপ নামবে না। কারণ, কোন হাংগামা হলে তার কোন কৈফিয়ত আমি দিতে পারবো না।'

সেদিন দুপুরের একটু পরেই রয়্যাল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের একটা ডি.সি.থ্রি বিমান শ্রীনগরের পরিত্যক্ত ধুলোভরা বিমানবন্দরে নামলো। বিমান থেকে নাম-লেন ভি. পি. মেনন, কর্নেল শ্যাম মানেক্‌শ এবং একজন বায়ু সেনা অফিসার। দলের মধ্যে ভি.পি.ই একমাত্র অসামরিক ব্যক্তি। একদা এঁরই কর্মদক্ষতায় অচলায়তন ভেঙে অনেকগুলো দেশীয় রাজ্য ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল।

এই তিনজনকে শ্রীনগর পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্যাবিনেটের ডিফেন্স কমিটি। সেদিনই সকালে কমিটির বিশেষ সভা ডেকে এই জরুরী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিদ্রোহী পরিবেষ্টিত মহারাজাকে কি ভাবে সাহায্য করা যায় সেটাই ছিল ডিফেন্স কমিটির একমাত্র আলোচ্য বিষয়। বিষয়টা জটিল এবং জেনারেল অকিনলেকের সঙ্গে আলাপের পর থেকেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন মাউন্ট-ব্যাটেন। এ ব্যাপারে নেহরুর শক্ত মনোভাবও তাঁর অবিদিত নয়। মাউন্টব্যাটেন ঠিকই বুঝেছেন যে কাশ্মীর উপত্যকায় সামরিক হস্তক্ষেপ আসন্ন ও অনিবার্য। সুতরাং সমস্ত ব্যাপারটা যাতে আইনসংগত থাকে তারই চেষ্টা করলেন মাউন্ট-ব্যাটেন। প্রথমেই নেহরু ও তাঁর সরকারকে বুঝিয়ে দিলেন যে সরকারীভাবে কাশ্মীর রাজ্যকে ভারতের সংগে অন্তর্ভুক্তির ঘোষণা না করা পর্যন্ত কাশ্মীর উপত্যকায় কোন সেনাবাহিনী পাঠাতে পারবে না ভারত সরকার।

www.pathagar.com

শুধু এখানেই থেমে না থেকে আরও কিছুটা এগিয়ে গেলেন মাউন্টব্যাটেন। সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের অধীনে কর্মরত থাকার সময় যেমন কিছু কিছু গণতান্ত্রিক সংস্কার মেনে চলতেন, ভারত সরকারের চাকরিতেও সেই সংস্কারগুলো মেনে চলতে চাইলেন তিনি। তখন যেমন বিশ্বাস করতেন যে, এ দেশের জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার একদিনও রাজত্ব করতে পারবে না, এ ক্ষেত্রেও সেইরকম একটা বিশ্বাস তাঁর গণতান্ত্রিক ধারণার অবলম্বন হ'ল। তাঁর ধারণা হ'ল যে কাশ্মীরের সংখ্যাগুরু মুসলমানদের সেন্টিমেন্টকে অবজ্ঞা করে কাশ্মীর রাজ্যের কোন স্থায়ী সমাধান করা যাবে না। এমনকি ওদের সেন্টিমেন্ট সম্বন্ধেও তাঁর মনে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল না। তাই ৭ নভেম্বর তারিখে জ্ঞাতিভাই সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের নামে মাউন্টব্যাটেন যে রিপোর্টটি পাঠান, তার মধ্যেও নিজের মতামতটি ব্যক্ত করে দেন মাউন্টব্যাটেন। তিনি লেখেন, 'এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে কাশ্মীর উপত্যকার অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমানেরা সংখ্যাধিক্য হওয়ায় পাকিস্তানের সংগেই তারা যুক্ত হবার মতামত দেবে।'

নেহরুর মনের রক্ষণশীলতা সত্ত্বেও এই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রি-পরিষদকে একটা বিশেষ শর্ত আরোপ করতে রাজী করিয়েছেন মাউন্টব্যাটেন। নেহরুকে তিনি বোঝালেন যে ভারতের সংগে কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারটা সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে মেনে নেওয়া হ'ক। এই অস্থায়ী বিহিতটি তখনই পাকা করা হবে যখন দেশের আইনশৃংখলা স্বাভাবিক হবে এবং গণভোটের মাধ্যমে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এই অন্তর্ভুক্তি সমর্থন করবে।

ভি. পি. মেনন শ্রীনগর এলেন মন্ত্রিপরিষদের এই বিশেষ শর্তটি মহারাজাকে জানাতে। তাঁর সহযাত্রী অন্য দুজন সামরিক অফিসার এসেছেন সরজমিনে কাশ্মীরের সামরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে। এঁদের নিয়ে দিল্লির বিমানবন্দর থেকে বিশেষ বিমানটি ছেড়ে যাবার পর, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাক্তন সুপ্রীম এ্যালায়েড কম্যাণ্ডার লর্ড মাউন্টব্যাটেন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কাশ্মীর উপত্যকায় বায়ুসেনা পাঠাবার ব্যবস্থাদি করতে। শুধু দিল্লি নয়, তখন একযোগে সারা দেশের সমস্ত বিমানবন্দরগুলোয় তিনি নির্দেশ পাঠালেন যেন সাধারণ যাত্রীদের নামিয়ে সমস্ত বিমানগুলো দিল্লির উদ্দেশ পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

২৬ অক্টোবর শনিবার। মাঝরাতের খানিক আগে আরও একজন মানুষ বাস্তুহারা হলেন। দেড়কোটি হিন্দু, শিখ ও মুসলমান উদ্বাস্তুদের এই ঐতিহাসিক অভিপ্রয়াণে আরও যে একজন বিশিষ্ট মানুষ যোগ দিলেন, তিনি হলেন কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিংহ। মহারাজাও ঘরছাড়া হয়ে পথে বেরিয়েছেন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। সংগে চলেছে তাঁর নিজস্ব রয়েল গাড়ি, একখানা আরামদায়ক বিদেশী স্টেশন ওয়াগন। স্টেশন ওয়াগনের পেছনে চলেছে এক ঝাঁক ট্রাক ও মোটরগাড়ি। রীতিমত ইলাহী কাণ্ড। রাজার ব্যবহারের যাবতীয় সৌখিন জিনিসপত্র গাঁটরি বেঁধে ট্রাকের মধ্যে রাখা হয়েছে। না, লুট রাহাজানির ভয় রাজার নেই। সংগে চলেছে বিশ্বস্ত বডিগার্ড বাহিনী। তারা সবাই সশস্ত্র এবং নজর রেখে চলেছে দলের সংগে।

শ্রীনগরের রাজপ্রাসাদ ছেড়ে পলাতক হলেও মহারাজা একেবারে নিরাশ্রয় নন। ময়লা, দুর্গন্ধময় ও অস্বাস্থ্যকর কোন শরণার্থী শিবিরে তাঁকে আশ্রয় নিতেও

www.pathagar.com

হবে না। সদলবলে রাজামশাই জম্মু চলেছেন। সেখানকার শীতকালীন রাজপ্রাসাদেই তিনি এখন থেকে বাস করবেন। একদা এই ভবনেই প্রিন্স অব ওয়েল্স্ এবং যুবরাজের এ.ডি.সি. লুই মাউন্টব্যাটেনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন তিনি। সে অনেককাল আগের কথা। কিছুটা নিঃশঙ্ক মনেই পথ চলেছেন মহারাজা হরি সিংহ। তাঁর ধারণা যে হিন্দু প্রধান জম্মু শহরে তিনি সোয়াস্তি নিয়েই বাস করতে পারবেন।

স্বাধীন থাকার কত চেষ্টাই করেছিলেন মহারাজা। সবটাই পণ্ডশ্রম হলো। একের পর এক জবরদস্ত ঘটনাগুলো এমনভাবে তাঁকে ঢেকে দিয়েছিল যেন তাঁর দমবন্ধ হয়ে আসছিল তখন। এত যে ফন্দিফিকির, কূটকৌশল করলেন কী ফল পেলেন ? কোনরকমে তিনটে মাস স্বাধীন রাজার সত্তা নিয়ে আপেলের ঝুড়ির বাইরে থাকতে পেরেছিলেন তিনি। এবার আর কোন জারিজুরি চলবে না। ওই আপেলের ঝুড়ির মধ্যেই ঢুকতে হবে রাজামশাইকে। ভি.পি. মেননের সব পরামর্শই তিনি মেনে নিয়েছেন। অভিশপ্ত শ্রীনগর ও তাঁর রাজপুরী ছেড়ে রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি পালিয়ে যাচ্ছেন ভি.পি.র দিল্লি ফেরার আগেই। ভি.পি.কে জানিয়ে দিয়েছেন যে, দিল্লির সব শর্তেই তিনি রাজী, বদলে একটু সরকারী নিরাপত্তা চান তিনি।

ভি.পি. মেনন তাঁকে আশ্বস্ত করে গেছেন। রাজাও কথা দিয়েছেন যে ছেড়ে যাওয়া রাজপুরীতে আর কোনদিনই ফিরে আসবেন না তিনি। প্রাসাদের করিডোর দিয়ে আনমনে হাঁটছিলেন মহারাজা হরি সিংহ। একদা এই দরদালান দিয়েই পরম অনুগত দেহরক্ষী সমভিব্যাহারে রাজদর্পে হেঁটে যেতেন তিনি। মহারাজার খুব অবাক লাগছিল যে যাদের এমন অনুগত বিশ্বস্ত ভাবতেন, তাদের আনুগত্য কত ঠুনকো। পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর এই সুরম্য প্রাসাদভবনটা যে এক শৌখিন বিলাসী হোটেল হয়ে উঠবে তার কোন ধারণাই তাঁর হয় নি। হয়ত তখন এই করিডোরের ওপর আমেরিকান টুরিস্ট ছেলেমেয়েরা বসে বিশ্রম্ভালাপ করবে। বিদায় বেলার সময় এগিয়ে আসছে। প্রাসাদের খাস চাকরবাকররা স্ট্রংবক্স খুলে দামী হীরা মুক্তা বের করছিল। মহারাজা এসে দাঁড়ালেন সেখানে। তারপর নিজের হাতে উদ্ধার করলেন তাঁর অতি প্রিয় দুটি বস্তু। দোনলা দুটি শটগান। ভারী আদরের বন্দুক দুটির তেল চকচকে কাঠের কুঁদোর ওপর কিছুক্ষণ হাত বুলোলেন। তারপর সযত্নে চামড়ার খাপের মধ্যে ভরে অপেক্ষারত গাড়িতে উঠে বসলেন মহারাজা।

শ্রীনগর থেকে কঠিন উৎরাইয়ের পথটুকু পেরিয়ে জম্মু পেঁছতে ষোল ঘণ্টা সময় লাগলো রাজবাহাদুর এবং তাঁর দলবলের। জম্মুর প্রাসাদে পেঁছেই হাক্লান্ত মহারাজা তাঁর নিজস্ব অংশে বিশ্রাম নিতে গেলেন। তারপর শুতে যাবার আগে তাঁর এ.ডি.সি.কে ডেকে বললেন, 'যদি ভি.পি. মেনন দিল্লি থেকে ফিরে আসেন তবেই আমায় ডেকে তুলো। তিনি ফিরে এলেই বুঝবো যে ভারত সরকার আমায় আশ্রয় দিতে রাজী হয়েছেন। আর তিনি যদি না ফেরেন, তাহলে ঘুমন্ত অবস্থাতেই আমার এই সার্ভিস রিভলভার দিয়ে আমায় মেরে ফেলো। কারণ ভি.পি. মেনন ফিরে না এলে আমার বাঁচার কোন আশা নেই।'

দিল্লিতে ফিরেই ভি.পি. মেনন ও তাঁর দুই সহযাত্রী ফৌজি অফিসার ক্যাবিনেটের

www.pathagar.com

ডিফেন্স কমিটির সভায় রিপোর্ট পেশ করলেন। সারা সভা গম্ভীর মুখে রিপোর্টের বয়ান শুনলো। এটা আশার কথা যে মহারাজা শেষমেশ কাশ্মীর রাজ্যকে ভারতের হাতে তুলে দিতে রাজী হয়েছেন। কিন্তু শিয়রে সমন নিয়ে বসে আছেন তাঁরা। শ্রীনগর থেকে মাত্র ৩৫ মাইল দূরেই পাঠান হানাদারেরা ওত্ পেতে বসে আছে। যে কোন মুহূর্তেই হানা দিয়ে শ্রীনগরের বিমানবন্দরটা তারা কেড়ে নিতে পারে। তা হলেই সব ফতে হয়ে যাবে। ভারত থেকে বিমানবাহী সেনা নামাবার আর কোন জায়গা থাকবে না সারা কাশ্মীর উপত্যকায়।

মিটিংয়ে স্থল ও বিমানবাহিনীর দুই ব্রিটিশ কম্যান্ডারই সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধতা করলেন। তাঁরা যুক্তি দিলেন যে এই হস্তক্ষেপের ফল ভয়ঙ্কর হবে। ভবিষ্যতে এমন একটা অবস্থা হবে যখন কাশ্মীরের সাধারণ দেশবাসীর মনোভাব তীব্র ভারতবিরোধী আকার নেবে। কিন্তু কাশ্মীর সম্বন্ধে ভারতের নিবিড় আবেগ উপলব্ধি করে মাউন্টব্যাটেন তা অগ্রাহ্য করলেন। অবশ্য একই সঙ্গে হুঁশিয়ারি দিয়ে বললেন, যে হস্তক্ষেপ তাঁরা করতে চলেছেন তার পরিণাম হবে দীর্ঘস্থায়ী এবং এর সঙ্গে এত মানুষ ও সম্পদের বিনাশ হবে, যা কল্পনাও করা যায় না। তবে মন্ত্রিপরিষদের মনোবল অটুট থাকলে মাউন্টব্যাটেন তাঁর সামরিক অভিজ্ঞতার সবটুকু দায়ভার নিতে প্রস্তুত।

অতঃপর আর কোনরকম আবরণের অবকাশ থাকলো না। পরদিন সকাল থেকেই শ্রীনগর বিমানবন্দরে বায়ুসেনা নামাবার হুকুম দিলেন মাউন্টব্যাটেন। এর দরুন সারা দেশের সব রকম পরিবহন আটক করার আদেশ দিলেন তিনি। স্থির হলো যে কোন মূল্যে শ্রীনগরের বিমানবন্দর আটক থাকবে তারা যতক্ষণ না স্থলপথে গোলা বারুদ কামান ইত্যাদি নিয়ে গোলন্দাজবাহিনী কাশ্মীর উপত্যকায় এসে পোঁছায়। বলাবাহুল্য, স্যর সিরিল র‍্যাডক্লিফ অর্পিত একটি মাত্র যোগাযোগপথ দিয়েই শুরু হলো সামরিক অভিযান। মুসলমান অধ্যুষিত গুরুদাসপুরের অপরিসর পথটিই ভারত ও কাশ্মীরের মধ্যে একমাত্র যোগাযোগপথ, যেটি প্রায় দৈবীকৃপায় ভারতের ভাগে এসে গেছে।

এইভাবে একদিকে যখন বিকারের ঘোরের মতন সেনা পাঠাবার তোড়জোড় চলছে তখন ভি.পি. মেননকে ডেকে পাঠালেন মাউন্টব্যাটেন। তারপর সেদিনই তাঁকে জম্মু পোঁছতে বললেন তিনি। ভি.পি. যখন মহারাজার শোবার ঘরে এসে পোঁছলেন, তখনও মহারাজার দেওয়া চরমপত্রের সময়সীমা উত্তীর্ণ হয়ে যায় নি। ভি.পি. মেননের সঙ্গে আনা অন্তর্ভুক্তির কাগজপত্র তৈরিই ছিল। মহারাজার স্বাক্ষর হলেই সমস্ত ব্যাপারটা বৈধ হয়ে যায়। সুতরাং মহারাজার স্বাক্ষর নেবার পর ভারতের পক্ষ থেকে এই সামরিক হস্তক্ষেপটি বিধিসিদ্ধ করে নেওয়া হ'ল।

সেদিনই অর্থাৎ ২৬ অক্টোবর রবিবার সন্ধ্যার মধ্যেই সই করা কাগজপত্র দিল্লি পোঁছে গেল। ভি.পি. মেনন বেজায় উৎফুল্ল। প্রায় নির্ঝঞ্ঝাটেই ব্যাপারটা চুকেবুকে গেছে। তাঁর কাছে এটা এক মস্ত সাফল্য। ব্রিটেনের ডেপুটি হাই কমিশনার আলেকজন্ডার সাইমনকে নিয়ে পানসভায় বসলেন মেনন। তারপর দুজনের পাত্রেই কড়া পানীয় ঢাললেন পুরোপুরি। মেননকে দারুণ খুশী খুশী দেখাচ্ছে। একমুখ হাসি নিয়ে সাইমনের চোখের ওপর পানীয় ভর্তি নিজের গেলাসটা তুলে সেটা তার হাতে দিলেন মেনন। তারপর জ্যাকেটের পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করে সাইমনের নাকের ওপর সেটা নাচাতে নাচাতে বললেন, 'কাশ্মীর এখন

www.pathagar.com

আমাদের। এটাই তার প্রমাণ। হারামজাদাটি শেষমেশ দস্তখত করে দিয়েছে এটায়। একবার যখন কাশ্মীর পেলাম তখন প্রাণ থাকতে একে আর ছাড়ছি না।' (দ্য বাস্টার্ড সাইন্‌ড্‌ দ্য অ্যাক্ট অব এ্যাক্‌শেসন্‌। অ্যান্ড নাউ উই হ্যাভ গট ইট, উই উইল নেভার লেট ইট গো।)

* * *

সেদিন পানপাত্র হাতে নিয়ে ভি.পি. মেনন যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ভারত তাই-ই পালন করলো। সোমবার ২৭ অক্টোবরের ভোরেই ডি.সি.থ্রি বিমানখানা আশ্চর্য রকমের নিরিবিলি শ্রীনগর বিমানবন্দরে চুপচাপ এসে দাঁড়ালো। তখন সারা বিমানবন্দর শুনশান। কোথাও কেউ বাধা দেবার নেই। বিমান থেকে নামলো ফার্স্ট শিখ রেজিমেন্টের ৩২৯ জন শিখ বিমানসেনা। সংগে নামলো কিঞ্চিদধিক আট টন ওজনের লটবহর। বিমানবাহিনীর সেনারা তখন হতভম্ভ হয়ে গেছে বিমানবন্দরে এতটা নির্বিঘ্ন অবতরণ তারা মোটেই আশা করে নি। ভারতীয় সেনার এটাই প্রথম আগমন। ক'দিনের মধ্যেই আরও অনেক সৈন্য ও সমরায়োজন এসে পড়বে কাশ্মীর উপত্যকায়। ঠিক তাই দিন কয়েকের মধ্যেই কাশ্মীরের তুষারাবৃত হাইল্যান্ড ছেয়ে গেল লক্ষাধিক ভারতীয় সেনায়। অমন রমণীয় উপত্যকা যা একদা মাছ ও বনছাগল (আইবেক্স) শিকারের লোভনীয় মৃগয়াভূমি ছিল, সেখানেই দাপিয়ে বেড়াতে লাগলো ভারতীয় সেনারা।

তবে কাশ্মীর উপত্যকায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই প্রাথমিক সাফল্যের সবটুকুই তাদের সামরিক প্রতিভার স্ফুরণ নয়। এই দুর্লভ সাফল্যের অনেকখানি কৃতিত্ব যাঁরা দাবি করতে পারেন তাঁরা কেউ সেনাবাহিনীর লোক নন। কাশ্মীরে অবস্থিত ফ্রান্সিস্‌ক্যান মিশনের চোদ্দজন খ্রীশ্চান সন্ন্যাসিনী তাঁরা। ফ্রেঞ্চ, স্কটিশ, ইতালিয়ান ইত্যাদি সব জাতির সন্ন্যাসিনীদের নিয়ে তৈরি এই খ্রীশ্চান মঠটি আছে শ্রীনগর থেকে তিরিশ মাইল দূরে ছোট্ট বারমূলা শহরে।

সেদিন এই ক'টি খ্রীশ্চান মঠবাসিনী সন্ন্যাসিনীদের জন্যই শ্রীনগর বিমানবন্দর পর্যন্ত পাঠান হানাদারবাহিনীর অভিযান পৌঁছতে পারে নি। ঘটনাটা এই-রকম। যখন পাঠান হানাদারবাহিনীর শ্রীনগর বিমানবন্দর অধিকার করার কথা, তখন দেখা গেল বারমূলা শহরের চৌহদ্দির মধ্যেই আটকে আছে পাঠান হানাদারেরা। তারা মজে আছে মঠের সম্পত্তি লুঠতরাজ করতে এবং খ্রীশ্চান সন্ন্যাসিনীদের লাঞ্ছনা করতে। বস্তুত, জানোয়ারগুলোর নারীদেহ লোলুপতার জন্যই সম্রাট জাহাংগীরের অমন সাধের কাশ্মীর উপত্যকাটি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার সুখস্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল জিন্নার। ২৭ অক্টোবরের সারাটি দিন ভারতীয় সেনাবাহিনী যখন শ্রীনগর বিমানবন্দরে তাদের ক্ষীণ অধিকার কায়েম করতে ব্যস্ত, তখন পাঠান হানাদারেরা মজে রইল নির্বিচার নারীদেহ ভোগ আর সংশ্লিষ্ট কুকর্মে। সন্ন্যাসিনীদের ধর্ষণ করেই পশুগুলো থেমে গেল না। মঠের আরোগ্য-শালার অসহায় রোগীদের লাঞ্ছনা এবং যাবতীয় সম্পত্তি লুটতরাজে সারাটা দিন মজে রইল তারা। এমনকি, ঘরের দরজায় লাগানো পিতলের হাতলটাও ওদের লোভী দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি সেদিন।

সেদিনই সন্ধ্যা নাগাদ কনভেন্টের লাঞ্ছিতা মাদার সুপীরিয়র, সিস্টার মেরী এডেলট্রুড্‌ হাতে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর প্রতিমূর্তি নিয়ে মঠের মধ্যে দেহ রাখলেন। মৃত্যুর আগেও এই অপাপবিদ্ধা মহীয়সী নারী কাশ্মীরের দিনবদলের জন্য

www.pathagar.com

প্রার্থনা করে গেছেন। তাঁর ও অন্যান্য সন্ন্যাসিনীদের এতবড় আত্মোৎসর্গ হিমালয়ের পায়ের তলায় পড়ে থাকা এই পাহাড়ি রাজ্যের ওপর থেকে সনাতন ইসলামী প্রভাব এতটুকুও ক্ষুন্ন করে নি। তবে কাশ্মীর উপত্যকায় পাঠানো নেহরুর ফৌজ তাদের অধিকার মজবুত করতে সেদিন যে সময়টুকু চেয়েছিল সেটুকু তারা পেয়ে যায় সন্ন্যাসিনীদের এই আত্মোৎসর্গে।

শুধু সময়টুকু পেয়ে যাওয়াই নয়। পা রাখার যে জায়গাটুকু সেদিন ভারতীয় সেনাবাহিনী পেয়ে যায়, সেটাও তারা হারায় নি। পাঠান হানাদারবাহিনী যখন ফের অভিযান শুরু করলো তখন তারা অনেক দেরি করে ফেলেছে। হানাদারদের অগ্রগতি স্বচ্ছন্দে থামিয়ে দিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। ইতিমধ্যে র‍্যাডক্লিফ সাহেবের প্রদত্ত যোগাযোগপথ ধরে সাঁজোয়া বাহিনীর প্রথম সেনা-যোগান এসে পড়েছে। শ্রীনগর শহরের উপকণ্ঠে পাঠান হানাদারদের সংগে খুঁটি গেড়ে দারুণ লড়াই হলো ভারতীয় সেনাবাহিনীর। ক্রমেই পিছু হটতে লাগলো হানাদারবাহিনী। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সুপরিকল্পিত আক্রমণ সইতে না পেরে কাশ্মীরের উপত্যকা পর্যন্ত ফিরে গেল হানাদারবাহিনী। যে সেতু পেরিয়ে কনকনে অঘ্রানের রাতে তারা এই উপত্যকায় ঢুকেছিল সেখান পর্যন্ত হানাদারদের খেদিয়ে নিয়ে গেল ভারতীয় সেনাবাহিনী। ঘটনার বৃত্তান্ত শুনে রাগে ক্ষোভে ফুঁসে উঠলেন জিন্না। তাঁর সেনাবাহিনীর ব্রিটিশ সেনাপতিদের না জানিয়েই পাঠান হানাদারদের মনোবল উসকে দিতে ছদ্মবেশে পাকিস্তানি সেনা পাঠাতে বললেন। উপজাতি কর দ্বিগুণ আদায় করা হলো এবং শীতকাল জুড়েই কনকনে কাশ্মীর উপত্যকায় লড়াই চালিয়ে যাওয়া হলো।

শেষে রাষ্ট্রপুঞ্জ পর্যন্ত গড়ালো দু-তরফ একেবারে। যে মুমূর্ষু মোগল সম্রাট মৃত্যুশয্যায় শুয়ে এই মনোরম পাহাড়ি রাজ্যটির জন্য হা-হুতাশ করেছিলেন, তার ভাগ্যনির্দেশের দায় গিয়ে পড়লো রাষ্ট্রপুঞ্জের হাতে। বার্লিন, প্যালেস্টাইন এবং কোরিয়ার অমীমাংসিত সমস্যাগুলোর সংগে কাশ্মীরও একটা ইস্যু হয়ে ঝুলে রইল রাষ্ট্রপুঞ্জের আলোচ্যমঞ্চে। গণভোটের প্রস্তাবটিতে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে নেহরুর অনুমোদন আদায় করেছিলেন মাউন্টব্যাটেন। এখন সেটিও নির্বাসিত হলো এবং ভুলে যাওয়া অনেকানেক সাধু প্রস্তাবের সংগে এরও কোন সদগতি হলো না। ফলে ১৯৪৮ সালের যুদ্ধরেখা বরাবর দু টুকরো হয়ে রইল কাশ্মীর। একদিকে পাহাড়ি উপত্যকা, যা রইল ভারতের হাতে, অন্যদিকে গিলগিটকে ঘিরে কাশ্মীরের উত্তরাংশ চলে গেল পাকিস্তানের হাতে। পরবর্তী কালে কাশ্মীরের এই বিতর্কিত অধিকারটাই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধের কারণ হয়ে উঠবে এবং দুই রাষ্ট্রের সম্প্রীতির পথে এক দুর্লংঘ্য বাধার পাঁচিল হয়ে থাকবে দীর্ঘদিন।

www.pathagar.com

পুণার দুই ব্রাহ্মণ

পুণা, ১ নভেম্বর ১৯৪৭

১৫ আগস্টের সকালে যে জঙ্গি তরুণটি দলবল নিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বস্তিকা আঁকা পতাকাকে স্যালিউট করেছিল, সে আজ বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে আছে সামনের চালাঘরটার দিকে। সদ্য চুনকাম করা সামনের ওই চালাঘরটাই তার 'হিন্দু রাষ্ট্র' দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তর। যখনই সে দিকে তাকাচ্ছে গর্বে ফুলে উঠছে তার বুক। একটা ফ্ল্যাট বেড্ মেশিন আর পি.টি.আই এর একটা টেলিটাইপ মেশীন নিয়েই উপস্থিত তৈরী হয়েছে তার এই ছাপাখানা। ঠিক পাশেই রাখা আছে খানকয়েক খালি প্যাকিং বাক্স। সেগুলো উল্টো করে রেখে একটা টেবিলের কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। এই নিয়েই নাথুরাম গড়সের সম্পাদকীয় দপ্তরের ছাপাখানা।

নেহাতই সাদামাটা অনাড়ম্বর আয়োজন। তাই রদারমেয়ার কিংবা হার্স্টের মতন কোন ব্রিটিশ প্রেস লর্ড আহ্লাদে আটখানা না হলেও নাথুরামের চোখমুখ এক স্বর্গীয় খুশীতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল সেদিন। শেষ পর্যন্ত 'হিন্দু রাষ্ট্র' দৈনিকের নিজস্ব ছাপাখানা তৈরি করতে পেরেছে সে। এ কথা ভাবতেও ভাল লাগছিল তার। নাথুরাম আজ বেপরোয়া নির্ভীক স্পার্টানদের মতন। সারা শরীরে যা পরেছে সেটাই তার উর্দি। ঢলঢলে সাদা শার্ট, সুতীর আলগা ফতুয়া আর মারাঠাদের মতন মালকোঁচা দিয়ে কাপড়। ছোকরা নাথুরাম তখন তার মুখের স্বাভাবিক ব্যস্তভাব যথাসম্ভব সহজ করে হাসি হাসি মুখে সকলের কাছে যাচ্ছে। 'হিন্দু রাষ্ট্র' পত্রিকার হিন্দু আদর্শের কথা বলে আশ্বস্ত করছিল সে সবাইকে।

চালাঘরের সামনের খোলা জমির ঠিক মাঝখানে একটা ছোট্ট টেবিল পাতা। টেবিলের ওপর থরে থরে মিষ্টান্ন সাজানো আছে। পাছে আতিথেয়তায় ত্রুটি হয় তাই প্রায় গৃহকর্ত্রীর মতন এই সব বন্দোবস্ত নিজের হাতে করেছে নাথুরাম। বরফি, হালুয়া আরও নানারকম মিষ্টান্ন সাজিয়ে রেখেছে টেবিলে। টেবিলের ঠিক পেছনে একটা মস্ত গামলায় কফি ছাঁকা হচ্ছে। টপ টপ করে চুঁইয়ে পড়ছে ছাঁকা কফি। নাথুরাম ভারী কফি ভক্ত। সারা পুণায় তিনটি পরিচয়ে সবাই তাকে চেনে। একটা তার হিন্দু রাজনীতি, দ্বিতীয়টা তার সাধু সন্তদের মতন সহজ চালচলন আর তিন নম্বর হলো তার কফিপ্রীতি। কোন দোকানে ভাল কফি তৈরি হয় শুনলে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতেও তার ক্লান্তি নেই।

নাথুরাম যখন অতিথিদের মধ্যে কফি বিলি করছে তখন আর একজন যুবক ঘুরে ঘুরে সকলের নমস্কার নিচ্ছিল। এ ছোকরার নাম নারায়ণ আপ্তে। নারায়ণের পোশাক অমন সাদামাটা নয়। বেশ বাহার আছে তার পোশাকে। আজ সে পরেছে টুইডের জ্যাকেট, ধূসর রঙের ফ্ল্যানেলের স্ল্যাক্‌স্ আর নরম স্পোর্টস শার্ট। শার্টের খোলা কলারটা জ্যাকেটের ওপর নিপুণভাবে ভাঁজ করা। অতিথিদের মধ্যে নাথুরাম গড়সে যখন ছটফট করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, নারায়ণ আপ্তে তখন প্রায় নিঃসাড়ে চুপি চুপি লুকিয়ে বেড়াচ্ছিল সকলের মধ্যে। যেন তার পরিচয় জানাজানি

www.pathagar.com

হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় তটস্থ হয়ে আছে সে। এমনকি মন খুলে খোলামেলা হাসতেও তাকে দেখা যায় না কখনও। বলতে গেলে নাথুরাম গড়সের ঠিক উল্টোটি যেন নারায়ণ। সর্বদাই লোক দেখানো একটা দেখনহাসি মুখে লেগে আছে তার। নাথুরামের পত্রিকা ব্যবসার সে-ই হলো প্রধান কর্মকর্তা এবং তার অভিন্নহৃদয় সখা বা অলটার ইগো (alter ego)। নারায়ণের মাথার সামনেটা কেশহীন। রুক্ষ কালো চুল পিছু হটে যাওয়ায় গড়ানে কপালটা ধুধু করছে এবং পিছন দিকে বাবরির মতন কুন্ডলী পাকিয়ে গেছে। ফলে পাশ থেকে তার চকচকে কপাল আর লম্বা চোখা নাকের প্রোফাইল দেখলে, তাকে পুরুষ নেফারতিতির মতন দেখায়।* তার সারা মুখমণ্ডলে দেখবার মতন বস্তু হলো তার চোখ দুটো। যেন ভরা পেয়ালা। ঠান্ডা সেই চোখের দৃষ্টি যখন নিবিড় হয়ে কারও দিকে তাকায় তখন এক মুহূর্তের জন্যও সেই দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নেয় না সে। তার এই অপলক চাউনি যে দেখেছে সে-ই মজেছে। আপ্তের 'চোখদুটি যেন কথা বলে এবং তার চোখদুটি যখন কথা বলে তখন সবাই তা মুগ্ধ হয়ে শোনে।'

৩৪ বছরের নারায়ণ আপ্তে কারবারের অন্য অংশীদার নাথুরামের চেয়ে বছর তিনেকের ছোট। তবে বয়সে ছোট হলেও কারবার সম্বন্ধে নাথুরামের চেয়ে সে অনেক চৌকস। এ ব্যাপারে নাথুরাম যতখানি অনাসক্ত নারায়ণ আপ্তে ঠিক ততটাই নিবিষ্ট। সবসময়ই কারবার নিয়ে সে কিছু না কিছু ভাবে ও কাজ করে। নিমন্ত্রিত শেয়ারহোল্ডারদের হাতে হাতে কফির পেয়ালা ধরিয়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকলো না নারায়ণ। খোলা জমির মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে সে দুহাতে তালি দিল যাতে সবাই তার দিকে তাকায়। প্রথমে খানিকক্ষণ এ্যানুয়্যাল রিপোর্ট থেকে 'হিন্দু রাষ্ট্র' পত্রিকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করা হলো। তারপর সেদিনের প্রধান আকর্ষণ নাথুরাম গড়সেকে কিছু বলতে ডাকা হলো। পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালো নাথুরাম। আবেগে টানটান মানুষটাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন ঐকতান গানের প্রধান গায়ক সে। শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় অপেক্ষা করছে কখন প্রথম সুর উঠবে এবং সমবেত শ্রোতারা নীরব হবে।

ধীরে ধীরে বক্তৃতা শুরু করলো নাথুরাম। শ্রোতারা চুপচাপ। কিন্তু অপেক্ষমাণ মানুষগুলো ধারণাও করতে পারে নি যে খোলা মাঠের গায়ের বাড়িটার চারতলার জানালাটা কখন চুপিচুপি খুলে গেছে এবং জানলার কপাটের আড়ালে দাঁড়ানো একটা ছায়া শরীর উৎকর্ণ হয়ে নাথুরামের বক্তৃতা শুনছে। ওই ছায়া শরীরটা একজন সাদা পোশাকের পুলিসের। পুণার সি.আই.ডি. বিভাগের একজন টিকটিকি সে। গোয়েন্দা লোকটা ততক্ষণে আড়াল থেকে সরে এসেছে এবং জানলা দিয়ে ঝুঁকে গড়সের বক্তৃতা শোনার চেষ্টা করছিল। গোয়েন্দা পুলিসের খাতায় গড়সে এবং আপ্তে দুজনেই পরিচিত। শুধু ওই দুজনই নয়। শহরের আরও অনেক গোঁড়া হিন্দু সমর্থকের নামধাম তাদের খাতায় লেখা আছে। হপ্তায় হপ্তায় তাদের কাজকর্মের ফিরিস্তি দিয়ে গোপন রিপোর্ট যাচ্ছে দিল্লি ও বম্বেতে। গোয়েন্দা বিভাগে এদের প্রত্যেকের নাম, ধাম, জীবিকা ও রাজনৈতিক ঝোঁক সম্বন্ধে পরিপূর্ণ তথ্য সম্বলিত আলাদা ফাইল খোলা আছে। এদের মধ্যে আপ্তের নামের পাশে এক অতিরিক্ত সংযোজন আছে যা গড়সের ক্ষেত্রে নেই

* মিশরের সুন্দরী রাজ্ঞী নেফারতিতি (Nofretete)। অনুঃ

www.pathagar.com

পুলিসের খাতায় নারায়ণ আপ্তে হলো খুবই 'বিপজ্জনক' চরিত্রের। ('পোটেন-শ্যালি ডেঞ্জারাস।')

সম্ভবত শ্রোতাদের কাছে তার টানটান আবেগকে ভারী মুনশীয়ানার সঙ্গে সংযত করে নাথুরাম তার বক্তব্য পেশ করছিল। লুই মাউন্টব্যাটেনের পার্টিশন প্ল্যান প্রকাশ হবার পর যে ঘটনাগুলো ঘটে গেছে সেগুলো নিয়েই আলোচনা করছিল নাথুরাম। গান্ধীজী, কংগ্রেস ও ভারত ভাগই হলো তার প্রধান বক্তব্য বিষয়। নাথুরাম প্রথমেই প্রশ্ন করলো যে গান্ধীজী কেন তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখেন নি। তিনি বলেছিলেন যে দেশ ভাগ করতে হলে তা করা হবে তাঁর মৃতদেহের ওপর। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! দেশভাগ হয়ে গেলেও গান্ধীজী দিব্যি বেঁচে রইলেন। এরপর নাথুরাম আরও নির্মম কথা বললো। সে বললো যে, গান্ধীজীর অহিংসা নীতির বলি হয়েছে অসহায় হিন্দুরা। যখন তারা অনাহারে মরছে তখন তিনি মুসলমান অত্যাচারকারীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছেন। হিন্দু মা বোনেরা ইজ্জত বাঁচাতে যখন কুয়োর মধ্যে ঝাঁপ দিচ্ছেন তখন গান্ধীজী তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন, নিঃশেষে প্রাণ দাও। তোমাদের ক্ষয় নেই। বলছেন 'ভিকটরি ইজ ইন দ্য ভিকটিম্!' অর্থাৎ বলির পাঁঠা হও। 'আমার মা-ও হতে পারতেন এমনি এক বলির পাঁঠা।'

হঠাৎ নাথুরামের কণ্ঠস্বর কর্কশ চীৎকারের মতন শোনাল। সে চেঁচিয়ে বলে উঠলো, 'আমাদের মাতৃভূমিকে চিরে দুখন্ড করা হয়েছে। মায়ের শরীর থেকে মাংস খুবলে নিচ্ছে শকুন গৃধ্নরা। যখন প্রকাশ্য রাস্তার ওপর হিন্দু মেয়েদের সতীত্ব নাশ হচ্ছে, তখন কংগ্রেসী ক্লীবের দল সেই বীভৎস কান্ড দেখছে। প্রতিবাদ করছে না। বলতে পারেন, আর কতকাল এই অবস্থা আমাদের সইতে হবে?'

নাথুরামের বক্তৃতা শেষ হতেই ঘনঘন হাততালি পড়লো। হাততালি না পড়াটাই আশ্চর্যের হতো। বোম্বাই শহর থেকে মাত্র ১১৯ মাইল দূরে অবস্থিত পুণা শহরটা প্রায় সাড়ে তিনশ' বছর ধরে গোঁড়া হিন্দু জাতীয়তাবাদির পীঠস্থান হয়ে আছে। এই পুণারই অদূরে পাহাড় ঘেরা গ্রামে শিবাজীর জন্ম হয়েছিল। এই পাহাড়-কন্দরে লুকিয়ে থেকেই হিন্দু জাতীয়তাবাদের বীর নায়ক শিবাজী প্রবল পরাক্রান্ত মোঘল সম্রাট আওরংগজেবকে চোরাগোপ্তা আক্রমণে জেরবার করে দিয়েছিলেন। শিবাজীর যোগ্য উত্তরাধিকারী হলেন মারাঠা রাজশক্তির প্রতিষ্ঠাতা 'চিৎপাডন পেশোয়া। শিবাজীর মৃত্যুর পর এই 'অগ্নিশুদ্ধ' ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত পেশোয়াদের হাতে রাজশক্তি চলে যায়। অন্তত ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজদের হারিয়ে মারাঠা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেছে এই পেশোয়ারা যদিও শেষ রক্ষা হয় নি। এই পুণা শহর থেকেই ভারতের রাজনীতিতে উঠে এসেছেন বাল গঙ্গাধর তিলকের মতন এক ঝাঁক জাতীয়তাবাদী নেতা। এই দলপতি নেতার হাতেই ভারতের জঙ্গি আন্দোলন ধরা ছিল যতদিন না নেতৃত্ব নিজের হাতে তুলে দিয়েছেন গান্ধীজী। অবশেষে তাঁরই নেতৃত্বে জঙ্গি আন্দোলন অহিংস আন্দোলনের রূপ নেয়।

সেদিন 'হিন্দু রাষ্ট্র' পত্রিকার বার্ষিক সভায় আর একজনকে পাবার প্রত্যাশায় পুণার উগ্র জাতীয়তাবাদী হিন্দুরা খুব খুশী। এই মানুষটার চেহারার মধ্যেই নিবিড় হয়ে আছে শিবাজী ও তাঁর অনুগত পেশোয়াতন্ত্রের ভাবমূর্তি। অনেকেই মনে করে তিনি যেন এই ধারাবাহিকতারই উত্তরসাধক। তাঁর মধ্যেই নিমগ্ন হয়ে আছে তিলকের ছায়া। অথচ এই সভায় সেদিন তাঁকে দেখা গেল না। শুধু ১৬

www.pathagar.com

মি.মি. প্রজেক্টর দিয়ে সাদা দেওয়ালের গায়ে তাঁর মুখখানা দেখলো সবাই প্রজেক্টর চলার একটানা শব্দ ছাড়া আর কোথাও কোন শব্দ নেই তখন। সবাই নিস্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে সাদা দেওয়ালের দিকে। সেখানে তখন ফুটে উঠেছে সেই মানুষটার সম্মোহনী চেহারা যাঁর নাম বিনায়ক দামোদর 'বীর' সাভারকর।

তবে অসাধারণ ছিল সাভারকরের বাগ্মিতা। তাঁর যা কিছু খ্যাতি প্রতিপত্তি সব এই জন্যই। তাঁকে বলা হতো মহারাষ্ট্রের চার্চিল। তাঁর নিজের 'জায়দাদ' বম্বে বা পুণায় সাভারকর ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সেখানে স্বয়ং নেহরুও তাঁর সমকক্ষ হতে পারেন নি কখনও। জিন্না বা নেহরুর মতন লন্ডনের ইন্‌স্‌ অব কোর্ট থেকে সাভারকরও আইনবিদ্যা শিখে আসেন। তবে এই পবিত্র শিক্ষায়াতন থেকে যে বিশেষ বিদ্যাটিতে তিনি ধুরন্ধর হয়ে আসেন তা অন্য বিদ্যা। সশস্ত্র বিপ্লবের পাঠ নিয়ে আসেন সাভারকর এবং যে গুহ্য বিদ্যাটি আয়ত্ত করে আসেন তা হ'ল রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা।

একজন ইংরেজ আমলাকে গুপ্তহত্যার নির্দেশ দেবার দরুন লন্ডন শহরে সাভারকর বন্দী হন ১৯১০ সালে। লন্ডন থেকে তাঁকে বিচারের জন্য ভারতে চালান করার সময় মার্সাই বন্দরে জাহাজের পোর্টহোল দিয়ে কোনরকমে ফ্রান্সের এই সমুদ্র বন্দরে গোপনে নামেন। কিন্তু ফ্রান্স থেকেও সাভারকর নির্বাসিত হন এবং আন্দামান দ্বীপে তাঁকে যাবজ্জীবন নির্বাসনের দন্ড দেওয়া হয়। তারপর যুদ্ধ শেষ হবার পর অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের সংগে সাভারকরকেও ক্ষমামূলক মুক্তির (য়্যাম্‌নেস্‌টি) আদেশ দেয় ব্রিটিশ সরকার। মুক্তির পর বোম্বাই ও পাঞ্জাবের গভর্নরদের হত্যার ষড়যন্ত্রের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন সাভারকর। কিন্তু চতুর সাভারকর কখনও হত্যাকারীদের সংগে প্রকাশ্য মেলামেশা করেন নি। তাই চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধে পুলিস কোন ষড়যন্ত্রের মামলা সাজাতে পারে নি।

কংগ্রেসের হিন্দু মুসলমান মিলনের ভন্ডামি বা গান্ধীজীর অহিংসা নীতি দুটোর কোনটাই তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর মনের আকাঙ্ক্ষা ছিল ভারতবর্ষে হিন্দু জাতির শ্রেষ্ঠত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। সিন্ধুর উৎসদেশ থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত ও হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত এক অখন্ড হিন্দু রাজ্য স্থাপন করা। সাভারকরের জীবনের ব্রত ছিল 'হিন্দুত্ব'। মুসলমানদের তিনি ঘৃণা করতেন। এমনকি তাঁর স্বপ্নের হিন্দুরাজ্যে একজনও মুসলমানের ঠাঁই ছিল না।

মোট দুবার তিনি দক্ষিণপন্থী হিন্দু মহাসভা দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু তাঁর আসল লক্ষ্য ছিল আধা ফ্যাসিস্ত জংগি শাখাদল আর.এস.এস. বাহিনীর কাজকর্মের ওপর। আর. এস. এস. বাহিনীর মূল শক্তি নিহিত ছিল 'হিন্দু রাষ্ট্র দল' নামে একটা গুপ্ত শাখার মধ্যে। এই গুপ্ত দলটা তাঁরই তৈরি। ১৯৪২ সালের ১৫ মে তারিখে পুণা শহরে এই গুপ্ত দলটা সাভারকরই প্রতিষ্ঠা করেন। এর গোপন কাজকর্ম ও আন্দোলনের সর্বাধিনায়ক ছিলেন সাভারকর। তাই হিন্দু রাষ্ট্র দলের প্রতিটি সভ্যকে তাঁর কাছে আনুগত্যের শপথ নিতে হয়েছিল। এই আনুগত্য প্রায় অন্ধ বশ্যতাই শামিল। তবে শুধু বশ্যতাই নয়, আরও নিবিড় যোগ ছিল তাঁদের মধ্যে। হিন্দু রাষ্ট্র দলের প্রতিটি সভ্যই ছিল পুণার 'চিৎপাবন' ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত। জন্মসূত্রে এই পেশোয়া বংশধররাই ছিল পুণার শিরোমণি সম্প্রদায় এবং এই জন্মগত সামাজিক বিভাগ বা 'জাত' বন্ধনই হ'ল হিন্দু কাঠা-

www.pathagar.com

মোর একমাত্র শক্ত অবলম্বন। 'হিন্দু রাষ্ট্র' পত্রিকার সম্পাদক ও প্রশাসক নারায়ণ আপ্তেও হিন্দু রাষ্ট্র দলের একজন সভ্য ছিল।

ফিল্ম দেখানো শেষ হবার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করে বসে রইল সবাই। মনে হচ্ছিল যেন পুজার ঘরের নৈঃশব্দ বিরাজ করছে সেখানে। সাভারকর যেন অবতীর্ণ দেবতা। সকল হিন্দুর ত্রাণকর্তা তিনি। তাই তাঁকে নিয়ে তৈরি চলচ্চিত্র দেখে সবাই ভাবমুগ্ধ হয়ে গেছে যেন। খানিক পরে গড়্‌সে ও আপ্তে হাতে হাত দিয়ে এগিয়ে গেল ছাপাখানার মেশীনটার দিকে। সাভারকরের টাকা দিয়েই কেনা হয়েছে এই ফ্ল্যাডবেড্ ছাপার মেশীনটা। পনেরো হাজার টাকা আগাম দিয়েছেন তিনি। সবাই বুঝতে পারলো যে এখন থেকে জঙ্গি হিন্দুয়ানার যে হুংকার শোনা যাবে তা উঠবে এই দুর্ভেদ্য দুর্গের অভ্যন্তর থেকে। মাত্র এক-জনেরই কন্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হবে সেখানে এবং সে কন্ঠস্বর বীর সাভারকরের। সকলের হর্ষধ্বনির মধ্যে যুবক দুজন তখন ছাপার মেশীনের সামনে হাত ধরা-ধরি করে দাঁড়াল। ওদের ছবি তোলার পর ওরা দুজনে একসঙ্গে মেশীনের লাল বোতামটা টিপলো। ঝমঝম শব্দ চলতে শুরু করলো মুদ্রণ যন্ত্র।

ছাপার যন্ত্র চালু হতেই একে একে নিমন্ত্রিতরা চলে যেতে শুরু করলো। মুদ্রণ যন্ত্র থেকে তখন 'হিন্দু রাষ্ট্র' পত্রিকার ছাপানো সংখ্যা বেরিয়ে আসছে। গান্ধীজী এবং কংগ্রেস পার্টির ক্ষতিকর নীতির ওপর আক্রমণাত্মক ধারাবাহিক রচনা সেগুলো। চারতলার জানলার কপাট খুলে দাঁড়িয়ে থাকা সাদা পোশাকের পুলিসটা এবার তার নোটবই বন্ধ করলো। আড়ালে দাঁড়িয়ে সে এতক্ষণ নোট করছিল সভার কার্যবিবরণী। কিন্তু জানলার পাল্লা নিঃশব্দে বন্ধ করতে গিয়ে সে হঠাৎ চমকে উঠলো। শেডের সামনের খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে আপ্তে অমন উচ্ছ্ব-সিত হয়ে কার সঙ্গে কথা বলছে ? লোকটা ত তার অচেনা নয় ! আপ্তের মতন ওই লোকটাও পুলিসের খাতায় 'বিপজ্জনক'। তাড়াতাড়ি নোটবই খুলে আরও কিছু নোট করলো লোকটা। ওর নাম বিষ্ণু কারকারে। ছাপাই যন্ত্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ষাট মাইল দূর থেকে ছুটে এসেছে বিষ্ণু কারকারে। ও এসেছে আহমেদ-নগর থেকে। সেখানে ওর একটা যাত্রীনিবাস আছে। নাম 'ডেকান গেস্ট হাউস'। ক'দিন আগে এই বিষ্ণু কারকারের বলিষ্ঠ দুই বাহুর আলিঙ্গনেই নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেয়েছিল মুসলমানদের এক ধর্মীয় শোভাযাত্রায় হাতবোমা নিক্ষেপকারী মদনলাল পাওয়া।

যে দুজন যুবকের আঙুলের চাপে 'হিন্দু রাষ্ট্র' পত্রিকার ছাপাখানা চালু হলো তাদের মধ্যে দুটি ছাড়া আর কোন ব্যাপারেই মিল নেই। প্রথম হলো দু-জনেরই রাজনৈতিক মতাদর্শ গোঁড়া এবং দ্বিতীয় হলো যে দুজনেই জন্মসূত্রে সনাতন হিন্দু সমাজের বিশেষ অধিকার ও মর্যাদাসম্পন্ন বর্ণের অন্তর্গত। অর্থাৎ দুজনেই ব্রাহ্মণ।

হিন্দু পুরাণে আছে যে ব্রাহ্মণের জন্ম হয়েছে ব্রহ্মার মানসলোক থেকে। ব্রহ্মার মানসপুত্র যে সাতজন ঋষি আকাশের ঈশান কোণে অবস্থান করেন তাঁরা আকাশলোকে সপ্তর্ষিমন্ডল নামে পরিচিত। এই ঋষি দার্শনিকেরা পৃথিবীর যাবতীয় প্রলোভন থেকে দূরে থেকে একনিষ্ঠ জীবন যাপন করতেন। অবশেষে জন্মজন্মান্তরের বিবর্তনে এঁরাই মর্তলোকে বর্ণশ্রেষ্ঠ 'বিপ্র' হয়ে জন্মগ্রহণ করে-

www.pathagar.com

ছেন। হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মণকে 'দ্বিজ' বলা হয়। কারণ, পাখির মতন দুবার জন্ম হয় ব্রাহ্মণের। একবার ভূমিষ্ঠ হবার সময় আর দ্বিতীয় বার উপনয়নের সময়। পাখিরাও দুবার জন্মায়। একবার ডিম হওয়ার সময় আর দ্বিতীয়বার যখন খোলা ফাটিয়ে শাবক বেরোয়, তখন।

নাথুরামের যথার্থ ব্রাহ্মণ জীবন শুরু হয়েছিল তার উপনয়ন অনুষ্ঠানের সময়। তখনই তার দ্বিতীয়বার জন্ম হয়।. উপনয়নাদি অনুষ্ঠান পালনে কোন ত্রুটি হয় নি। মন্ত্রপাঠ করে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা তার গলায় যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়ে দেন। তখনই তাকে জানানো হয় যে, এখন থেকে সমাজের এমন এক অগ্রগণ্য শ্রেণীর প্রতিনিধি রূপে সে গণ্য হলো যেখানে প্রবেশের অধিকার আছে দুই শতাংশ অর্থাৎ অর্থাৎ অনুষ্ঠানটি পালন করার সংগে সংগেই বালক নাথুরামকে হিন্দুধর্মের জটিল জাতি কাঠামোর একেবারে চূড়োয় তুলে দেওয়া হ'ল। বলতে গেলে, সেই থেকে অধিকার আর নিষেধের এক বিচিত্র জগতে প্রবেশ করলো নাথুরাম।

তবে অধিকারভোগের সবটুকুই শুধুই অর্থকরী ব্যাপার নয়। নাথুরামের বাবার সংসারে কোন আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। তিনি ছিলেন সামান্য একজন ডাকপিয়ন। বেতন পেতেন মাসে পনেরো টাকা। এই সংকীর্ণ সামর্থ্যের মধ্যেই ছেলেকে গোঁড়া হিন্দুয়ানির পরিবেশে মানুষ করেছেন তিনি। ঠিক বয়সে তার উপনয় দিয়েছেন এবং নিয়মিতভাবে ঋগ্বেদ ও ভগবদ্গীতা পাঠে অভ্যস্ত করিয়েছেন।

আর পাঁচজন সদ্ব্রাহ্মণের মতন নাথুরাম গড্সের বাবাও নিরামিষাশী ছিলেন। ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কারও সংগে একত্রে আহার করেন নি তিনি। নাথুরামের মা ছাড়া অন্য কারও পরিবেশিত অন্নাদি গ্রহণ করেন নি কখনও। স্নানাদির পর শুদ্ধ কাচা কাপড় পরে তিনি খেতে বসতেন। তাঁর পরনের কাপড় যেখানে কাচা ও শুকানো হতো সেখানে কোন ঋতুমতী স্ত্রীলোকের ছোঁয়া পড়তো না। ভোজনের আগে মন্ত্র পড়ে তিনি জলগণ্ডূষ করতেন এবং নিঃস্ব দরিদ্রদের জন্য খানিকটা অন্ন নিবেদন করে আহারে বসতেন। ডান হাতের পাঁচ আঙুল দিয়ে তিনি ভোজন করতেন এবং আহারের সময় কিছু পাঠ করতেন না কারণ লেখার কালি অশুদ্ধ।

এইভাবে কঠোর সংস্কারের মধ্যে নাথুরামের হিন্দুয়ানির অনুশীলন শুরু হলো এবং ক্রমে দুর্জ্ঞেয় তন্ত্র সাধনভজনের দিকে সে ছেলেবেলাতেই আকৃষ্ট হলো। তখন তার বয়স মাত্র বারো বছর। হঠাৎ একদিন সবাই অবাক হয়ে দেখলো যে নাথুরাম কাপালিক পুজোর আয়োজন করেছে। খানিকটা টাটকা গোবর এনে প্রথমে সে ঘরের একটা দেওয়ালে মাখালো। তারপর বাকী গোবরের সংগে ভুসোকালি ও তেল মিলিয়ে একটা গোল কানা উঁচু তামার টাটের উপর রাখলো। পরে থালার সামনে একটা প্রদীপ জেলে পুজোয় বসলো ১২ বছরের নাথুরাম। খানিক পরেই যেন ঘোর লাগা ভাব হলো তার। চোখের সামনে নাচছে নানারকম আজগুবী ছবি, লেখা ইত্যাদি। না পড়া পদ্যের ক'টা লাইনও ভেসে উঠলো চোখের ওপর। নাথুরাম তখন কি বলেছে কি করেছে কিছুরই স্মরণ নেই। ঘোর কেটে যাবার পর অনেকক্ষণ সে কথা বলতেও পারলো না। তবে চিহ্নগুলো চিনতে পারলো সে। বাড়ির লোকজন ভাবলো এবার না জানি কত কীর্তিমান হয়ে উঠবে সে।

www.pathagar.com

তবে যুবককাল পর্যন্ত তেমন আশাপ্রদ কোন লক্ষণই দেখা যায় নি তার মধ্যে। ইংরিজিতে ফেল করায় ম্যাট্রিক পরীক্ষার গন্ডী পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর পর্যন্ত পেঁছিতে পারে নি গড়সে। তারপর ইস্কুল ছেড়ে পেটের ধান্দায় এখানে ওখানে চাকরি নিয়ে ঘুরেছে। তখন কী না করেছে সে। কাঠের প্যাকিং বাক্সের পেরেক আঁটা থেকে শুরু করে টায়ার সারানো পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত কয়েকজন আমেরিকান মিশনারী সাহেব অনুগ্রহ করে তাকে দরজীর কাজ শেখায়। তা, দরজীর কাজটা সে মন দিয়েই শেখে এবং ১৯৪৭ পর্যন্ত এই জীবিকাতেই লেগে ছিল নাথুরাম গড়সে।

অবশ্য দরজীগিরি তার পেশা হলেও নাথুরামের আসল নেশা হ'ল রাজনীতি। তখন ভারতবর্ষের রাজনীতিতে প্রধান পুরুষ গান্ধীজী। ফলে গান্ধীজীর নীতিরই একনিষ্ঠ সমর্থক হয়ে ওঠে সে। নাথুরামের জীবনের প্রথম রাজনৈতিক কৃতিত্ব হলো তার সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশ নিয়ে ইংরেজের কারাবরণ। কিন্তু ১৯৩৭ সাল নাগাদ নাথুরামের চোখে ফিকে লাগলো এই নিরামিষ রাজনীতি। ফলে গান্ধীজীকে ছেড়ে আর একজনকে তার গুরু মানলো সে। এই মানুষটি নিরামিষ রাজনীতি করতেন না। তাছাড়া পুণার এই ব্রাহ্মণ ছিলেন তার মতন 'চিৎপাবন'। তাঁর নাম বীর সাভারকর।

নাথুরামের মতন এমন একনিষ্ঠ চেলা এর আগে অন্য গুরু পায় নি। তখন প্রায় ছায়ার মতন সাভারকরের সংগে লেগে আছে সে। সারা দেশ চষে বেড়িয়েছে গুরুর সংগে। যখনই গুরুর দরকার হয়েছে তখনই সে হাজির হয়েছে গুরুর সামনে। সাভারকরও খুব খুশী এমন চেলা পেয়ে।

বলতে গেলে নাথুরামের প্রতিভার বিকাশ হলো সাভারকরের অভিভাবকত্বে এসে। ক্রমে সে বুঝতে পারলো ওই সব আজগুবী ছবি, লেখা ইত্যাদির মধ্যেই তার যৌবনের আদর্শ লুকিয়ে নেই। তখন গুরুর হিন্দুত্ব ভাবটি পুরোপুরি আত্মসাৎ করে নিয়েছে নাথুরাম। এই সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে সে তখন রচনাদি লিখছে, সভায় ভাষণ দিয়ে সবাইকে বোঝাচ্ছে। সাভারকরের হিন্দুত্ব ভাবটি আত্মসাৎ করে তার ন্যাওটা হয়ে পড়লেও, ওরই মধ্যে রাজনীতিতেও সে একজন চিন্তাশীল নেতা তৈরি হয়ে গেল। ১৯৪২ সাল নাগাদ তাদের ধার্মিক পরিবারের পুজো ঘরের সাবেক কালের দেবদেবীরা বিদায় নিলেন। সেই জায়গায় এসে বসলেন হিন্দু জাগরণের সেই সব নেতারা যাঁরা একদা মোগল বা ইংরেজের বিরুদ্ধে খোলা তলোয়ার নিয়ে লড়াই করেছেন। নাথুরামের জীবন থেকে সাবেক কালের দেবমন্দির চিরকালের মতন হারিয়ে গেল। এখন থেকে আর. এস. এস. দলের সদর দপ্তরই হলো তার নতুন দেবালয়।

এইরকমই এক মন্দিরে আপ্তের সংগে নাথুরামের প্রথম দেখা হয়। ১৯৪৫-এর জানুয়ারিতে সাভারকরের নির্দেশে তারা একটা পত্রিকা বের করলো। নাম 'অগ্রণী'। পুণায় সবচেয়ে মারমুখো কাগজ। পত্রিকার সম্পাদকীয় বক্তব্যে সরকার বেশ বিব্রত হতো তখন। কিন্তু প্রাদেশিক সরকারের চোখরাঙানির পরোয়া করলো না অগ্রণী। সাভারকর ও হিন্দু মহাসভার ডাকা ৩রা জুলাই দিনটাকে দেশভাগের প্রতিবাদস্বরূপ 'কালাদিবস' মানার সমর্থনে ঝাঁজালো সম্পাদকীয় লিখলো অগ্রণী। ব্যস ! সরকারের আদেশে বন্ধ হয়ে গেল অগ্রণীর প্রকাশ। কিন্তু ঠিক দশ দিনের মাথায় আপ্তে ও গড়সের চেষ্টায় নতুন সাজে বেরোল অগ্রণী। নামকরণ হলো

www.pathagar.com

'হিন্দু রাষ্ট্র।'

'হিন্দু রাষ্ট্র' পত্রিকায় তাদের দুজনের ভূমিকার মধ্যেই তাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। আপ্তে যখন পত্রিকার ব্যবসায়িক দিক নিয়ে পর্যালোচনা করে, গড়্সে তখন গরম গরম সম্পাদকীয় লেখে। বোর্ড মিটিংয়ের চেয়ারম্যান হয়ে আপ্তে যখন কারবারের নীতি নিয়ন্ত্রণ করে, তখন ঝাঁজালো বক্তৃতা দেয় গড়্সে। আপ্তে যখন রাজনৈতিক মতলব স্থির করে তখন গড়্সে হয় তার প্রবক্তা।

নীতিবাগীশ গড়্সে তার নীতিবোধের বাড়াবাড়ি নিয়ে যতটা আড়ষ্ট, আপ্তে ঠিক ততটাই সহজিয়া। আসলে আপ্তে হলো সুলুকসন্ধানী। টাকা পয়সা রোজগার নিয়ে তার কোনরকম আড়ষ্টতা ছিল না। গড়্সে ঠিক বিপরীত। কফির প্রতি দুর্বলতাটুকু বাদ দিলে আর কিছুতেই যেন তার আসক্তি নেই। দরজী দোকানের উল্টোদিকে একখানা ঘর নিয়ে সে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর মতন সংযমী জীবন যাপন করে। আসবাব বলতে দড়িতে ঝোলানো একটা বিছানা। কলের জল পড়ার ছড়ছড় শব্দে তার ঘুম ভাঙে ঠিক সাড়ে পাঁচটায়। জলের এই শব্দটাই তার এ্যালার্ম ঘড়ি।

আপ্তে শৌখিন মানুষ। হাতে টাকাপয়সা জমলেই বম্বে গিয়ে সে নতুন নতুন জামাকাপড় বানায়। ভাল খাবারদাবারের ওপর খুব ঝোঁক তার। সঙ্গে চাই এক গেলাস হুইস্কি। জীবনে যতরকমের আনন্দ আছে সবই পেতে ইচ্ছে করে তার। গড়্সের মতন হিন্দুধর্মকে সে পুরোপুরি গুড়্বাই করে দেয় নি। বিষয়ী আপ্তে সুযোগ পেলেই ফুল মিষ্টি নিয়ে মন্দিরে যায়। তারপর ঘন্টা বাজিয়ে ঠাকুরের পুজো চড়ায়। এমনিতেই দেবদেবীদের মতিগতি বোঝা ভার। সুতরাং অকারণে ওঁদের রাগিয়ে দিতে চায় না আপ্তে। জ্যোতিষী, হাতদেখা ইত্যাদি ব্যাপারেও তার খুব ঝোঁক।

বিপ্লবের ওপর ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও গড়্সের চরিত্রের একটা বিশিষ্ট দিক হলো তার রক্তভীতি, অথচ হিন্দু জাগরণ ঘটাতে গেলে রক্তপাত ঘটবেই। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই গড়্সের রক্তভয়ের চেহারাটা বোঝা যাবে। একদিন যখন সে আপ্তের ফোর্ড গাড়িখানা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তখন রাস্তার কিছু লোক গাড়ি থামিয়ে একজন আহত বালককে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলে। ছেলেটার শরীর থেকে তখন গলগল করে রক্ত ঝরছে। তা দেখে শিউরে উঠলো গড়্সে। তারপর তাকে পিছনের সীটে তুলে দিতে বললো। তবে রক্তভয় থাকলেও পেরী ম্যাসনের জাসুস কহানী পড়তে বা ছবি দেখতে তার আপত্তি ছিল না। প্রায়ই দেখা যেত যে পুণা ক্যাপিটল থিয়েটারে দুটাকার টিকিট কিনে সে খুব মন দিয়ে 'স্কারফেস' বা 'চার্জ অব দ্য লাইট ব্রিগেডের' মতন মারামারি এ্যাডভেঞ্চারের ছবি দেখছে।

মনের দিক থেকেও আপ্তের ঠিক বিপরীত ছিল গড়্সে। আপ্তের মতন লোকজন জুটিয়ে আমোদ করার ধাত না থাকায় তাদের সান্নিধ্য যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতো সে। তার ঘনিষ্ট মাত্র গুটিকয় বন্ধু ছিল যাদের সঙ্গে সে অন্তরঙ্গ ভাবে মিশতো। গড়্সে বলতো যে তার কাজের মধ্যেই নিমগ্ন থাকতে চায়, তাই লোকজনকে এড়িয়ে চলে সে।

মেয়েদের সম্বন্ধেও দুজনের মনোভাব ছিল দুরকম। এই দুরকম মনোভাব থেকেই তাদের স্বভাবের প্রভেদও ফুটে ওঠে। নারী সংসর্গের ব্যাপারে আপ্তের

www.pathagar.com

কাছে বৈধ অবৈধ ভেদাভেদ ছিল না। সুযোগ পেলে যে কোন নারীর সংগেই সে ব্যভিচার করতো। তখন কোন কিছুই বাধা হতো না তার কাছে। বিবাহিত হলেও বিকলাঙ্গ সন্তান প্রসবের অপরাধে সে তার স্ত্রীর সংগে সহবাস বন্ধ করে দেয়। তার ধারণা যে তার স্ত্রীর গর্ভদোষই এই বিপত্তির কারণ। তাই অন্য নারীর সংগে সহবাস করে সে তার যৌন আকাংক্ষা মেটাত। মেয়েদের একটা মিশন স্কুলে বেশ কয়েক বছর সে গণিত পড়ায়। আহ্‌মেদনগরের এই স্কুলের মেয়েদের সে নানা ছলাকলায় কামসূত্র সম্বন্ধে আগ্রহী করে তোলে। ফলে বীজগণিতের সূত্রের বদলে কামসূত্রের ব্যাখ্যা শুনতেই মেয়েরা বেশি চাইত। আপ্তের আকাঙ্ক্ষাও ফলপ্রসূ হতো। তার রাজনীতির চেলারা যেমন তার চোখের চাহনির ফাঁদে জড়িয়ে যেত, মেয়েদের অবস্থাও তেমনি সঙ্গিন হতো। আপ্তের সর্বনেশে চোখের টানে সর্বস্ব খুইয়ে বসতো মেয়েরা।

গড্‌সের কাছে নারী যেন নরকের দ্বার। তাই বিতৃষ্ণায় তাদের দিকে চেয়েও দেখে নি কোনদিন। জগতে মা ছাড়া অন্য নারীর ছায়াও মাড়ায় নি সে। পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান হলেও সে নিজে বিয়ে না করে পরের ভাইদের বিয়ে করার অনুমতি দেয়। কিন্তু বিয়ের পর পাছে ভাদ্রবউদের সংগে দেখা সাক্ষাৎ হয়, তাই পরিবার ছেড়ে অন্যত্র একা থাকতো সে। নাথুরাম গড্‌সে প্রায়ই আধকপালে (মাইগ্রেন) রোগে ভুগতো। সে এক বীভৎস কষ্ট। একদিন এমন হলো যে যন্ত্রণার দাপটে সে অচৈতন্য হয়ে যায়। সেই অবস্থায় তাকে নিয়ে পুণা হাসপাতালে ভর্তি করে দেয় আপ্তে। জ্ঞান ফেরার পর গড্‌সে দেখলো যে হাসপাতালের মহিলা নার্সরা তার শুশ্রূষা করছে। প্রায় ভূত দেখার মতন লাফিয়ে উঠলো গড্‌সে। তারপর চাদর টেনে গায়ে জড়িয়ে সে ছুটে পালাল হাসপাতাল থেকে। কিন্তু আশ্চর্য ! এত নারী বিদ্বেষ সত্ত্বেও এই মানুষটাই যখন তার লেখায় পাঞ্জাবের দাংগার বর্ণনা দিত, তখন এমন অনায়াসে 'ধর্ষণ', 'বলাৎকার', 'শ্লীলতাহানি' ইত্যাদি শব্দগুলো ব্যবহার করতো যে মনে হতো তার এই নারী বিদ্বেষ এক রকমের যৌনবিকৃতি।

*

অশান্ত বিক্ষুব্ধ ইতিহাস মোট তিনবার পাণিপথ প্রান্তর আলোড়িত করেছে। দিল্লির উপকণ্ঠে ৫৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত এই পাণিপথ প্রান্তরে মোট তিনবার ভারত ইতিহাসের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়েছে এবং মোগল হানাদারবাহিনী এই পথ ধরেই দিল্লি পৌঁছেছে। এখন মাউন্টব্যাটেন নির্দেশ দিয়েছেন যে পাকিস্তান থেকে ট্রেন বোঝাই হয়ে আগত ছিন্নমূল মানুষদের প্রথম আশ্রয়স্থল হবে এই পাণিপথ শহর। এখানেই তাদের সরকারীভাবে প্রথম অভ্যর্থনা জানানো হবে। তারপর এখান থেকেই বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে চালান করা হবে তাদের।

এই পথ দিয়ে শরণার্থী শিবিরে যাবার সময় উদ্বাস্তুরা কত উত্তেজনা ছড়িয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই উত্তেজনা রীতিমত ভীতিকর হয়ে উঠেছে স্থানীয় মানুষের কাছে। কিন্তু পাণিপথ রেল স্টেশনের হিন্দু স্টেশনমাস্টারকে সেদিন যে ভয়ংকর ঘটনা চোখে দেখতে হলো তার যেন জুড়ি নেই। নভেম্বরের শেষাশেষি কোন একটা দিন। কাল অপরাহ্ন। পাণিপথ রেলস্টেশনের হিন্দু স্টেশনমাস্টার দেখলেন যে ট্রেন বোঝাই শিখ উদ্বাস্তুরা প্ল্যাটফর্মে নেমেই যেন তান্ডব জুড়ে দিল। মুসলমানদের আক্রমণে উৎখাত হয়ে পাকিস্তান থেকে সদ্য পালিয়ে এসেছে ওরা। কিন্তু লোকগুলো যেন প্রেত পিশাচের মতন ব্যবহার করছে এখন। প্রতি-

www.pathagar.com

শোধস্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে সারা স্টেশন চত্বরে খ‌ুঁজে বেড়াচ্ছে কোথায় মুসলমান পাওয়া যায়। শেষমেশ ওদের প্রথম বলি হলো তাঁরই সহকারী স্টেশনমাস্টার। লোকটা ধর্মে মুসলমান। শুধু এই অপরাধেই হিড়হিড় করে টেনে আনলো তাকে। তারপর স্টেশন প্ল্যাটফর্মের ওপরেই 'কতল' করার হুমকি দিল। হিন্দু স্টেশনমাস্টার মনে মনে শিউরে উঠলেন। ওদের বাধা দেবেন সে শক্তি তাঁর নেই। শিখ উদ্বাস্তুদের হাতে খোলা কৃপাণ ক্ষণে ক্ষণে রোদের আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠছে। যে কোন মুহূর্তে ওর এক কোপে দিয়ে লোকটার ধড়মুণ্ডু আলাদা করে দেবে ওরা। হিন্দু স্টেশনমাস্টার ভীত চোখে তাকিয়ে রইলেন ওই মূর্তিমান ঘাতকদের দিকে। এখন আর ওদের তিনি নিবৃত্ত করতে পারবেন না। তবে যোগ্য সরকারী কর্মী হিসাবে সারা জীবন যা করেছেন তাই তিনি করলেন। শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে চীৎকার করে বললেন, 'প্লিজ! স্টেশন প্ল্যাটফর্মের ওপর খুনোখুনি করবেন না। এখানে এসব চলবে না।'

হিন্দু স্টেশনমাস্টারের নিষেধাজ্ঞা শুনে লোকগুলো একমুহূর্ত থমকে গেল। তারপর তাঁকে তুষ্ট করতেই যেন তাঁর মুসলমান সহকারীকে টেনে নিয়ে গেল প্ল্যাটফর্মের শেষ মাথায়। হিন্দু স্টেশনমাস্টার দেখলেন যে আকাশের গায়ে চকচক করে উঠলো একটা খোলা কৃপাণ। তারপর সেই কৃপাণের চকিত আঘাত নেমে এল লোকটার ঘাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে লোকটার ধড় থেকে মুণ্ডুটা আলাদা হয়ে গেল। পাণিপথ রেলস্টেশনের হিন্দু স্টেশনমাস্টার স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন এই বীভৎস দৃশ্য। আর যেন খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না তিনি। তখন তাঁর চোখের ওপর দিয়েই প্রেতপিশাচরা নাচতে নাচতে চললো শহরের মুসলমান পাড়ার দিকে।

ঘণ্টা দেড়েক পরের কথা। তখনও হিন্দু স্টেশনমাস্টারের মন থেকে আতঙ্কের ঘোর পুরোপুরি কেটে যায় নি। পাণিপথ রেল স্টেশনের সামনে একটা স্টেশনওয়াগন এসে দাঁড়ালো। গাড়ি থেকে একজনই নামলেন । কৃশ ক্ষীণ চেহারা। গাড়িতে দ্বিতীয় প্রাণী নেই। নেই সেনাপুলিস বা তাঁর দেহরক্ষী। পাণিপথের অসহায় মুসলমানদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনতে একাই এসেছেন মহাত্মা গান্ধী। যখন থেকে দিল্লি প্রবেশের দ্বারপথ হয়েছে পাণিপথ, তখন থেকেই যমুনার তীরে অবস্থিত এই শহরটা গুরুত্বপূর্ণ মুসলমান শহর। তাই কলকাতার ত্রাণকর্তা গান্ধীজীর কাছে এই শহরটার একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। গান্ধীজী এসেছেন একা এবং নিঃসঙ্গ হয়ে সেই ভূমিকা পালন করতে।

সারা স্টেশন চত্বরটায় তখন গিসগিস করছে কয়েক শ' হিন্দু শিখ উদ্বাস্তু। শীতের শেষ বেলার নরম আলো ছড়িয়ে পড়েছে সবার মুখে। চাপা উত্তেজনায় থমথম করছে সবাই। গান্ধীজী অবিচলিত ভাবে এসে দাঁড়ালেন ওদের সামনে। তারপর নির্ভয়ে বললেন, 'তোমরা মুসলমানদের কাছে যাও। ওদের বুকে জড়িয়ে ধরো। ওদের বারণ করো যেন এ দেশ ছেড়ে ওরা পাকিস্তানে না যায়।'

কিন্তু নির্ভীক গান্ধীজীর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে উঠলো সমুদ্র গর্জনের মতন অসংখ্য ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ মানুষের প্রতিবাদ। গর্জন করে মানুষগুলো বলে উঠলো, 'ওরা বোধহয় আপনার পরিবারকে লাঞ্ছনা করে নি? আপনার ছেলেকে কেটে দুটুকরো করে নি? করে নি বলেই একথা বলছেন।' কিন্তু মানুষগুলো অবাক হলো গান্ধীজীর কথা শুনে। গান্ধীজী চীৎকার করে বললেন, 'হ্যাঁ

www.pathagar.com

করেছে। ওরা আমার স্ত্রীকে অপমান করেছে। আমার ছেলেকে কুঁচি কুঁচি করে কেটেছে।' একটু থেমে গান্ধীজী ফের বললেন, 'কেন বলছি জানো? কারণ, তোমাদের মা বোন আমারও মা-বোন। তোমাদের ছেলেমেয়ে আমারও ছেলে-মেয়ে।' গান্ধীজীর কথা শেষ হবার সংগে সংগেই শেষ বেলার রোদে চিকচিক করে উঠলো কয়েকশ' কৃপাণ, তরোয়াল আর ছোরাছুরি। হতাশ গান্ধীজী মাথা নাড়লেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'না, না। ওগুলো হিংসার হাতিয়ার। খুনোখুনির হাতিয়ার। ওই হাতিয়ার দিয়ে এই সমস্যা মেটানো যাবে না। হতে পারে না তা।'

ততক্ষণে তাঁর আসার খবর সারা পাণিপথে ছড়িয়ে গেছে। স্টেশন পার্কের মধ্যে একটা লাউডস্পীকার বসিয়ে তড়িঘড়ি একটা প্রার্থনামঞ্চ তৈরি করে দিল শহরের পৌর কর্তারা। একজন দুজন করে ঘেরা ঘরবাড়ি ছেড়ে মুসলমান অধিবাসীরা এসে জড়ো হলো গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায়। এল শিখ, হিন্দুরাও। দেখতে দেখতে সমস্ত পার্কটা ভর্তি হয়ে গেল মানুষে। ঠিক যেমন আড়াই মাস আগে পবিত্র ঈদের দিন কলকাতার মানুষ একটা মিরাক্‌ল্‌ দেখতে জমায়েত হয়েছিল ময়দানে, তেমনি এরাও আজ জড়ো হয়েছে এই বৃদ্ধ মানুষটির মিরাক্‌ল্‌ দেখতে। কি নতুন মিরাক্‌ল্‌ দেখালেন তিনি? গান্ধীজী সেদিন যা শোনালেন তা তাঁর হৃদয়ের কথা, অকপট বিশ্বাসের কথা। তাঁর অস্ত্রাগারে এই বিশ্বাসটুকু ছাড়া আর কোন মিরাক্‌ল্‌ নেই। পাছে মনের উদ্বেগের ছোঁয়ায় তাঁর গলার স্বর অশ্রুত হয়, তাই প্রতিবার কথা বলার আগে কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলেন তিনি। তারপর বহুবার যে কথা বলেছেন, সেই দৃঢ় বিশ্বাসটুকুই ফের ব্যক্ত করলেন সকলের সামনে। বললেন, 'যে আদর্শ আমাদের সবাইকে গড়েছে, সেই হিন্দু, শিখ, মুসলমান, খ্রীশ্চান—সবাই আমরা এই ভারতমাতার সন্তান।' স্টেশন প্ল্যাটফর্মের ওপর অশ্রুধারায় পড়ে থাকা বিপন্ন মানুষের নিভে যাওয়া মুখের দিকে চেয়ে তিনি করুণাধারা ঢেলে দিলেন। আর বললেন যে প্রতিশোধ কামনায় তাদের মনগুলো যেন অমানুষ না করে তারা। বরং এই বেদনার মধ্যেই যেন তাদের মহান জয়ের বীজবপন হয়।

গান্ধীজীর এই হৃদয়ের কথায় দারুণ কাজ হলো। সুবাতাসের আলগা ছোঁয়ায় ভয় ভয় ভাবটা কাটিয়ে তিরতির করে কাঁপতে লাগলো মনগুলো। এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা শিখেরা একজন দুজন করে হাতের অস্ত্র ফেলে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মুসলমানের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। একজন মুসলমান তার গায়ের গরম দোলাইখানা খুলে শেষ বেলার ঠান্ডায় কাঁপুনি লাগা একজন বৃদ্ধ শিখের গায়ে চাপিয়ে দিল। অনেক মুসলমান ততক্ষণে সভা ছেড়ে বাড়ি গেছে বিপন্ন শিখ ভাইদের জন্য কিছু খাবারদাবার আনতে। সর্বত্রই তখন যেন তাজা প্রাণের হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

খানিক আগেও যে মানুষটি সকলের কটুবাক্য শুনেছেন, তিনি ফিরে যাবার সময় দেখলেন যে সবাই তাঁর জয়ধ্বনি করছে। সত্যই এ তাঁর দারুণ জয়। কিন্তু তাঁর খুবই মনোকষ্ট হলো যখন দেখলেন এই জয়গৌরবের আয়ু বড় ক্ষণস্থায়ী। একথা ঠিক যে সেদিন তাঁর উপস্থিতির দরুন অনেক মানুষের প্রাণ রক্ষা পেয়ে যায়। কিন্তু পাণিপথ শহরের মুসলমানদের মনের ভয় ভাঙাতে পারেন নি তিনি। তাই তাঁর এই ঐতিহাসিক সফরের এক মাসের মধ্যেই এই মুসলিম শহরটির

www.pathagar.com

সুপ্রাচীন বংশধরেরা চিরকালের মতন জন্মভূমি ছেড়ে পাকিস্তানে চলে যাবার সংকল্প করে। যেদিন তারা ভারত ছেড়ে চলে যাচ্ছে সেদিন গান্ধীজী বড় দুঃখে বলেছিলেন, 'পাণিপথের চতুর্থ যুদ্ধে হার হলো ইসলামের।' কিন্তু ইতিহাস বলবে যে শুধু 'ইসলাম' নন, গান্ধীজীও হেরে গিয়েছিলেন সেদিন।

পুণা, নভেম্বর ১৯৪৭

সাধুর পরনের গেরুয়া ধুতিটি যেমন ময়লা তেমনি জট পড়া তার ঘন কালো-দাড়ি। এই সাধু ভেকধারী মানুষটির কাছেই নারায়ণ আপ্তে ভক্তিবিগলিত হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সচরাচর এমন বিগলিত ভাব সে তার মাহিলা ছাত্রীদের কাছেই দেখিয়ে থাকে। মোটকথা, ভেকধারী লোকটি মোটেই সাধু বা গুরু নয়। বোম্বাই প্রদেশের সবাই সে কথা জেনে। পুলিসের রেকর্ড আর কর্তাব্যক্তিদের চোখে ধুলো দিতেই তার এই ভগবদ্‌ভক্তির ভেক নেওয়া। আসলে গেরুয়া পোশাকের সাহায্যে একটা আধ্যাত্মিক পরিমন্ডল তৈরি করে লোকটা তার আড়ালে বেআইনি অস্ত্র লেনদেনের কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে।

ওর নাম দিগম্বর গড়্‌সে। গত সতেরো বছরে মোট সাঁইত্রিশ বার পুলিস তাকে নানা অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু ব্যাংক ডাকাতি, মানুষ খুন, বেআইনি অস্ত্র লেনদেন ইত্যাদি নানা অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও, একবার ছাড়া কোন অপরাধই প্রমাণ হয়নি। ১৯৩০ সালে গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলনের সময় এক সংরক্ষিত বনের মধ্যে গাছ কাটার অপরাধে দিগম্বরের এক মাস জেল হয়। ব্যস, এটুকু ছাড়া তার রেকর্ডে আর কোন কালো দাগ নেই।

পুণার একটা সাদামাটা নিরীহ বইয়ের দোকানের ভেতরের ঘরে তার এই অস্ত্রভান্ডার। বাইরের ঠাটবাট দেখে বোঝার উপায় নেই যে এটা বইয়ের দোকান নয়। এই লুকানো ঘরে থরে থরে মজুত আছে নানারকম অস্ত্র। আধুনিক হাত বোমা থেকে শুরু করে আদিম কালের নানারকম বর্বর অস্ত্র যেমন বাঘনখ, ছোরা, পেতলের দস্তানা, পেন্সিল কাটা ছুরি ইত্যাদি। পাঞ্জাবের দাংগায় তখন এই সব হাতিয়ারগুলোই চলছে। তাছাড়া আর একটা কারণের জন্য পুণার ডাকাত, গুন্ডা, বদমাশদের কাছে তার ও তার বৃদ্ধ বাপের খুব খাতির। তারা দুজনে মিলে এমন একরকম বর্ম তৈরি করতে পারে যা প্রায় মধ্যযুগের নাইটদের পরনের বর্মের মতন দুর্ভেদ্য।

দিগম্বর গড়্‌সের একজন নিয়মিত ক্রেতা হলো আপ্তে। ইতিমধ্যেই এ বছরের জুন থেকে প্রায় তিনহাজার টাকার অস্ত্রশস্ত্র সে তার কাছ থেকে কিনেছে। দিগম্বর জানে যে আপ্তে আরও অস্ত্র কিনবে। কারণ, সব সময়ই লোকটা একটা না একটা ফন্দি আঁটছে। জিন্নাকে খুন করার দুটো ষড়যন্ত্র ইতিমধ্যে ভেস্তে গেছে। প্রথমবার দিল্লির এক মুসলিম জনসভায় জিন্নাকে তাক করেছিল সে। কিন্তু বোমা ছোঁড়া হয় নি। দ্বিতীয়বার একদল গুপ্তঘাতক নিয়ে সে সুদূর সুইজারল্যান্ড পর্যন্ত জিন্নার পেছনে ধাওয়া করে। কিন্তু জিন্না সেবার জেনেভা

www.pathagar.com

এলেন না। এখন তার ভারী দুঃখ যে অসুস্থ জিন্না কিছুতেই পাকিস্তান ছেড়ে নড়তে চাইছেন না। অগত্যা আপ্তের পরবর্তী লক্ষ্য হলো হায়দ্রাবাদের নিজাম। তারই দেশের লোকজনদের দিয়ে একটা গেরিলা আক্রমণের চক্রান্ত করেছে সে। এর জন্যেও বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র কিনতে হয়েছে তাকে।

সেদিন আপ্তে যে উদ্দেশ্যে দিগম্বরের কাছে এসেছে তা যেমন গোপন তেমনি মারাত্মক। সাধুবেশী দিগম্বরের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে আপ্তে বললো, 'এবার সত্যিই একটা বড় "ঘাই" দেবার কথা ভাবছি। বেশ বড়সড় ঘাই। তার জন্যে আমার বেশ কিছু হাত বোমা, বিস্ফোরক তুলোর ডেলা (গান কটন স্ল্যাব) আর পিস্তল চাই'।

দিগম্বর একটু দুশ্চিন্তায় পড়লো। এই মুহূর্তে তার সংগ্রহে একটা বস্তুও নেই। তা ছাড়া পিস্তল সংগ্রহের ব্যাপারটাও বেশ কঠিন তার পক্ষে। তবে এসব ক্ষেত্রে সামান্য দুটো পয়সার মায়া সে করবে না। তেমন পাত্রও সে নয়। সুতরাং আপ্তেকে তখনই নিরাশ করলো না দিগম্বর। একটু সময় চাইল। অন্তত ডিসেম্বর পর্যন্ত।

আপ্তে একটু দ্বিধা করলো। তারপর রাজী হলো। 'মারি তো গন্ডার, লুটি তো ভান্ডার'। শিকার যখন রুই কাতলা, তখন অপেক্ষার সময়টাও লম্বা হ'ক।

সে বছরে (১৯৪৭) ডিসেম্বরের গোড়া থেকেই গান্ধীজী বড় মনমরা। তাঁকে কেমন যেন দুঃখী মানুষ মনে হতো পিয়ারীলালের। গান্ধীজীর এই একান্ত বিশ্বস্ত সচিব ও তাঁর দীর্ঘদিনের সংগী পিয়ারীলাল নায়ার অনেক অবস্থায় গান্ধীজীকে দেখেছেন। কিন্তু কখনও তাঁকে এমন দুঃখী দেখেন নি। (দ্য স্যাডেস্ট-ম্যান ওয়ান কুড্ পিকচার)। কিন্তু কেন এত বিষণ্ণ তিনি ? তাঁর কাজ ত সমাপ্ত ! যারা ক্ষমতা চেয়েছিল তাদের ক্ষমতায় বসিয়ে দিয়েছেন তিনি। এখন সবাই নিশ্চিন্ত হয়েছে। কিন্তু ইদানীং গান্ধীজীর মনে হচ্ছে যেন তাঁর আর ওঁদের মধ্যে একটা পাঁচিল উঠেছে। একদিন যাদের নিয়ে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে নেমে-ছিলেন তারা যেন পাঁচিলের ওপাশে আলাদা হয়ে গেছে। তবে কি কালের গতির সংগে তাল রেখে চলতে না পেরে তিনি পিছিয়ে গেছেন ? তাই কি তাঁকে নিয়ে ওরা সবাই এত বিব্রত ? যদি এমন হয় যে দেশের পক্ষে 'অহিংসা' নিষ্প্রয়োজন, তবে সে দেশের কাছে তাঁরও প্রয়োজন কি ফুরিয়ে যায় নি ? তিনি মোটেই অবাক হবেন না যদি দেশের বর্তমান নেতারা কোনদিন বলে ফেলে, 'এই বুড়োটাকে নিয়ে ঢের নাকরা হয়েছে। এবার উনি আমাদের রেহাই দিন।'

হ্যাঁ রেহাই তিনি দেবেন। তবে যতদিন তেমন অবস্থা না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত কাউকে 'রেয়াত' করেন নি, করবেন না গান্ধীজী। যারা ক্ষমতার শীর্ষে বসে আছে তাদের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর প্রধান অভিযোগ যে ক্ষমতার নেশায় ওরা অসহায় দরিদ্র মানুষের কষ্ট দেখছে না। বেচারা উদ্বাস্তুরা যখন দিনের পর দিন 'ভুখা' থাকছে তখন খানাপিনায় অফুরন্ত সরকারী অর্থ অপচয় করছে মন্ত্রীরা। তীব্র আক্রমণের ভংগিতে গান্ধীজী ঘোষণা করলেন যে অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে, 'পাশ্চাত্য দেশের বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ আর ওদের উন্নত বিকশিত অর্থনীতির চোখ ধাঁধানো রূপের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে আছে নেতারা।' সবচেয়ে তীব্র হলো নেহরুর ওয়েল-ফেয়ার স্টেট বা কল্যাণ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণ। গান্ধীজী বললেন যে এর

www.pathagar.com

আসল উদ্দেশ্য হলো কেন্দ্রের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখা। ক্ষমতার এই কেন্দ্রীকরণের পরিণতি বড় বেদনাদায়ক। 'মানুষ তখন একপাল ভেড়া বনে যায় আর সর্বক্ষণই পাচনবাড়ি হাতে মেষপালকের মুখের দিকে চেয়ে থাকে কখন সে তাদের ঘাসের মাঠে চরাতে নিয়ে যাবে। কিন্তু মেষপালকের হাতের লাঠি প্রায়ই লোহার ডান্ডা হয়ে যায়, এবং পরে মেষপালকরাও তখন আর মানুষ থাকে না. নেকড়ে হয়ে যায় সবাই।' (.. people becoming a herd of sheep, always relying on a shepherd to drive them to good pastures. The shepherd's staff soon turns to iron and the shepherds turn to wolves.)

গান্ধীজী ওদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললেন যে, শহুরে বুদ্ধিজীবীরা একটা পালিশ করা শহুরে সমাজ বানাতে চাইছে। দেশের শিল্পোন্নয়নের যে নকশা তারা তৈরি করেছে সেখানে গ্রামীণ মানুষের স্বার্থ দেখা হচ্ছে না। মাও সে তুঙয়ের নজির তুলে গান্ধীজী পরামর্শ দিলেন যে শহরে বেড়ে ওঠা এই সব পালিশ করা চেহারার মানুষদের গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ক। তারা সেখানে গিয়ে 'গ্রামের সেই পুকুরের জল খাক যেখানে গ্রামের মানুষরা চান করছে বা গরু মোষের গা ধুইয়ে দিচ্ছে। গ্রামের মানুষদের মতন তারাও চড়া রোদে পিঠ নুইয়ে মাঠে কাজ করুক।' তবেই তারা দেশের উন্নয়নে গ্রামের মানুষের স্বার্থের কথা বুঝতে পারবে।

দেশের নেতারা যেমন তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছেন তেমনি গান্ধীজীও পারেন তাদের উপেক্ষা করতে। ডিসেম্বরের একটা দিন। বিড়লা হাউসে গান্ধীজী যাঁকে ডেকে পাঠালেন তাঁরই সৈকতকুঞ্জে জেল ফেরত এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি। ১৯৪৪ সাল সেটা। ইংরেজের জেল থেকে বেরিয়ে ভাঙাচোরা শরীরটা সারাতে তাঁরই সমুদ্রনিবাসে এসে উঠেছিলেন গান্ধীজী। খুবই বিশ্বস্ত ও অনুগত মানুষটি। গান্ধীজী এঁর কাছেই মনের কথাটি খুলে বললেন। মনের মধ্যে স্বপ্নের যে কুঁড়িটা সযত্নে লালন করেছেন, এবার সেটা ফুটে উঠুক। কিন্তু ব্যাপারটাকে খুবই গোপন রাখতে হবে। কেউ যেন জানতে না পারে। এমনকি নেহরু বা প্যাটেলও নয়। ভদ্রলোককে বললেন, 'করাচি গিয়ে আমার পাকিস্তান সফরের ব্যবস্থা করে আসুন।'

মানুষটির তো দমবন্ধ হবার অবস্থা হলো। এ ত স্রেফ পাগলামি! উনি ত খুন হয়ে যাবেন ওখানে গেলে? কিন্তু গান্ধীজী অবিচল। এতটুকু অস্থির দেখাল না তাঁকে। শুধু শান্তস্বরে বললেন, 'আমার এই জীবন ভগবানের। এ থেকে একটা মিনিটও কেউ কমিয়ে দিতে পারবে না।' (নো ওয়ান ক্যান শর্টেন মাই লাইফ বাই এ মিনিট। ইট বীলংস্ টু গড্।)

তবে একথাও ঠিক যে পাকিস্তানে যাবার আগে তাঁর নিজের ঘরটাও গুছিয়ে নেওয়া দরকার। নইলে কোন মুখে তিনি পাকিস্তানীদের কাছে শান্তির কথা বলবেন? তখন খোদ দিল্লাই দাঙ্গার আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে। দিল্লির বেসামাল অবস্থাটাই তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভাবিয়ে তুলেছে। শহরের মুসলমান নেতারা জিদ ধরেছেন যে তাঁদের নিরাপত্তার জন্য গান্ধীজীর এখানে থাকা দরকার। পাকিস্তান থেকে আগত পাঞ্জাবী, হিন্দু, শিখ রেফিউজীরা দলে দলে দিল্লির পুলিসবাহিনীতে চাকরি নিয়ে রাজধানীতে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছে। মুসলমানদের ঘরবাড়ি ও মসজিদ ইত্যাদি ধর্মস্থান জবরদস্তি কেড়ে নিয়ে ঢুকে পড়ছে

www.pathagar.com

তারা।

গান্ধীজীর কাছে সবচেয়ে বেদনাদায়ক যা তা হলো শহরময় ছড়িয়ে রাখা বিশাল পুলিসবাহিনী। পাছে সেপ্টেম্বরের মতন আর একদফা খুনদাঙ্গা শুরু হয়ে যায় রাজধানীতে তাই সারা শহরটাকে পুলিসের ঘাঁটি করে তুলেছে ওরা। স্বাধীন ভারতের রাজধানী শহরের শান্তিশৃংখলা বজায় রাখতে এই অস্ত্রাঘাতের আয়োজন যেন তাঁর মনঃপুত হ'ল না। এমন আদিম ব্যবস্থা কেন? কেন আত্মিক শক্তির প্রয়োগ করে দেশের শান্তি বজায় রাখা যায় না? গান্ধীজীর অন্তরাত্মা নিবিড় বেদনায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল যেন। তাঁর মনে হতে লাগলো যেখানে দেশের মানুষের ওপর তাঁর চাইবার দাবি নেই সেখানে পাকিস্তানের মানুষের কাছে কোন মুখে এত চাইবেন! ক্রমে এমন হলো যে গান্ধীজী নিজের মধ্যে হারিয়ে যেতে লাগলেন। এইসব গভীর তন্ময় মুহূর্তগুলো সাধারণত তাঁর চিন্তাময় নীরবতার পূর্বলক্ষণ। জীবনের কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার আগে তাঁর এইরকমই সমাহিত ভাব হয়। সেবারও তাই হলো। তখন ডিসেম্বরের শেষ। বছরেরও শেষ হয়ে আসছে তখন। পরে গান্ধীজীও যেন বিষন্ন নীরবতার মধ্যে ক্রমেই ডুবে যাচ্ছেন। এইরকমই এক নিবিড় অবস্থা যখন তাঁর, তখন কয়েকজন দর্শনপ্রার্থী ইংরেজ তাঁর সংগে দেখা করতে এলেন। সেদিন গান্ধীজী তাঁদের যে কথা বলেন তা বড় করুণ। গান্ধীজী বেদনার সংগে বলেন, 'জগতের কি আশ্চর্য ধারা দেখুন! মহাপুরুষদের গায়ে পাথর ছুঁড়ে মারা হয় আগে, তারপর তাঁর স্মৃতিমন্দির বানিয়ে তাঁর পুজো করা হয়। এই আদতই চলে আসছে যুগ যুগ ধরে।' একটু থেমে শান্ত স্বরে গান্ধীজী ফের বললেন, 'আজ আমরা যীশুর ভজনা করছি। কিন্তু একদিন রক্তমাংসের যীশুকে আমরাই ক্রুশবিদ্ধ করে বধ করেছিলাম।'

গান্ধীজী সেদিন স্বীকার করেন যে আজীবন তিনি জ্ঞানী কনফুশিয়সের সেই সমৃদ্ধ রচনাটিই অনুসরণ করে চলেছেন। সেটিই তাঁর জীবনের ব্রত। তাই কনফুশিয়সের মতন তিনিও এখন বলতে পারেন, 'যা সত্য বলে জেনেছি তা পালন করতে না পারা হলো কাপুরুষতা।'

করাচি, অক্টোবর—ডিসেম্বর ১৯৪৭

পিংপং বলের মাপের যে কালো দাগগুলো একস্‌রে প্লেটে ধরা পড়েছিল, তার বিষাক্ত মারণ ক্রিয়া ইতিমধ্যেই অনেকটা ছড়িয়ে পড়েছে মহম্মদ আলি জিন্নার ফুসফুসে। বম্বের সেই ডাক্তার বন্ধুর আশংকাটা যে উড়িয়ে দেবার নয়, জিন্নার স্বাস্থ্য দেখে তা বোঝাই যায়। রোগের বালাই নিয়ে ব্যতিব্যস্ত জিন্না ক্রমেই যেন রোগের কাছে আত্মসমর্পণ করে ফেলছিলেন। তাছাড়া তাঁর সুদীর্ঘদিনের স্বপ্ন যখন সার্থক হয়ে গেছে, তখন আর নতুন করে উজ্জীবিত হবার দরকারই বা কিসের! রোগ জানুক আর দেহ জানুক কি ঘটেছে। মনটাকে আর অকারণে বিব্রত করাই বা কেন! যা ঘটার তা ঘটুক।

বাস্তবিক তাই। ২৬ অক্টোবর তারিখে মাত্র ক'টি সপ্তাহের জন্যে করাচি থেকে

www.pathagar.com

তিনি লাহোর গেলেন। পাঁচ হপ্তা বাদে যখন ফিরে এলেন তখন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। ভাঙাচোরা, বিধ্বস্ত। তাঁর ইংরেজ মিলিটারী সেক্রেটারী লিখেছেন, 'যখন করাচি ছাড়েন তখন তাঁর বয়স যেন ষাট, আর ফিরে এলেন যেন আশী বছরের এক কোলকুঁজো বৃদ্ধ।' কথাটা ঠিক। কারণ, লাহোরে এই মাসাধিক সময় প্রায় শুয়েই কেটেছে তাঁর। যেমন জ্বর তেমনি কাশি।

এতেই এত শক্তিক্ষয় হয়ে যায় যে দেহমনে আর কোন উৎসাহ অবশিষ্ট ছিল না। তখন সর্বক্ষণই বিষাদে ছেয়ে থাকতো তাঁর মন। এমনকি যাঁরা তাঁর অন্তরঙ্গ, নিত্য ওঠাবসা যাঁদের সঙ্গে, তাঁদের কাছ থেকেও যেন অনেক দূরে সরে যেতে লাগলেন এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমান নেতা। জীবনের এই গোধূলি বেলায় আর যেন কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না তিনি। তাই সাধ করে স্বপ্নলব্ধ ফলটি আর কারও হাতে তুলে দিতেও তাঁর মন সরলো না। বলতে কি, তখন তার অক্ষম দুটি হাতে দশটি দুর্বল আঙুলের মধ্যেই সমস্ত রাষ্ট্রক্ষমতা যেন কেন্দ্রীভূত করে রেখেছিলেন তিনি। কারও হাতে সেটি তুলে দিতে পারছিলেন না। ক্রমেই ব্যাপারটা এমন হয়ে দাঁড়ালো যে সরকারী অনেক জরুরী সিদ্ধান্তই অসাধিত থেকে যেতে লাগলো। একদিকে অসুস্থ জিন্না বিছানায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন, অন্যদিক ফাইলের পর ফাইল জমা হতে লাগলো তাঁর দপ্তরে। কে দেখে, কে পড়ে তার ঠিক নেই। তখন লোকের কথাও গায়ে সইতো না জিন্নার। যেন ছেঁকা লাগছে গায়ে এমন অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন তিনি। সেই সময় ইংরেজ সামরিক সচিব কর্নেল বার্নী তাঁর সম্বন্ধে সে সরেস মন্তব্যটি তাঁর ডাইরিতে লেখেন তার মধ্যেই জিন্না চরিত্রের সঠিক ছবিটি যেন পাওয়া যায়। কর্নেল বার্না লেখেন, 'হাতে চাঁদ পেলে ছেলেরা যেমন হয়ে ওঠে, জিন্নাও তেমনি অবুঝ হয়েছেন। একমুহূর্তের জন্যও চাঁদটা হাতছাড়া করতে চাইছেন না।'

তখন যেন এক দুর্বোধ্য নীচতার প্রশ্রয় দেখা যায় জিন্নার চরিত্রে। প্রায় তাজ্জব করে দেবার মতন সেই নীচতা ফুটে উঠলো যখন তাঁর এ.ডি.সি.কে ডেকে ক্রকেট (croquet) খেলার সেটটা নিজের কাছে আনিয়ে নিলেন তিনি। তাঁর ব্যক্তিগত বিমানটা প্রায় অকেজো হয়েই পড়ে থাকতো তখন। বিমান কর্মীরাও বসে থাকতো। স্বার্থপর দৈত্যের মতন বিমানটাকে সর্বদা চোখে চোখে আগলে রাখতেন তিনি। এমনকি বিপন্ন উদ্বাস্তুদের স্থানান্তরে পাঠানোর কাজেও বিমানটাকে ব্যবহার করতে দেন নি তিনি। তাঁর যুক্তি ছিল যে এই অনুমতি দিলে কু-নজির সৃষ্টি করা হবে। তাঁর সচিবালয়ের খুঁটিনাটি খরচ নিয়ে প্রায়ই তখন তুলকালাম করতে লাগলেন জিন্না। সকলের যেন মাথা কাটা যেতে লাগলো লজ্জায়। হয়ত কিছুটা সাশ্রয় হতো কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত খানাপিনার পিছনে দ্বিগুণ অপব্যয় হতো।

মোদ্দা কথা যে, জিন্না তখন একটা অহেতুক ভয় তাড়স নিয়ে দিন কাটাতেন। তাঁর কেবলই আতঙ্ক, এই বুঝি তাঁর পুরনো কংগ্রেসী শত্রুরা তাঁর সাধের ধন কেড়ে নেয়। তখন তাঁর দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে, তাঁর 'ইন্তাকাল' হবার পর হিন্দু কংগ্রেসীরা কিছুতেই পাকিস্তানকে শিকড় গেড়ে বসতে দেবে না। মূলে হাবাত করে দেবে এই শিশু রাষ্ট্রকে। এর লিখন যেন চতুর্দিকেই দেখতে পাচ্ছেন তিনি। জুনা-গড়, কাশ্মীর, পাঞ্জাব সর্বত্রই চক্রান্ত চলছে, কেমন করে দেশভাগের সুফলটুকু বাতিল করে দেওয়া যায়। তাহলেই পাকিস্তানকে ভেঙে দেওয়া যাবে। এই সময় নাগাদই চরম আঘাতটি এসে লাগলো তাঁর গায়ে। তখন ডিসেম্বরের মাঝামাঝি।

www.pathagar.com

বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরেই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে পরিসম্পতের (asset) হিস্সা নিয়ে চুলচেরা আলোচনা হচ্ছে। অবশেষে একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো দুই রাষ্ট্রের আলোচনাকারীদের মধ্যে। স্বাধীন হবার সময় অবিভক্ত ভারতের তহবিলে মজুদ জমার (Cash reserve) পরিমাণ ছিল ৪০০ কোটি টাকা। ঐকমত্য হলো যে এই সঞ্চয় থেকে পাকিস্তানকে তখনই ২০ কোটি টাকা অগ্রিম দেওয়া হবে এবং আরও ৫৫ কোটি টাকা যেটি তার প্রাপ্য হবে, তা তাকে যথাসময়ে দেওয়া হবে। কিন্তু পাকিস্তানের পাওনা ৫৫ কোটি টাকা সে পেল না। যে অজুহাত দেখিয়ে তাকে এই টাকা দেওয়া হ'ল না, সেটিও ঘোষণা করা হলো। বলা হলো যে এই টাকা দিয়ে পাকিস্তান বিপজ্জনক সমরাস্ত্র খরিদ করবে এবং সেই সব মারণাস্ত্র ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। সুতরাং কাশ্মীর সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তান তার প্রাপ্য বখরা পাবার যোগ্য হবে না।

বলাবাহুল্য, ভারত সরকারের এই চুক্তিবিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে মহা ফাঁপরে পড়লেন জিন্না। রীতিমত সসেমিরা অবস্থা তখন পাকিস্তানের। কোষাগার প্রায় শূন্য। ভাঁড়ে মা ভবানী। এমন বাড়ন্ত অবস্থা কোষাগারের যে, পুরো বেতন দেবার ক্ষমতাও নেই। ২০ কোটি টাকার মধ্যে পড়ে আছে মাত্র ২ কোটি। সিভিলিয়ান চাকুরেদের বেতন কমিয়ে দেওয়া হলো। শেষমেশ যে আঘাতটা এসে লাগলো তা রীতিমত মর্মান্তিক। অপযশের বোঝার ভারে জিন্নার অহংকারী মাথা ধুলোয় লুটিয়ে গেল যখন আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন সংস্থা বি.ও.এ.সি. কোম্পানি তাঁর পাঠানো চেকখানি অপ্রচুর ব্যাঙ্ক পুঁজির কারণ দেখিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিল। বাস্তুহারাদের পরিবহনের জন্যই বি.ও.এ.সি. কোম্পানীর বিমানটি ভাড়া করেছিলেন জিন্না এবং তাঁর সরকার।

আহ্মেদনগর শহরে এসে মদনলাল পাওয়ার দিনগুলো বড়ই সুখে কাটছে তখন। পাঠকের হয়ত মনে আছে, একদিন বিশ বছরের এই ছেলেটি সম্বন্ধেই জ্যোতিষীরা ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিল যে সারা ভারতে তার নাম ছড়িয়ে যাবে। তা, আহ্মেদনগরে এসে পর্যন্ত মদনলাল সুখী। সে বেশ বুঝতে পারলো যে রিফিউজী হিসাবে নাম লিখিয়ে সে ভালই করেছে। দিব্যি আয়পত্র হচ্ছে যা পুলিসের চাকরিতে ঢুকলে হ'ত না। এখন তার কোন আপসোস নেই। এখানে তার নতুন মন্ত্রণাদাতা, গুরু হ'ল বিষ্ণু কারকারে। তারই পরামর্শে প্রায় দশ হাজার শরণার্থীর জন্য শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে এক আবাসন শিবিরের ব্যবস্থা করেছে সে। সেখানে মদনলালই তাদের রাজা।

কারকারের সংগে ষড় করে রিফিউজীদের জন্য 'ফন্ড' তৈরি করেছে সে। 'ফন্ডের' জন্য অর্থসংগ্রহ করা হয় শহরের কারবারীদের কাছ থেকে। চাঁদা আদায়ে গড়িমসি হলে তাদের হুমকি দেয়, বিশেষ মুসলমান কারবারীদের বিরুদ্ধে সে সর্বদাই খড়্গহস্ত। তাদের অর্থসংগ্রহপদ্ধতি খুবই অভিনব। চাঁদা দিতে গাফিলি করলে তাদের কারবার, দোকানঘর ইত্যাদি পুড়িয়ে দেয় তারা।

এইভাবে জবরদস্তি অর্থসংগ্রহ করে যথেষ্ট ধনী হয়ে উঠেছে তাদের 'ফন্ড'। তবে সংগ্রহের সবটুকুই উদ্বাস্তুদের সেবায় ব্যয় হয় না। তাদের নিজেদের খাওয়া-পরা ছাড়াও একটা বড় অংশ খরচ করা হয় বিষ্ণু কারকারের স্বপ্ন সার্থক করতে। আর.এস.এস. নামক জঙ্গি হিন্দু প্রতিষ্ঠানের গোঁড়া সমর্থক কারকারে। জঙ্গি

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠানের দাবি মেটাতে সে রসদ সংগ্রহ করে। তার গেস্ট হাউসের চিলেকোঠার ঘরটাতেই সেই রসদ মজুত করা হয়েছে। বিভিন্ন রকমের হাতিয়ার আর মারণাস্ত্রে ঘরখানা বোঝাই। চাঁদার অনেক টাকাই এর পেছনে খরচ হয় কারণ বন্ধুবর আপ্তের মতন তারও মনের বাসনা হলো হায়দ্রাবাদের নিজামের বিরুদ্ধে 'গেরিলা' আক্রমণ সংগঠন করা।

কিন্তু শিবাজীর মতন সফল হ'ল না তার উচ্চাশা। ফানুসটি হঠাৎ ফেঁসে গেল। নতুন বছরের (১৯৪৮) প্রথম দিনটাতেই এই দুর্ঘটনা ঘটলো। একটা খুনের মামলার তদন্ত করতে এসে পুলিসের নজরে পড়ে গেল এই সব অস্ত্রশস্ত্র। ডেকান গেস্ট হাউসে তখন বিষ্ণু কারকারে নেই। পুলিসের তর্জন গর্জনে ভয় পেয়ে গেস্ট হাউসের ম্যানেজার কবুল করলো যে এই সংগ্রহের মালিক বিষ্ণু কারকারে। ঠিক চারদিন পরে আর একটা দুর্ঘটনা ঘটলো। ইন্ডিয়ান সোস্যালিস্ট পার্টির তরফ থেকে সংখ্যালঘু মুসলমানদের নিরাপত্তার দাবিতে একটা জনসভার আয়োজন হয়েছিল শহরে। একদল গুন্ডা নিয়ে সেই সভা পন্ড করার সময় পুলিসের হাতে ধরা পড়ে গেল কারকারে ও মদনলাল। অবশ্য ধমক দিয়েই পুলিস তাদের ছেড়ে দিল। ছাড়া পেয়ে পরদিন ভোরেই তারা আহমেদনগর ছেড়ে পালাল। পড়ে রইল অত যত্নে সংগ্রহ করা অস্ত্রশস্ত্র। তারা সোজা গিয়ে পৌঁছাল পুণায়। কারণ পুণাই তখন সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপের সদর কেন্দ্র। মদনলালকেও সেইরকম বোঝাল কারকারে। বললো যে, সারা ভারতে পুণা শহরটাই তখন সন্ত্রাসবাদীদের পছন্দের কাজকর্ম আর আশ্রয়ের সবচেয়ে নিরাপদ স্থান।

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি ১৯৪৮

১৯৪৭ সনের সেই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের পর গংগা দিয়ে অনেক জলই গড়িয়ে গেছে। সেদিন বড়লাটভবনের স্টাডি রুমের সেই বৈঠকে বসে থাকা গান্ধীজী এবং লুই মাউন্টব্যাটনের হাতের মুঠোয় ধরা ছিল ৪০ কোটি ভারতীয়ের ভাগ্য। কিন্তু সময় যেন ঘটনাকে ধরে রাখতে পারে নি। তার পরে যে এতগুলো ঘটনা তাদের পরোয়া না করেই ঘটে যাবে, এ যেন ভাবতেই পারেন নি তাঁরা। মনে পড়ছে ইমারজেন্সি কমিটির কথা। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে লুই মাউন্টব্যাটেন তখন ভারতে ইংরেজ কর্তৃত্ব ফিরিয়ে এনেছিলেন। কত তাড়াহুড়ো আর গোপনীয়তার সংগে তিনি এই কাজটা করেছিলেন সর্বেসর্বা হয়ে। সেই জরুরী কমিটি এখন অতীতের ঘটনা। কমিটি ভেঙে দেবার পর তাঁরও বিক্রম অপসৃত। পুনর্মূষিক হয়ে গেছেন মাউন্টব্যাটেন। ফিরে গেছেন তাঁর পূর্বতন পদে, যেখানে তিনি শুধুই সাংবিধানিক কর্তা। নৈবেদ্যর ওপর বাতাসার মতন, ঠুঁটো, ওরা যা চেয়েছিল। এখন তাঁর সাংবিধানিক ক্ষমতা এতই সীমাবদ্ধ যে ভারতীয় নেতৃবর্গের সংগে বন্ধুত্বের সুবাদে যেটুকু আদায় করতে পারবেন সেইটুকুই তাঁর অধিকারের সীমা। এর বাইরে তিনি অস্তিত্বহীন।

মাউন্টব্যাটেনের মুখোমুখি হাতলওলা চেয়ারে বসে থাকা ওই কৃশ ক্ষীণ

www.pathagar.com

ঋষিপ্রতিম মানুষটির মুখে ফুটে উঠেছে সারা দেশের দুর্গতির ছাপ। বসে আছেন এমনভাবে যেন মরমে মরে আছেন। গায়ের চাদরের তলায় যথারীতি খোলা দুখানি পা দেখা যাচ্ছে। নেতৃবর্গ তাঁর উপদেশ, পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেছে, দেশের মানুষ তাঁর নীতি নিয়ে বচসা করেছে। আজ সব হারিয়ে তিনি একা। ওরা তাঁকে চায় না। তাই খড়কুটোর মতন জলে ভেসে যাচ্ছেন তিনি।

তবুও দেশভাগের দারুণ কষ্ট বুকে নিয়েও এই ইংরেজ ভদ্রলোকটি সম্বন্ধে, যিনি প্রায় কর্তব্যপালনের মতন দেশের ঘাড়ে এটি চাপিয়ে দিয়েছেন, গান্ধীজীর ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাপ্রীতি কখনও ক্ষুন্ন হয় নি। গান্ধীজী মনে মনে জানেন যে স্বাধীনতার পর থেকে তাঁর সব কাজের যথার্থ গুরুত্ব বুঝেছেন শুধু একজনই, তিনি মাউন্টব্যাটেন। হপ্তা কয়েক আগে যখন মাউন্টব্যাটেন দম্পতি রাজকুমারী এলিজাবেথের সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্র ফিলিপের বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে লন্ডন গেলেন, তখন ভাবী বরবধূর জন্য গান্ধীজী যে স্নেহ উপহারটি পাঠান তা মনে রাখার মতন উপহার। মাউন্টব্যাটেনের ইয়র্ক এম. ডব্লু ১০২ বিমানখানা তখন যাবতীয় দুমূর্ল্য উপহারে ভরে গেছে। কত রকমের মণি, মুক্তা, হীরে, জহরত, সোনাদানার 'সওগাত' পাঠিয়েছে ভারতের প্রাক্তন রাজারাজড়ারা। এত ঐশ্বর্যের মধ্যে গান্ধীজী পাঠালেন একটা ছোট্ট উপহার। একদিন যিনি মাথায় ভিক্টোরীয়ার মুকুট পরে সম্রাজ্ঞী হবেন তাঁর জন্য পাঠানো ভারতের মুক্তিদাতা বৃদ্ধের এই উপহারটি যেন প্রাণের ছোঁয়ায় উষ্ণ হয়ে আছে। গান্ধীজী পাঠালেন তাঁর নিজের হাতে কাটা সুতোয় বোনা একটা টেবিলঢাকা, টী ক্লথ।

মাউন্টব্যাটেনের সততা সম্বন্ধে গান্ধীজীর বিশ্বাসে কোন ফাঁক ছিল না। তাঁর কেমন এক দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে গভর্নর-জেনারেলের চেয়ারে বসে মাউন্টব্যাটেন এমন কোন কাজ করবেন না যা তাঁর সরকারের পক্ষে অসম্মানজনক হয়। বলতে কি, আগের মাসটায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ সম্ভাবনা বন্ধ করতে মাউন্টব্যাটেন যেভাবে কাজ করেছেন গান্ধীজীর চোখে তার চেয়ে প্রশংসনীয় আর কিছু হয় না। সত্যই অনেক কিছু করেছেন তিনি এই সর্বনাশা যুদ্ধ ঠেকাতে। ভারত যাতে কাশ্মীর সমস্যাটা নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের স্বারস্থ হয় তার জন্য নেহরুর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বটা প্রায় মনকষাকষির পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। এমনকি ব্যাপারটা অগ্নিগর্ভ বলে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সালিসি করতে ক্লিমেন্ট এ্যাটলিকে আনাবার প্রস্তাবও দিয়েছেন। পাকিস্তানের প্রাপ্য ৫৫ কোটি টাকা আটক করে রাখার সিদ্ধান্তটা তাঁর মনঃপুত হয় নি। মাউন্টব্যাটেনের ধারণা এর দরুন অপমানিত দেউলিয়া জিন্না মরিয়া হয়ে যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারেন। তাছাড়া নীতিগতভাবে টাকাটা পাকিস্তানেরই প্রাপ্য। কোন ওজর দেখিয়ে টাকাটা না দেবার সিদ্ধান্ত একধরনের প্রবঞ্চনা, আন্তর্জাতিক প্রতারণা, যার কোন নৈতিক সমর্থন নেই। নেহরু বা প্যাটেল তাঁর কোন যুক্তিই শোনেন নি। দুজনেই সার বুঝেছেন যে পাকিস্তানের হাতে এখনই এই টাকা দেওয়ার অর্থ হলো ভারতীয়দের রোষ উসকে দেওয়া। এতবড় ঝুঁকি নিতে তাঁরা চান না কারণ তাঁরা নিঃসংশয় যে এই টাকার প্রতিটি পাই-পয়সা দিয়ে অস্ত্র কেনা হবে এবং পাকিস্তান সেগুলো তাক করবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর দিকে।

মাউন্টব্যাটেনের সামনের চেয়ারে বসে থাকা বৃদ্ধ গান্ধীজীকে তখন ছোট্ট এতটুকু দেখাচ্ছিল। দেহমন দুইই অবসন্ন। গলার স্বরও নিস্তেজ হয়ে গেছে। কোন-

www.pathagar.com

রকমে একটু ধাতস্থ হয়ে প্রায় চুপিচুপি মাউন্টব্যাটেনের কাছে তাঁর মনের বাসনার কথা জানালেন। সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয়ে গেছে তাঁর। তবে ব্যাপারটা এখনও জানাজানি হয় নি। এমনকি তাঁর দুজন বিশ্বস্ত সহকর্মীদের কাছেও ব্যাপারটা তিনি ভাঙেন নি। কিন্তু কী সেই সিদ্ধান্ত যা তিনি নেহরু বা প্যাটেলকেও জানান নি? উৎসুক মাউন্টব্যাটেনের মুখের দিকে চেয়ে গান্ধীজী ধীরে ধীরে বললেন যে বেশ কিছুদিন ধরেই দিল্লির মুসলমান বন্ধুরা তাঁর পরামর্শ চাইছেন। কী করবেন তাঁরা? প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ভারতে থাকবেন না সব ছেড়েছুড়ে পাকিস্তানে চলে যাবেন?

মাউন্টব্যাটেন নিঃশব্দ। একটু থেমে গান্ধীজী ফের বললেন, 'আমি ওঁদের এখানেই থাকতে বলেছি। বিপদের ঝুঁকি নিয়েই থাকতে বলেছি ওঁদের। কিন্তু নিজে কোন ঝুঁকি না নিয়ে কতদিন ওঁদের মিথ্যা স্তোকবাক্য দিয়ে যাব?' গান্ধীজী চুপ করলেন। তারপর মাথা নেড়ে জানালেন সে অধিকার তাঁর নেই। মাউন্টব্যাটেন কি বলতে পারেন ওঁকে? তাই হতাশ গান্ধীজীর মুখের দিকে শুধু চেয়ে রইলেন। এবার গান্ধীজী তাঁর সংকল্পের কথা শোনালেন তাঁকে। তাঁর ধারনা, সংকল্পের কথা শুনে মাউন্টব্যাটেন রাগ করবেন না। গান্ধীজী তখন বললেন যে এই অসহনীয় অবস্থার প্রতিবাদ করতেই তিনি আমরণ অনশন করতে চান। যতদিন দিল্লির মানুষের মধ্যে মনের মিলন না হচ্ছে, ততদিন এই অনশন চালিয়ে যাবেন তিনি। তিনি বিশ্বাস করেন যে বাইরের চাপ দিয়ে মনের নিষ্ক্রিয়তা কাটানো যাবে না। কর্তব্যের তাগিদেই এই পুনর্মিলন হবে।

গভর্নর-জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন তখন প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেছেন যেন। আর্মচেয়ারে তাঁর লম্বা শরীরটা এলিয়ে দিলেন তিনি। তিনি ভালই জানেন যে গান্ধীজীর সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক করা চলবে না। এ তাঁর নিটোল প্রতিজ্ঞা। সারা জীবন ধরে যে নীতি ও বিশ্বাসকে সম্বল করে নিজেকে গড়ে তুলেছেন, সেটাই ফুটে উঠেছে এই নির্ভীক সংকল্পে। তাঁর মনে হলো, রাগ নয়, তিনি কুর্নিশ করবেন ওই ছোট্ট অথচ দৃঢ় মনোভাবের মানুষটিকে। তাই সসম্ভ্রমে গান্ধীজীর মুখের দিকে চেয়ে বললেনও সে কথা। 'আমি কেন রাগ করবো? বরং আমার মনে হচ্ছে, এর চেয়ে মহা সুন্দর কাজ আর হয় না। শুধু তাই নয়, আমি মনে করি যে অন্য সবাই যেখানে ব্যর্থ হয়েছেন শুধু আপনিই পারবেন সেখানে সফল হতে। আপনার সংকল্পের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছি আমি।'

কথাগুলো বলার সময় মাউন্টব্যাটেনের মনে এক চকিত উদ্ভাস হলো। তিনি জানেন যে, এই অনশন গান্ধীজীকে দারুণ নৈতিক শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করবে। বিড়লা ভবনের খড়ের শয্যায় শুয়ে যখন তিনি পা টিপে টিপে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন, তখন প্রতি দিন প্রতিটি মুহূর্তে ভারত সরকারের ওপর যে নৈতিক চাপ পড়বে, তা অন্য কেউ আড়াল করতে পারবে না। তখন নেহরু প্যাটেল, তাঁর কথা উড়িয়ে দিলেও মুমূর্ষু গান্ধীজীকে অস্বীকার করতে পারবেন না। গান্ধীজীকে তিনি খোলাখুলিই বললেন যে, পাকিস্তানকে প্রতিশ্রুত অর্থ না দেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ভারত সরকার নিজেই হেয় হয়ে গেছেন। জেনেশুনেই তাঁরা কলঙ্কের দাগ গায়ে মাখলেন।

এমন স্পষ্ট অভিযোগ শুনে খাড়া হয়ে বসলেন গান্ধীজী। ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে সায় দিলেন। হ্যাঁ, তিনি স্বীকার করেন যে কাজটা গর্হিত। হেয় হয়ে গেছে তাঁর দেশের সরকার। যখন কোন ব্যক্তি বা সরকার সর্বসমক্ষে চুক্তিবদ্ধ হয় তখন

www.pathagar.com

আর ফিরতে পারা যায় না শপথ থেকে। তাই চুক্তি ভঙ্গ করে ভারত সরকারও ফিরে আসতে পারেন না। তাছাড়া, তিনি সর্বদাই চেয়েছেন যে, বিশ্বের দরবারে তার আন্তর্জাতিক আচরণে সততা রক্ষা করে ভারত একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করুক। 'আত্মিক শক্তি'র পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে নিজেকে উজাড় করে দিক। কিন্তু তার বদলে জন্মলগ্নেই এ কি ভ্রষ্টাচার করে বসলো তাঁর ভারত? জন্মের শুরুতেই তাঁর দেশ এমন এক অপরাধের বোঝা মাথায় তুলে নিল যে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল তাঁর।

কিন্তু ভেঙে পড়লেন না গান্ধীজী। বরং মাউন্টব্যাটেনকে আশ্বস্ত করে বললেন যে, এই ইস্যু একটা নতুন মাত্রা এনে দেবে তাঁর অনশনকে। শুধু দিল্লিতে শান্তি ফেরানোই তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তিনি অনশন করবেন ভারতের হৃত সম্মান ফিরিয়ে আনতে। সুতরাং অনশন প্রত্যাহারের অন্যতম শর্ত হবে আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তানকে তার পাওনা টাকা মিটিয়ে দেওয়া। সন্দেহ নেই যে, গান্ধীজীর সিদ্ধান্তটি নির্ভীক ও সাধু। কিন্তু এর পরিণাম বড়ই মারাত্মক হয়ে ওঠে।

অপরাহ্নের আলো তখনও নিভে যায় নি। গান্ধীজী নিঃশব্দে বসে আছেন। তাঁর সারা মুখখানতে ছড়িয়ে পড়েছে দুষ্টু হাসির কিরণ। সেইভাবেই মাউন্টব্যাটেনের দিকে চেয়ে গান্ধীজী হঠাৎ বললেন, 'ওরা কিন্তু এখনই আমার কথা শুনবে না।' তারপর মুচকি হেসে বললেন, 'তবে শুনবে। একবার অনশন শুরু করি, তখন শুনতেই হবে আমার কথা।'

www.pathagar.com

ধ্বানত হলো 'গান্ধী মুর্দাবাদ'

জীবনের শেষ অনশন, নয়াদিল্লি ১৩-১৮ জানুয়ারি, ১৯৪৮

গান্ধীজীর জীবনের শেষ অনশন শুরু হ'ল মংগলবার, ১৩ জানুয়ারি সকাল ১১.৫৫ মিনিট থেকে। কনকনে ঠান্ডা সকাল। অন্য দিনের মতন সেদিন ভোরেও প্রার্থনা করছেন তিনি। ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করেছেন। তারপর উষ্ণতাহীন ঘরের কনকনানির মধ্যে বসে ধ্যান করেছেন। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' অর্থাৎ ধর্মসাধনা ভীরুদের কাজ নয়। তাদের ঈশ্বর দর্শন হয় না।

বেলা ঠিক সাড়ে দশটাতেই দিনের প্রধান আহার সেরে নিয়েছেন তিনি। দুখানা চাপাটি, একটা আপেল, আধসের ছাগলদুধ আর কয়েকটা আঙ্গুর। খাওয়া শেষ হতেই ভক্তেরা তড়িঘড়ি প্রার্থনাসভার আয়োজন করে ফেললো বিড়লাভবনের বাগানের মধ্যে। খুবই ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সহচর আর আশ্রমবাসীদের নিয়ে এই প্রার্থনাসভা। শ্রীমতী মনু, শ্রীমতী আভা তাঁর 'দ্বিতীয় যষ্ঠি', সচিব প্যারেলাল নায়ার, প্যারেলালের ডাক্তার বোন সুশীলা এবং গান্ধীজীর আধ্যাত্মিক উত্তরসাধক জওহরলাল। প্রার্থনাসভা শেষ হ'ল সুশীলার খ্রীষ্ট সাধনসংগীত দিয়ে। সুশীলা গাইলেন 'হোয়েন আই সার্ভে দি ওয়নড্রস ক্রস।' গানটি শুনতে শুনতে অভিভূত গান্ধীজীর মনে পড়ে গেল তৃণাচ্ছাদিত দক্ষিণ আফ্রিকার দিনগুলির কথা যেখানে তিনি প্রথম এই গান শোনেন। সেই থেকে যখনই এই গান শুনেছেন তখনই উদাস হয়ে গেছেন তিনি।

গান শেষ হ'ল। আনমনা গান্ধীজী শীতের দুপুরের মিষ্টি রোদে খাটিয়ার ওপর শুয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন। একটা গভীর সোয়াস্তি ছড়িয়ে পড়েছে শরীরে। ক'টা হপ্তা কী ঝড়ই বয়ে গেছে শরীরের ওপর দিয়ে। দুঃখ বেদনায় ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল দেহমন। এখন মুক্ত সেই দুঃসহ অবস্থা থেকে। আঃ কি শান্তি! চারপায়ার ওপর পড়ে থাকা তন্দ্রাচ্ছন্ন গান্ধীজীকে দেখে প্যারেলালের মনে হ'ল যে, সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লিতে আসা থেকে গান্ধীজীকে এমন 'প্রফুল্ল', এমন 'নিরুদ্বেগ' কখনো দেখেন নি তিনি।

দিল্লি তখন দিশি-বিদেশী সাংবাদিকদের পীঠস্থান হয়ে উঠেছে। সারা বিশ্বের সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলো গান্ধীজীর এই বিষম অগ্নিপরীক্ষার ঘটনাটা অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশন করতে চায়। তাঁর কলকাতায় অনশনের সময় যা করতে পারা যায় নি, এখানে সেটাই করতে চাইছে ওরা। গান্ধীজীর এই আকস্মিক সিদ্ধান্তটা অনেককেই ভাবিয়ে তুলেছে যেন। কেননা তখনও কলকাতার মতন হয়ে ওঠে নি দিল্লির অবস্থা তখনও দাংগা খুনোখুনি ছড়িয়ে পড়ে নি শহরের রাস্তায়। যদিও দিল্লি তখন বেশ থমথম করছে চাপা উত্তেজনায় এবং কখন কি হয় তারও আগাম আন্দাজ করা কঠিন। তবুও কলকাতার মতন দিল্লির রাস্তায় সাম্প্রদায়িক খুনোখুনি নতুন করে শুরু হয় নি। কিন্তু গান্ধীজী যেন তাঁর সহজাত প্রজ্ঞা দ্বারাই অনুমান করতে পেরেছিলেন যে অতি সত্বর আর একটা ভয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটতে চলেছে সারা দেশে এবং এই রাজধানী শহরেই তিনি নাকে গন্ধ পেয়েছেন সেই বিস্ফোরক বারুদের।

www.pathagar.com

গান্ধীজীর এই অনশনের সিদ্ধান্ত এবং তাঁর দেওয়া শর্তগুলো দেশের মানুষের মনে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো যেন। কেউ বিমূঢ়, কেউ ক্ষুব্ধ, অনেকেরই আবার রীতিমত যুদ্ধংদেহী মনোভাব। তখন দিল্লির যা রাজনৈতিক পরিবেশ তাকে মোটেই সাফল্যের অনুকূল অবস্থা বলা যায় না, যেমন কলকাতার ছিল। বরং ঠিক বিপরীত ছিল অবস্থা। প্রায় রোজই তখন দলে দলে ছিন্নমূল মানুষ পাকিস্তান থেকে উৎখাত হয়ে দিল্লি এসে পৌঁছচ্ছে। দিল্লিতে পৌঁছে তাদের হয়রানির একশা হলো। একে খোলামাঠের প্রচণ্ড শীত তায় শরণার্থী শিবিরগুলোর দুরবস্থা। ফলে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আর পাকা গাঁথনির আস্তানা খুঁজতে গিয়ে তারা শহরময় ছড়িয়ে থাকা মুসলমানদের পরিত্যক্ত ঘরবাড়ি আর মসজিদের মধ্যে দিব্যি ঘরসংসার পেতে বসলো। এমন নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে ওদের আবার ওই নিকৃষ্ট উদ্বাস্তু শিবিরে ফিরে যেতে বলছেন মহাত্মা। শুধু তাই নয়, তিনি গোঁ ধরেছেন যে পাকিস্তানের হাতে বকেয়া ৫৫ কোটি টাকা প্রত্যর্পণ করা হ'ক। অনশন প্রত্যাহারের এই শর্তদুটির কথা শুনেই জনমত দারুণ রুষ্ট হ'ল। এমনকি ভারত সরকারও যেন দুভাগ হয়ে গেল এই ইস্যুতে।

অবশ্য এতসব ভাবনাচিন্তা যাঁকে নিয়ে সেই অস্থিসার বৃদ্ধ মানুষটি তখন বিড়লাভবনের বাইরে পেতে রাখা খাটিয়ার ওপর শুয়ে গায়ে শীতের দুপুরের রোদ মেখে দিব্যি ঘুমচ্ছেন। হয়ত ওই ক্ষীণ দেহখানা দেখে কারও মনে হতে পারে যে মানুষটাকে হয়ত ভুলে গেছে দেশের লোক। মনে হতে পারে যে আদর্শ তিনি এতকাল প্রচার করেছেন তা ছেঁড়া পাতার মতন দূর করে দিয়েছে ওরা। কিন্তু তা নয়। এবার দেশের মানুষের বিরুদ্ধেই গান্ধীজী তাঁর এই প্রাচীন অস্ত্রটি প্রয়োগ করবেন। একদা যা বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতেন, এবার সেটার প্রয়োগ হবে দেশের মানুষের বিরুদ্ধে। তিনি ওদের বুঝিয়ে দিতে চান তিনি কে এবং কী তাঁর আদর্শ। শেষবারের মতন দেশের মানুষ উপলব্ধি করুক তাঁর জীবনবোধ।

পুণা, ১৩ জানুয়ারি ১৯৪৮

প্রায় একই সময় তখন দিল্লি থেকে সাতশ' মাইল দূরে পুণার সেই চুনকাম করা চালাঘরের সামনে দুজন যুবককে প্রায় খোঁটার মতন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। হপ্তা দশেক আগে এই চালাঘরের মধ্যেই 'হিন্দু রাষ্ট্র' পত্রিকার এই দপ্তরটির উদ্বোধন হয়েছে। টেলিটাইপ যন্ত্রটা সেদিনই বসানো হয়েছিল। যন্ত্রটার কাচের জানলার দিকে চোখ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওই যুবক দুজন। নাথুরাম গড্‌সে এবং নারায়ণ আপ্তে। তখন যন্ত্রের ভেতর থেকে প্রায় জলোচ্ছ্বাসের মতন সংবাদ বুলেটিনগুলো বেরিয়ে আসছে। কে বলতে পারে এই সংবাদগুলোই অনিবার্যভাবে ওই যুবক দুজনের নিয়তি স্থির করে দিল কি না! সংবাদলিপির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই ওরা প্রথম জানতে পারলো যে গান্ধীজী আমরণ অনশন শুরু করেছেন। শুধু তাই নয়, অনশন প্রত্যাহারের যে

www.pathagar.com

শর্ত দিয়েছেন তার একটি হ'ল পাকিস্তানের পাওনা ৫৫ কোটি টাকা ফেরত দেওয়া। শর্তটা দেখেই ওদের মাথায় যেন খুন চড়ে গেল। আর এরই প্ররোচনায় ওই দুই জঙ্গি হিন্দুর নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা স্পৃহা যে জঘন্য অপরাধে ওদের লিপ্ত করলো তা ভাবতেও শিউরে উঠবে সারা পৃথিবী।

টেলিটাইপ যন্ত্রটার সামনে দাঁড়িয়ে সংবাদ বুলেটিনগুলোর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই কেমন ফেকাশে হয়ে গেল নাথুরাম। ছি ! ছি ! এ সব কি করছেন বুড়ো গান্ধী ? এ ত রাজনৈতিক ব্ল্যাকমেল ! চাপ দিয়ে কিছু আদায় করে নেবার কৌশল ! একদিন এই মানুষটার কথাতেই সে অম্লানবদনে ইংরেজের জেলে গেছে। কিন্তু আজ এই মানুষটাকেই সে সবচেয়ে ঘেন্না করে। মানুষটা অন্যায়ভাবে মুসলমান খুনে গুন্ডাদের তোয়াজ করতে ভারত সরকারের ওপর চাপ দিতে চাইছে। তার মনে হ'ল যে আপ্তে বা পুণার আরও কিছু গোঁড়া হিন্দুদের মতন সেও এখন থেকে ভারতের রাজনীতি থেকে জোর করে গান্ধীজীকে সরিয়ে দেবার কথা রাস্তাঘাটে বলাবলি করবে। তাদের এই সিদ্ধান্তটা সঠিকই। অবশ্য পুণার মানুষ ওদের এই-সব তর্জন গর্জন নেহাতই পাগলের প্রলাপ বলে ধরে নিয়েছিল সেদিন।

কিন্তু ব্যাপারটা নেহাত 'বালভাষিতং' নয়। সংবাদলিপির দিক থেকে চোখ সরিয়ে পাশে দাঁড়ানো আপ্তের দিকে তাকাল গড়্সে। চোখেচোখে কথা হ'ল দুজনের। হায়দ্রাবাদে গেরিলা আক্রমণের জবরদস্ত পরিকল্পনা, জিন্না হত্যার চক্রান্ত ইত্যাদি ব্যাপারগুলো তখনকার মতন এক পাশে সরিয়ে রাখলো ওরা। এখন তাদের একটাই চিন্তা, একটাই উদ্বেগ এবং একটাই লক্ষ্য। তার জন্য সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করতে হবে। তাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হবে একটাই, গান্ধী-হত্যা। আপ্তে তাকাল গড়্সের চোখের দিকে। সর্বনাশের সেই ছায়াটাই দেখলো সে তার চোখে। দাঁতে দাঁত চেপে গড়্সে তখন হিসহিস করে বললো, 'গান্ধীকে আমরা মারবই।'

শীতের বেলা পড়ে আসছে। অস্তগামী সূর্যের শেষ কিরণ গায়ে মেখে ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছেন গান্ধীজী। বিড়লাভবনের চমৎকার কেয়ারি করা লন্ মাড়িয়ে যাবার সময় একটুও টলমল ভাব নেই তাঁর পা ফেলায়। একটা হাত মনু আর অন্য হাত আভার কাঁধে রেখে দিব্যি দৃঢ় পায়ে লাল পাথরের চার সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে মূল বাগানে উঠলেন। লন্ থেকে চার ধাপ উঁচু বাগানটা। বাগানের চারপাশে হাঁটু সমান উঁচু রেলিং। তার গা বেয়ে লাল গোলাপের বেড়। বেশ বড় বাগান। অন্তত এক জোড়া টেনিস কোর্টের মতন এর আয়তন। এই গোলাপ বাগানে ঢুকলেই গান্ধীজীর মন যেন জুড়িয়ে যায়। আঃ ! কি শান্ত এর পরিবেশ ! গান্ধীজী তাই এই বাগানটাই তাঁর দর্শনপ্রার্থীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার স্থান হিসাবে বেছেছেন। এখানেই বসাচ্ছেন তাঁর সান্ধ্য প্রার্থনাসভা।

বাগানের এক প্রান্তে সুদৃশ্য খিলানযুক্ত একটা ছোট্ট মন্ডপ। লাল পাথরমোড়া এই সুদৃশ্য চাঁদনির মধ্যেই গান্ধীজীর পার্ষদরা আধ ফুট উঁচু একটা মঞ্চ তৈরি করেছে। মঞ্চের ওপর গান্ধীজীর জন্য খড়ের গদি পাতা আছে। আর আছে একটা মাইক্রোফোন। গদির এক ধারে যত্ন করে মনু সাজিয়ে রেখেছে তিনটি প্রায় অপরি-হার্য বস্তু। একখন্ড শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, গান্ধীজীর ব্যবহারের নোটবই, তাঁর সেদিনের ভাষণের মূললিপি আর পিতলের একটা পিকদানি। আজকের এই

www.pathagar.com

প্রার্থনাসভায় অন্য দিনের মতন শুধু ঈশ্বরীয় আলোচনা হবে না। আজকের সভা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই ইতোমধ্যেই দু'শ মানুষ জড়ো হয়েছেন মঞ্চের সামনে। গান্ধীজী মঞ্চে উঠলেন। তারপর ভক্ত অনুরাগীদের তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়ে কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'একলা চল রে' গানটি গাইতে বললেন। তাঁর মনে পড়লো যে নোয়াখালির জলজঙ্গলে এই গানটি গাইতে গাইতেই তাঁর তীর্থযাত্রা নির্ভয় করেছেন তিনি। গান্ধীজীর অনুরোধে সবাই তখন গাইছিলেন, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে!'

গান শেষ হবার পর ভক্তদের কিছু উপদেশ দিতে চাইলেন গান্ধীজী। প্রথমেই তিনি বললেন, 'এই অনশন হলো ভগবানের কাছে চিত্তশুদ্ধির প্রার্থনা। যেন সবাই সমান ভাবি নিজেদের। হিন্দু, শিখ, মুসলমান সবাই এক মায়ের সন্তান। তাই সহোদরের মতন পাশাপাশি বাস করার মনোবৃত্তি তৈরি করতে হবে সবাইকে।'

লাইফ ম্যাগাজীন পত্রিকার মহিলা সাংবাদিক মার্গারেট বুর্ক হোয়াইট স্তব্ধ হয়ে গেলেন গান্ধীজীর জ্বলন্ত বিশ্বাসের কথাগুলো শুনে। তাঁর মনে হলো যথার্থ কথাই বলেছেন গান্ধীজী। ও'র সেই অধিকার আছে; আছে সেই দার্শনিক উপলব্ধি। তাই মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধের কল্পনা তাঁর কাছে কোন পলকা বিশ্বাস নয়। অনেকের মতন সেই তরুণী সাংবাদিকেরও সেদিন মনে হলো, 'যেন এক মহান সত্তা ঢেকে রেখেছে ওই ক্ষীণ মানুষটিকে'। তখন গোধুলি আলোয় দাঁড়িয়ে গান্ধীজী ও'দের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

গান্ধীজী বললেন, 'তোমরা সাবধান। এখন এক কঠিন পরীক্ষার কাল চলেছে। তোমরা, দিল্লির মানুষরা, কেউ তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ো না। তোমাদের কাছে এই আমার দাবি। যদি পাকিস্তানে ওরা সব শিখ, হিন্দুকেও হত্যা করে, তাহলেও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে দিল্লির মানুষ যেন একটি মুসলমান শিশুকেও হত্যা না করে।' সবাইকে রক্ষা করতে হবে দিল্লির মানুষদেরই। যাতে 'প্রকৃত ভারতীয়' হয়ে ওঠে সবাই। 'মন থেকে পাশববৃত্তি সরিয়ে সেখানে মানবতাবোধ স্থাপন করতে হবে। যদি কেউ না পারে তাহলে আমার বেঁচে থাকা অর্থহীন, নিষ্ফল।'

গান্ধীজীর কথা শেষ হলো। প্রার্থনাসভার তখনকার পরিবেশ কেমন যেন বিষণ্ণ, গম্ভীর। একপাশে হাঁটু মুড়ে বসে শ্রীমতী মনু গান্ধীজীর প্রিয় গীতা-খানি এবং তাঁর ব্যবহারের পিকদানিটা গুছিয়ে রাখছে। তখন ভক্ত অনুরাগীরাও উঠে পড়েছে। কারও মুখেই কথা নেই। ওরা দাঁড়িয়ে দুপাশে সরে গেল যাতে ওদের মধ্য দিয়ে পথ করে চলে যেতে পারেন গান্ধীজী। তরুণী বিদেশিনী সাংবাদিক মার্গারেট দেখলো যে মানুষটি ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছেন ভক্ত অনুরাগীদের মধ্য দিয়ে। যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ ঠায় তাকিয়ে রইল মেয়েটির স্নেহময় চোখ দুটি। যেন ছবি তুলে নিল ওই ছোট্ট রোগা মানুষটির। অবশেষে বাগান থেকে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল গান্ধীজীর চেহারাটা। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মার্গারেটের চোখেও ফুটে উঠলো একটা আশ্চর্য ভাবনা, 'আমরা কি গান্ধীজীকে আবার দেখতে পাবো?'

www.pathagar.com

পুণা, ১৩ জানুয়ারি ১৯৪৮

'হিন্দু রাষ্ট্র' পত্রিকার দপ্তরে চারজনের যে গোপন বৈঠক বসেছে সেখানে উঁকি মারার মতন কোন নজরদারী চোখ সেদিন দেখা গেল না। মাস তিনেক আগে যে সাদা পোশাকের পুলিসটা এই পত্রিকার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গোয়েন্দাগিরি করেছিল সে আজ নেই। শোনা যায় লোকটাকে নাকি এই কাজ থেকে রেহাই দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। তার দুর্ভাগ্য যে সে রাতের এমন গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শগুলো নাথুরামের মুখ থেকে শোনার সুযোগ তার হলো না, যা একজন ভারতীয় পুলিস-রূপে তার শোনা দরকার ছিল। নাথুরামের পাশে বসেছে আপ্তে। লোকটা যেন আজ অন্য মানুষ। বেখাপ্পা রকমের চুপচাপ বসে আছে আপ্তে। নাথুরামের মুখোমুখি বসেছে ডেকান্ গেস্ট হাউসের মালিক বিষ্ণু কারকারে। বিষ্ণুর পাশে বসেছে মদনলাল পাহ্ওয়া নামে সেই পাঞ্জাবী হিন্দু উদ্বাস্তু ছেলেটি যে প্রায় জন্ম থেকেই বদমেজাজী।

বৈঠকের শুরুতেই দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করলো গড্‌সে। তারপর সেঙাতদের দিকে চেয়ে বললো, 'একটা বিহিত করতেই হবে আমাদের।' সেঙাতরা তখন তাকিয়ে আছে গড্‌সের দিকে। শপথ নেবার ভঙ্গিতে গড্‌সে বললো, 'যেমন ভাবে হ'ক, গান্ধীকে সরিয়ে দেব আমরা।' মদনলাল সঙ্গে সঙ্গে রাজী। প্রতিহিংসা নেবার এই-ই সুযোগ। বলা যায়, এরই অপেক্ষায় দিন কাটিয়েছে সে এই ছ'টা মাস। তবে মদনলাল একা নয়। গড্‌সের প্রস্তাবে সায় দিল বিষ্ণু কারকারেও।

'হিন্দু রাষ্ট্র' দপ্তরের গোপন সভা শেষ করে ওরা চারজন গেল সাধু ভেকধারী সেই অস্ত্রকারবারী দিগম্বরের কাছে। ওদের সঙ্গে নিয়ে দিগম্বর গেল তার চোর-কুঠুরিতে। তারপর স্যাকরা যেমন ভেলভেট কাপড়ের ওপর গয়না সাজিয়ে রেখে খরিদ্দারদের দেখায়, তেমনি দিগম্বরও একটা কম্বল পেতে বিভিন্ন অস্ত্রগুলো সাজিয়ে রেখে ওদের দেখালো। নির্দেশ মতন প্রায় সব অস্ত্রই যোগাড় হয়েছে একটি ছাড়া। সেই বস্তুটি হ'ল স্বয়ংক্রিয় পিস্তল। বস্তুটা সত্যই অপরিহার্য। তাই পিস্তল না পাওয়ায় ওরা একটু মুষড়ে পড়লো। যাক, যা সংগ্রহ করা গেছে সেগুলি পছন্দ করে আলাদা করে ফেললো আপ্তে। হাতবোমা, ডেটোনেটর, হাই-এক্সপ্লোসিভ ইত্যাদি। পরদিন সবাইকে সন্ধ্যের পর দাদারের হিন্দু মহাসভা আপিসে দেখা করতে বললো আপ্তে। তারপর প্রায় চোরের মতন চুপিচুপি রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিল ওরা চারজন।

গড্‌সেকে এবার পুণা ছাড়তে হবে। পুণা শুধু তার জন্মস্থান নয়, এই শহরটাই তাকে উগ্র হিন্দুয়ানায় গড়েপিঠে মানুষ করেছে। নতুন জীবনদর্শন দিয়েছে। তবে যাবার আগে তাকে একটা শেষ কাজ করতে হবে। একটা জরুরী দায়িত্ব মিটিয়ে যেতে হবে তাকে। পরম শত্রু গান্ধীজীর মতন তারও কোন নিজস্ব সম্পত্তি নেই। থাকবার মধ্যে আছে দুটো জীবনবীমা। ওরিয়েন্টাল লাইফ ইন্-স্যুর্যান্স কোম্পানির এই পলিসি দুটির কোন বেনিফিশিয়ারি বা দানভোগীর নাম সে দেয় নি। এবার দিল। প্রথমটা ৩০০০ টাকার পলিসি, দ্বিতীয়টা ২০০০ টাকার। প্রথমটার নম্বর ১১৬৬১০১, দ্বিতীয়টার নম্বর ১১৬৬১০২। প্রথম পলিসির বেনিফিশিয়ারি করলো তার ছোট ভাই গোপাল গড্‌সের স্ত্রীকে কারণ দিল্লি

www.pathagar.com

গিয়ে তার হাতে একটা পিস্তল পৌঁছে দিতে রাজী হয়েছে গোপাল। দ্বিতীয়টার বেনিফিশিয়ারি করলো তার বন্ধু আপ্তের সহধর্মিনীকে। একজন জীবনবিতৃষ্ণ মানুষ যেমন শেষ দানপত্র লিখে তার দায়িত্ব শেষ করে ফেলে, তেমনি সে-ও যেন বীমা কোম্পানির কেরানীর হাতে দরখাস্ত দুটি জমা দিয়ে তার সব দায় মিটিয়ে ফেললো। এখন সে বাতাসের মতন মুক্ত স্বাধীন। একটি ছাড়া আর কোন গরজ নেই। পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ যাঁকে সাধু পুণ্যাত্মা বলে ভক্তি শ্রদ্ধা করে তাঁকে হত্যা করা ছাড়া আর কোন দায় রইলো না নাথুরামের।

যতক্ষণ শরীরে বল সামর্থ্য আছে ততক্ষণ দিনের রুটিন কাজে কখনও গাফিলতি করেন নি গান্ধীজী। ফলে বুধবার দিন ভোরে সেই কনকনানি ঠান্ডার মধ্যেই গীতাপাঠ সমাপ্ত করলেন তিনি। তারপর ব্রাশ দিয়ে সাবধানে অবশিষ্ট দাঁত ক'টা মাজলেন। যখন তিনি দাঁত মুখ ধুচ্ছেন তখন ক্লান্ত গান্ধীজীকে বলতে শোনা গেল, 'আ !! আজ আর উপোস করতে ইচ্ছে করছে না যেন !'

কথাটা কানে গেল মনুর। কাছেই ছিল সে। বেচারা মনু সর্বক্ষণই তাঁর কাছাকাছি থেকে সেবা করে। এমনকি রাতেও দুবার উঠে দেখতে হয় যে বুড়ো মানুষটার গায়ে ঠিকমতন গরম কাপড় আছে কি না। মোটকথা, সেদিন গান্ধীজীর মুখে ওই আক্ষেপ শুনে মনু তাড়াতাড়ি তাঁর জন্য এক গেলাস সোডা মেশানো ঈষদুষ্ণ জল তৈরি করে আনলো। অনশনকালীন এই পানীয়টাই তাঁর প্রথম 'আহার'। গান্ধীজী একবার তাকালেন গেলাস হাতে মনুর দিকে। তারপর মুখ সিঁটকে ওষুধ গেলার মতন জলটুকু খেয়ে নিলেন।

গতকাল থেকে একটা ব্যাপার নিয়ে ভেবে চলেছেন গান্ধীজী। একটা চিঠি লিখেছে ছোট ছেলে দেবদাস। চিঠিটা নিয়ে তাঁর ভাবনার যেন শেষ নেই। তাঁকে অনশন প্রত্যাহার করে নিতে বলেছে দেবদাস। লিখেছে, 'তুমি বেঁচে থেকে যে কাজ করতে পারবে মরে গেলে তা পারবে না।' অতএব এই অনশন, উপবাসের কৃচ্ছ্রতা কেন ? অনেক ভেবে তাঁর কর্তব্য স্থির করেছেন গান্ধীজী। এখন সেটারই জবাব পাঠাতে চান। তাই মনুকে ডাকলেন তিনি। তারপর মুখে মুখে জবাবটা বলে গেলেন মনুকে। তাঁর জবানিতে মনু লিখলো, 'যাঁর নির্দেশে এই অনশন, শুধু সেই ঈশ্বরই পারেন আমায় অনশন থেকে বিরত করতে। তুমি ও তোমরা সবাই মনে রেখ যে, আমি বাঁচি বা মরি তাতে কিছু যায় আসে না ঈশ্বরের। তাঁর কাছে আমার একটিই অন্তিম প্রার্থনা, "হে ঈশ্বর, অনশনে যেন দৃঢ় থাকতে পারি ; অন্তত বেঁচে থাকার লোভে যেন তাড়াতাড়ি ব্রত ভেঙে না দিই।" '

তখন যথার্থই অক্ষম গান্ধীজীর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা তাঁর তরুণী চিকিৎসক সুশীলার কাছে এক মহা ভাবনার বিষয় হয়ে উঠেছে। এবার দিল্লিতে ফিরে আসা থেকেই গান্ধীজীর শরীরের শক্তি সামর্থ্যের পুঁজি বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। কলকাতায় অনশন করার পর থেকেই কিড্‌নি কাজ করছিল না। তার ওপর পাঞ্জাবের নিত্য নতুন অশান্তির জের তাঁর পরিপাকশক্তিও হীন করে দেয়। ফলে রক্তচাপ এলোমেলো হয়ে পড়ে এবং রক্তধমনীতে শ্বাসকষ্টের লক্ষণ ধরা পড়ে। এখন একমাত্র প্রতিষেধক রূপে সুশীলা যা দিতেন তা হ'ল সর্পগন্ধা গাছের ছাল থেকে তৈরি তরল ভেষজ। কিন্তু ইদানীং অনশনের নিয়মকানুন আরও কঠিন করে দেওয়ায় এটুকুও বন্ধ করে দিলেন গান্ধীজী। অবশ্য কোন ওষুধ সেবন করিয়ে

www.pathagar.com

তাঁর বয়সটা কমানো যেত না। গান্ধীজীর বয়স তখন ৭৮ চলছে। এই বয়সে প্রতি-দিন নিয়ম করে ওজন নেওয়ায় রাজী করানো ছাড়া, সুশীলা নিজেও জানতেন না, আর কতদিন এই ভাঙা দেহটার ধকল তিনি সইতে পারবেন।

সেদিন ওজন যন্ত্রের কাঁটা দেখে সুশীলার চক্ষুস্থির হয়ে গেল। রীতিমত এলোমেলো মাপ। একবার দেখেই মনের সংশয়ের যুৎসই জবাব পেয়ে গেলেন সুশীলা। অনশনের প্রথম চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই দেহের ওজন দুপাউন্ড কমে গেছে। সকালে ওজন ছিল ১০৯, পাউন্ড। চিন্তিত হলেন সুশীলা। তিনি জানেন যে গান্ধীজীর অস্থিসার শরীরে যেটুকু মেদ অবশিষ্ট আছে অনতিবিলম্বেই সেটুকু ক্ষয় হয়ে যাবে। তখনই শুরু হবে সংকটের কাল। গান্ধীজী বা অন্য যে কোন অন-শনকারীর পক্ষে বিপজ্জনক মুহূর্ত তখনই আসে যখন শরীরের মেদ সঞ্চয় নিঃশেষ হয়। তখন শরীরের ক্রিয়া বজায় রাখতে প্রোটিনের পুঁজিতে টান পড়ে। এই অবস্থা চলতে থাকলে বিপদাশংকা দেখা দিতে বাধ্য। তখন যে ভাবে হ'ক, এই অপচয় (প্রোটিন) বন্ধ করা দরকার। কারণ গান্ধীজীর দুর্বল শরীরে এই অপ-চয়ের বেগ বিপজ্জনকভাবে দ্রুত হয়ে পড়বেই।

আশ্চর্য মনে হয় যখন দেখি যে দিল্লিতে তখন প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত, বিশেষজ্ঞ পুরুষ ডাক্তারের অনটন না থাকলেও, গান্ধীজী তাঁর নিজের চিকিৎসার যাবতীয় দায়ভার একজন স্বল্প অভিজ্ঞ তরুণী চিকিৎসকের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। বস্তুত এটাই গান্ধীদর্শনের মূল ভাব যার পরিচয় আমাদের অল্পই জানা আছে। যেদিন তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করলেন, সেদিন থেকেই যোগ্য মর্যাদা দিয়ে মেয়েদের তিনি সামনে রেখেছেন।

তাঁর অটুট বিশ্বাস ছিল যে নারী জাতির বন্ধনমোচন ছাড়া ভারতবর্ষের যথার্থ মুক্তি আসবে না। তাঁর মতে মেয়েরা হলো মানবজাতির নিগৃহীত অর্ধাংশ (সাপ্-প্রেস্‌ড্ হাফ্ অব হিউম্যানিটি)। তাদের গোলামির মূলে আছে সংকীর্ণ পারিবারিক জীবনের একঘেয়েমি যেখানে পুরুষরাই শাসক হয়ে অপচয়িত জীবনের পাকে হীন করে রেখেছে মেয়েদের। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর প্রথম সেবাশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করার সময় থেকেই তিনি সবাইকে জানিয়ে দেন যে এই আশ্রমের গেরস্থালির কাজ নারীপুরুষ উভয়কেই ভাগ করে নিতে হবে। আশ্রমের মধ্যে এক এক সংসারের জন্য আলাদা হাঁড়ির ব্যবস্থা রাখতে দেন নি তিনি। সবার জন্য একটাই রসুইঘর এবং একই রকম আহারের ব্যবস্থা চালু করেছিলেন, যাতে পুরুষদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মেয়েরাও সামাজিক বা রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে পারে। এবং ইতিহাস সাক্ষী দেবে যে মেয়েরাও সেদিন পুরুষের পাশে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি পর্বে ব্রিটিশ পুলিসকে প্রতিরোধ করে-ছিল তারাও এবং পুরুষের মতন দলে দলে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে ইংরেজের কারাগারে বন্দী হয়েছিল।

নারীজাতির কল্যাণের জন্য তাঁর সকল উদ্যোগের মধ্যে তীব্র স্ববিরোধ না থাকলে গান্ধীজী কখনই গান্ধীজী হতেন না। পাঞ্জাবের দাংগায় ধর্ষিতা মেয়েদের তিনি দাঁতে জিভ কামড়ে নিশ্বাস বন্ধ করে মরতে বলেছেন। আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে ভারতের ক্রমবর্ধিত জনসংখ্যার সমাধানরূপে মেনে নেন নি কারণ এটা তাঁর অনুসৃত নীতি নয় বলে। গান্ধীজী মনে করতেন যে ইন্দ্রিয়সংযমই হলো জন্মনিয়ন্ত্রণের একমাত্র গ্রহণযোগ্য নীতি। যেমন নিজে পালন করেছেন তেমনি

www.pathagar.com

অন্যদেরও পালন করতে বলেছেন।

তবুও বলা যায়, যে সমাজ পতিহারা বিধবাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা দেয় নি, তাদের মর্যাদা কেড়ে নিয়ে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়ে মরতে বলেছে, সেই সমাজই গান্ধীদর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল সেদিন। তাই আধুনিক স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রিপরিষদে মন্ত্রী হয়েছিলেন একজন নারী।

সেদিন দুপুরের খানিক আগে স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রিপরিষদের সেই সদস্যরাই এসে জড়ো হলেন অনশনরত কৃশ মানুষটির শয্যাপাশে। তিনিই যেন আবার ভারতের জাগ্রত বিবেক হয়ে উঠেছেন। তাই তাঁর চারপাই ঘিরে বসেছেন নেহরু, প্যাটেল থেকে শুরু করে মন্ত্রিপরিষদের সব সদস্যরা। যে সুরম্য প্রাসাদোপম রাজভবনে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন ওই ক্ষীণতনু মানুষটি, সেই রমণীয় সুরক্ষিত প্রাসাদভবন ছেড়ে সবাই এসে জড়ো হয়েছেন এই চারপাইটার চতুর্দিকে। মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক আজ এখানেই বসবে। এখানেই আলোচিত হবে যে একটি বিষয় তা হলো পাকিস্তানের হাতে বকেয়া টাকা ফিরিয়ে দেবার দাবি।

কিন্তু গান্ধীজী যা দাবি করেছেন সেটি কিছুতেই ন্যায্য মনে করলেন না মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা। বরং সবাই মনে মনে আহত, ক্ষুব্ধ হলেন। বিশেষ, বল্লভভাই প্যাটেল। তিনি এবং নেহরু বোঝাবার চেষ্টা করলেন কেন তাঁরা টাকাটা ধরে রেখেছেন। কিন্তু গান্ধীজী নিঃশব্দ। চিত হয়ে শুয়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। বিছানায় উঠে বসতে পারছেন না। সে চেষ্টা করলেই মাথা ঘোরে। ওদের কথার কোন প্রতিবাদ করার ইচ্ছে বা শক্তি কোনটাই নেই। তবে প্যাটেলের জিদটা ক্রমশই যেন অশোভন কঠোর হয়ে যাচ্ছিল। তাঁর কর্কশ কথাগুলো মর্মে আঘাত করছে যেন। গান্ধীজীর চোখ দুটো জলে ভরে এল। এক ফোঁটা গড়িয়েও পড়লো বৃদ্ধের শুকনো গাল বেয়ে। কোনরকমে দুহাতের কনুইয়ে ভর দিয়ে শরীরটা আধখানা তুললেন গান্ধীজী। তারপর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা প্যাটেলের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালন। এই মানুষটাই কি সেই মানুষ যে কত কঠিন সংগ্রামের দিনে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে সাহায্য করেছেন ? মনে মনে মাথা নাড়লেন গান্ধীজী। না, না, তা কখনই হতে পারে না। তাই ভাঙা গলায় ফিসফিস করে বললেন, 'যে সর্দারকে আমি চিনতুম তুমি সেই সর্দার নও।' কথাটা বলেই বিছানার ওপর এলিয়ে পড়লেন গান্ধীজী।

সেদিন সারাটা বেলা দলে দলে হিন্দু মুসলমান আর শিখ নেতারা গান্ধীজীর শয্যাপার্শ্বে এসে তাঁকে অনশন তুলে নিতে অনুরোধ করলো। ওদের সকলের দুশ্চিন্তা যে ব্যাপার নিয়ে গান্ধীজীর সংগোপাঙ্গরা সুরক্ষিত বিড়লাভবনের নিরাপদ আশ্রয়ে বসে তার কিছুই টের পায় নি। এই প্রথম একজন প্রধান নেতার অনশন নিয়ে দেশের সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। নতুন দিল্লির শৌখিন হাটবাজার হ'ক আর পুরনো দিল্লির ভিড় করা চাঁদনি চকের গলিঘুঁজি হ'ক, সবাই আলোচনা করছে গান্ধীজীর অনশন নিয়ে। দিল্লি কংগ্রেসের একজন পার্টিকর্মচারীর সাম্প্রতিক আবিষ্কারটাই এর মূল কারণ। হাটেবাজারে ঘুরে সাধারণ মানুষের সংগে মিশে মানুষটি আবিষ্কার করেছে যে গান্ধীজীর প্রাণরক্ষা নিয়ে কোন মাথাব্যথা তাদের নেই। বরং অনেকের ধারণা যে বিড়লা-ভবনের চারপাইয়ার ওপর শুয়ে থাকা মানুষটির এ এক জঘন্য ষড়যন্ত্র। মুসলমান-

www.pathagar.com

দের কিছু পাইয়ে দেবার চক্রান্ত করেছে বুড়োটা। সেই কনকনে ঠান্ডা বিকালে দিল্লির হাটবাজারের মানুষের মুখে মুখে ফিরছে একটাই কথা, 'বুড়োটা আর কদিন জ্বালাবে?' ওরা কেউ তাঁর বাঁচার কথা নিয়ে একটুও ভাবছিল না। ওরা ভাবছে কবে এই 'উৎপাত' বন্ধ হবে। এমনকি গান্ধীজীর জীবন বাঁচাতে যে শান্তি মিছিল বেরোল, তার ওপরও হামলা করে ভেঙে দিল একদল ক্রুদ্ধ হিন্দু রিফিউজি।

সন্ধ্যের মুখে দূর থেকে ভেসে আসা অনেক মানুষের সমবেত ধ্বনি শোনা গেল। এ ধ্বনি চেনা। ওই শ্লোগানধ্বনি এগিয়ে আসছে বিড়লাভবনের দিকে। গান্ধীজীর বিড়লাভবনের সাঙ্গোপাঙ্গরা উৎসুক হয়ে উঠলো। ওরা উৎকর্ণ হয়ে শোনবার চেষ্টা করলো কি বলছে মানুষ। কলকাতার কথা মনে পড়ে গেল তাদের। সেদিন কলকাতাতেও ওই শ্লোগান শুনেছিল তারা। একদল মানুষের আর্ত কণ্ঠস্বর মিনতি হয়ে আছড়ে পড়েছিল গান্ধীজীর পায়ের কাছে, যেন তিনি অনশন প্রত্যাহার করে নেন। এরাও হয়ত সেই মিনতিটুকু নিয়ে আসছে। একজন সচিব ছুটে গেল ফটকের কাছে। তখন অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে এসেছে। রাস্তার অস্পষ্ট আলোয় সে দেখলো বেশ কিছু মানুষ মিছিল করে ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে আসছে অলবুকার্ক রোড ধরে। দেখা যাচ্ছে অসংখ্য পতাকা আর আবছা রেখার মতন মানুষের চেহারাগুলো।

অন্ধকার ঘরে শুয়ে আছেন গান্ধীজী। শব্দটা সেখানেও পৌঁছেছে। তবে অস্পষ্ট। ক্রমে আরও স্পষ্ট হলো ওদের চিৎকার। খাটিয়ার ওপর শুয়ে থাকা আচ্ছন্ন গান্ধীজীর কানেও ক্ষীণ হয়ে শব্দটা পৌঁছাল। ততক্ষণে গেটের কাছে পৌঁছে গেছে মিছিলকারীরা। ওদের শ্লোগানধ্বনি আছড়ে পড়লো আটকাঠ বন্ধ করা ঘরের মধ্যে। গান্ধীজীর হুঁশ হয়েছে এতক্ষণে। কান খাড়া করে বোঝবার চেষ্টা করলেন ওরা কি বলছে। কিন্তু পারলেন না। হতাশ গান্ধীজী হাত ইসারায় প্যারেলালকে কাছে ডাকলেন। তারপর নির্জীব স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হচ্ছে ওখানে? এত চেঁচামেচি কেন?'

প্যারেলাল বললো, 'একদল রিফিউজি এসে চেঁচাচ্ছে।'

'অনেক লোক?'

'না, না। অল্প কয়েকজন।'

'ওরা কি করছে?'

'শ্লোগান দিচ্ছে।'

গান্ধীজী আবার চেষ্টা করলেন ওদের শ্লোগানের কথা বুঝতে। এবারও পারলেন না। ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'কি বলছে ওরা?'

প্যারেলাল চুপ করলেন। মনে মনে ভাবতে বসলেন কি জবাব দেবেন। খানিক পরে ঢোঁক গিলে বললেন, 'ওরা বলছে "গান্ধী মুর্দাবাদ!"'

www.pathagar.com

বোম্বাই, ১৪ জানুয়ারি ১৯৪৮

গান্ধীজী হত্যার ষড়যন্ত্রকারী তিনজন যুবককে সেদিন বম্বের উত্তর শহরতলির একটা বেঢপ দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। গ্রিলের সদর দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ এবং আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ওই তিন যুবক তখন অপেক্ষা করছিল কখন গেট খুলে তাদের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হবে। পুরনো বাড়ি যেমন হয় সেইরকম চেহারা বাড়িটার। রোদে জলে ভিজে বাড়ির সামনেটা ভাঙাচোরা। পুরনো দেওয়ালের অনেক জায়গার পলস্তারা খসে গেছে। বাড়ির একমাত্র সুশ্রী বস্তু হলো ভবনের পরিচয়বহনকারী মার্বেল পাথরের ফলকটা। ঝকঝক করছে ওই ফলক। ফলকের গায়ে মারাঠি ভাষায় লেখা 'সাভারকর সদন।'

হ্যাঁ, এটাই সাভারকরদের বসতবাটী এবং বর্তমানে যে মানুষটি এখানে বাস করে, জঙ্গী হিন্দুয়ানির প্রবর্তক রূপে ইতিমধ্যেই সে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সারা দেশে। কিছুটা স্বঘোষিত মনে হলেও এই পরিচয়েই 'বীর' সাভরকরকে লোকে চেনে। এমনকি বিড়লাভবনের খাটিয়ার ওপর শুয়ে থাকা অনশনক্লিষ্ট বৃদ্ধ গান্ধীজীর পরম শত্রু এই মানুষটার ঘৃণাবোধও কিংবদন্তীস্বরূপ। বস্তুত গান্ধীজী অনুসৃত সব নীতিরই বিরোধী সে। যদি বলা যায় যে গান্ধীজীর বসবাসের প্রতিটি জায়গাই সেদিন অহিংসার দেবালয় হয়ে উঠেছিল, তাহলে উত্তর শহরতলির ছায়া ঘেরা কেলুশকর রোডের ওপর অবস্থিত সভারকর সদনকে অবশ্যই হিংসার হাঁড়িকাঠ বলা যায়। সুতরাং বম্বে শহরে এসে পেঁছানো চক্রান্তকারী ওই যুবক তিনজনকে সঙ্গত কারণেই এই ভবনের বন্ধ সদরের সামনে যে দেখা যাবে তা বলাই বাহুল্য।

ওই যুবক তিনজনকে আমরা চিনি। প্রথম দুজন যুবকের নাম যথাক্রমে ন্যাথুরাম গড়্সে ও নারায়ণ আপ্তে। তৃতীয় যুবকের নাম দিগম্বর বাড়্গে। দিগম্বরের পরনে আজ আর সাধুর পোশাক নেই। তাকে দেখে মনে হয় পথে পথে নেচে গেয়ে সে জীবিকানির্বাহ করে। তার বাঁ হাতে ধরা আছে একটা মস্ত ঢোল। আর এরই খোলের মধ্যে লুকানো আছে মারাত্মক অস্ত্রগুলো যা তার দোকান থেকে সদ্য কিনে এনেছে চক্রান্তকারীরা।

খানিক পরেই গ্রিলদরজা খুলে একজন বিশ্বস্ত অনুচর ওই তিনমূর্তিকে বসার ঘরে নিয়ে গেল। আসবাবের ভিড়ে জমাট হয়ে আছে বসার ঘরখানা। এখানেই অপেক্ষা করতে বলা হলো ওদের। বলতে গেলে, অল্প সংখ্যক বিশ্বাসযোগ্য মানুষ ছাড়া আর কাউকেই এই ঘর পেরিয়ে যেতে দেওয়া হয় না। ওদেরও যেতে দেওয়া হ'ল না। খানিক পরে বিশ্বস্ত অনুচরটি দিগম্বর ছাড়া অন্য দুজনকে সঙ্গে নিয়ে দোতলায় সাভারকরের ব্যক্তিগত বাসস্থানে নিয়ে গেল। হিন্দু রাষ্ট্র দলের সর্বাধিনায়ক বীর সাভারকর এখানেই বাস করে। দিগম্বরের বয়ে আনা ঢোলটা হাতে নিয়ে ওরা দুজন ঘরে ঢুকে দেখলো যে তাদেরই অপেক্ষায় বসে আছে সাভারকর। ওকে দেখেই আনুগত্য ও আজ্ঞাবহিতার প্রমাণ দেখাতে ওরা দুজন সাষ্টাঙ্গ প্রণত হলো। সাভারকরের পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে তার পদচুম্বন করলো। আর ওদের এই আনুগত্যের পুরস্কার হিসেবে ওদের বুকে জড়িয়ে ধরলো দুটো গুপ্তহত্যার অদৃশ্য নায়ক বীর সাভারকর।

www.pathagar.com

তবে সাভারকরের সদর কার্যালয়ের এই গোপন দুর্গে শুধু ওরা তিনজনই নয়, দলের আরও দুজন আগেই তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে গেছে। গুরুজীর কৃপা পেতে মদনলালকে সঙ্গে এনেছিল বিষ্ণু কারকারে। তার পরিচয় করিয়ে দেয় 'ভারী ডার্নাপটে' বলে। এই পাঞ্জাবী গোঁয়ার ছেলেটির দিকে প্রশ্রয়ের চোখে চেয়ে এক টুকরো ঠাণ্ডা শীতল হাসি উপহার দেয় সাভারকর। তারপর আশীর্বাদ করে বলে, 'ভাল কাজ চালিয়ে যাও!'

তো, সেদিন গুরুজীর সঙ্গে ওদের সাক্ষাতের পর তিনমূর্তি বিদায় নিল সেখান থেকে। তারপর রাস্তায় নেমে যে যার আশ্রয়ে ফিরে গেল রাত্রিবাসের জন্য। বাড়্গে গেল হিন্দুমহাসভার ডরমিটরিতে। আর ওরা দুজন গেল তাদের পদমর্যাদার উপযোগী সী গ্রীন হোটেলে। হোটেলে ঢুকেই অভ্যর্থনাকারিণীর কাছে একটা নম্বর চাইল আপ্তে। এই টেলিফোন নম্বরটি বোম্বাই পুলিসের সদর কার্যালয়ের। একজন ভাবী হত্যাপরাধীর কাছ থেকে এই নম্বরটি আশা করা যায় না। কিন্তু জগতে কত অঘটনই ঘটে। এরপর এক্সটেনশন ৩০৫ চেয়ে আপ্তে যার সঙ্গে কথা বললো সে একজন মহিলা। বোম্বাই পুলিসের চীফ্ সার্জনের এই মেয়েটি অনেকেরই অঙ্কশায়িনী হয়েছে। সুতরাং সেই সন্ধ্যায় আপ্তের শয্যাসঙ্গিনী হতেও তার আপত্তি হলো না।

গান্ধীজীর স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি যে এত দ্রুত হবে এবং অনশন শুরুর পর থেকেই তাঁর শরীর যে এমনভাবে ভেঙে যাবে, তা বোধহয় আন্দাজ করতে পারেন নি সুশীলা। ১৫ জানুয়ারি সকালে তাঁর মূত্র পরীক্ষার যে রিপোর্টটি হাতে পেয়েছেন সুশীলা, তা খুবই আশঙ্কাজনক। গান্ধীজীর প্রস্রাবে অ্যাসিটোন (acetone) এবং অ্যাসেটিক এ্যাসিডের প্রভাব বেশ উদ্বেগজনক। তার মানে, তাঁর স্বাস্থ্যের ক্ষয় শুরু হয়ে গেছে এবং শরীর থেকে কার্বোহাইড্রেট সঞ্চয় নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ শরীরের মধ্যে জীবনীবর্ধক প্রোটিনের ঘাটতি অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ অনশন শুরুর আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই অশীতিপর বৃদ্ধ গান্ধীজী যেন অনিবার্যভাবেই চিকিৎসাশাস্ত্রের বিপজ্জনক এলাকার মধ্যে নিমজ্জিত হলেন।

স্বাভাবিক কারণেই সুশীলা তাই উদ্বিগ্ন। শুধু এই অসাধারণ মানুষটির সেবা করবে বলেই রাষ্ট্র সঙ্ঘের একটা ফেলোশিপ বৃত্তি সে ছেড়ে দিয়েছে সম্প্রতি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যেন সংকটের মধ্যেই পড়ে গেছেন গান্ধীজী। উদ্বেগের আরও লক্ষণ ধরা পড়লো সুশীলার অভিজ্ঞ চোখে। গত চব্বিশ ঘণ্টায় গান্ধীজী জলপান করেছেন আটষট্টি আউন্স। কিন্তু জলত্যাগের পরিমাণ মাত্র আঠাশ আউন্স। সুশীলা জানেন যে কলকাতায় অনশন করার পর থেকেই গান্ধীজীর মূত্রাশয় ঠিক মতন কাজ করছে না। তাঁর গভীর দুশ্চিন্তা এই কারণেই। বলেছেনও সে কথা গান্ধীজীকে যে এ যাত্রায় সংকট কাটিয়ে ওঠা তাঁর পক্ষে মুশকিল। কিন্তু গান্ধীজীর যেন ভ্রূক্ষেপই নেই। সুশীলার কোন উপদেশই শুনতে চাইলেন না। বরং জোর করায় চাপা স্বরে যা বললেন, তা শুনে স্তম্ভিত হলেন তরুণী সুশীলা। গান্ধীজী বললেন, 'আমার প্রস্রাবে অ্যাসিটোনের উপদ্রব নিয়ে কেন ভাবছো? ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ওপর আমার আস্থা পরিপূর্ণ নয় বলেই এই উপদ্রব।'

স্তম্ভিত, কিছুটা বা বিরক্ত সুশীলা বললেন, 'এর সঙ্গে ভগবানের কী সম্পর্ক

www.pathagar.com

বাপু! ভগবানের কিছুই করবার নেই।' এই কথা বলে শরীর ক্রিয়ার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা করলেন কেন শরীরের মধ্যে হানিকর বস্তুর নিঃসরণ এত উপযোগী। গান্ধীজী চুপ করে শুনলেন এই ব্যাখ্যা। তারপর সুশীলার মুখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললেন, 'তা তোমার বিজ্ঞান কি সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে? ভুলে গেছ শ্রীমদভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি বলেছেন?' একটু চুপ করে গান্ধীজী আপনমনেই আবৃত্তি করলেন, "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।" (আমি নিজের এক অংশের দ্বারা সমস্ত জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছি—I bear this whole world in an infinitely small part of my being)।

সকাল ৭টা বেজে ২০ মিনিট হয়েছে তখন। অর্থাৎ গান্ধীজী যখন তাঁর তরুণী চিকিৎসক সুশীলাকে বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই সুবেশ যুবক নারায়ণ আপ্তে বম্বের এয়ার ইণ্ডিয়া লিমিটেডের বিমান আপিসে ঢুকলো এবং টিকিট কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে ১৭ জানুয়ারি শনিবার বিকালের দুখানা দিল্লির টিকিট কিনলো। টিকিট দুখানা কেনা হলো ডি.এন. কারমারকার ও এস. মারাঠের নামে। টিকিটের দাম বাবদ কাউন্টারবাবু ৩০৮ টাকা গুনে নিল, তারপর সবিনয়ে জিজ্ঞেস করলো ফেরার টিকিট চাই কি না। ছোকরার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলো আপ্তে তারপর ঘাড় নেড়ে জানালো যে এখনই ফেরার তাগিদ তাদের নেই। উপস্থিত দিল্লি যাবার একমুখী টিকিটই তাদের দরকার।

শরীরের দুর্বলতা সত্ত্বেও অন্যবারের মতন এবারও প্রতিদিন সকালে এনীম্যা নেবার জন্য জিদ করতে লাগলেন গান্ধীজী। অনশনের সময় প্রতিদিন নিয়ম করে এনীম্যার সাহায্যে শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বের করার এই অনুশীলন প্রায় অপরিহার্য মনে করতেন গান্ধীজী। বলতেন, 'জপধ্যান করলে যেমন মন পবিত্র হয় তেমনি শরীর শুদ্ধ হয় এই প্রক্রিয়া দ্বারা।' তাঁর এই গোপন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করাতে যে গান্ধীজীকে সাহায্য করতো সে হলো মনু। এই নিরলস শুশ্রূষাকারিণী অসাধারণ মেয়েটি ধূপের মতন পুড়ে আপনাকে গান্ধীজীর সেবায় বিলীন করেছে। তাই অনশনের আগের রাতেই গান্ধীজী তাকে কাছে ডেকে স্নেহভরে বলেছিলেন, 'এতবড় উৎসর্গের পেছনে শুধু তুমিই আমার সঙ্গিনী।'

তবে সঙ্গিনী মনুর ভূমিকাটি মোটেই অনায়াস ছিল না। এটা সেটা চেয়ে যখন তখন রাগ করতেন গান্ধীজী। মনুর অবাক লাগতো এই ভেবে যে মানুষটির বাইরের চেহারা কত শান্ত, নির্বিরোধী। হয়ত এনীম্যার জন্য গরম জল আনতে সামান্য দেরি হয়ে গেছে। গান্ধীজী বকাঝকা শুরু করে দিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। উত্তেজনায় ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। তারপর মনুকে কাছে ডেকে অনুতপ্ত গান্ধীজী স্নেহভরে বললেন, 'দ্যাখো মনু, জীবনে যখন এইরকম কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয় তখনই মানুষ তার ভুল বুঝতে পারে।'

মনু দেখেছে যে এনীম্যা দেবার পরেই ক্লান্তিতে অবশ হয়ে যান গান্ধীজী। প্রতিবারই এই ঘটনা ঘটে। তখন শরীরটা তুলোর মতন সাদা হয়ে যায়। বিছানার

www.pathagar.com

ওপর গুটিয়ে যায় শরীরটা। কতবার এমন হয়েছে যে গান্ধীজীর গুটিয়ে যাওয়া শরীরটা দেখে ভয় পেয়ে গেছে মনু। তার মনে হয়েছে এবার হয়ত তাঁকে বাঁচানো যাবে না। আতংকিত হয়ে লোকজন ডাকার কথা ভেবেছে। গান্ধীজী যেন বুঝতে পেরেই হাত নেড়ে নিঃশব্দে কাছে ডেকেছেন তাকে। তারপর কোনরকমে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছেন, 'না. না। এত ভয় পাবার কিছু নেই। যতদিন দরকার, ততদিন আমায় বাঁচিয়ে রাখবেন ভগবান।'

এদিকে অনশনের তৃতীয় দিন থেকেই রাজধানীর চেহারা বদলাতে শুরু করলো। লালকেল্লার মাঠে প্রায় দশহাজার মানুষের এক সমাবেশে- প্রধানমন্ত্রী নেহরু স্বীকার করে বললেন, 'যদি মহাত্মা গান্ধীর জীবনবসান হয় তবে দেশ তার আত্মা হারাবে।' এই সমাবেশটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। কিন্তু বছরখানেক আগে একই জায়গায় ১৫ আগস্টের সমাবেশে অন্তত পাঁচ লক্ষ মানুষ জমায়েত হয়েছিল। যাহক. গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে সরকারী সব অনুষ্ঠান বন্ধ করার আদেশ দিলেন মাউন্টব্যাটেন। দিল্লির রাস্তায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির শ্লোগান দিয়ে ক্ষীণজীবী ও ভীত দু-একটা মিছিলও বেরোল। কিন্তু কলকাতার তুলনায় এ যেন কিছু নয়। সেখানে অনশনের প্রথম দিনেই কলকাতার মেজাজের নাটকীয় পটপরিবর্তন হয়ে যায়। বলতে গেলে, আবেগের তোড়ে ভেসে গিয়েছিল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। কিন্তু রাজধানীর মনোভাবে যেন সেই আবেগ দেখা গেল না। আর এখানকার এই নিস্পৃহ উদাসীনভাব দেখে এক অজানা আশঙ্কায় মনুর মন ভরে গেল। তার ভয় হলো যে নিষ্ঠুর এই দিল্লি শহর যেন নির্মম উদাসীনতায় গান্ধীজীকে অনিবার্য মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

ওদিকে পাকিস্তানবাসীদের মনের আবেগ তখন প্রবল হয়ে উঠেছে। গান্ধীজীর স্বাস্থ্যের কথা শুনে লাহোর থেকে তারবার্তা এল। তাতে লেখা, 'আমরা সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে দিন কাটাচ্ছি। সবাই জানতে চাইছে গান্ধীজীকে কি ভাবে বাঁচানো যায় ?' সারা পাকিস্তান জুড়ে মুসলিম লীগের নেতাদের গান্ধীপ্রেম উথলে উঠলো যেন। যে মানুষটাকে চিরশত্রু মনে করে এসেছে এতকাল সেই গান্ধীজীই হয়ে উঠলেন ভ্রাতৃত্ববন্ধনের দিশারী। দেশের সব দরগা, মসজিদে গিয়ে পীর মোল্লারা গান্ধীজীর জন্য প্রার্থনা করলো। হাজার হাজার পর্দানশিন মুসলমান মেয়েরা পর্দার আড়াল থেকে বৃদ্ধ গান্ধীজীর জন্য আল্লার 'দোয়া' চাইল যাতে এই বৃদ্ধ হিন্দুটি বেঁচে থেকে ভারতের মুসলমানদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন আগের মতন।

আর এরই মধ্যে দিল্লির একটা 'খুশ খবর' শুনে পাকিস্তানের মেজাজ যেন আহ্লাদে গলে গেল। সীমান্ত পেরিয়ে সংবাদ এজেন্সির পাঠানো এই খবরটা বৃহস্পতিবারের শেষ বেলায় পাকিস্তানে পেঁাছানো মাত্র উত্তাল হয়ে উঠলো সারা দেশ। প্রথম রাউন্ডের লড়াইয়ে গান্ধীজী বিজয়ী হয়েছেন। অসহ্য শারীরিক কষ্ট আর ক্ষুধাতৃষ্ণা ভোগ করে বৃদ্ধ গান্ধীজী যেন মহম্মদ আলি জিন্নার সাধের পাকিস্তানকে দেউলিয়া হবার লজ্জা থেকে মুক্তি দিলেন। এই উপ-মহাদেশে শান্তি থিতু রাখতে এবং ভারতের 'আত্মা'র শারীরিক ক্লেশভোগের অবসান ঘটাতে ভারত সরকার শেষমেশ ৫৫কোটি টাকা মিটিয়ে দেবার কথা ঘোষণা করলেন।

www.pathagar.com

বোম্বাই, ১৫ জানুয়ারি ১৯৪৮

একদল শিকারীর মতন গান্ধী হত্যার ষড়যন্ত্রকারীরা হাঁটু গেড়ে গোল হয়ে মন্দিরের মধ্যে বসে আছে। এই মন্দিরের মধ্যেই আগের দিন সন্ধ্যায় অস্ত্রভর্তি ঢোলটা লুকিয়ে রেখে গেছে দিগম্বর বাড়্গে। এখান থেকে অস্ত্রগুলো বের করে ওদের সামনে রাখলো সে। তারপর নিপুণ ভাবে অস্ত্রগুলো ব্যবহার করার প্রক্রিয়া বুঝিয়ে দিতে লাগলো। কি করে গ্রেনেড ছুঁড়তে হয়, কি করে হাই একসপ্লোসিভের গায়ে ফিউজ পরাতে হয়, ইত্যাদি।

এইভাবে দিগম্বর যখন ওদের বোঝাচ্ছিল তখন তার দিকে চেয়ে যেন গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে গেল আপ্তে। দিগম্বরের হাতে তখন শেষ আগ্নেয়াস্ত্রটা ধরা আছে। সম্পূর্ণ দিশি মাল। পিস্তলের বদলে এই অস্ত্রটাই ব্যবহার করতে হবে ওদের। আপ্তের মনে হলো অস্ত্রটা মোটেই নিরাপদ নয়। ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিক্ষেপকারীর হাতের মধ্যেই ফেটে যাবার সম্ভাবনা। তখন শুধু গান্ধীজী নয়, নিক্ষেপকারীর ভবলীলাও সাঙ্গ হয়ে যাবে সেই সঙ্গে। মনের আশঙ্কার কথাটা বিড়বিড় করে গড়্সেকেও বললো আপ্তে। কাউকে হত্যা করার সবচেয়ে নিরাপদ অব্যর্থ অস্ত্র হ'ল পিস্তল। এমন নির্ঝঞ্ঝাট অস্ত্র আর হয় না। কিন্তু পিস্তল সংগ্রহ করাটা খুবই কঠিন। আপ্তের মনে হ'ল যে তাদের হাতে যে অস্ত্র মজুদ আছে তা দিয়ে একটা তিনতলা বাড়ি উড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু গান্ধী হত্যার চক্রান্তটা সফল করার মতন একটা মামুলী পিস্তল যোগাড় করা গেল না। এমনকি অভিযানে বেরিয়ে যথেষ্ট টাকাপয়সা যোগাড় হলেও যা জুটলো না তা হ'ল একটা পিস্তল। আপ্তের পকেটে এখন হাজার টাকার কড়কড়ে নোটের তাড়া আছে, কিন্তু পিস্তল নেই।

দিগম্বরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আপ্তের মনে হ'ল কেমন অবলীলায় দিগম্বরের আঙুলগুলো নেচে বেড়াচ্ছে ওই সব মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্রগুলোর ওপর। এতটুকু ভয়ডর নেই। যেন খেলা করছে। হঠাৎ তার মনে হলো যে, এই লোকটাকে বোধহয় তাদের কাজে লাগবে দিল্লিতে। খুবই অপরিহার্য হবে ওর এই অভিজ্ঞতা। অবশ্য এই চক্রান্তের মধ্যে বাড়্গে নেই। সে বা গড়্সে তাকে পুরোপুরি বিশ্বাসও করে না। তবে মানুষটাকেও তাদের চাই এই চক্রান্ত সফল করতে। সুতরাং মনস্থির করে ফেললো আপ্তে। তাকে মন্দিরের চাতালের আলো আঁধারের মধ্যে ডেকে নিয়ে এল। তারপর খুবই ঘনিষ্ঠের মতন তার দু কাঁধে হাত রেখে কথাটা পাড়লো। বললো, 'আমাদের সঙ্গে তোমায় দিল্লি যেতে হবে। পারবে না?' আপ্তে জানে যে গান্ধী, নেহরু এবং সুরাবর্দীকে 'খতম' করার চক্রান্ত করেছে সাভারকর এবং এই কাজে নিয়োগ করেছে তাকে এবং গড়্সেকে। কিন্তু অস্ত্রবিশারদ দিগম্বরের সাহায্য ছাড়া এতবড় কাজে সফল হতে পারবে না তারা। আপ্তের কথায় দিগম্বরের মনে দ্বিধাভাব হচ্ছিল। তবে আপ্তের পরের কথায় সেই 'কিন্তু' ভাব অপসারিত হলো দিগম্বরের। তার দিকে চেয়ে আপ্তে যখন বললো, 'সব খরচ আমাদের', তখন তার লোভী মন থেকে সব সংকোচ দূর করে দিল দিগম্বর।

বলতে গেলে, দিগম্বর বাড়্গের মতন এমন একজন অভিজ্ঞ অস্ত্রবিশারদকে দলে নিয়ে ওদের বৃত্ত যেন সম্পূর্ণ হলো। এখন সময় হয়েছে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে

www.pathagar.com

রাজধানীতে পৌঁছানো এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান স্থপতির সঙ্গে মোলাকাত করা। তো, সেই কাজটুকু সম্পন্ন করতেই চলেছে ওরা।

মদনলালের বেডিংয়ের মধ্যে দিগম্বরের আমদানি করা আগ্নেয়াস্ত্রগুলো আজই দিল্লি চালান হয়ে যাচ্ছে। ভিক্টোরিয়া টারমিনাস স্টেশন থেকে রাত্রের ফ্রনটিয়ার মেল ধরে মদনলাল ও কারকারে দিল্লি যাচ্ছে আজই। এই স্টেশনটাই একদা ইংরেজ আগন্তুকদের এ দেশে ঢোকবার প্রবেশদ্বার ছিল। নাথুরামের ছোট ভাই গোপালকে সঙ্গে নিয়ে দিগম্বর বাড়্গেরা দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করবে ৪৮ ঘণ্টা পরে। আপ্তে ও নাথুরামের অন্য ব্যবস্থা। এয়ার ইণ্ডিয়া লিমিটেডের ডি.সি. থ্রি বিমানে দুখানা টিকিট আগেই কিনে রেখেছে আপ্তে। ওরা আকাশপথে দিল্লি পৌঁছে সোজা চলে যাবে বিড়লামন্দির সংলগ্ন হিন্দু মহাসভা ভবনে। দিল্লিবাসী ভক্তদের জন্য নির্মিত বিড়লামন্দিরের ভিতরে প্রাচীন স্টাইলের যে ঝলমলে ভবন অধিষ্ঠিত সেখানেই অবস্থান করছেন বৃদ্ধ গান্ধীজী। এবং বিস্ময়কর ব্যাপার যে, গান্ধীজীর হত্যাকারীদের চক্রান্তস্থলও নির্বাচিত হলো এই ভবনেরই সংলগ্ন হিন্দু মহাসভা লজ। ভাগ্যের কি আশ্চর্য পরিহাস !

বেলা পড়তেই বিড়লাভবনের লন্-এ শ'য়ে শ'য়ে ভক্ত অনুরাগীরা এসে পড়লো। আজ বৃহস্পতিবার। সবারই ধারণা যে হয়ত কোন দৈবযোগে কিংবদন্তী পুরুষ গান্ধীজী এসে পড়বেন প্রার্থনাসভায়। কিন্তু তেমন দৈব অনুগ্রহ হলো না। গান্ধীজীর আর সে শক্তি নেই যে পায়ে হেঁটে প্রার্থনামঞ্চে আসতে পারেন কিংবা সোজা হয়ে দুদণ্ড বসে থাকতে পারেন। এই ক'দিনের অনশনেই চলৎশক্তি-হীন হয়ে পড়েছেন তিনি। তবে অনুরাগীদের তিনি পুরোপুরি নিরাশও করলেন না। যেটুকু পারলেন সেটুকুই দিলেন। তাঁর শয্যার পাশটিতেই মাইক্রোফোন বসানো হলো। তারপর বিছানায় শোয়া অবস্থায় ক্ষীণ স্বরে যে দু-চারটি কথা বললেন সেগুলোই লাউডস্পিকারের মাধ্যমে ভক্ত অনুরাগীদের শুনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু এ কণ্ঠস্বর কার ? বিগত তিন যুগ ধরে যে মহাবল কণ্ঠস্বর লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে উদ্দীপ্ত করেছে কোথায় গেল সেই তেজ ? এত ক্ষীণ এত নিস্তেজ এই কণ্ঠস্বর যে উৎকর্ণ ভক্ত অনুরাগীদের মনে হলো হয়ত কবরের তলা থেকে উঠে আসছে গান্ধীজীর কথাগুলো।

বস্তুত তাই। গান্ধীজীর ক্ষীণ স্বর প্রায় ফিসফিস স্বরের মতন শোনাচ্ছিল তখন। তিনি যা বললেন তার নিহিত অর্থ হলো যেন সবাই দেশ ও জাতির কথা চিন্তা করেন। চিন্তা করেন, কেমন করে বৈরিতা ভুলে সবাইকে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করা যায়। বললেন, 'আমার জন্য দুশ্চিন্তা করো না তোমরা। জন্মালে মরতেই হবে। মৃত্যুকে কেউ এড়িয়ে যেতে পারে না।' বললেন, 'মৃত্যু আমাদের সকলের বন্ধু। মৃত্যুর কাছে আমরা সবাই কৃতজ্ঞ। কারণ, জীবনভর মানুষ যত দুঃখকষ্ট, তাপজ্বালা পায় সবকিছু জুড়িয়ে দেয় মৃত্যু।'

সামান্য এই ক'টি কথা বলেই নিস্তেজ হয়ে পড়লেন গান্ধীজী। প্রার্থনাসভাও তখন শেষ হয়েছে। দর্শনার্থীরা উৎসুক হলো তাদের প্রিয় নেতাকে দর্শন করতে। একটা ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি শুরু হলো জনতার মধ্যে। অবশেষে সবাইকে সুশৃঙ্খল ভাবে জড়ো করা হলো। তারপর সারিবদ্ধভাবে, প্রথমে মেয়েরা পরে পুরুষরা, একে একে গান্ধীজীকে দর্শন করে আসতে লাগলো নিঃশব্দে। সবাই যুক্তকরে দাঁড়িয়ে আছে। থমথম করছে নীরবতা। কাচঘেরা বারান্দায় নিদ্রিত

www.pathagar.com

অবস্থায় শুয়ে আছেন গান্ধীজী। সবাই স্তম্ভিত হয়ে দেখলো কেমন যেন ছোট হয়ে গেছে গান্ধীজীর কাঠামোটা। গর্ভস্থ ভ্রূণ যেমন হাত পা গুটিয়ে পড়ে থাকে প্রায় তেমনি বাঁকাচোরা হয়ে পড়ে আছে তাঁর রোগা শরীরটা। একটা সাদা শাল জড়ানো আছে তাঁর শরীরে। চোখ দুটো বোজা। জিরজির করছে রোগা মুখখানা। তবুও মনে হচ্ছে যেন এক অতিপ্রাকৃত আলোক রেখায় উজ্জ্বল হয়ে আছে সেই শীর্ণ মুখখানা। শরীরের ভংগীতে হাত দুটি জোড় করা অবস্থায় বিছানার ওপর পড়ে আছে। মনে হচ্ছে যেন ঘুমন্ত অবস্থাতেও যুক্তকরে সবাইকে প্রতিনমস্কার জানাচ্ছেন তিনি।

কিন্তু পরের দিন সকালে গান্ধীজীর কাণ্ড দেখে মনু যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারলো না। কাল সন্ধ্যে পর্যন্ত যে মানুষটি অমন নির্জীব হয়ে ছিলেন, আজ সকালে কোন এক অজ্ঞাত কারণে তিনি যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। বিছানা থেকে ধড়টা সামান্য তুলতেও কাল যাঁর কষ্ট হয়েছে, আজ তিনিই দিব্যি দাঁড়িয়ে উঠেছেন। শুধু তাই নয়। পায়ে হেঁটে ঘর থেকে বেরিয়ে সকালের প্রার্থনাসভায় গিয়ে হাজির হলেন ঠিক সময়ে। প্রার্থনার পর যা করলেন তা শুধু তাঁর দ্বারাই সম্ভব। কে বলবে যে টানা চারদিন তিনি অনশন করেছেন। পুষ্টি বলতে যা বোঝায় তার কিছুই নেই শরীরে। উপরন্তু সর্বক্ষণ আতংক, এই বুঝি বিদায় নিলেন পৃথিবী ছেড়ে। সেই মানুষই যখন প্রার্থনার পর পা মুড়ে বসে প্রাত্যহিক ভাষা শিক্ষার অনুশীলনে মনোযোগ দিলেন তখন অবাক হতেই হয়। তাঁর নোয়াখালি ভ্রমণের সময় বাংলাভাষা শেখার অনুশীলন শুরু করেছিলেন গান্ধীজী। সেই থেকেই এই চর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন। অবশেষে এই কাজটা শেষ হবার পর মনুকে কাছে ডাকলেন তিনি। তারপর সেদিনের সান্ধ্য প্রার্থনাসভায় কি ভাষণ দেবেন, তার বয়ানটা মুখে মুখে বলে গেলেন। মনু সেটি টুকে নিল তার খাতায়।

তবে গান্ধীজীর এই তেজ, এই দাপট যে স্রেফ মনের ভুল, তাঁর গোঁয়ারতুমি, তা বোঝা গেল খানিক পরেই। মরণাপন্ন ক্যানসার রোগী যেমন রোগযাতনা থেকে সাময়িক বিরাম পেয়ে উৎফুল্ল হয়, যেমন অতলস্পর্শ গহ্বরের অন্ধকার থেকে ক্ষীণ আলোর কিরণ দেখে আশার আশায় বুক বাঁধে, এও ঠিক সেইরকমই। গান্ধীজীরও এই মনের ভুল ভাঙলো খানিক পরেই যখন একা একা বাথরুমে যাবার সময় মাথা ঘুরে বেহুঁশ হয়ে মেঝের ওপর পড়ে গেলেন তিনি।

গান্ধীজীর হঠাৎ পড়ে যাবার শব্দ শুনেই ছুটে এলেন ডাক্তার সুশীলা নায়ার। তারপর সবাই মিলে ধরাধরি করে গান্ধীজীকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হ'ল। সুশীলা বুঝেছেন কেন এই দুর্ঘটনা ঘটলো। গান্ধীজীর বিকল কিড্‌নি থেকে মূত্রনিঃসরণ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গান্ধীজীর ক্ষীণ শরীরে জল জমেছে। আর এরই দরুন তাঁর হৃদপিণ্ডের ওপর চাপ বেড়েছে অত্যধিক। কারণ নির্ণয়ে এই তরুণী চিকিৎসকের যে কোন ভুল হয় নি, তার সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল খানিক আগেই যখন শরীরের ওজন নেওয়া হয়। সেই ১০৭ পাউণ্ড। রক্তচাপও নাড়ির গতি পরীক্ষা করেও ফল একইরকম পাওয়া গেল। কার্ডিওগ্রামের সাহায্যে হৃদপিণ্ডের রক্তসঞ্চালনও মাপা হলো। ৭৮ বছরের এই বৃদ্ধ মানুষটির সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ এই অর্গানটিরও অবস্থা একই রকম মন্দ। অর্থাৎ বুঝতে পারা গেল যে অনশনরত

www.pathagar.com

বৃদ্ধ গান্ধীজীর পরিণতি মর্মান্তিক হবার সম্ভাবনা সুস্পষ্ট। এমন একটা ইঙ্গিতও পাওয়া গেল যে অনশন প্রত্যাহৃত না হলে গান্ধীজীর হৃদযন্ত্রের অবক্ষয় কিছুতেই রোধ করা যাবে না। এই ক্ষয় চিরকালের জন্য স্থায়ী হবে এবং তখন সবরকম চিকিৎসার বাইরে চলে যাবেন তিনি।

বুকভরা টনটনে ব্যথা নিয়ে একটুকরো কাগজ টেনে নিলেন সুশীলা। তারপর একটা পেন্সিল দিয়ে সেদিনের প্রথম বুলেটিনটি লিখে ফেললেন তিনি। গান্ধীজীর অনশনের প্রথম দিন থেকেই দুটি করে বুলেটিন তিনি দৈনিক প্রকাশ করছেন। দেশের মানুষকে তাদের প্রিয় নেতার শারীরিক অবস্থার পূর্ণ চিত্রটা জানিয়ে দেওয়া তাঁর কর্তব্য বলেই দৈনিক দুটো বুলেটিন তিনি প্রকাশ করেন। আজ তাঁর প্রথম বুলেটিনে সুশীলা তাঁর সন্ত্রস্ত মনের অভিব্যক্তি জানালেন। তিনি লিখলেন যে গান্ধীজী যদি এই আত্মপীড়ন বন্ধ না করেন তাহলে অক্ষম শরীরে ধকল সইবে না আর। তখন শারীরযন্ত্রের ওপর যে চাপ পড়বে তার পরিণতি মর্মান্তিক হবে। হয়ত ভারতের প্রিয় নেতা মহাত্মা গান্ধীকে সারাজীবন অক্ষম অকর্মণ্য হয়ে বেঁচে থাকতে হবে তার ফলে।

আর একবার যেন বিড়লাবাড়ির ভিতর থেকে সেই অসাধারণ তরঙ্গটি ছড়িয়ে পড়লো যা লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর হৃদয়ের সঙ্গে এক মহান আত্মার মিলনটি ক্ষীণ সুতোয় বেঁধে রেখেছে। শ্রীমতী সুশীলা নায়ারের প্রচারিত বুলেটিনের সতর্কীকরণ ছাড়াই সারা দেশের মানুষ শুক্রবারের সকাল থেকেই জেনে গেল যে গান্ধীজীর জীবনে সংকট ঘনিয়ে এসেছে। এসব অবস্থায় অন্যবার যেমন হয় এবারও তার অন্যথা হলো না। তাঁর অনশনের মধ্যেই সারা দেশের মর্জি যেন ঘন ঘন বদলে যেতে লাগলো সবাইকে হতবুদ্ধি করে। বিবেকের সঙ্গে তাঁর এই লড়াইয়ের ওপর চোখ রেখে বসে রইল বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ জনবহুল রাষ্ট্রের মানুষ।

ঘণ্টায় ঘণ্টায় আলবুকার্ক রোডের আকাশবাণী ভবন থেকে গান্ধীজীর স্বাস্থ্যসমাচার প্রচার হতে লাগলো। কয়েক ডজন দিশি বিদেশী সাংবাদিকরা তখন ঘটা করে বিড়লাবাড়ির ফটকের বাইরে মৃত্যুর প্রহর গুনতে বসে গেছে। সারা দেশের প্রতিটি শহরের মাঠ ময়দানগুলো তখন 'হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই', 'গান্ধীজীকে বাঁচাও' ইত্যাদি শ্লোগানে মুখর হয়ে উঠেছে। দেশের সর্বত্র অসংখ্য 'গান্ধীজী বাঁচাও' সমিতি গড়ে উঠেছে। বেছে বেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতাদর্শের মানুষদের নেওয়া হয়েছে সেই সমিতিতে। ডাক বিভাগের সরকারী কর্মচারীরাও যোগ দিল এই প্রবাহে। লক্ষ লক্ষ চিঠির গায়ে 'সাম্প্রদায়িক শান্তি বজায় রাখুন—গান্ধীজীর জীবন রক্ষা করুন' ছাপ দিয়ে তারা তাদের মনোভাব ব্যক্ত করলো। দেশ জুড়ে হাজার হাজার প্রার্থনাসভা অনুষ্ঠিত হলো। সবাই তাঁর নিরাময়ের জন্য প্রার্থনা করলো। শুক্রবারের নামাজ পাঠের সময় মসজিদে গিয়ে মুসলমানরা তাঁর জন্য 'দোয়া' চাইল। বোম্বাইয়ের হরিজনেরা গান্ধীজীর কাছে তারবার্তা পাঠিয়ে জানিয়ে দিল, 'আপনার এই জীবন আপনার নয়, আমাদের।'

কিন্তু সবাইকে ছাড়িয়ে গেল দিল্লি। এত দিন যাবৎ যেন মৃত হয়ে ছিল শহরটা। এখন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলো। রাজধানীর প্রতিটি বাজার, মহল্লা, পাড়া

www.pathagar.com

থেকে ধ্বনি দিতে দিতে মিছিল বেরোল। অবশেষে তাঁর মনোবেদনা বুঝেছে দিল্লির মানুষ। তাই দোকান-বাজার বন্ধ করে গান্ধীজীর কথা ভাবতে বসেছে তারা। হিন্দু, শিখ, মুসলমানদের নিয়ে সম্মিলিত শান্তি বাহিনী বেরোল শহরের রাস্তায়। হাতে হাত জুড়ে তারা রাস্তা দিয়ে চলার সময় কৌতূহলী পথচারীদের দিকে গান্ধীজীর অনশন প্রত্যাহারের আবেদনপত্র ছড়িয়ে দিল। তখন ট্রাকের ওপর চড়ে যুবকরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে রাজধানীর রাস্তাঘাট। ওরা হাততালি দিয়ে চিৎকার করছে আর বলছে, 'আমাদের চেয়ে গান্ধীজীর জীবনের দাম অনেক বেশি।' সবথেকে হৃদয়গ্রাহী ব্যাপার হলো যখন দাঙ্গায় নির্যাতিত প্রায় শ'দুই বিধবা মহিলা আর অনাথ ছেলেমেয়েরা বিড়লাবাড়ির গেটের কাছে দাঁড়িয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে একদিন অনশন করার কথা জানালো।

ঘটনাটা যেন ভাবাবিষ্ট মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস। কিন্তু যাঁকে নিয়ে এই আবেগ তাঁর কোন আবেগ, আকুলতা নেই। খাটিয়ার ওপর শুয়ে আছেন স্থির, অচঞ্চল। মানুষের পাথর-কঠিন মন নাড়া দিতে অনেক সময় নিয়েছে তাঁর অনশন। যতটা আশা করেছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি সময়। কিন্তু একবার যখন পেরেছেন পাথর সরাতে তখন আর তিনি ফিরবেন না লক্ষ্য থেকে। কৃচ্ছ্রসাধনের এই পথ ধরে আরও বিপজ্জনক অন্ধকারের কাছে পৌঁছে যেতেও তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু ওদের হৃদয়ের এই বদল যেন সত্যিকার নিবিড় আর অর্থবহ হয়ে ওঠে।

তাই মুমূর্ষু মানুষটি তাঁর দীনহীন শয্যায় শুয়ে যখন ক্ষীণ স্বরে উদ্বিগ্ন মানুষদের উদ্দেশে বললেন, 'আই য়্যাম ইন নো হারি', (আমার তাড়া নেই) তখন সবাই উপলব্ধি করতে পারলো যে এটা তাঁর নিছক কথার কথা নয়। লাউডস্পিকার থেকে ভেসে আসা তাঁর কণ্ঠস্বর ক্ষীণ শোনালেও প্রত্যয়ে তা দৃঢ় ছিল। প্রার্থনা-সভায় সমবেত ভক্ত অনুরাগীদের উদ্দেশে তিনি বললেন, 'আমার তাড়া নেই। আমার কাজ অসম্পূর্ণ রেখে যেতে চাই না আমি।' এই কথা ক'টি বলেই দম নিলেন গান্ধীজী। তখন লাউডস্পিকারের মধ্যে তাঁর নিশ্বাস নেবার শব্দটুকুও শুনতে পাচ্ছিল সবাই। একটু দম নিয়ে গান্ধীজী ফের বললেন, 'যদি আমাদের সারা দেশ, ভারত ও পাকিস্তানের সর্বত্র যদি শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে আমার বেঁচে থাকার প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবে। আমার এই আত্মত্যাগের উদ্দেশ্য সেটাই।'

তখন একদল জনপ্রতিনিধি নিয়ে নেহরু তাঁর শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছেন। সবাইকে নিয়ে গান্ধীজীকে আশ্বস্ত করলেন নেহরু। বললেন যে দিল্লির পরিস্থিতি আমূল বদলে গেছে। গান্ধীজী খুশী হলেন এই আশ্বাসবাণী শুনে। উৎফুল্ল স্বরে বললেন, 'ভালই ত! আমার জন্য ভেব না। এখনই হঠাৎ সরে পড়বো না আমি। যা বলছো তার সত্যতা প্রমাণ করো। আমি কাজের কাজ চাই।' যখন এইরকম কথাবার্তা চলছে, তখন করাচি থেকে গান্ধীজীর নামে একটা তারবার্তা এল। সেখানা পড়ে শোনানো হ'ল তাঁকে। ও'রা জানতে চেয়েছেন যে দিল্লি থেকে যে সব মুসলমান ঘরবাড়ি হারিয়ে উৎখাত হয়েছে তারা দিল্লিতে ফিরে এসে তাদের অপহৃত ঘরদোর ফিরে পাবে কি না। সব শুনে গান্ধীজী অনুচ্চ স্বরে বললেন, 'এটাই তোমাদের পরীক্ষা!'

তবে তাই হ'ক। গান্ধীজী মনোবাঞ্ছাই পূরণ করা হ'ক। হাতে টেলিগ্রামটা

www.pathagar.com

নিয়ে প্যারেলাল নায়ার তখনই পৌঁছে গেলেন দিল্লির শরণার্থী শিবিরগুলোয়। তারপর জনে জনে অনুরোধ করলেন যেন তারা গান্ধীজীর অভিলাষ পূরণ করে। যেন তারা অধিকার করা মুসলমানদের ঘরবাড়ি আবার তাদের হাতেই ফিরিয়ে দেয়। প্যারেলাল আরও বললেন যে শুধুমাত্র ওঁরাই পারেন গান্ধীজীর প্রাণ রক্ষা করতে। খানিকক্ষণের মধ্যেই সহস্রাধিক হিন্দু ও শিখ শরণার্থীরা এক স্বাক্ষরিত ঘোষণাপত্রে প্রতিশ্রুতি দিল যে পাকিস্তান থেকে আগত দিল্লিবাসী মুসলমানদের হাতে তারা তাদের ঘরবাড়ি ফিরিয়ে দেবে। এর জন্য যদি তাদের পরিবারবর্গকে এই শীতের রাতে শিবিরের ছেঁড়া তাঁবু বা খোলা ফুটপাতে রাত কাটাতে হয় তাও সহ্য করবে তারা। খুশী হয়ে একদল নেতা বিড়লাভবনে এসে গান্ধীজীকে যথারীতি আশ্বাস দিয়ে জানালেন যে সত্যই বদল হয়েছে মানুষের মন। খাটিয়ার ওপর শুয়ে থাকা গান্ধীজীর দিকে চেয়ে জননেতারা বললেন, 'আপনার এই অনশন অভিভূত করেছে সারা পৃথিবীর মানুষকে। দেশটা যে শুধু শিখ বা হিন্দুদের নয়, মুসলমানদেরও অধিকার আছে এই দেশে বাস করার, তার জন্য সবাই মিলে চেষ্টা করবো আমরা। শুধু আমাদের অনুরোধ এবার আপনি অনশন প্রত্যাহার করুন এবং আমাদের দেশকে দুর্ভাগ্য থেকে বাঁচান।'

মনে দারুণ উদ্বেগ নিয়ে ওজনযন্ত্রের কাঁটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন ডাক্তার সুশীলা। কিন্তু নিরাশ হলেন। অনশনের পঞ্চম দিনেও সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর ব্যাপার হলো যে, ওজনযন্ত্রের কাঁটা তখনও একই জায়গায় স্থির। সুশীলা অবশ্য মনে মনে চাইছিলেন যে তাঁর শরীরের ওজন কমে যাক। কিন্তু যা তিনি চেয়েছেন ওজনযন্ত্রের কাঁটা তা নির্দেশ করলো না। গত তিনদিন কাঁটা যেখানে থেমে ছিল সেই ১০৭ পাউন্ডের কাছাকাছি দূরত্বেই কাঁটা স্থির হয়ে রইল। এই ব্যাপারটাই এখন সবচেয়ে বিমূঢ় করেছে ডাক্তার সুশীলাকে। তিনি বুঝতে পারলেন যে, গান্ধীজীর কিডনি থেকে পর্যাপ্ত মূত্রনিঃসরণ হচ্ছে না। অন্তত প্রতিদিন যতটা জল তিনি পান করেন, ততখানি না হলেও, অন্তত ৭০ আউন্স মূত্রনিঃসরণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তেমনটি না হওয়ায় গান্ধীজী যেন কিছুতেই বিপদমুক্ত হতে পারছেন না। অনাহারহেতু হৃদযন্ত্রের ওপর যে অতিরিক্ত চাপ ছিল, সেই চাপ ক্রমবর্ধিত হলো যখন মূত্রাশয়ের অকর্মণ্যতায় তাঁর দেহমধ্যে জলীয়বস্তুর সঞ্চয় বেড়ে গেল।

ডাক্তার সুশীলা এবং তাঁকে সাহায্যরত আরও তিনজন চিকিৎসকের কাছে অন্যান্য পরীক্ষাদির ফলও একই রকম হতাশজনক মনে হলো। গান্ধীজীর প্রস্রাবে এ্যাসেটিক এ্যাসিডের আধিক্য এখন আরও গভীর সংকট সৃষ্টি করেছে। এমনকি তাঁর নিশ্বাসেও টক গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। তাঁর রক্তচাপ এখনও ১৮৪, নাড়ির গতি ক্ষীণ এবং হৃদস্পন্দনও অনিয়মিত।

বলতে কি, যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই গান্ধীজীর গুরুতর শারীরিক অবস্থা যেন নির্ধারিত হয়ে গেল। চোখের দেখা দেখেই চিকিৎসকেরা বুঝে গেলেন যে তাঁর অবস্থা কত সঙ্গিন। সুতরাং তাড়াতাড়ি একটা ঐকমত্য সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁরা। ঘোষণা করে বললেন যে অনশন বজায় রাখলে ৭২ ঘণ্টাও টিকে থাকবেন না তিনি। বরং তাঁর শরীরের যা বর্তমান অবস্থা তার হেরফের না হলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর জীবনহানির আশঙ্কা আছে। সেইমত চারজন ডাক্তারের সই করা শনিবারের

www.pathagar.com

প্রথম বুলেটিনের ভাষাও হ'ল বাহুল্যবর্জিত, ছোট্ট কিন্তু অকপট। তাঁরা লিখলেন, 'দেশের মানুষকে আমাদের জানিয়ে দেওয়া কর্তব্য যে অবিলম্বে অনুকূল অবস্থা তৈরি করে যেন গান্ধীজীর অনশন প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করা হয়।'

পুণা, ১৭ জানুয়ারি, ১৯৪৮

পুণা স্টেশনে বম্বে এক্‌স্‌প্রেস ট্রেনটাকে হিসহিস শব্দ করে ঢুকতে দেখেই মনে মনে থরথর করে কেঁপে উঠলো শক্তসমর্থ বেঁটেখাট একজন মহিলা। কী ভীষণ স্নায়বিক উত্তেজনা তখন হচ্ছে তার! বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করছে যেন। দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনটা দেখেই যেন বিদ্যুৎ শিহরন খেলে গেল মহিলার সারা শরীরে। মনে মনে বিড়বিড় করে বললো, 'বোধহয় সারা প্ল্যাটফর্মে শুধু আমিই জানি কেন এই ট্রেনে আমার স্বামী আজ দিল্লি যাচ্ছেন।' প্ল্যাটফর্ম জুড়ে থিকথিক করছে যাত্রীর ভিড়। এদের মধ্যে ওই একটা মুখই মন দিয়ে শেষবারের মতন দেখে নিচ্ছে মহিলাটি। মুখখানা তার স্বামী গোপাল গড়্‌সের। তখন যাত্রীদের ভিড়ের ঠেলা খেতে খেতে গোপাল এগিয়ে চলেছে একটা থার্ডক্লাস কামরার দিকে।

সকালের এই ট্রেনটাতেই গোপাল আজ দিল্লি চলেছে গান্ধীজীকে হত্যা করার সংকল্প নিয়ে। বড়ভাই নাথুরামের কাছে সে যে অঙ্গীকার করেছিল সেটাই পালন করতে চলেছে গোপাল। তার বেডিংয়ের মধ্যে সে লুকিয়ে নিয়ে চলেছে একটা °৩২ ক্যালিবার পিস্তল। পুণার মিলিটারি স্টোরস ডিপো থেকে একজন সহকর্মীর সাহায্যে নগদ ২০০ টাকা দিয়ে সে এই পিস্তলটা কিনেছে। তার বাড়ির কাছে জঙ্গলের মধ্যে পিস্তলটা চালিয়ে ইতিমধ্যে পরখ করে নিয়েছে সে। তার এই মরণপণ প্রতিজ্ঞার কথাটা স্ত্রী ছাড়া আর দ্বিতীয়প্রাণীর জানা নেই। আশ্চর্যের ব্যাপার গোপালের স্ত্রী কোন বাধাই দেয় নি তাকে। বরং উৎসাহিত করেছে গোপালকে। গোপালের স্ত্রীর কোলে ওদের চারমাসের বাচ্চা। ওকে সে সঙ্গে এনেছে শেষবারের মতন বাপের কোলে দেবে বলে। যাতে দিল্লি যাবার আগে গোপাল তার মেয়েকে একটু আদর করতে পারে। বুকের মধ্যে বাচ্চাকে গাঢ়ভাবে জড়িয়ে নিয়ে যাত্রীদের ভিড়ের মধ্যে পথ করে চলেছে গোপালের যুবতী স্ত্রী। পরবর্তীকালে যখন সেইদিনটির কথা তার মনে পড়েছে, তখন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে সে। সে সময় তাদের ভরা যৌবন। পরিপূর্ণ রোমান্টিক জীবন। কিন্তু জীবন ত শুধু রোমান্স নয়! 'রোমান্স ও বিপ্লব দুই-ই ছিল আমাদের স্বপ্ন।'

কামরার কাছে পেঁছে গোপালের হাত ধরে টানলো তার স্ত্রী। তারপর স্বামীর কোলে বাচ্চাকে দিয়ে ফিসফিস করে বললো, 'আমাদের জন্য দুশ্চিন্তা করো না। যা হয় একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারবো।' মেয়েকে আদর করে স্ত্রীর কোলে ফেরত দিল গোপাল। গোপালের স্ত্রী নিজের হাতে তৈরি করা ট্রেনের খাবারের পুঁটুলিটা গোপালকে দিল। ততক্ষণে কামরায় উঠে পড়েছে গোপাল এবং নিজের জায়গায় বসেছে। যারা স্টেশনে এসেছে তারা বিদায় জানালো

www.pathagar.com

গোপালকে। একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল গোপালের যুবতী স্ত্রী কোলে মেয়ে নিয়ে। দুই কামরার মধ্যে সংযোগকারী শিকলে টান পড়তেই ঝনঝন শব্দে ট্রেন নড়ে উঠলো। তারপর ধীর গতিতে এগিয়ে চললো ট্রেন। কোলের কচি বাচ্চার নরম হাতদুটি তুলে নাড়াতে লাগলো গোপালের যুবতী স্ত্রী। ট্রেনের গতি ততক্ষণে বেড়ে গেছে খানিক। কামরার মধ্যে গোপালের শরীরের কাঠামোটা দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের সামনে। যুবতী বধূর চোখ দুটিতে টলটল করছে দুফোঁটা জল। কিন্তু না। চোখের জল সে ফেলবে না। এক কঠিন ব্রত পালন করতে চলেছেন উনি। সার্থক হ'ক, সফল হ'ক ওঁর যাত্রা। এটুকু ছাড়া কঠিন হৃদয়ের মেয়েটি আর কী-ই বা কামনা করতে পারে এই মুহূর্তে !

গান্ধীজীর শরীরের অবস্থা যতই সঙ্গিন হ'ক না কেন শনিবারের সকাল থেকে তাঁর মনটি যেন আনন্দময় হয়ে উঠেছে। আসলে এটাই তাঁর অনশনের তৃতীয় দশা, শেষ পর্ব। অনশনের প্রথম ৪৮ ঘণ্টার বৈশিষ্ট্য হলো পেটের মাংসপেশীতে তীব্র টান আর আড়ষ্টভাব। ঠিক যেন খিলধরা অবস্থা আর প্রবল খিদে। মনে হয় পেটের মধ্যে সবকিছু তালগোল পাকাচ্ছে। কিন্তু সেই ভাব কেটে যাবার পর আহারের ইচ্ছা থাকে না। পরের দুদিন থাকে প্রবল মাথা ঘোরা আর গা বমি ভাব। অবশেষে এই অবস্থাও চলে যায় এবং আর কোন উপসর্গই থাকে না। তখন আশ্চর্য এক প্রশান্তিতে শরীর যেন জুড়িয়ে যায়। তখন একমাত্র উপদ্রব হলো গাঁটের ব্যথা। কিন্তু মনু বা অন্য সহকর্মিণীদের দিয়ে গাঁটে গাঁটে তেল মালিশ করার দরুন গান্ধীজীর শরীরে আর কোনরকম বেদনাবোধ থাকতো না। তো, সেদিনও এইভাবে মালিশ করার পর গান্ধীজী খুবই আরাম বোধ করতে লাগলেন। তখন দিব্যি সহজ হয়ে উঠেছেন গান্ধীজী। যখন সুশীলা ও তাঁর সহকারী ডাক্তারবাবুরা গম্ভীর মুখে গান্ধীজীর জীবনের শেষ ক'টি ঘণ্টার হিসাব করছেন তখন দেখা গেল মুক্ত মনে ঠিকানা লেখা বাতিল খামের উল্টোপিঠে বাংলা লেখা মক্শ করছেন গান্ধীজী।

বাংলা লেখার অনুশীলন শেষ হলে ইশারায় সচিব প্যারেলালকে কাছে ডাকলেন গান্ধীজী। শরীরের এই অবস্থাতেও তাঁর নিপুণ সময়জ্ঞান তাঁকে ছেড়ে যায় নি। গান্ধীজীর মনে হলো যে যদি যথার্থই এই অনশন তাঁকে লক্ষে পৌঁছে দিয়ে থাকে, যা ওঁরা দাবি করছেন, এবং তাঁকে বাঁচাবার জন্য এটা যদি ওদের মনগড়া ছলনা না হয়, তবে এখনই ঠিক সময় যখন সেটি যাচাই হওয়া দরকার। প্যারেলালকে তিনি কাছে ডেকেছেন এরই জবাব পেতে। গান্ধীজী তাই তাঁর অনশন প্রত্যাহারের একটা সাতদফা দাবিপত্র মুখে মুখে বলে যেতে লাগলেন প্যারেলালের কাছে। তাঁর প্রথম দাবি হলো যে হিন্দুমহাসভাসহ দিল্লির সমস্ত রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতাদের দাবিপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে এই মর্মে যে শর্তগুলো তাঁরা মেনে নিয়েছেন। তারপর অনশন প্রত্যাহারের আগে তিনি মিলিয়ে নেবেন যে শর্তগুলো ঠিকমতন মানা হয়েছে কি না। বলাবাহুল্য, গান্ধীজীর দেওয়া শর্তগুলো মূলত নীতিগত হলেও নগরজীবনের প্রায় সবক'টি অধ্যায় এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুসলমানদের হাতে তাদের অধিকারচ্যুত ১১৭টা মসজিদ ফিরিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে তাদের দোকান বাজারের বর্জন তুলে নেওয়া এবং ফিরে আসা মুসলমানদের নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া পর্যন্ত এক

www.pathagar.com

সুদীর্ঘ ক্ষেত্র এই শর্তাবলীর অন্তর্গত হলো।

গান্ধীজীর দেওয়া শর্তগুলি হাতে নিয়ে প্যারেলাল ছুটলো শান্তি কমিটির কর্তাদের কাছে সেটি পেশ করতে। দিল্লির ভাবগতিক তখন রীতিমত আবিষ্ট। উত্তেজনা হুজুগের ঘোরে থমথম করছে পরিবেশ। স্বাধীনতা দিবসের পর থেকে এমন ঘোরলাগা ভাবটি আর দেখা যায়নি। সারা দিল্লিই তখন যেন সস্তা হুজুগে মেতে উঠেছে। কনট সার্কাস থেকে শুরু করে শহরের এ'দো অলিগলি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে এই হুজুগ। শহরের সাধারণ মানুষ চিৎকার করে শ্লোগান দিয়ে শহর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। শহরের আপিস, আদালত, দোকান, বাজার সব বন্ধ। এরই মধ্যে সব সম্প্রদায়ের মানুষ মিলে মিশে জমায়েত হলো পুরনো দিল্লির জুমা মসজিদের সামনের মাঠে। অন্তত লাখখানেক মানুষের সেই সমাবেশ থেকে বজ্রনির্ঘোষ হলো যেন গান্ধীজীর দাবিগুলো মেনে নেওয়া হয়। পুরনো দিল্লির সবচেয়ে বিস্ফোরক অঞ্চল সবজিমণ্ডির হিন্দু ফলওলারা দল বেঁধে বিড়লাবাড়ির গেটের সামনে এসে জড়ো হলো। তারপর গান্ধীজীর কাছে এত্তেলা পাঠিয়ে জানিয়ে দিল যে মুসলমান ব্যাপারীদের বয়কটের হুমকি তারা তুলে নিয়েছে।

বিড়লাবাড়ির অন্তঃপুরে গান্ধীজীর শরীরের তখন দোদুল্যমান অবস্থা চলছে। কখনো চৈতন্য হচ্ছে, ইতিউতি চাইছেন। পরক্ষণেই হয়ত ঘোরের মধ্যে ঢলে পড়লেন। এরই মধ্যে হয়ত কোন শুভানুধ্যায়ী তাঁর খাবার জলে কয়েক চামচ কমলালেবুর রস মিশিয়ে দিতে বললেন। তখন গান্ধীজীর ঘোর কেটে গেছে। তিনি শুনেছেন লোকটার কথা। ক্ষীণ হলেও ক্রুদ্ধ স্বরে তিনি ওদের সবাইকে জানিয়ে দিলেন যে এমনভাবে তাঁর পবিত্র অনশনকে উচ্ছিষ্ট করার চেষ্টা করা হলে তিনি নতুন ভাবে ২১ দিন অনশন করার ব্রত নেবেন। ডাক্তার সুশীলা নায়ার তখন গান্ধীজীর কিডনি থেকে কৃত্রিম উপায়ে মূত্র নিষ্কাশনের অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন এই নিষ্কাশন প্রক্রিয়ায় মূত্রাশয়ের কাজ ত্বরান্বিত হবে। কিন্তু সুশীলার প্রার্থনা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে দিলেন গান্ধীজী। সুশীলা নায়ার প্রতিবাদ করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। বললেন, 'কিন্তু বাপু, এটা ত প্রকৃতি চিকিৎসার মধ্যেই পড়ে!' গান্ধীজী মাথা নাড়লেন। ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'আর কোন চিকিৎসা নয়। এখন শুধু ঈশ্বরকে ডাকছি। তিনিই আমার শেষ চিকিৎসা।'

গান্ধীজীর সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য জওহরলাল ত নিজের আপিসঘর ছেড়ে গান্ধীজীর শয্যাপার্শ্বেই পাকাপাকি বসতে শুরু করেছেন! প্রায় সর্বক্ষণই চুপ করে বসে থাকেন তিনি, আর ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যাওয়া মানুষটির অধঃপতন দেখেন। দৃশ্যটা খুবই মর্মান্তিক তাঁর কাছে। চিরকাল যে মানুষটির কাছ থেকে পুত্রবৎ স্নেহ পেয়েছেন, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়াই করেছেন একসঙ্গে, আজ তিনিই চলে যাচ্ছেন চিরকালের মতন। আজ তাই এই মানুষটির দুরবস্থা দেখে বুক ফেটে যাচ্ছে নেহরুর। মাঝে মাঝে তাই ঘরের কোনটিতে গিয়ে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলেছেন।

সস্ত্রীক ঘুরে গেলেন প্রাক্তন বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেনও। কিন্তু দুজনেই অবাক হলেন গান্ধীজীর মুখের দিকে চেয়ে। এত ঝড়ঝাপটা চলেছে শরীরমনের ওপর দিয়ে, তবুও আশ্চর্য ওঁর মুখের ওই চাপা আলোর কিরণ। এখনও কেমন

www.pathagar.com

চাপা পরিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে মানুষটির মুখচোখ। সস্ত্রীক মাউন্টব্যাটেনকে দেখে ছোট্ট রসিকতা করলেন গান্ধীজী। দুষ্টু হেসে বললেন, 'আঃ! শেষ পর্যন্ত আমার অনশনই দেখছি পর্বতকে মহম্মদের কাছে টেনে আনলো!'

মাউন্টব্যাটেন স্থির হয়ে শুনলেন গান্ধীজীর পরিহাস। কিন্তু ভেঙে পড়লেন এডুইনা। এ কি অবস্থা হয়েছে গান্ধীজীর শরীরের? ঘর থেকে বেরনোর সময় ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন মহিলা। পত্নীর কাঁধে হাত রেখে ধীরে ধীরে সান্তনা দিলেন মাউন্টব্যাটেন। বললেন, 'দুঃখ করো না! উনি যা করতে চেয়েছিলেন তাই করেছেন।' তারপর একটু চুপ করে আবার বললেন, 'কত নির্ভীক ওই ছোট্ট মানুষটি!'

ভারতীয় জনমানসে 'দর্শন' নামক রীত্যাচারটি যেন এক গভীর রহস্যময় অনুভূতি, কোন সংজ্ঞা দিয়েই যার ইন্দ্রিয়াতীত অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করা যায় না। একজন সাধারণ চাষী যখন কয়েক শ' মাইল পথ হেঁটে পুণ্যতোয়া জাহ্নবী প্রথম দর্শন করে তখন যে অনুভূতি হয় সে অনুভূতি 'অতীন্দ্রিয়'। আবার সেই পুণ্যসলিলার জলে অবগাহন স্নান করে যখন তার দেহমন জুড়িয়ে যায়, তখন তার একইরকম অনুভূতি হয়। মন্দিরে, শ্মশানে, রাজনৈতিক সমাবেশে, জনতা পরিবেষ্টিত কোন জাতীয় নেতাকে দেখে কিংবা কোন পুণ্যদেহ গুরু বা সন্ন্যাসীর 'দর্শন' লাভ করেও এই রোমাঞ্চকর বিহ্বলতার স্বাদ পাওয়া যায়। বস্তুত, 'দর্শন' থেকে এক অনির্বচনীয় বিদ্যুৎ শিহরন সঞ্চারিত হয় প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে। তখন মনে হয় এক অনুকূল কৃপাবাতাস বইছে সেখানে।

শনিবার ১৭ জানুয়ারির বিকালে সেই আদি অকৃত্রিম দর্শনাভিলাষ সঞ্চারিত হলো এমন দুজন মানুষের মধ্যে যারা ৭০০ মাইল তফাতে থাকে এবং যাদের দুজনের আবেগের মধ্যে ফারাকও দুস্তর। তবুও আশ্চর্যের ব্যাপার, ইতিহাসের ধারায় অনতিবিলম্বেই নাম দুটি একসঙ্গে জুড়ে গেল। সেদিন বিকালের প্রার্থনাসভায় গান্ধীজীর গলার স্বর প্রায় চুপিচুপি কথার মতন শোনাল। মাত্র তিন মিনিট তিনি কথা বললেন। তাও একটানা নয়। অনেকক্ষণ থেমে থেমে কথা বলতে হচ্ছিল তাঁকে। তখনই হাঁপাতে হাঁপাতে গান্ধীজী বললেন, 'কারও সাধ্য নেই যে আমায় বাঁচিয়ে রাখে বা মেরে ফেলে। সে শক্তি আছে শুধু ভগবানেরই। মানুষের বাঁচামরা সবই তাঁর হাতে।'

সুতরাং এখনই অনশন প্রত্যাহার করার 'কোন কারণ' নেই। কথাটা শুনেই একটা চাপা আতংক ছড়িয়ে পড়লো সেই সমাবেশে। প্রার্থনাসভা শেষ হতেই দলে দলে মানুষ তাঁকে 'দর্শন' করার অভিলাষ নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লো। লম্বা লাইন! পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে সবাই কষ্ট পাচ্ছে মনে মনে। সকলেরই ধারণা হচ্ছিল যেন মৃত্যুর বড় কাছাকাছি পেঁছে গেছেন গান্ধীজী। সবারই মন হুহু করছে তাই। তখন অস্তগমন হচ্ছে সূর্যের। দ্রুত কমে আসছে দিনের আলো। সেই ম্লান আলোয় বিড়লাভবনের ঘাসছাওয়া লন দিয়ে হেঁটে আসার সময় অনেকেরই মনে হলো বোধহয় এটাই শেষ দেখা ওঁকে। সেদিনের 'দর্শন' অনুষ্ঠান প্রায় ঘন্টাখানেক সময় ধরে চললো। দর্শনাকাঙ্ক্ষায় সারি দিয়ে চলেছে অগণিত পুরুষ মহিলা ভক্ত। অনেকেরই চোখ টসটস করছে বেদনায়। তাদের মুখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল যখন বারান্দায় শুয়ে থাকা গান্ধীজীর ছোট্ট শরীরটা তারা

www.pathagar.com

দেখলো। সাদা শাল ঢাকা গান্ধীজীর কৃশ শরীরটা দেখেই হুহু করে কেঁদে উঠলো সবাই।

বম্বেতে 'বীর' সাভারকরের সঙ্গে শেষ মোলাকাত করতে এসেছে গড়সে ও আপ্তে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমানে চড়ে ওরা দুজন দিল্লি পৌঁছে যাবে। তাই নৃশংস যজ্ঞের যিনি পুরোহিত তাকে শেষবারের মতন দর্শন' করতে এল দুই আততায়ী।

বলাবাহুল্য, আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ইতিমধ্যেই দিল্লি পৌঁছে গেছে মদনলাল ও বিষ্ণু কারকারে। ওরা নিয়ে গেছে হ্যান্ড গ্রেনেড, টাইম বোমা আর দিশি পিস্তল। তাছাড়া গোপাল গড়সের সঙ্গে চলেছে বিলিতি স্বয়ংক্রিয় পিস্তল। আজই সন্ধ্যায় ট্রেনে উঠবে দিগম্বর বাড়্গে আর তার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এয়ার ইণ্ডিয়ার ডি.সি.থ্রি বিমানে উঠবে দুই হত্যাকারী নাথুরাম ও নারায়ণ আপ্তে।

সাভারকর সদনে দুই আততায়ীর সমাদরের কোন ত্রুটি হ'ল না। তবে সাক্ষাৎকারের সময় এবার দীর্ঘ হ'ল না। ওদের দুজনকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলো সাভারকর। তারপর সঙ্গে নিয়ে গ্রিল গেটের সামনে এসে দাঁড়ালো। যে মানুষটিকে সে সবচেয়ে ঘৃণা করে, পৃথিবী থেকে তাঁকেই চিরকালের মতন সরিয়ে দেবার ভার দিয়েছে এই দুজনের ওপর। কিন্তু আশ্চর্য! এতবড় চক্রান্তের এমন নিপুণ প্রেক্ষাপট তৈরি করেও প্রধান মানুষটি কেমন নির্বিকার। যেন কিছুই হয় নি এমনি এক ভাব তার মুখে। দৃঢ়, অভিব্যক্তিহীন কঠিন মুখে কোন আলোছায়া নেই। পুরু ঠোঁটদুটি বরফের মতন নিথর। শুধু হাত দুটি ফেলা আছে দুই বিশ্বস্ত অনুচরের কাঁধের ওপর। খানিক পরে ওদের চোখে চোখ রেখে সাভারকর বললো, 'তোমরা সফল হয়ে ফিরে এস।...আমি অপেক্ষা করবো।'

নতুন দিল্লির বিড়লাভবনে তখন লক্ষ মানুষের ঢল নেমেছে। মানুষের সেই বিরামহীন স্রোত মিলিত হলো বিড়লাভবনে, যেখানে বেহুঁশ ঘোরের মধ্যে গান্ধীজী শুয়ে আছেন। আলবুকার্ক রোড ধরে আগত সেই মিছিলের মাথায় উড়ছে নানারঙের অসংখ্য পতাকা নিশান ইত্যাদি। পতাকা নিশানের গায়ে বড় বড় করে লেখা আছে 'গান্ধীজী জিন্দাবাদ।' দিন পাঁচেক আগে মুষ্টিমেয় কিছু উন্মাদ মানুষ যেখানে আওয়াজ তুলেছিল 'গান্ধী মুর্দাবাদ' সেখানেই আজ ধ্বনিত হলো অন্তত সহস্রগুণ অধিক এই 'জিন্দাবাদ' ধ্বনি।

কত সংস্থাই না হাজির হয়েছে এই মিছিলে। টাঙ্গা ড্রাইভার্স্ এসোশিয়েশন, রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, পোস্ট এ্যান্ড টেলিগ্রাফ এম্প্লয়িজ, হরিজন্স অব দি ভাঙ্গী সুইপার্স্ কলোনি। দিল্লি উইমেন লীগ ইত্যাদি। গান্ধীজীর শয্যাপার্শ্বে পৌঁছবার জরুরী তাগিদ নিয়ে ওরা ছুটে এসেছে এই বিড়লাভবনে। তারপর ফটক পেরিয়ে, গাছের চারা মাড়িয়ে, গোলাপবাগান তছনছ করে প্রায় উন্মত্ত স্রোতের মতন নাচতে নাচতে ওরা এসে পৌঁছল। ওদের গলায় কল্লোলিত হলো গান্ধীজীর জন্য প্রাণ দেবার কাড়াকাড়ি।

লোকগুলোর মেজাজ দেখে এবং গান্ধীজীর অনশনের পরিণাম বুঝে নেহরু হঠাৎ প্রার্থনামঞ্চের ওপর দাঁড় করানো মাইক্রোফোনটা হাতে নিলেন। তারপর

www.pathagar.com

অনুরাগীদের দিকে চেয়ে বললেন, 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা নিয়ে আমি স্বপ্ন দেখতাম। এশিয়ার ভবিষ্যতের একটা ছবিও এঁকে রেখেছি আমার বুকের মধ্যে। এ সবই করেছেন গান্ধীজী। ইনিই সেই মানুষ যিনি দেখতে সুশ্রী নন। যাঁর পোশাকে চাকচিক্য নেই। কথায় পালিশ নেই।' (এ্যান অড্ লুকিং ম্যান উইথ নো আর্ট অব ড্রেসিং, নো পলিশ ইন হিজ ওয়ে অফ স্পিচ) তারপর জনতার উদ্দেশে নেহরু বললেন যে গান্ধীজীই তাঁকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আরও বললেন, 'আমাদের এই দেশের মাটির এমন কিছু মহৎ গুণ আছে বলেই গান্ধীজীর মতন মহাপুরুষ এখানে জন্ম নেন।' অতঃপর শেষ কথাটি বললেন নেহরু। অভিভূত জনতার দিকে চেয়ে বললেন, 'ওঁর জীবনরক্ষার জন্য আমাদের কোন আত্মত্যাগই যথেষ্ট নয়। ওঁকে বাঁচাতেই হবে। কারণ, উনিই পারেন আমাদের আশাভ্রম তিরোহিত করে আসল লক্ষে পোঁছে দিতে।'

কিন্তু নেহরুর কথা শেষ না হতেই ওই সুশৃংখল জনতার মধ্যে একজনের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা গেল। লোকটাকে আমরা চিনি। ওর নাম মদনলাল। একটা অসুস্থ ঔৎসুক্য ওকে এখানে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। ওর সংগে এসেছে বিষ্ণু কারকারেও। ভিড়ের মধ্যে বসে ওরা স্তম্ভিত হয়ে শুনছিল নেহরুর কথা। যে মানুষটাকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার সংকল্প নিয়ে ওরা দিল্লি ছুটে এসেছে, লোকগুলো তাঁকেই বাঁচিয়ে রাখতে চায়। তাঁকে মিনতি করে বলছে যেন তিনি অনশন প্রত্যাহার করে নেন। মদনলালের বিদ্রোহী মন এই স্তুতিবাদ মেনে নিতে পারলো না। চিৎকার করে নেহরুর কথার প্রতিবাদ করে বসলো আহাম্মকের মতন।

এরপর যা স্বাভাবিক তাই ঘটে গেল। দুদিক থেকে সাদা পোশাকের পুলিস এসে ঝাপটে ধরলো অসহিষ্ণু মদনলালকে। হতভম্ব কারকারের মনে হ'ল তাদের সমস্ত পরিকল্পনা বুঝি এবার বানচাল হয়ে যায় এই ছেলেটার গোঁয়ারতুমির জন্য। আর কোনদিনই তাদের চক্রান্ত সফল হবে না। অনশনের ধকল কাটিয়ে উঠবেন বৃদ্ধ গান্ধীজী এবং আবার শুরু হবে তাঁর চতুরালি। মনে মনে হায় হায় করতে লাগলো বিষ্ণু কারকারে।

তবে কারকারের শঙ্কাটা ভিত্তিহীন। পুলিসের হাতে ধরা পড়লেও কোন হয়রানি হ'ল না মদনলালের। সারা দিল্লি শহরে তার মতন এমন খেপা অসুখী হিন্দু উদ্বাস্তু অনেক আছে। যেখানে সেখানে চিৎকার করে তারা প্রতিবাদ জানায়। পুলিস বেশ জানে সে কথা। তাই মদনলালকেও তারা এমনি একজন রাগী, অতৃপ্ত যুবক হিসাবে ধরে নিল। সুতরাং কোন বিপত্তি হলো না। এমনকি জিজ্ঞাসাবাদ দূরে থাক, নামটাও জানতে চাইল না পুলিস। নিঃসংশয়ে ছেড়ে দিল মদনলালকে।

সন্ধ্যার কিছু পরেই প্যারেলাল বিড়লাভবনের ভেতরে ঢুকলেন। তাঁর হাতে একটা বার্তা রয়েছে। এটাই শেষ পর্যন্ত হয়ত গান্ধীজীকে প্রাণদান করবে। সারাটা রাত টালমাটাল অবস্থা গেছে। মনে হয়েছে বুঝি একটা পলকা সুতোয় তাঁর জীবন ঝুলছে। নাড়ির গতি অনিয়মিত, দুর্বল। মধ্যে মধ্যেই ভুল বকেছেন। হয়ত যে কোন মুহূর্তেই শেষের ঘণ্টা বেজে উঠবে। প্রস্রাব করতে না 'পারার কষ্ট ক্রমেই তীব্র হচ্ছিল। এগুলোই বলে দিচ্ছে যে

www.pathagar.com

গান্ধীজীর শরীরের যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

প্যারেলালজী যখন ঘরে ঢুকলেন তখন গান্ধীজী আচ্ছন্নের মতন পড়ে আছেন। মনে হয় ঘুমচ্ছেন। ঘরের সর্বত্র থমথম করছে শোকের ছায়া। গান্ধীজীর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে ডাকলেন প্যারেলালজী। গান্ধীজী কোন সাড়া দিলেন না। একটুও নড়লো না তাঁর শরীর। এবার তাঁর কাঁধ দুটি ধরে ধীরে ধীরে নাড়লেন প্যারেলালজী। গান্ধীজীর শরীরটা কেঁপে উঠলো। তিনি চোখ খুলে তাকালেন। প্যারেলালজী তখন পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করেছেন। সেটা খুলে গান্ধীজীর চোখের সামনে মেলে ধরলেন প্যারেলাল। 'কি ওটা?' গান্ধীজীর চোখে জিজ্ঞাসা দেখে প্যারেলালজী জানালেন যে শান্তি কমিটির স্বাক্ষর করা সেই চার্টারটা। এখনই পেয়েছেন এটা। শান্তি, শৃঙ্খলা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে ওই সই করা কাগজটা।

গান্ধীজী খুশী হলেন। একটা তৃপ্তি ফুটে উঠলো তাঁর সারা শরীরে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইলেন শহরের সব নেতারা স্বাক্ষর করেছেন কি না। প্যারেলালজী দ্বিধাগ্রস্ত। কি জবাব দেবেন? দুজন ছাড়া আর সবাই স্বাক্ষর করেছেন এই সনদে। গান্ধীজীর চিরশত্রু দুই গোঁড়া হিন্দু প্রতিষ্ঠান হিন্দু মহাসভা ও আর.এস.এস. দলের স্থানীয় দুই নেতা সই করতে অস্বীকার করেছেন। গান্ধীজী নিঃশব্দে শুনলেন। তাঁকে আশ্বস্ত করতে প্যারেলাল বললেন যে ওই নেতা দুজন পরের দিন স্বাক্ষর করবে। তবে অন্য নেতারা যুক্ত বিবৃতি মেনে নিয়েছেন। এখন গান্ধীজী তাঁর অনশন প্রত্যাহার করে নিন এবং কিছু আহার গ্রহণ করুন যাতে রাতটুকু নির্বিঘ্নে কাটাতে পারেন। কিন্তু না। প্যারেলালজীর এই প্রার্থনা তিনি মেনে নিতে পারলেন না। অতি কষ্টে প্যারেলালজীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে অনুচ্চ স্বরে গান্ধীজী বললেন, 'না। কোন কিছুই তাড়াতাড়ি করা উচিত নয়। যতদিন না ওদের পাথরমনটি কোমল হচ্ছে ততদিন আমার অনশন বন্ধ হবে না।'

টেলিফোনটা ঝনঝন শব্দে বেজে উঠতেই সভার কাজ থেমে গেল। সভা চলছিল কংগ্রেস দলের সভাপতির অফিস ঘরে। সভাপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ মিটিং ছেড়ে টেলিফোন ধরতে ছুটে এলেন। টেলিফোন এসেছে বিড়লাভবন থেকে। রাজেন্দ্রপ্রসাদকে বলা হলো যে গান্ধীজীর শারীরিক অবস্থার হঠাৎ অবনতি হয়েছে। যদি এখনই সাতদফা শর্ত সম্বলিত চার্টারটি অনুমোদন করে সব নেতার স্বাক্ষর নিয়ে একটি প্রস্তাব পাঠানো না হয় তাহলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। দিনটা রবিবার, ১৮ জানুয়ারি, সময় বেলা এগারোটা। রাজেন্দ্রপ্রসাদ আরও জানতে পারলেন যে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে বেহুঁশ ঘোরের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে আছেন গান্ধীজী।

খবরটা শুনেই প্রায় বিধ্বস্ত মুখে উপস্থিত সবাইকে মর্মান্তিক ঘটনাটা জানালেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ। গুরুত্বপূর্ণ নথিটায় শেষ স্বাক্ষর দিতে সবাই জড়ো হয়েছেন সভায়। কয়েকজন বিশিষ্ট নেতাকে সঙ্গে নিয়ে এবং অন্যদের আসতে বলে রাজেন্দ্রপ্রসাদ তখনই পৌঁছলেন বিড়লাভবনে। গান্ধীজীর তখনও হুঁশ ফিরে আসে নি। মরণাপন্ন রোগীর পাশে নার্স সিস্টারদের মতন গান্ধীজীর শয্যাপাশেও দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর ঘনিষ্ঠ সাঙ্গোপাংগরা। আগের দিনের

www.pathagar.com

মতন তাঁর কানের কাছে মুখ এনে তাঁকে জাগাবার চেষ্টা করলেন প্যারেলালজী। কিন্তু গান্ধীজীর দেহে কোন সাড় নেই যেন। ধীরে ধীরে কপালে হাত বুলিয়ে দিলেন। গান্ধীজী তেমনি অঘোর, অচৈতন্য। একজন একটা ভেজা ন্যাকড়া নিয়ে এল। তারপর ঠান্ডা জলের সেই পটি তাঁর মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হলো। একটু একটু জলপট্টির শীতল ছোঁয়া তাঁর চেতনায় প্রবিষ্ট হতেই গান্ধীজীর শরীরটা ঈষৎ নড়ে উঠলো। খানিক পরে চোখ খুলে তাকালেন তিনি। তখন তাঁকে ঘিরে রয়েছে এক ঘর মানুষ। ওদের দিকে চেয়ে ক্ষীণ একটু হাসলেন গান্ধীজী। আজ তিনি একটা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়েছেন। তিনিই শুধু পারেন এমন মিরাক্‌ল্‌ ঘটাতে। তাঁকে ঘিরে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের শরীরে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর রক্তধারা। শতাব্দী প্রাচীন দ্বেষ ও শত্রুতার বিষ ছড়িয়ে আছে ওদের রক্তে। একই মাতৃভূমির সন্তান হলেও ওরা সবাই পোশাকে, আচরণে, ধর্মে পৃথক। কেউ উষ্ণীষ পরা শিখ, কেউ ফেজ্‌ পরা মুসলমান। হিন্দু কংগ্রেসীরা পরেছে ধুতি। খ্রীশ্চান, পার্শীরা পরেছে প্যান্ট কোট। আরও অনেককে দেখলেন গান্ধীজী। দেখলেন অস্পৃশ্য হিন্দু হরিজনদের, গেরুয়া পরা সাধুদের। ওদের সঙ্গে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে উগ্র মৌলবাদী দক্ষিণপন্থী হিন্দুমহাসভা ও আর.এস.এস. বাহিনীর নেতারাও। পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতকে পাশে নিয়ে ওরা দাঁড়িয়ে আছে শান্তভাবে। গান্ধীজীর মনে হলো যেন সত্যিকার ভারত দেখছেন।

খাটিয়ার ওপর গান্ধীজীর দোমড়ানো ছোট্ট শরীরের পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ। তারপর অনুচ্চ স্বরে গান্ধীজীকে বললেন যে তাঁর সাত দফা চার্টারে সবাই একমত হয়ে স্বাক্ষর করেছেন। এখন দলমতনির্বিশেষে সবাই চাইছেন যেন এবার তিনি অনশন ভঙ্গ করেন। শয্যাঘিরে যারা দাঁড়িয়েছেন তারাও একজন একজন করে রাজেন্দ্রপ্রসাদের কথাগুলো সমর্থন করলো। সকলের একই রকম ইচ্ছের কথা শুনে গান্ধীজীর মুখে দারুণ খুশী ফুটে উঠলো। ইশারায় জানালেন কিছু বলতে চান। মনু তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে গান্ধীজীর ঠোঁটের কাছে তার কান নিয়ে এল। তারপর গান্ধীজী যা বললেন সেগুলো একটা নোটবইয়ের মধ্যে টুকে প্যারেলালজীর হাতে তুলে দিল মনু। কথাগুলো সবাইকে পড়ে শোনালেন প্যারেলালজী।

ক্ষীণ, দুর্বল শরীর নিয়েও একজন নির্মম শাসকের মতন গান্ধীজী তাঁর প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের নীতিটি আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন। চতুর মানুষটি বুঝেছিলেন যে যাদের দিয়ে তিনি কাজ করাতে চান তারাই ঘিরে আছেন তাঁকে। তাই সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপনের উদ্যোগটি এঁদের দ্বারাই সম্পন্ন করাতে চাইলেন তিনি। থেমে থেমে কথা বলতে হচ্ছে গান্ধীজীকে। মিনিট দুই থামছেন, আবার দম নিয়ে কথা বলছেন। এইভাবেই চললো গান্ধীজীর কথা বলা। তাঁর অবস্থা দেখে বেদনায় অভিভূত হলেন প্যারেলাল। আর যেন পড়তেও পারছেন না শ্রীমতী মনুর লেখা কাগজটা। বোন সুশীলার হাতে সেটা ধরিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন প্যারেলাল।

গান্ধীজীর টুকেরাখা কথাগুলো তখন সুশীলা পড়ছে। গান্ধীজী বললেন, 'আমাদের সবচেয়ে নির্বুদ্ধিতা হলো ভারতকে শুধু হিন্দুদের এবং পাকিস্তানকে শুধু মুসলমানদের দেশ মনে করা। আমি জানি যে সমস্ত ভারত ও পাকিস্তানকে নতুনভাবে গড়ে তোলা কত কঠিন। কিন্তু মনপ্রাণ দিয়ে আমরা যদি কিছু করতে

www.pathagar.com

চাই, তাহলে কোন একদিন সেটি বাস্তবসত্য হয়ে উঠবেই।'

খানিকক্ষণ থেমে গান্ধীজী আরও বললেন, 'আমার সব কথা শোনার পরেও যদি আপনারা চান তবে আমি অনশন তুলে নেব। কিন্তু ভারত যদি তার মনোভাব না বদলায় তাহলে আপনাদের এই কথাদেওয়া শুধুই উপহাস হয়ে দাঁড়াবে। তখন মরা ছাড়া আমার কোন গতি থাকবে না।'

গান্ধীজীর কথা শেষ হতেই ঘরের মধ্যে একটা আনন্দের ঢেউ ছড়িয়ে পড়লো। একজন একজন করে এসে সবাই গান্ধীজীকে আশ্বস্ত করলেন। বললেন যে গান্ধীজীর কথার যথার্থ মর্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা। এমনকি গান্ধী হত্যার ষড়যন্ত্রকারী কম্যান্ডো বাহিনীর প্রতি আস্থাশীল জঙ্গী হিন্দু আর.এস.এস. দলের স্থানীয় নেতাও গান্ধীজীকে আশ্বস্ত করে বললো, 'আমরা শপথ করছি যে আপনার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবো।'

এইভাবে যখন শেষ মানুষটিও সম্মতি জানিয়ে গেল তখন মনুকে তাঁর শয্যাপাশে ডাকলেন গান্ধীজী। তারপর তার হাত থেকে চেয়ে নেওয়া প্যাডের পাতায় কাঁপা কাঁপা হাতে লিখলেন, 'আমি অনশন ভাঙতে রাজী। ঈশ্বর যা চান তাই-ই হ'ক।' প্যাডের লেখাটা পড়ে মনুর সারা মুখ পবিত্র আনন্দে ঝলমল করে উঠলো। তরিপর উদ্ভাসিত মুখে গান্ধীজীর নিজের হাতের লেখাটা সকলকে পড়ে শোনাল মনু।

মনুর মুখে গান্ধীজীর ইচ্ছার কথাটা শুনেই একটা দারুণ খুশীর জোয়ার ভরিয়ে দিল ঘরখানা। একজন জনপ্রিয় নেতা যখন নির্বাচনে জয়ী হয় তখন তাকে নিয়ে জয়গৌরবের যে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে ঠিক সেইরকম উৎসাহ ছড়িয়ে পড়লো ঘরের মধ্যে। অবশেষে শান্ত হলো উচ্ছ্বাস। গান্ধীজী সবাইকে সর্বধর্মপ্রার্থনায় যোগ দিতে বললেন। পাঠ হলো গীতা, কোরান, বাইবেল থেকে। অবশেষে পারসীকদের 'মাজ্দা' প্রার্থনাগীত শেষ হবার পর, গাওয়া হলো শিখ-গুরু গোবিন্দ্ সিংহর স্তোত্রগান। চোখ মুছে গান্ধীজী শুনলেন সবধর্মের প্রার্থনাগান। ভগবদপ্রেমের স্বগীয় আলোয় উজ্জ্বল হয়ে গেল গান্ধীজীর মুখ। সব স্তোত্রগানের সঙ্গেই ঠোঁট নেড়ে অংশগ্রহণ করলেন তিনি।

ছোট্ট ঘরখানায় তখন তিলধারণের জায়গা নেই। সারা পৃথিবীর সাংবাদিক আর আলোকচিত্রীরা এসে জড়ো হয়েছে ঘরের মধ্যে। ওই ভিড়ের মধ্যেই পথ করে হাতে গ্লুকোজ মেশানো এক গেলাস কমলালেবুর রস নিয়ে আভা এসে দাঁড়ালো গান্ধীজীর বিছানার পাশটিতে। মৌলানা আজাদ ও নেহরু দুজনেই তখন আনন্দে অভিভূত। থরথর করে কাঁপছে তাঁদের শরীর। সেই অবস্থাতেই ফলের রসের গেলাসটা দুজনেই হাতে নিয়ে গান্ধীজীর মুখের কাছে তুলে ধরলেন। ঘরের মধ্যে ঝল্সে উঠলো একাধিক ক্যামেরার ফ্ল্যাশবাল্ব। ঝকমক করে উঠলো ঘরের চেহারা। তখন বেলা পৌনে একটা। ১২১ ঘন্টা ৩০ মিনিট পরে ৭৮ বছরের বৃদ্ধ গান্ধীজী এক গ্লাস ফলের রস পান করে এবার তাঁর অনশন ভাঙবেন। অনশনের পর এই প্রথম পুষ্টিবর্ধক পানীয় গ্রহণ করতে চলেছেন তিনি।

তাঁর অনশন ভাঙার পাকা খবরটা ছড়িয়ে পড়তেই বিড়লাবাড়ির বাগানে, এখানে ওখানে অপেক্ষারত মানুষ আনন্দে চিৎকার করে উঠলো। অন্তঃপুরের মেয়েরা ডালা সাজিয়ে ছাড়ানো কমলা নিয়ে গান্ধীজীর শয্যাপাশে এসে দাঁড়ালো। ডালা ছুঁয়ে 'প্রসাদ' করে দিলেন গান্ধীজী। তখন চোখের জল আর খুশীতে

www.pathagar.com

মাখামাখি হয়ে গেছে অন্তঃপুরবাসিনীদের মুখ। সেই অবস্থায় হাতে ডালা নিয়ে প্রসাদ বিলি করলো অপেক্ষারতদের মধ্যে। এইভাবেই একদল বিচ্ছিন্ন মানুষের সংগে এদের এক নিগূঢ় আত্মিক বন্ধন স্থাপিত হলো।

এই পর্ব যখন মিটলো তখন গান্ধীজীর শরীরে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। পাঁচদিনের 'উপবাসের পর' এই ধকল যেন শরীরমন ভেঙে দিয়েছে তাঁর। গান্ধীজীর কাহিল অবস্থা দেখে ঘর থেকে সবাইকে চলে যেতে বলা হ'ল। রইলেন শুধু জওহরলাল। মানুষটির মন থেকে সব দুশ্চিন্তা চলে গেছে। খুশীর আনন্দে মুখের চেহারাটাও বদলে গেছে। দিব্যি প্রসন্ন মুখে গান্ধীজীর খাটিয়ার পাশটিতে আসনসিঁড়ি হয়ে বসে আছেন তাঁর মন্ত্রশিষ্য জওহরলাল। তারপর ঘর থেকে সবাই চলে গেলে গান্ধীজীর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে যা বললেন সেটি নাকি আর কারও কাছে তিনি তখনও ভাঙেন নি। এমনকি মেয়ে ইন্দিরার কাছেও নয়। নেহরু বললেন গতদিন থেকে তাঁর মন্ত্রগুরুর সংগে তিনিও প্রতীক অনশন করে আছেন।

গ্লুকোজজল খাবার পর থেকেই গান্ধীজীর শরীরমন উৎসাহে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে মনে হল। গত ছত্রিশ ঘণ্টা যে ভাবে প্রায় ক্ষীণ স্বরে কথা বলেছেন, হালফিল সেই স্বরেই ফিরে এসেছে হারিয়ে যাওয়া তেজ। তাই বিকালের প্রার্থনাসভায় তাঁর উপলব্ধির কথাগুলি নবীন প্রেরণায় ব্যক্ত করলেন গান্ধীজী। প্রথমে সবাইকে ধন্যবাদ দিলেন তিনি। বললেন, 'আপনারা আমায় যে অনুগ্রহ দেখালেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। সারা জীবনে একথা ভুলবো না আমি।' একটু চুপ করলেন তিনি। তারপর বললেন, 'আমার অনুরোধ দিল্লি বা অন্য জায়গার মধ্যে কোন তফাত করবেন না আপনারা।' তিনি চান ভারত ও পাকিস্তানের সর্বত্রই শান্তি ফিরে আসুক। গান্ধীজী আরও বললেন, 'যদি আমরা মনে রাখি যে সব জীবনই একটা, তাহলে পরস্পরকে শত্রু মনে করার কোনই কারণ নেই।' তাই তাঁর ইচ্ছা সব হিন্দু পবিত্র কোরানগ্রন্থ পাঠ করুন এবং সব মুসলমান চিন্তা করুন হিন্দুর গীতা-রহস্য ও তাঁরা পাঠ করুন শিখেদের 'গ্রন্থসাহব' নামক ধর্মগ্রন্থ। তারপর বললেন, 'যেমন আমরা নিজের ধর্মকে শ্রদ্ধা করি তেমনি অন্য ধর্মের মানুষকেও যেন শ্রদ্ধা করতে পারি। যা সত্য ও শুদ্ধ তা চিরকালই সত্য ও শুদ্ধ। তার কোন ভেদাভেদ নেই। হ'ক না তা সংস্কৃত, উর্দু, ফারসীতে লেখা।'

অবশেষে শেষ কথাটি বললেন, 'ঈশ্বর আমাদের চৈতন্য দিন, বিবেকবান করুন আমাদের। যেন তাঁর প্রতি আমাদের আস্থা ঘনিষ্ঠ হয়। তাহলেই ভারত ও সারা বিশ্বের মানুষ সুখী হবে।'

সেই সন্ধ্যায় তাঁর দর্শন-অনুষ্ঠানটি এক অসাধারণ দৃশ্য হয়ে উঠলো যেন। সদ্যোজাত শিশুর মতন চেয়ারে বসিয়ে, গায়ে কম্বল জড়িয়ে তাঁকে তখন বাইরের খোলা বারান্দায় আনা হয়েছে। যেন সবাই তাঁকে দেখতে পায়। কিন্তু ভক্তদের মন সরলো না। তাই বিজয়ী হেভিয়েট বক্সারের মতন তাঁকে কাঁধে তুলে তারা নাচতে লাগলো আর সকলের কাঁধে চড়ে সেই বৃদ্ধশিশুটি ভারী আমোদ করে সবাইকে হাত নেড়ে আশীর্বাদ করতে লাগলেন। এই বিরল মনোহর দৃশ্যটি দেখে মনুর চোখদুটি মুগ্ধ হয়ে গেল। তার মনে হলো এমন মধুর দৃশ্যের সংগে তুলনা হতে পারে কেবল একটি দৃশ্যের। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যেন চৌদ্দ বছরের

www.pathagar.com

বনবাস শেষ করে অযোধ্যানগরে ফিরে এসেছেন এবং অযোধ্যাবাসীরা হর্ষোৎফুল্ল মনে তাঁকে কাঁধে চড়িয়ে নাচছে আর বলছে. 'হে ভগবান! আমাদের কৃপা করো যেন তোমার সেবা করে আমরা ধন্য হতে পারি।'

ঘণ্টা তিনেক পরে সারা দিল্লি যখন তাঁর অনশন প্রত্যাহারের খুশীতে বিভোর, তখন গান্ধীজী দিনের প্রথম আহার গ্রহণ করলেন। পোয়াটাক ছাগলদুধ আর চারটি কমলালেবু। খাওয়া-দাওয়ার পর সঙ্গীদের দিয়ে তাঁর প্রিয় চরকা যন্ত্রটি আনিয়ে নিলেন। সাবেককালের এই যন্ত্রটার মধ্যে যে জীবনদর্শন মূর্ত হয়েছে সেটাই অগণিত মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে এই যন্ত্রটি। তাই ডাক্তার আর সঙ্গোপাঙ্গরা হায় হায় করে ছুটে এলেও গান্ধীজী কোন বারণই শুনলেন না। চরকাটা কোলের কাছে টেনে কাঁপা হাতে চাকা ঘুরিয়ে কাজ শুরুর সময় অনুচ্চ স্বরে আপন মনেই বলতে লাগলেন. 'বিনা মেহনতে যে রুটি মেলে তা চুরির রুটি। আমি যখন খাবার খাওয়া শুরু করেছি তখন মেহনত কেন করবো না!'

www.pathagar.com

মদনলালের প্রতিহিংসা

নয়াদিল্লি, ১৯-২০ জানুয়ারি ১৯৪৮

গান্ধীজীকে এমন হৃষ্ট, উৎফুল্ল কতকাল দেখেন নি প্যারেলাল। এমন আনন্দময় চেহারা কবে শেষ দেখেছেন মনেও পড়ে না প্যারেলালের। অনশনের পর থেকেই গান্ধীজীর মুখচোখ যেন স্বর্গীয় বিভায় ঝলমলে হয়ে উঠেছে। এর দারুণ সাফল্য তাঁর চোখের সামনে খুলে দিয়েছে এক 'সীমাহীন স্বপ্ন ও আশার' জগৎ। ১৯২৯ সনের সেই লবণ আন্দোলনের পরে আর কোন কৃতিত্বই সারা জগতকে এমনভাবে উদ্দীপ্ত করতে পারে নি।

বিড়লাভবনে তখন যেন অভিনন্দনের বান ডেকেছে। বিশ্বের তামাম সংবাদ-পত্রগুলো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে গান্ধীজীর এই অসাধারণ কৃতিত্ব দেখে। বিলেতের কাগজগুলো ত পাঁচমুখে প্রশংসা করলো। নিউজ ক্রনিক্ল্ লিখলো, '৭৮ বছরের বৃদ্ধ গান্ধীজী তাঁর এই ঐশী আত্মিক শক্তির মহিমা দেখিয়ে যেন জাদু করে দিয়েছেন সারা বিশ্বকে।' তারা আরও লিখলো, 'যে আত্মিক শক্তির বিকাশ তিনি দেখালেন তা যে আণবিক বোমার চেয়েও শক্তিশালী ইওরোপের উচিত অ অনুধাবন করা।' লন্ডনের দ্য টাইম্স্ পত্রিকাটি কোনদিনই ভারতের গুণগ্রাহী নয়। কিন্তু তারাও লিখলো, 'মিস্টার গান্ধীর নির্ভীক আদর্শবাদ আর কখনও এমন সরল সত্য হয়ে দেখা দেয় নি।' ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকার মন্তব্যটি সবচেয়ে উচ্ছ্বাসময়। তারা লিখলো, 'গান্ধীজী একজন রাজনৈতিক সাধু হতে পারেন, কিন্তু সৎ রাজনৈতিক নেতা রূপে তিনি এতটুকু কম নন।' মার্কিন সংবাদপত্র ওয়াশিংটন পোস্ট সরল স্বীকারোক্তি করলো যে, তাঁর জীবন এমনভাবে রক্ষা পাওয়ায় যথার্থই 'স্বস্তির হাওয়া' সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এ যেন 'তাঁর সাধুতারই পরিচয়' দেয়। মিশর দেশ তাঁকে এশিয়ার মহান সন্তান বলে অভিহিত করলো। তারা বললো যে শান্তি, ক্ষমা ও মিলনের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন গান্ধীজী। প্রাচ্যের আর একটি দেশ ইন্দোনেশিয়া তো এই অসাধারণ মানুষটির মধ্যে প্রাচ্যের 'মুক্তিসূর্যের উদয়' দেখতে পেল।

প্রশংসার বিপুল প্লাবনে এমনভাবে ঢাকা পড়ে গেল বিড়লাবাড়ি যে, গান্ধীজীও নির্বিকার থাকতে পারলেন না। ১৯শে জানুয়ারি সোমবার তাঁর মৌনী দিবস। কিন্তু উপচে পড়লো তাঁর মনের আনন্দ এবং সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়লো সেই খুশী। অনশনের শেষে দিনগুলিতে বিড়লাবাড়ির সর্বত্র যে হতাশা চেপে বসেছিল সেখানে তখন তাজা খুশীর হাওয়া বইছে। গান্ধীজীর দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে এখন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে চলেছে যা তাঁর অহিংসানীতির জয়গানে মুখর হয়ে থাকবে।

শুধু ফলের রস, বার্লি ও গ্লুকোজজল খেয়ে গান্ধীজীর শরীর তখনও বেশ কাহিল। কিন্তু শরীরের এই দুর্বলতা সত্ত্বেও মন যেন আশা আনন্দে মুখর হয়ে আছে। এতটুকু ক্লান্তি নেই মুখেচোখে। সঙ্গীসাথীরাও উৎফুল্ল। তারা সব-চেয়ে আশ্বস্ত হলেন যখন রোজকার মতন সেদিন সকালেও গান্ধীজীর ওজন নেওয়া

www.pathagar.com

হলো। ১০৬ পাউন্ড। ওজন দেখে সকলের মনের ওপর চেপে বসে থাকা উৎকণ্ঠা এক নিমেষে অন্তর্ধান করলো। বিড়লাবাড়িতে গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠদের কাছে সেটাই তখন শ্রেষ্ঠ সংবাদ। অর্থাৎ গান্ধীজীর জলমগ্ন কিড্‌নি দুটি আবার স্বাভাবিক কাজ শুরু করেছে। সবাই উপলব্ধি করলো যে তাঁর অজেয় সত্তা যেন জড়সড় অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসবে এবং স্বপ্রকাশ মহিমায় উজ্জ্বল হবে।

ঠিক যে সময় গান্ধীজীর ওজন নেওয়া হচ্ছে প্রায় তখনই বিড়লামন্দিরের পিছনের ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে একটু ফাঁকা জায়গায় ছ'টি প্রাণী এসে নিঃশব্দে জড়ো হলো। জায়গাটা নিরিবিলি এবং কৌতূহলী পথিকের শ্রবণ থেকে বেশ খানিকটা নিরাপদ দূরত্বে। কখন এবং কিভাবে গান্ধীজীকে আক্রমণ করা হবে তার রূপরেখা ঠিক করার আগে অস্ত্রগুলো পরখ করতে ওরা এখানে জমা হয়েছে। প্রথমে গোপাল তার জ্যাকেটের তলা থেকে °৩২ ক্যালিবার পিস্তলটা বের করলো। তারপর গুলি ভরে ২৫ ফুট মতন দূরত্বে পিছিয়ে এসে পিস্তলের ঘোড়া টিপলো। সব ভোঁ ভোঁ। আবার ট্রিগার টিপলো গোপাল। এবারও একই ফল।

আপ্তে ও নাথুরাম তখন পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। দুজনেই কিছু স্তম্ভিত। কিন্তু আপ্তে ততক্ষণে মন ঠিক করে নিয়েছে। ইশারায় বাড়্‌গেকে তার দিশি পিস্তলটা বার করতে বললো। সবারই মনের অবস্থা একইরকম। না জানি কি হয়। যে গাছটা গোপাল নিশানা করেছিল বাড়্‌গে সেটাকেই নিশানা করলো। তারপর কিছুটা পিছিয়ে এসে ট্রিগার টিপলো। একটা তীক্ষ্ন শব্দ হলো। সবাই ছুটে গেল গাছটা দেখতে কোন গুলির দাগ পড়েছে কি না। না, গাছ পর্যন্ত গুলি পৌঁছয় নি। অর্ধেক পথ না যেতেই মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছে গুলি। বাড়্‌গে দ্বিতীয়বার ট্রিগার টিপলো। এবার গুলি এসে পড়লো নিশানার ডান দিকে। পরপর চারবার গুলি ছুঁড়লো বাড়্‌গে। একবারও লক্ষ্যবস্তুর কাছাকাছি পৌঁছল না গুলি। আপ্তে ঠিকই আশঙ্কা করেছিল। বাড়্‌গের পিস্তলের যা ছিরি তাতে গান্ধী মারতে গিয়ে নিজেদেরই মরতে হবে।

ষড়যন্ত্রীরা সবাই তখন দারুণ মুষড়ে পড়েছে। কথা হারিয়ে গেছে তাদের। গোপাল যখন অক্ষম হাতে পিস্তলটা নাড়াচাড়া করছিল তখন ভাইয়ের দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে রইল নাথুরাম। একদম ভেঙে পড়েছে সে। এতদিন সবকিছু কেমন ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু বাদ সাধলো আসল জায়গায় এসে। ২৫ ফুট দূর থেকে গুলি ছুঁড়ে গান্ধীকে হত্যা করাটাই এখন একমাত্র কাজের কাজ। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য। মালপত্র লোকজন নিয়ে দিল্লি পৌঁছেও এই কাজের কাজটা করে উঠতে পারলো না তারা। এখন বোধহয় নতুন করে ভাবতে হবে তাদের। ওরা কথা দিয়ে এসেছিল যে কাজটা নিষ্পত্তি করবে। কিন্তু গোপালের হাতের পিস্তলটা যদি কাজ না করে তাহলে সমস্ত চক্রান্তটাই বানচাল হয়ে যাবে কারণ দুটো পিস্তলের একটা অকর্মণ্য আর একটা লক্ষ্যহীন।

সেদিন বিড়লাবাড়ির মধ্যে হন্তদন্ত হয়ে যাকে ঢুকতে দেখা গেল বম্বের

www.pathagar.com

ব্যাপারী মহলে একজন নামকরা তুলার দালাল সে। গান্ধীজী এঁকেই দূত করে করাচি পাঠিয়েছিলেন তাঁর পাকিস্তান সফরের ব্যবস্থা করতে। এঁর নাম জাহাংগীর পটেল। দিল্লিতে অনশন নিয়ে গান্ধীজী যখন তাঁর অগ্নিপরীক্ষা চালাচ্ছেন, তখন তাঁরই প্রস্তাব নিয়ে জিন্নার সংগে গোপন আলোচনায় বসেছেন জাহাংগীর। কিন্তু একটা করে দিন কাটছিল আর গান্ধীজীর সফর-সম্ভাবনা যেন হ্রাস পেয়ে যাচ্ছিল। জিন্না ত প্রথম থেকেই বিরূপ ও সতর্ক। আসলে ওই ক্ষীণজীবী মানুষটি সম্বন্ধে জিন্নার অবিশ্বাস এত গভীর যে কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না পুরনো দিনের কথা। তাঁর কেবলই মনে পড়ছিল কেমন পাকেচক্রে ফন্দি-ফিকিরের ধান্দায় ফেলে ওই ফন্দিবাজ লোকটা তাঁকে কংগ্রেস দল থেকে উৎখাত করেছিল একদিন। তাছাড়া ভারতের অভিসন্ধি সম্বন্ধেও জিন্না মোটেই নিঃসংশয় নন। ভারতকে তিনি মোটেই সজ্জন দেশ মনে করেন না। এই দেশটার মতলব নিয়ে উৎকট সন্দেহ আছে জিন্নার মনে। তাই দূতের মুখে গান্ধীজীর প্রস্তাব শুনেই জিন্নার মনে হলো যে এটা নিশ্চয়ই ওই মার্কামারা 'হিন্দু ধড়িবাজটার' এক নতুন চাল।

তবে পাকিস্তানের হাতে বাকী টাকা মিটিয়ে দেবার সরকারী সিদ্ধান্ত এবং ভারতপ্রবাসী পাকিস্তানী মুসলমানদের জন্য গান্ধীজীর এই কষ্টভোগ দেখে তাঁর দেশবাসীর সঙ্গে জিন্নারও মনোভাব অনেক নরম হলো। বস্তুত, টাকাটার তখন খুব দরকার ছিল পাকিস্তান সরকারের। তাই গান্ধীজীর এই অনশন এবং ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদের জন্য তাঁর সদিচ্ছা জিন্না সাহেবের হৃদয় দুয়ারে ঘা দিতে না পারলেও, নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের সদরটি গান্ধীজীর জন্য হাট করে খুলে দেওয়া হলো। গান্ধীজী যেদিন তাঁর অনশন ভঙ্গ করলেন সেদিনই জিন্না সাহেব তাঁর পুরনো রাজনৈতিক শত্রু গান্ধীজীকে পাকিস্তানের মাটিতে সফর করতে আমন্ত্রণ জানালেন।

জিন্নার এই সিদ্ধান্ত গান্ধীজীর মনে উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হলো যেন। তাঁর মনে হলো, জীবনের এক মহা সন্ধিক্ষণ উপস্থিত যখন বৃহত্তর পরীক্ষাগারে যাচাই হবে তাঁর নীতি। ভারত থেকে বাইরে গিয়ে গান্ধীদর্শন প্রচারের সময় হয়েছে এবার। এই সুযোগ আগেও পেয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী রাজী হননি, কারণ ভারতকে স্বাধীন করাই তাঁর প্রথম স্বপ্ন ছিল। এখন স্বাধীন হয়েছে ভারত। যে 'ধ্রুবপদ' তিনি দেশবাসীর জন্য বেঁধেছিলেন, তাঁর অনশন সেই পথটাই ফিরিয়ে দিল ওদের। তাঁর মনে হলো এখনই সেই সে পরমক্ষণ এসেছে যখন দেশের বাইরে গিয়ে তাঁর দর্শনটি প্রচার করতে হবে। এবং পাকিস্তান ছাড়া এমন উর্বর ক্ষেত্র আর কোথায় তিনি পাবেন? এই উপ-মহাদেশে আজ কোন ভৌগোলিক ঐক্য নেই। না থাকুক, কিন্তু দুদেশের মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক মিলন ঘটাবে তাঁর অহিংসা নীতি।

তাই শুধু পাকিস্তান যাওয়াই নয়, কিভাবে যাবেন তারও একটা ছক তিনি মনে করে ফেললেন। বেশ কিছুদিন ধরে এই ব্যাপারটা নিয়েই স্বপ্ন দেখেছেন গান্ধীজী। জিন্না বলে পাঠিয়েছেন যেন বোম্বাই থেকে করাচি বন্দর পর্যন্ত গান্ধীজী জলপথে আসেন। কিন্তু এমন ঐতিহাসিক সফরে গান্ধীজীর মতন ব্যক্তিত্বের কাছে এই অনাড়ম্বর সফর যেন মানায় না। এ তুচ্ছ বেড়াতে যাওয়া নয় তাই গান্ধীজীর কিছুতেই মনঃপূত হলো না এমন সাদামাঠা যাত্রা। তিনি তুফান

www.pathagar.com

তুলে, মাটি কাঁপিয়ে যাত্রা করতে চান যাতে মানুষের মন আলোড়িত হয়। যেমন ভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভালের সীমানা পেরিয়েছিলেন, মাটি ছেঁচে এক মুঠো লবণ তুলে এনেছিলেন ডাণ্ডীর সমুদ্রবেলা থেকে, যেমনভাবে হাজার হাজার গ্রাম-বাসীদের মধ্যে অহিংসা মৈত্রী ও জনস্বাস্থ্যের মন্ত্র শিখিয়েছিলেন। ঠিক সেইরকম সাড়া জাগিয়েই তিনি পাকিস্তানে যেতে চাইলেন। গান্ধীজী স্থির করেছেন যে রক্তাক্ত পাঞ্জাবের বুকের ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে তিনি পাকিস্তান সফরে যাবেন। যে পথ মাড়িয়ে হাজার হাজার ছিন্নমূল মানুষ যাতায়াত করেছে এবং অপরিসীম ক্লান্তি সইতে না পেরে অনেকে প্রাণবলি দিয়েছেন, সেই হতভাগ্য পথ দিয়েই শুরু হবে তাঁর ঐতিহাসিক পদযাত্রা। একবছর আগে এইভাবেই নোয়াখালির গ্রামগঞ্জ, ও জলাজঙ্গল পেরিয়ে শুরু করেছিলেন তাঁর অবিস্মরণীয় তীর্থযাত্রা। আবার তেমনি পায়ে হাঁটা পথেই তীর্থযাত্রা করতে চাইলেন গান্ধীজী। তাঁর আশা এই তীর্থযাত্রা প্রেম ও প্রীতির অপার্থিব বন্ধনে আবদ্ধ করবে দুদেশের মানুষকে। দেশভাগের ফলে যে মৈত্রীবন্ধন শিথিল হয়ে গিয়েছিল আবার তা দৃঢ় হবে তাঁর এই তীর্থযাত্রায়।

অবশ্য ঠিক সেই মুহূর্তে এমন এক দুঃসাহসিক চিন্তা স্রেফ বাতুলতা মনে হতে পারে, কারণ যে পা দুটি তাঁকে পাকিস্তান সফরে নিয়ে যাবে, সেই পা দুটি ত প্রায় অকর্মণ্য! পায়ের এমন জোর নেই যে বিড়লাবাড়ির লনটুকু পেরিয়ে দর্শনপ্রার্থীদের কাছে পৌঁছান। তাই বলে, থেমে থাকবার মানুষও তিনি নন। রোজ সন্ধ্যায় যাঁরা তাঁর দর্শনপ্রার্থী হয়ে আসছেন, তাঁদের কাছে নিয়মিত উপস্থিত হবার দায়িত্ব তাঁরই। যে কোনভাবে তাঁকে পৌঁছতেই হবে ওঁদের কাছে। এ বাঁশির ডাক যে শুনেছে তার যে ঘরে থাকার যো নেই! তাই সহচরদের কোন ছলছুতাই তাঁকে প্রার্থনাসভায় গরহাজির করতে পারেনি। যে করেই হ'ক ওদের কাছে নিজেকে পৌঁছে দিয়েছেন গান্ধীজী। চেয়ারে বসে লোকের কাঁধে চড়ে তিনি পৌঁছেছেন দর্শনপ্রার্থীদের কাছে। সবাই অভিভূত হয়েছে তাঁকে দেখে। যেন কোন রাজামহারাজা তিনি। দুহাত জোড়া করে 'নমস্তে' বলি করছেন সবাইকে। ওদের প্রেমও আনন্দই ওঁকে নামিয়ে এনেছে ওদের কাছে। আর এই মহাপুরুষকে দর্শন করে ধন্য হচ্ছে সবাই।

সত্যিই এক বিরল দৃশ্য হতো যখন ভিড়ের ভেতর দিয়ে চেয়ারে বসে গান্ধীজী প্রার্থনামঞ্চে এসে পৌঁছতেন। তখন প্রতিটি চোখই অভিভূত হয়ে রাজদর্শন করতো যেন। লাল-কমলা রঙের বোগেনভিলিয়া ফুল থোকা থোকা ফুটে আছে বিড়লাবাড়ির বাগানে। রঙিন সেই ফুলের তরুণ পেরিয়ে গান্ধীজী এসে পৌঁছলেন মঞ্চের সামনে। তারপর লাল বেলেপাথরের ছোট ছোট ধাপ পেরিয়ে তাঁকে তোলা হলো মঞ্চের ওপর। এক হপ্তা আগে এখানে বসেই গান্ধীজী তাঁর আমৃত্যু অনশনের সংকল্পের কথা ঘোষণা করেছিলেন। তা, সেদিনও এই ঘটনার ব্যতিক্রম হলো না। কিন্তু খড়ের গদির ওপর আসীন গান্ধীজীকে দেখে সমাবেশের প্রতিটি চোখই যে অভিভূত হলো তা নয়। ভিড়ের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে থাকা তিন জোড়া ক্ষুধিত চোখের সন্ধানী দৃষ্টি তখন চেরা চোখে লক্ষ্য করছিল তাঁর গতিবিধি, হাবভাব। ওই তিনজোড়া 'খুনে' চোখের মালিক হলো নাথুরাম, গোপাল আর আপ্তে। গান্ধীজীর দর্শনপ্রার্থী হয়ে ওরা এখানে আসে নি। ওরা এসেছে বিড়লাবাড়ির লন ও তার আশপাশ খুটিয়ে দেখতে,

www.pathagar.com

কেমনভাবে এই হত্যাকাণ্ড নির্বিঘ্ন করা যায়।

এই প্রথম গান্ধীজীকে চোখে দেখলো গোপাল। কিন্তু মোটেই অসাধারণ মনে হলো না ওঁকে। একজন সাধারণ বুড়ো' মানুষ। ছোট্ট ভাঙাচোরা চেহারা। মঞ্চের ওপর বসে আছেন পায়ের ওপর পা মুড়ে যেমন বুড়ো মানুষরা বসে থাকে। ইনিই গান্ধীজী? কিন্তু কই, এঁকে দেখে তো একটুও বিদ্বেষভাব জেগে উঠলো না মনে? বলতে কি, পরেও তার সে কথা মনে হয়েছিল। গোপাল স্বীকার করেছিল যে 'সেদিন ওই বুড়ো মানুষটিকে হত্যা করার কোন প্রবৃত্তিই হয় নি আমার।' ভিড়ের মধ্যে বসে থাকার সময় গোপালের সন্ধানী চোখ এড়িয়ে গেল না আর একটা ঘটনা। তার মনে হলো যে সাদা পোশাকের অনেক পুলিস লুকিয়ে বসে আছে ভিড়ের মধ্যে। তাছাড়া শুধু টিকটিকিই নয়, গেটের মুখে যেখানে পুলিস ক্যাম্প বসেছে সেখানে একটা ছোট্ট মেশীনগানও দেখতে পেল সে। তার মনে হলো যে কাজ ফতে করে এখান থেকে নির্বিবাদে বেরিয়ে যাওয়া খুব সহজ হবে না।

মিনিট পঁয়তাল্লিশ পরে সকলের নজর এড়িয়ে মেরীনা হোটেলের চল্লিশ নম্বর ঘরে একজন একজন করে ঢুকে পড়লো ওরা। কনট্ সার্কাসের এই হোটেলেই নাম ভাঁড়িয়ে উঠেছে নাথুরাম ও আপ্তে। হোটেলের খাতায় ওদের নাম যথাক্রমে এস দেশপাণ্ডে ও এম দেশপাণ্ডে। নিজের ও আপ্তের জন্য দুপাত্র হুইস্কির অর্ডার দিল বিষ্ণু কারকারে।

হাতে হুইস্কির গেলাস নিয়ে আপ্তে বললো যে এবার সিদ্ধান্ত নেবার সময় হয়েছে। আপ্তে আরও বললো যে সব দেখে শুনে তার মনে হয়েছে যে অন্তত একবার গান্ধীজীকে চোখের সামনে তারা দেখতে পাবে। অন্তত একবার তাঁকে পুরোপুরি দেখা যাবেই এবং তখনই ওঁকে আক্রমণ করবে তারা। সেটা কখন? আপ্তে বুঝিয়ে দিল তার ছক। পরদিন ২০শে জানুয়ারি মঙ্গলবার। বিকাল ঠিক পাঁচটায় গান্ধীজী আসবেন তাঁর প্রার্থনাসভায়। ভক্তদের সঙ্গে তাঁর প্রতিশ্রুত সাক্ষাতের সেটাই বিশ্বস্ত সময়। গান্ধীজীকে হত্যা করা হবে ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই।

পরদিন সকাল ঠিক ন'টার সময় একটা ট্যাক্সি গড়াতে গড়াতে এসে থামলো বিড়লাবাড়ির পিছনের সাদা রঙ করা গেটের সামনে। পিছনের এই কাঠের খিড়কি দোর দিয়েই কাজের লোকেরা যাতায়াত করে। এদিকটা প্রায় জনমানব-শূন্য। শুনশান এই পরিবেশে নেমে প্রায় বিনা বাধাতেই ওরা দুজন গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। একটু হাঁটলেই এক ফালি সিমেন্ট বাঁধানো উঠন। উঠনের একপাশে একতলা পাকা গাঁথনির কতকগুলো খুপরি ঘর। এগুলো চাকরবাকর শ্রেণীর কাজের লোকেদের থাকবার ঘর। এর ঠিক পেছনেই লালপাথরের মণ্ডপের দেওয়াল। এই মণ্ডপের সামনে বসেই গান্ধীজী তাঁর সান্ধ্য প্রার্থনাসভা করেন।

লোকদুটি সারা বাগানটা চক্কর দিল কয়েকবার। কেউ কোথাও নেই। শীতের সকালের নরম সূর্যালোক নিঃশব্দে গায়ে মেখে নিচ্ছে বাগানের গাছগাছালি, ঘাস, ফুল। সবুজ ঘাসের মাঠের ওপর তখনও চকচক করছে শিশিরবিন্দু। সারা মাঠটায় ছড়িয়ে আছে শিশিরের পাতলা চাদর। বাগানের চতুঃসীমায় লাল গোলাপের বেড়। ফুলের গায়েও টলটল করছে শিশিরফোঁটা।

www.pathagar.com

চারপাশ ভাল করে দেখার পর নারায়ণ আপ্তে এবং সাধুবেশধারী দিগম্বর বাড়্গে মনে মনে আশ্বস্ত হলো। তাদের দুজনেরই মনে হলো যে গুরু দায়িটি সম্পন্ন করতে বিশেষ বাধা আসবে না। এখন ঠিক কি ভাবে এই দুষ্কর্মটি সম্পন্ন করা যায় সেটাই স্থির করতে হবে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা দৃশ্য নজরে পড়ে গেল আপ্তের। লালপাথরের যে মণ্ডপের সামনে বসে গান্ধীজী তাঁর প্রার্থনাসভা করেন তার ঠিক পিছনেই পরিচারকদের খুপরি ঘরগুলি রয়েছে। প্রত্যেক খুপরিঘরের মাথায় সিলিংয়ের কাছে গ্রিলের জালমোড়া ফোকর। এগুলো দিয়েই ঘরের মধ্যে আলোবাতাস আসে। এইসব জানলা দিয়ে প্রার্থনাসভার মাঠটা পুরোপুরি দেখা যায়। কিন্তু আপ্তে সবচেয়ে অবাক হলো যখন দেখলো যে একটা ঘরের গ্রিল জানলার প্রায় সামনেই গান্ধীজীর প্রার্থনামঞ্চ অবস্থিত এবং এখানেই গান্ধীজীর ব্যবহারের মাইক্রোফোনটি দাঁড় করানো হয়।

আপ্তে খুব দ্রুত দূরত্বটা মনে মনে মেপে নিল। গ্রিলজানলা থেকে মাইক্রোফোনটার দূরত্ব কিছুতেই দশ ফুটের বেশি হতে পারে না। এই পয়েন্ট থেকে গুলি করা কাজটা এতই তুচ্ছ যে বাড়্গের দিশি পিস্তলেও তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না।

এই তথ্যটুকু জানতেই বিড়লাবাড়িতে তদন্ত করতে এসেছে আপ্তে। এখন তার একটাই কাজ। যে কোন উপায়ে ওই খুপরি ঘরটার মধ্যে বাড়্গেকে চালান করে দেওয়া। তাছাড়া এক চোটেই যাতে কাজটা শেষ করা যায় তাই গোপালকেও সে ওর সংগে পাঠিয়ে দেবে। গোপাল সংগে নেবে তার হাত গ্রেনেড। আড়াআড়ি বসানো গ্রিলজানলার ফুটো দিয়ে সে তার হাতের গ্রেনেডটা তখনই ছুঁড়ে দেবে যখন দিগম্বর বাড়্গের হাতের পিস্তল থেকে গুলি ছোড়া হবে। আপ্তে মাপ নিয়ে দেখলো যে গ্রিলজানালার ছিদ্রটা আড়েবহরে পাঁচ ইঞ্চি হওয়ায় হ্যান্ড গ্রেনেডটা অনায়াসেই ওই ছিদ্রপথ দিয়ে গড়িয়ে দেওয়া যাবে।

আর একটা কাজ বাকী রইল। ট্যাক্সিতে ওঠার আগে সেটাও করে ফেললো আপ্তে। খিড়কি দোরের দিকে যাবার সময় খুপরি ঘরগুলো দেখে সে হিসাব করে ফেললো যে গান্ধীজীর বক্তৃতামঞ্চের ঠিক পিছনের ঘরখানা বাঁদিক থেকে তিন নম্বর ঘর। অর্থাৎ এই ঘরখানাই অধিকার করতে হবে তাদের। বাইরে ট্যাক্সি দাঁড়িয়েই ছিল। খুশী মনে দিগম্বর বাড়্গেকে সংগে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলো সে। আপ্তে আজ মনে মনে ভারী উৎফুল্ল। বাড়্গেকে আশ্বাস দিয়ে বললো যে আর মাত্র ঘণ্টা সাত-আটের মধ্যেই গান্ধী নামক মানুষটির থেঁতলে যাওয়া শরীরটা শব হয়ে থাকবে ওই প্রার্থনামঞ্চের ওপর।

মেরীনা হোটেলের চল্লিশ নম্বর ঘরের গোসলখানার মেঝের ওপর থেবড়ে বসে আছে দিগম্বর বাড়্গে। নিপুণ হাতে হ্যান্ড গ্রেনেডের মধ্যে সে তখন বিস্ফোরক ঠাসছিল। পাঁচ জোড়া চোখ উদ্গ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে তার আঙুলগুলোর দিকে। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই গ্রেনেডগুলো তারা কাজে লাগাবে।

বাথরুমের দরজার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নাথুরাম। দেখেই মনে হয় খুব সুস্থ সে নয়। কেমন যেন অস্থির ভাব তার শরীরে ফুটে উঠেছে। মুখখানা ছাইয়ের মতন সাদা। হঠাৎ চাপা কঠিন হিস্হিস স্বরে সে বলে উঠলো, 'এটাই শেষ সুযোগ আমাদের। দেখো যেন ওগুলো ঠিকমতন কাজ করে।'

বিস্ফোরক ঠাসার কাজটা শেষ করে একটা ছুরি দিয়ে খানিকটা ফিউজ তার

www.pathagar.com

কেটে নিল বাড়্গে। তারপর ফিউজের একটা দিকে আগুন ধরিয়ে আপ্তেকে ঘাড় ধরে সময় দেখতে বললো। দাহ্য তারটা তখন ধিকিধিকি পুড়ছে। কালো কটু ধোঁয়ায় ভরে গেছে ছোট্ট স্নানের ঘরটা। ধীরে ধীরে দাহ্যবস্তুর কটুধোঁয়া ছড়িয়ে পড়লো শোবার ঘরেও। সবাই তখন তাড়াতাড়ি সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো যাতে কটু গন্ধটা চাপা দেওয়া যায়।

খানিক পরে ধোঁয়া কেটে গেলে সবাইকে বেডরুমে ডেকে আনলো আপ্তে। এবার সবাইকে কাজটা বুঝিয়ে দেবে সে। তবে যে মানুষটার জেদের জন্য তারা সবাই এখানে জড়ো হয়েছে সে এই আলোচনায় যোগ দিতে পারলো না। মানুষটা তখন বিছানায় শুয়ে মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করছে। নাথুরামের এই আধকপালে যন্ত্রণার কথা আমরা জানি। এই যন্ত্রণা যখন শুরু হয় তখন অন্য মানুষ হয়ে যায় নাথুরাম। আজও তাই সুস্থ মনে এই ষড়যন্ত্রের আলোচনায় যোগ দিতে পারলো না সে। আপ্তে প্রথমেই মদনলালকে দায়িত্বভার বুঝিয়ে দিল। বিড়লা-বাড়ির পিছন দিকের দেওয়ালের গায়ে মদনলাল তার টাইম বোমা লুকিয়ে রাখবে। জায়গাটা যেন প্রার্থনাসভার কাছাকাছি হয় যাতে বিস্ফোরণের শব্দ শুনেই লোকেরা আতংকগ্রস্ত হয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দেয়। এইরকম বিশৃংখলা হলেই হত্যা ষড়যন্ত্র সফল করা অনেক 'আসান' হয়ে যাবে তাদের পক্ষে।

ইতিমধ্যে তিন নম্বর খুপরি ঘরের মধ্যে আত্মগোপন করবে দিগম্বর বাড়্গে ও গোপাল। যদি কেউ তাদের পথ আটকায়, তাহলে পিছন থেকে ভাষণরত গান্ধীজীর ছবি তোলার অজুহাত দেবে ওরা। খুপরি ঘরে ঢুকে ওরা দরজা বন্ধ করে দেবে। তারপর অপেক্ষা করবে মদনলালের টাইম বোমার বিস্ফোরণ পর্যন্ত। বিস্ফোরণের শব্দ শোনার সংগে সংগেই গান্ধীজীর মাথা তাক্ করে গুলি ছুঁড়বে বাড়্গে এবং তখনই গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠদের দিকে হাত বোমাটা গ্রিলের জানলা দিয়ে গলিয়ে দেবে গোপাল।

তবে সাবধানের মার নেই। গুলি যদি না ছোটে, যদি গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তারও বিকল্প ব্যবস্থা করেছে আপ্তে। ভিড়ের মধ্যে হাতে গ্রেনেড নিয়ে গান্ধীজীর কাছাকাছি বসে থাকবে বিষ্ণু কারকারে। মদনলালের টাইম বোমার বিস্ফোরণের সংগে সংগে কারকারেও তার হাতের বোমাটা গান্ধীজীকে লক্ষ্য করে ছুঁড়বে। এই ষড়যন্ত্রের সমস্ত ব্যবস্থাপনায় থাকবে আপ্তে ও নাথুরাম। কারকারে যখনই গান্ধীজীর সামনাসামনি পৌঁছে যাবে, তখনই আপ্তেকে সংকেত করবে নাথুরাম। সেই সংকেত আপ্তে জানাবে মদনলালকে এবং ঠিক তখনই মদনলাল তার বোমা ফাটাবে।

ষড়যন্ত্রীদের সেই গোপন সভায় আপ্তে স্বীকার করলো যে পৃথিবী থেকে গান্ধী নামক মানুষটিকে সরিয়ে দিতে কিছু নিরীহ মানুষকেও মরতে হবে। কিন্তু তারা নিরুপায়। এই দামটুকু দিতেই হবে দেশকে। যার জন্য পাঞ্জাবের হাজার হাজার হিন্দু নিহত হয়েছে তাকে হত্যা করার দাম শোধ হবে এইভাবে।

অবশেষে কূট-কচালে আলোচনা শেষ হলো। তখন থমথম করা নিস্তব্ধতা চেপে বসেছে লোকগুলোর মনে। সবাই যেন আসন্ন দুর্যোগের ভাবনায় ক্লিষ্ট। ওপাশে বিছানায় পড়ে গোঙাচ্ছে নাথুরাম। দুঃসহ মাইগ্রেনের যন্ত্রণায় ছটফট করছে মানুষটা। বেশ কিছুক্ষণ ওরা চুপ করে বসে রইল। তারপর মন থেকে সবকিছু ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালো। আপ্তে নির্দেশ দিয়েছে যে সবাইকে আলাদা

www.pathagar.com

পোশাক পরতে হবে যাতে ওদের একদলভক্ত মনে না করে কেউ। আপ্তে নিজেও তার ফ্যাশনের পোশাক ছেড়ে খাটো ধুতি পরলো। বিষ্ণু কারকারে লাল তিলক কাটলো কপালে। তারপর ভুরুর রঙ কালো করলো। মদনলাল পরলো বম্বে থেকে কেনা নীল রঙের স্যুট। পাঞ্জাবের এই হিন্দু রিফিউজি ছেলেটি জীবনে প্রথমবার সাহেব সেজে জ্যোতিষীর কথা সফল করতে অভিযানে চলেছে আজ।

মেরীনা হোটেলের চল্লিশ নম্বর ঘরের পরিবেশ তখন সত্যিই দুঃসহ হয়ে উঠেছে। টানটান হয়ে আছে চাপা উত্তেজনা। সবাই নিঃশব্দ। কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছে না। একটা করে মিনিট কাটছে আর ওদের উত্তেজনাও বেড়ে যাচ্ছে। নাথুরাম এখন খানিকটা প্রকৃতিস্থ। সেই-ই প্রথম চেষ্টা করলো এই থমথমে ভাবটা কাটাবার। এই উৎসর্গ-অনুষ্ঠানটা স্মরণীয় করে রাখতে নাথুরাম সকলের জন্য কফি আনতে বললো বেয়ারাকে। নিঃশব্দে কফি পান শেষ করলো সবাই। ধীরে ধীরে সময় এগিয়ে চলেছে চরম মুহূর্তটির দিকে। এবার সময় হয়েছে যাত্রা করার। সবার আগে বেরিয়ে গেল মদনলাল, কারকারে ও নাথুরাম। পাঁচ মিনিট পরে পরে হোটেল থেকে বেরোল ওরা। তারপর আলাদা টাংগায় চড়ে বিড়লাবাড়ির দিকে যাত্রা করলো। দশ মিনিট পরে বেরোল আপ্তে। তার পিছু পিছু বেরোল অন্যরা। স্থির হলো যে ট্যাক্সি চড়ে ওদের পিছনে যাবে ওরা। কিন্তু তখনই ট্যাক্সিতে চড়া হলো না ওদের। বিড়লাবাড়ি পর্যন্ত যাওয়া আসার ভাড়া নিয়ে দরকষাকষি শুরু করলো আপ্তে। অবশেষে এ ট্যাক্সি ও ট্যাক্সির মধ্যে টানাপোড়েন শেষ করে ওরা যখন গাড়িতে উঠলো তখন চারটা বেজে পনেরো মিনিট হয়েছে। শেষপর্যন্ত রীগ্যাল সিনেমার সামনে থেকে একটা সবুজ রঙের শেভ্রলেট ট্যাক্সি চার টাকা কম ভাড়ায় রফা হলো। অনেক বাদানুবাদের পর ষোল টাকা ভাড়ার বদলে বারো টাকায় রাজী হলো পি.বি.এফ. ৬৭১ নম্বরের ট্যাক্সিওয়ালা।

এবার বিড়লাবাড়ির দিকে নজর দেওয়া যাক। গান্ধীজী তখনও এত দুর্বল যে প্রার্থনামঞ্চ পর্যন্ত হেঁটে যাবার ক্ষমতা তাঁর নেই। তাই চেয়ারে বসিয়ে তাঁকে মঞ্চ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হলো। ভিড়ের মধ্য দিয়ে যাবার সময় যুক্তকরে সবাইকে নমস্কার করে চলেছেন গান্ধীজী। ছোট্ট শরীরটা নত করে নমস্কার করার সময় মদনলালের কাছেও পৌঁছে গেলেন তিনি। মদনলালের মনে হলো যাঁকে সে হত্যা করার সংকল্প নিয়ে এখানে এসেছে, তিনি তার সামনেই উপস্থিত তবুও হাতজোড় করে গান্ধীজীকে সে শ্রদ্ধা নমস্কার জানালো। ঠিক পিছনের দেওয়ালের গোড়াতেই ঘাস পাতার মধ্যে সে তার টাইম বোমাটি লুকিয়ে রেখেছে। গান্ধীজী যখন তার সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছেন তখন তাঁর দিকে চোখ তুলে সে তাকালো। এই প্রথমবার সে গান্ধীজীকে দেখলো। তার মনে হলো এই মানুষটি তার পরম শত্রু। আসলে গান্ধীজীর ওই ছোট্ট চেহারাটা নয়, তার মনের আরশিতে তখন ভেসে উঠেছে ফিরোজপুর হাসপাতালের বেড-এ শুয়ে থাকা তার মুমূর্ষু বাবার মুখখানা। ততক্ষণে মঞ্চের কাছে প্রায় পৌঁছে গেছেন গান্ধীজী। কিন্তু প্রার্থনামঞ্চে উঠে বসার আগেই ভিড়ের ভেতর থেকে একজন ছুটে এসে তাঁর সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। তারপর গান্ধীজীর পায়ের কাছে মাথা রেখে অভিভূত স্বরে বললো, 'বাপু, আপনি বলুন, আপনি ভগবান।' গান্ধীজী হতভম্ব।

www.pathagar.com

লোকটাকে তিনি চেনেন না। কিন্তু এ কি আবদার তার? তিনি কখনও অবতার হতে চান নি। নিজেকে তেমন ভাবতেও ঘৃণা হয় তাঁর। কিন্তু লোকটা আজ এ কি অনুরোধ নিয়ে এসেছে? গান্ধীজী তখন পরম স্নেহভরে লোকটাকে তুলে ধরলেন। তারপর তার মুখের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বললেন, 'শান্ত হও ভাই। কেন আমায় ভগবান ভাবছো তোমরা? আমি ভগবান নই। আমি তোমাদেরই মতন রক্তমাংসের মানুষ।'

ইতিমধ্যে আপ্তেকে নিয়ে সবুজ রঙের ট্যাক্সিটা বিড়লাবাড়ির খিড়কি দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তখন। ট্যাক্সিওলার সঙ্গে সওদা করতে গিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ অকুস্থলে পৌঁছতে দেরি করে ফেলেছে আপ্তে। কে বলতে পারে মাত্র চার টাকার জন্য এক মহার্ঘ মুহূর্ত সে তাচ্ছিল্য করলো না। যা হক, ট্যাক্সি থেকে নামতেই বিষ্ণু কারকারের কাছে সে সমস্ত খবর পেল। টাইম বোমাটি যথাস্থানে লুকিয়ে রেখেছে মদনলাল এবং পরিকল্পনা মতই অন্য কাজগুলি সম্পূর্ণ হয়েছে। কারকারে তাকে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর দিল। তিন নম্বর কুঠুরি ঘরের মালিকের হাতে দশটা টাকা দিয়ে ঘরে ঢোকার সমস্যা মিটিয়ে ফেলা হয়েছে। এখন বিনা বাধায় ওই ঘরে ঢুকে গুলি ছোড়ার কাজটি সমাধা করতে পারবে বাড়্‌গে ও গোপাল। লোকটাকে দূর থেকে চিনিয়েও দিল বিষ্ণু কারকারে। তারপর আপ্তের কাছে বিদায় নিয়ে ভিড়ের মধ্যে তার নির্দিষ্ট জায়গায় ফিরে গেল বিষ্ণু কারকারে।

কারকারে চলে যাবার পর দিগম্বর বাড়্‌গেকে ডেকে পাঠালো আপ্তে। তারপর রোদে পিঠ দিয়ে বসে থাকা লোকটাকে দেখিয়ে বাড়্‌গেকে তার ঘরের মধ্যে যেতে বললো সে। কয়েক পা দূরেই বসে বসে রোদ পোহাচ্ছিল লোকটা। ওই লোকটাই তিন নম্বর ঘরের মালিক এবং ওরই হাতে দশটা টাকা গুঁজে দিয়ে গেছে কারকারে। কিন্তু আপ্তের নির্দেশ পেয়ে কয়েক পা যাবার আগেই পাথরের মতন দাঁড়িয়ে গেল দিগম্বর। লোকটার মুখের দিকে চেয়েই মনে মনে কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে সে। আর এক পা-ও এগোবে না। ভয়, ঘৃণা আতংক কিছুই তাকে সামনের দিকে নড়াতে পারবে না। তার মনে হলো সময়ের আবরণ সরিয়ে বহু যুগের ওপার থেকে ভেসে আসা নিষেধের কণ্ঠ শুনতে পেল সে। কেউ যেন তার কানে কানে বলে গেল, 'না। আর এগিও না।' এই ভারতবর্ষকে বাড়্‌গে চেনে। নিষেধ, বর্জন, ট্যাবু আর কুসংস্কারের এই ভারত ত্রিকালজ্ঞ মুনিঋষির ভারতের মতনই প্রাচীন। সুতরাং এই প্রাচীন নিষেধবাণী শোনার পর ওই ঘরের চৌকাঠ পেরনো তার পক্ষে সম্ভব নয়। দিগম্বর স্পষ্ট দেখেছে যে ওই রোদ পোয়ানো লোকটার একটা চোখ কানা। এর চেয়ে অলক্ষণ আর কী হতে পারে? সুতরাং আপ্তের দিকে ঘুরে তাকালো বাড়্‌গে। তখন তার সারা শরীর অমঙ্গলের আশংকায় ঠকঠক করে কাঁপছে। তারপর আপ্তের চোখের দিকে চেয়ে চাপা স্বরে বললো, 'লোকটার এক চোখ কানা। ওর ঘরে আমি কিছুতেই ঢুকবো না।'

বাড়্‌গের কথা শুনে মনে মনে প্রমাদ গনলো আপ্তে। এখন কি করবে সে? প্রার্থনাসভা শুরু হয়ে গেছে। রামধুনও এখনই শেষ হয়ে গেল। গান্ধীজী এবার শুরু করেছেন তাঁর ভাষণ। তবে এত দুর্বল তিনি যে মনে হয় না বেশিক্ষণ কথা বলতে পারবেন। এখনই তাঁর প্রায় অস্ফুট কথাগুলো শোনাবার জন্য রীপিট করতে হচ্ছে ডাক্তার সুশীলাকে। চিন্তিত আপ্তের মনে হলো যে বাড়্‌গের সঙ্গে তর্কাতর্কি করার সময় নেই। যা করার এখনই করতে হবে। যে কোন মুহূর্তে

www.pathagar.com

বক্তৃতা থামিয়ে গান্ধীজী ফিরে যেতে পারেন। আপ্তে মনে মনে আক্রমণের ছকটা বদলে নিয়েছে ততক্ষণে। খুপরি ঘরের মধ্যে সে গোপালকে পাঠালো। তাকে বলে দিল যে টাইম বোমা বিস্ফোরণের সংগে সংগে সে যেন গ্রিল্‌জানলার ফাঁক দিয়ে গ্রেনেডটা ছুঁড়ে দেয় জনতার মধ্যে। অনিচ্ছুক বাড়্‌গেকেও রেহাই দিল না আপ্তে। তাকে নতুন কাজের ভার দিল। তাকে বলে দেওয়া হলো যেন ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গান্ধীজীর একেবারে কোল ঘেঁষে দাঁড়ায়। বোমা ফাটার সংগে-সংগে সে যেন গান্ধীজীর মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে।

আপ্তের আদেশ শুনলো গোপাল। তারপর সোজা ঢুকে গেল তিন নম্বর খুপরি ঘরের মধ্যে। যাবার সময় রোদে বসে থাকা একচোখো লোকটার দিকে চেয়ে একটু মাথা নাড়লো। ঘরে ঢুকেই একমাত্র দরজাটা বন্ধ করে দিল গোপাল। ঘরের ভেতরে তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। শুধু সিলিংয়ের কাছে গ্রিলজানলার ফাঁক দিয়ে সামান্য আলো আসছে। ওই ছোট্ট ফাঁকটা দিয়েই তাকে গ্রেনেড ছুঁড়তে হবে।

প্রার্থনাসভা থেকে গান্ধীজীর ভাষণ ভেসে আসছে ঘরের মধ্যে। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে ওঁর কথা। গোপাল শুনতে পেল গান্ধীজীর কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করছে সুশীলা। 'যে মুসলমানের শত্রু সে দেশেরও শত্রু।' গোপাল ততক্ষণে গ্রিল-জানলার ঠিক নীচে পেঁাছে গেছে। গান্ধীজীর কথাটা যেন গলানো সীসের মতন তার কানে ঢুকলো। কিন্তু ওই গ্রিলজানলা পর্যন্ত পেঁাছবে কি করে সে? মেঝে থেকে অন্তত আট ফুট উঁচু এই গ্রিলজানলা। সকালবেলা আপ্তে যখন জায়গাটা পর্যবেক্ষণ করতে এসেছিল, তখন এই খুপরি ঘরের মধ্যে সে ঢুকে দেখে নি। যদি ঢুকে দেখতো তাহলে এমন ভয়ংকর খুঁতটা তার নজরে পড়ে যেত। মাপজোখ করার সময় সে ধারণা করতে পারে নি যে প্রার্থনাসভার মাঠের উচ্চতা অনেক বেশি। যে উঠনের ওপর চাকরবাকরদের এই খুপরিঘরগুলো রয়েছে তার লেভেলের চেয়ে মাঠের লেভেল অনেক উঁচু। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটা যদি ওদের নজর এড়িয়ে না যেত, তাহলে এই অঘটন ঘটতো না। এখন গোপালের পক্ষে ডিঙি মেরেও ওই জানলার ধাপ পর্যন্ত পেঁাছনো সম্ভব নয়। হয়ত দুহাত উঁচু করে জায়গাটা সে ছুঁতে পারবে, কিন্তু গর্তের মধ্য দিয়ে বোমা ছুঁড়তে পারবে না। অমন জবর শীতেও গোপালের গায়ে কালঘাম ছুটলো যেন। তখন অন্ধকারে পাগলের মতন সে হাতড়াতে লেগেছে একটা কিছুর জন্য। হঠাৎ তার হাতে ঠেকলো একটা খাটিয়া। নিশ্চয়ই ওই একচোখো লোকটার চারপাই। তাড়াতাড়ি দুহাতে ধরে চারপাইটা জানলার নীচে টেনে আনলো গোপাল। হ্যাঁ, এবার সে যা হয় একটা উপকরণ পেয়েছে যার ওপর দাঁড়িয়ে সে গ্রিলজানলার গর্তটা পর্যন্ত পেঁাছতে পারবে।

বাইরের সব বন্দোবস্ত তখন পাকা। নাথুরাম খোঁজ করে দেখলো যে ভিড়ের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানটিতেই লুকিয়ে বসে আছে কারকারে। সংকেত পেলেই সে তার হাতবোমা ছুঁড়বে। গান্ধীজী তখন মার্কিন দেশে অশ্বেতকায়দের ওপর শ্বেতকায়দের সন্ত্রাসের কথা বলছিলেন। নাথুরামের মনে হলো যে গান্ধীজীর ওপর আক্রমণ হানার এখনই উপযুক্ত সময়। সুতরাং পরিকল্পনা মতন সে তার চিবুকে হাত দিয়ে আঁচড়াল। এই সংকেতটা দেখেই হাত তুললো আপ্তে। মানসিকভাবে তৈরি হয়েই ছিল মদনলাল। বলতে গেলে, এতদিন ধরে এই পরম

www.pathagar.com

মুহূর্তটির জন্যেই বসে ছিল পাঞ্জাবি হিন্দু ছেলেটি। যেদিন পাঞ্জাব সীমান্তের সুলেমাঙ্কিহেড সেতু পেরিয়ে সে এপাশে এসে পৌঁছেছে, সেদিন থেকেই দিন গুনছে সে। এতদিনে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ সে পেল। সুতরাং এই সুযোগটা কিছুতেই হারাবে না সে। ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল মদনলাল। তারপর হেঁট হয়ে পায়ের কাছে রাখা টাইম বোমার ফিউজের জ্বলজ্বলে বোতামটা টিপে দিল।

সুশীলা তখন ভক্ত অনুরাগীদের কাছে গান্ধীজীর কথাগুলোই আবার উচ্চারণ করছিলেন। 'ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে যদি আমাদের চমৎকার সিন্ধান্তগুলো ধরে রাখতে পারি, তাহলেই আমাদের নৈতিক মান অনেক উঁচু হয়ে যাবে।'

নৈতিক মানোন্নয়নের এতবড় সুপারিশের কথাটা বলা শেষ না হতেই, টাইম বোমার বিস্ফোরণ হলো। সঙ্গে সঙ্গে সারা প্রার্থনাসভায় ভীতি ছড়িয়ে পড়লো। মোটা থামের মতন কালো ধোঁয়ার কুন্ডলী তখন বিস্ফোরণের জায়গা থেকে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। সুশীলার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল ধোঁয়ার কটু গন্ধে। 'মাগো!' বলে প্রায় কেঁদে ফেললেন সুশীলা। সুশীলার হতাশ ভাব দেখে ক্ষীণ স্বরে গান্ধীজী তাকে ভর্ৎসনা করে উঠলেন, 'ভগবানের নাম করতে করতে মরতে পারার মতন এমন সুখের মরা আর কী আছে?'

ওদিকে তিন নম্বর কুঠুরির মধ্যে গোপাল তখন রুদ্ধশ্বাসে গ্রিলজানলার নাগাল পাবার কসরত করে চলেছে। কিন্তু খাটিয়ার দড়িগুলোর যা অবস্থা তাতে মাত্র ইঞ্চি তিনেক উঁচু হতে পারলো তার ওপর দাঁড়িয়ে। খাটিয়ার দড়ি আলগা হয়ে প্রায় মেঝে পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। গোপালের তখন কান্না পাবার অবস্থা। একটা করে মুহূর্ত কাটছে আর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে সে। সে বুঝতে পারছিল যে চতুর্দিক থেকে সর্বনাশ ধেয়ে আসছে তার দিকে। শেষ পর্যন্ত বুদ্ধি স্থির রেখে খাটিয়ার চারপাশের কাঠের ফ্রেমের ওপর উঠে দাঁড়ালো গোপাল। হ্যাঁ, এবার সে অনেকটা উঁচু হতে পারলো। তবুও গ্রিলজানলার ধাপ পর্যন্ত তার চোখদুটি নিয়ে যেতে পারলো না। আরও খানিক উঁচু না হলে বোমাটা ঠিক জায়গায় তাক করতে পারবে না সে। এখন সে শুধু জানলার গর্তের ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে বোমাটা আন্দাজে গড়িয়ে দিতে পারবে। কিন্তু কোথায় বা কার ঘাড়ের ওপর সেটা পড়বে গোপাল তা জানে না। যাই হ'ক, হাতের কাছে বোমাটি তৈরি রাখলো সে। কিন্তু আশ্চর্য হলো আর কোন বিস্ফোরণের আওয়াজ না পাওয়ায়। গুলি বা বোমা কোন আওয়াজই সে শুনতে পেল না। সে শুধু শুনতে পেল গান্ধীজীর ক্ষীণদুর্বল কন্ঠস্বর। সবাইকে শান্ত হতে বলছেন তিনি। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে গান্ধীজী তখন চিৎকার করছেন, 'শুনুন। আপনারা শুনুন। এটা বোমার আওয়াজ নয়। সিপাইরা টার্গেট প্র্যাকটিশ করছে। আপনারা চুপ করে বসুন। আমাদের প্রার্থনাসভা এখনই শুরু হবে।'

কিন্তু কে শোনে তাঁর কথা। সারা বাগানটা জুড়ে তখন তুমুল হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়লো। সবাই শশব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে। বিস্ফোরণে কেউ আহত না হলেও সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে তখন। ষড়যন্ত্রীরা ঠিক এইরকম বিশৃঙ্খল অবস্থাই চাইছিল। বস্তুত, বোমা ফাটানোর উদ্দেশ্যই হলো হত্যার চক্রান্ত আড়াল করা। এদিকে তখন লোকের ধাক্কায় গান্ধীজীর প্রায় মুখোমুখি এসে পড়লো বিষ্ণু কারকারে। অবাক হয়ে দেখলো যে তার ও গান্ধীজীর মধ্যে

www.pathagar.com

দূরত্ব মাত্র পনেরো ফুটের মতন। দুর্বল মানুষটি তখন তার দৃষ্টির সম্পূর্ণ গোচরে এসে গেছেন অসহায়, অরক্ষিত হয়ে। যেন হুইলচেয়ারে বসে থাকা এক-জন খোঁড়া মানুষ তিনি।

কার্কারে তখন গ্রেনেডগুলো বার করে ফেলেছে। হঠাৎ তার নজর গেল গান্ধীজীর মাথার ঠিক পিছনের ওই গ্রিলজানলাটার দিকে। ওখানে ত কোন সংকেত নেই! না উঁকি দিচ্ছে পিস্তলের চকচকে নল, না কোন গ্রেনেডের কালো চেহারা। কার্কারের শরীর তখন প্রায় হিম হয়ে গেছে। সে স্থির হয়ে চেয়ে রইল ওই ফোকরটার দিকে।

ছোট্ট ঘরের মধ্যে গোপালের অবস্থা তখন কলে পড়া ইঁদুরের মতন। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে বার কয়েক চেষ্টা করলো সে। কিন্তু কিছুতেই জানলার লেভেল পর্যন্ত উঁচু হতে পারলো না। তখন মনস্থির করে খাটিয়া থেকে নেমে পড়লো সে। না, কিছুতেই অন্য কারও মাথায় বোমা ফেলবে না সে। কাকে হত্যা করছে না জেনে এমন নির্বিচারে বোমা ফেলা অন্যায়। সুতরাং খাটিয়া থেকে নেমে সে অন্ধকারের মধ্যে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু কিছুতেই কপাটের হুড়কো খুঁজে পেল না। হঠাৎ একটা ভয় আচ্ছন্ন করলো তাকে। তার মনে হলো, ওই একচোখো লোকটার ফাঁদে আটকে পড়েছে সে। তখন পাগলের মতন অবস্থা তার। কোথায় হুড়কো, কেমনভাবে খুলতে হয় কিছুই তার মনে পড়ছে না। ক্রমে ক্রমে যেন নিস্তেজ হয়ে পড়তে লাগলো গোপাল।

বাগানের মধ্যে কার্কারের অবস্থাও তদ্রূপ। হাতের মধ্যে গ্রেনেডটা জড়িয়ে ধরে সে ঠায় তাকিয়ে রইল গ্রিলজানলার দিকে কখন পিস্তলের নল দেখতে পাবে এই আশায়। কিন্তু একটা করে মুহূর্ত যাচ্ছে আর ডেকান গেস্ট হাউসের দুঁদে মালিক বিষ্ণু কার্কারের সাহস ফুরিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে দশ গজের মধ্যে বাড়্গেকে দেখতে পেল সে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে সে। বিষ্ণু কারকারের মনে হলো লোকটা অমন চুপচাপ কেন? একটা কিছু করছে না কেন ও? বাড়্গে কিন্তু কিছু করার জন্য ভিড়ের মধ্যে আসে নি। সে ভাবছিল কত তাড়াতাড়ি এখান থেকে চম্পট দেওয়া যায়। এই বয়সের মধ্যেই সাঁইত্রিশবার শ্রীঘরবাস করা হয়ে গেছে তার। শ্রীঘরবাসের মজা সে বেশ জানে। সুতরাং নতুন করে ফের ওই রাস্তায় পা বাড়াবে না সে। তাছাড়া সে একজন কারবারী মানুষ। অস্ত্র কেনাবেচাই তার পেশা। সে যেমন আদর্শবাদী বিপ্লবী নয়, তেমনি কোনরকম রাজনৈতিক গোঁড়ামিও তার নেই। সুতরাং এতরকম জটিলতার মধ্যে সে নিজেকে জড়াতে চাইল না। কার্কারেকে সেও দেখেছে। তাই তার চোখ এড়িয়ে টুপ্ করে ভিড়ের মধ্যে ডুবে গেল দিগম্বর বাড়্গে।

এদিকে অনেক ধস্তাধস্তির পর হুড়কো খুলে বাইরে আসতে পারলো গোপাল। আঃ! সূর্যের আলোয় আলোয় যেন মুক্তিস্নান হলো গোপালের। হঠাৎ সে মদনলালকে দেখতে পেল। একজন সেনা অফিসার তাকে হিড়হিড় করে টেনে আনছে। মদনলাল যখন ফিউজ তারে আগুন লাগিয়ে সরে গেল, তখন ইটের দেওয়ালের পিছনে বসে বছর তিনেক বয়সের শিশু সন্তানের সংগে খেলা করছিল তার মা। সেই মেয়েটিই চিনিয়ে দিয়েছে মদনলালকে।

মদনলালকে ওই অবস্থায় দেখেই হতভম্ব হয়ে গেল গোপাল। মাটির ওপর দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে মদনলালকে। অসহায় গোপাল ভিড়ের মধ্যে

www.pathagar.com

চেনা মুখ খুঁজতে লাগলো। হঠাৎ সে আপ্তেকে দেখতে পেল। দেখতে পেল তার বড় ভাই নাথুরামকে— ওই তিন ব্রাহ্মণসন্তানের চোখে চোখে কি কথা হলো কে জানে। তারপরই দেখা গেল ওই তিনমূর্তি ভিড়ের ভিতর থেকে সরে এসে অপেক্ষারত সবুজ রঙের ট্যাক্সির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের চোখেমুখে কেমন যেন ভ্যাবাচাকা ভাব। তবে এতক্ষণে ওরা সঠিক বুঝতে পেরেছে যে সমস্ত চক্রান্তটাই বানচান হয়ে গেছে। ওরা পুরোপুরি ব্যর্থ। ট্যাক্সির কাছে দাঁড়িয়ে ওরা এক মুহূর্ত ভাবলো। তারপর যঃ পলায়তে স জীবতি শাস্ত্রবাক্য মেনে ট্যাক্সিতে উঠে পুরনো দিল্লির বাজার মহল্লার দিকে জোরে গাড়ি চালাতে বললো। অন্য ষড়যন্ত্রীদের দুরবস্থার কথা না ভেবেই ওরা সদলবলে চম্পট দিল।

ওরা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই স্তম্ভিত কারকারে দেখলো যে প্রায় বস্তার মতন মদনলালকে টেনে নিয়ে চলেছে সেনাবাহিনীর লোকেরা। গেটের সামনে যে পুলিস ছাউনি বসেছে সেই দিকেই ওকে নিয়ে গেল লোকগুলো। এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে গান্ধী হত্যার ঝাঁঝ উবে গেল কারকারের মন থেকে। তার তখন একটাই চিন্তা। কেমন করে এখান থেকে পালানো যায়।

গান্ধীজীর বিরামহীন চেষ্টার পর প্রার্থনাসভা মোটামুটি শান্ত হলেও, সভা জুড়ে তখন বেজায় শোরগোল চলছিল এক উন্মাদ পাঞ্জাবী রিফিউজিকে নিয়ে। সবাই তখন বলাবলি করছে যে ছেলেটা নাকি গান্ধীজীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে এসেছিল। এতসব হাঙ্গামার মধ্যেই গান্ধীজী ঘোষণা করলেন তাঁর পরবর্তী কর্মসূচী। সকলের উদ্দেশে শান্ত স্বরে বললেন, 'আমি এবার পাকিস্তানে যেতে চাই। যদি সরকার এবং ডাক্তারের অনুমতি পাই, তবে এখনই যাত্রা করতে পারি।'

কথাটা বলে স্মিত মুখে তাকালেন গান্ধীজী। উজ্জ্বল সেই হাসির কিরণ মেখে তাঁর মুখখানা তখন ঝলমল করছে। দিব্যি হুইলচেয়ারে বসে লোকের কাঁধে চড়ে নিশ্চিন্ত মনে চলে গেলেন সভা থেকে। ঘুণাক্ষরেও টের পেলেন না খানিক আগে কী অলৌকিক উপায়ে প্রাণে বেঁচে গেছেন তিনি।

ট্যাক্সি ছুটে চলেছে শহরের দিকে। ট্যাক্সির মধ্যে ব্যর্থতার লজ্জায় অধোবদন হয়ে আছে ওরা তিনমূর্তি, দুই গড়সে এবং আপ্তে। দুঃসহ যন্ত্রণায় দুহাতের মধ্যে মাথা রেখে চুপচাপ বসে আছে নাথুরাম। ফের শুরু হয়েছে মাইগ্রেনের যন্ত্রণা। অন্য দুজনও নিঃশব্দ। ওদের পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে তা কেউ জানে না। আসল কথা হলো যে, আপ্তের ওপর ওদের আস্থা এত নিবিড় ছিল যে কেউ কল্পনাও করে নি এমনভাবে ফেঁসে যাবে সবাই। এখন ওদের সামনে সমূহ বিপদ। জেরার মুখে সবই কবুল করতে পারে মদনলাল। তবে আশার কথা যে মদনলাল ওদের নাম বা অন্য পরিচয় জানে না। তবে তারা যে পুণার লোক সে কথা মদনলাল জানে। এমনকি ওরা যে পত্রিকাটা চালায় তার নামটাও অজানা নয় তার। সুতরাং এই সূত্র ধরে পুলিসের লোকেরা অনায়াসেই খুঁজে বার করে ফেলবে তাদের।

গোদের ওপর বিষফোড়ার মতন এই তিক্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যোগ হলো অসম্মানের জ্বালা। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্রতী হতে যাদের অর্থসাহায্য নিয়েছিল, বম্বের সেই উগ্রবাদীদের কাছে মুখ দেখাবার যো রইল না তাদের।

www.pathagar.com

সাভারকর সদনের সেই উৎকট গোঁড়া হিন্দুটিকে কথা দিয়েও তারা ব্যর্থ হলো।

যা-হক, কিছুক্ষণ পরে যন্ত্রণার ঘোর কাটিয়ে কিছুটা প্রকৃতিস্থ হলো নাথুরাম। তারপর ছোট ভাই গোপালকে তখনই পুণায় ফিরে যেতে বললো যাতে ঘটনার সময় অন্যত্র থাকার একটা বিশ্বাসযোগ্য ওজুহাত (এ্যালিবাই) সে তৈর রাখতে পারে। তাছাড়া গোপালকে সে তার সংসারের কথাও মনে করিয়ে দিল। আরও বললো যে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তা স্থির করবে সে ও আপ্তে। ওরা কথাবার্তা বলছিল মাতৃভাষা মারাঠিতেই যাতে হিন্দীভাষী ড্রাইভার তাদের কথা বুঝতে না পারে। কথাগুলো বলার পর ইঙ্গিতে গাড়ি থামাতে বললো নাথুরাম। ট্যাক্সি থামলে নেমে পড়লো গোপাল। তারপর আপ্তে ও নাথুরামকে নিয়ে জনবহুল শহরের পথে হারিয়ে গেল ট্যাক্সি।

দুদিন আগে গান্ধীজীর অনশন ভঙ্গের সময় বিড়লাবাড়ির যে অবস্থা হয়েছিল এখন ঠিক সেইরকম অবস্থা সেখানকার। মহাত্মাকে অভিনন্দন জানিয়ে চতুর্দিক থেকে তারবার্তা আসতে শুরু করেছে তখন। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বেঁচে ফিরেছেন তিনি। সবাই তাই দারুণ খুশী। ঘন ঘন ফোন আসছে। ছুটে এলেন নেহরু, প্যাটেল ইত্যাদি জননেতারা। তাছাড়া বাঁধভাঙা স্রোতের মতন উপচে পড়লো মানুষের ঢল। সবচেয়ে আগে এসে পৌঁছলেন শ্রীমতী এডুইনা মাউন্টব্যাটেন।

প্রাক্তন ভাইসরয়-পত্নীকে স্পষ্টতই আতঙ্কিত দেখাচ্ছিল। গান্ধীজী তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'আপনারা সবাই কত কি বলছেন আমায়। কিন্তু এর মধ্যে আমার বীরত্ব কতটুকু?' গান্ধীজীর তখনও ধারণা যে সেনাবাহিনীর বিস্ফোরণের সময় বোমাটা হঠাৎ ফেটে গিয়েছিল। তাই একটু থেমে শ্রীমতী মাউন্টব্যাটেনের দিকে চেয়ে গান্ধীজী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'হ্যাঁ, বীরত্ব হতো যদি আমার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে কেউ আমার দিকে গুলি ছুড়তো, আর হাসি মুখে রামনাম গাইতে গাইতে আমি ঢলে পড়তাম। তাহলেই সার্থক হতো আপনাদের অভিনন্দন!'

দিল্লি পুলিসের ডেপুটি ইন্‌স্‌পেকটার জেনারেল ডি. ডবু. মেহরাকে অসুস্থ শরীরেও বেশ চিন্তিত মনে হলো যেন। পরপর তিনখানা সরকারী মেসেজ এসেছে তাঁর নামে। ইনফ্লুয়েঞ্জায় ১০৩ ডিগ্রি জ্বর নিয়েও তাই মানুষটির মনে কোন সোয়াস্তি নেই। তিনি জানেন যে গুরুত্বপূর্ণ এই মেসেজ কটি পাঠিয়ে সরকার তাঁকে আগাম সতর্ক করে দিল। কারণ পুলিস প্রধান হিসাবে গান্ধীকে হত্যা-চেষ্টার এই তদন্তভার তাঁকেই নিতে হবে। প্রথম মেসেজটা সরল, সাদামাঠা। কোন জটিলতা নেই তার মধ্যে। গান্ধীজীর প্রার্থনাসভায় হাতবোমা ছোড়ার অপরাধে একজন যুবক ধরা পড়েছে। লোকটাকে আটক করে রেখেছে পুলিস। এর দুঘণ্টা পরে এল দ্বিতীয় মেসেজটা। তাতে লেখা যে আটক করা লোকটা জিজ্ঞাসাবাদের সময় কোন সহযোগিতা করছে না। তা এর একটাই জবাব এবং মেহরা সেই জবাবটাই পাঠিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ কড়ুয়া ধোলাই দাও। 'থার্ড ডিগ্রি প্রসিডিউর' বা তৃতীয় শ্রেণীর প্রক্রিয়া প্রয়োগ করো। তাহলেই সহযোগিতা করবে সে।

তিন নম্বর বা সর্বশেষ যে মেসেজটা এল তার মধ্যেই তদন্তের রূপরেখার একটা

www.pathagar.com

ইংগিত পাওয়া গেল। এই মেসেজটা এসেছে দিল্লি পুলিসের নামমাত্র প্রধানের কাছ থেকে। ওঁর নাম ডি.জে. গম্ভীভী। রাজনীতির মানুষ হলেও দিল্লি পুলিসের আসল কর্তা উনিই। ওঁর নির্দেশেই সেন্ট্রাল ইন্‌টেলিজেন্স ব্যুরো নামক কেন্দ্রীয় চরবিভাগের কাজকর্ম অনুষ্ঠিত হয়। মেহরার সংগে গঞ্জীভীর একটা গোপন বোঝাপড়া আছে। এর ফলে দিল্লিতে যত উল্লেখযোগ্য অপরাধ ঘটে তার তদন্ত তিনি নিজেই করেন। এ ব্যাপারে মেহরার কাছে তাঁর মনের কথা জানিয়েছেন গঞ্জীভী। অবসরের আগে তাঁর ভি.আই.পি. হবার খুব সাধ। 'গাড়িতে ঢুকবেন তখন তাঁর সম্মানে অস্ত্র প্রদর্শন করবে গার্ড।' দিল্লি পুলিসের প্রধান হয়ে সেই সম্মান তিনি পেয়েছেন যদিও দিল্লি পুলিসের প্রশাসনের দায়িত্ব তিনি ছেড়ে দিয়েছেন মেহরার ওপর। কিন্তু সেদিন ঠিক উল্টো ব্যাপারই ঘটলো। মেহরা অবাক হলেও সঞ্জীভীর মেসেজ পেয়ে। তাতে স্পষ্ট লেখা আছে, 'মদনলালের কেস্ নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি নিজেই এর তদন্তভার নিলাম।'

পার্লামেন্ট স্ট্রীটের পুলিস থানার একটা কুঠুরির মধ্যে মদনলালকে তখন নষ্টামি দুষ্টামির চরম দাম দিতে হচ্ছিল। সকাল থেকেই তার ওপর এই জিজ্ঞাসাবাদের উৎপীড়ন চলেছে। তাই শুধু বিধ্বস্ত হওয়াই নয়, এই প্রবল চাপের ফলে শরীর মন ক্রমশই নেতিয়ে পড়েছে মদনলালের। দুঘণ্টা ধরে বিরামহীন চলেছে এই জিজ্ঞাসাবাদ। শুধু মানসিক নয়, শারীরিক নির্যাতনও চলেছে সেই সংগে। রীতিমত 'থার্ড ডিগ্রি' উৎপীড়ন চালাচ্ছে পুলিস। তবুও সংগী চক্রান্তকারীদের নামধাম প্রকাশ করে সে বিশ্বাসঘাতকতা করে নি। এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট এজাহার দিয়েছে সে। বলেছে যে এই ষড়যন্ত্রে সে একাই আছে। এর বেশি একটা কথাও বলেনি এখন পর্যন্ত। তবে তার ধারণা ওরা আবার জেরা করতে আসবে এবং ওদের জেরার মুখে নীরব থাকতে পারলেই শেষপর্যন্ত সে হয়ত সময়টুকু কাটিয়ে দিতে পারবে।

তবে এত সাবধান হলেও জেরার প্রথম দিকে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ফাঁস করে দিয়েছিল সে। সে তখন স্বীকার করে নেয় যে, একজন ক্ষিপ্ত রিফিউজির ব্যক্তিগত আক্রোশ এ নয়। একটা খুনীর দলের একজন হয়ে সে একাজ করেছে। দলে আছে সাতজন এবং গান্ধীজীকে হত্যাচেষ্টার কারণ হলো যে মুসলমানদের তিনি অকারণ তোয়াজ করে চলেছেন। হিন্দু শরণার্থীদের মুসলমানদের ছেড়ে যাওয়া মসজিদের আশ্রয় থেকে উৎখাত করেছেন। পাকিস্তান সরকারকে অনেক টাকা পাইয়ে দিয়ে ওদের হিন্দুপীড়নে উৎসাহ দিচ্ছেন।

মদনলালের ধারণা যে ততক্ষণে তার চক্রান্তকারী সংগীরা নিরাপদে দিল্লি থেকে অন্তর্ধান করতে পেরেছে। অতএব নির্ভাবনায় সে যখন দিল্লিতে তাদের কাজকর্মের ফিরিস্তি দিচ্ছে, তখন অসাবধানে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পুলিসের হাতে তুলে দিল মদনলাল। এটা তার দেওয়া দ্বিতীয় ক্লু। কথায় কথায় সে বলে ফেললো যে সংগীদের সংগে সে নিজেও সাভারকর সদনে গিয়ে, ওই বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞকে চাক্ষুষ করে এসেছে। পুলিসের কাছে তথ্যটা মোটেই গুরুত্বহীন নয়। সুতরাং তার ওপর চাপ দিয়ে সংগীদের নামধাম চেহারার আরও খুঁটিনাটি বিবরণ জানবার চেষ্টা করলো পুলিস। অবশ্য মদনলালের দেওয়া সব তথ্য খুব কার্যকর হলো না পুলিসের কাছে। যেমন, কারকারের নাম বললো

www.pathagar.com

'কিরাধিরি।'

তবে গড়্সের চেহারার বিবরণ দেবার সময় আর একটা সূত্র অজান্তেই বলে ফেললো সে। নাথুরাম গড়্সের কথা জানাবার সময় সে স্বীকার করে ফেললো 'রাষ্ট্রীয় বা অগ্রণী মরাঠা' নামক কোন এক মাতৃভাষা পত্রিকার সম্পাদক সে। হয়ত দৈনিক পত্রিকার নামটা সে নির্ভুল জানাতে পারে নি। কিন্তু তদন্তকারী পুলিসের কাছে এই টুকরো তথ্যটাই সেদিন খুবই মূল্যবান হয়ে ওঠে।

এদিকে যখন জোরকদমে মদনলালের জেরা চলছে তখন দিল্লির হিন্দু মহাসভা অফিস ও মেরীনা হোটেলে তড়িঘড়ি খানাতল্লাশী শুরু করে দিল পুলিস। কিন্তু পাখী উড়ে গেছে তখন। কাউকেই পেল না তারা। দিগম্বর বাড়্গে তখন পুণার কয়েকশ' মাইল এগিয়ে গেছে। আর পুরনো দিল্লির একটা হোটেলে নাম ভাঁড়িয়ে বাস করছে গোপাল গড়্সে ও বিষ্ণু কার্কারে। আপ্তে ও নাথুরাম ত বলতে গেলে বেপাত্তা হয়ে গেছে তখন। কয়েক ঘণ্টা আগেই মেরীনা ছেড়ে কোথায় যে তারা অন্তর্ধান করেছে তার খোঁজ পেল না পুলিস। তবে হোটেলের চল্লিশ নম্বর ঘরটা তল্লাশ করে আর একটা অপরিহার্য তথ্য তারা হাতে পেল। এটা চার নম্বর ক্লু। ওই ঘরের ডেস্ক থেকে স্বাক্ষর করা একটা বিবৃতি খুঁজে পেল পুলিস। দিল্লির যে সব রাজনৈতিক নেতৃবর্গ চুক্তি করে গান্ধীজীকে অনশন প্রত্যাহারে রাজী করেছিল, তাদের প্রকাশ্যে নিন্দা করা হয়েছে বিবৃতিতে। স্বাক্ষর করেছে জনৈক আশুতোষ লাহিড়ী। হিন্দুমহাসভা দলের সে একজন কর্মকর্তা। আপ্তে ও নাথুরামকে সে চেনে। সাভারকরপন্থী মরহাট্টা দৈনিক 'হিন্দু রাষ্ট্র' পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষ ও সম্পাদক হিসাবে ওই দুজনকে আট বছর ধরে সে চেনে।

সেদিন জেরার পালা চুকলো মাঝরাতে। তারপর কেস্ রেজিস্টারের পাতা বন্ধ করলো পুলিস। টানা সাতঘণ্টা ধরে জেরা চালিয়েছে পুলিস। বলাবাহুল্য এই জেরার ফল যে আশাতীত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহই নেই। এখন দিনের আলোর মতন স্পষ্ট হয়ে গেছে যে গান্ধীজীকে হত্যাচেষ্টার একটা দারুণ চক্রান্ত ওরা করেছে। এমনকি কতজন চক্রান্তকারী এর সংগে জড়িয়ে আছে সেটাও অজানা রইল না পুলিসের কাছে। আরও একটা চাঞ্চল্যকর তথ্য জেনে ফেললো পুলিস। চক্রান্তকারীরা সবাই সাভারকরের বিশ্বস্ত চেলা। গত মে মাস থেকেই সাভারকরের এই দলটার কাজকর্ম, গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ন নজর রেখেছে পুলিস। এখন যে তথ্যটুকু তাদের করায়ত্ব হয়েছে তা দিয়ে সামান্য যত্ন ও চেষ্টা করলেই নাথুরাম ও আপ্তেকে সনাক্ত করা সম্ভব। ইতিমধ্যে যতটুকু কাজ হয়েছে তা খুবই কৃতিত্বপূর্ণ এবং সে রাত্রে দিল্লি পুলিসের কোন বুদ্ধিমান অফিসারের পক্ষেই ঘুঁটি সাজিয়ে ওই দুজনকে পাকড়াও করতে ঘণ্টা কয়েকের বেশি সময় লাগার কথা নয়। কিন্তু অমন চমৎকার শুরুর পরেও তদন্ত যেন ভোঁতা হয়ে গেল। এমন ভাসাভাসা দায়সারা তদন্ত চললো যে কোন কাজের কাজই হলো না শেষ পর্যন্ত। তাই বোধহয় সারা দেশে তিরিশ বছর পরেও ব্যাপারটা এমন বিতর্কের আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে।

www.pathagar.com

‘পুলিসের হাতে ধরা পড়ার আগেই গান্ধীকে পেতে হবে আমাদের’

নয়াদিল্লি এবং বোম্বাই, ২১-২৯ জানুয়ারি ১৯৪৮

চোখের সামনে দৃশ্যটা দেখেই গোপাল গড়্‌সের মুখের ওপরের মাড়িতে আটকে যাওয়া আধাখানা খাওয়া বিস্কুটটা গুঁড়িয়ে গেল। হাতে হাতকড়া লাগিয়ে, মাথায় মুখে বোরকা ঢেকে একটা কয়েদীকে প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে নিয়ে চলেছে পুলিস। মাথায় মুখে বোরকা ঢাকা দিলেও চোখের কাছে দুটো চেরা গর্ত আছে। পুরনো দিল্লির স্টেশন প্ল্যাটফর্মের ওপর যে লাঞ্চ কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে গোপাল ও বিষ্ণু কারকারে চা বিস্কুট খাচ্ছিল, সেখান দিয়েই কয়েদীটাকে নিয়ে গেল পুলিস। কয়েদীকে দেখেই চিনে ফেলেছে গোপাল। চিনে ফেলেছে ওর নীল রঙের পোশাকটা দেখে। বোরকার আড়াল থেকে উঁকি দেওয়া এই নীল রঙের পোশাকটাই মদনলাল পরেছিল যেদিন প্রথম গান্ধীজীকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। হাতকড়া লাগানো মদনলালকে চোখের সামনে দেখেই শরীরটা হিম হয়ে গেল গোপালের।

মনে হলো ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত সিরসির করে নামছে তার পিঠ বেয়ে। তাড়াতাড়ি কাউন্টারের পিছন দিকে নিজেকে আড়াল করে নিল গোপাল। পুলিস বেষ্টিত হয়ে বোরকা ঢাকা দেওয়া মদনলাল তখন অনেকটা কাছে এসে পড়েছে। সকাল থেকে এই নিয়ে পাঁচবার ওকে সঙ্গে নিয়ে পুলিস প্ল্যাটফর্মে এসেছে সঙ্গী ষড়যন্ত্রকারীদের খোঁজে। দিল্লি স্টেশনের প্রায় প্রতিটি ট্রেনের যাত্রীদের মধ্যে ষড়যন্ত্রকারীদের এইভাবে খুঁজে বেড়াচ্ছে পুলিস।

মদনলালের অবস্থা তখন সঙ্গিন। খাওয়া নেই, শোওয়া নেই অবস্থায় শরীর আর বইছে না তার। প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা বম্বে এক্‌স্‌প্রেস ট্রেনের প্রতিটি যাত্রীর ওপর নজর রেখে সে হাঁটছে। মুখের ওপর ফেলা বোরকার ছোট্ট ছেঁদা দিয়ে সে যতটুকু দেখছে, তার চেয়ে বেশি আড়াল হচ্ছে তার দৃষ্টি। হঠাৎ তার নজরে পড়লো একটা চেনা চেহারার ওপর। চা দোকানের কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে পড়া বিষ্ণু কারকারের কুঁজো হয়ে যাওয়া পিঠখানা চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনে মনে চমকে উঠলো মদনলাল। সঙ্গে সঙ্গে তার গতিও শ্লথ হলো মুহূর্তের জন্য। সঙ্গের পুলিসটা মদনলালের হাবভাব সামলে নিল। গলা ঝেড়ে কেশে উঠলো সে। তারপর গটগট করে গোপাল ও বিষ্ণু কারকারের পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেল অপেক্ষারত ট্রেনটার দিকে। বলতে গেলে, দিল্লি শহরে পড়ে থাকা শেষ দুজন ষড়যন্ত্রকারীদের নিরাপদে শহর ছেড়ে পালাবার ব্যবস্থা করে দিল সে এইভাবে।

প্রথম দিনে মদনলালের বোমা ফাটানোর পরে গান্ধীজীর নিরাপত্তার ব্যাপারটাই দিল্লি পুলিস কর্তৃপক্ষের কাছে একমাত্র চিন্তার কারণ ছিল। নামে ওপরওলা সঞ্জীভীর হাতে তদন্তের দায়িত্ব থাকলেও গান্ধীজীকে রক্ষা করার আসল দায়িত্ব

www.pathagar.com

ছিল মেহ্‌রার ওপর। অথচ মানুষটা তখনও রীতিমত অসুস্থ। যখন তখন জ্বর আসছে হু হু করে। সেই অবস্থায় গায়ে ওভারকোট চড়িয়ে একদিন দুপুরবেলা বিড়লাভবনে সশরীরে হাজির হলো মেহ্‌রা।

ভর দুপুরে গায়ে ওভারকোট চাপানো অসুস্থ মানুষটাকে দেখে গান্ধীজীও অবাক। কি ব্যাপার? মাথা নুইয়ে গান্ধীজীকে সশ্রদ্ধ অভিভাদন করে মেহ্‌রা বললো, 'আপনাকে ডবল মুবারক জানাতে এসেছি।'

ফোকলা মুখে হেসে গান্ধীজী বললেন, 'বুঝলাম। কিন্তু জোড়া মুবারক কেন?'

মেহ্‌রাও হাসিমুখ। বললো, 'আপনি অনশন করে যা করলেন আমার পুলিস তা করে উঠতে পারে নি। দিল্লিতে আপনি সম্প্রীতি ফিরিয়ে এনেছেন। এর দরুন এক প্রস্থ শুভেচ্ছা জানালাম। আর দ্বিতীয় শুভেচ্ছার কারণ হলো যে, অলৌকিকভাবে এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছেন আপনি।'

গান্ধীজীর ফোকলা মুখে তখনও সেই সরল হাসির কিরণ। মেহ্‌রা অভিভূত। হাসি হাসি মুখেই পুলিস প্রধানের দিকে চেয়ে গান্ধীজী বললেন, 'ব্রাদার, ঈশ্বরই আমার জীবন রক্ষা করেছেন। এই দেহমন সবই তাঁকে দেওয়া।' অথচ মহাত্মার জীবন রক্ষার ভার নিয়েই মেহ্‌রা ছুটে এসেছে বিড়লাবাড়ির বাগানে। গান্ধীজীকে তাই অনেকভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলো মেহ্‌রা। বললো যে, এটা কোন একক বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বোমা নিক্ষেপকারীর দলে আরও লোক আছে। মোট সাতজন আছে দলে। সুতরাং আবার চেষ্টা করবে ওরা। এ অবস্থায় গান্ধীজী যদি রাজী হন, তাহলে বিড়লাবাড়িতে গার্ডের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারে সে। যারা প্রার্থনাসভায় আসছে তাদের প্রত্যেককে তল্লাসির ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

মেহ্‌রার প্রস্তাব শুনে প্রায় ক্ষিপ্ত হলেন গান্ধীজী। মেহ্‌রার প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বললেন, 'না, আমি কিছুতেই রাজী হতে পারি না। যারা মন্দিরে কি চার্চে যায় তাদের কি সার্চ করাও তুমি?'

'আজ্ঞে না। তা করাইনা। কারণ তাদের মধ্যে এমন কেউ থাকেন না যাঁকে লক্ষ্য করে আততায়ী গুলি ছুঁড়তে পারে।'

গান্ধীজী চুপ করে শুনলেন। তারপর সস্নেহে বললেন, 'শোন বাবা। আমার ভরসা হলেন ভগবান শ্রীরাম। যদি তিনি চান যে আমার জীবন এখনই শেষ হ'ক, তাহলে কেউ আমায় রক্ষা করতে পারবে না। তখন লক্ষ পুলিসের পাহারা বসিয়েও আমায় তুমি বাঁচাতে পারবে না।' একটু থেমে গান্ধীজী ফের বললেন, 'যারা এখন দেশ চলাচ্ছে তারা কেউ আমার অহিংস নীতিতে বিশ্বাস করে না। তাই তারা ভাবছে যে বোধহয় পুলিস পাহারা বসিয়ে আমার প্রাণ বাঁচানো যাবে। তুমি জেনো যে, ভগবান রামই আমার পাহারাদার। এরপরেও যদি তুমি পাহারা বসাও বা আমার প্রার্থনাসভায় কাউকে ঢুকতে না দাও, তাহলে প্রতিবাদে তখনই আমি দিল্লি ছেড়ে চলে যাব। শুধু তাই নয় যাবার আগে তোমাকেই দোষারোপ করে যাব।'

গান্ধীজীর কথা শুনে একেবারে মুষড়ে পড়লো মেহ্‌রা। গান্ধীজীকে সে ভালভাবেই চেনে। কোন অবস্থাতেই মত বদল করার মানুষ তিনি নন। অথচ তাঁর নিরাপত্তার দায়টি তাকেই নিতে হয়েছে সরকারী আদেশে। সুতরাং মহাত্মাকে রক্ষা করার একটা পথ তাকে খুঁজে নিতেই হবে। সব দিক ভেবে সাহস করে

www.pathagar.com

সে বললো, 'অন্তত একটা অনুগ্রহ করুন। আপনার প্রার্থনাসভায় আমায় রোজ আসবার অনুমতি দিন।'

গান্ধীজী সহাস্যে বললেন, 'দিলাম অনুমতি। একজন সাধারণ ব্যক্তি হিসেবে তুমি প্রতিদিন আসবে।'

সেদিনই বিকালে পাঁচটা বাজার মিনিট দশ আগে জ্বর গায়েই মেহ্‌রা এসে হাজির হলো বিড়লাবাড়িতে। তার পরনে সাদা পোশাক। ইতিমধ্যেই বিড়লা-বাড়ির চারপাশে পাহারাদারের সংখ্যা পাঁচ থেকে বাড়িয়ে ছত্রিশ করে দিয়েছে সে। এদের বেশিরভাগই সাদা পোশাকপরা পুলিস। ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকার হুকুম হয়েছে তাদের ওপর। তার নিজের পরনের কোটের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে ওয়েবার এ্যান্ড স্কট থার্টি এইট রীভলভারটা। গুলিভরা মারণাস্ত্রটা পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে পকেট থেকে বের করে সে তিন রাউন্ড গুলি ছুড়ে বিশ ফুট দূরের কাউকে ঘায়েল করতে পারে। গান্ধীজীকে দেখা গেল কোয়ার্টার ছেড়ে প্রার্থনাসভার দিকে আসতে। মেহ্‌রা আগেই স্থির করে রেখেছে কোথায় সে বসবে। গান্ধীজীর কোল ঘেঁষে ডানদিকে একটা জায়গা নির্দিষ্ট করে রেখেছে সে। তার দৃঢ় ধারণা যে ওই স্পট্‌টায় বসলে কোন আততায়ীর পক্ষে গান্ধীজীকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া সম্ভব হবে না।

ওরা হুইল চেয়ারে বসিয়ে গান্ধীজীকে প্রার্থনামঞ্চে নিয়ে এল। সভায় এসে প্রথমেই ঘৃণা জর্জরিত সেই যুবক রিফিউজির উদ্দেশে গান্ধীজী তাঁর প্রথম উপদেশটি দিলেন। তিনি শুনেছেন যে প্রতিহিংসা নেবার শপথ নিয়েই সে তাঁকে হত্যা করতে এসেছিল। তার ধারণা দেশভাগের জন্য তিনিই দায়ী। আর এরই দরুন আজ তার পরিবারের সকলের এমন হেনস্থা। গান্ধীজী সবাইকে অনুরোধ করে বললেন, 'আপনারা কেউ ছেলেটিকে বোমা ছোড়ার দরুন ঘৃণা করবেন না। মন্দ বলবেন না তাকে।' পুলিস কর্তৃপক্ষের কাছে মদনলালকে মুক্তি দেবার অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন, 'কাউকে দুর্বৃত্ত ভেবে শাস্তি দেবার অধিকার আমাদের নেই।' (উই হ্যাভ নো রাইট টু পানিশ এ পারসন্‌ উই থিংক উইকেড্‌)

অপ্রত্যাশিত ভাবে যে লোকটির হাতে গান্ধীজীর হত্যাচেষ্টার রহস্য উদ্ঘাটনের দায়িত্ব এসে পড়েছে তার কাছে একটা সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠলো অচিরেই। তদন্তকাজ হাতে নিয়েই সঞ্জীভী জানতে পারলো যে এই ভয়ংকর চক্রান্তটা দানা বেঁধেছে বোম্বাই প্রদেশে। মদনলাল ইতিমধ্যেই সাক্ষ্য দিয়েছে যে তার সংগী চক্রান্তকারীরা সবাই মারাঠি। সে নিজেও দিল্লি থেকে বোম্বাই গিয়ে সাভারকরের বাসভবন দেখে এসেছে। অতএব সঞ্জীভীর প্রথম কর্তব্য হলো বোম্বাই পুলিসকে সতর্ক করা এবং এই তদন্তকাজে সেখানকার একজন অফিসারকে নিযুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া। তাছাড়া বোম্বাইয়ের তদন্তকাজে সহযোগিতা করার জন্য দিল্লি থেকে সমস্ত উদ্ঘাটিত তথ্যসহ দুজন সি.আই.ডি. পুলিস অফিসার পাঠাবার ও নির্দেশ দিল সঞ্জীভী।

তবে দুর্ভাগ্যের কথা যে বোম্বাই যাত্রার সময় ওই দুই পুলিস অফিসার এমন এক মারাত্মক ভুল করে বসলো যার কোন চারা নেই। এমন প্রমাদ কেমন ভাবে ঘটলো তা এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। এই তদন্তকাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে নথি অর্থাৎ মদনলালের স্বাক্ষরিত এজাহারের একটি টাইপ করা কপি তারা সঙ্গে

নিতে ভুলে গেল। ঠিক আগের দিন প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত কাজ করে মদনলালের এই প্রাথমিক বয়ানটি সংগ্রহ করা হয়। গান্ধীজীকে হত্যা চেষ্টার তদন্তকাজে মদনলালের এই বয়ানটা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দিল্লির দুজন অফিসার রহস্যজনকভাবে এই বয়ানের কপিটি সঙ্গে নিতে অবহেলা করে। এর বদলে খুবই অকিঞ্চিৎকর যে বস্তুটা তারা সঙ্গে নেয় সেটি একটা কার্ড। কার্ডের গায়ে ভুল বানানে লেখা কারকারের নাম আর কিছু অসমর্থিত তথ্য সংক্ষেপে লেখা ছিল। এমনকি নারায়ণ আপ্তে ও নাথুরাম গড়্সের সনাক্তকরণের সুবিধার জন্য তাদের সম্পাদিত মারাঠা দৈনিকের যে পরিচয়লিপি দিল্লি পুলিশের হেপাজতে ছিল, সেই অপরিহার্য তথ্যটাও তারা সঙ্গে নিয়ে যায় নি।

বম্বের যে ওপরওলার কাছে দিল্লির অফিসার দুজন রিপোর্ট করলো, সে ছোকরা খুবই কর্মদক্ষ। প্রায় টেবিলে বসেই সে এমন সব প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে ফেলেছে যা ওই কার্ডের গায়ে লেখা নেই। ছোকরার নাম জামশীদ জিমি নাগরওলা। মাত্র ৩২ বছর বয়সেই বোম্বাই পুলিসের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের ডি.সি. হয়ে বসেছে নাগরওলা। এই বিভাগের কর্তা হয়ে বোম্বাই প্রদেশের যাবতীয় রাজনৈতিক গুপ্ততথ্য তার করায়ত্ব। শুধু তাই নয়। এই শহরে আগত বিদেশীদের নাড়ী-নক্ষত্র এমনভাবে সংগ্রহ করা আছে যে, তার চোখে ধুলো দিয়ে বিদেশীদের সরে পড়া সম্ভব নয়। তবে যোগ্য তদন্তকারী অফিসার বলে মদনলালের কেস্টা যে তাকে দেওয়া হয়েছে তা নয়। যোগ্যতার বিচারে এই মনোনয়ন হয় নি। সংস্কারাচ্ছন্ন ভারতীয় পুলিস বিভাগের নানা বিধিনিষেধের জন্য নাগরওলাকে এই কাজে বাছা হয়েছে। কোন মুসলমান অফিসার দিয়ে যেমন এই তদন্ত চালানো বাঞ্ছনীয় নয়, তেমনি হিন্দু অফিসারের হাতেও এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি নির্বিবাদে ছেড়ে দেওয়ার ঝুঁকি অনেক। কেননা, তখন অনেক হিন্দু পুলিস অফিসারই মনে মনে গান্ধীবিরোধী ছিল। নাগরওলাকে মনোনয়ন করা হয়েছে ঠিক এই কারণের জন্যই। সে হিন্দু নয়, মুসলমানও নয়। সে একজন পার্শী।

তখন বোম্বাই প্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোরারজী দেশাই। অনেক ভেবেচিন্তেই তিনি এই পার্শী ছোকরার হাতে গুরুত্বপূর্ণ তদন্তভার গচ্ছিত করে দিয়েছেন। তবে শুধুই তদন্তভার নয়। সেই সঙ্গে খুবই গোপন একটা তথ্যও তুলে দিয়েছেন তার হাতে। একজন বিশ্বস্ত 'সোর্স' মারফত তথ্যটা তিনি পেয়েছেন। আগের হপ্তাতেই ওই বিশ্বস্ত সোর্সের কাছে গান্ধী হত্যাচক্রান্তের কথাটা জাঁক করে বলে ফেলেছিল মদনলাল। শুধু তাই নয়। এই কাজে যে লোকটা তার সহযোগী হয়ে থাকবে তারও নামধাম ফাঁস করে দিয়েছিল মদনলাল। লোকটার নাম নাকি কারকারে এবং আহ্মেদনগরের বাসিন্দা সে।*

---

* ১২ই জানুয়ারি তারিখে আহ্মেদ নগরের পুলিস রিপোর্টটি মোরারজী দেশাইয়ের চোখে পড়াটা প্রায় কাকতালীয় ঘটনা। সেদিনই তিনি প্রথম জানতে পারলেন যে ১লা জানুয়ারি তারিখে কারকারের হোটেল ম্যানেজারের ঘর থেকে লুকানো অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধান পায় আহ্মেদনগরের পুলিস। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে কারকারেকে সেদিন গ্রেপ্তার করা হয় নি। ক্ষুব্ধ মন্ত্রীমশাই কারণ জানতে চেয়ে যে নোট পাঠালেন সেটি ভারতীয়-পুলিসের প্রশাসনিক অলিগলি পেরিয়ে যথাস্থানে পৌঁছতে সময় লাগলো সাতদিন। বলতে গেলে গান্ধীজীর হত্যাচেষ্টার তদন্তের কাজেও এই গড়িমসি অনেকটা দায়ী।

www.pathagar.com

এই কার্‌কারে নামক লোকটাকে শনাক্ত করতে নাগরওয়ালা মোটেও গড়িমসি করে নি। প্রশাসনকে সতর্ক করা ছাড়াও, এক ধাপ এগিয়ে গেল এই যুবকের চিন্তাধারা। তার দৃঢ় ধারণা হলো যে দিন কয়েকের মধ্যেই শান্ত, ছায়াঘেরা কেলুশকর রোডের ওপর অবস্থিত সাভারকর সদনের আশেপাশে গান্ধীজীকে হত্যাচেষ্টার অপরাধীদের ঘুরপাক খেতে দেখা যাবে। সুতরাং হপ্তাখানেক আগে সাভারকারের সঙ্গে মদনলালের সাক্ষাতের ভিত্তিতে আগেভাগে সাভারকরকে গ্রেপ্তার করার ফন্দি করলো সে। মোরারজীর কাছে সেই মর্মে অনুমতিও চাইতে গেল নাগরওলা। কিন্তু ধমক দিলেন মোরারজী। বললেন, 'তুমি কি উন্মাদ? তুমি কি চাও সারা বম্বেতে আমি আগুন জ্বালিয়ে দিই?'

সাভারকরকে হাজতবাস করাতে না পারলেও লোকটাকে সি.আই.ডি. পুলিস বিভাগের চরশাখার এক্তিয়ারভুক্ত করতে বিশেষ কাঠখড় পোড়াতে হ'ল না নগরওলার। ব্রিটিশ সরকারের বিশেষ কৃপাধন্য এই চরবিভাগের শাখা বিস্তারের কাজটা একদিনে গড়ে ওঠে নি। তিলতিল করে গড়ে ওঠা এই বিভাগের কাজকর্ম রীতিমত প্রশংসনীয়। বোম্বাই সি. আই. ডি. বিভাগের অধীন এই শাখার চালু নাম 'ওয়াচার্স ব্রাঞ্চ।' অন্তত দেড়শ' ইন্‌ফরমার এই শাখার কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত। সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষ এরা। সাধারণত নিম্নশ্রেণীর জীবিকাধারীরাই খবরপাচারের কাজ করে। খোঁড়া, অন্ধ ভিখিরী। বোরকাপরা মুসলমান রমণী, রাস্তার ঠেলাওলা, ফলওলা, ঝাড়ুদার ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার লোকরাই ওয়াচার্স ব্রাঞ্চের ইন্‌ফরমার। প্রায় সিকি শতাব্দী ধরে বোম্বাইয়ের বেয়াড়া রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের নাড়ীনক্ষত্র এদের জানা। গর্ব করে ওরা বলেও বেড়ায় যে সরকারের সন্দেহজনক একজন মানুষও ওদের নজর এড়িয়ে যেতে পারে নি। তাই দায়িত্ব হাতে পেয়ে জিমি নাগরওলার প্রথম কাজ হলো সাভারকর ও তার বাসভবনের ওপর নজরদার বসানো।

দিল্লির প্রধান তদন্তকারী অফিসারের মতন নাগরওয়ালার তদন্তকাজও প্রত্যাশিত দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে চললো। তদন্তের পহেলা রাউণ্ডেই দারুণ সাফল্য পেল এই তরুণ পুলিস অফিসার। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিষ্ণু কারকারের পুরো পরিচয় শনাক্ত হলো। শুধু নাম-ধাম নয়, তার পেশা এবং ৬ জানুয়ারি আহমেদনগর থেকে সে যে নিরুদ্দেশ হয়েছে সে খবরও অবগত হলো নাগরওয়ালা। খানিক পরেই পুণার 'জনৈক বাড়্‌গে'র খবর দিয়ে গেল একজন ইনফরমার। লোকটা নাকি একজন ছোটখাট অস্ত্র ব্যাপারী। পুণা শহরে তার একটা দোকান আছে এবং গান্ধীজীকে হত্যাচেষ্টার ষড়যন্ত্রে এই লোকটাও নাকি যুক্ত ছিল।

১শে জানুয়ারির আগে এই নোটটি লালফিতার ফাঁস কেটে আহ্‌মেদনগরের সি. আই. ডি. পুলিসের হাতে পৌঁছাল না। তারপর আরও পাঁচদিন নির্দেশটি ঘুরপাক খেল অফিসের মধ্যে। অতঃপর ২৪শে জানুয়ারি তারিখে কার্‌কারের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হলো। প্রতিদিনই এইধরনের কয়েকশ' সরকারী কাগজে চোখ বোলান মোরারজী। তাই তখন মদনলালের সঙ্গী চক্রান্তকারীদের নামধাম জানতে পারলেন, তখন রিপোর্টারটির কথা মনে পড়ে নি তাঁর।

www.pathagar.com

খবরটা পেয়েই পুণার পুলিস প্রধানের কাছে বার্তা পাঠাল নাগরওয়ালা। তখনই বাড়্গের দোকান তদন্ত করতে বলা হলো পুণার পুলিসকে। কিন্তু বাড়্গেকে পেল না পুণার পুলিস। সে নাকি নিরুদ্দেশ। তবে তাদের অনুমান যে লোকটা সম্ভবত পুণা শহরের আশপাশের জংগলের মধ্যে আত্মগোপন করে আছে।

দুর্ভাগ্যবশত ঐটুকু ছাড়া পুণা পুলিসের তদন্তকাজ এক কদমও এগোয় নি। পুণা শহর থেকে দীর্ঘদিন ধরে লোকটার অনুপস্থিতির কারণ সন্ধানের কোন চেষ্টাও হয় নি। এমনকি এই বে-আইনী অস্ত্র কারবারীর নাম পুলিস বিভাগের চাহিদা তালিকায় থাকা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কোনরকম শিরঃপীড়া হয়নি পুণার পুলিস কর্তার। অথচ প্রথম দফার তদন্তকাজ শেষ হবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দিল্লি থেকে পুণায় পৌঁছে গিয়েছিল বাড়্গে। তারপর দশদিন ধরে মদনলালের বোমা বিস্ফোরণের সংগে অভিযুক্ত করে পুলিসের লোকজন যখন তাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে, তখন সে নাকি দিব্যি ভালমানুষ সাধু সেজে দোকানের পিছনের ঘরটিতে বসে বর্ম সেলাই করছিল।

মোটকথা, তার নিজস্ব তদন্তের সাফল্যের তুলনায় দিল্লির ওই দুই পুলিস অফিসারের যোগান দেওয়া তথ্য হাতে পেয়ে এতটুকুও খুশী হলো না নাগরওয়ালা। ওই দুজনের মধ্যে একজন হলো শিখ। লোকটা বোম্বাই শহরের একজন উগ্রপন্থী শিখ আন্দোলনকারীর হোটেলে আবাসিক হয়েছে। বম্বের সি.আই.ডি. দপ্তরে ওই হোটেল মালিকের নাম আছে। লোকটাকে দেখেই নাগরওয়ালার মনে হলো যেন গান্ধীজীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের তদন্তকাজে এই শিখ অফিসার এবং তার সহকর্মীর কাজকর্ম চালচলন মোটেই সদর্থক পদক্ষেপ নিতে পারবে না।

সুতরাং সর্বদিক ভেবেই সে স্থির করলো যে এদের সাহায্য ব্যতিরেকেই সে অগ্রসর হবে। সুতরাং শিষ্টাচারের তোয়াক্কা না করেই ওই দুজন অফিসারকে হোটেলে ফেরত পাঠিয়ে দিল নাগরওয়ালা। পরদিন অর্থাৎ ২৩ জানুয়ারির সকালেই ওদের ডেকে পাঠাল নাগরওয়ালা। তারপর ওদের হাতে তাঁর নিজের সংগৃহীত তথ্যগুলি দিয়ে তাদের ফেরত পাঠিয়ে দিল।

দিল্লি পৌঁছেই সীনিয়র অফিসারটি বোম্বাই সফরের কেস ডাইরি জমা দিল। ডাইরিতে সে যা লিখলো তা রীতিমত বিস্ময়কর। সে লিখলো যে হিন্দুরাষ্ট্র কিংবা অগ্রণী নামক সংবাদপত্রের সম্পাদককে গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে তারা যথেষ্ট পীড়াপীড়ি করেছিল। প্রমাণ স্বরূপ যে বিশেষ ডকুমেন্টটি তারা ডাইরির সংগে গেঁথে দেয় সেটি নাকি নাগরওয়ালার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আগেই পেশ করা হয়েছিল বলে তারা দাবি করে। কিন্তু সেটির দিকে চেয়েও দেখে নি নাগরওয়ালা। বলাবাহুল্য, সমস্ত ব্যাপারটাই যে সাজানো তার প্রমাণ মেলে কয়েক বছর পরে। ডকুমেন্টটি তাদের বোম্বাই যাত্রার পর লেখা হয়েছিল এবং রাজধানী শহরে ফেরার পর ডাইরির সংগে সেটি তারা জুড়ে দেয়।

শুক্রবার দুপুর নাগাদ তদন্তকাজটি হঠাৎই অনেকটা এগিয়ে গেল যেন। এমন আচমকা আগুয়ান হবার ঘটনা অপ্রত্যাশিত এবং দিল্লির পুলিস কর্তৃপক্ষ তা কল্পনাও করে নি। পুলিসের বিরামহীন জিজ্ঞাসাবাদের চাপ আর যেন সইতে পারছিল না মদনলাল। শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়লো সে এবং খোলাখুলি এজাহার

www.pathagar.com

দিতে রাজী হয়ে গেল। পুলিসের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়েই যে সে লিখিত সাক্ষ্য দিয়েছে তেমন অভিযোগ অবশ্য দিল্লি পুলিস কোনদিনই স্বীকার করেনি।* যাহক, দুজন তদন্তকারী অফিসার দুদিন ধরে মদনলালের এজাহার নিল। তারপর টাইপ করা ৫৪ পাতার সেই বয়ানটি লিপিবদ্ধ হলো ২৪শে জানুয়ারি তারিখে। রাত সারে ন'টার সময় মদনলালকে শোনানো হলো টাইপ করা সেই এজাহার। তারপর মদনলালের স্বাক্ষর নিয়ে পুরো এজাহারটি পেঁাছে গেল সঞ্জীভীর টেবিলে, সেই রাতেই।

এবারের স্বীকারোক্তিতে মদনলাল কিছুই গোপন করল না। সে যা জানে সবই বললো। বাড়্‌গেকে নামে চিনিয়ে দিতে না পারলেও, সে যে পুণার 'শস্ত্রভাণ্ডারের' মালিক তা জানিয়ে দিল। কারকারের নাম, ধাম, তার রাজনৈতিক কাজকর্মের পুরো পরিচয় ইত্যাদিও জানিয়ে দিল পুলিসকে। এমনকি হিন্দুরাষ্ট্র পত্রিকার নামটাও সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারলো মদনলাল। আর একটা দরকারী খবর তাদের দিল। পুলিস এতদিনে সঠিক ভাবে জানতে পারলো যে হিন্দুরাষ্ট্র পত্রিকার ঠিকানা হলো পুণা। পত্রিকার সঠিক অবস্থান জানার পর পত্রিকার মালিক ও সম্পাদককে সনাক্ত করার কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেল সঞ্জীভীর কাছে। এবার একজন ইন্‌স্‌পেকটর পাঠিয়ে ভারত সরকারের হোম ডিপার্টমেন্ট বা ইন্‌ফরমেশন অ্যান্ড ব্রডকাসটিং ডিপার্টমেন্ট থেকে দরকারী প্রমাণটুকু টুকে আনালেই তার কাজ সম্পূর্ণ হয়। তাকে যা করতে হবে তা হলো বোম্বাই প্রদেশ থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের তালিকাটি পরীক্ষা করে করে মারাঠি দৈনিক 'হিন্দুরাষ্ট্র' পত্রিকার সম্পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করা। কাজটি মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। বার্ষিক রিপোর্টের পাতা ওল্টালেই পত্রিকার নাম, সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারীর নাম এবং পত্রিকার চরিত্র জানা যাবে। একজন অফিসার পাঠিয়েই তথ্যগুলো সংগ্রহ করা যায়।

'হিন্দুরাষ্ট্র'—মারাঠি ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা

সম্পাদক—এন.ভি. গড়্‌সে

স্বত্বাধিকারী—এন.ডি. আপ্তে

একটি সাভারকরপন্থী দৈনিক।'

যে মানুষটার পেছনে দিল্লির পুলিস তাড়া করে বেড়াচ্ছে সে লোকটার নাম যে 'এন.ভি. গড়্‌সে', তার আর একটা চূড়ান্ত প্রমাণ দুদিন আগেই পুলিসের

---

* ১৯৭৩ সালে মদনলালের সঙ্গে বেশ কয়েকবার সাক্ষাৎকার হয়েছিল এই গ্রন্থের লেখকদ্বয়ের। সে সময় মদনলাল তাঁদের কাছে কয়েকটি শারীরিক অত্যাচারের ঘটনা শোনায়। একবার নাকি তার দুই অণ্ডকোষ থেকে বরফের চাঙড় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। আর একবার তার মুখের ওপর চিনির পানা ঢেলে দেওয়া হয়। তারপর এক ঝাঁক পিঁপড়া ছেড়ে দেওয়া হয়। অবশ্য দিল্লি পুলিসের তরফ থেকে এই অভিযোগগুলি অস্বীকার করা হয়। লেখকদ্বয়কে তাঁরা রেকর্ড দেখে বলে যে পরপর দুদিন অর্থাৎ ২১ ও ২২শে জানুয়ারি তারিখে মদনলালকে সাবধান করে দেওয়া হয়। তাকে বলা হয়েছিল যে সে ক্রমাগত মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে যার পরিণাম শুভ নয়। এমনকি মদনলালের প্রশ্নকারীদেরও জানিয়ে দেওয়া হয় যেন সে তার আচরণ শুধরে নেয়। এর পরেই মদনলাল স্বীকারোক্তি দিতে রাজী হয়েছিল।

www.pathagar.com

কাছে পেঁাছে গেছে। মদনলাল যেদিন এজাহার দিতে শুরু করে সেদিনই এই প্রমাণটি হাতে পেয়ে যায় পুলিস। মেরীনা হোটেলের ৪০ নম্বর ঘরে পড়ে থাকা কাচা কাপড়ের বাণ্ডিলের মধ্যে নাথুরামের জামা কাপড়ের গায়ে ধোবিখানার যে মার্কা দেওয়া ছিল তা নাথুরাম গড়্সের আদ্যক্ষর এন.ভি.জি.। ২০শে জানুয়ারি তারিখে হোটেল থেকে তড়িঘড়ি চম্পট দেবার সময় অসাবধানে এই কাপড়ের বাণ্ডিলটি ফেলে গিয়েছিল নাথুরাম।

মোট কথা সম্পূর্ণ তথ্য হাতে সত্ত্বেও তদন্তকাজে প্রত্যাশিত দ্রুততা দেখা যায় নি। এর জন্য সঞ্জীভী নামে মানুষটাই অনেকখানি দায়ী। অন্তকাজ হাতে নেবার পর থেকেই মানুষটার কাজকর্মে কেমন এক উৎসাহহীনতা, আলগা ভাব লক্ষ্য করা যায়। একে সে দাম্ভিক তায় চাপা প্রকৃতির। সমস্ত তদন্তের ব্যাপারটা সে এমনভাবে আড়াল করে রাখলো যেন কোন মূল্যবান সম্পত্তি রক্ষা করছে। তদন্তের ব্যাপারে তার অধীনস্থ কর্মচারীদের কৌতূহল বা আগ্রহ দেখলে সে যেমন অপ্রসন্ন হতো তেমনি বিমুখ হতো যদি কেউ তাকে সাহায্য করতে চাইত। এ ব্যাপারে কারও হস্তক্ষেপ সে সইতে পারে নি।

তখন তার হাতে মদনলালের স্বাক্ষর করা স্বীকারোক্তি ছাড়াও অন্য যে সব তথ্য ছিল সেগুলি ব্যবহার করে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছয় জনের মধ্যে অন্তত পাঁচজনকে শনাক্ত করা মোটেই দুঃসাধ্য কাজ ছিল না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে এ ব্যাপারে প্রাথমিক উদ্যোগ নিতেও দেখা গেল না সঞ্জীভীকে। হোম ডিপার্টমেন্টে গিয়ে সংবাদপত্রের বার্ষিক তালিকা পরীক্ষা করে নাথুরাম গড়্সের নাম সন্ধান করতে যেমন সে কোন ইন্স্পেক্টর পাঠায়নি, তেমনি হিন্দু মহাসভা দলের স্থানীয় দপ্তরে হাজির হয়ে জনৈক লাহিড়ীর সঙ্গে গড়্সে বা আপ্তের দীর্ঘদিনের পরিচয়সূত্র জানার চেষ্টাও করে নি সে। এমনকি এ ব্যাপারে বম্বে পুলিসের ডি.সি.এস. বি. জিমি নাগরওয়ালার কাছে স্বীকারোক্তির কোন নকলও পাঠাল না সে। তবে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হলো পুণার পুলিস বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ না করা। টেলিফোনের মাধ্যমে 'হিন্দুরাষ্ট্র' পত্রিকার সম্পাদকের নাম, ধাম, পরিচয়, জানার কোন চেষ্টাই সে করে নি। মোটকথা, লোকটার সমস্ত কাজকর্মের মধ্যে এইরকম হতবুদ্ধিকর অযোগ্যতার দৃষ্টান্ত এত ভূরি ভূরি যে অবাক হতে হয়। বলতে গেলে এই অযোগ্যতা রীতিমত অপরাধ। অন্তত সিকি শতাব্দী পরে এ দেশের মানুষের কাছে ব্যাপারটা যে খুবই অপরিচ্ছন্ন মনে হবে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। তারা সত্যই গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসবে কি করে এমনটা ঘটেছিল।*

---

* ২০শে জানুয়ারি তারিখে মদনলালের বোমা বিস্ফোরণের পর গান্ধীজীকে হত্যা করার চক্রান্ত বানচাল হয়ে যায়। গান্ধীজী নিহত হন পরবর্তী প্রয়াসে। কিন্তু গান্ধীজীকে ঘিরে এই হত্যাচক্রান্ত কেন হয়েছিল এবং কেন পুলিসের তদন্তকাজে গাফিলতি দেখা দেয়, তার রহস্য উন্মোচনের জন্য ১৯৬০ সালের শেষাশেষি ভারত সরকার একটা তদন্ত কমিশন বসান। তদন্ত কমিশনের নেতৃত্ব দেন সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জাস্টিস জে. এল. কাপুর। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে দীর্ঘদিন ধরে কমিশন এই তদন্তকাজ চালায়। কিন্তু প্রার্থিত ফল পাওয়া যায় নি, কারণ তদন্তকাজে কিছু কিছু ব্যাঘাত

www.pathagar.com

তবে সঞ্জীভীই একমাত্র পুলিস অফিসার নয় যার ভাবগতিক বা আচরণ ঠিকমতন ব্যাখ্যা করা যায়। ওই দলভুক্ত ছিল আর একজন উচ্চপদস্থ অফিসার। পুণার ডি.আই.জি., সি.আই.ডি. অফিসার ইউ.এইচ. রানা। রবিবার ২৫শে জানুয়ারি তারিখে দিল্লিতে এক সম্মেলনে যোগ দিতে এল সে। কিন্তু দরকারী ফাইলটি পুণাতেই পড়ে থাকলো। গড্‌সে, আপ্তে, বাড্‌গে বা কারকারেকে শনাক্ত করার পর্যাপ্ত তথ্য ফাইলে থাকা সত্ত্বেও, রানা কোন আগ্রহ দেখায় নি। ফাইলের মধ্যে আপ্তে ও কারকারের দুখানা ছবিও আছে। বিড়লাবাড়ির গেটে পুলিস চৌকিতে ওদের দুজনের ছবি দুখানা জমা করে দিলে প্রার্থনাসভায় ওই দুজনকে সহজেই চিনে নেওয়া যেত। এবং তাদের আগমন হয়ত ঠেকানো যেত। মোটকথা ফাইলের মধ্যে হিন্দুদের উগ্রপন্থী কাজকর্মের সম্পূর্ণ তথ্যই ছিল। তারই নির্দেশে নিয়মিতভাবে এইসব তথ্য মাসের পর মাস ধরে সংগ্রহ করেছে তার অধস্তন কর্মচারীরা। অথচ ব্যাপারটা ধামাচাপাই রয়ে গেল।

সঞ্জীভীর অফিসেই দুই অফিসারের আলোচনা সভা বসলো। দুঘণ্টা ধরে মদনলালের স্বীকারোক্তির প্রতিটি পাতার বিস্তারিত আলোচনা হলো রানা ও সঞ্জীভীর মধ্যে। প্রায় প্রতিটি লাইনেই সতর্ক হবার যথেষ্ট তথ্য ছিল। কিন্তু পুণার এই পদস্থ পুলিস অফিসারের কোন কিছুতেই চৈতন্য হল না। মদনলালের স্বীকারোক্তি প্রমাণ করে দিয়েছে যে গান্ধীজীকে হত্যাচেষ্টার এই ষড়যন্ত্রে অন্তত দুজন এমন মানুষ জড়িয়ে আছে, যারা পুণা অঞ্চলের অধিবাসী। তাছাড়া একথা ভাবাই যায় না যে হিন্দুরাষ্ট্র পত্রিকার নামটা টাইম্‌স্‌ অব ইণ্ডিয়ার মতন পরিচিত নাম নয় তার কাছে। গত জুলাই মাসেই রাষ্ট্রবিরোধী রচনার জন্য হিন্দুরাষ্ট্র প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাছাড়া তারই নির্দেশে এই পত্রিকার সম্পাদক ও কর্মাধ্যক্ষের ওপর থেকে পুলিস চৌকি তুলে নেওয়া হয়। আগের গ্রীষ্ম মরসুমে পুণা শহরে যে বোমা বিস্ফোরণ হলো সেটা যে আপ্তেরই যোগানো বোমা এ খবরও রানার অজানা নয়।

তবু ভবী ভোলবার নয়। পুণা শহরকে ঘিরে এতগুলি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরাসরি জানার পরও মানুষটার প্রতিক্রিয়া দুর্বোধ্যই থেকে গেল। সে যেমন টেলিফোনে কর্মচারীদের কোন নির্দেশ দিল না, তেমনি নিজেও এ ব্যাপারে তদন্ত শুরু করার কোন উদ্যোগ নিল না। এমনকি বিমানযাত্রা করে দুঘণ্টার মধ্যে পুণা পেঁৗছে নিজের হাতে তদন্তকাজ নেবার চেষ্টাও করলো না রানা। বিমানযাত্রা

আসে। যেমন, সঞ্জীভী ও আরও কয়েকজন প্রধান সাক্ষীর সাক্ষ্য নেওয়া যায় নি। কারণ তারা কেউ তখন বেঁচে ছিল না। এমনকি যে অফিসারটি বম্বে থেকে দিল্লিতে ফিরেই কেস ডাইরির মধ্যে জাল 'এনট্রি' করেছিল সেও তখন বেঁচে নেই। অবশ্য 'এনট্রি' যে জাল সেটা ফাঁস করে দেয় কমিশন।

ভারত সরকারের কাছে ছ'খণ্ডের এই তদন্ত রিপোর্ট জমা পড়ে ১৯৬৯ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে। তবে বিচারপতি কাপুর মোটেই খুশী হন নি পুলিসের এই আড়ম্বরের তদন্ত দেখে। এ ব্যাপারে তাঁর সখেদ মন্তব্যটি বড় হৃদয়স্পর্শী। যেন ভাসাভাসা দায়সারা কর্তব্য করেছে পুলিস। এই-রকম খিন্ন উক্তি করেছিলেন বিচারপতি কাপুর। গান্ধীজীর মতন এমন একজন জাতীয় নেতার হত্যা-রহস্য তলিয়ে দেখতে পুলিস বিভাগের যতটা আন্তরিক ও চটপটে হওয়া উচিৎ ছিল তা তারা কোন জায়গাতেই হন নি।

www.pathagar.com

করলে পাছে তার শরীর অসুস্থ হয়, তাই বোম্বাই ফেরার জন্য তার ট্রেনের টিকিট কাটা হলো। এমনকি দ্রুতগতি ট্রেনের বদলে ঘুরপথের টিকিট কাটা হলো তার জন্য। যাতে দিল্লি থেকে বোম্বাই পেঁছিতে ছত্রিশ ঘণ্টার ওপর অতিরিক্ত আরও ছ'ঘণ্টা বেশি সময় লাগে।

অনুমান করা যেতে পারে যে পুণার এই পুলিস অফিসারটি তার দুর্বোধ্য আচরণের জন্য হয়ত আর একজনের দিকে আঙুল তুলে দেখাবে। তার নাম সঞ্জীভী। কারণ, দিল্লির এই আমলার হাতেই সরকারীভাবে এই তদন্তভার তুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সঞ্জীভীরও এই অহেতুক গড়িমসি কেন ? মানুষটার কি ধ্রুব বিশ্বাস হয়েছিল যে আততায়ীরা দ্বিতীয়বার হত্যা করার চেষ্টা করবে না ? হয়ত এই বিশ্বাসটি কেন্দ্র করেই সঞ্জীভী তার তদন্তকাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। তার ধারণা যে বিশে জানুয়ারি তারিখে যারা গান্ধীজীকে আক্রমণ করেছিল তারা একদল ভ্রষ্টাচারী উন্মাদ। (বাঞ্চ অব ক্র্যাক্‌পট্‌স্‌) একবার অমন শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হবার পর দ্বিতীয়বার এই অপচেষ্টা তারা করবে না। কিন্তু সঞ্জীভীর অঙ্ক ভুল। সে বুঝতে পারে নি যে তার এবং ৭৮ বছরের বৃদ্ধ নেতার হাতের সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। সঞ্জীভীর এই তদন্তকাজে যেটির অভাব সেদিন সবচেয়ে প্রকট হয়ে উঠেছিল তা হলো উপলব্ধি। দুর্ভাগ্যবশত, সঞ্জীভীর কাজকর্মের মধ্যে জরুরীবোধের এই উপলব্ধিটুকুই বিসদৃশভাবে অনুপস্থিত ছিল সেদিন।

বম্বে শহরের শহরতলী স্টেশন। নাম থানে। প্ল্যাটফর্মের ওপর শেষ ল্যাম্প পোস্ট থেকে বিচ্ছুরিত আলোকবৃত্তের কোলআধারে গোল হয়ে বসে আছে ওরা চার মূর্তি। সঞ্জীভীর এই তদন্তকাজ যেটির অভাবটি সেদিন সবচেয়ে প্রকট হয়ে উঠেছিল তা হলো উপলব্ধি। দুর্ভাগ্যবশত, সঞ্জীভীর কাজকর্মের মধ্যে জরুরীবোধের উপলব্ধিটুকুই বিসদৃশভাবে অনুপস্থিত ছিল সেদিন। সেই জরুরীবোধটাই যেন এদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল তখন। অন্তত এদের দলনেতার কণ্ঠস্বরের মধ্যে সেই আবেগটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তখন। তাই যে সম্ভাবনাটা পাগলামি বলে উড়িয়ে দিয়েছিল সঞ্জীভী সেটাই যেন বাস্তবসত্য হয়ে উঠতে চলেছে এবার। গান্ধীজীর ওপর দ্বিতীয়বার আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে আততায়ীরা আবার ফিরে আসতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। এবার ওরা অকৃতকার্য হতে চায় না। তাই অসংবদ্ধ কোন কর্মসূচি হাতে নিয়ে ওরা কর্মক্ষেত্রে নেমে পড়ে নি। সফল ভাবে কোন রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করতে যে পথ নিরাপদ এবং সর্বত্র অনুসৃত হয়, সেই পথটাই ওরা বেছে নিয়েছে। একজন বধ্য, একজন হত্যাকারী, একখানি অস্ত্র এবং একটি অন্ধ নির্বোধ আবেগ। অতঃপর গুপ্তহত্যা অনুষ্ঠিত হবার পর হত্যাকারীর আত্মবলিদান। এই হলো ওদের গুপ্তমন্ত্র।

দিল্লি থেকে পালিয়ে আসার পর থেকেই নাথুরাম ও আপ্তে ধরা পড়ার ভয়ে অষ্টপ্রহর তটস্থ হয়ে আছে। ওরা জানে যে সারা দেশ জুড়ে হন্যে হয়ে ওদের খুঁজে বেড়াচ্ছে পুলিস। এই অবস্থায় ঘুরে ঘুরে থানে স্টেশনের এই গোপন আস্তানাটা খুঁজে বার করেছে ওরা। গোপাল গড়্‌সে এবং বিষ্ণু কারকারেকেও ডেকে এনেছে ওরা। তার সিদ্ধান্তটা শোনাতে নাথুরামই কথাটা প্রথম তুললো। কঠিন খসখসে গলায় বললো, 'আমরা প্রথমবার ব্যর্থ হয়েছি কারণ অনেককে জড়িয়ে রেখেছিলাম এর সঙ্গে। আর সেই ভুল করতে চাই না। গান্ধীকে হত্যা

www.pathagar.com

করার একটাই পথ। এ কাজটা একজনকেই করতে হবে, পরিণাম যাই-ই হোক।'

গোপাল তাকাল তার বড়ভাইটির দিকে। সারা জীবনটাই ব্যর্থতায় ভরা মানুষটার। কখনও কোন কাজে সফল হয় নি সে। তাই কেমন যেন পাগলাটে মনে হয়েছে দাদাকে। তার জীবনে ভালবাসার বস্তু দুটি। কফি আর নারীবিদ্বেষ। দিল্লিতে যে ক'টা দিন ছিল সর্বক্ষণই মাইগ্রেনের যন্ত্রণায় কুঁকড়ে থাকতো। ফেকাশে আর ম্লান দেখাত দাদাকে। আজ কিন্তু অন্যরকম দেখাচ্ছে তার দাদাকে। একেবারে অন্য মানুষ যেন। চেহারায় সেই পাণ্ডুর বিষন্নতা নেই। আজ সে সংকল্পে স্থির এবং প্রত্যয়ে দৃঢ়। গোপালের মনে হলো এ শুধুই কথার ঘটা নয়। এমনকি উচ্ছল আপ্তের চোখেও নাথুরাম তখন অন্য মানুষ হয়ে গেছে। সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে হাঁ করে সেও তাকিয়ে রইল নাথুরামের দিকে।

নাথুরামের কণ্ঠস্বর ধীর, শান্ত। একদিন ভুসোকালির মধ্যে ভাবীকালের অমঙ্গলের ছায়া দেখে যে মানুষটা শিউরে উঠেছিল আজ তার কাছে জীবনের মানেটা অনেক স্পষ্ট হয়ে গেছে। আজ আর জীবনটা স্রেফ অর্থহীন নয়। বরং নাথুরাম যেন সেই ভূমিকাই পালন করতে চলেছে যেখানে মনের অবচেতনায় সে ডাক শুনেছে লাঞ্ছিতা মাতৃভূমির। তিনি দ্বিখণ্ডিতা হয়েছেন, লাঞ্ছিতা হয়েছেন। মাতৃভূমি তাই প্রতিহিংসাপরায়ণা। নাথুরাম সেই ইচ্ছাই পালন করবে। একটা প্রেতমূর্তির মতন সেই ঘোষণাই করলো নাথুরাম। বললো, 'এ কাজটা আমিই করবো।' সবাই স্তব্ধ হয়ে শুনলো তার এই প্রতিজ্ঞার কথা। কেউ জোর করে নি তার ওপর। এটা তার নিজেরই সিদ্ধান্ত। কারণ, 'কেউ জোর করে কাউকে প্রাণ বলি দেওয়াতে পারে না।' (দি স্যাক্রিফাইস অব ওয়ানস্ লাইফ ইজ নট এ ডিসিশন টু বি ইম্‌পোজ্‌ড্)।

একটু চুপ করে সে তার পরিকল্পনার কথা বললো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গান্ধীজীকে হত্যা করে কাজ হাসিল করতে চায় সে। দুজন লোকের সাহায্য চাই তার। নারায়ণ আপ্তের সঙ্গে আর একজন। বিষ্ণু আসুক না এই ত্রিমূর্তি দলে? হিন্দুত্ববাদের ত্রিমূর্তি কল্পনার মতন তারাও অক্ষয় হয়ে থাকুক এইভাবে।

বিষ্ণু কারকারে রাজী! নাথুরাম তাকে তখনই দিল্লি যেতে বললো। দিল্লি পৌঁছে প্রতিদিন দুপুর থেকে সে যেন পুরনো স্টেশনের সামনের জলের কলের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। আপ্তেকে সঙ্গে নিয়ে নাথুরাম যেদিন দিল্লি পৌঁছবে সেদিনই ওরা ওই জায়গায় গিয়ে কারকারের সঙ্গে দেখা করবে।

ইতিমধ্যে আপ্তেকে সঙ্গে নিয়ে সে একটা পিস্তলের সন্ধান করবে। পিস্তলটা খাঁটি হওয়া চাই। যাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই এবং বস্তুটা চট করে লুকিয়ে ফেলা যায়। এরপর সবাইকে শুনিয়ে শক্ত নির্মম স্বরে নাথুরাম বললো, 'সবাইকে দ্রুত কাজ করতে হবে। যা করণীয় তা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। পুলিস গ্রেপ্তার করেছে মদনলালকে। আজ নয় কাল আমরাও ধরা পড়বো। কিন্তু পুলিস আমাদের নাগাল পাবার আগেই গান্ধীকে পেতে হবে আমাদের।'

ওদিকে দিল্লিতে গান্ধীজীর প্রার্থনাসভায় দৃশ্যপটের একটু যেন বদল লক্ষ্য করা গেল ২৫ জানুয়ারির বিকাল থেকে। পকেটে গুলিভরা পিস্তল নিয়ে গান্ধীজীর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নেই ডি.ডব্লু. মেহ্‌রা। গায়ে জ্বর নিয়ে মানুষটা

www.pathagar.com

আবার বিছানায় আশ্রয় নিয়েছে। তার জায়গায় এই দায়িত্ব নিয়ে এসেছে দিল্লির আর একজন পুলিস অফিসার। তার নাম এ.এন. ভাটিয়া। মেহ্‌রার মতন নিখুঁত লক্ষ্যভেধী না হলেও গান্ধীজীর যথেষ্ট পরিচিত সে। তাই এই ঘনিষ্ঠতার সুবাদে ভাটিয়াও তাঁর ছায়াসংগী হয়ে থাকার সুযোগ পেয়েছে।

২৬শে জানুয়ারি ১৯৪৮। গান্ধীজী ও তাঁর দেশবাসীর জীবনে এই দিনটা বিশেষ অর্থবহ। আঠারো বছর আগে ঠিক এই দিনটিতেই (২৬শে জানুয়ারি ১৯৩০) ভারতের প্রতিটি ছোটবড় শহর আর হাজার হাজার গ্রামের কয়েক লক্ষ নারীপুরুষ কংগ্রেস কর্মী, জাতিকে স্বাধীন করার শপথ নিয়েছিল প্রথমবার। সেদিনের সেই শপথবাক্য গান্ধীজী নিজের হাতে লিখেছিলেন। সেই থেকে দেশের প্রতিটি স্বদেশানুরাগী মানুষ এই দিনটাকে স্বাধীনতা দিবসরূপে পালন করে আসছে। সেদিন গান্ধীজীও এই স্বাধীনদেশে আঠারো বছর আগের সেই শপথ অনুষ্ঠানটি উদযাপন করলেন। নেহরুর অনুরোধে আর একটি উপযুক্ত কাজের ভার নিয়েছেন গান্ধীজী। সেদিন থেকেই এই কাজটা হাতে নিলেন তিনি। দেশ স্বাধীন হবার পর কংগ্রেস পার্টির ভূমিকা ও লক্ষ্য কী হবে তা নিয়ে একটা ঘোষণাপত্র বা ম্যানিফেস্টো রচনা করার দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি।

বলতে গেলে সেদিন থেকেই ওই ক্ষীণদুর্বল শরীরের আড়ালে একটা দৃঢ়, বলিষ্ঠ, আত্মপ্রত্যয়ী মন যেন নতুনভাবে টের পেল দেশবাসী। সেদিন থেকেই তিনি শক্ত খাবার খেতে শুরু করেছেন। ভোর হতেই প্রাতর্ভ্রমণ সেরে এসেছেন এই অশীতিপর বৃদ্ধ। এটি তাঁর দীর্ঘদিনের প্রিয় অভ্যাস। অথচ কে বলবে যে সাতদিন আগেই ডাক্তাররা ২৪ ঘণ্টার নোটিশ দিয়েছিলেন তাঁকে। প্রায় মৃত্যুর দোরগোড়া থেকেই ফিরে এসেছেন গান্ধীজী। সকালবেলা লম্বা লম্বা পা ফেলে যখন তিনি বিড়লাবাড়ির লন-এ হাঁটছিলেন, তখন তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল যেন দাঙ্গা বিধ্বস্ত পাঞ্জাবের ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে পাকিস্তান সফরের উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা ভেবেই হাঁটছেন। সেইরকম রোমাঞ্চিত দেখাচ্ছিল তাঁকে।

আগের দিন পাকিস্তান থেকে একজন দর্শনপ্রার্থী এসেছে। লোকটা এসে গান্ধীজীর পাকিস্তান সফরের ছবিটা আরও স্বপ্নময় করে তুলল যেন। বস্তুত, গান্ধীজীর জীবনে এটাই শেষ স্বপ্ন দেখা। বলাবাহুল্য এ এক মহান স্বপ্ন তাঁর। পাকিস্তান থেকে আসা সেই দর্শনপ্রার্থীর কথায় মনে হলো যে ওরা সবাই অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে ওই সম্ভাবনার দিকে। যেন দীর্ঘ ৫০ মাইলের এক মিছিল চলেছে। হিন্দু মুসলমানের মিলিত সেই মিছিল চলেছে পাকিস্তানের দিকে। আর মিছিলের সামনে চলেছেন দণ্ড হাতে অশীতিপর বৃদ্ধ গান্ধীজী।

কি দারুণ সেই সম্ভাবনা! যে শীর্ণকায় মানুষটি দেশকে পথ দেখিয়েছেন তিনিই আবার স্বাধীন ভারতকে পথ দেখাবেন। গান্ধীজী ভাবনেত্রে সেই মহান যাত্রার ছবিটি দেখলেন। হাতে বাঁশের লাঠি নিয়ে তিনি সবার আগে চলেছেন হাইওয়ে দিয়ে। তাঁর পিছনে চলেছে, ছিন্নমূল মানুষের এক সীমাহীন মিছিল। গান্ধীজী ওদের নিয়ে চলেছেন মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু ফিরিয়ে দিতে। কে বলতে পারে যে তিনি সফল হবেন না! আর যদি সফল হন তাহলে ওপার থেকে বাস্তুচ্যুত মুসলমানদেরও তিনি ফিরিয়ে আনবেন এদেশে। ফিরিয়ে দেবেন ওদের কেড়ে নেওয়া ভূমি আর মাথা গোঁজার ঠাঁই। সে এক অসাধারণ জয় হবে তাঁর

www.pathagar.com

অহিংসানীতির। জয় হবে প্রেমের, ভ্রাতৃত্বের। তাঁর জীবনের এক মহান কীর্তি হবে এই ঐতিহাসিক জয়যাত্রা। এই জয় এত বড় মাপের হবে, এত উজ্জ্বল হবে এর মহিমা যে, ম্লান হয়ে যাবে তাঁর সমস্ত পুরনো মিরাক্‌ল্‌। গান্ধীজী স্বপ্ন দেখলেন যেন সত্যই মাপে, মহিমায় হ্রস্ব হয়ে গেছে তাঁর পুরনো সব কৃতিত্ব। সেই সম্ভাবনার কথা মনে করে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন তিনি। মনে মনে প্রার্থনা করলেন যেন করুণাময় ঈশ্বর সেই মহান বিস্ময়টি উপলব্ধি করার মতন শক্তি, সাহস ও সময় তাঁকে দেন। করুণাময় ঈশ্বরের কাছে এর চেয়ে বড় আর কী ভিক্ষা তিনি চাইতে পারেন !

সেদিন প্রাতর্ভ্রমণ থেকে ফিরে এসেই তাঁর চিকিৎসক সুশীলাকে ডেকে পাঠালেন গান্ধীজী। না, কোন চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ নয়। সুশীলাকে তিনি একটা কর্তব্য দিয়ে পাকিস্তান পাঠাতে চান। তাঁর আগামী পাকিস্তান সফরের একটা অঙ্গ এই নিয়োগ। তবে কর্তব্যনিষ্ঠ গান্ধীজী যেমন অন্যদের বেলায় কাজের দায়িত্ব দিয়ে একটা সময়সীমা বেঁধে দেন, এই সুন্দরী ডাক্তারের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হ'ল না। তাকে দিয়ে গান্ধীজী কড়ার করিয়ে নিলেন যে তিন দিনের মধ্যে তাকে পাকিস্তানের কাজ শেষ করে ফিরে আসতে হবে। গান্ধীজীর প্রার্থনা মিছিলের সব আগে থাকেন সুশীলা। এটাই তার নির্দিষ্ট স্থান। অতএব তাঁর ইচ্ছা যে শুক্রবার ৩০শে জানুয়ারি তারিখে বিকালের আগেই কাজ শেষ করে সুশীলা ফিরে আসুক এবং তাঁর সান্ধ্য প্রার্থনাসভায় তার নির্দিষ্ট স্থানটিতে উপস্থিত থাকুক।

এই নিয়ে দশদিনের মধ্যে দ্বিতীয়বার দিল্লি আসছে নাথুরাম ও নারায়ণ আপ্তে। বম্বে থেকে এয়ার ইণ্ডিয়ার ভাইকিং বিমানে পাশাপাশি বসে ওরা আসছে। দুজনেই তন্ময় হয়ে আছে আপন আপন রুচির কাজে। একজন পাঠে মগ্ন। তার হাতে 'হিন্দুত্ববাদ' নিয়ে লেখা বীর সাভারকরের একখানা বই। বইটা আগেও পড়েছে নাথুরাম এবং যতবার পড়েছে ততবারই দারুণ অনুপ্রাণিত হয়েছে। আপ্তের নজর অন্যদিকে। তার নারীদেহলোলুপ নজর তখন গোগ্রাসে গিলছিল আকর্ষণীয় চেহারার ওই বিমানসেবিকার দেহ। হাতে ব্রেকফাস্টের ট্রে নিয়ে ওই যুবতীটি সারা বিমান জুড়ে যেন চরকির মতন স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। আপ্তের নজর তার ওই শরীরটাতেই নিবদ্ধ।

বম্বে শহরে তাদের শেষের দিনটা খুবই অপয়া কেটেছে। গান্ধীজীকে হত্যাচেষ্টার প্রথম দফায় যে বস্তুটি যোগাড় করতে তারা হিমশিম খেয়েছিল এবারও সেই নিষিদ্ধ বস্তুটির খোঁজ করতে গিয়ে তারা নাকালের একশেষ হয়েছে। সারাটা দিন টাকা ও পিস্তলের সন্ধানে এক বন্ধু থেকে আর এক বন্ধুর কাছে মাকুর মতন ছুটে বেড়িয়েছে দুজন। টাকা যথেষ্টই সংগ্রহ হয়েছে। রীতিমত অপর্যাপ্ত টাকা। দশহাজার। কিন্তু একটা পিস্তল জোটানোর প্রতিশ্রুতিও কেউ দিতে পারে নি তাদের।

এদিকে পুলিসের ভয় তখন তাড়া করে ফিরছে তাদের। সুতরাং সব দিক চিন্তা করে তারা স্থির করলো যে পিস্তলের খোঁজে অযথা সময় নষ্ট না করে তারা দিল্লি চলে যাবে। তারপর দিল্লি পেঁৗছে কলোনির বিক্ষুব্ধ উদ্বাস্তুদের মধ্যে খোঁজ করে একটা পিস্তল যোগাড় করে নেবে।

www.pathagar.com

কিন্তু বিমানে উঠে এবং বিমানসেবিকাকে দেখে আপ্তের সমস্ত মনোযোগ লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। মেয়েটা তখন ব্রেকফাস্টের ট্রে তুলে নিচ্ছিল। চোখে চোখে কথা হলো ওদের। তারপর হাতের কাজ শেষ করে মেয়েটা আপ্তের কাছে এল। আপ্তে তাকে ঠারেঠোরে জানিয়ে দিল যে সে হাত দেখতে জানে। শুনেই হাতখানা বাড়িয়ে দিল মেয়েটা। হাতের রেখার দ্বারা ভাগ্যগণনার এমন সুযোগ ক'জন পায়! আপ্তের আসনের হাতলের ওপর ঝুঁকে বসে হাত দেখাতে লাগলো সে। তার অমন ঘনিষ্ঠ হয়ে বসা দেখে পাশের আসনে বসে থাকা নাথুরাম জানলার দিকে সরে বসলো।

দিল্লি পেঁছিবার আগেই মেয়েটাকে বশ মানিয়ে নিল আপ্তে। তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি এমনভাবে এঁকে দিয়েছে সে যে, তার নাগপাশ থেকে মেয়েটার মুক্তি নেই। সুতরাং দিল্লি পেঁছিবার আগেই মেয়েটা কথা দিয়ে গেল যে রাত আটটা নাগাদ রাজধানী শহরের ইমপীরিয়্যাল হোটেলে সে হাজির থাকবে।

উপবাস, অনশনে ক্লিষ্ট গান্ধীজীর দেহমনের সব ভোগান্তি জুড়িয়ে গেল যখন ২৭ জানুয়ারির সকালে দিল্লির শহরতলির মেহেরুলিতে তিনি এসে পেঁছিলেন। কুওউত্-উল-ইসলাম (ইসলামের ক্ষমতা) মসজিদের আঙিনা তখন মানুষে মানুষে ছয়লাপ। অসংখ্য ভক্ত মুসলমান সকালের শীত উপেক্ষা করে এখানে এসে হাজির হয়েছে গান্ধীজীকে দেখতে, তাঁর কথা শুনতে। গান্ধীজী অভিভূত হলেন এই দৃশ্য দেখে। তাঁর মনে হলো আর কোন দৃশ্য দেখে তিনি এত তৃপ্তি পেতেন না।

কুওউত-উল-ইসলাম মসজিদটা ভারতের প্রাচীনতম মসজিদ। ২৭টা হিন্দু ও জৈন মন্দির ভেঙে এই মসজিদ তৈরি করান ভারতের প্রথম মুসলমান সুলতান এবং দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা কুতব্-উদ্দীন-আইবক। প্রতি বছর আইবকের মৃত্যুদিবস উপলক্ষে হাজার হাজার মুসলিম ভক্ত এই মসজিদ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন এবং এর মনোরম গ্রাম্য পরিবেশে ধর্মীয় উৎসব পালন করেন।

তাঁর ঐতিহাসিক অনশন প্রত্যাহারের যে সাতটি শর্ত গান্ধীজী আরোপ করেছিলেন, তার একটা হলো যে মসজিদের এই ধর্মীয় উৎসবটি অবাধে চলতে দিতে হবে। কোনরকম বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে না এই উৎসব পালনের ক্ষেত্রে। নির্ভয়ে সবাই এতে যোগ দেবে। যারা যোগ দিতে আসবে তাদের 'প্রাণভয়' যেন না হয়। সেদিন মসজিদের উৎসব সর্ববিষয়ে সফল। তাই গান্ধীজীও দারুণ খুশী হলেন। তাঁর অনশন যে এমন সাফল্য নিয়ে আসবে তা তিনি ভাবেনও নি।

পনেরো দিন আগেও শহরতলির এই মসজিদে জড়ো হওয়া ইসলাম ভক্তদের ওপর ছুরি, কৃপাণ, তরোয়াল নিয়ে শিখ ও হিন্দু রিফিউজিরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আজ তারাই মসজিদের ফটকের মুখে ফুল আর মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। প্রতিটি মুসলমান ভক্তদের গলায় গাঁদার মালা পরিয়ে দিল তারা। অনেক শিখ কম্পাউন্ডের ভেতরে চা মিঠাইএর দোকান খুলে বিনামূল্যে বিলোচ্ছে সবাইকে। তখন আর মানুষে মানুষে কোন তফাত নেই। হিন্দু, মসুলমান, শিখ মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। এমন অভিনব মিলনমেলায় গান্ধীজী যখন এসে পেঁছিলেন তখন মসজিদের অঙ্গনে থইথই করছে মানুষ। তাঁর দুপাশে দুই যষ্ঠি মনু ও আভার কাঁধে দুহাত রেখে বৃদ্ধ মানুষটি আকুল হয়ে চেয়ে রইলেন ওই বিশাল সমাগমের

www.pathagar.com

দিকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর মনে হলো কেউ হিন্দু, মুসলমান বা শিখ নয়। সবাই মানুষ। এই অসাধারণ সম্প্রীতির ছবিটা দেখে গান্ধীজীর দুচোখে তখন টলটল করছে জল।

মসজিদের মৌলবীরাই কৃতজ্ঞতা জানাতে গান্ধীজীকে ডেকে এনেছেন এখানে। তাঁরা এত খুশী হয়েছেন যে মসজিদের মধ্যে ইসলাম ভক্তদের কাছে হিন্দু গান্ধীজকে কিছু বলতে অনুরোধ করেছেন। এমনকি কঠোর ইসলামিক রীতি লঙ্ঘন করে দুজন মহিলাকে গান্ধীজীর কন্যা পরিচয় দিয়ে মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করার অনুমতিও দিয়েছেন।

গান্ধীজীও এমন বিহ্বল হয়েছেন যেন কথা সরছে না তাঁর। হিন্দু, শিখ, মুসলমান নির্বিশেষে সব সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে হাত জোড় করে একটাই ভিক্ষা চাইলেন। সবাইকে বললেন, 'আপনারা আমায় এই পবিত্র ধর্মস্থানে দাঁড়িয়ে কথা দিন যে এখন থেকে আপনারা সহোদরের মতন পাশাপাশি বাস করবেন।' আরও বললেন, 'আমরা আলাদা হয়ে থাকি বটে কিন্তু সবাই একই গাছের পাতা।' (...বাট উই আর দ্য লীভ্স্ অব দ্য সেম ট্রি)।

বিড়লাবাড়িতে যখন ফিরে এলেন তখন ক্লান্তি আর আবেগে পরিশ্রান্ত গান্ধীজী। সেই অবস্থায় বিশ্রাম নিতে নিতে এক বিষণ্ণ ভাবনার মধ্যে ডুবে গেলেন তিনি। ইদানীং এরকম প্রায়ই হচ্ছে। মদনলালের হাতের বোমার আঘাত থেকে মুক্তি পাবার কথা যখনই মনে হয় তখনই বিচিত্র এক বিষণ্ণতা তাঁকে পেয়ে বসে। কেন এবং কিভাবে বেঁচে গেলেন বারবার সেই কথাই মনে হয়। ডাইরিতে লিখলেন 'এ কি ঈশ্বরের অনুগ্রহ ?' হয়ত তাই। কিন্তু ডাইরিতে আরও লিখলেন, 'আমি প্রস্তুত। যখনই তাঁর ডাক আসুক আমি প্রস্তুত।' আরও লিখলেন, '২রা ফেব্রুয়ারি আমি দিল্লি ছাড়ার কথা বলেছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, বোধহয় যেতে পারবো না। কাল কী ঘটবে তা কেউ বলতে পারে ?'

২৭ জানুয়ারি। দুপুরের পর থেকেই ওল্ড দিল্লি রেল স্টেশনের সামনের গোলবাগানের ভেতরের কলতলার চারপাশে পায়চারি করছিল বিষ্ণু কারকারে। নাথুরামের কথা মতন এই জায়গাতেই তাদের দেখা হবার কথা। হঠাৎ দুজন চেনা মানুষের চেহারা দেখতে পেয়ে উশখুশ করে উঠলো বিষ্ণু। দুই বন্ধু ঘুমিয়ে থাকা রিফিউজিদের ছেঁড়া মাদুর আর যত্রতত্র পড়ে থাকা পায়খানা প্রস্রাব ডিঙিয়ে ওর দিকে আসছে।

দূর থেকে দুজনকেই সম্পূর্ণ হতাশ দেখাচ্ছিল। ঝড়ো কাকের মতন চেহারা হয়েছে দুজনের। দিল্লির রিফিউজি ক্যাম্পের মধ্যে ঢুকে হন্যে কুকুরের মতন ঘুরেও কোন লাভ হয় নি। দুর্গতির ভাঁড়ার হলেও ওই সব রিফিউজি ক্যাম্পে পাঁতি পাঁতি করে খুঁজেও কোন রিভলভার-এর সন্ধান করতে তারা পারে নি। ওখানে যা আছে তা শুধু ঘেন্না আর অবিশ্বাস। একটা করে দিন এখন শুধু ঝরা পাতার মতন বাতিল হয়ে যাচ্ছে। পুলিস ক্রমশ সাবধান হচ্ছে। গান্ধীজীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিখুঁত হচ্ছে। তারা বুঝতে পেরেছে যে তাদের হাতের সময়ও ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। এখনই কোন রিভলভার যোগাড় না হলে ভরাডুবি হবে তাদের ষড়যন্ত্রের।

আর মাত্র একটা জায়গায় তারা খোঁজ করতে পারে। এখান থেকে অনেক দূরে

www.pathagar.com

সেই জায়গা। ১১৪ মাইল দূরের গোয়ালিয়র শহরে অদের যেতে হবে। সেখানেও যদি পিস্তল যোগাড় না হয় তাহলে আর কোন ভবিষ্যত নেই এই ষড়যন্ত্রের। তখন সাভারকর আর দলের লোকজনের কাছে মুখ দেখানোরও জো থাকবে না।

ঠিক ২৪ ঘণ্টা পরে একই জায়গায় কারুকারেকে অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়ে দুই বন্ধু ছুটলো গোয়ালিয়রের লাস্ট ট্রেন ধরতে। সেদিনই রাত আটটায় ইম্পীরিয়্যাল হোটেলে সেই সুন্দরী বিমানসেবিকার শয্যাসংগী হবার কথা আপ্তের। কিন্তু একটা পিস্তলের জন্য ফুসলানো মেয়েটাকে হাতছাড়া করতে হচ্ছে তাকে। গান্ধীজীকে হত্যা করার এই মারণাস্ত্রটা সংগ্রহ করতে এখনই তাকে গোয়ালিয়র যাত্রা করতে হবে। আপ্তে জানে না এই যাত্রায় তাকে কি মহামূল্যবান দাম দিতে হবে। এমন আদরের জীবনটাই বিলিয়ে দিতে হবে শেষমেশ।

২৭ জানুয়ারি। রাত প্রায় বারটা। গোয়ালিয়রের হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার দত্তাত্রেয় পরচুরের ডাক্তারখানায় ঝনঝন শব্দে বেল বেজে উঠলো। ধড়মড় করে উঠে বসলো প্রৌঢ় ডাক্তার। এত রাতে কে জ্বালাতন করতে এল? নিশ্চয় কোন হতভাগী মা। কোলে রুগ্ন বাচ্চা নিয়ে ছুটে এসেছে তার ডিসপেনসারীতে। তাড়াতাড়ি দোর খুলেই অবাক হলো দত্তাত্রেয়। সামনে দাঁড়িয়ে দুই উগ্রমূর্তি যুবক। দত্তাত্রেয় চিনতে পেরেছে যুগল মূর্তিকে। দুই বন্ধু। দুই গোঁড়া হিন্দু যারা তাকেও ছাড়িয়ে গেছে গোঁড়ামিতে। সাড়ে চারমাস আগে এই দত্তাত্রেয়র কাছে বিপ্লবের পাঠ নিয়ে যে মদনলাল পথ খুঁজে নিয়েছিল এবং যে পথের শেষ হলো দিল্লির হাজতখানায় পেঁৗছে, তার কাছেই পিস্তলের জন্য মরিয়া হয়ে ছুটে এসেছে নাথুরাম। আজ দত্তাত্রেয়ই শেষ ভরসা নাথুরামের।

পরের দিন সারাটা বেলা রুগী সেজে দুই বন্ধু ডাক্তারের ডিসপেনসারীতে বসে রইল। তাদের মাথার ওপর দেওয়ালের গায়ে ঝুলছে 'ডাক্তারের গুরুর তেলরঙা ছবি। জীবনভর এই সাধু নাকি শ্বাপদসংকুল বনে বসে তপস্যা করেছে। দত্তাত্রেয়র হিন্দুয়ানার পাঠ এই গুরুর কাছ থেকেই নেওয়া। তাই দুই অসুখী হিন্দু এই মানুষটার কাছেই ছুটে এসেছে রোগের নিদান নিতে। অতএব ডাক্তারের ছাত্ররা যখন বাজার ঘুরে নানারকম গাছগাছড়া সংগ্রহে ব্যস্ত, তখন তার রাজনীতির চেলারা সারা শহর চুঁড়ে পিস্তল সংগ্রহ অভিযানে বেরিয়ে পড়লো। কারণ, নাথুরাম ও আপ্তের দরকার এই পিস্তল নামক ভেষজটি।

অবশেষে যোগাড় হলো এই দুষ্প্রাপ্য ভেষজ। পিস্তলটা সংগে নিয়ে দুই বন্ধু যখন গোয়ালিয়র থেকে দিল্লিগামী ট্রেনে চড়লো তখন রাত দশটা। শেষ হতে চললো এক দীর্ঘ, জটিল যাত্রাপথ। এই দুষ্প্রাপ্য বস্তুটা হাতে পেতে তারা দুবার এই উপমহাদেশের আনাচকানাচ ঘুরে এসেছে। কোথায় না গেছে তারা! ছুটে বেড়িয়েছে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। তছনছ করেছে দিল্লির শরণার্থী শিবির আর বম্বের ঝুপড়ি। ঢুঁ মেরেছে মন্দির, গুরুদ্বার। চষে বেড়িয়েছে ছাপাখানা, ধোবিখানা আর সাভারকর সদন। এখন সাতরাজার ধন এই মানিকটি যত্ন করে নিয়ে চলেছে নাথুরাম। ছেঁড়া ন্যাকড়ায় জড়িয়ে বুকের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে চলেছে এই স্বয়ংক্রিয় বেরেট্টা পিস্তল ৬০৬৮২৪-পি এবং বিশ রাউন্ড গুলি। এবার তার করণীয় কাজ হবে এই স্বয়ংক্রিয় পিস্তলটা ব্যবহারের কায়দা রপ্ত করা।

www.pathagar.com

পিস্তল নিয়ে আপ্তে ও নাথুরাম যখন গোয়ালিয়র স্টেশন থেকে দিল্লিগামী ট্রেনে চড়েছে, ঠিক তখনই ৮০০ মাইল দূরে পুলিসের একজন কর্তাব্যক্তিকে ধীরেসুস্থে পুণা স্টেশনে নামতে দেখা গেল। এই মানুষটার ফাইলের মধ্যে আপ্তে ও নাথুরাম সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য থাকা সত্ত্বেও ওদের শনাক্ত করা কিংবা বিড়লাবাড়ির মধ্যে ওদের অবাঞ্ছিত প্রবেশ রোধ করার কোন ব্যবস্থা সে নেয় নি। তাই ঘুরপথে পুণায় পৌঁছেও ডি.আই.জি., সি.আই.ডি. সাহেবকে কোনরকম ব্যস্ততার তোড়জোড় করতে দেখা গেল না। দিব্যি ধীরেসুস্থে স্টেশনে নামলো ডি.আই.জি. সাহেব। তারপর সরাসরি বাড়ি ফিরে গেল বিশ্রাম নিতে। পুণায় ফিরে এসে নিজের অফিসে যাবার চক্ষুলজ্জাও হলো না তার।

ওল্ড দিল্লি স্টেশনের উল্টোদিকের কলতলার কাছেই কারকারেকে দেখতে পেল দুই বন্ধু, নাথুরাম ও আপ্তে। কথামতন ওখানেই পায়চারি করছিল কারকারে। তাকে দেখেই খুশীতে লাফ দিয়ে উঠলো নাথুরাম। তারপর কারকারের হাত ধরে হিড়হিড় করে আড়ালে টেনে নিয়ে গেল সে। তখন আবেগে কথা জড়িয়ে আসছে নাথুরামের। সেই অবস্থায় কারকারেকে জড়িয়ে ধরে সে বলে উঠলো, 'ওঃ কারকারে! জিনিসটা শেষপর্যন্ত পেয়ে গেছি আমরা।' এই বলে অতি সাবধানে তার পুরনো কোটের ভেতর থেকে ন্যাকড়া জড়ানো বাদামি রঙের পিস্তলটা বের করলো নাথুরাম। তারপর কোন বেআইনি নিষিদ্ধ বস্তু যেমন হাতের তেলোর মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়, তেমনিভাবে লুকানো পিস্তলের চকচকে হাতলটা বন্ধুকে দেখাল সে। কারকারেও স্তম্ভিত। যে বস্তুটা না পেয়ে তারা হতাশ হয়ে গিয়েছিল, সেটার দিকেই তখন বড়বড় চোখে তাকিয়ে রইল কারকারে।

হত্যার হাতিয়ার এখন তাদের করধৃত। ভয়ঙ্কর ওই বস্তুটার দিকে একনজর চেয়েই ওরা উপলব্ধি করতে পারলো কী দারুণ পরিণতির দিকে ছুটে চলেছে তারা। আর উপায় নেই পিছু হটার বা থেমে যাওয়ার। হাতিয়ারটা হাতে নিয়ে তাই তিনমূর্তি পাথরের মতন স্থির, কঠিন হয়ে গেল মুহূর্তে। ওই তিনমূর্তির মধ্যে শেষমেশ জীবিত ছিল মাত্র একজনই। তারই মুখ থেকে সেদিনের অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনা যাক।

"কলতলার পাশে সবাই দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ আপ্তে বললো, 'আর ভুল করবো না আমরা। পিস্তলটা ঠিক মতন কাজ করছে কি না সেটা আগেই যাচাই করে নিতে হবে। কোনরকম অসুবিধা হবে না। আমার সঙ্গে অনেক গুলি আছে।' এই বলে আপ্তে তার কোটের পকেট ফাঁক করে দেখাল। উঁকি দিয়ে দেখলুম, এক পকেট গুলি। তখন ঠিক হলো যে, কোন নির্জন জায়গায় গিয়ে গুলি ছোড়ার পর পিস্তলটা পরখ করে নেওয়া হবে। কিন্তু দিল্লিতে তখন নির্জন জায়গার যথেষ্ট অভাব। সর্বত্রই গিজগিজ করছে রিফিউজি।

"এইভাবে আমরা যখন জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছি তখন নাথুরাম আমাদের রাজা রাও পেশোয়ার গল্প শোনাল। তখন তিনিই মারাঠাদের প্রধান। মোগল সম্রাটদের সঙ্গে প্রায়ই লড়াই করতে হচ্ছে তাঁকে। একটা লড়াই থামছে ত আর একটা এসে পড়ছে ঘাড়ের ওপর। এতগুলো লড়াই করতে টাকার দরকার হয়। অনেক টাকার। কিন্তু খাজাঞ্চিখানায় অত টাকা কোথায়!? তাই ধারের বহরও বেড়ে

www.pathagar.com

যেতে লাগলো রাজা রাও পেশোয়ার।

"গল্পটা শুনিয়ে একটু চুপ করলো নাথুরাম। তারপর বললো, 'এখন আমাদেরও ওই অবস্থা হয়েছে। এই কাজটা সম্পন্ন করতে জনে জনের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছি। কিন্তু কাজটা হয় নি। এবারও যদি না হয় তবে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাবে আমাদের।'

"শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো যেখানে প্রথমবার গুলি ছোঁড়ার পরীক্ষা হয়েছিল সেই বিড়লামন্দিরের পিছনের পাঁদাড়ে গিয়েই এবারও টিপ পরীক্ষা করা হবে। তাই গেলাম। আমরা জানতাম না যে নিশানা করার সময় গান্ধীজী বসে থাকবেন না দাঁড়িয়ে থাকবেন। সুতরাং দুভাবেই গুলির নিশানা করতে হলো আমাদের।

"আপ্তে একটা গাছ বেছে নিল। তারপর গান্ধীজীর বসে থাকা অবস্থায় তাঁর উচ্চতার মাপটা মনে মনে ভেবে, গাছের গায়ে একটা দাগ দিল। এবার নাথুরামের দিকে চেয়ে বললো, 'ধরো এই জায়গাটা তাঁর মাথা এবং বাকিটা তাঁর ধড়। এবার তুমি মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ো।'

"নাথুরাম তখন হাতে পিস্তল নিয়ে বিশ-পঁচিশ ফুট পিছনে সরে এসেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে সে নিশানা করলো। তারপর দাগ লক্ষ্য করে পরপর চারবার গুলি ছুড়লো। নাথুরামের মনে হলো এবার সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি। অব্যর্থ হয়েছে তার নিশানা। ততক্ষণে গাছের দিকে ছুটে গেছে আপ্তে। গাছটার গায়ে গুলির দাগগুলো দেখেই উৎফুল্ল হলো আপ্তে। নাথুরামের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বললো, 'নাথুরাম, একেবারে অব্যর্থ হয়েছে তোমার নিশানা।' "

দিল্লিতে তখন গান্ধীজীর কাজ প্রায় শেষ। চার মাস আগে যখন দিল্লি শহরে এসেছিলেন তখন শহরটা ছিল মৃতদেহ নগরী। এখানে ওখানে পড়ে আছে মানুষের মড়া। চওড়া চওড়া রাস্তার পাশে ডাঁই করা আছে বেওয়ারিশ মড়া। সর্বত্রই থমথম করছে ভয়, আতঙ্ক। এখন অবস্থাটা অন্যরকম। রাজধানী শহর এখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ফিরে এসেছে শৃঙ্খলা। তাঁর অনশন যেন নাটকীয়-ভাবে শহরের নৈতিক পরিবেশ শুদ্ধ করে দিয়েছে। এবার তিনি নিশ্চিন্ত মনে শহর ছাড়তে পারেন।

গান্ধীজী যখন নিশ্চিন্ত মনে দিল্লি ছাড়ার কথা ভাবছেন তখন তাঁরই আততায়ী যে বিড়লামন্দিরের পিছনের পাঁদাড়ে বসে পিস্তলের নিশানা করছিল, গান্ধীজী তা কল্পনাও করতে পারেন নি। যাহক, সব দিক ভেবে স্থির হলো যে গান্ধীজী দিল্লি ছেড়ে প্রথমে ওয়ার্ধা যাবেন ৩রা ফেব্রুয়ারি। তারপর ওয়ার্ধার আশ্রমে দিন দশেক বিশ্রাম নিয়ে পাকিস্তানের উদ্দেশে পদযাত্রা শুরু করবেন। ততদিনে তাঁর বুড়ো পা দুটো দীর্ঘ পদযাত্রার উপযুক্ত হয়ে উঠবে বলেই তাঁর বিশ্বাস। যে পথ দিয়ে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী দেশ গাঁ ছেড়ে পালাবার সময় জবাই হয়েছে, সেই হাইওয়ে দিয়েই দলবল নিয়ে তিনি হাঁটবেন। তাঁর আশা, এই পদ-যাত্রায় মানুষের বিদ্বেষভরা কুটিল মনগুলো ঘুরে যাবে প্রেম ও প্রীতির টানে। এটাই তাঁর সর্বশেষ তীর্থযাত্রা পাকিস্তানের দিকে। শুধু সর্বশেষ নয়। এ হবে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ মিরাক্‌ল্‌। উজ্জ্বল সেই ছবিটাই তখন যেন দূর দিগন্তের ওই খাঁ খাঁ মরুভূমির বুকে মরীচিকার সম্ভাবনা হয়ে তাঁকে হাত নেড়ে ডাকছিল।

গান্ধীজীর সব কাজই নির্দয় নিয়মবন্ধ। কোন অবস্থাতেই তিনি নিয়মের

www.pathagar.com

লঙ্ঘন করেন না। প্রতিটি কাজই ছকবাঁধা নিয়ম মেনে করেন তিনি। সেদিনও এই নৈমিত্তিক কাজের লঙ্ঘন হলো না। প্রথমে চরকায় সুতো কাটলেন। তারপর পেটে কাদার পুলটিশ দিয়ে এনীম্যা নিলেন। এটা শেষ করে খানিকক্ষণ বাংলা লিখলেন। প্রায় ডজনখানেক চিঠি লেখার কাজ ছিল। সেটা শেষ করে কংগ্রেস পার্টির নয়া সংবিধান রচনার কাজ নিয়ে বসলেন। এরই মধ্যে অনেক দর্শনার্থী এসে গেছেন। তাঁদের সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর বোন তারা পণ্ডিতের সঙ্গে রঙ্গপরিহাস করলেন। মার্গারেট বুর্ক হোয়াইট একটা ছবির ওপর তাঁর স্বাক্ষর করিয়ে নিল। সই করার সময় সেই মার্কিন মহিলা সাংবাদিককে আণবিক বোমার বিধ্বংসী শক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন যে, মার্কিন সরকারের উচিত আণবিক বোমা বর্জন করা। আরও বললেন যে আণবিক যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে পৃথিবীর সব কিছু ধ্বংস করলেও তাঁর অহিংস নীতি ধ্বংস করা যাবে না কোনদিন। সুতরাং তেমন দুর্দিন এলে তাঁর অহিংস অনুগামীরা যুগে যুগে 'সম্ভবামি' সেই মহান পুরুষের আবির্ভাব প্রার্থনা করবে নির্ভয়চিত্তে।

কিন্তু হঠাৎ অমন শান্ত আনন্দময় দিনটা যেন এক পশলা আচমকা বর্ষার বৃষ্টির মতন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। সীমান্ত প্রদেশ থেকে একদল শিখ ও হিন্দু উদ্বাস্তু এসেছে গান্ধীজীর দর্শনার্থী হয়ে। যেদিন তিনি অনশনের কথা ঘোষণা করলেন সেদিনই এই উদ্বাস্তুরা সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানের হাতে চরম লাঞ্ছিত হয়। অনেকেই তাদের হাতে জবাই হয়েছে সেদিন। যারা কোনরকমে পালিয়ে এসেছে তাদেরই একটা দল এসেছে গান্ধীজীর কাছে কৈফিয়ত চাইতে। তাদের হেনস্থার কথা শুনে মৌখিক সমবেদনা জানাবার অবকাশও পেলেন না গান্ধীজী। তার আগেই ওই ক্রুদ্ধ মানুষদের একজন তীক্ষ্নস্বরে বলে উঠলো, 'আপনি আমাদের অনেক অশান্তি ঘটিয়েছেন। আপনার জন্যই আজ আমাদের এই দুরবস্থা। এবার অনুগ্রহ করে আমাদের রেহাই দিন। দয়া করে আমাদের ছেড়ে হিমালয়ে গিয়ে সাধনা করুন।'

গান্ধীজী স্তম্ভিত। তাঁর ক্ষীণ শরীরটা এমন তীক্ষ্ন কথার ঘা খেয়ে দুমড়ে কুঁচকে ছোট্ট হয়ে গেল। মনে হলো যেন একটা ভারী বস্তু তাঁর শরীরের ওপর এসে আঘাত করলো। আহত শরীরের এই ভার নিয়ে কেমন করে প্রার্থনাসভায় যাবেন তিনি? সাধারণত হেঁটে চলার সময় মনু ও আভার কাঁধে আলতো ভার দিয়ে তিনি হাঁটেন। তুলোর আঁশের মতন হালকা সেই ছোঁয়া। কিন্তু সেদিন শরীরের সমস্ত ভার ওই দুজনের কাঁধে রেখে ধীরে ধীরে প্রার্থনামঞ্চের ওপর এসে বসলেন। তারপর শ্রোতাদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে শুরু করলেন।

গান্ধীজীর গলার স্বর শান্ত, মিয়নো। প্রতিটি কথার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে একটা দারুণ অভিমান। দেশবাসীর উদ্দেশে ভারতের প্রিয় মহাত্মার শেষ ভাষণ এটি। তখন শীতের বিষণ্ণ বেলা সবে অস্পষ্ট হচ্ছে। সূর্যাস্তের পরে পাতলা আঁধারের একটা চাদর যেন কেউ বিছিয়ে দিয়েছে বাগানের বুকের ওপর। অনিবার্যভাবেই ওই ক্রুদ্ধ উদ্বাস্তুদের প্রসংগ এসে পড়লো তাঁর সেদিনের ভাষণে।

সমবেত জনতাকে শুনিয়ে গান্ধীজী বললেন, 'কাদের কথা শুনবো আমি বলতে পারেন? একদল আমায় এখানে থাকতে বলছেন, আর একদল আমায় এখান থেকে চলে যেতে বলছেন। কেউ আমায় মন্দ বলছেন, আমার নামে অপযশ

www.pathagar.com

ছড়াচ্ছেন। কেউ মাথায় তুলে নাচছেন। আমি তাহলে এখন কি করি?' খানিক থামলেন গান্ধীজী। তারপর কিছুটা অভিমান করে বলে উঠলেন, 'ঈশ্বর যা চান আমি তাই-ই করবো। অশান্তির মধ্যে শান্তির সন্ধান করতে হবে আমায়।' এবার দীর্ঘক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি। তারপর গাঢ় স্বরে বলে উঠলেন, 'আমার হিমালয় এখানেই।' (মাই হিমালয়েজ আর হিয়ার।)

গান্ধীজীর প্রার্থনাসভা শেষ হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই দিল্লির তদন্তকারী পুলিস অফিসার একটা টেলিফোন বার্তা পেলেন। টেলিফোনটা এসেছে কোন দূরবর্তী শহর থেকে। মদনলালের স্বীকারোক্তি আদায় করার পর তদন্ত প্রায় কিছুই এগোয় নি বলতে গেলে। সঞ্জীভীর তখনও অনড় ধারণা যে আততায়ীরা আর ফিরে আসবে না। সুতরাং তদন্তের কাজটা হাতে নেওয়া থেকে যে গড়িমসি চলছিল সেটাই থেকে গেছে সঞ্জীভীর কাজে।

এখন বম্বে থেকে যে তাকে ফোন করেছে তারও নতুন কিছু জানাবার নেই। গান্ধীজীর হত্যাচেষ্টার এই তদন্ত কাজে বম্বের অফিসার জিমি নাগরওয়ালার হাতে প্রথম ৪৮ ঘণ্টা পরে নতুন কোন তথ্যই আদায় হয় নি। তবে তার স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ বিভাগের ওয়াচার্সরা সাভারকর সদনের ওপর তীক্ষ্ন নজর রেখে চলেছে। কারা আসছে যাচ্ছে শুধু সেই খবরই নয়। বাড়ির ভেতরের ওই ধড়িবাজ লোকটার কাজকর্মের একটা হদিস পাবার চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছে তারা। অবশ্য সাভারকর নামে লোকটা যে অত্যন্ত ধূর্ত এবং ক্রুরবুদ্ধির মানুষ তা সবাই জানে। চট করে নিজেকে মেলে দেবার মানুষ সে নয়। কিন্তু তবুও ওয়াচার্সরা বুঝতে পারছিল যে সদনের ভেতরে কোন একটা চক্রান্ত হচ্ছে। কী সে চক্রান্ত তা তারা জানে না। কিন্তু চক্রান্তের একটা তাপ যেন বাইরে থেকেই টের পাচ্ছিল সবাই। ক্রমাগত অনেক মানুষের যাওয়া আসার মধ্যেই ফুটে বেরোচ্ছিল তার লক্ষণ। তাই সবদিক ভেবেই সঞ্জীভীকে টেলিফোন করেছে নাগরওয়ালা। তার ধারণা, একটা কিছু ঘটবে এবং তারই অশুভ ইঙ্গিত সে পাচ্ছে। একটু থেমে তার এই আশংকার কথাটাই সরাসরি বলে ফেললো জিমি নাগরওলা। সঞ্জীভীকে সে বললো, 'কেন বলছি তা জানতে চাইবেন না। তবে আমার ধারণা অপরাধীরা আর একবার চেষ্টা করবে। অন্তত বাতাসে সেই গন্ধই পাচ্ছি।'

নাগরওয়ালার কথাগুলো মন দিয়ে শুনলো সঞ্জীভী। তারপর হঠাৎ বিস্ফোরণ হলো তার। প্রায় ক্ষিপ্ত স্বরে সে বলে উঠলো, 'তা আমায় এখন কি করতে বলেন আপনি?' সঞ্জীভীর বক্তব্য হলো যে নেহরু ও প্যাটেল দুজনেই গান্ধীজীকে বার বার অনুরোধ করেছেন। কিন্তু গান্ধীজী কিছুতেই তাঁর প্রার্থনাসভায় পোশাক পরা পুলিস ঢুকতে দেবেন না। সঞ্জীভী তাই রীতিমত হতাশ। টেলিফোনেই তার রুষ্ট কণ্ঠস্বর শুনতে পেল নাগরওয়ালা। 'গান্ধীজী কি বলেছেন জানেন? প্রেয়ার মিটিংয়ের মধ্যে পোশাকপরা একজন পুলিস দেখলেই তিনি অনশন শুরু করে দেবেন। এখন বলুন কি করতে পারি আমরা?'

সঞ্জীভীর প্রশ্নের জবাবটা রাখা ছিল পুলিসের আর এক কর্তাব্যক্তির দপ্তরে। দিল্লি থেকে ৭০০ মাইল দূরে পুণা শহরের ডি.আই.জি, সি.আই.ডি.ইউ.এইচ, রানার টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে যে খবরটা রাখা ছিল সেটা অন্তত চার দিন আগেই টেলিফোন মারফত সে পেতে পারতো। যখন তার টেবিলে খবরটা এসে পৌঁছেছে

www.pathagar.com

তার ন'দিন আগে মদনলাল প্রথম স্টেটমেন্ট দিয়েছে এবং পুলিসের হাতে মদনলালের স্বাক্ষর করা এজাহার পৌঁছানোর পর আরও পাঁচ দিন কেটে গেছে। এতদিন পরে ওই উচ্চপদস্থ পুলিস অফিসারটি ওই তিন চক্রীর আসল মতলব জানতে পারে। জানতে পারে ছলে বলে কৌশলে বিড়লাবাড়ির হাতার মধ্যে ওদের ঢোকার সংকল্পের কথা।

কিন্তু সব জানার পরেও চুপচাপ বসে রইল পুণার ডি.আই.জি, সাহেব। আপ্তে ও গড়সের চেহারার বিবরণ দিয়ে না করলো দিল্লিতে টেলিফোন না পাঠাল তার। এমনকি বিড়লাবাড়ির ফটকে চৌকিদার ঘাঁটিতে ওদের ছবি পাঠাবার চেষ্টাও করলো না সে। ওদিকে বেআইনি অস্ত্র কারবারী বাড়্গের দোকানেও কোনরকম পুলিস অভিযান হলো না। পুলিসের হাতে তাকে অপদস্থও হতে হলো না। দোকানের পিছনের ঘরে বসে বর্ম সেলাই করে সে সারাটা দিন দিব্যি কাটিয়ে দিল। দিল্লির সঞ্জীভীর মতন পুণার ডি.আই.জি, সাহেবেরও মজ্জাগত সংস্কারের মতন একটা দৃঢ় ধারণা হয়ে গেছে যে ২০ জানুয়ারি তারিখে চক্রান্ত রচয়িতারা অমন শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হবার পর দ্বিতীয়বার তারা এই দুঃসাহসিক কাজে ঝাঁপ দিতে সাহস করবে না। পুণার মতন অমন গোঁড়া হিন্দু শহরের পুলিস প্রধান হয়েও এমন একটা সংস্কার কি করে বদ্ধমূল হলো সেটাই চিন্তার বিষয়। মোটকথা যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটা ডি.আই.জি, সাহেবের টানার মধ্যে রাখা ছিল, সেটা সেখানেই নির্বিবাদে পড়ে রইল। তার আর মুক্তি হলো না।

অভিযান শেষ করে যাদের ফিরে আসার কথা নয়, সেই মূর্তিমান তিন ষড়যন্ত্রী যুবক তখন পুরনো দিল্লির রেল স্টেশনের ৬ নম্বর রিটায়ারিং রুমের মধ্যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। ওরা সবাই নীরবে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। রাস্তা থেকে খোলা জানলা দিয়ে মানুষ আর গাড়ির হল্লা ঝাঁপিয়ে পড়ছে ওদের কানে। ওরা জানে যে কেউ আর বেঁচে ফিরবে না। তাই ওদের চোখ দুটোরও ক্লান্তি নেই। ঠায় তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। গান্ধীজীর জীবনরক্ষার দায় নিয়ে পুলিসকে আর দিন গুনতে হবে না। এখন থেকে ঘণ্টা মিনিট গুনতে পারলেই ওদের দায়মুক্তি হবে। সময়ক্ষণ সবই নির্ধারিত হয়ে আছে এই হত্যাকাণ্ডের। মোহনদাস গান্ধীর হত্যার সময় স্থির হয়েছে বিকাল পাঁচটা পরের দিন, অর্থাৎ শুক্রবার ৩০শে জানুয়ারি তারিখে। সেই একই জায়গায়, বিড়লাবাড়ির বাগানে; যেখানে তাদের প্রথম উদ্যোগ নিষ্ফল হয়ে যায়।

সেই রাতের সব ঘটনা কারকারের দিব্যি মনে আছে : "নাথুরামের ভারী খুশ মেজাজ সেদিন। হালকা ফুরফুরে মন নিয়ে ঘুরছে ফিরছে। রাত সাড়ে আটটা নাগাদ বললো, 'আজই আমাদের শেষ একসঙ্গে খাওয়া। চলো, সবাই মিলে ভালো কিছু খাওয়া দাওয়া করা যাক। আর হয়ত এমন সুযোগ আমরা পাব না।'

"সবাই রাজী। নীচে নেমে প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হাঁটছি একটা ভাল রেস্টোর‍্যান্টের খোঁজে। একটুখানি গিয়েই ব্র্যান্ডনের আমিষ ভোজনালয় চোখে পড়লো। ভারতের সব স্টেশনেই এদের আমিষ রেস্টোর‍্যান্ট আছে। কিন্তু এখানে ঢোকা যাবে না। আপ্তে বললো, 'কারকারে নিরামিষাশী।' নাথুরামও রাজী হলো না ব্র্যান্ডন্ রেস্টোর‍্যান্টে ঢুকতে। আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললো, 'ঠিক কথা।

www.pathagar.com

আজ সবাই একসংেগ খাওয়া-দাওয়া করবো।' এরপর একটা নিরামিষ ভোজনালয়ে গিয়ে পেট পুরে খাওয়া-দাওয়া করলাম। ভাত, চাপাটি, নিরামিষ তরকারি। টক দই ছিল না বলে একজন বয়কে পাঁচ টাকা দিয়ে টক দই আনতে পাঠাল নাথুরাম। খুব তৃপ্তি করে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমরা রিটায়ারিং রুমে ফিরে এলাম। আমাদের ইচ্ছে ছিল রাত জেগে খানিকক্ষণ গল্পগুজব করার। কিন্তু নাথুরাম রাজী হলো না। একলা থাকতে চাইছিল সে। আমরাও তাকে অকারণ জ্বালাতন করলাম না।"

ঘর থেকে বেরোবার আগে শেষবারের মতন নাথুরামের দিকে তাকাল ওরা। পরের দিন যে মানুষটার হাতে গান্ধীজী গুলিবিদ্ধ হবেন, সে তখন হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছে। তার হাতে রয়েছে দিল্লি থেকে আনা স্ট্যানলী গার্ডনারের লেখা পেরী ম্যাসনের ডিটেকটিভ গল্পের বইটা।

গান্ধীজীর জীবনের শেষ সন্ধ্যেটা কংগ্রেস পার্টির খসড়া সংবিধান রচনার কাজে কেটে গেল। প্রার্থনাসভা থেকে ফিরেই এই পাণ্ডুলিপি সংস্কারের মন দিয়েছেন তিনি। অবশেষে অনেক মেহনতের পর কাজটা যখন শেষ করলেন তখন রাত সওয়া ন'টা। বলতে গেলে জাতির কাছে এটাই তাঁর শেষ ইচ্ছাপত্র।

পাণ্ডুলিপিটা গুটিয়ে উঠে দাঁড়ালেন গান্ধীজী। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেল। তাড়াতাড়ি বসে পড়লেন তিনি। কোনরকমে বললেন, 'মাথাটা বড্ড ঘুরছে।' এটুকু বলেই তাঁর প্রিয় শয্যায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়লেন। তাড়াতাড়ি ছুটে এল মনু। তারপর তার কোলের ওপর তাঁর মাথাটা তুলে আস্তে আস্তে তেল মালিশ করে দিতে লাগলো। গান্ধীজীর অতি ঘনিষ্ঠ ক'টি ভক্তদের কাছে ক্ষণিক অবসরের এই মুহূর্তক'টি বড় মধুর। বলতে গেলে ওদের ব্যস্ত দিনগুলোর মধ্যে এই ক'টি মুহূর্ত যেন শান্তির দ্বীপভূমি যেখানে এসে গান্ধীজী আরাম পান। ঘুমতে যাবার আগে এই ঘণ্টাখানেক সময় গান্ধীজী যেন এদেরই প্রিয় বাপু হয়ে যান। তখন তিনি জগৎসংসারের কেউ নন। তখন স্বচ্ছন্দ, আনন্দময় এইসব মুহূর্ত-গুলো সবার সংেগ হালকা হাসিঠাট্টায় কেটে যায় তাঁর।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যতিক্রম সেই রাতটা। গান্ধীজীর মুখে খুশীর কণামাত্র নেই। থমথম করছে সারা মুখখানা। মন থেকে কিছুতেই যেন ওই ক্রুদ্ধ রিফিউজির ঘৃণাভরা মুখখানা মুছে ফেলতে পারছেন না। চুপ করে শুয়ে রইলেন তিনি। তখন তার নরম আঙুলগুলো দিয়ে তাঁর কেশহীন মাথার ত্বকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল মনু। এইভাবে মিনিট দুই-তিন নিঃশব্দে শুয়ে থাকলেন। তারপর ধীরে ধীরে যে বিষয় নিয়ে কথা শুরু করলেন সেটার দিকে সবে তাঁর চোখ পড়েছে। পার্টির সংবিধানখানা নাড়াচাড়া করতে গিয়ে তিনি দেখতে পেয়েছেন যে সারা দেশটা ভরে গেছে দুর্নীতিপরায়ণ মানুষে। সর্বত্রই প্রকট হয়ে পড়েছে অসদাচরণের লক্ষণগুলো। তাঁর লজ্জা যে একদিন তিনি এদেরই নেতা ছিলেন।

খানিক পরে গভীর অভিমানের সংেগ বললেন, 'এমন অবস্থা চলতে থাকলে জগতের সামনে আমরা মুখ দেখাবো কেমন করে? সমস্ত জাতটার শ্রদ্ধা সম্মান নির্ভর করছে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ওপর। তারাই যদি ক্ষমতার অপব্যবহার করে তবে কিছুতেই আমরা শক্ত পায়ে দাঁড়াতে পারবো না।'

www.pathagar.com

কথা ক'টি বলেই আবার ঘোর বিষাদে স্তব্ধ হয়ে গেলেন গান্ধীজী। তারপর যেন অনেক দূর থেকে বিষণ্ণ স্বগতোক্তি শোনা গেল তাঁর। যেন নিজেকে শোনাচ্ছেন এমনভাবে একটা উর্দু বয়েত গুনগুন করে আবৃত্তি করলেন,

দুনিয়ার বাগিচায় বসন্ত যেন ক্ষণিকের অতিথি
যতক্ষণ সে থাকে
আশ মিটিয়ে তার রূপ দেখে নাও।

নাথুরামকে ঘরে রেখে বাইরে এসে দাঁড়াল দুই মূর্তিমান আপ্তে ও কারকারে। দুজনকেই নার্ভাস মনে হচ্ছিল তখন। ওরা একবার নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। তারপর ঠিক করলো যে একটা সিনেমা দেখে সময়টুকু কাটিয়ে দেবে। কারকারের হুবহু মনে আছে সেই রাতের কথা। তার জবানিতেই শোনা যাক্ সে কাহিনী :

"ঘুরতে ঘুরতে প্রথম যে সিনেমা হলটা চোখে পড়লো সেখানেই ঢুকে গেলাম। সেই হাউসে তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাহিনী অবলম্বনে একটা ছবি দেখানো হচ্ছিল। ইনটারভ্যালের সময় আমরা লবিতে দাঁড়িয়ে নিচু স্বরে কথাবার্তা বলছিলাম। নাথুরামের কথাটাই ঘুরে ফিরে এসে গেল আমাদের আলোচনায়। খানিক আগে খাবার টেবিলে বসে নাথুরাম বলেছিল, 'হয় কাল নয় পরশুর মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাবে'।

"আপ্তেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার মনে আছে নাথুরামের কথাটা ?'

'হ্যাঁ, আছে বৈকি।' আপ্তে বললো।

আমি ফের জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন ও কথা বললো নাথুরাম ? ও কি পারবে এত তাড়াতাড়ি সব কাজ শেষ করতে ? কাজটা যে বেশ শক্ত !'

"আমার সংশয় দেখে আপ্তে আরও কাছে এগিয়ে এল। তারপর নিচুস্বরে বললো, 'কেন পারবে না ?' একটু চুপ করে আপ্তে আবার বললো, 'শোন কারকারে। তোমার চেয়ে ওকে আমি অনেক ভাল করে চিনি। আগে ওর সব কথা তোমায় বলি তারপর তোমার মতামত স্থির করো। তোমার হয়ত মনে আছে যে এই মাসের (জানুয়ারি) বিশ তারিখে দিল্লি থেকে পালিয়ে আমরা কানপুরের দিকে যাই। আমরা দুজনেই ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কাটি। কামরায় আমরা শুধু দুজন। অনেক রাত পর্যন্ত গল্পগুজব করে আমরা শুতে যাই। কিন্তু ভাল ঘুম হলো না। ভোরের দিকে একটু তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ ধাক্কা-ধাক্কিতে ঘোর কেটে গেল। তখন ভোর প্রায় ছ'টা। গাড়ি কানপুরের কাছাকাছি এসে গেছে। তাকিয়ে দেখলুম সামনে দাঁড়িয়ে নাথুরাম। ওপরের বাঙ্ক থেকে লাফিয়ে নীচে নেমে এসেছে সে। কি ব্যাপার ? নাথুরাম গম্ভীর মুখে আমার চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার চোখে চোখ রেখে নাথুরাম হঠাৎ বলে উঠলো, 'আপ্তে ভাই, জেগে আছ ? শোন, আমি স্থির করেছি কাজটা আমিই করবো। আমি ছাড়া একাজ আর কেউ করতে পারবে না। যে একাজ করবে তাকে প্রাণের মায়া ত্যাগ করতে হবে। তাই আমিই একা একাজটা করতে চাই।'

"কথাটা বলে আপ্তে আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর খুব নিচু স্বরে, যাতে অন্য কেউ শুনতে না পায়, এমনিভাবে বললো,

www.pathagar.com

সেদিন নাথুরামের ওই কথাগুলো শোনার পর হঠাৎ চোখের সামনে দেখলাম যেন কামরার মেঝের ওপর গান্ধীজীর রক্তাক্ত শরীরটা গড়াগড়ি যাচ্ছে।' একটু চুপ করে আপ্তে বললো, 'নাথুরামের কথার ওপর আমার আস্থা ঠিক অতখানিই।' আপ্তের বিশ্বাসের কথাগুলো শুনতে শুনতে অজান্তে শিউরে উঠলাম আমি।"

শুয়ে থাকা অবস্থায় কাশির হঠাৎ ধমকে গান্ধীজীর ছোট্ট শরীরটা যেন কুঁকড়ে গেল। তাঁর সারা শরীর জুড়ে তখন কাশির বেগ। বেচারা মনু তখন বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখছে শীর্ণ শরীরের কাঁপুনি। গান্ধীজীর জীবনের শেষদিকে এই কষ্টের চিরক্ষণের সঙ্গিনী সে। তাই আজও তার বিষণ্ণ চোখ দুটি জলে ভরে গেল এই বৃদ্ধ মানুষটির কষ্ট দেখে।

হঠাৎ তার মনে পড়লো যে যাবার আগে ডাক্তার সুশীলা নায়ার বাপুর ব্যবহারের জন্য এক বাক্স পেনিসিলিন লজেন্স রেখে গেছে। মনু তাড়াতাড়ি প্যাক খুলে একটা লজেন্স্ নিয়ে এল। কিন্তু বাপুকে লজেন্স্ খেতে বলার সাহস তার নেই। মহাত্মাকে সেবা করার জ্বালা অনেক। কিন্তু বাপু তখনও কেশে চলেছেন দেখে মনু আর থাকতে পারলো না। সাহস করে তাঁকে একটা লজেন্স্ খেতে বললো।

কিন্তু মনুর অনুরোধে গান্ধীজী যে জবাব দিলেন সেটাই আশা করেছিল মনু। কাশির ধমকের মধ্যেই গান্ধীজী তাকে মৃদু তিরস্কারের সুরে বললেন, 'যদি রোগে ভুগে বা সামান্য একটা ফুসকুড়ি থেকেও মরি, তাহলে তোমার প্রথম কর্তব্য হবে ছাদে উঠে চিৎকার করে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া যে আমি একজন জালিয়াত মহাত্মা। তা যদি করতে পার তাহলেই জেনো যে আমার আত্মা, যেখানেই থাকুক, শান্তি পাবে।' (ইফ্ আই ডাই অব ডিজিজ অর ঈভ্‌ন্ এ পিম্প্‌ল্, ইট উইল বি ইওর ডিউটি টু সাউট টু দ্য ওয়ার্লড্ ফ্রম দ্য রুফ্‌টপ্‌স্ দ্যাট আই ওয়াজ এ ফল্‌স্ মহাত্মা। দেন মাই সোল, হোয়েরএভার ইট মে বি, উইল রেস্ট ইন পীস্)।

মেয়েটার মুখের দিকে তখন স্থির চোখে তাকিয়ে আছেন মহাত্মা। তাঁর মা জননী হয়ে, সেবিকা-সঙ্গিনী হয়ে অনেক সংঘাতের অংশীদার হয়েছে এই মেয়েটা। সেই জোরেই গান্ধীজী তার ব্যথিত মুখখানির দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বললেন, 'গত হপ্তার মতন যদি আবার কেউ বোমা ফাটায় কিংবা আমার বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে কেউ যদি গুলি ছোড়ে এবং কোন দীর্ঘশ্বাস না ফেলে যদি রামনাম জপ করতে করতে মরতে পারি, তবেই জানবে যে জাল নই, আমি সত্যিকার মহাত্মা। আর তাতেই আমার দেশের মানুষের যথার্থ কল্যাণ হবে, ইষ্ট হবে।'

সিনেমা দেখে ফিরে এসেছে ওরা। ধীরে ধীরে রিটায়ারিং রুমের ছ'নম্বর ঘরের দোর খুলে ভেতরে উঁকি দিল। ঘরের সব শেষের খাটের ওপর দিব্যি হাত পা ছড়িয়ে নিশ্চিন্ত মনে নাথুরাম ঘুমচ্ছে। দেখে মনে হলো মানুষটার দেহমনে এতটুকু উদ্বেগের চাপ নেই। মাটিতে পড়ে আছে সদ্য শেষ করা গোয়েন্দা কাহিনীর বইটা।

www.pathagar.com

যেন দ্বিতীয়বার ক্রুশবিদ্ধ হলেন যীশু

নিউ দিল্লি, ৩০শে জানুয়ারী ১৯৪৮

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জীবনের শেষ দিনটি শুরু হলো অন্যদিনের মতই। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকার সময় থেকেই দিনযাপনের এই রীতি অভ্যাস করে আসছেন তিনি। কখনও এই রীতির বদল হয় নি। অন্ধকার থাকতেই শয্যাত্যাগ এবং গীতাপাঠ সমাপ্ত করে শুরু হয় এই নিত্যচর্চা। আজ সকালেও রাত থাকতেই শয্যাত্যাগ করলেন তিনি। তাঁর সাঙ্গপাঙ্গোরাও উঠে পড়েছেন তখন। তারপর দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে তৃণশয্যার ওপর পা মুড়ে বসে শ্রীমদ্ভগবদগীতা থেকে আবৃত্তি শুরু করলেন গান্ধীজী। তাঁর জোরালো অথচ স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সবাই মিলে আবৃত্তি করলো সেই সুপরিচিত গীতা শ্লোকটি।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥

যে জন্মায় তার মৃত্যু যেমন নিশ্চিত, তেমনি যে মরে তারও জন্ম নিশ্চিত ; এইজন্য এই অপরিহার্য বিষয়ে শোক করা উচিত নয়। (দেয়ারফোর ওভার দ্য ইনেভিট্যাবল দাউ শুড্স্ট নট গ্রীভ)

প্রার্থনার পর মনু তাঁর হাত ধরে পাশের ঘরখানায় নিয়ে গেল। এটাই তাঁর কাজের ঘর। এই ঘরে বসেই গান্ধীজী লেখাপড়া করেন। পায়ে হেঁটে পাকিস্তান সফরে যাবার স্বপ্ন দেখেছিলেন গান্ধীজী। কিন্তু অন্যের সাহায্য ছাড়া এঘর-ওঘরে যাবার সামর্থ্যও তাঁর নেই। ঘরে এসে পায়াভাঙা টেবিলের সামনে বসলেন গান্ধীজী। এটা তাঁর লেখার টেবিল। তারপর মনুকে বললেন, যেন তাঁর কানের কাছে মন্ত্রোচ্চারণের মতন সে সর্বক্ষণ বলে, 'চরৈবেতি ! চরৈবেতি !' যেন তাঁর ক্লান্তি না আসে। যেন তিনি থেমে না যান।

আগের রাতে যেমন কথা হয়েছিল সেই সকাল সাতটার মধ্যেই ৬ নম্বর রিটায়ারিং রুমে চলে এল কারকারে ও আপ্তে। নাথুরাম তখন ঘুম থেকে সবে উঠেছে। সেদিনের ঘটনার যে বিবরণ কারকারে দিয়েছিল, তা এইরকম।

"হালকা হাসি ঠাট্টায় ঘণ্টা দুই সময় আমরা দিব্যি কাটিয়ে দিলাম। মাঝে মধ্যে চা-কফি খেয়েছি। ঠাট্টা ইয়ারকি করেছি। এরই মধ্যে কখন আমাদের আলোচনা গম্ভীর হয়ে গেছে বুঝতে পারিনি। বলতে কি, একটা ব্যাপার তখনও আমাদের কাছে যথেষ্ট অস্পষ্ট ছিল। আমরা জানতাম যে নাথুরামের হাতেই গান্ধীজী নিহত হবেন। কিন্তু কিভাবে কাজটা করা হবে তা কেউ জানতাম না। আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে বিশ তারিখের ষড়যন্ত্র বানচাল হবার পর গান্ধীজীর নিরাপত্তা ব্যবস্থার খুব কড়াকড়ি হবে। তল্লাশি না করে কাউকে প্রার্থনাসভায় ঢুকতে দেওয়া হবে না। আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢোকার অনেক বাধা থাকবে। সুতরাং মতলব ঠাওরাতেই অনেক সময় কেটে গেল। শেষে নাথুরামই একটা

www.pathagar.com

পরামর্শ দিল। সে বললো যে বাজার থেকে পায়াওলা সেকেলে একটা ক্যামেরা কেনা হ'ক। মাথাঢাকা সেই ক্যামেরার ক্যামেরাম্যান সেজে নাথুরাম প্রার্থনাসভায় ঢুকবে। কালো কাপড়ের হুডের আড়ালে লুকানো থাকবে তার পিস্তলটা। পায়াওলা ক্যামেরা নিয়ে সে সোজা গান্ধীজীর কাছাকাছি চলে যাবে। তারপর মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার ভান করে কালো হুডের আড়াল থেকে গান্ধীজীকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়বে।

"দিব্যি ফন্দি। সবাই রাজী হলাম এক কথায়। তারপর শুরু হলো বাজার ঘুরে সাবেক কালের সেইরকম একটা ক্যামেরার সন্ধান করা। পুরনো দিল্লির বাজারে সেইরকম একটা ক্যামেরার খোঁজ পাওয়া গেল। কিন্তু ক্যামেরার দশা দেখে কারোরই মনঃপূত হলো না। আপ্তেই প্রথম নাকচ করে দিল প্রস্তাবটা। সে বললো যে ব্যস্ত মানুষের ছবি তোলার জন্য আজকাল কেউ হুডওলা ক্যামেরা ব্যবহার করে না। তাছাড়া প্রার্থনাসভায় গিয়ে যারা গান্ধীজীর ছবি তোলে তারা সবাই ছোট বিদেশী ক্যামেরা ব্যবহার করে। সুতরাং আপ্তের এক কথায় বাতিল হয়ে গেল নাথুরামের প্রস্তাব।

"রিটায়ারিং রুমে ফিরে আবার আমরা নতুন মতলবের কথা ভাবতে বসলুম। এবার ঠিক হলো যে বোরকা পরে নাথুরাম প্রেয়ার মিটিংয়ে যাবে। তখন অনেক মুসলিম রমণী বোরকা পরে গান্ধীজীর প্রার্থনাসভায় যোগ দিতে আসতো। স্ত্রীলোক হওয়ার দরুন তারা মঞ্চের কাছাকাছি গিয়ে বসতো। গান্ধীজীরও অনুমোদন ছিল এই ব্যবস্থায়। সুতরাং বোরকা পরে নাথুরাম সহজেই মঞ্চের কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারবে। ব্যাপারটা কল্পনা করে আমরা বেশ উৎসাহিত হলাম। বাজার থেকে বেশ বড়সড় একটা বোরকা কেনা হলো। তারপর বোরকা নিয়ে আবার রিটায়ারিং রুমে ফিরে এলাম সবাই।

"কিন্তু গায়ে বোরকা চাপিয়ে নাথুরাম যেন জড়সড় হয়ে গেল। বোরকার ভাঁজ পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাওয়ায় হাঁটতেই পারছিল না সে। তার আশংকা হলো যে, এইরকম জড়সড় অবস্থায় কিছুতেই পিস্তল বার করতে পারবে না সে। তখন পুলিসের হাতে বামাল ধরা পড়ে যাবে। সুতরাং এই প্রস্তাবটাও নাকচ করে দিতে হল।

"এইভাবে প্রায় সারা সকালটাই নিষ্ফল কেটে গেল আমাদের। হাতে সময়ও বেশি নেই। মাত্র ছ'ঘণ্টা। একটা মতলবও পাকা হলো না তখন পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত আপ্তের প্রস্তাবটাই আমাদের পছন্দ হলো। আপ্তে বললো যে কখনো কখনো সহজ সরল পন্থাই শ্রেষ্ঠ পন্থা হয়। সুতরাং কোন ছদ্মবেশ নয়। সাদামাটা পোশাক পরেই নাথুরাম অকুস্থলে যাবে। তার পরনে থাকবে ধূসর রঙের ফৌজি পোশাক। দেশের অনেক মানুষ তখন এইরকম ফৌজি পোশাক পরতো। দোকানেও তৈরি পোশাক পাওয়া যাচ্ছিল। সুতরাং খানিকটা হতাশ হয়েই আমরা এটা মেনে নিলাম। বাজার থেকে কিনে আনা হলো ঢোলা মিলিটারি শার্ট। প্যান্টের ওপরে এইরকম ঢোলা শার্ট পরায় পিস্তলটাও লুকিয়ে রাখার সুবিধে হলো। কিন্তু বাজার থেকে ফেরার পথে একটা ছেলেমানুষি কাজ করে ফেললাম আমরা। শুধু ছেলেমানুষি নয়। আবেগের বশে যেন একটা ভয়ংকর বোকামি করে ফেললাম আমরা। ক্যামেরার দোকানে ঢুকে আমাদের একটা গ্রুপ ছবি তুলিয়ে ফেললাম।

www.pathagar.com

"ছবি তোলার পর আবার ফিরে এলাম রিটায়ারিং রুমে। রিটায়ারিং রুমে বিশ্রাম নিতে নিতে কাজের ছকটা তৈরি করে ফেললাম আমরা। ঠিক হলো যে বিড়লাবাড়িতে আগে যাবে নাথুরাম। আমরা দুজন পরে যাব। গুলি ছোড়ার সময় আমরা দুজন তার দুপাশে দাঁড়াবো যাতে কেউ তাকে বাধা দিতে না পারে। তাহলে নাথুরামও তার লক্ষ্য ঠিক রাখতে পারবে। ছকটা তৈরির পর আমরা উঠলাম। রিটায়ারিং রুম থেকে এবার আমাদের বিদায় নিতে হবে। নাথুরাম তার পিস্তলটা বের করে সাতটা গুলি ভরে নিল। তারপর গুলি ভরা পিস্তলটা কোমরে গুঁজে আমরা সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

"রিটায়ারিং রুম ছেড়ে দিয়ে আমরা স্টেশনের ওয়েটিংরুমে এসে বসলাম। তখনও যাত্রা করার সময় হয় নি। সুতরাং স্টেশনের নামপরিচয়হীন এই ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করাই সংগত মনে করলাম আমরা। খানিক পরে চীনাবাদাম খাবার শখ হলো নাথুরামের। সামান্য বাসনা এবং তার এই তুচ্ছ সাধটুকু মেটাতে আমাদের মন ব্যগ্র হয়ে উঠলো। যে মানুষটা প্রাণবলি দিতে চলেছে তার কোন সাধই অপূর্ণ রাখতে চাইলাম না আমরা।

"সুতরাং চীনাবাদামের খোঁজে বেরিয়ে পড়লো আপ্তে। কিন্তু তল্লাটে কোথাও চীনাবাদাম নেই। কাজুবাদাম বা অন্য বাদাম আছে কিন্তু চীনাবাদাম পাওয়া গেল না। অথচ নাথুরামের চীনাবাদামই চাই। অতএব আবার অভিযানে বেরোল আপ্তে। একটা বিরাট কাজের দায়িত্ব নিয়েছে নাথুরাম। এ অবস্থায় তার মনোভংগ করতে চাইলাম না কেউ। যাহক, শেষমেশ পাওয়া গেল চীনাবাদাম। খানিক পরেই ঠোঙাভর্তি চীনাবাদাম নিয়ে ফিরে এল আপ্তে। বাদামের ঠোঙা হাতে পেয়ে নাথুরামও ভারী খুশী। খোসা ছাড়িয়ে একটার পর একটা বাদাম মুখে পুরতে লাগলো সে।

নাথুরামের বাদাম খাওয়া শেষ না হতেই আমরা উঠে দাঁড়ালাম। এবার যাত্রা করার সময় হয়েছে। আমরা স্থির করেছি যে আগে মন্দিরে গিয়ে দেবদর্শন করবো। কিন্তু দেবদর্শনে নাথুরামের কোন আগ্রহ নেই। মন্দিরের পিছনের ঝোপঝাড় পাঁদাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে সে আমাদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। আমরা দুজনে জুতো খুলে মন্দিরে ঢুকলাম। ঘন্টা বাজিয়ে আমাদের আগমন জানালাম। তারপর লক্ষ্মীনারায়ণের বিগ্রহ প্রণাম করে গেলাম কালী মন্দিরে। সেখানেও সাষ্টাংগ হয়ে প্রণাম করলাম। দেবীমূর্তির পায়ে প্রণামী দিলাম। আমাদের হাতে ফুল ও যমুনার জল দিলেন পূজারী। পূজার ফুল দেবীর পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিলাম। তারপর চোখের ওপর পবিত্র অমৃতবারি ছুঁইয়ে প্রার্থনা করলাম যেন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

"মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম নাথুরাম অপেক্ষা করছে। সে দাঁড়িয়ে আছে বাগানের শিবাজী মূর্তির তলায়। আমাদের দেখে ব্যংগ করে বললো, 'কি, দর্শন হলো?' আমরা বললুম, 'হ্যাঁ।' এবার সে আমাদের দিকে এক পলক তাকিয়ে দেখলো। তারপর বললো, 'আমারও দর্শন হলো।' তারপর হাত তুলে শিবাজীর মূর্তিটা দেখালো।"

নাথুরামের আরাধ্য দেবতা মন্দিরের বিগ্রহ নন। ধূপধুনা বা যূঁই বেল সুবাসিত নিত্য পূজার্চিত কোন দেবদেবী তিনি নন। তার আরাধ্য দেবতা

www.pathagar.com

অন্যজন। মন্দিরের পিছনের বাগানে উঁচু বেদির ওপর প্রতিষ্ঠিত বীর শিবাজীর ওই সুবিশাল পাথরের মূর্তিটাই তার আরাধ্য। পুণার পশ্চিমঘাট পর্বতমালার কন্দর থেকে আচম্বিতে বেরিয়ে যে বীর যোদ্ধা মারাঠা থেকে মোগল আততায়ীদের বারবার খেদিয়ে দিয়েছিল, সেই বীর শিবাজীই তার আরাধ্য। এক অখণ্ড হিন্দুরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন একদিন যাঁর চোখে ভাস্বর হয়েছিল, সেই বীর শিবাজীর স্বপ্ন সফল করতেই যেন নাথুরাম এই নির্মম হত্যাকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। আর মাত্র ঘণ্টাখানেক সময় বাকী আছে। তারপরেই এমন এক নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড তাকে সম্পন্ন করতে হবে যা শুনে সারা দুনিয়া ভয়ে শিউরে উঠবে।

তিনমূর্তি খানিকক্ষণ পায়চারি করলো বিড়লাবাড়ির বাগানে। একটু পরে হাতঘড়ির দিকে চেয়ে আপ্তে বললো, 'সাড়ে চারটে বেজেছে।' নাথুরামও তাকাল আপ্তের হাতঘড়ির দিকে। তারপর চাইলো দুই ঘনিষ্ঠ সহচরের দিকে। খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল সে ওদের দিকে। তারপর দুহাত জোড়া করে বললো, 'নমস্কার।' তখন তিনজনই নিঃশব্দ। একটু পরে ভারী গলায় নাথুরাম বললো, 'আর কখনও আমরা একত্র হতে পারবো কিনা জানি না।' কথাটা বলে সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে নামতে শুরু করলো নাথুরাম। কারকারে যেন অভিভূত। ঠায় চেয়ে রইল নাথুরামের চলে যাওয়া চেহারাটার দিকে। তার দুচোখে তখন তিরতির করছে শ্রদ্ধা। নাথুরামকে অনুসরণ করে চলেছে সেই নীরব শ্রদ্ধা। মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে নেমে পথের ভিড়ের মধ্যে মিশে একটা টঙ্গা ডাকলো নাথুরাম। তারপর কোনদিকে না চেয়ে টঙ্গায় চেপে বিড়লাবাড়ির দিকে যাত্রা করলো।

শুক্রবার, ৩০শে জানুয়ারি। সকাল থেকেই মহাত্মা গান্ধী যেন অক্ষরে অক্ষরে কর্মযোগ পালন করে চললেন। সর্বক্ষণ মনু তাঁর কানের কাছে বীজমন্ত্র আবৃত্তি করে চলেছে 'আরাম নয়। নিয়তং কুরু কর্ম।' গান্ধীজীর সাঙ্গোপাঙ্গরা আজ সবাই পুলকিত। তাঁর অনশনের পর এই প্রথম কারও সাহায্য না নিয়ে তিনি পায়ে হেঁটে বেড়ালেন। আজ তাঁর ওজনও নেওয়া হয়েছে। আধ পাউণ্ড ওজন বেড়েছে। তার মানে, শরীরে কিছুটা বলবৃদ্ধি হয়েছে। গান্ধীজীরও ভাল লাগলো এই শক্তিবৃদ্ধির কথা শুনে। তাঁর মনে হলো ঈশ্বর বোধহয় তাঁকে দিয়ে আরও কিছু কাজ করিয়ে নিতে চান।

দুপুরের বিশ্রামের পর প্রায় ডজনখানেক সাক্ষাৎপ্রার্থীর সঙ্গে মোলাকাত করলেন গান্ধীজী। এদের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন মানুষটি এলেন সবশেষে। গান্ধীজীর বিশ্বস্ত অনুগামীদের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো এবং আস্থাভাজন এই মানুষটি তখন ভারতের রাজনীতিতে লৌহমানব বলে পরিচিত। বলা যেতে পারে যে বিংশ শতাব্দীর এই স্বল্পভাষী মোগলটি ইতিমধ্যেই গান্ধীজীর কংগ্রেস দলের ছাঁচটি বদলে দিয়েছেন। তাই অনিবার্যভাবেই কঠিন বাস্তববাদী সরদার বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে বৈশাখের মেঘের মতন উদ্ভ্রান্ত সমাজবাদী নেহরুর আদর্শগত সংঘাতটি এমন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। গান্ধীজীর লেখার ওই ছোট্ট চৌকির ওপর পড়ে আছে সরদারের ইস্তফা দেওয়া চিঠিটা। নেহরুর মন্ত্রিপরিষদ থেকে ইস্তফা দেওয়া এই চিঠিটা নিয়ে অনশনের আগেই গভর্নর-জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে তাঁর একপ্রস্থ আলোচনা হয়ে গেছে। গভর্নর-জেনারেল তখনই তাঁকে (গান্ধীজী) অনুরোধ করেছিলেন যেন কিছুতেই প্যাটেলের ইস্তফা-

www.pathagar.com

পত্র গ্রহণ করা না হয়। গান্ধীজীকে সতর্ক ক[illegible] মাউন্টব্যাটেন বলেছিলেন, 'আপনি প্যাটেলকে ছেড়ে দিতে পারেন না। [illegible]রুকেও নয়। দেশ এখন দুজনকেই চায়। তাই দুজনেরই একসঙ্গে কাজ করতে শেখা দরকার।'

গান্ধীজীরও সেই মত। সরদার প্যাটেলকেও সেই কথাটা বুঝিয়ে বললেন তিনি। আরও বললেন যে প্রয়োজন হলে তাঁরা তিনজনেই একত্র বসে সব মতপার্থক্য দূর করে নেবেন যেমনটি স্বাধীন হবার আগে তাঁরা করতেন।

আলোচনার মধ্যেই আভা তাঁর সন্ধ্যার খাবার নিয়ে এল। ছাগলদুধ, কমলালেবু আর ভেজিটেব্‌ল্‌ সুপ। ক্ষুন্নিবৃত্তির এই যৎসামান্য আহারপর্ব মিটলে গান্ধীজী তাঁর প্রিয় চরকাটা আনিয়ে নিলেন। তারপর সরদার প্যাটেলের সঙ্গে উৎসাহদীপ্ত আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে ঘড়ঘড় শব্দে চালাতে লাগলেন সাবেককালের এই সুতোকাটা যন্ত্রটা। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের কাছে এই চরকাই তাঁকে চিনিয়ে দিয়েছে। তাই জীবনের শেষ দিনটাতেও কর্মচ্যুত হলেন না গান্ধীজী। বিনা মেহনতের রুটি যে চুরি করা রুটি এই নৈতিক নির্দেশটা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে মেনে নিয়েছিলেন তিনি।

যে ঘরে বসে গান্ধীজী চরকা চালাচ্ছিলেন তারই অদূরে বিড়লাবাগানের মধ্যে তখন পায়চারি করছিল তাঁর আততায়ীরা। নাথুরামের এখানে পৌঁছানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অন্য দুজনও চলে এসেছিল এখানে।

কারকারের মুখ থেকেই সেদিনের ঘটনা শোনা যাক। প্রধান ফটকের কাছে পৌঁছে আমরা দারুণ নিশ্চিন্ত হলাম। মনে হলো ভেতরে ঢোকার কোন সমস্যাই নেই। পাহারার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে বটে, কিন্তু যারা আসছে তাদের কেউ সার্চ করছে না। আমরা সত্যিই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মনে হলো নাথুরাম নিশ্চয়ই নিরাপদে পৌঁছে গেছে। আমরাও ভেতরে ঢুকলাম বিনা বাধায়। খানিক দূর গিয়েই নাথুরামকে দেখলাম। ভিড়ের সঙ্গে দিব্যি মিশে গেছে। মনে হলো না ওর মনে কোনরকম চাপ আছে। ও আমাদের দেখলেও কোন কথাবার্তা হলো না আমাদের মধ্যে। পাঁচটা বাজার একটু আগে থেকেই বাগানের ভেতরে ছড়িয়ে থাকা মানুষ কাছাকাছি জড়ো হতে লাগলো। ততক্ষণে আমরা দুজনেও নাথুরামের দুপাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছি। আমরা কেউ কারো দিকে তাকালাম না। কথাবার্তাও বলার চেষ্টা করলাম না। নাথুরামও যেন নিজের মধ্যেই মশগুল হয়ে আছে। আমরা যে ওর দুপাশে দাঁড়িয়ে আছি তা যেন ওর খেয়ালও নেই।

"আমাদের প্ল্যান ছিল যে গান্ধীজী যখন মঞ্চের ওপর বসে জনতার দিকে তাকাবেন তখনই তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হবে। সেটা করার জন্য আমরা ভিড়ের বাইরে একটু ডানদিক ঘেঁষে সরে দাঁড়ালাম। সেখান থেকে মঞ্চের দূরত্ব প্রায় পঁয়ত্রিশ ফুট। মনে মনে দূরত্ব মেপে আমার কেমন ভয়ভয় করতে লাগলো। এতটা দূরত্ব থেকে লক্ষ্য ঠিক রাখতে পারবে তো নাথুরাম? সে মোটেই অভিজ্ঞ বন্দুকবাজ নয়। লক্ষ্যও তার অব্যর্থ নয়। যদি সে নার্ভাস হয়ে যায়? যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়? খুব সবল স্নায়ুর মানুষ সে নয়। আড়চোখে নাথুরামের দিকে তাকালাম। দেখলাম সামনের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে সে। তাকে বেশ শান্ত মনে হচ্ছিল তখন। যেন নিজের মধ্যেই ডুবে আছে। আমার হাতঘড়ির

www.pathagar.com

দিকে তাকালাম এবার। গান্ধীজীর আসতে দেরি হচ্ছে আজ। কেন? আমার বুক দুড়দুড় করতে লাগলো। কেমন যেন নার্ভাস হয়ে গেলাম আমি।”

এদিকে মনু ও আভাও সমান বিচলিত। ঘনঘন হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে দুজনে। পাঁচটা বেজে দশ মিনিট হয়ে গেছে। কিন্তু গান্ধীজীর হুঁশ নেই। যে বিনয়নম্র ভদ্র মানুষটি ডিক্টেটরের মতন তাদের সময়জ্ঞান শিখিয়ে এসেছেন এতকাল, কাজের দায়িত্ব হাতে নিয়ে ফুরসত খোঁজার বাহানা করাটা যিনি চিরকাল ঘৃণা করেছেন, সেই সময়নিষ্ঠ মানুষটিই জীবনের শেষ দিনটিতে সমস্ত হিসাব যেন গরমিল করে দিলেন। সরদার প্যাটেলের সঙ্গে গুরুগম্ভীর আলোচনায় এতই মজে রইলেন যে প্রার্থনাসভায় আসতেও দশ মিনিট দেরি করে ফেললেন তিনি। ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে তখন উত্তেজনায় ছটফট করছিল মনু ও আভা। দুজনের আলাপের চেহারা দেখে কিছুতেই ভরসা করে সময়ের কথাটা পাড়তে পারছিল না কেউ। শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি করলো মনু। গান্ধীজী তাকাতেই তার হাতঘড়ির দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। এবার গান্ধীজীর হুঁশ হলো। তাড়াতাড়ি তাঁর ট্যাঁকঘড়ি বের করলেন। তারপর ঘড়ির দিকে চেয়েই প্রায় লাফিয়ে উঠলেন বিছানা থেকে। হঠাৎ এমনভাবে লাফিয়ে ওঠায় সরদার প্যাটেলও অবাক। গান্ধীজীর মুখের দিকে তাকাতেই ব্যস্ত গান্ধীজী বলে উঠলেন, ‘আর ত দেরি করা যায় না! এবার আমায় ছেড়ে দিতেই হবে। ভগবানের সভায় যাবার ডাক পড়েছে আমার!’

এই বলে কোনদিকে না তাকিয়ে প্রার্থনামঞ্চের দিকে হাঁটতে শুরু করে দিলেন গান্ধীজী। তাঁর পিছনে চলেছে অনুগামীদের ছোট্ট দলটি। আজ এই দলে দুজন মানুষ নেই। ডাক্তার সুশীলা নায়ার তখনও পাকিস্তান থেকে ফেরে নি। আর নেই সেই পুলিস অফিসারটি যে অসুস্থ মেহরার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। একটা জরুরী মিটিং করতে সে পুরনো দিল্লি গেছে। পরের দিন ধাঙড়, ঝাড়ুদারদের ধর্মঘটের মোকাবিলা করতে ডাকা হয়েছে এই মিটিং।

যাত্রার আগে মনু রোজ যা করে আজও তাই করলো। প্রথমেই তাঁর পিকদানিটা গুছিয়ে রাখলো। নোট বইটা হাতে নিয়ে দেখে নিল যে সেদিনের ভাষণের মূল অংশটা লেখা আছে কিনা। তারপর আভাকে সঙ্গে নিয়ে গান্ধীজীর দুপাশে দাঁড়ালো। তাঁর শীর্ণ হাতদুটি দুই সহচরীর কাঁধে রাখলেন গান্ধীজী। তারপর এই দুই যষ্ঠির কাঁধে ভর দিয়ে তিনি চলতে শুরু করলেন প্রার্থনামঞ্চের দিকে।

ইতিমধ্যেই অনেক দেরি করে ফেলেছেন গান্ধীজী। তাই বিড়লাবাড়ির কুঞ্জকাননের পথটুকু সংক্ষেপ করতে বোগেনভিলা ঝোপের চারপাশ দিয়ে না ঘুরে, আড়াআড়ি পেরিয়ে এলেন বাগানটা। তখন সারাক্ষণই মেয়েদুটোকে দেরির জন্য বকাবকি করছেন। ‘কেন আমায় জানাও নি ঠিক সময়ে? তোমরাই আমার ঘড়ি। জানো তো যে একমিনিট দেরিও আমি সইতে পারি না!’

প্রার্থনাসভার উঁচু জমিতে উঠতে আর চারটি সিঁড়ির ধাপ বাকী আছে। গান্ধীজী তখনও মেয়েদুটোকে ধমক দিয়ে চলেছেন। অস্তগামী সূর্যের বাদামী রঙের মাথাটা তখনো উঁকি দিচ্ছে পশ্চিম আকাশে। বেলেপাথরের সিঁড়ির ধাপ ক'টি সবাইকে নমস্কার করতে করতে একাই উঠলেন। তাঁকে দেখেই জনতার মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জন উঠলো। কারকারের পিছনে জনতার গুঞ্জন. আর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন গান্ধীজী হাতজোড় করে। তাঁর দুপাশে দুই যষ্ঠি মনু ও আভা।

www.pathagar.com

গান্ধীজীকে দেখেই জনতার ভিড়ে একটু দোলা উঠলো। সবাই বিড়বিড় করে বলে উঠলো, বাপুজী, বাপুজী!

এর পরের ঘটনা স্মৃতি থেকে বললো কার্কারে :

“ওই গুঞ্জন শুনেই আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। ঘুরে দাঁড়াল নাথুরামও। তবে সবটা নয়। ডানদিকে আধখানা ঘুরে দাঁড়াল সে। হঠাৎ দেখলাম যে দাঁড়িয়ে থাকা জনতা যেন মাঝখান দিয়ে চিরে দুফাঁক হয়ে গেল। আর সেই ফাঁকের ভেতর দিয়ে হেঁটে আসছেন গান্ধীজী। নাথুরামের দিকে তাকালাম। তার হাতদুটো পকেটের মধ্যে ঢোকানো। এরপর একটা হাত বের করে নিল সে। পিস্তলধরা অন্য হাতটা পকেটের মধ্যে রেখে পিস্তলের সেফ্টি ক্যাচটা খুলে দিল।

“ততক্ষণে ঝটিতি মনে মনে হিসাব করে নিয়েছে নাথুরাম। তার মনে হলো যে গান্ধীজীকে হত্যা করার এটাই উপযুক্ত সময়। সে বুঝতে পারলো যে তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। তাই ঠিক এমনি অবস্থায় গান্ধীজীকে সামনাসামনি পেয়ে গেল সে। তিনি যদি প্রার্থনামঞ্চে বসে পড়তেন, তাহলে রীতিমত কঠিন হ'ত তার কাজ। আর মাত্র দুপা এগোলেই গান্ধীজীকে ঘিরে থাকা মানুষের তৈরি ওই ছোট্ট বেড়ার মুখে পৌঁছে যাবে সে। মাত্র দুপা, অর্থাৎ তিন সেকেন্ড। তারপরই হত্যার কাজটা যান্ত্রিক হয়ে যাবে। এখন যা দরকার তা হলো নিজেকে উদ্বুদ্ধ করার মানসিকতা। এক পা এগিয়ে যাবার সেই দুর্মর মানসিকতা তৈরি করলেই হত্যার কাজটা অনিবার্য হয়ে যাবে।”

নাথুরামকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে দেখেছিল মনু। ‘খাঁকি পোশাক পরা একজন মজবুত চেহারার যুবক পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে।’ দুপাশে সরে যাওয়া জনতার মধ্যের ফাঁকা পথটার কিনারা পর্যন্ত তখন নাথুরাম এসে গেছে। ওই ফাঁকটুকু দিয়েই সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে গান্ধীজীও হেঁটে আসছিলেন।

কারকারের চোখের দৃষ্টি তখন প্রায় গেঁথে আছে নাথুরামের ওপর। সে দেখলো যে গান্ধীজী মুখোমুখি হতেই পকেট থেকে পিস্তলটা বার করে তার দুহাতের তালুর মধ্যে লুকিয়ে রাখলো নাথুরাম। তখন গান্ধীজী আর নাথুরামের মধ্যে ব্যবধান মাত্র তিন পা। হাতের মধ্যে লুকিয়ে রাখা পিস্তলটা নিয়ে নাথুরাম নিচু হয়ে তাঁকে প্রণাম করতে উদ্যত হলো। হাতজোড়া অবস্থায় শান্ত স্বরে বললো, ‘নমস্তে গান্ধীজী।’

মনু ভেবেছিল যে খাঁকি পোশাক পরা যুবকটি বোধহয় নিচু হয়ে গান্ধীজীর পদচুম্বন করবে। তাই তাড়াতাড়ি ডান হাত বাড়িয়ে তাকে নিরস্ত করতে গেল। শান্তভাবে বললো, ‘ভাইসাব, গান্ধীজীর দশ মিনিট দেরি হয়ে গেছে।’ কিন্তু তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই নাথুরামের বাঁ হাতটা সজোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল মনুকে। তখন তার ডান হাতের মধ্যে চকচক করছে কালো রঙের পিস্তল। মনুর দুচোখ তখন বিস্ফারিত। কিন্তু সে কিছু বোঝার আগেই নাথুরামের পিস্তল গর্জন করে উঠলো। পরপর তিনবার ট্রিগার টিপে গুলি ছুড়লো নাথুরাম। দুম দুম দুম। সমস্ত প্রার্থনাসভার শান্ত স্তব্ধ পরিবেশ, গুলিরা নির্মম শব্দে থরথর করে কেঁপে উঠলো যেন। এবার আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি নাথুরাম গড়্সে। জোড়হাতে এগিয়ে আসা গান্ধীজীর শীর্ণ বুকখানা ঝাঁঝরা করে দিয়েছে সব ক'টা গুলি।

www.pathagar.com

নাথুরামের বাঁ হাতের নির্মম ঝাপটা খেয়ে মনুর হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল পিকদানি আর নোটবইটা [illegible] হয়ে সেগুলো যখন হাতড়ে তোলার চেষ্টা করছে তখনই গুলির শব্দ শুনলো সে। তাড়াতাড়ি মুখ তুলে তাকাল মনু। যা দেখলো স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার মনে হলো গান্ধীজী যেন মঞ্চের দিকে সিঁড়ির শেষ ধাপটা ওঠবার চেষ্টা করছেন। তাঁর নগ্ন বুক বেয়ে ঝরঝর করে রক্ত ঝরে পড়ছে। দেখতে দেখতে সাদা খাদির ধুতিখানা লাল টকটকে হয়ে গেল। গান্ধীজী তখন হাঁ করে নিশ্বাস নেবার চেষ্টা করছেন। সেই অবস্থাতেই কোনরকমে শেষ কথাটি বলে উঠলেন, 'হে রাম—হা ঈশ্বর!' তারপর একটা শুকনো ফসলের আঁটির মতন ধীরে ধীরে নেতিয়ে পড়লেন মনুর পাশে। তখনও তাঁর হাতদুটি তেমনি জোড়া। যেন শেষ নমস্কার জানাচ্ছেন তাঁর হত্যাকারীকে। রক্তমাখা তাঁর ধুতির পাশটিতেই তখন গড়িয়ে পড়েছে তাঁর অতি প্রিয় ট্যাঁকঘড়িটা। আট সিলিং দাম দিয়ে কেনা এই প্রিয় ইন্‌গারসল্‌ ঘড়িটাই মাস দশেক আগে হারিয়ে যাওয়ায় দারুণ কষ্ট পেয়েছিলেন তিনি। স্তম্ভিত মনু দেখলো ঘড়িটা টিকটিক করে ঠিক চলছে। পাঁচটা বেজে সতেরো মিনিট তখন।

*　　　*　　　*

ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন মাউন্টব্যাটেন। লাটভবনে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই এ.ডি.সি.র মুখ থেকে গান্ধীজীর গুলিবিদ্ধ হবার কথা শুনলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে নেমে পড়লেন। তারপর এ.ডি.সি.কে প্রথমেই যে প্রশ্নটা করলেন সেটাই তখন কোটি কোটি ভারতবাসীর প্রথম জিজ্ঞাসা। 'কে করলো এমন কাজ?' বাস্তবিক এই প্রশ্নের সদুত্তর কেউ জানতো না। এ.ডি.সি.ও নয়। তাই সসম্ভ্রমে মাথা নেড়ে সে বললো, 'আমরা জানি না স্যর।' জবাব শুনে একমুহূর্তও দাঁড়ালেন না মাউন্টব্যাটেন। তাড়াতাড়ি ছুটলেন পোশাক বদলাতে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই পোশাক বদল করে ফিরে এলেন। তারপর প্রেস এ্যাটাশে এ্যালান ক্যাম্পবেল জন্‌সনের সন্ধান করে ছুটলেন বিড়লাবাড়ির দিকে।

জন্‌সনকে নিয়ে মাউন্টব্যাটেন যখন বিড়লাবাড়িতে পৌঁছলেন, তখন সারা দিল্লি শহরের মানুষ ভেঙ্গে পড়েছে বিড়লাবাড়ির কম্পাউন্ডে। সর্বত্রই থইথই করছে মানুষ। রীতিমত ধস্তাধস্তি করে গান্ধীজীর বাসভবনের দিকে এগোতে হ'ল তাঁদের। তখনই মাউন্টব্যাটেনের কানে গেল সেই বীভৎস চিৎকারটা। রাগে ঘেন্নায় বিকৃত মুখের একটা লোক তখন উন্মত্ত স্বরে চেঁচিয়ে বলছিল, 'আমি জানি একাজ যে করেছে সে একজন মুসলমান।'

লোকটার কথা শুনেই ঘুরে দাঁড়ালেন মাউন্টব্যাটেন। তারপর গলায় যত শক্তি আছে তা দিয়ে হেঁকে উঠলেন, 'ইউ ফুল! কে বললে সে মুসলমান। সে একজন হিন্দু!' ভিড়ের মধ্যে যেটুকু শোরগোল উঠেছিল মাউন্টব্যাটেনের কথায় তা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ততক্ষণে ভিড় ঠেলে মাউন্টব্যাটেন পৌঁছে গেছেন গান্ধীজীর কোয়ার্টারে। খানিক পরে একটু নিরিবিলি পেয়ে মাউন্টব্যাটেনকে জিজ্ঞেস করলো এ্যালান জনসন, 'কি করে জানলেন যে সে হিন্দু?'

এ্যালান জনসনের মুখের দিকে চেয়ে মাউন্টব্যাটেন বললেন, 'আমি ত জানি না!'

'তবে যে বললেন?'

www.pathagar.com

মাউন্টব্যাটেন একটুও না ভেবে বলে উঠলেন, 'না বললে সারা দেশ জুড়ে নৃশংস দাঙ্গা শুরু হয়ে যেত। এমন দাঙ্গা যার নজির নেই কোথাও।'

বস্তুত, মাউন্টব্যাটেনের এই দুর্ভাবনাটাই তখন যেন হাজার হাজার দায়িত্বপূর্ণ মানুষের মনে উদ্‌বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘটনাচক্রে গান্ধীজীর হত্যাকারী যদি একজন মুসলমান হয় তাহলে সারা দেশ জুড়ে যে তাণ্ডব শুরু হয়ে যাবে তা ভাবতেও শিউরে উঠলো সবাই তাই আকাশবাণীর অধিকর্তা নিজের দায়িত্বে আকাশবাণীর সর্বভারতীয় চ্যানেলের অনুষ্ঠানগুলো চালিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন। এই শতাব্দীর সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের তড়িঘড়ি কোন ঘোষণা না করে সাধারণ অনুষ্ঠানগুলো অবিরাম চালানোর এই অসাধারণ সিদ্ধান্ত তাঁর নিজের। শুধু তাই নয়। অন্যরকম প্রচারে যাতে বিশৃংখলা না ঘটে, তাই পুলিস ও সামরিক সদর কার্যালয় থেকেও ঘনঘন নির্দেশ পাঠানো হতে লাগলো ভারতের সব পুলিস ও সামরিক চৌকিতে। যেন তারা জরুরী অবস্থার মতন নিজেদের তৈরি রাখে। যথাসময়ে বিড়লাহাউস থেকে আকাশবাণীতে খবর পাঠানো হলো যে হত্যাকারী নাথুরাম গড়্‌সে একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ। তারপর কাঁটায় কাঁটায় সন্ধ্যা ছ'টায় দিল্লির আকাশবাণী থেকে সারা দেশের মানুষের কাছে পেঁাছে গেল সেই মর্মস্পর্শী ঘোষণাটি। তারা শিউরে উঠলো যখন শুনলো, 'আজ নতুন দিল্লিতে পাঁচটা বেজে কুড়ি মিনিটের সময় মহাত্মা গান্ধী নিহত হয়েছেন। তাঁর হত্যাকারী একজন হিন্দু।'

এই ঘোষণার পর গণহত্যা ও খুনোখুনি তখনকার মতন এড়ানো গেল। সারা দেশ তখন শোকার্ত। তাতেই ব্যথিত হয়ে রইল দেশবাসী।

ততক্ষণে তাঁর মৃতদেহটা বিড়লা উদ্যান থেকে বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে তাঁর প্রিয় খড়ের বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হলো গান্ধীজীকে পাশেই রাখা আছে তাঁর সাধের চরকাখানা। কিছুক্ষণ আগেই এই চরকাটি চালিয়ে সুতো কেটেছেন তিনি। কাঁদতে কাঁদতে আভা তাঁর রক্তমাখা ধুতির ওপর কম্বল ঢাকা দিয়ে গেল। কে একজন এসে মৃতদেহের পাশে গান্ধীজীর ব্যবহারের প্রিয় জিনিসগুলো রেখে গেল। কাঠের খড়ম জোড়া, যা পরে তিনি স্নান করতেন, যে চপ্পল পায়ে দিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন সেই চপ্পল, তিনটি বাঁদরের মূর্তি, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা খানা, তাঁর ইনগারসল ট্যাঁকঘড়ি, চকচকে পিকদানি আর যারবাদা জেলে থাকার সময় ব্যবহার করা টিনের কৌটোটা।

লুই মাউন্টব্যাটেন যখন ঘরে ঢুকলেন তখন শোকার্তদের ভিড়ে থইথই করছে। নেহরুর দিকে তাকালেন তিনি। মুখখানা ছাইয়ের মতন সাদা হয়ে গেছে। মেঝের ওপর থেবড়ে বসে আছেন। মাথাটা দেওয়ালে ঠেস দেওয়া। চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে নেহরুর সুন্দর মুখটা। কয়েক হাত দূরেই বসে আছেন প্যাটেল। ঠিক যেন পাথরের বুদ্ধমূর্তি। এইত কিছুক্ষণ আগে কথা বলে গেছেন তিনি ! এক ঘণ্টাও হয় নি। তাই শবদেহের ওপর থেকে কিছুতেই যেন চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছেন না প্যাটেল।

ঘরের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে মেয়েদের চাপা কণ্ঠস্বর। গান্ধীজীর মৃতদেহ ঘিরে মেয়েরা গুনগুন স্বরে গীতাপাঠ করছে। প্রায় ডজনখানের প্রদীপের ম্লান হলুদ আলোয় গান্ধীজীর মৃতদেহটি যেন মুড়ে রাখা হয়েছে। বাতাসে ধূপের

www.pathagar.com

গন্ধ ম-ম করছে। মনু নিঃশব্দে কেঁদে চলেছে কখন থেকে। তার কোলের ওপর রয়েছে বাপুর মাথাটা। ক[illegible] বাপুর মাথায়, কপালে তেল মালিশ করে দিয়েছে সে। আজ সেই মাথাটা প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে তার কোলে। ভারী যত্নের সঙ্গে কেশহীন মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল মনু। আর নিঃশব্দে কাঁদছিল। এই ছোট্ট মাথাটা থেকে মানুষের হিতকামী কত না ভাবনাচিন্তার উদ্ভাবন হয়েছে এতকাল। আজ থেকে সব শেষ হয়ে গেল।

খড়ের বিছানায় শোয়ানো গান্ধীজীর মৃতদেহটার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন লুই মাউন্টব্যাটেন। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর মনে হলো 'মনমরা ছোট্ট পাখিটা' আরও ছোট হয়ে গেছেন মাপে। যেন একটা বাচ্চার শরীর। ঠিক অতটুকু জায়গা নিয়েই শুয়ে আছেন মেঝের ওপর। ওঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী স্টিল ফ্রেমের চশমাটা কে যেন খুলে নিয়েছে তাঁর মুখ থেকে। তাই ম্যাড়ম্যাড়ে মোমবাতির আলোয় প্রথমটা চিনতে পারেন নি তিনি। একটা আশ্চর্য প্রশান্তি ঢেকে রেখেছে তাঁর মুখখানা। তাঁর মনে হলো, যে স্নিগ্ধ প্রশান্তি তিনি মৃত্যুতে দেখলেন তেমন প্রশান্তি ওঁর জীবিত মুখে কখনও দেখেন নি। তাঁর হাতে কে যেন গোলাপগুচ্ছ দিয়ে গেল। বিষণ্ণ মুখে ফুলের গোলাপী পাপড়িগুলো ছড়িয়ে দিতে লাগলেন তিনি। তাঁর প্রপিতামহীর হাতে গড়া এই সুবিশাল সাম্রাজ্যটি যাঁর হাতে সমাপ্ত হয়েছে, তাঁকেই শেষ শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন ভারতের সর্বশেষ ভাইসরয়। ইতিহাস যেন বাঁক নিল এখনই। মৃতদেহের ওপর যখন তিনি ফুলের পাপড়িগুলো ছড়িয়ে দিচ্ছেন তখন অকস্মাৎ তাঁর যা মনে হলো খানিক পরে সেই কথাটাই একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছে বলে ফেলেছিলেন মাউন্টব্যাটেন। তাঁর মনে হলো, 'গৌতম বুদ্ধ ও যীশু খ্রীষ্টের মতনই ইতিহাসে অমর অক্ষয় হয়ে থাকবেন মহাত্মা গান্ধী।' খানিক পরে শোকার্ত মানুষের ভিড় ঠেলে নেহরু ও প্যাটেলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন মাউন্টব্যাটেন। দুজনেই চুপচাপ। ওদের কাঁধে দুহাত রাখলেন মাউন্টব্যাটেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'আপনারা জানেন গান্ধীজীকে আমি কতখানি শ্রদ্ধা করতাম।' একটু চুপ করে মাউন্টব্যাটেন ফের বললেন, 'তাই দু-একটা কথা বলতে চাই আপনাদের। শেষবার যখন ওঁর সঙ্গে কথা বলি তখনই বুঝতে পেরেছিলুম যে আপনাদের দুজনকে নিয়ে ওঁর কি দারুণ দুশ্চিন্তা। যাঁদের উনি সবচেয়ে ভালবাসেন, অকৃত্রিম বন্ধু ও অনুরাগী মনে করেন সেই মানুষ দুজন যেন ক্রমশ তফাত হয়ে যাচ্ছেন পরস্পরের কাছ থেকে।' এই পর্যন্ত বলে মাউন্টব্যাটেন আবার চুপ করলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে তাঁর দুপাশের মানুষ দুটিও কি দারুণ অস্বস্তি বোধ করছেন। ওঁদের মনের অশান্তি কাটাতে মাউন্টব্যাটেন বললেন, 'তাই সেদিন গান্ধীজী বললেন, "ওরা এখন আপনার কথাই বেশি শোনে। আপনিই চেষ্টা করুন ওদের মিলিত করার।'" মাউন্টব্যাটেন দুজনের মুখের দিকেই তাকালেন। তারপর গভীর স্বরে বলে উঠলেন, 'বলতে পারেন এটাই তাঁর অন্তিম বাসনা। একটু নীরব থেকে মাউন্টব্যাটেন বললেন, 'যতটা শোকার্ত মনে হচ্ছে আপনাদের, ততখানি যদি ওঁকে মনে রাখেন, তাহলে সব ভুলে এখনই আপনারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করুন।' মাউন্টব্যাটেনের কথা শুনে দুজন অনুতপ্ত নেতাই অভিভূত হলেন। তাঁর সামনেই দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরলেন।

বস্তুত এই আবেগের দৃশ্যটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে দিলেন না মাউন্টব্যাটেন।

www.pathagar.com

তখনও তার কিছু করণীয় কাজ বাকী আছে যা তিনি গভর্নর-জেনারেল হিসাবে দেশকে দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। সেটা হলো গান্ধীজীর অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা। শোকের প্রথম ধাক্কায় যে কথাটা প্রায় সবাই ভুলে বসেছে।

নেহরু এবং প্যাটেল তখনই রাজী হয়ে গেলেন, যখন মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব দিলেন যে গান্ধীজীর মৃতদেহ বিশেষভাবে সুবাসিত করে স্পেশ্যাল ট্রেনযোগে সারা দেশে ঘোরানো হ'ক। সবাইকে তাদের প্রিয় মহাত্মাকে শেষবারের মতন 'দর্শন' করার সুযোগ দেওয়া হ'ক, কিন্তু বাদ সাধলেন গান্ধীজীর রক্ষণশীল সেক্রেটারি প্যায়রলাল নায়ার। তিনি ভীষণ আপত্তি করলেন প্রস্তাব শুনে। কারণ গান্ধীজী নাকি জানিয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই গোঁড়া হিন্দু মতে যেন তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

অনন্যোপায় মাউন্টব্যাটেন তখন নেহরু ও প্যাটেলের দিকে তাকালেন। তাহলে? একটাই উপায় আছে এখন। কালই দিল্লিতে মৃতদেহ সৎকারের আয়োজন করতে হবে। কিন্তু এই বৃহৎ আয়োজন কারা সামলাবেন? সারা দেশের মানুষ এসে জড়ো হবে দিল্লিতে। তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার যোগ্যতা সারা দেশে যে একটি মাত্র বিভাগের আছে তার নাম সামরিক বিভাগ। সুতরাং সামরিক বিভাগের হাতেই এই দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হ'ক।

মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাব শুনে দুই নেতাই প্রায় আঁতকে উঠে দুজনের দিকে তাকালেন। অহিংসার পূজারী গান্ধীজীর শবযাত্রার মিছিলটি পরিচালনা করবে দেশের সামরিক বাহিনী? যুদ্ধ এবং হত্যা যাদের জীবিকা তাদের হাতে থাকবে গান্ধীজীর শোক মিছিলের নিয়ন্ত্রণ?' না। তা হতে পারে না। দুই নেতাই কেমন ভীতত্রস্ত হলেন মাউন্টব্যাটেনের অভিপ্রায় শুনে। মাউন্টব্যাটেন চেষ্টা করলেন ওঁদের বোঝাতে। বললেন যে গান্ধীজী চিরকাল এই বাহিনীর সুশৃঙ্খল কাজের প্রশংসা করেছেন। সুতরাং সামরিক বাহিনীর এই ভূমিকা গ্রহণে কোনই অমত হবার কারণ নেই। অবশেষে নিমরাজী হলেন দুই নেতা। ঠিক হলো যে অহিংসার পূজারী মহাত্মা গান্ধীর অন্তিমযাত্রার মিছিলটি পরিপূর্ণ সামরিক মর্যাদার সঙ্গেই পরিচালিত হবে।

মাউন্টব্যাটেন খুশী হলেন। তখনই নির্দেশ দিলেন সামরিক বিভাগকে। যেন উপযুক্ত ব্যবস্থাদি নিয়ে এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে তারা তৎপর হয়। এ দিকটা মিটে যাবার পর নেহরুর দিকে তাকালেন মাউন্টব্যাটেন। তারপর বললেন, 'এবার দেশবাসীকে আপনি কিছু বলুন। সবাই এখন আপনার দিকেই তাকিয়ে আছে। এখন থেকে আপনিই ওদের নেতা। সুতরাং আপনার মুখ থেকেই সবাই কিছু শুনতে চায়।'

বিহ্বল নেহরুর কাছে এ এক কঠিন কর্তব্য। কি বলবেন তিনি? তিনি তো মানসিক ভাবে প্রস্তুত নন! মাথা নাড়লেন নেহরু। মাউন্টব্যাটেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি পারবো না। কিছুই বলতে পারবো না। আমি একটুও ধাতস্থ নই। তাছাড়া কি বলবো তাও জানি না।'

মাউন্টব্যাটেন চেয়ে ছিলেন নেহরুর দিকে। তাঁর কথা শেষ হতে বললেন, 'ঈশ্বরই ঠিক করে দেবেন কি বলবেন। এ নিয়ে ভাবতে হবে না আপনাকে।'

গান্ধীজীর মৃত্যু সংবাদ শুনে ব্যথিত দেশের মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এমন

www.pathagar.com

একটা ভূমিকা বেছে নিল · চেয়ে উপযুক্ত শোকপালন আর হয় না। সারা দেশ জুড়ে হরতাল পালন করে ওরা সর্বকিছু স্তব্ধ করে দিল, যেমনটি গান্ধীজী করতেন স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবার সময়। নেতৃত্বহীন এই হরতাল দেশের মানুষের একান্ত। সারা দেশের বুকে নেমে এল গভীর নৈঃশব্দ্য। কাজকর্ম, হাটবাজার সব বন্ধ হয়ে গেল। পালিত হলো আসল ধর্মঘট।

পাহাড়, সমভূমি, বাজার, বস্তি, সর্বত্রই খাঁ খাঁ করছে শূন্যতা। কোথাও যেন প্রাণের সাড়া নেই। কোথাও উনান জ্বললো না। ঘুঁটের ধোঁয়ায় রাতের আকাশ ভারী হলো না। বোম্বাই শহরটা যেন মৃতের শহর মনে হলো। মালাবার হিল-এর প্রাসাদোপম ভবনগুলো থেকে শুরু করে প্যারেলের বস্তি এলাকা পর্যন্ত সব মানুষের চোখে জল। কলকাতার অতবড় ময়দান জনমানিষ্যিশূন্য। শুধু বড় রাস্তা দিয়ে একজন ছাইমাখা সাধু চলতে চলতে মাঝে মাঝে হেঁকে উঠছিল, 'মহাত্মা চলে গেলেন। আবার কবে এমন এক মহাত্মা আসবেন?'

পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ মুসলমান রমনী তাদের হাতের অল্পমূল্যের কাচের চুড়ি ভেঙে শোক করলো চিরচরিত প্রথায়। লাহোর শহরটা তখন পুরোপুরি মুসলমানদের শহর হয়ে গেছে। তাই শহরের সব ক'টি সংবাদপত্র অফিসে লাহোরবাসীরা হুমড়ি খেয়ে পড়লো আরও খবরের জন্য। কিছু কিছু শহরে উৎপাতও হলো। পুণার 'হিন্দুরাষ্ট্র' পত্রিকার ছাপাখানাটা নষ্ট করতে চুনকাম করা সেই শেডটার ওপর হামলা করলো উত্তেজিত জনতা। বম্বে শহরের সাভারকর সদনের ওপর চড়াও হলো হাজারখানেক মানুষ। সারা দেশজুড়ে যেখানে হিন্দু মহাসভা এবং আর.এস.এস. দপ্তর আছে সেখানেই হামলা করলো ক্ষুব্ধ মানুষ।

ছাতারপুর গ্রামের কৃষক রঞ্জিতলাল গান্ধীজীর নিহত হবার খবরটা শুনতে পেল সরকারের কৃষি দপ্তর থেকে উপহার পাওয়া রেডিওটা থেকে। সে একা নয়। এই দুঃসংবাদ শুনলো গ্রামের আরও মানুষ। খবরটা শুনেই যেন গোটা গ্রামখানা উঠে দাঁড়াল। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তারা স্থির করলো যে পায়ে হেঁটে সবাই দিল্লি যাবে এবং গান্ধীজীর অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানে যোগ দেবে। যে পথ দিয়ে স্বাধীনতা-উৎসব দেখে তারা গ্রামে ফিরেছিল, সেই পথ ধরেই তখন দিল্লির দিকে চলেছে মানুষের এক বিপুল স্রোত। শুধু ওরাই নয়, আশপাশের আরও অনেক জনপদ থেকে হাজার হাজার মানুষ তখন মিছিল করে চলেছে দিল্লির দিকে। মাউন্ট-ব্যাটেন এইরকমই আশংকা করেছিলেন যে দিন শুরুর সংগে সংগে লক্ষ মানুষের ঢল আছড়ে পড়বে এই রাজধানী শহরের বুকের ওপর।

বিড়লাবাড়ির দোতলার খোলা বারান্দায় শোয়ানো হয়েছে গান্ধীজীর মৃতদেহটি। গোলাপ, যুঁই ফুলের সমাহারে সজ্জিত সেই মৃতদেহর মাথার কাছে জ্বলছে চারটি ঘিয়ের প্রদীপ। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম, এই পঞ্চভূত-পদার্থ যেন জ্বলছে সেখানে। কাঠের পাটাতনের ওপর শোয়ানো হয়েছে মৃতদেহটি যাতে শেষবারের মতন দর্শনার্থীরা তাদের প্রিয় নেতাকে দেখতে পায়।

একটিবার দর্শনের আশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওরা এখানে অপেক্ষা করে আছে। একদিন এঁরই নাম স্মরণ করে ব্রিটিশ পুলিসের লাঠিগুলি তুচ্ছ করে ওরা স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আজ তারাই সারা সন্ধ্যেটা এইভাবে দাঁড়িয়ে আছে কখন বিড়লাবাড়ির কাচের দরজা দিয়ে মহাত্মার মৃতদেহটি দেখতে

www.pathagar.com

পাবে এই আশায়। ওদিকে আর একদল মানুষ তখন বিড়লাবাড়ির বাগানে ভিড় করে আছে। যেখানে তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন সেখানকার ঘাসের শিষ ছিঁড়ে তাদের প্রিয় নেতার স্মৃতিরক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তারা। এবার একজন করে বারান্দা দিয়ে যাবার সময় শায়িত মৃতদেহটি তারা দেখে গেল। সার্চলাইটের উজ্জ্বল আলোয় চকচক করছে তাদের খাদির সাদা পোশাক। মনে হলো মৃত জেনারেলের প্রতি স্বাধীনতার এই প্রবীন সেনানীদের শেষ সম্মান প্রদর্শন এটি।

দিল্লি শহরের আর এক প্রান্তে একজন ভগ্নহৃদয় মানুষ তখন শোকে কাতর হয়ে আকাশবাণীর মাইক্রোফোনের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। শোকস্তব্ধ মানুষটির মুখের কথা হারিয়ে গেছে যেন। গান্ধীজীর অন্তরঙ্গ ভাবশিষ্য জওহরলাল তখন সত্যই বিমূঢ়। দেশবাসীকে কি বলবেন তিনি? মনে মনে তাঁকে স্মরণ করলেন যিনি মূককে বাচাল করেন, পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করান। অতঃপর স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে বেরিয়ে এল হৃদয়ের কথাগুলি ঠিক যেমনটি হয়েছিল স্বাধীনতা দিবসের আগের দিন রাত্রে। তবে কথাগুলি মনিমুক্তার মতন ঝলমল করলো না। কেমন বিষণ্ণ রূপের আভায় ঝিকিমিকি জ্বলতে লাগলো শুধু। নেহরু বললেন, 'আমাদের জীবন থেকে আলো নিভে গেছে। তাই নিবিড় অন্ধকার নেমে এল আমাদের জীবনে। আমাদের প্রিয় নেতা, যাঁকে আমরা বাপু বলতাম, তিনি আর ইহজগতে নেই।' একটু থেমে নেহরু বললেন, 'আমি বললাম আলো নিভে গেছে। কথাটা ঠিক বলা হলো না। কারণ, এ আলো সাধারণ আলো নয়। হাজার বছর লাগবে এমন আলো জ্বলতে। তবে আবার সে আলো দেখবো আমরা...দেখবে সারা বিশ্ব এবং সান্ত্বনা পাবে লক্ষ লক্ষ ভগ্নহৃদয় মানুষ। যে আলো জ্বলেছিল তা শুধু বর্তমান নয় আরও অধিক কিছু প্রদর্শন করেছিল। সে আলো আমাদের সত্য চিনিয়েছিল, উদ্ভাসিত করেছিল শাশ্বতকে। ভ্রষ্টপথ থেকে উদ্ধার করেছিল আমাদের এবং মুক্তির ধ্রুবপথ দেখিয়েছিল এই প্রাচীন দেশকে।'

যে জ্যোতি নিভে যাওয়ায় নেহরু বিষণ্ণ হয়েছিলেন সেই আলোয় যেন সারা বিশ্বই এতকাল ভাস্বর হয়ে ছিল। তাই গান্ধীজীর মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে শোকস্তব্ধ বিশ্বের সমস্ত কোনা থেকে আসতে লাগলো অসংখ্য শোকবার্তা।

দুঃসংবাদটা সবচেয়ে অভিভূত করলো লণ্ডন শহরকে। বিশ্বযুদ্ধ থেমে যাবার পর বোধহয় আর কোন ঘটনা এমনভাবে শহরটাকে নাড়া দেয় নি। খবরটা শুনে সবাই বিমূঢ়। যে সান্ধ্য দৈনিকে এই দুঃসংবাদটি ছাপা হয়েছিল সেটি নিঃশেষ হয়ে গেল বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে। তখন লণ্ডনবাসীর হাতে হাতে ঘুরছে ফুরিয়ে যাওয়া সেই সান্ধ্য দৈনিকের কপিটি। লণ্ডনবাসীর মনে আছে ১৫ বছর আগের সেই ঘটনা যেদিন এই বিহ্বল মানুষটি একটি ছাগলী সঙ্গে নিয়ে ব্রিটেনের ক্রাউন জুয়েলটি ফেরত চাইতে এসেছিলেন। সেদিন কে জানতো যে অমন ভালমানুষের এই পরিণতি হবে! উনি আজ আর ইহলোকে নেই। তাই লণ্ডন শহরের আপামর মানুষ শোকার্ত হয়ে উঠেছে। সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ থেকে শুরু করে লণ্ডনের দরিদ্র, সাধারণ মানুষ সবাই শোকবার্তা পাঠালেন। সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ, প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এ্যাটলী, গান্ধীজীর পুরনো শত্রু উইনস্টন

www.pathagar.com

চার্চিল, স্টাফোর্ড ক্রিপস্, ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ থেকে শুরু করে হাজার হাজার সাধারণ মানুষ। তবে যাঁর পাঠানো বার্তাটি চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে সেই স্বনামধন্য আইরিশ নাট্যকার জর্জ বার্নাড শ'য়ের সঙ্গে গান্ধীজীর সাক্ষাৎ হয়েছিল ১৯৩১ সালে লণ্ডন শহরে। গান্ধীজীর এমন ভয়ংকর মৃত্যু যে স্পষ্টবক্তা, ঋজু এই নাট্যকারটিকে দারুণ নাড়া দিয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই স্বল্পবাক ট্রিবিউটটির মধ্যে। জি.বি.এস. লিখেছিলেন, 'এ থেকেই বোঝা যায় যে এত ভালমানুষ হওয়ার দায় কত।' (শোজ হাউ ডেনজারেস্ ইট ইজ টু বি·গুড)

প্যারিস থেকে ফরাসী প্রধানমন্ত্রী জর্জ বিদ্যল মন্তব্য করলেন, 'যারা মানুষে মানুষে সৌভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী তারা সবাই গান্ধীর মৃত্যুতে পরিতাপ করবে।' দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ফীল্ড মার্শাল স্মাট্স্ এক লাইনের একটি স্মরণীয় বার্তা পাঠিয়ে বললেন, 'পৃথিবী থেকে রাজার রাজা বিদায় নিলেন।' ভ্যাটিক্যানের পোপ দ্বাদশ পায়াস যে প্রশংসা বার্তা পাঠালেন সেটিও স্মরণীয়। তিনি লিখলেন, 'গান্ধী ছিলেন শান্তির দূত এবং খ্রীষ্টভাবে অনুপ্রাণিত ব্যক্তি।' চীন, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি প্রাচ্য দেশগুলিও বিমূঢ় হলো এই নিষ্ঠুর হত্যার সংবাদ পেয়ে। এশিয়া ভূখণ্ডে যিনি ছিলেন স্বাধীনতার অগ্রদূত তাঁর এমন আকস্মিক অন্তর্ধানে স্তব্ধ হয়ে গেল এশিয়াবাসী। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট হ্যারি ট্রুম্যান ওয়াশিংটন থেকে প্রেরিত বার্তায় লিখলেন, 'ভারতের সঙ্গে সারা বিশ্বই আজ শোকাকুল হলো।'

নেহরুর ভগিনী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত তখন সোভিয়েত দেশের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত। মস্কো শহরের ভারতীয় দূতাবাস দপ্তরে তিনি একটি শোকবই খুলেছিলেন। কিন্তু সরকারী সেই শোকবইটিতে আঁচড় কাটতে প্রেসিডেণ্ট স্তালিনের বিদেশ দপ্তরের একজন সদস্যও ভারতীয় দূতাবাস দপ্তরে পা দেয় নি সেদিন।

এই উপ-মহাদেশে গান্ধীজীর আর একজন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন মহম্মদ আলী জিন্না। জিন্না তাঁর সরকারী শোকবার্তায় লিখলেন, 'মৃত্যুর পর আমাদের মধ্যে আর কোন মতবিরোধ রইল না। স্বীকার করছি যে হিন্দু সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন গান্ধীজী।' একজন সহকারী যখন জিন্নার সঙ্গে তাঁর শোকবার্তাটি মিলিয়ে নিচ্ছিল, তখন এই মন্তব্যটি সম্বন্ধে বিনীত প্রতিবাদ করেছিল সে। সে বলেছিল যে গান্ধী অনেক বড় মাপের মানুষ। তাই শুধু হিন্দুসমাজের বেষ্টনীর মধ্যে তাঁকে ধরে রাখা উচিত নয়। পনেরো দিন আগেও ভারতের মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য তিনি প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে অনশন করেছেন এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রকে দেউলিয়া অবস্থা থেকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু জিন্না কানেও তোলেন নি সহকারীর ক্ষীণ প্রতিবাদ। সেদিন কোন যুক্তিই কায়েদ-এ-আজমকে তাঁর জিদ থেকে নড়াতে পারে নি। জিন্নার এক কথা, 'নো। যা বলেছি ঠিক বলেছি। একজন বড়মাপের হিন্দু ছাড়া গান্ধী অন্য কিছু নয়।' (নো। দ্যাট্স্ হোয়াট হি ওয়াজ, এ গ্রেট হিন্দু)

তবে সঙ্গত কারণে সেই বিপুল সংখ্যক শোকবার্তার মধ্যে ভারতীয়দের দেওয়া ট্রিবিউটটিই সবচেয়ে স্মরণীয় হয়েছিল। হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড নামক কলকাতার একটি ইংরিজি দৈনিক অভিনব পন্থায় এক সম্মানপত্র রচনা করে

www.pathagar.com

গান্ধীজীর মহা প্রয়াণে শ্রদ্ধার্ঘ জানিয়েছিল সেদিন। সম্পাদকীয় পাতাটির চারপাশে কালো দাগ টেনে তারা একটি বর্ডার দেয় এবং পাতার মাঝখানে গোটা গোটা হরফে চার লাইনের এই স্মারকলিপিটি ছাপা হয়।

'যাদের মুক্তির জন্য গান্ধীজীর আবির্ভাব হয়েছিল তাদের হাতেই নিহত হলেন তিনি। যেন দ্বিতীয়বার ক্রুশবিদ্ধ হলেন যীশু। আজ থেকে এক হাজার নশ' বছর আগে এইরকম আর এক শুক্রবারে মৃত্যুর মধ্যে নিঃশেষ হয়েছিলেন মহামানব যীশুখ্রীষ্ট। ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করুন।'

মাঝরাতের একটু পরে বিড়লাবাড়ির অলিন্দ থেকে গান্ধীজীকে নীচে নামানো হলো। আবার খানিকক্ষণের জন্য তাঁর কাছের মানুষজন, যারা এতকাল তাঁর সঙ্গেই কঠিন জীবন যাপন করেছেন, তাঁকে কাছে পেল। মনু, আভা, প্যায়ারেলাল, গান্ধীজীর দুই পুত্র দেবদাস ও রামদাস এবং আরও অনেকে। তারা চিরকাল সুখে দুঃখে গান্ধীজীর কাছাকাছি থেকেছে জয়ের দিনে যেমন তেমনি বেদনাদায়ক শেষের বছরটিতেও ভাগীদার হলো এরা।

গান্ধীজীর শবদেহ মেঝেতে শোয়ানোর আগে হিন্দুদের আচার, সংস্কার মেনে মার্বেল পাথরের মেঝেটি গোময় লেপে শুদ্ধ করা হলো। তারপর মরদেহটি স্নান করিয়ে দিল দুই ছেলে এবং প্যায়ারেলাল। স্নানের পর খাদির সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো মরদেহ। নতুন বস্ত্র পরিয়ে কাঠের পাটাতনের ওপর মরদেহ শুইয়ে দেওয়া হলো। একজন পুরোহিত এসে তাঁর খোলা বুকে চন্দনবাটা লেপে দিল। কপালে সিঁদুর পরিয়ে দিল মনু। তারপর আভাকে দিয়ে তাঁর ললাটে লেখালো 'হে রাম', এবং 'ওঁ।' তখন ভোর সাড়ে তিনটা। এখনই তাঁর প্রার্থনার সময়। মেয়েরা সবাই তখন নিঃশব্দে কাঁদছে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে।. সবাই ঘিরে আছে তাঁর মৃতদেহ। চিরবিদায় দিতে হবে তাদের প্রিয় বাপুকে। জীবনের সব অনুষ্ঠান সাঙ্গ হলো। এবার বিনাশ হবে এই দেহ। মনে মনে বিদায় জানাল সবাই। এদেহ বিনাশশীল। মাটিতেই মিশে যাবে এ দেহ। অতঃপর স্নান করিয়ে নতুন বস্ত্র পরিয়ে দেওয়া হবে। এবার তিনি যেখানে যাবেন, সেখান থেকে আর তাঁকে ফিরতে হবে না।

সংস্কারাদি অনুষ্ঠান শেষ। এবার প্রিয় বাপুর জীর্ণদেহটি অপেক্ষারত ভক্তদের হাতে তুলে দিতে হবে। কিন্তু তার পূর্বে আর একটি করণীয় কাজ সম্পন্ন করলো ওরা। মৃতের গলায় ফুলের মালা দেবার সংস্কারটি খুবই অপছন্দ করতেন গান্ধীজী। তাই শবের কণ্ঠলগ্ন মালাটি খুলে নিল দেবদাস। তারপর গান্ধীজীর নিজের হাতে কাটা সুতার গ্রন্থি পরিয়ে দিল তাঁর গলায়। গান্ধীজীর অনন্তযাত্রাকালে এই গ্রন্থিটিই তাঁর পাথেয় হ'ক।

মৃত্যুর হিম স্তব্ধতার মধ্যে স্থির হয়ে শুয়ে আছেন মহাত্মা। শেষবারের মতন এই শান্ত মূর্তিটিই 'দর্শন' করতে এল সবাই। আর একবার ফুলে ঢাকা দেহটি শবখাটে তুলে জনতার চোখের সামনে প্রদর্শন করা হলো। তখন সবে সূর্যোদয় হচ্ছে। বিড়লাবাড়ির ব্যালকনিতে শবখাটে (bier) শোয়ানো গান্ধীজীকে শেষবারের মতন দেখার আশায় উদ্বেগ জনস্রোত আছড়ে পড়লো বিড়লাবাড়ির অলিন্দে। ওদের মনের সমুদ্রে তখন উত্তাল ঢেউ। ক্ষণে ক্ষণে দোলা উঠছে

www.pathagar.com

আশা-নিরাশার। সূর্যোদয়ের প্রথম কিরণ সম্পাতের সংগে সংগে সেই ভাবতরংগ ঢেকে ফেললো বিড়লাবাড়ি।

এগারোটা বাজার খানিক পরেই শবখাটটি কাঁধে তুলে ব্যালকনি থেকে নামিয়ে আনলো কিছু ভক্ত। তারপর অপেক্ষারত গাড়ির ওপর ধীরে ধীরে তোলা হলো। এবার তাঁর শেষযাত্রা শুরু হবে। শোকাচ্ছন্ন রাজধানী শহরটি পরিক্রমা করে গাড়িটিকে শবদাহের জন্য রাজঘাটে নিয়ে যাওয়া হবে। যমুনার তীরে অবস্থিত এই শ্মশানঘাটেই প্রাচীন রাজারাজড়াদের শবসংকার করা হতো। রাজার রাজা গান্ধীজীর শবসংকারও এই শ্মশানঘাটেই অনুষ্ঠিত হবে। তাঁর শবাধার নিয়ে সামরিক বিভাগের যে গাড়িটি রাজধানী শহর পরিক্রমা করবে, সেটি একটি ওয়েপন ক্যারিয়ার। ঠিক হয়েছে যে পরিক্রমার সময় এই ডজ্ ওয়েপন ক্যারিয়ারের ইঞ্জিনটি চালু করা হবে না। আয়ুধশকটখানি টেনে নিয়ে যাবে মানুষ। যিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে যন্ত্রের বিরোধিতা করেছেন, সভ্যতার স্খলনের মূলে যিনি যন্ত্রকে দায়ী করে এসেছেন জীবনভর, তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানাতে ২৫০ জন দেশবাসী টেনে নিয়ে যাবে এই শস্ত্রশকটটি। গাড়ির বাম্পারের সংগে চারটি কাছি বাঁধা হবে এবং গুণটানার মতন ওয়েপন ক্যারিয়ারটি টেনে নিয়ে যাবে তিন সেনাবাহিনীর জওয়ানরা।

তখন কেঁদে কেঁদে চোখ দুটি লাল করে ফেলেছেন জওহরলাল। বল্লভভাই প্যাটেলও যেন পাথর হয়ে গেছেন শোকে। তবুও মনু ও আভার সংগে হাত মিলিয়ে সর্বশেষ সংস্কারটি পালন করলেন তাঁরা। শবদেহের গায়ের ওপর আড়াআড়ি করে সাদা ও লাল রঙের দুটি লক্ষ্মণ-বস্ত্র পরিয়ে দিলেন। মৃতব্যক্তি যে পরিপূর্ণ জীবন যাপন করেছেন এবং পরিপূর্ণ জীবনযাপনের পর তিনি যে অনন্ত আনন্দধামের উদ্দেশে পাড়ি দিলেন, তারই লক্ষ্মণ সূচনা করলো এই সংস্কার। এরপর গান্ধীজীর মৃতদেহের ওপর যে শবাচ্ছাদন বস্ত্রটি বিছিয়ে দেওয়া হলো গান্ধীজীর কাছে তার চেয়ে উপযুক্ত শৌখিন আভরণ আর হয় না। গরিবের রাজা গান্ধীজীর গায়ের ওপর বিছিয়ে দেওয়া হলো স্বাধীন ভারতের তেরঙা জাতীয় পতাকাখানি।

আয়োজন শেষ। এবার যাত্রা শুরু। মিছিল পরিচালনার ভার পড়েছে লেঃ জেনারেল রয় বুচারের ওপর। ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই ব্রিটিশ কম্যাণ্ডার শেষবারের মতন নির্দেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা জওয়ান বাহিনীর দিকে তাকালেন। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর অনুরূপ একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। ইতিহাসের কি আশ্চর্য কৌতুক! ১৯৪২ সালে গান্ধীজী যখন যারবাদা জেলের মধ্যে ২১ দিনের ঐতিহাসিক অনশন পালন করছেন, তখন ব্রিটিশ সরকার ধরেই নিয়েছিল যে সে যাত্রা টিকে যাবেন না তিনি। সেবায়ত্ত শোক মিছিল পরিচালনার ভার ছিল তাঁর ওপর। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে মিছিল বেরোয় নি। ২১ দিন অনশনের পর রক্ষা পেয়েছিলেন গান্ধীজী।

রায় বুচারের ইংগিত পাবার সংগে সংগেই ধীরে ধীরে চলতে লাগলো শোক মিছিল। তারপর বিড়লাবাড়ির ফটক পেরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জনসমুদ্রের মধ্যে গিয়ে পড়লো। মিছিলের আগে আগে চলেছে চারটি আর্মার্ড কার্ এবং গভর্নর-জেনারেলের নিজস্ব বডিগার্ডবাহিনী। মাউন্টব্যাটেন নিজেই উদ্যোগ নিয়ে এই আয়োজন করেছেন। ছোট্ট 'মনমরা পাখিটার' জন্য এটাই তাঁর শেষ সম্মানপ্রদর্শন।

www.pathagar.com

একজন ভারতীয়ের সম্মানে এই প্রথম বড়লাটের নিজস্ব বডিগার্ডবাহিনী নিযুক্ত হলো।

এ যেন এক মহামিছিল। শ্রেণী, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে সবাই এসে মিশেছে এই অখণ্ড স্রোতে। কে নেই সেখানে ? মন্ত্রী, মজুর, অস্পৃশ্য ধাঙড়, বোরকাপরা মুসলমান রমণী, সবাই এসেছে এই মহামিলনের তরঙ্গে মিশে যেতে। জাত, ধর্ম ভুলে, মাথায় একই রকম শোকের বোঝা নিয়ে ওরা এসেছে। মনে হচ্ছে আকারহীন একটা মানবস্রোত বয়ে চলেছে মিছিলকে লক্ষ্য করে।

যমুনা পর্যন্ত এই মহামিছিলের যাত্রাপথটি পাঁচ মাইল লম্বা। এই দীর্ঘ পথটা গাঁদা আর গোলাপ ফুলের পাপড়িতে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। মিছিলের দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। তাদের কেউ গাছে চড়েছে, কেউ জানলা থেকে ঝুলেছে। বাড়ির ছাতে উপচে পড়েছে মানুষ। অনেকে ল্যাম্পপোস্টের মাথায় চড়ে বসেছে। কেউ বা রাস্তার ধারে পাথরের ভাস্কর মূর্তির হাতের ওপর বসেছে। কিংসওয়েব সেই 'ঠাঁই নাই' ভিড়ের মধ্যে একটা ল্যাম্পপোস্টের মাথায় চড়ে বসেছিল রঞ্জিতলালও। কাল সন্ধ্যের সময় রেডিওতে গান্ধীজীর নিহত হবার সংবাদ শুনে দলবল নিয়ে সে গ্রাম থেকে বেরিয়ে পড়েছিল শোভাযাত্রা দেখতে। আজ যখন শোকমিছিল তার ল্যাম্পপোস্টের তলা দিয়ে যাচ্ছে তখনই সে গান্ধীজীর আশ্চর্য কোমল মুখখনা দেখতে পেল। সরলতা মাখানো ওই বিখ্যাত মুখখানা দেখে চাপা কান্নায় গুমরে উঠলো তার বুকখানা। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হলো কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে ফুলের শয্যায় ঘুমিয়ে আছেন তিনি। দুচোখ ভরে এল জলে। একটা সহজ সরল ভাবনার উদয় হলো তার মনে। রঞ্জিত ভাবলো যে এই মানুষটিই, 'আমায় স্বাধীন করেছেন।'

দরবার হলের গোল গম্বুজঘর থেকে প্রেস এ্যাট্যাশে অ্যালান ক্যাম্পবেল জনসনও মিছিলের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে ছিল। মিছিলের গতি এত মন্থর যে বোঝাই যায় না মিছিল এগোচ্ছে। শবানুগামীরা যেন তাদের কোলের মধ্যে আগলে নিয়ে চলেছে মিছিলটাকে। কিংসওয়েব এই রাজপথ তৈরি হয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যুদ্ধজয়ের সদর্প উল্লাশ করার জন্য। আজ সেই পথ দিয়েই গান্ধীজীর প্রয়াণ মিছিল চলেছে তাঁর জয়ধ্বনি গাইতে গাইতে। মৃত্যুতে যে সম্মান গান্ধীজী পেলেন, তা কোন ভাইসরয়ের স্বপ্নেরও অগোচর।

মিছিলের পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগলো যমুনার তীরে রাজঘাট শ্মশানে পৌঁছতে। অর্থাৎ ঘণ্টায় এক মাইল পথ হেঁটেছে মিছিল। রাজঘাটে পৌঁছে দেখা গেল সেখানেও অপেক্ষা করছে লক্ষাধিক মানুষ। যেখানে চন্দনকাঠের স্তূপ রাখা আছে, তারই ওপাশে বিশাল তৃণভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে শোকার্ত মানুষ। এই বিপুল জনসমাগম দেখে মার্কিন মহিলা সাংবাদিক মার্গারেট বুর্ক হোয়াইট অভিভূত হয়ে গেল। তার মনে হলো এমন অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা তার আগে কখনও হয় নি। সুতরাং চিরকালের মতন এই ছবিটা স্মৃতিবন্দী করে রাখতে চাইল সে। কাঁধে ঝোলানো তার লাইকা ক্যামেরার লেন্সের মধ্যে তখনই বন্দী হয়ে গেল এই ঐতিহাসিক জনসমাবেশের দৃশ্যটা।

শতখানেক সম্মানিত রাজ অতিথিদের জন্য ভিড়ের বাইরে একটুখানি ফাঁকা জায়গায় বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঐতিহাসিক মিছিল দেখতে এঁরাও এসেছেন রাজঘাটে। এঁদের নিরাপত্তার জন্য যে সামরিক বাহিনী নিযুক্ত করা হয়েছে তার

www.pathagar.com

চেহারা খুবই কৃশ। যাঁরা বসে আছেন তাঁদের মধ্যে নৌরাহিনীর সাদাটুপি পরা মাউন্টব্যাটেনের উন্নত চেহারার রেখাচিত্রটা দূরে থেকেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দাহচুল্লীর সামনাসামনি চেয়ারে বিশিষ্ট মূর্তিতে বসে আছেন তিনি।

হঠাৎ জনতার মধ্যে একটা তরঙ্গ উঠলো যেন। দেখা গেল যে গান্ধীজীর মৃতদেহটি হাতে হাতে দাহচুল্লীর কাছে নিয়ে আসছে সামরিক প্রধানরা। দৃশ্যটা দেখেই মৃগী রোগীর মতন জনতার সারা শরীরে যেন আবেগের সঞ্চার হলো। দারুণ ভাবে কেঁপে উঠলো জনতার দেহ। মনে হলো বিশাল জনতা এবার বুঝি সামনের দিকে ধেয়ে আসবে। কে বাধা দেবে তাদের? নিরাপত্তার জন্য যে ক্ষীণ সামরিক বাহিনী আছে তাদের সাধ্য কি এই নির্বোধ নিরাকার জনতার উদ্বেলিত উচ্ছ্বাস প্রতিরোধ করে? মনে মনে প্রমাদ গুনলো মাউন্টব্যাটেনের পার্সোন্যাল স্টাফ মেজর মার্টিন। তার মনে হলো এই আবেগের বন্যায় নির্ঘাত তলিয়ে যাবে ওই গুটিকয় মানুষ এবং সেই সঙ্গে মাউন্টব্যাটেন ও তাঁর পরিবারের সবাই। তারপর এই দুর্ঘটনার সংবাদ যখন লন্ডন শহর শুনবে, তখন তারা যে কতখানি মর্মাহত হবে তা কল্পনা করাও যায় না।

তবে, এমন বিপত্তি যে ঘটতে পারে মাউন্টব্যাটেন নিজেই তা আঁচ করেছিলেন। তাই আলোড়ন ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই স্তূপ করে রাখা চন্দনকাঠের ঢিপি থেকে অন্তত বিশ গজ দূরে আমন্ত্রিতদের বসার আসনগুলো সরিয়ে দেবার নির্দেশ দিলেন। তারপর দূরে দাঁড়িয়ে থাকা জনতাকে ইশারা করে কাদা মাটির ওপর বসে পড়তে বললেন। পাছে তাদের বুঝতে অসুবিধা হয় তাই মেয়ে বৌ নিয়ে নিজেই এক পা কাদার মধ্যে ধোপভাঙা সেনাপতির পোশাক পরে বসে পড়লেন।

শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর শবখাটটি দাহচুল্লীর বেষ্টনীর মধ্যে এসে পড়লো। গান্ধীজীর দুই ছেলে অত্যন্ত যত্ন করে পিতার শবদেহটি শুইয়ে দিল চন্দনকাঠের ঠান্ডা চিতার ওপর। এই চিতাশয্যাই তাঁর শেষ শয্যা। হিন্দুর সংকার রীতি অনুযায়ী শবের মাথাটি উত্তরমুখী এবং পা দুটি দক্ষিণমুখী করে রাখা হলো। তখন বেলা ঠিক চারটে। নিয়ম অনুযায়ী সূর্যাস্তের আগেই দাহকাজ শেষ করা দরকার। তাহলে সূর্যের শেষ কিরণের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে এই সংসার থেকে চিরবিদায় নিতে পারেন তিনি।

গান্ধীজীর জ্যেষ্ঠপুত্র হীরালালের অনুপস্থিতে পিতার অন্ত্যেষ্টি অধিকার পেয়েছে দ্বিতীয় পুত্র রামদাস। এটাই হিন্দুর শাস্ত্ররীতি। তাই ছোটভাই দেবদাসকে নিয়ে সে তখন স্তূপ করে রাখা চন্দনকাঠের ঢিপির ওপর উঠে গেল। তারপর ঘি, মাখন, নারকেল তেল আর কর্পূর ও সুগন্ধীদ্রব্য মাখিয়ে দিল চিতার গায়ে।

দূর থেকে ফুলের শয্যায় শুয়ে থাকা ওই কৃশ মানুষটির আবছা রেখামূর্তির দিকে চেয়ে ছিলেন মাউন্টব্যাটেন। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর মনে হলো ভারতে তাঁর স্বল্পকালীন অবস্থিতির মধ্যে গান্ধীজীর সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতাই তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। এই এক বছরের পরিচয়ের মধ্যে অনেক গভীরভাবে এই মানুষটিকে তিনি জেনেছিলেন। এখন তিনিই শেষ শয্যায় শুয়ে আছেন। মনে হচ্ছে, 'অনেক ক্লান্তির পর নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমচ্ছেন তিনি।' আর কিছুক্ষণ পরে 'আমাদের চোখের সামনেই জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মধ্যে হারিয়ে যাবেন চিরকালের মতন।'

www.pathagar.com

রামদাস এবার পাঁচবার উত্তর-দক্ষিণে সাজানো চিতা প্রদক্ষিণ করলো। শবমুখে অগ্নিপ্রদান করবার জন্য জ্বলন্ত একটি পাটকাঠি হাতে নিল সে। পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করলো। দেবাশ্চাগ্নিমুখাঃ সর্বে...ইত্যাদি। অগ্নিগ্রহণ করার পর শবমুখে অগ্নিপ্রদান করলো সে দক্ষিণমুখ হয়ে। প্রথমে কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ শিথিল পায়ে নাচতে নাচতে চললো আগুনের শিখাটি। তারপর চন্দনকাঠের সংস্পর্শে এসে দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো চিতা ও শবদেহ। তখন বিখ্যাত শান্তিস্তোত্রটি উচ্চারণ করা হলো ঃ

অসতো মা সদ্‌গময়ো
তমসো মা জ্যোতির্গময়ো
মৃত্যোর্মামৃতম গময়ো

(আমাদের অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোকে, মৃত্যু থেকে অমরত্বের দিকে নিয়ে চল।)

চুল্লী থেকে তখন পাক দিয়ে ধুঁয়া উঠছে। সেই ধূমায়িত আগুনের দিকে চেয়ে ব্যথায় ভারী হয়ে উঠলো যমুনাতীর পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা জনতার বুকগুলি। মেয়েদের আবেগটাই বেশি। গান্ধীজীর দেহবিনাশের এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে ওরা বিলাপ করে উঠলো। হঠাৎ পামেলা মাউন্টব্যাটেন লক্ষ্য করলো যে তার আসনের পিছনে দশ-বারজন মহিলা পাগলিনীর মতন বুক চাপড়াচ্ছে, মাথার চুল ছিঁড়ছে। অনেকে তখনই পরনের শাড়িখানা যেন টেনে খুলে ফেলতে চায়। নিরাপত্তার ক্ষীণ বেষ্টনী ভেঙে ওরা এগিয়ে আসতে চাইছিল। জওয়ানরা উদ্ভ্রান্ত হয়ে ওদের প্রতিরোধের চেষ্টা করতে লাগলো। পামেলা সভয়ে তাকিয়ে ছিল ওই উন্মাদিনীদের দিকে। সে জানতো না যে শোকে বিহ্বল মেয়েরা জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়ে সতী হতে চাইছে। যখন জানলো তখন তার মনে হলো বিপত্তির আভাস পেয়ে ভাগ্যিস তার পিতা ওদের সবাইকে কাদার মধ্যেই বসিয়ে দিয়েছিলেন! তাই এ যাত্রায় তারা রক্ষা পেল। নইলে জনস্রোতের ধাক্কায় তাদের অনেককেই ওই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পড়ে অনিচ্ছুক 'সতী' হতে হতো।

ঘি মাখনের ছোঁয়া পেয়ে চিতার আগুন তখন ফট্‌ফট্‌ শব্দে ফাটছে। আকাশের বুকে ফিনকি দিয়ে উঠছে আগুন। স্তূপ করা চন্দনকাঠের চিতা দাউ দাউ করে জ্বলছে। দেখতে দেখতে চিতায় শোয়ানো বাদামী রঙের শবদেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেল গোলাপী অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে। যমুনার দিক থেকে ধেয়ে আসছিল কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা। সেই শুকনো ঠাণ্ডা বাতাসের ধাক্কায় চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মতন টগবগিয়ে উঠলো আগুন। তেল পোড়া কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠলো আকাশের বুকে। সূর্যাস্তের শেষ কিরণে উদ্ভাসিত আকাশের বুক চিরে ওঠা চিতার কালো ধোঁয়ার দিকে চেয়ে তখন হায় হায় করে উঠলো লক্ষ লক্ষ মানুষ। আকাশ ফাটানো গলায় তারা চিৎকার করে উঠলো, মহাত্মা গান্ধী অমর হো গয়ে! মহাত্মা গান্ধী হ্যাজ বিকাম ইম্‌মরট্যাল!)

সারা রাত লাগলো চিতার আগুন নিভতে। আর সারা রাত ধরেই একজন একজন করে শোকার্ত মানুষ তাঁর চিতাভস্ম প্রণাম করে গেল। তাদের কেবলই মনে পড়ছিল তাঁর কথা। যাঁকে শেষ প্রণাম জানিয়ে গেল, ক'দিন আগেও একজন মহৎ মানুষ হয়ে তিনি সকলের মধ্যে বেঁচে ছিলেন। ভিড়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র

www.pathagar.com

হীরালালও ছিল। মুখ লুকিয়ে সেও প্রণাম করতে এসেছে পিতার চিতাভস্ম। ওকে চিনতে পারে নি কেউ। তাই লক্ষ্যও করে নি তাকে। সমাজে সে এখন পতিত হয়ে গেছে। অপরিমিত মদ্যপান আর অসংযত জীবনযাপনের দরুন সে আজ অচ্ছুৎ। শুধু ক্ষয়রোগ নয়, স্বাস্থ্যও হারিয়েছে সে। তাই পিতার অন্ত্যেষ্টি-অধিকারটিও আজ তার নেই।

আর একজন মানুষও রাতভর পাহারা দিলেন চিতাস্থল। তিনি জওহরলাল। শোকে, বেদনায় শ্রীহীন হয়ে গেছে তাঁর মুখখানি। চিতার আগুন তখনও ধিকি-ধিকি জ্বলছে। অথচ যে মানুষটিকে চিতায় শোয়ানো হয়েছিল তিনি হারিয়ে গেলেন। যাঁকে পরম প্রিয়জন মনে করতেন জওহরলাল, তিনি তাকে অনাথ করে দিয়ে গেলেন আজ। ওই চিতার আগুন যেন জওহরলালের জীবনের একটা অধ্যায় শেষ করে দিয়ে গেল। তাই পরদিন তিনি সূর্যালোকের প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে লাল গোলাপের একটা তোড়া এনে রাখলেন চিতাভস্মের ওপর। তারপর ভাবাবেগে ফিসফিস করে বললেন, 'বাপুজী, আজও আপনার জন্য ফুল এনেছি। এখনও কিছু দেহাস্থি আর ভস্ম পড়ে আছে ওই চিতাস্থলে। কাল আর কিছুই অবশেষ থাকবে না। কাল কোথায় এই ফুল দেব ? আর কাকে বা দেব ?'

* * *

হিন্দুর শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বারো দিন পরে মহাত্মা গান্ধীর চিতাভস্ম হিন্দুর পবিত্র প্রয়াগ সংগমতীর্থে নিমজ্জিত করা হলো। হিন্দুর কাছে এই সংগমতীর্থ খুবই পবিত্র। এই তীর্থেই পুণ্যসলিলা জাহ্নবীর গেরুয়া জল আর যমুনার স্বচ্ছ নীল জলের সঙ্গে অন্তঃসলিলা হয়ে মিশেছেন সরস্বতী, তারপর প্রবাহিত হয়েছেন সাগরের দিকে। সৃষ্টির সেই ঊষাযুগ থেকেই এই পুণ্যধারা প্রবহমান। এর তরঙ্গে নাচতে নাচতে চললো গান্ধীজীর ভস্মাবশেষ। এই পুণ্যধারা দিয়ে বহে গেছে কত লক্ষ লক্ষ মানুষের চিতাভস্ম। তাদের সকলের সুখদুঃখ ভাগ করে নিয়েছিলেন গান্ধীজী। তাই গান্ধীজীর আত্মাও মিলিত হলো এই সম্মিলিত গণআত্মার সঙ্গে। তারপর এক বিন্দু জল হয়ে মিশে গেল অসীম সাগরের বুকে।

যে তামার পাত্রে গান্ধীজীর চিতাভস্ম রাখা হয়েছে সেটিকে দিল্লি থেকে ট্রেনযোগে ৩৯৩ মাইল পেরিয়ে এলাহাবাদে আনা হচ্ছে। ট্রেনের সব কামরাই তৃতীয় শ্রেণীর। এই শেষযাত্রা দেখতে কাতারে কাতারে মানুষ ট্রেন লাইনের দুপাশে জমা হয়েছিল সেদিন। মনে হচ্ছিল, মানুষের এই করিডোরের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে ট্রেনটা। ওরা এসেছে একজন মহান মানুষের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। অবশেষে ট্রেন এসে পৌঁছাল এলাহাবাদ স্টেশনে। তারপর তামার টাটটি ট্রেন থেকে নামিয়ে একটা গাড়ি করে নদীতীরে তোলা হলো। সেখানেও দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। ওদের সকলের জয়ধ্বনির মধ্যে তাম্রপাত্রটি তোলা হলো সেনাবাহিনীর একটা উভয়চর শকটে। শকটের নাম 'দ্য ডাক্।' ডাঙায় চলে আবার জলেও ভাসে। শকটে তোলার পর 'ডাক্' নামে এই য়্যামফিবিয়স জলযানটিকে মাঝ নদীতে নিয়ে আসা হলো।

সেদিন ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই উভয়চর ফুলে ছাওয়া শকটটির মধ্যে তাম্রাধারটি আগলে বসেছিলেন খুবই ঘনিষ্ঠ কয়েকজন। নেহরু, প্যাটেল, মনু, আভা

www.pathagar.com

এবং গান্ধীজীর দুইপুত্র রামদাস ও দেবদাস। শকটটি জলে ভাসানের সংগে সংগে তাকে অনুসরণ করে সাঁতার দিয়ে চলেছিল কয়েক লক্ষ শোকার্ত মানুষ।

অবশেষে আসন্ন হলো সেই পরমলগ্ন। তখন ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বেদমন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছিল। তার সংগে মিশে গেল সানাইয়ের করুণ সুর। হাজার লক্ষ শোকবিহ্বল মানুষ তখন জলে নেমে পড়েছে এই মহান দৃশ্য দেখতে। তারা কপালে পরেছে ভস্মের টিপ আর চন্দনবাটার প্রলেপ। জলে দাঁড়িয়ে নারকেল খোলার মধ্যে দুধ, মিষ্টান্ন, ফুল ইত্যাদি ভরে স্রোতে ভাসিয়ে দিল তারা। তারপর গণ্ডূষ ভরে সেই দুধগোলা নদীর জল তিনবার পান করলো।

জলযান তখন তিন নদীর কিংবদন্তী সংগমে পেঁাছে গেছে। যে তামারপাত্রে চিতাভস্ম রাখা আছে সেটি দু হাতে ধরে ডেকের দিকে এগিয়ে গেল রামদাস। তাকে অনুসরণ করে সবাই তখন এগিয়ে গেছে। এক ঘটি টাটকা দুধ তামার পাত্রে ঢেলে দিল রামদাস। তারপর ধীরে ধীরে নাড়াতে লাগলো দুধমাখা ভস্ম। সবাই তখন শান্তিস্তোত্র আবৃত্তি করলো, 'হে পুণ্যাত্মা, তোমার প্রতি মিত্র সুখপ্রদ হউন, বরুণ সুখপ্রদ হউন, অর্যমা সুখকর হউন।'

স্তোত্রগান শেষ হবার পর যেখান থেকে জাহাজের কামান ছোড়া হয়, সেই 'গানওয়েল'-এর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো রামদাস। তারপর তামার পাত্র কাত করে সেই দুধ গোলা চিতাভস্ম ঢেলে দিল জলের বুকে। স্রোতের সংগে নাচতে নাচতে এগিয়ে চললো ঘন বাদামী ভস্মরাশি। জাহাজের অন্য আরোহীরা তখন নদীর বুকে ঝুঁকে এই দৃশ্য দেখলো। তারপর যুক্তপাণি হয়ে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করলো সেই চিতাভস্মের ওপর।

নদীর মমতাহীন তরঙ্গ যেন বুকের মধ্যে আগলে নিয়ে চলেছে সেই ভস্মরাশি। তার মাথায় শোভা পাচ্ছে গোলাপের পাপড়ি। দেখে মনে হলো যেন মোহনদাস গান্ধীর ভস্মরাশি মাথায় গোলাপ ফুলের মুকুট পরে শেষ তীর্থযাত্রায় চলেছে। দীর্ঘ পথ পেরিয়ে অবশেষে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হবে একজন নিষ্ঠাবান হিন্দুর চিতাভস্ম। এ যাত্রা বড় পুণ্যের। ভাগীরথী সুখ-দায়িনী মাতা ; তিনি পতিত-উদ্ধারিণী, দ্রবময়ি। তিনি বুকে করে নিয়ে চললেন গান্ধীজী দেহাবশেষ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত করতে। রাত্রির আঁধার পেরিয়ে গান্ধীজীর আত্মা এবার এক হয়ে মিশে যাবে সেই পরমব্রহ্মের সংগে। চিদানন্দস্বরূপ সেই মহৎ, যিনি শ্রী শ্রী গীতার ভগবান্—তাঁর সংগে মিশে যাবে গান্ধীজীর আত্মা।

www.pathagar.com

উপসংহার

বেঁচে থেকে মহাত্মা গান্ধী যা পান নি সেই কৃতিত্বটুকু তিনি মৃত্যুর পর পেলেন। তাঁর হত্যাই যেন চিরকালের মতন মানুষে মানুষে এই অবুঝ সাম্প্রদায়িক খুনোখুনি বন্ধ করে দিল। এখন থেকে এই উপ-মহাদেশের দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক রেষারেষি এবং বিরোধের নিষ্পত্তি হবে যুদ্ধক্ষেত্রে। দুই রাষ্ট্রের সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীরা লড়াই করে মীমাংসা করবে সব বিরোধের। এটাই চিরচরিত প্রথা। বিড়লাবাড়ির উদ্যানে সেদিন যে পুণ্যপ্রাণটি মানুষের কল্যাণে নিবেদিত হয়েছিল সেই ঘটনাটাই ক্লাইম্যাকস হয়ে আনন্দ ও শোকের বাঁধনে যুগলবন্দী করে রাখলো ১৯৪৭-৪৮এর এই উপমহাদেশকে।

সেদিনের সেই ট্র্যাজেডির নায়ক নাথুরাম পিস্তল হাতে সভাস্থলেই ধরা পড়ে এবং বিনা প্রতিরোধে পুলিসের হাতে সে গ্রেফতার হয়। একে একে অন্য ষড়যন্ত্রীরাও সত্বর ধরা পড়লো এরপর। আপ্তে এবং বিষ্ণু কারকারে ধরা পড়লো বোম্বাই পুলিসের তৎপরতার জন্য। তাদের বিভাগের চীফ সার্জনের মেয়ের সংগে টেলিফোন মারফত ফষ্টিনষ্টির খেসারত দিতে হলো তাদের। ১৪ই ফেব্রুয়ারি সেন্ট ভ্যালেনটাইন দিবসে আপ্তের বম্বে হোটেলের দরজায় চেনা খুটখুট শব্দ হতেই লাফিয়ে উঠে দোর খুললো আপ্তে। কিন্তু দরজার সামনে কোন যৌবনবতী নয় দাঁড়িয়ে ছিল তিনজন যমদূত পুলিস অফিসার। ওদের দুজনের টেলিফোনের কথাবার্তা আড়ি পেতে শুনেই হোটেলের দরজায় হানা দিয়েছে পুলিসের লোক।

১৯৪৮এর ২৭মে তারিখে মোট আটজন ষড়যন্ত্রকারীকে ট্রায়ালে পাঠানো হলো। আপ্তে, নাথুরাম, গোপাল, মদনলাল, কার্কারে, পরচুরে, সাভারকর ও দিগম্বর বাড়্গের চাকর। শুরু থেকেই হত্যা চক্রান্তের সব দায় নিজের কাঁধে নিয়েছিল নাথুরাম। সে কবুল করলো যে রাজনৈতিক কারণেই গান্ধীজীকে হত্যা করেছে সে। সে একাই এর নায়ক এবং অন্যরা কেউ এই ষড়যন্ত্রের সংগে জড়িত নয়। এমনকি পাগলামির অজুহাত দেখিয়ে কোন মনোবিজ্ঞানী দিয়ে নিজেকে পরীক্ষা করানোর অনুরোধও সে করে নি। সেক্ষেত্রে মানসিক বিকলতা প্রমাণ করা সম্ভব হলে হয়ত সে বেঁচেও যেতে পারতো।

দিগম্বর বাড়্গের ৩৭ বার ধরা পড়া এবং একটিবার সাজা পাওয়ার বিরল রেকর্ডটা কিছুতেই ম্লান হতে দিল না পুলিস। জাল সাধুবাবাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজসাক্ষী করে নিল পুলিস। ফলে বিচার সভায় তাকে দাঁড়াতেই হ'ল না। বরং তারই সাক্ষ্যর ভিত্তিতে আটজনের মধ্যে সাতজন ষড়যন্ত্রকারী সাজা হয়ে যায়। অন্যদিকে উপযুক্ত প্রমাণাভাবে 'বীর' সাভারকরের কোন সাজা হলো না। সে মুক্তি পেল।

বিচারে নাথুরাম ও আপ্তের ফাঁসির হুকুম হলো। বেচারা আপ্তে। এই ষড়যন্ত্রের সংগে জুড়ে থাকার দরুন তাকে অনেক বড়সড় দাম দিতে হ'ল শেষ-পর্যন্ত। ২৭ জানুয়ারি রাত্রে তার না হলো সেই সুন্দরী বিমানসেবিকার সংগে

www.pathagar.com

রঙ্গরসের বৈঠক, না থাকলো প্রাণ। শেষপর্যন্ত ফাঁসির দড়ি গলায় পরে এমন সুখের জীবনের ইতি করতে হলো তাকে। তার ফাঁসির হুকুম হলো কারণ গোয়ালিয়র শহরে যখন সেই মারণাস্ত্রটা সংগ্রহ করা হয়, তখন সেখানে সে উপস্থিত ছিল। বাকী পাঁচজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের রায় দিলেন বিচারক। শুধু দিগম্বরের চাকর এবং পরচুরের বেলায় আপীল আদালতের বিচারফল বিপরীত হলো।

নাথুরাম ও আপ্তের আপীল নাকচ হয়ে যাওয়ায় তাদের ফাঁসির দিন ধার্য হলো ১৯৪৮এর ১৫ নভেম্বর প্রত্যুষে। গান্ধীজীর দুই পুত্র ও আরও কয়েক-জনের স্বাক্ষর করা ফাঁসি রদের আবেদনও নাকচ করে দিলেন গান্ধীজীর মন্ত্রশিষ্য জওহরলাল। ১৫ নভেম্বর ভোরবেলা আম্বালা জেলের সেল্ থেকে বের করে আনা হলো ওদের। তারপর ভারতীয় ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউরের ধারা অনুসারে গলায় দড়ি লাগিয়ে তাদের বধ করা হলো। অবশ্য ফাঁসুড়েকে চোখে না দেখা পর্যন্ত আপ্তের কিছুতেই বিশ্বাস হয় নি যে গান্ধী হত্যার অপরাধে তাকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হবে। কিন্তু ভোর হতেই বন্দীকুঠুরির দোর খুলে যখন তাকে বধ্যমঞ্চের ওপর নিয়ে যাওয়া হলো তখনই তার মনের সংস্কার কেটে গেল। তার ধারণা ছিল যে অন্তত শেষ মুহূর্তেও তার দণ্ডরহিতের আদেশ আসবে। কারণ হাতের রেখায় নাকি সেই রকমই ইংগিত আছে। তাই যখন তাকে ফাঁসি-কাঠের ওপর তোলা হলো তখন তার কাছে এই হস্তলিপি বিজ্ঞানের বুজরুকি প্রমাণ হয়ে গেছে। ফলে ফাঁসিকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই হার্টফেল করে মরলো সে। তখন মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিতে ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে হলো আপ্তেকে।

নাথুরাম তার দানপত্রে উল্লেখ করে যায় যে চিতাভস্ম ছাড়া আর কোন বিত্তসম্পত্তি সে তার পরিবারের জন্য রেখে যাবে না। যে স্বপ্ন চোখে নিয়ে সে এতবড় হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে যতদিন তার সেই স্বপ্ন সফল না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত অমর হবার বাসনাও সে ত্যাগ করেছিল। হিন্দুত্ববাদের সব নিয়ম শাসন থোড়াই কেয়ার করে সে তার বাসনার কথা জানিয়ে দিয়ে বলেছিল যে, তার চিতাভস্ম জলে না ভাসিয়ে যেন বংশপরম্পরায় সযত্নে রেখে দেওয়া হয়। তারপর সিন্ধু নদীর জল সিঞ্চিত এই উপমহাদেশ যেদিন এক হিন্দু সাম্রাজ্যের অধীন হবে যেন তার চিতাভস্ম সিন্ধুর জলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

'বীর' সাভারকারকেও ফাঁসির দড়িতে মরতে হয় নি। অন্তত তিনটি রাজনৈতিক খুনের সংগে জড়িত থাকলেও গোপনে গোপনে এই হত্যাচক্রান্তের সংগে তার সংযোগ প্রমাণ হয় নি। ফলে ৮৩ বছর পর্যন্ত লোকটা বেঁচে ছিল এবং নিজের বিছানায় শুয়েই সে মরতে পেরেছিল ১৯৬৬ সালে।

আপীল কোর্টে পরচুরের বিচারফল বিপরীত হবার পর সে তার কর্মক্ষেত্র গোয়ালিয়র শহরে ফিরে যায় এবং জীবনের বাকী দিনগুলো এলাচগুঁড়া, মধু আর পিয়াজ রসের 'পুরিয়া' তৈরি করে হাঁপানি রোগীদের চিকিৎসা শুরু করে।

রাজসাক্ষী দিগম্বরকে প্রাণের ভয়ে পুণা ছেড়ে বোম্বাই চলে আসতে হয়। তারপর বম্বের পুলিস লাইনের মধ্যে তার থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। পুলিস লাইনের নিরাপদ পরিবেশের মধ্যে বাস করে সে আবার তার পুরনো কারবার শুরু করে দেয়। বুলেট প্রুফ জ্যাকেট তৈরির মস্ত কারবার ফেঁদে বসে

www.pathagar.com

সে। সারা বোম্বাই প্রদেশ জুড়ে তার তৈরি করা জামার কদর বাড়তে থাকে। একটার দাম হাজার টাকা। সারা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতারা প্রাণের দায়ে এই জ্যাকেটের খরিদ্দার হয়ে গিয়েছিল তখন। বলতে কি, ধনে মানে দিগম্বর বাড়্‌গে তখন একজন কেউকেটা লোক।

আইন মোতাবেক শাস্তি পাবার পর কার্‌কারে, মদনলাল এবং গোপাল গড়্‌সে জেল থেকে মুক্তি পেল ১৯৬০ সালের শেষের দিকে। ছাড়া পেয়ে বিষ্ণু কারকারে আহ্‌মেদনগরে ফিরে আসে এবং ডেকান্‌ গেস্ট হাউস চালাতে থাকে। একখানা ঘরে সাতটা চারপাই বিছিয়ে লোকের শোওয়ার ব্যবস্থা করতো সে। চারপাই প্রতি ভাড়া নিত একটাকা চার আনা। দিব্যি জাঁকিয়ে ব্যবসা শুরু করে দিল কার্‌কারে। কিন্তু বেশিদিন বাঁচলো না কারকারে। ১৯৭৪ সালের জুলাই মাসে বুকের অসুখে মারা যায় সে। মদনলাল শেষপর্যন্ত বম্বেতেই থেকে গেল। তার বাসার পিছনদিকে একটা চিলেকোঠার মধ্যে বাচ্চাদের খেলনা তৈরি করতো সে। তখন খেলনার বাজারে জাপানী খেলনার ভারী সমাদর। তা, মদনলাল তার নিজের ঢঙয়ে জাপানীদের খেলনার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছিল: যে মানুষটা একদিন গান্ধীজীকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল তার একটা অসাধারণ শিল্প সৃষ্টির কাজ এখনও অনেক স্থানীয় বয়স্ক মানুষের মনে আছে। তার তৈরি করা একটা রকেট আকাশের বুকে একশ' ফুট উঠে ফেটে যাবার পর প্যারাস্যুটসহ রকেটটা আবার মাটিতে নেমে আসতো।

গোপাল গড়্‌সে পুণাতেই ফিরে গেল। একটা সাদামাটা বাড়ির তিনতলায় সে এখন বাস করে। তার ঘরের কোলে যে ছাত আছে তার একটা দেওয়ালে অখণ্ড ভারতের একটা মস্ত মানচিত্র আঁকা আছে। প্রত্যেক বছর ১৫ নভেম্বর তারিখে নাথুরামের ফাঁসির দিন গোপাল একটা অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান করে। একটা রুপোর পাত্রে নাথুরামের চিতাভস্ম ভরে মানচিত্রের সামনে রেখে দেয় সে। সেদিন বীর সাভারকরের অনেক উৎসাহী শিষ্য গোপালের ঘরে এসে জমায়েত হয়।

তবে কোনরকম অনুতাপ বা দুষ্কৃতিরোধের জন্য মর্মপীড়া দেখাতে কিংবা বিলাপ করতে ওরা এখানে আসে না। ওরা সমবেত হয় শহিদ নাথুরামকে স্মরণ করতে। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে নাথুরাম যাতে হত্যাপরাধী না হয়, তার জন্যও চেষ্টা করে সবাই। টুনি বাল্ব দিয়ে সাজানো মানচিত্রের সামনে বসে সেতারের বাজনা শুনতে শুনতে সবাই মিলে শপথ নেয় যাতে পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, এবং দ্রাবিড়, উৎকল ও বঙ্গদেশ নিয়ে এক বিশাল অখণ্ড হিন্দুরাজ্য স্থাপন করতে পারে। নাথুরামের চিতাভস্ম সামনে রেখে খণ্ডিত মাতৃভূমির লাঞ্ছনার অবসান করার সংকল্প নেয় তারা।

কার্যভার নেবার সময় থেকেই মাউন্টব্যাটেন যা বলে এসেছিলেন তাই করলেন। ১৯৪৮ সালের জুন মাসেই গভর্নর-জেনারেল পদের দায়িত্বভার ছেড়ে দিলেন। যাবার আগের শেষ ক'টি সপ্তাহ হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুরকে সমঝানোর কাজেই তাঁর সময় কেটে গেল। 'কাজের কাজ' কিছুই হ'ল না। নিজাম বাহাদুরকে কিছুতেই বোঝানো গেল না যে স্বায়ত্তশাসিত ভারতে তাঁর স্বাধীন রাজা সাজার স্বপ্ন কতটা অর্থহীন। কিন্তু কিছুতেই টলানো গেল না নিজামকে। সিংহাসনে বসে তিনি তখনও স্বাধীনতার দিবাস্বপ্ন দেখে চলেছেন তন্ময় হয়ে।

www.pathagar.com

তাই ভারত ডোমিনিয়নের সংগে সংযুক্ত হবার কোন যুক্তিই মানলেন না।

দেশে ফিরে যাবার আগে মাউন্টব্যাটেনের পত্নী শ্রীমতী এডুইনার সর্বশেষ অফিসিয়াল কর্তব্য হলো তাঁরই হাতে গড়া দুটো শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করা। এই দুটো ক্যাম্পের অধিবাসীদের সুখ-দুঃখের সাথী তিনি। তাঁর অনেক সময় ও শক্তি এই হতভাগ্যদের জন্য তিনি উৎসর্গ করেছেন। ওরা সে কথা মনে রেখেছে। তাই এডুইনা এসে দাঁড়াতেই দল বেঁধে তাঁকে বিদায় জানাতে এল। তাদের চোখের জলে ভিজিয়ে দিল শ্রীমতীর ফিরে যাবার পথ।

ওঁদের ফিরে যাবার আগের দিন সম্মানিত অতিথিদের উদ্দেশে ভোজসভা দিলেন জওহরলাল নেহরু। পুরনো বড়লাটপ্রাসাদের ডাইনিং হল-এ এই ভোজ-সভার আয়োজন করা হয়েছে। প্রথামত হাতের পানপাত্র উঁচু করে তুলে ধরলেন নেহরু। এই দম্পতির সংগে অনেক প্রীতি ও সখ্যতার বাঁধনে জড়িয়ে আছে তাঁর নিজের স্মৃতি। তাই দুজনের দীর্ঘজীবন কামনা করলেন নেহরু। তারপর শ্রীমতী এডুইনার দিকে চেয়ে বললেন, 'যেখানেই আপনি গেছেন সেখানেই মানুষের ভাঙা বুকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। তাদের হতাশ মনে আশা উৎসাহ যুগিয়েছেন। তাই ভারতবর্ষের মানুষ যে আপনাকে ভালবাসবে, আপনজন ভাববে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'

তারপর লুই মাউন্টব্যাটেনের দিকে চেয়ে বললেন, 'স্যর, খ্যাতির মুকুট মাথায় পরে আপনি ভারতে এসেছিলেন। এদেশে এসে অনেকেরই খ্যাতি বিপর্যস্ত হয়েছে। আপনার হয় নি। যদিও খুবই কঠিন ও সমস্যাবহুল সময়ের মধ্যে আপনাকে পথ চলতে হয়েছে তখন। এ এক অসাধারণ কৃতিত্ব আপনার।'

নেহরুর কথার সংগে এবার নিজের কথাগুলো জুড়ে দিলেন প্রতিদ্বন্দ্বী প্যাটেল। তারপর মাউন্টব্যাটেন দম্পতির দিকে চেয়ে বললেন, 'বন্ধুত্ব ও সহ-যোগিতার মাধ্যমে আপনারা যা পেয়েছেন সেই অমূল্য ধন হেলায় হারিয়েছিলেন আপনার পূর্বসূরীরা। কারণ সর্বদাই তাঁরা নিজেদের আলাদা করে রাখতেন এবং কিছুতেই এদেশের নেতৃবর্গকে আস্থার সংগে মেনে নেন নি।'

পরের দিন সকালেই ল্যুতেন (Lutyen) রাজপ্রাসাদ থেকে বিদায় নিলেন এই সম্মানিত দম্পতি। পনেরো মাস আগে যে স্বর্ণখচিত রাজশকট চড়ে এই প্রাসাদভবনের সোপানশ্রেণীর পাদদেশে এসে তাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন, সেই সোপান-শ্রেণী বেয়েই তাঁরা এসে উঠলেন ছয় ঘোড়ার ল্যাণ্ডো গাড়ির মধ্যে। একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটলো তখন। ছয় ঘোড়ার ল্যাণ্ডোশকটের একটা ঘোড়া কিছুতেই নড়তে চাইল না। সে এক মহা বিড়ম্বনা যেন। এই অনিচ্ছুক অবলা জীবটির কাণ্ড দেখে সবাই তটস্থ। কী হয়, কী হয় ভাব সবার। হঠাৎ অপেক্ষমান জনতার ভিড় থেকে কে যেন চেঁচিয়ে বলে উঠলো, 'এটা ভগবানের নির্দেশ। তিনিও চাইছেন যে ভারতেই থেকে যান আপনারা।' লোকটার এই আচমকা মন্তব্য যেন দিল্লীতে ওঁদের বিক্ষুব্ধ ক'টি মাসের অবস্থানের প্রতি দেশবাসীর স্বতঃপ্রণোদিত শ্রদ্ধার্ঘ হয়ে রইল।

মহম্মদ আলি জিন্নার বোম্বাই প্রবাসী যে ডাক্তার বন্ধুটি তাঁর ফুসফুসে ক্ষয়রোগ সংক্রমণের সন্ধান পেয়ে জিন্নার আয়ুষ্কাল নির্দিষ্ট করেছিলেন, তাঁর

www.pathagar.com

বিচারে ভুল ছিল না। কারণ, নির্ধারিত সময়ের তিন মাসের মধ্যেই মহম্মদ আলি জিন্নার দেহাবসান হয়। অর্থাৎ তাঁর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক শত্রু মোহনদাস গান্ধীর নিহত হবার ঠিক আট মাস পরেই এই উপমহাদেশের বুকে আর একটি উল্কাপাত হলো।

যে ব্যক্তিগত সাহস ও দুর্জয় নির্ভীকতা তাঁর সব কাজকে অনুপ্রাণিত করতো, সেই সাহস ও তেজ দিয়েই তাঁর সাধের রাষ্ট্র পাকিস্তানের ভবিষ্যত গড়ে দিতে চেয়েছিলেন জিন্না। যতদিন সামর্থ্য ছিল ততদিন চালিয়ে গেছেন এই দেশ গড়ার কাজ। তারপর দেহ রাখলেন ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে। যে করাচি শহর তাঁর জন্মস্থান এবং এক মহান ইসলামিক রাষ্ট্রের অস্থায়ী রাজধানী, সেই করাচির মাটিতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার যে মৃত্যু শয্যাতেও তাঁর আপসহীন তেজ বজায় রেখেছিলেন জিন্না। রাত দশটা বাজার দশ মিনিট আগে ডাক্তার যখন মুমূর্ষু জিন্নার মুখের ওপর ঝুঁকে ফিসফিস করে বললেন, 'স্যর, আপনাকে একটা ইঞ্জেকশন দিলাম। খোদাতালার ইচ্ছায় এবার আপনি বেঁচে উঠবেন।' কায়াদ-এ-আজম তখন স্থির দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে চেয়ে আছেন। তাঁর শেষ দেখা মানুষ এই ডাক্তারই। সেইভাবেই ঝকঝকে চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জিন্না মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, 'নো, আই অ্যাম নট, বেঁচে উঠবো না আমি।' এর ঠিক আধ ঘণ্টা পরেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন জিন্না।

জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই জিন্নার দেশ সবচেয়ে কঠিন সময়টা পেরিয়ে এলেও, দেশের মধ্যে গণতান্ত্রিক কাঠামোটি টিকিয়ে রাখা গেল না। ১৯৫৮ সালেই ফীল্ড মার্শাল আয়ুব খাঁর নেতৃত্বে যে মিলিটারি ক্যু হলো তাতেই ইতি হয়ে গেল দীর্ঘদিনের দুর্নীতিপরায়ন অসামরিক সরকারের। আয়ুব খাঁর সামরিক শাসন চলেছে এক্ দশক। দেশ তখন গণতান্ত্রিক স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছে। সেখানে তখন চলেছে একাধিপতির নিরঙ্কুশ শাসন। সে শাসন স্বেচ্ছাচারী হলেও কার্যকর শাসন বলা যায়। যাই হ'ক, এক দশক আয়ুব খাঁর শাসন চলার পর আর একটা সামরিক অভ্যুত্থান হলো এবং আয়ুব খাঁর সরকারের অবসান হলো।

তারপর ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ যুদ্ধের অপ্রীতিকর কিছুটা বা অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতার পর পাকিস্তানের রাষ্ট্রিক প্রেক্ষাপট যেন পুরোপুরি বদলে গেল। পাকিস্তানের এই অনিবার্য ভবিতব্যের ইঙ্গিতটি অনেক আগেই মাউন্টব্যাটেন দিয়েছিলেন। দুই অংশের এই মিলন যে ২৫ বছরও টিকবে না সেই দৃশ্যপটটি মাউন্টব্যাটেন যেন সেদিনই দেখেছিলেন। মোটকথা ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ যুদ্ধের পরেই জুলফিকার আলি ভুট্টোর নেতৃত্বে পাকিস্তানে আবার অসামরিক শাসন ফিরে আসে। তবে পাকিস্তানের ভাগ্যে যেন নিরবচ্ছিন্ন শান্তি নেই। সীমান্ত প্রদেশের বিক্ষুব্ধ উপজাতির উৎপাত লেগেই রইল। অমন পরাক্রমশালী ব্রিটিশ সরকারও যাদের শায়েস্তা করতে পারে নি, তারা যেন চিরক্ষণের অশান্তি হয়ে বিরাজ করতে লাগলো পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের মনে। তবুও বলা যায় যে, বাংলাদেশ যুদ্ধের পরিণতি পাকিস্তানের পক্ষে সাপে বর হয়ে দাঁড়ায়। তখন যথার্থই একজাতিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে পাকিস্তান। তাছাড়া পাকিস্তানের দোদুল্যমান অর্থনীতিতেও নতুন জোয়ার এল। ধনী মুসলমান তৈলদেশগুলি থেকে নিয়মিত আর্থিক সহযোগিতার আশ্বাস পেল পাকিস্তান।

www.pathagar.com

তাই বলা যায় ১৯৭৫ সাল থেকে পাকিস্তানের রাজনীতিক জীবনে যে সুস্থির ভাব আসে তেমনটি আর কখনও ঘটে নি।

সেইসময়েই করাচি শহরের পাহাড়ের মাথায় একটি স্মৃতি মন্দির তৈরি করা হয়। এই স্মৃতিমন্দিরের মধ্যেই রক্ষিত আছে পাকিস্তানের জনক ও প্রতিষ্ঠাতার সমাধি। পাহাড়ের মাথার ওপর নির্মিত এই উন্নতশীর্ষ স্মৃতিসৌধের দিকে তাকালে মনে হয় যেন ওই সর্বশেষ মোগলবীরের জন্য এর চেয়ে আর কোন যোগ্য শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা যায় না।

মহাত্মা গান্ধীর কথাই ফলে গেল শেষ পর্যন্ত। দেশভাগের উত্তরাধিকার পেল দু দেশেরই মানুষ। বছরের পর বছর ধরে বনিবনার অভাব দুটো দেশের মানুষকেই যুদ্ধমান করে তুললো ক্রমশ। এরই ফল হলো দুটো বিধ্বংসী যুদ্ধ। একটা ১৯৬৫তে অন্যটা ১৯৭১এ। একই মাতৃগর্ভজাত দু দেশের মানুষ একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করলো দুবার। এই লড়াইয়ের জের টানতে হলো দু দেশের মানুষকেই। দুটো দেশেরই অর্থভাণ্ডার উজাড় হয়ে গেল এর ফলে। সম্পদ গড়ে ওঠার বদলে বিনষ্ট হলো দেশের সম্পদ। ধারাবাহিক খরচের বোঝায় বিপন্ন হয়ে উঠলো মানুষ। কোথায় পরিমিত সম্পদের সদব্যবহার করে বুননের পরিকল্পনা করবে, নিরন্ন মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেবে, তার বদলে দু দেশের মানুষ পেল রাশি রাশি অফলপ্রসূ, নির্মম যুদ্ধোপকরণ।

তবে একটা ক্ষেত্রে বিস্ময়কর কর্মতৎপরতার বিকাশ ঘটিয়েছিল দুই দেশ। সেই ক্ষেত্রে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন। লক্ষ লক্ষ বাস্তুচ্যুত পাঞ্জাবী যে বন্ধ্যা কৃষিভূমি ধারণের প্রেরণা পেয়েছিল সেদিন। ১৯৪৭-এর শরতে পাঞ্জাবের যে বন্ধ্যা কৃষিভূমি মানুষের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল সেখানেই ফল ফলাবার আশায় সুখের মুখ দেখতে পেল মানুষ। আবার ফললো সোনালী গম, সরষের ফসল, রাশি রাশি সাদা তুলোর ঝাড় আর ঘন সবুজ রঙের ইক্ষুদণ্ড। পাঞ্জাবের শিখ অধিবাসীরা ভারতের বুকে সবুজ বিপ্লবের সূচনা করেছিল মধ্য সাতের দশকের আগেই। সারা পৃথিবীজুড়েই তখন ঘনিয়ে উঠেছে তীব্র তৈলসংকট। কিন্তু তার ঢের আগেই ভারতকে তার স্বপ্ন-সম্ভবের দোরগোড়ায় এনে দিয়েছিল পাঞ্জাবের মানুষ। দেশকে খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর করে দিয়েছিল তারা।

তবে সমৃদ্ধি ফিরে এলেও ওদের স্মৃতি থেকে ইতিহাসের বৃহত্তম জনপরিযানের বীভৎস দুঃস্বপ্ন একেবারে মুছে যায় নি। র‍্যাডক্লিফের পেনসিল যে সীমান্তরেখা টেনে দিয়েছিল তার দুপাশের মানুষের মধ্যে তখনো সপত্ন ঘৃণা ও বিদ্বেষ তীব্রভাবে বিদ্যমান। তখনো সেই পুরনো বিদ্বেষ ও ঘৃণার জের টেনে চলেছে মানুষ। তাই হতভাগ্য বুটা সিং এবং তার হরণকারীর কবল থেকে দাম দিয়ে কেড়ে নেওয়া সেই মুসলমানী যুবতীর সম্পর্কটা লক্ষ লক্ষ পাঞ্জাবীদের মনে যেমন আত্মকলহের প্রতীক হয়ে দাঁড়াল, তেমনি আনন্দময় জীবনের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা যে, কোনও একদিন মানুষের ঘৃণাকেও ছাপিয়ে উঠবে, তার আশা সঞ্চার করলো।

বুটা ও জেনাবের বিয়ের এগার মাস পরে ওদের এক কন্যাসন্তান হয়। মেয়েকে পেয়ে বাপ-মা দুজনের আহ্লাদ যেন ধরে না। শিখেদের রীতি অনুযায়ী পবিত্র 'গ্রন্থসাহিব' খুলে বসলো বুটা। তারপর পাতা উল্টে যে অক্ষরটা প্রথম দেখলো

www.pathagar.com

সেই আদ্যক্ষের 'ত' দিয়েই মেয়ের নাম রাখলো 'তনবীর।'

এরপর বেশ ক'টা বছর মেয়েকে নিয়ে ভারী সুখে কাটালো ওরা। হঠাৎ একদিন উৎপাতের মতন বুটারই দুই ভাইপো এসে হাজির। বুটা বিয়ে করায় তার সম্পত্তি, টাকাকড়ি হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে ছোকরা দুজন বেজায় খাপ্পা। হারিয়ে যাওয়া জেনাবের পূর্ব পরিচয়ের কথা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিল তারা। দু রাষ্ট্রের মধ্যে তখন চুক্তি হয়েছে—হৃত রমণীদের তাদের পরিবারের মধ্যে পুনর্বাসন করাতে হবে। ফলে দু দেশের সরকার তখন এই ধরনের হারিয়ে যাওয়া মেয়েদের খুঁজে বেড়াচ্ছিল। বুটার দুই ভাইপোর কাছ থেকে জেনাবের খোঁজ পেয়ে তাকে জোর করে ক্যাম্পে নিয়ে এল তারা। তারপর খোঁজ করতে লাগলো তার পরিবারের লোকদের।

জেনাবকে ডীটেন্‌শন ক্যাম্পে আটক করে রাখার পর বুটা সিং যেন কান্ডা-কান্ডবোধ হারিয়ে ফেললো। সব ফেলে সে দিল্লি ছুটলো। তারপর দিল্লির বড় মসজিদে গিয়ে সে যা করে বসলো তেমন কাজ কোন শিখের পক্ষে করা ঘোরতর অন্যায়। সে দাড়ি ছেঁটে কলমা পড়ে মুসলমান হলো। তার নতুন নামকরণ হলো জমিল আহ্‌মেদ। তারপর পাকিস্তান দূতাবাসে গিয়ে সে তার অপহৃতা বিবিকে ফেরত চাইল। কিন্তু অনেক জল গড়িয়ে গেছে তখন। দু দেশের সরকার চুক্তিবদ্ধ হয়েছে যে প্রথমে দুই দেশের মধ্যে অপহৃতা নারীদের পারস্পরিক বিনিময় হবে। তারপর বিবাহিতা ও অবিবাহিতা দু শ্রেণীর মেয়ে-দেরই ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে তাদের পরিবারের কাছে। সুতরাং বুটার সব চেষ্টাই নিষ্ফল হলো।

তখন ছ'মাস ধরে প্রতিদিন আটক শিবিরে গিয়ে বুটা তার বিবির সঙ্গে দেখা করতো। তারা পাশাপাশি চুপচাপ বসে থাকতো। নিঃশব্দে কাঁদতো। তাদের সুখের স্বপ্ন এমনভাবে হারিয়ে যাবে তা যেন কল্পনাও করে নি তারা। তারপর একদিন শোনা গেল যে জেনাবের পরিবারদের খোঁজ পেয়েছে সরকারী লোকেরা। যাবার দিন ওরা দুজন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে অনেক কাঁদলো। দুজনেই সান্ত্বনা দিচ্ছে দুজনকে। জেনাব 'কসম' খেয়ে বললো যে সে কোনদিন বুটাকে ভুলবে না। সুযোগ পেলেই বুটার কাছে ফিরে আসবে। আবার স্বামী ও মেয়ে নিয়ে সুখে সংসার করবে।

এর পরের ঘটনা বড় করুণ। বুটা তখন মরিয়া। ধর্মান্তরিত হলেও মুসলমান সে। সুতরাং অধিকার বলেই সে পাকিস্তানে অভিবাসী হতে চাইল। কিন্তু তার আবেদন নামঞ্জুর করলো কর্তৃপক্ষ। তখন সে ভিসার জন্য আবেদন করলো। সে আবেদনও অগ্রাহ্য হলো। তখন প্রায় অর্ধোন্মাদ হয়ে গেছে বুটা। মেয়েকে নিয়ে চোরাই পথে সীমান্ত পেরিয়ে সে পাকিস্তানের লাহোর শহরে গিয়ে পৌঁছোল। তারপর লাহোরের এক সহৃদয় মানুষের কাছে মেয়েকে রেখে সে গিয়ে উপস্থিত হলো জেনাবের গ্রামে। কিন্তু সেখানে গিয়ে সে দারুণ এক মানসিক ধাক্কা খেল। সে শুনলো যে জেনাবকে গ্রামে ফিরিয়ে আনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এক জ্ঞাতি ভাইয়ের সঙ্গে তার 'শাদি' দেওয়া হয়েছে। অত্যন্ত নিষ্ঠুর সেই খবর শুনে হাউ হাউ করে সে যখন কাঁদছে, তখন জেনাবের বাড়ির লোকজন তাকে বেধড়ক মারধর করলো। তারপর একজন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসাবে তাকে পুলিসের হাতে ধরিয়ে দিল।

www.pathagar.com

অভিবাসন আইন অনুসারে বুটার বিচার শুরু হ'ল লাহোর শহরে। আসামী বুটা নিজের সপক্ষে দাবি করলো তার বিবিকে। কারণ ধর্মান্তরিত হলেও সে মুসলমান। বিচারকের কাছে সে মিনতি করলো যেন একটিবারের জন্য তার দেখা করার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। তখন সে নিজেই জিজ্ঞেস করবে যে মেয়েকে নিয়ে সে তার স্বামীর সঙ্গে ভারতে ফিরে যেতে চায় কিনা।

এবার আর বুটার আবেদন অগ্রাহ্য হলো না। সাতদিন পরে আদালত প্রাঙ্গণে এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হলো। সেদিন কোর্টঘরে লোক যেন আর ধরে না। খবরের কাগজ পড়ে অনেকেই এসেছে এই বিচিত্র মামলা দেখতে। এসেছে জেনাবের পরিবারের ক্রুদ্ধ আত্মীয়স্বজন তার ওপর তাদের স্বত্বাধিকার কায়েম করতে। ওরাই আগলে এনেছে ভীতা ত্রস্তা জেনাবকে। বুটাও এসেছে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। জেনাব এসে পৌঁছতেই বুটাকে দেখিয়ে জজসাহেব তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি একে চেন ?'

কাঁপতে কাঁপতে জেনাব বললো, 'হ্যাঁ হুজুর, চিনি। ও আমার প্রথম স্বামী বুটা সিং।' তারপর নিজের মেয়েকেও চিনিয়ে দিল জেনাব।

এবার জজসাহেব জেনাবকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি ওদের সঙ্গে ভারতে ফিরে যেতে চাও ?'

জেনাব চুপ। বুটা তাকিয়ে আছে জেনাবের দিকে। তার চোখে ব্যগ্র মিনতি। যে মেয়েটা তার জীবন সুখ দিয়ে, আনন্দ দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছিল, সে আজ ফিরিয়ে দেবে তাকে ? জেনাব কি বলবে ? তার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে আছে তার পরিবারের ক্রুদ্ধ লোকজন। সে বুঝতে পারছিল ওদের জ্বলন্ত দৃষ্টি যেন পুড়িয়ে দিতে চাইছে তাকে। শুধু ওরা নয়। এই কোর্ট ঘরের সব মানুষই তাকিয়ে আছে তার দিকে। পুরুষরা তাদের দৃষ্টির শাসনে তাকে বলতে চাইছে যে তার শরীরে বইছে পবিত্র মুসলমানের 'খুন।' এর পবিত্র অধিকার যেন সে রক্ষা করে। কোর্টঘরের সর্বত্র তখন টানটান উত্তেজনা। থমথম করছে পরিবেশ। মরিয়া হয়ে তাকিয়ে আছে বুটা। সে চেয়ে আছে তিরতির করে কাঁপা জেনাবের পাতলা ঠোঁট দুটির দিকে। তার দৃঢ় ধারণা হলো যে জেনাব তাকে নিরাশ করবে না। একটা অসহ্য নীরবতা অনেকক্ষণ ধরে কোর্ট-ঘরখানা ঢেকে রেখেছে। হঠাৎ সেই থমথমে নীরবতা ভেঙ্গে চাপা স্বরে জেনাব বলে উঠলো, 'না।'

জেনাবের জবাব শুনে তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠলো বুটা। এক ঝলক অবসাদ যেন তার সমস্ত উৎসাহ নিবিয়ে দিয়েছে তখন। কোনরকমে পিছু হটে রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল সে। তারপর মনের ঝড় তখন একটু শান্ত হলো, তখন এক হাতে মেয়েকে ধরে কোর্টঘর আড়াআড়ি পেরিয়ে এসে দাঁড়াল জেনাবের সামনে। বুটার দৃষ্টি স্থির। জেনাবের দিকে মেয়েকে এগিয়ে দিয়ে সে বললো, 'এই তোমার মেয়ে। তোমার মেয়েকে আমি কেড়ে নেব না। তাই ওকে তোমার কাছেই রেখে গেলুম।' এই বলে পকেট থেকে এক গোছা টাকা বের করে জেনাবের হাতে দিয়ে বললো, 'আমারও জীবন শেষ হয়ে আসছে।'

কোর্টঘরে তখন যেন নাটক হচ্ছে। সবাই বিভোর হয়ে দেখছে এই মর্মস্পর্শী দৃশ্য। জজসাহেবও অভিভূত। খানিক পরে যখন তাঁর সংবিত ফিরে এল,

www.pathagar.com

তখন জেনাবের দিকে চেয়ে শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি তোমার মেয়েকে কাছে রাখতে চাও?' ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে জেনাব। কি উত্তর দেবে সে? আবার সেই বুকচাপা নৈঃশব্দ্যে ঘরখানা ভরে গেছে। জেনাবের পুরুষ আত্মীয়রা সবেগে মাথা নেড়ে তাকে না বলতে ইংগিত করলো। তাদের ছোট সামাজিক গন্ডীর মধ্যে কোন শিখ রক্তের দূষণ ঢুকতে দিতে চায় না তারা। ওদের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে দারুণ হতাশায় ভরে উঠলো জেনাবের মন। মেয়ের দিকে নিরাশ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। মেয়েটা যেন তার গর্ভের সন্তান নয়। সে এখন বেশ বুঝতে পারছে যে মেয়েকে গ্রহণ করলে অপরিসীম দুর্দশার মধ্যে তাকে পড়তে হবে। তাই মনস্থির করে ফেললো সে। কান্নার দমকে শরীরটা কেঁপে উঠলেও স্থির শান্ত স্বরে সে আবারও বললো, 'না।'

জেনাবের উত্তর শুনে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো বুটা। সজল চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল তার বিবির দিকে। সেও তখন কাঁদছে। বুটা হয়ত চেষ্টা করছিল তার বিবির অস্পষ্ট মুখের চেহারাটা তার মনের মধ্যে গেঁথে রাখতে। অনেকক্ষণ একইভাবে তাকিয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে মেয়ের হাত ধরলো বুটা। তারপর একবারও পিছনে না তাকিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল কোর্টরুম থেকে।

হতাশ মানুষটা সারা রাত ধরে পীর গংগ্ বক্স্-এর দরগায় বসে হাউ হাউ করে কাঁদলো। তখন দরগার একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে মেয়েটা ঘুমচ্ছে। সারা রাত একবারও দুচোখের পাতা এক করলো না বুটা। তারপর ভোরের আলো ফুটলে মেয়ের হাত ধরে সে কাছাকাছি একটা বাজারে গিয়ে মেয়ের জন্য অনেক জিনিস কিনলো। শৌখিন ফ্রক, সোনালী রঙের কাজ করা জুতো ইত্যাদি। তারপর মেয়ের হাত ধরে এসে দাঁড়াল কাছাকাছি শাহ্দারা রেলস্টেশনে। প্ল্যাটফর্মে ট্রেনের জন্য দাঁড়িয়ে থাকার সময়ই বুটা প্রথমবার মায়ের কথা বললো মেয়েকে। মেয়ে এই প্রথম জানলো যে আর কখনও তার মাকে সে দেখতে পাবে না।

দূর থেকেই শোনা যাচ্ছিল ট্রেনের ঝক্ঝক্ শব্দ। খানিকক্ষণের মধ্যেই বাঁশি বাজিয়ে স্টেশনে ঢুকলো ট্রেন। বুটা তখন মেয়েকে কোলে তুলে আদর করলো। চুমু খেল। তারপর প্ল্যাটফর্মের ধারে এসে দাঁড়াল বাপবেটি। তার মুঠোর মধ্যে মেয়ের হাতটা তখন শক্ত করে ধরা। হুড়মুড় করে ট্রেনটা ঢুকে পড়লো স্টেশনে। হঠাৎ একটা কান্ড করে বসলো বুটা। মেয়েকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো এগিয়ে আসা ইঞ্জিনের সামনে। একটা হৈ হৈ চিৎকার উঠলো যাত্রীদের মধ্যে। মেয়েটাও কানে শুনলো সেই চিৎকার, ট্রেনের হুইস্ল্ আর তার নিজের আর্তনাদ। তারপরই সব অন্ধকার হয়ে গেল তার চোখে।

বুটা সিং তখনই মারা গেল। কিন্তু আশ্চর্য করুণাময়ের লীলা। মেয়েটা অলৌকিক ভাবে বেঁচে গেল। সবাই তখন ধরাধরি করে তাদের তুলেছে। বুটার শরীরটা খন্ড খন্ড হয়ে গেছে ট্রেনের ধাক্কায়। ভেসে যাচ্ছে রক্তে। বুটার জামার মধ্যে একটা ছোট্ট চিঠি পেল ওরা। জেনাবকে লেখা চিঠি। এটাই শেষ চিঠি বুটার। বুটা লিখেছে, 'প্রিয়তমে জেনাব, আমি জানি, লোকের সামনে তুমি যা বলেছো সেটা তোমার মনের কথা নয়। কারণ তুমি সকলের কথা শুনেছো। তবু তোমাকেই, আমার শেষ বাসনার কথা জানিয়ে গেলুম। তোমাদের গ্রামের মাটিতেই

www.pathagar.com

আমার কবর দিও। আর মাঝে মাঝে এসে আমার সমাধিতে ফুল দিয়ে যেও।'

বুটার এই আত্মহত্যা সারা পাকিস্তান জুড়ে দারুণ উন্মাদনার সৃষ্টি করলো। সবচেয়ে স্পর্শকাতর হলো তার অন্ত্যেষ্টির দিনটা। বুটার মৃত্যু যেন একবছর আগে পাঞ্জাবের সেই ভয়ংকর দাঙ্গার কথা মনে করিয়ে দেয়। জেনাবের দ্বিতীয় স্বামী ও তার পরিবারের লোকজন তখন প্রতিশোধপরায়ণ হয়েই গ্রামের মধ্যে বুটার কফিন ঢুকতে দিল না। সেটা ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭ সালের ঘটনা।

সরকারী মহলে একটা নতুন সমস্যা হলো বুটার শব নিয়ে। সারা মুলুক জুড়ে তখন টানটান উত্তেজনা। পাছে নতুন করে দাঙ্গা বেধে যায়, তাই সরকারী আদেশে বুটার শবাধার লাহোরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। তারপর লাহোরের কবরখানায় একরাশ ফুলের তলায় ঢাকা পড়লো বুটার শবাধার।

কিন্তু জেনাবের বাড়ির লোকজনের আক্রোশ কিছুতেই কমলো না। গুণ্ডা দিয়ে তারা কবর খুঁড়ে বুটার শব বার করে আনলো। কবরটাও নষ্ট করে দিল। ওদের এই জঘন্য কাজের কথা শুনে লাহোরের মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। নতুন করে বুটার সমাধি তৈরি হলো এবং কয়েকশ' মুসলমান যুবক দিনরাত পাহারা দিল ওই ধর্মান্তরিত বুটার শবাধার। সেদিন এই ক'টি উদার মন স্বপ্ন দেখেছিল যে কোনও একদিন তাদের এই মহৎ কাজ পাঞ্জাবের বুক থেকে চিরকালের মতন ১৯৪৭-এর সেই বীভৎস দিনগুলির স্মৃতি মুছিয়ে দিতে পারে..

রাজঘাট শ্মশানের যে চুল্লির ওপর গান্ধীজীর শ্মশানশয্যা পাতা হয়েছিল সেখানেই একটা কালো পাথরের ফলক বসানো হয়েছে। ভারতের হারিয়ে যাওয়া মহাত্মার স্মৃতিফলক এটি। ১৯৪৮ সনের ৩১ জানুয়ারি তারিখে এই স্মৃতিফলকটি বসানো হয়। ফলকের গায়ে স্বাধীন ভারতের জন্য গান্ধীজীর ইচ্ছাপত্রটি হিন্দী ও ইংরিজিতে উৎকীর্ণ করা আছে।

'আমি সেই স্বাধীন ও নির্ভীক ভারত দেখতে চাই, যে ভারত বিশ্বের মঙ্গলের জন্য স্বেচ্ছায় আত্মবলিদান করবে। ব্যক্তি যেমন পরিবারের শুভাশুভের জন্য আপনাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেয়, ঠিক তেমনি নিঃস্বার্থ আত্মবলিদান করবে পরিবার তার গ্রামের জন্য, গ্রাম তার জেলার জন্য, জেলা তার প্রদেশের জন্য, প্রদেশ তার জাতির জন্য এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করবে জাতি। আমি সেই 'খুদাই রাজ' চাই। কামনা করি, আমার ভারত সেই স্বর্গে জাগরিত হ'ক।'

অবশ্য গান্ধীজীর স্বপ্ন অলীকই থেকে গেল শেষ পর্যন্ত। আধুনিক প্রযুক্তির ছলাকলা আর শিল্পোন্নয়নের হাতছানি এড়িয়ে যেতে পারলো না তাঁর দেশের মানুষ। অন্য পাঁচটা দেশের মতন তারাও এই প্রলোভনের শিকার হয়ে উঠলো। যে ভয় তিনি করেছিলেন তাই-ই ঘটলো। জীবনের শেষ বছরটিতেই তাঁর রাজনৈতিক উত্তরপুরুষরা তাঁর প্রচারিত আদর্শ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। এই শতাব্দীতে শক্তি ও সাফল্যের শীর্ষে উঠতে যে নীতিপথ মেনে চলা দরকার,

---

* বুটার এই অনাথ মেয়েটিকে মানুষ করেন লাহোরের এক সহৃদয় মুসলমান পরিবার। তার নাম দেওয়া হয় সুলতানা। এক ইঞ্জিনীয়ার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয় সুলতানার। সুলতানা এখন তিন সন্তানের মা। স্বামী এবং ছেলেমেয়ে নিয়ে এখন সে লিবিয়ায় ঘরসংসার করছে।

www.pathagar.com

ভারত সেই পথই বেছে নিল। গান্ধীজীর চরকা আদর্শ অনুসরণ করার বদলে একটা শক্ত দৃঢ় শিল্পোন্নত সমাজ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করলো দেশ। তখন স্বাধীন ভারতের প্রথম যুগের নেতৃবর্গের মুখে মুখে ফিরছে জাতীয় পরিকল্পনা, বিকাশের অনুপাত, মৌল শিল্প ও পরিকাঠামো, ক্রমবর্ধমান চাহিদার আবর্তন ইত্যাদি পরিচিত শব্দাবলী। জড়বাদী সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে এইসব অনুষঙ্গগুলিই তখন মানুষের সবচেয়ে ঈপ্সিত বস্তু। ভারতের পাঁচলক্ষ গ্রামের অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার যে ব্যবস্থাপত্র গান্ধীজী ঘোষণা করেছিলেন, সে সব পরিকল্পনা ধামাচাপা পড়ে গেল আধুনিক সমাজের জড়বাদী আবশ্যকবিধির তলায়। ভারতের গ্রামগুলি পড়ে রইল রেড়ির তেলের যুগে। তার খিড়কির দরজা দিয়েও আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার উপকরণগুলির আনাগোনা হলো না। বদলে, ছোট ছোট শহর ও নগরভিত্তিক রূপরেখা তৈরি হলো। তৈরি হলো বৃহৎ শিল্পকাঠামো আর গান্ধীজীর উত্তরসাধকেরা তাদের বাঞ্ছাপূরণের উল্লাসে-বিভোর হয়ে গেল। এমনকি যে কংগ্রেস দলকে তিনি দেশের মানুষের সেবায় নিয়োগ করবেন ভেবেছিলেন (পীপ্‌ল্‌স্‌ সার্ভিস লীগ), সেই কংগ্রেস দলও প্রথাগত নিশ্চিন্ত পথ বেছে নিল, এবং দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক ফোর্স রূপে আত্মপ্রকাশ করে ক্রমবর্ধমান লোভ ও দুর্নীতির শিকার হয়ে পড়লো স্বাধীনতার প্রথম মাস থেকেই।

সবচেয়ে বিসদৃশ ঘটনাটা ঘটলো ১৯৭৪-এর ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে যখন রাজস্থানের মরুভূমিতে পরমাণুবিক বিস্ফোরণ ঘটালো ভারত। যে দেশের মানী মানুষটি মৃত্যুর আগের দিন মার্কিন সরকারকে পরমাণু বোমা বর্জন করতে বলেছিলেন, সেই দেশেরই সরকার নিরন্নের মুখের গ্রাস বঞ্চিত করে দেশের সমুদয় সম্পদ বন্ধক রেখে এই আনবিক বিস্ফোরণ ঘটালো। সেদিন এই ঘটনাটাই নাটকীয়ভাবে অহিংসা নীতি থেকে ভারতের তফাত করে দিল এবং যে ক'টি হাতে গোনা দেশের অস্ত্রাগারে এই বিধ্বংসী ব্রহ্মাস্ত্রটি সগর্বে রক্ষিত আছে তাদের দলভুক্ত হলো শান্তির দূত মোহনদাস গান্ধীর জন্মভূমির দেশ, ভারতবর্ষ।

তবে গান্ধীজীকে একেবারে ফেলে দিল না তাঁর দেশের মানুষ। তাঁর অহিংসার পথ অসম্ভব স্বপ্ন হলেও অন্য পালনীয় আচারবিচারগুলো ভারী নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে নিল তারা। যে সাদামাটা খাদির পোশাক তিনি দেশের সাধারণ মানুষকে ব্যবহার করতে বলেছিলেন সেই খাদির তৈরি পোশাকটাই হলো মন্ত্রী আমলাদের একমাত্র ইউনিফর্ম। তাঁর আদর্শ না মানলেও নিদেনপক্ষে তাঁকে মনে রাখার (মেমরি ইফ নট দ্য মেসেজ) ব্যবস্থা দেশবাসী সেদিন নিয়েছিল। এমনকি জওহরলালের মতন শৌখিন মানুষটিও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গান্ধীজীর পরিয়ে দেওয়া খাদির পোশাক ব্যবহার করেছেন। পাছে গান্ধীজীর উষ্মার উদ্রেক হয় তাই রাজধানী শহরে ঘোরাঘুরি করার সময় বিদেশী ক্যাডিল্যাক, রোল্‌স্‌ রয়েস বা মার্সিডিস বেঞ্জ গাড়ি না চড়ে ছোটখাট দিশি গাড়ি ব্যবহার করেছেন তিনি।

সারা ভারত জুড়ে ভাষা, মত, সংস্কৃতি বা ব্যবহার চালচলনে কত না অমিল। বিভেদের এই চাপ এবং ইংরেজের বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের একজাতি কাঠামো ভেঙে পড়ার উন্নাসিক হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও, গান্ধীজীর ভারত ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট যা ছিল, তাই-ই রইল। চুরচুর হয়ে ভেঙে গেল না। শুধু তাই

www.pathagar.com

নয়, ভারতের এই সংযুক্ত প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যেই দেশীয় রাজারাজড়ারা তাদের বিপুল এলাকা আর নানা মতের মানুষ নিয়ে প্রায় বিনা আয়াসেই অন্তর্ভুক্ত হলো।

গান্ধীজীর অনেক 'আইডিয়া', একদা যা একজন বৃদ্ধ মানুষের 'কথার কথা' মনে হয়েছে ধীরে ধীরে সেগুলি তাঁর জীবনাবসানের তিন দশকের মধ্যেই সারা পৃথিবীর চিন্তাশীল মানুষের কাছে আস্থাভাজন হয়ে উঠলো। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বিশ্বের সম্পদের যত সংকোচন হতে লাগলো ততই মানুষ বুঝতে শিখলো তাঁর উপদেশের প্রাসঙ্গিকতা। কাগজের অপচয় বন্ধ করতে পুরনো খামের উল্টোপিঠে চিঠির মুসাবিদা করা, শরীর ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু খাদ্যবস্তু গ্রহণ করা, অপ্রয়োজনীয় জিনিসের উৎপাদন বন্ধ করা ইত্যাদির অনুশীলন সাতের দশকেই চালু হয়ে গেল। মানুষ ততদিনে বুঝতে শিখেছে যে এসব নেহাত শৌখিন পাগলামি নয়। দ্রুত সম্পদশূন্য হয়ে যাওয়া এই গ্রহে একজন মানুষের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ব্যবস্থাপত্রও নয়।

আরও একটা ক্ষেত্রে লাঠি হাতে এই শীর্ণ বৃদ্ধকে ভারত মনে রাখবে। মনে রাখবে যে এই দেশের অভুক্ত দুর্ভিক্ষপীড়িত লক্ষ লক্ষ মানুষকে মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনিই। অবশেষে স্বাধীন রাষ্ট্র হয়ে আত্মপ্রকাশ করলো ভারত এবং অবশেষে স্বাধীন হয়ে বেঁচে থাকবে এই দেশ। দীর্ঘদিনের শ্রম ও সংগ্রামের পর ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের মধ্যরাতে ভারত যা হয়েছিল তাই-ই থেকে গেল জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ সত্ত্বেও। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রী দেশ হলো জনবহুল ভারত। কলোনি শাসকদের শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে যে সব দেশ স্বাধীন হয়েছিল তার মধ্যে একমাত্র ভারতের সমাজই খোলামেলা, দেওয়া নেওয়ায় অকপট। একমাত্র এই দেশটিই মানুষকে তার যোগ্য মর্যাদা দেয়। শুধু এই দেশের মানুষই ভিন্ন মত পোষনের অধিকার অর্জন করেছে। তারা যেমন প্রতিবাদ করতে পারে, তেমনি নিজেদের ব্যক্ত করার অধিকারও তাদের আছে। এই একটি দেশ যেখানে সংবাদপত্র স্বাধীন। যেখানে জনগণের স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার আছে। শুধু এই দেশেরই মানুষ সৎ। অবাধ ও গোপন নির্বাচন মারফত তাদের মনোমত সরকার গঠন করতে পারে। ভারতই একমাত্র দেশ যে তার 'পড়শী' চীনকে নকল করার প্রলোভন জয় করেছে এবং তার উন্নয়ন সওদা করতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বোধ অনুভূতিহীন সুশৃঙ্খল যন্ত্রমানবে (রেজিমেন্টেড্ রোবট) পরিণত করে নি। ভারতই একমাত্র দেশ যে ফেরিওয়ালার সস্তা মালের মতন সামরিক একনায়কতন্ত্র নামক বাজারচালু পণ্যটি খরিদ করে একদল 'জো হুজুর' আজ্ঞাবহ জনতার উল্লসিত জয়ধ্বনির মধ্যে তাকে কায়েম করে নি। এমনকি অবাধ্য মানুষকে শায়েস্তা করার গোপন আখ মাড়াই (টর্চার চেম্বার) যন্ত্রও তার নেই।

ভারতের এই কৃতিত্বের আয়তন এত বিপুল যে কোন মাপকাঠি দিয়ে এর পরিমাপ করা যায় না। তাই এই দেশটির প্রতি বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা এমন অকুণ্ঠ। যাঁর জন্য দেশ এই সম্মান ও কীর্তিত্ব অর্জন করেছে তিনিই এদেশের প্রবিসংবাদিত নেতা। দেশকে মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনিই এবং তাঁরই নেতৃত্বে মুক্ত হয়েছে দেশ। তিনি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

www.pathagar.com

সংগম তীর্থে গান্ধীজীর চিতাভস্ম ভাসানোর পনেরো দিন পরের কথা। গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার কংক্রিটের ছায়ার তলায় যে ছোট্ট বিদায় অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হলো তাতেই যেন শেষ হয়ে গেল একটা অধ্যায়। এই অধ্যায়ের শুরু হয়েছিল অনেক বছর আগে ১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাসে, যেদিন বগলে এক খণ্ড 'হিন্দ্‌স্বরাজ' পত্রিকা নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশের মাটিতে পা দিয়েছিলেন গান্ধীজী। শিখ ও গোর্খা বাহিনীর সশস্ত্র অভিভাদন (অনার গার্ড) শেষ হবার পর বেজে উঠলো ভারতীয় নৌবাহিনীর বিদায় সংগীত। তারপর এই ঐকতান বিদায় সংগীতের মধ্যে ধীরে ধীরে কুচকাওয়াজ করে গেটওয়ের কংক্রিট ল্যান্ডিংয়ের দিকে নেমে গেল সমারসেট লাইট ইনফ্যানট্রির ব্রিটিশ সেনারা। স্বাধীন ভারতের মাটি থেকে শেষ ব্রিটিশ সেনারা বিদায় নিল চিরকালের মতন।

ওরা যখন গেট্‌ওয়ে অফ ইন্ডিয়ার জয়স্তম্ভের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে, তখন অন্তর্হিত হয়ে যাওয়া ব্রিটিশ সেনাদের উদ্দেশে সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েক শ' ভারতীয়ও গলা মিলিয়ে গেয়ে উঠলো ওই বিদায় সংগীত। করুণ সেই স্কটিশ বিদায় সংগীত 'ওল্ড লং সিন্‌স্' (Auld Lang Syne) এর মূর্ছনা ছড়িয়ে পড়লো অগণিত মানুষের মধ্যে। সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ ওরা। ব্রিটিশ পুলিসের লাঠির ঘা খাওয়া যেমন কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবক আছে, তেমনি আছে শোকার্ত মহিলা, কিশোর ছাত্র ও দন্তহীন ভবঘুরে ভিখিরীরা। এমনকি ইন্ডিয়ান অনার গার্ড বাহিনীর সৈন্যরাও এই বিশেষ মুহূর্তটির গুরুত্ব বুঝে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলো এবং এই ঐকতানে যোগ দিল। অবশেষে সমারসেট লাইট ইনফান্‌ট্রির সর্বশেষ ব্রিটিশ সোলজারটিও যখন নোঙর করা জাহাজের ডক-এ উঠে পড়লো, তখন সেই সমস্বর বিদায় সংগীত, যা শুনে সমুদ্রযাত্রার সময় সব ইংরেজের মনই বেদনায় ম্লান হয়ে যায়, ছড়িয়ে পড়লো গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে।

এই গান মনে করিয়ে দিল আরও একজনের কথা। তিনি গান্ধীজী। সেই ছোটখাট নির্ভীক মানুষটি, অনেকদিন আগে এক শীতের সকালে এই গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার সিমেন্ট ঢালা গড়ানে পথ (র‍্যাম্‌প্‌) দিয়ে যিনি ভারতের মাটিতে নেমেছিলেন। সেদিন এই জয়তোরণের ছায়ায় একটা যুগ যেমন শেষ হলো, তেমনি শুরু হলো আর একটা যুগেরও। এই নতুন যুগের ভোর এনেছেন গান্ধীজী! পৃথিবীর তিন চতুর্থাংশ মানুষকে ঔপনিবেশিক দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবার মন্ত্র শিখিয়েছেন তিনি। ওই বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে রাজার জাতের শেষ মানুষরা! সমুদ্রের তাজা হাওয়ায় ভর দিয়ে তরতর করে এগিয়ে চলেছে ওদের আনন্দতরী স্বদেশের দিকে। ওদের এই স্বদেশযাত্রা যেন পালা বদলের সূচনা করলো সেদিন। এখন থেকে আগামী পঁচিশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর মানচিত্র নতুন করে তৈরি হবে। ভারসাম্য বজায় রাখতে নতুন করে জোট বাঁধবে শক্তিগোষ্ঠী।

ভারতের দাসত্ব শৃঙ্খল মোচন করতে গান্ধীজী যা করেছিলেন, তেমন ঘটনা আরও অনেক দেশ প্রত্যক্ষ করলো আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এবং ১৯৪৮-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে বোম্বাই শহরের জাহাজঘাটে যেমন অনুষ্ঠান হয়েছিল ঠিক সেইরকম অনুষ্ঠান একদিন তাদের দেশেও হলো।

তবে গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার এই জয়তোরণের ছায়াঢাকা পথে দুই জাতির

www.pathagar.com

মধ্যে যে শুভেচ্ছার বিকাশ হলো, তেমনটি আর কোন দেশের বেলায় হয় নি। ভারতের নিহত আত্মা মোহনদাস গান্ধী এবং বিরল কিছু ইংরেজ ও ভারতীয়, যাঁদের মনে উদ্ভাস হয়েছে তাঁর বাণীর আলো, তাঁদের কাছে এই প্রীতিসুখকর অনুষ্ঠানটি যেন সর্বশেষ স্মারক হয়ে রইল।

www.pathagar.com

উপাদানপঞ্জী

'যে জাতি শাসক হয়ে জন্মেছে'

ক্লিমেন্ট এ্যাটলির সঙ্গে মাউন্টব্যাটেনের সাক্ষাৎকার এবং তাঁদের দুজনের মধ্যে আলাপ আলোচনার উপাদান পেয়েছি মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনা করে এবং তাঁর নেওয়া নোট্স্ থেকে। মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের ভাইসরয় পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত-সংক্রান্ত তথ্যাদি দিয়েছেন ভারতসচিব লর্ড লিস্টোয়েল। পরে নয়াদিল্লিতে কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে দেখা করার পর ওঁর সঙ্গে স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্স্-এর আলোচনার নোট্স্ উনি আমাদের হাতে তুলে দেন। তখনই জানতে পারি মাউন্টব্যাটেনের নিয়োগ নিয়ে নেহরু এবং কংগ্রেস দলের প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটি।

১৯৪৭ সালের লন্ডন শহরের বর্ণনা রচনায় আমরা সাহায্য নিয়েছি সমকালীন সংবাদপত্র প্রতিবেদন থেকে। এর সঙ্গে যোগ করা যায় প্যারিস ম্যাচ-এর রেমণ্ড কার্টারের ফাইলগুলি।

ভারতে ব্রিটিশ নাগরিকদের জীবনযাপন ধারা, আই.সি.এস. ও সামরিক অফিসারদের চালচলনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে অনেকেই অনেক তথ্যাদি দিয়েছেন। কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : যেমন, লর্ড ট্রেভেলিয়ন, স্যার জর্জ এ্যাবেল, ক্রিস্টোফার রেমন্ট, স্যার ওলাফ ক্যারো, স্যার কনরাড্ করফিল্ড ইত্যাদি। প্রকাশিত বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, 'দ্য লাস্ট ইয়ার্স্ অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া', 'ব্রিটেন ইন্ ইণ্ডিয়া', 'দ্য ফল্ অফ ব্রিটিশ এমপায়ার', 'প্যাক্স্ ব্রিটানিকা', 'দ্য হ্যাণ্ডবুক অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া, ১৮৫৪' ইত্যাদি।

একলা চল রে'

গান্ধীজির নোয়াখালি সফরের প্রায় সমুদয় উপাদান পেয়েছি প্যারেলাল নায়ার এবং তাঁর সহোদরা ডাক্তার সুশীলার সঙ্গে আলাপ করে। এঁরা দুজনেই গান্ধীজীর যাত্রাসঙ্গী ছিলেন। অন্য সফরসঙ্গীরাও আমাদের তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। যেমন গুরুচরণ সিং, কিসান চণ্ডীওয়ালা, শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু এবং কে রঙ্গস্বামী। এঁরা সবাই ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর। লিখিত উপাদানের মধ্যে মাত্র একখানি গ্রন্থই আমায় সবচেয়ে প্রভাবিত করেছে এই অধ্যায়টি রচনা করতে। ২০০০ পৃষ্ঠার এই এপিক গ্রন্থের লেখক প্যারেলাল নায়ার। গ্রন্থের নাম, 'মহাত্মা গান্ধী, দ্য লাস্ট ফেজ (Phase)।' এছাড়া সমকালীন কিছু দৈনিক সংবাদপত্রের প্রতিবেদনগুলিও আমাদের সাহায্য করেছে। পত্রিকাগুলি যথাক্রমে টাইম্স্ অফ ইণ্ডিয়া, দ্য হিন্দুস্তান টাইম্স্, দ্য স্টেটসম্যান ইত্যাদি।

লাহোরের আইনজীবী আনোয়ার আলি উদ্যোগী হয়ে পাকিস্তান ম্যানিফেস্টোর মূল টেক্স্টটি আমাদের দেখতে দেন। যাঁর কল্পলোক থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভাবন হয়েছিল সেই রহমত আলির জীবনের অনেক

www.pathagar.com

অপ্রকাশিত অংশের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন এই আইনজীবী ভদ্রলোকটি।

ঈশ্বরই ভারতের ভাগ্যদেবতা'

মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে তাঁর জ্ঞাতিভাই সম্রাট ষষ্ঠ, জর্জের ব্যক্তিগত কথাবার্তার প্রায় সমস্ত তথ্যই পেয়েছি মাউন্টব্যাটেনের ডাইরি থেকে। তা ছাড়া লুই মাউন্টব্যাটেনকে পাঠানো সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের একখানি ব্যক্তিগত চিঠিও আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। সর্বশেষ ভাইসরয়ের যে চিত্রপটটি আঁকা হয়েছে তার উপাদান সংগৃহীত হয়েছে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে। এঁরা হলেন স্বয়ং মাউন্টব্যাটেন এবং তাঁর দুই মেয়ে লেডি ব্রাবোর্ন ও লেডি পামেলা হিক্স্, মাউন্টব্যাটেনের খাস তল্পিদার (Valet) চার্লস স্মিথ এবং তাঁর কয়েকজন সহযোগী যেমন কমোডোর পীটার হয়েস, এ্যালান ক্যাম্প্বেল জনসন, রোনাল্ড ব্রক্ম্যান ও ক্যাপ্টেন স্যর জেম্স্ স্কট। মুদ্রিত উপাদানবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সুইন্সন্ রচিত 'মাউন্টব্যাটেন' এবং টেরেইন (Terraine) রচিত 'লাইফ অ্যান্ড টাইম্স্ অফ লর্ড মাউন্টব্যাটেন' নামক .টি গ্রন্থ। এ ছাড়া ১৯২১ সালে প্রিন্স অফ ওয়েলস-এর সংগী হয়ে ভারতভ্রমণের সময় তাঁর লেখা নোট্স্গুলিও আমরা ব্যবহার করেছি।

এই অধ্যায় গান্ধীজীর নোয়াখালি সফর নিয়ে যে দুটি প্যাসেজ লেখা হয়েছে তার উপাদান সংগ্রহের আধারগুলির উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। ঘনিষ্ঠ জীবনযাত্রার বিবরণের জন্য সাক্ষাৎ করেছি নায়ার ভাইবোন, গুরুচরণ সিং, আচার্য কৃপালনী, জাহাঙ্গীর প্যাটেল, শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু, শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, সীমান্ত গান্ধী বাদশা খান ও ওয়ালি খান এবং কৃষ্ণ মেনন। এ ছাড়া, প্রকাশিত তথ্যপঞ্জীর অন্যতম হলো শীয়ান রচিত 'লীড্ কাইন্ডলি লাইট' ও 'গান্ধী : এ গ্রেট লাইফ ইন ব্রীফ্', কুলিজ (Coolidge) রচিত 'গান্ধী', অ্যাশে (Ashe) রচিত 'গান্ধী—আ স্টাডি ইন রিভলিউশন', পেইন রচিত 'গান্ধী', নায়ার রচিত 'গান্ধী : দ্য লাস্ট ফেজ', ফিশার রচিত 'দ্য লাইফ অফ মহাত্মা গান্ধী, গান্ধীর 'আত্মজীবনী, দ্য স্টোরি অফ মাই এক্স্পেরিমেন্ট উইথ ট্রুথ', কৃপালনী রচিত 'গান্ধী, আ লাইফ, এবং মজুমদার রচিত 'জিন্না অ্যান্ড গান্ধী।

হাউস অফ কমন্স্ সভার বিতর্ক চিত্রটি সমকালীন সংবাদপত্রের প্রতিবেদন থেকে সংগ্রহ করা তথ্যের ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। মাউন্টব্যাটেনের যাত্রার বিবরণ সংগ্রহ করা হয়েছে স্বয়ং মাউন্টব্যাটেন এবং আরও দু তিনজন, যেমন অ্যাডমিরাল ব্রকম্যান, কমোডোর হোয়েস এবং চার্লস স্মিথের সঙ্গে কথাবার্তা বলে।

মুমূর্ষু রাজতন্ত্রের বিদায় সংগীত—দি লাস্ট টাট্টু

শ্রীমতী মনুর সঙ্গে গান্ধীজীর সম্পর্ক নিয়ে এই অধ্যায়টি লেখার আগে প্যারেলাল এবং সুশীলার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করতে হয়েছে আমাদের। প্যারেলালের লেখা বইটি থেকেও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি। বোম্বাইতে গান্ধীজীর দুঃস্বপ্ন দেখার ঘটনার কথা 'হরিজন' পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করেছি।

লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে মাউন্টব্যাটেনের সাক্ষাৎকারের দৃশ্যটি রচনা করেছি মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে আলাপ করে এবং তাঁর ডাইরি পড়ে। লেডি মাউন্টব্যাটেনের আলেখ্যটি রচনা করেছি তাঁর স্বামী লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনা করে।

www.pathagar.com

এ ব্যাপারে লেডি মাউন্টব্যাটেনের দুই মেয়ে ও তিনজন মহিলা সচিবের সংগে সাক্ষাৎকার থেকেও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পেয়েছি। ১৯২১ সালে মাউন্টব্যাটেনের ভারতভ্রমণের স্মৃতিচারণমূলক অংশটি লিখতে তাঁর ব্যক্তিগত ডাইরির সাহায্য নিয়েছি।

ভাইসরয় ভবনে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের আগমন এবং ভাইসরয়রূপে তাঁর শপথানুষ্ঠানের ছবিটি কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। মাউন্টব্যাটেন নিজেও যথেষ্ট সাহায্য করেছেন আমাদের। লিখিত উপাদান পঞ্জীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সমকালীন সংবাদপত্র, ক্যাপ্টেন স্কটের ডাইরি, ক্যাম্পবেল জনসনের লেখা 'মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন' গ্রন্থটি এবং মিসেস এলিজাবেথ কলিনস্ পরিবেশিত এই উৎসবানুষ্ঠানের মূল প্রোগ্র্যামসূচি; কমোডোর হোয়েস পরিবেশিত তথ্যের ভিত্তিতে লাটপ্রাসাদের বিবরণটি লিখিত হয়েছে।

দায়িত্বভার হাতে নেবার পর মাউন্টব্যাটেনের প্রথম প্রতিক্রিয়ার বিবরণটি লেখা হয়েছে তাঁর সংগে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। এ বিষয়ে আরও তথ্যাদি পরিবেশন করেছেন ভাইসরয়ের ব্যক্তিগত কর্মচারীবৃন্দ। জর্জ এ্যাবেলের সংগে তাঁর আলোচনার চিত্রটি এঁকেছি জর্জ এ্যাবেলের পরিবেশিত এবং মাউন্টব্যাটেনের সমর্থিত তথ্যাদি থেকে।

এক বৃদ্ধ ও তাঁর ভাঙাচোরা স্বপ্ন

ভারতীয় নেতৃবর্গের সংগে আলোচনা সমাপ্ত হলেই মাউন্টব্যাটেন তার একটি সংক্ষিপ্ত নোট লিপিকার দিয়ে লিপিবদ্ধ করিয়ে নিতেন। এই নোটগুলি থেকেই প্যাটেল, জিন্না, নেহরু ও গান্ধীজীর সংগে তাঁর কথাবার্তা এবং উদ্ধৃতিগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে।

নেহরু আলেখ্যটি রচনা করতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অনেকেই সরবরাহ করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, এম ও মাথাই, ত্রিলোক সিং, শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, এইচ ভি আর আয়েংগার, আচার্য কৃপালনী, কৃষ্ণ মেনন, আর কে নেহরু ইত্যাদি। এ ছাড়া দুর্গা দাস রচিত 'ইণ্ডিয়া ফ্রম, কার্জন টু নেহরু', আর কে করঞ্জিয়া রচিত 'দ্য মাইণ্ড অফ মিস্টার নেহরু', নেহরু রচিত 'আত্মজীবনী' এবং 'দ্য ডিসকভারি অফ ইণ্ডিয়া এবং সাহনি রচিত 'দ্য লীড্ অফ' গ্রন্থগুলি থেকেও প্রভূত তথ্য সংগ্রহ করেছি।

সর্দার প্যাটেলের পোট্রেট বা চিত্রপটটি অংকন করতে যাঁদের সাহায্য নিয়েছি তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন প্যাটেলের সহোদরা শ্রীমতী মনিবেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত সচিব এস্ শংকর। তাছাড়াও সাহায্য করেছেন সি এইচ ভাবা, জেঃ জে এন চৌধুরী, স্যর জর্জ এ্যাবেল, স্যর কনরাড করফিল্ড, আচার্য কৃপালনী ও অনেকে। লিখিত রচনার মধ্যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ গ্রন্থটির নাম 'ইণ্ডিয়া ফ্রম কার্জন টু নেহরু অ্যাণ্ড আফটার' এবং সর্দার প্যাটেলের টীকা সম্বলিত নোট্স্-গুলি।

দীনা ওয়াদিয়ার সাহায্য ব্যতীত জিন্নার চিত্রপটটি আঁকা যেত না। জিন্নার এই কন্যাটি আমাদের প্রভূত তথ্য দিয়েছেন। এ ছাড়া তাঁর ভ্রাতৃব্য আকবর পীরবয়, জিন্নার এ ডি সি সৈয়দ আহ্‌শন, বোম্বাই শহরের ডাক্তার বন্ধু জে এ এল প্যাটেল,

www.pathagar.com

তাঁর সামরিক সচিব কর্নেল উইলিয়ম বার্নিও আমাদের অনেক তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন। আরও যাঁদের সাহায্য পেয়েছি তাঁরা হলেন ইউসুফ বার্চ, সৈয়দ পীরজাদা, আনওয়ার আলি, এম আর বেগ্ এবং তাঁর বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তিগণ যেমন দুর্গা দাস, জে এন সাহ্নী, তায়েবজী এবং শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু। জিন্নার পত্নীর খুবই অন্তরঙ্গ ছিলেন শ্রীমতী নাইডু।

জিন্নার রোগশয্যার যাবতীয় বিবরণ সংগ্রহ করেছি তাঁর চিকিৎসক ও কন্যার কাছ থেকে। এবিষয়ে যে একখানি গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি সেটির নাম 'জিন্না—দ্য ক্রিয়েটর অফ পাকিস্তান।' লেখক নাম হেক্টর বলিথো।

গভর্নরদের সম্মেলনের বিবরণ দিয়েছেন স্বয়ং মাউন্টব্যাটেন। এই সম্মেলনের কার্যাবিবরণীটিও তিনি আমাদের দেখতে দেন। সেই সম্মেলনে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেও অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি। এঁরা হলেন ওলাফ্ ক্যারো, স্যর চন্ডুলাল ত্রিবেদী এবং স্যর জর্জ এ্যাবেল। পাঞ্জাব ও পেশোয়ার শহরে মাউন্টব্যাটেনের সফরের খুঁটিনাটি তথ্যাদি দিয়েছেন মাউন্টব্যাটেন, স্যর ওলাফ্ ক্যারো এবং আবদুল রশীদ। যিনি প্রতিবাদ মিছিলটি সংগঠন করেছিলেন সেই কর্নেল মহম্মদ খান্ও আমাদের অনেক তথ্যাদি দিয়েছেন। অনুগামীদের সঙ্গে গান্ধীজীর বিতর্কচিত্রটি রচনায় সাহায্য করেছেন প্যারেলাল নায়ার এবং আচার্য কৃপালনী।

একটি ছোট্ট দামী শহর

শৈলশহর সিমলার বর্ণনা লেখার উপযোগী উপকরণের যোগান দেন এম্ এস্ ওবেরয়, মিসেস পেন্ মন্টেগু, স্যর চন্ডুলাল ত্রিবেদী এবং ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত একটা মনোজ্ঞ গাইডবুক। বড়লাটবাহাদুরের গোঁ সম্বন্ধে যে ঘটনাটির উল্লেখ আছে তার বিবরণ উনি স্বয়ং দিয়েছেন। নেহরুর ভয়ংকর প্রতিক্রিয়ার কথাটা বলেছেন কৃষ্ণ মেনন। তখন তিনিও নেহরুর সঙ্গে ওই শৈলশহরে উপস্থিত ছিলেন। ভি পি মেননের কন্যা আমাদের তাঁর পিতার ডাইরির অংশবিশেষ দেখিয়েছিলেন এই ঘটনাটির সমর্থনে।

সুরম্য প্রাসাদভবন এবং বাঘ, হাতি ও হীরাজহরতের দীপ্তি

স্যর কনরাড কর্ফিল্ডের লণ্ডন যাওয়ার তথ্যাদি পেয়েছি কর্ফিল্ড এবং ভারতসচিব আর্ল অফ লিস্টোয়েলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। এইসব অর্ধোন্মাদ, বিলাসী রাজামহারাজাদের খেয়ালখুশি জীবনযাত্রার মুখরোচক তথ্যাদি দিয়েছেন কর্ফিল্ড এবং তাঁর ডেপুটি স্যর হার্বার্ট থমসন। আরও যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন গোয়ালিয়র ও জয়পুরের রাজমাতা এবং পাতিয়ালা, ফরিদকোট, কপুরথালা, বরোদার মহারাজা ও নবাব, হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুরের আইন উপদেষ্টার বিধবাপত্নী লেডি রুথ্ভেন, স্যর ওয়াল্টার মংকটন, আলি জবর জং এবং কাশ্মীরের মহারাজার পুত্র কর্ণ সিংহ ইত্যাদি। গ্রন্থাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'দ্য মহারাজাস' এবং 'ইণ্ডিয়া অফ দ্য প্রিন্সেস।'

গ্রহনক্ষত্রের বিচারে একটি অভিশপ্ত দিন

লণ্ডন সফরের সময় ব্রিটিশ ক্যাবিনেট এবং স্যর উইন্স্টন চার্চিলের সঙ্গে মাউন্টব্যাটেনের সাক্ষাৎকার ও আলোচনার অংশটি লিখতে সাহায্য করেছেন স্বয়ং

www.pathagar.com

মাউন্টব্যাটন। তখন জর্জ এ্যাবেল লণ্ডনেই ছিলেন। সেই প্রথম মিটিংয়ে মাউন্টব্যাটেনের সংগে তিনি এবং আর্ল অফ লিস্টোয়েলও উপস্থিত ছিলেন। এঁদের সাহায্যেই এই মিটিংয়ের নোট্স্গুলি লিপিবন্ধ করে নেন মাউন্টব্যাটেন। এই নোট্স্গুলিও আমরা কাজে লাগিয়েছি।

রাজা মহারাজাদের নানা কুকীর্তির ঘটনা ও অভিজ্ঞতা সম্বলিত কাগজপত্রের বহ্নুৎসবের ঘটনার যাবতীয় তথ্যাদি দিয়েছেন স্যর কনরাড করফিল্ড এবং তাঁর ডেপুটি স্যর হার্বার্ট থম্সন। তাঁর ভারতবাসের অভিজ্ঞতা এবং রাজা-মহারাজাদের নানা কীর্তিকলাপ নিয়ে লেখা একটা অপ্রকাশিত রচনাও তিনি আমাদের পড়তে দিয়েছিলেন।

২রা ও ৩রা জুন তারিখে ভারতীয় নেতৃবর্গের সংগে মাউন্টব্যাটেনের আলোচনার অংশটি রচনা করা হয়েছে তাঁর সংগে কথা বলে এবং তাঁর সংগ্রহাগারে রক্ষিত ওই মিটিংয়ের নোট্স্গুলি পাঠ করে। জিন্না ও গান্ধীজীর সংগে মাউন্টব্যাটেনের আলোচনার অংশটিও তাঁর সংগে কথা বলে এবং নোট্স্গুলি পড়ে লেখা হয়েছে। প্রার্থনাসভায় গান্ধীজীর সংলাপের অংশটি 'হরিজন' পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করেছি। সাংবাদিক সম্মেলনের চিত্রটি নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। সম্মেলনের ট্রান্সক্রিপ্ট্ এবং এ্যালান ক্যাম্প্বেল জনসনের সংগে আলোচনার পর এই অংশটি লেখা হয়েছে। জ্যোতিষীর প্রতিক্রিয়ার অংশটি লেখা হয়েছে মাউন্টব্যাটেন, মাথাই এবং স্বামী মদনানন্দের সংগে কথাবার্তা বলার পর। বৃহৎ জ্যোতিষ সারণীটি এখনও যত্ন করে রেখে দিয়েছেন স্বামীজী। ভাইসরয় মাউন্ট-ব্যাটেনকে লেখা তাঁর চিঠির প্রতিলিপিটিও তিনি আমাদের দেখিয়েছেন।

একটি জটিল ঐতিহাসিক বিচ্ছেদ

'অ্যাসেট' ভাগাভাগের বিবরণটি লেখা হয়েছে ওই কাজের দায়িত্বভার প্রাপ্ত দুজন আমলা অর্থাৎ এইচ এম প্যাটেল এবং চৌধুরী মহম্মদ আলির সংগে আলোচনার পর। এ সম্পর্কে সমুদয় রিপোর্ট নথি ইত্যাদি ওঁরা আমাদের দেখিয়েছেন। ভাইসরয়ের খাসদখলের শকট ভাগাভাগির তথ্যাদি দিয়েছেন কমোডোর হয়েস এবং জেনারেল ইয়াকুব খান। ইণ্ডিয়ান আর্মির ভাগাভাগির তথ্যাদি দিয়েছেন সেনাবাহিনীর কর্তাব্যক্তিরা। তাছাড়া ইণ্ডিয়ান আর্মির উপর লেখা একটি চমৎকার ইতিহাস গ্রন্থ 'ম্যাটার অফ অনার' থেকেও অনেক দরকারী তথ্য পেয়েছি। আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম 'দ্য ফ্রন্টিয়ার ১৮৩৯-৪৭' ইণ্ডিয়ান আর্মির রণপ্রক্রিয়া ও কৌশল সম্পর্কিত অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যের সমাবেশ আছে এই গ্রন্থটিতে যা আমাদের কাজে লেগেছে।

লর্ড র‍্যাড্ক্লিফকে ডেকে পাঠানো এবং লর্ড চান্সেলার ও ক্লিমেন্ট এ্যাটলির সংগে তাঁর আলোচনার অংশটি লেখার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দিয়েছেন র‍্যাড্ক্লিফ স্বয়ং। তাছাড়া এই নিয়োগ নিয়ে লণ্ডন এবং ভাইসরয় হাউসের মধ্যে চিঠিপত্রের যে বিনিময় হয়েছিল সেগুলিও দেখার সুযোগ আমরা পেয়েছি। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সংগে তাঁর (র‍্যাড্ক্লিফির) প্রথম সাক্ষাতের বিবরণটি পেয়েছি দুজনের স্মৃতিচারণ থেকে। ভারতীয় রাজন্যবর্গের সংকট এবং এই সংকট-মোচনের ব্যাপারে মাউন্টব্যাটেনের ভূমিকা ও দৃষ্টিভঙ্গির যে চিত্রটি আঁকা হয়েছে, সে সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি অনেকের সংগে কথা বলে। তাছাড়া

www.pathagar.com

ভি পি মেননের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকেও অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি।

স্বাধীন ভারতের গভর্নর জেনারেলরূপে মাউন্টব্যাটেনের নিয়োগ এবং এ সম্বন্ধে যে পূর্বচিন্তা ছিল, তার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় দুখানি গ্রন্থে। গ্রন্থ দুটির নাম 'ডিভাইড অ্যান্ড কুইট' ও 'মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন।' এই বইদুটি ছাড়াও অনেকের সঙ্গে আলোচনা মারফত নানা তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে।

অবিভক্ত পাঞ্জাব প্রদেশের হাঙ্গামার চিত্রটি অঙ্কন করতে অনেক প্রাক্তন পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা বলতে হয়েছে। সি আই ডি বিভাগের গোপন সাপ্তাহিক নোটসগুলিও আমাদের দেখতে দেওয়া হয়েছিল। পাঞ্জাবী শরণার্থীদের সঙ্গে গান্ধীজীর সাক্ষাতের বিবরণটি লেখার জন্য প্যারেলাল নায়ারের সঙ্গে আমাদের আলোচনা করতে হয়েছে।

'আমরা চিরকাল সহোদর হয়ে থাকবো'

রয়্যাল এ্যাসেন্ট বা রাজানুমোদনের যে অনুষ্ঠানের বিবরণ দিয়েছি তার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ব্রিটেনের সমকালীন সংবাদপত্র থেকে। চেম্বার অফ প্রিন্সেস বা রাজন্যদের সভায় মাউন্টব্যাটেনের ভাষণ এবং তাঁদের সম্মানে আয়োজিত ভোজসভার বিবরণ লিখতে মাউন্টব্যাটেনের পরিবেশিত তথ্যগুলি ব্যবহার করেছি। দুই ডোমিনিয়নের যে কোন পক্ষে যোগ দিতে যে কিছু নেটিভ স্টেটের আপত্তি ছিল, সে সম্বন্ধে অনেকেই তথ্যাদি দিয়েছেন। এ সম্পর্কে ভি পি মেননের ব্যক্তিগত সংগ্রহগুলিই আমাদের কাছে উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে কারণ রাজন্যদের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ রাজকর্মচারী। তাছাড়াও অনেকের সঙ্গে আলোচনা মারফত প্রভৃত তথ্যাদি পেয়েছি। এ'দের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হলেন পাতিয়ালা, কাপুরথালার মহারাজা এবং গোয়ালিয়র ও জয়পুরের রাজমাতা। মাউন্টব্যাটেনের কাশ্মীর সফরের বিবরণ লেখার আগে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করা ছাড়াও এ্যাটলি সরকারের কাছে তাঁর পাঠানো রিপোর্ট এবং আলোচনার নোটসগুলি পাঠ করা সুযোগ নিয়েছি আমরা। জিন্নাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের গোপন তথ্যাদি পেয়েছি জি আর স্যাভেজের সঙ্গে কথা বলে। সেই-ই প্রথম দিল্লিকে এই খবরটি জানায়। তাছাড়া এই সংক্রান্ত অনেকগুলি প্রামাণ্য দলিল মাউন্টব্যাটেন আমাদের দেখিয়েছেন।

গান্ধীজীকে শান্তিরক্ষার্থে বাংলায় পাঠানোর খবরটি স্বয়ং মাউন্টব্যাটেন আমাদের দিয়েছেন। এ সম্পর্কে প্যারেলাল নায়ার, চণ্ডীওয়ালা ও রঙ্গস্বামীর বক্তব্যও সাক্ষাৎকার মারফত আমরা জেনেছি।

করাচির উদ্দেশে জিন্নার বিমানযাত্রার চিত্রটি তাঁর এ ডি সিদের পরিবেশিত তথ্যের ভিত্তিতে হলেও কিছুটা অন্যভাবে আঁকা হয়েছে। স্বাধীনতার অনুষ্ঠান পর্যন্ত র‍্যাডক্লিফের রায় বা অ্যাওয়ার্ডটি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তের ব্যাপারটি মাউন্টব্যাটেন, র‍্যাডক্লিফ এবং জর্জ এ্যাবেলের সঙ্গে আলোচনা করে জেনেছি। উদ্ধৃত অংশটি সংগ্রহ করেছি লণ্ডনে পাঠানো ভাইসরয়ের রিপোর্ট থেকে। র‍্যাডক্লিফের কাজের পদ্ধতি নিয়ে যে অংশটুকু লেখা হয়েছে তার উপাদান পেয়েছি র‍্যাডক্লিফ এবং তাঁর আই সি এস সহকারী বুমন্টের সঙ্গে আলোচনা করে।

দিল্লির জিমখানা ক্লাবে যে বিদায়ী ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছিল সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে আলোচনা করে এই অংশটি লেখা হয়েছে।

www.pathagar.com

পৃথিবী তখন ঘুমিয়ে ছিল

প্যারেলাল নায়ার, আর এন ব্যানার্জি এবং রাম গোবর্ধনের সংগে সাক্ষাৎ করার পর কলকাতায় গান্ধীর শান্তি মিশনের বিবরণটি রচনা করা হয়েছে। যে গ্রন্থগুলি থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছি তা হলো দ্য লাস্ট ফেজ (Phase)', 'হরিজন' পত্রিকা এবং সমকালীন সংবাদপত্রের প্রতিবেদন। করাচির রাস্তায় জিন্না এবং মাউন্টব্যাটেনকে নিয়ে যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল সেই দৃশ্যটি রচনা করা হয়েছে মাউন্টব্যাটেন পরিবেশিত তথ্য এবং সমকালীন সংবাদ-পত্রের রিপোর্ট থেকে। 'মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন' নামক গ্রন্থ থেকেও অনেক তথ্য পেয়েছি।

খাইবার গিরিপথ, লাহোর, নয়াদিল্লি এবং বোম্বাই শহরে যে স্বাধীনতা উৎসবের অনুষ্ঠান হয়েছিল তার তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে অনেকগুলি সোর্স থেকে। সাক্ষাৎকার নিয়েছি লর্ড মাউন্টব্যাটেন, অ্যালান সি জনসন, জেনারেল ইয়াকুব খান, জেনারেল মেসার্‌ভী, জেনারেল লকহার্ট, জেনারেল বুচার এবং জেনারেল চৌধুরীর। তাছাড়াও সাক্ষাৎ করতে হয়েছে কর্নেল বার্নী, ব্রিগেডিয়ার মহম্মদ ইদ্রিস, আনোয়ার আলি, খাজা মহীউদ্দিন, মিসেস সুচেতা কৃপালনী, এইচ ভি আর আয়াঙ্গার, মিসেস বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, ডাক্তার সুশীলা নায়ার ও আরও অনেকের সংগে। রিট্‌ন্‌ (লিখিত) সোর্সের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো লর্ড এবং লেডি মাউন্টব্যাটেন রচিত রিপোর্ট, উৎসবের সরকারী কর্মসূচী এবং এই অনুষ্ঠান সংক্রান্ত অসংখ্য চিঠিপত্র এবং ডাইরি। নেহরুর টেলিফোন-বার্তার অংশটি লেখা হয়েছে শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর পরিবেশিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে। মাউন্টব্যাটেনের সংগে ভারতীয় নেতাদের সাক্ষাতের যে বিবরণটি দিয়েছি তার আধার হলেন স্বয়ং মাউন্টব্যাটেন।

কি মিষ্টি এই মুক্তির সকাল'

সাক্ষাৎকার এবং গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে বারাণসীধাম ও ছাতারপুর গ্রামের বিবরণটি লেখা হয়েছে। দিল্লি ও অন্যান্য শহরে ১৫ আগস্টের উৎসব অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণটি লেখা হয়েছে অনেকের সংগে আলাপ আলোচনা করে। এঁদের কয়েকজন যেমন লর্ড এ্যালানডেল, এলিজাবেথ কলিন্স, রুশী গান্ধী, লেঃ কম্যান্ডার হয়েস, জেঃ লকহার্ট, দৃগল সিং, ইন্দিরা গান্ধী, লর্ড মাউন্টব্যাটেন, রাম গোবর্ধন, খুশবন্ত সিং, জেঃ হবিবুল্লা, পদ্মজা নাইডু ইত্যাদি। এছাড়াও লণ্ডনে পাঠানো ভাইসরয়ের রিপোর্ট, সমকালীন সংবাদপত্র, ক্যাপ্টেন স্কটের ডাইরি, এলিজাবেথ কলিন্স-এর লেখা চিঠিপত্রাদি থেকে অনেক তথ্য পেয়েছি। পামেলা মাউন্টব্যাটেনের ব্যক্তিগত যে ঘটনার কথা বলা হয়েছে তার উৎসমূল হলো পামেলা নিজে। তাছাড়া পামেলার এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার যে বিবরণটি লিপিবদ্ধ করে নেহরু লাইব্রেরির সংগ্রহগারে রক্ষিত আছে, সেই প্রতি-বেদনটিও দেখার সুযোগ লেখকদ্বয়কে দেওয়া হয়েছে।

অমৃতসর রেলস্টেশনের যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে তার বিবরণ দিয়েছেন স্টেশনমাস্টার চানী সিং। পুণা শহরে আর এস এস দলের ফ্ল্যাগ তোলার ঘটনার কথাটা 'হিন্দুরাষ্ট' পত্রিকার রিপোর্ট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। গোপাল গড়্‌সের সংগে কথা বলেও অনেক তথ্য পেয়েছি। 'বালমোরাল' প্রাসাদে শীল

www.pathagar.com

মোহর হারানোর ঘটনার কথা বলেছেন লর্ড লিস্টোয়েল স্বয়ং। যে সভায় ভারতীয় নেতাদের সামনে র‍্যাডক্লিফের এ্যাওয়ার্ড বা রায়টি মাউন্টব্যাটেন উপস্থিত করলেন, সেই সভার দৃশ্যপটটি মাউন্টব্যাটেনের পরিবেশিত তথ্যের ভিত্তিতে একটু অন্য-ভাবে লেখা হয়েছে। র‍্যাডক্লিফের বিদায়কালীন যাত্রার বিবরণটি তাঁর সঙ্গে কথা বলে লেখা হয়েছে।

'ওরা আর মানুষ নেই'

ইতিহাসের বৃহত্তম জন পরিযান (মাইগ্রেশন)

এই দুটি অধ্যায়ে বিবৃত দাঙ্গা, হত্যা, নারীলাঞ্ছনা, শরণার্থীদের পলায়ন, ট্রেনের মধ্যে নৃশংস গণহত্যা ও আরও অসংখ্য ভয়াবহ ঘটনার স্মৃতিচিত্রগুলি প্রায় ৪০০ ছিন্নমূল মানুষের সঙ্গে কথা বলে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গ্রন্থের লেখকদ্বয়কে প্রায় একই রকম ঘটনার কথা শুনতে হয়েছে ভাগরেখার দুপাশের অসংখ্য ছিন্নমূল মানুষের কাছ থেকে। এই অসংখ্য ব্যক্তিগত ঘটনাগুলি থেকে শুধু কয়েকটি ঘটনাই বেছে নেওয়া হয়েছে যেগুলির সমর্থন পাওয়া গেছে অন্য সোর্স থেকে। মূল গ্রন্থে যাদের নামধাম দেওয়া আছে তারা ছাড়াও আরও অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই অধ্যায়দুটি রচনা করা হয়েছে। এদের মধ্যে বিশিষ্ট হলেন স্যর চন্ডুলাল ত্রিবেদী, (ইনি তখন পাঞ্জাবের ভারতীয় অংশের গভর্নর), মেজর জেঃ এম এস চোপড়া (বর্ডারের ভারতীয় দিক থেকে পাকিস্তানের দিকে গমনরত শরণার্থী মিছিলের পরিদর্শক), জেনারেল রাজা, এবং পাকিস্তানের শহিদ হামিদ ও আকবর খান। এ ছাড়াও ছিলেন নবাব স্যর মালিক খাজার খান ত্রিওয়ানা (হাঙ্গামার উৎপত্তি নিয়ে ইনি আমাদের অনেকগুলি অপ্রকাশিত নথি দেখিয়েছেন), জি ডি হ্যারিংটন হোয়েস, আর ডব্লু এ্যাটকীন্স্ এবং এড্ওয়ার্ক ব্যের। মুদ্রিত গ্রন্থাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো খোশলা রচিত 'স্টার্ন রেকনিং', (যার মধ্যে দাঙ্গার উৎপত্তি, কারণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আছে), ইমার্জেন্সি কমিটির প্রতিবেদন, সেন্ট জন্ এ্যাম্বুলেন্সের জন্য লেডি মাউন্টব্যাটেনের তৈরি করা শরণার্থী সমস্যার উপর রিপোর্ট, ডি এফ্ কারাকা রচিত 'ফ্রিডম মাস্ট নট সিংক', মুন (Moon) রচিত 'ডিভাইড অ্যান্ড কুইট', 'মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন', হড্সন রচিত 'দ্য গ্রেট ডিভাইড' এবং কুলদীপ নায়ার রচিত 'ডিসট্যান্ট নেবারস', নামক গ্রন্থগুলি। তখনকার ঘটনা নিয়ে লেখা খুশবন্ত্ সিং রচিত 'ট্রেন টু পাকিস্তান' নামক চমৎকার উপন্যাসটি থেকেও অনেক সাহায্য পেয়েছি।

গান্ধীজীর কলকাতা সফর এবং তাঁর 'মিরাকল' সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্যাদি পেয়েছি 'দ্য লাস্ট ফেজ' নামক গ্রন্থটি থেকে এবং গান্ধীজীর অন্তরঙ্গগোষ্ঠীর কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনা করে। এঁদের মধ্যে বিশিষ্ট হলেন তাঁর সচিব প্যারেলাল নায়ার, অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু, রাম গোবর্ধন এবং সমকালীন সংবাদপত্রের রিপোর্ট। নেহরু এবং লিয়াকৎ খানের পাঞ্জাব সফরের বৃত্তান্তটি রচনা করতে যাঁরা তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন মেজর জেনারেল দুবে এবং এইচ ভি আর আয়াঙ্গার। এঁরা উভয়েই ওঁদের সফরসঙ্গী ছিলেন। মাউন্টব্যাটেনকে সিমলা থেকে দিল্লিতে ডেকে পাঠানোর ঘটনাটির কথা আমাদের স্বয়ং মাউন্টব্যাটেন বলেছেন। তাছাড়া তিনি যে গোপন প্রতিবেদনটি পাঠিয়েছিলেন

www.pathagar.com

সেটিও আমরা দেখেছি। ভি পি মেননের মেয়ের সঙ্গে কথা বলে এবং তার পিতার ব্যক্তিগত কাগজপত্র পরীক্ষা করেও এই ঘটনার সমর্থন পেয়েছি। সাক্ষাৎকারের সময় এইচ ভি আর আয়াংগার আমায় বলেছিলেন যে দিল্লির উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা সকলেই তখন প্রশাসনযন্ত্র ভেঙে পড়ার আশংকা করেছিলেন।

ইমার্জেন্সি কমিটির প্রথম অধিবেশন এবং কাজকর্মের বিস্তারিত রূপরেখা পেয়েছি কমিটির 'মিনিট' থেকে। তাছাড়া সি জনসন্ রচিত 'মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন' গ্রন্থটিও আমাদের সাহায্য করেছে। এছাড়াও মাউন্টব্যাটেন, সি এইচ ভাবা এবং আয়াঙ্গারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পেয়েছি।

মদনলালের গোয়ালিয়র যাত্রা এবং ডাক্তার পরচুরে ও বিষ্ণু কারকারের সঙ্গে তার মোলাকাতের সম্পূর্ণ কাহিনী পেয়েছি ওই তিনজনের সঙ্গে আলাপ করে। বুটা সিং এবং মুসলমান যুবতী জেনাবের কথা ও আখ্যানের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন লাহোরের রাবিয়া সুলতানা। এই সহৃদয়া মহিলাই বুটার মেয়েকে মানুষ করেছিলেন। তাছাড়া লাহোরের সংবাদপত্রেও এই ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল।

কাশ্মীর শুধু কাশ্মীর'

শারদ উৎসবের দিন মহারাজার প্রাসাদের আলোগুলি ধীরে ধীরে নিভে যাবার ঘটনাটি বলেছেন মহারাজার পুত্র কর্ণ সিং। আরও একজন আমায় এই ঘটনার কথা বলেন। তাঁর নাম মিসেস ফ্লোরেন্স লজ্। শ্রীনগরের একজন ব্রিটিশ নাগরিক তিনি। কাশ্মীরের সুরম্য উপত্যকায় জিন্নার অবসর যাপনের ইচ্ছার কথা জানা যায় কর্নেল কার্নীর ডাইরি থেকে। কাশ্মীরে উপজাতি হামলার পাকিস্তানী ষড়যন্ত্রের কথা বলেছেন জেনারেল আকবর খান। বর্তমানে ইনি প্রাগের পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত। শুরু থেকেই এই ষড়যন্ত্রের নাটের গুরু ছিলেন তিনি। কাশ্মীর উপত্যকায় পাকিস্তানী উপজাতিদের হামলার ঘটনার বিস্তারিত তথ্যাদি দিয়েছেন এমন দুজন মানুষ যাঁরা এই হামলাকারীদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যুক্ত ছিলেন। এরা হলেন খায়াৎ খাঁ এবং কর্নেল মহম্মদ শরীফ্ খাঁ। দুই রাজ্যের দুজন ব্রিটিশ সেনা অফিসারদের মধ্যে টেলিফোনযোগে আলাপের ছবিটি আঁকতে সাহায্য করেছেন তিন ব্রিটিশ জেনারেল। মেসারভী, লকহার্ট ও বুচার। শ্রীনগর প্রাসাদ থেকে মহারাজা হরি সিংহের পলায়নের সব তথ্য পেয়েছি মহারাজার পুত্র কর্ণ সিংহের কাছ থেকে। এই ব্যাপারে দিল্লির প্রতিক্রিয়া এবং অন্তর্ভুক্তির কাগজপত্র সহ ভি পি মেননকে জম্মু পাঠানোর সিদ্ধান্তের খবরাদি দিয়েছেন মাউন্টব্যাটেন, ফীল্ড মার্শ্যাল ম্যানেকশ, শেখ আবদুল্লা এবং স্যার আলেকজাণ্ডার সাইমনস্। তাছাড়া ১৯৭৩ সালে আমরা যখন বাঙ্গালোর শহরে যাই তখন ভিপি মেননের কন্যা মিসেস ডি মিশ্র তাঁর পিতার ব্যক্তিগত কাগজপত্র দেখিয়েছিলেন। দুই রাজ্যের মধ্যে বিবাদ নিয়ে যে বিবরণ আছে তার উল্লেখ আছে যে দুখানি বইয়ের মধ্যে তাদের লেখক দুই রাষ্ট্রের দুই জেনারেল। একজনের নাম এল পি সেন। তাঁর লেখা বইটির নাম 'স্লেনডার ওয়াজ দ্য থ্রেড।' অন্যজনের নাম জেনারেল আকবর খাঁ। তাঁর লেখা বইটির নাম 'রেইডার্স ইন কাশ্মীর।' শ্রীনগর অভিমুখে সামরিক অভিযানের খুঁটিনাটি তথ্যাদি পরিবেশন করেছেন হরবক্স্ সিং।

www.pathagar.com

পুণার দুই ব্রাহ্মণ

'হিন্দুরাষ্ট্র' পত্রিকার উদ্বোধনের বিবরণটি দেওয়া হয়েছে গোপাল গড়্সে এবং বিষ্ণু কার্কারের সঙ্গে সাক্ষাতের ভিত্তিতে। পুলিসের নজরদারীর ছবিটি আঁকা হয়েছে কাপুর কমিশনের রিপোর্ট থেকে নেওয়া তথ্য থেকে।

পাণিপথে গান্ধীজীর সমস্ত কাজকর্ম কথাবার্তার খুঁটিনাটি বিবরণ পেয়েছি প্যারেলালের সঙ্গে কথাবর্তা বলে এবং 'দ্য লাস্ট ফেজ' পড়ে। জিন্নার শারীরিক অসুস্থতা এবং তাঁর দুশ্চিন্তা নিয়ে লেখা অংশের সমুদয় তথ্য দিয়েছেন জিন্নার প্রাক্তন এ ডি সি। তাঁর সামরিক সচিবের ডাইরি থেকেও অনেক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। লর্ড মাউন্টব্যাটেন এবং গান্ধীজীর কথোপকথনের অংশটি লেখার উপকরণ সংগ্রহ করেছি লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে আলাপ করে।

ধ্বনিত হলো 'গান্ধী মুর্দাবাদ'

ডাক্তার সুশীলা নায়ারের সঙ্গে দুবার দীর্ঘ আলোচনা এবং তাঁর ব্যক্তিগত ডাইরির নোটস দেখার পর গান্ধীজীর সর্বশেষ অনশন সত্যাগ্রহের এই বিবরণটি লেখা হয়েছে। এছাড়াও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন প্যারেলাল নায়ার, কিসান চন্ডীওয়ালা এবং গুরুচরণ সিং। প্যারেলাল ছাড়া অন্য দুজনেই গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠদের অন্যতম। এই অংশটি লিখতে আরও যারা সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন ডি ডব্লু মেহ্রা, লর্ড মাউন্টব্যাটেন এবং পদ্মজা নাইডু। গান্ধীজী নিজের 'হরিজন' পত্রিকা থেকেই অনেক তথ্য উদ্ধৃত করেছি। সর্বোপরি তিনটি বই যথাক্রমে 'দ্য লাস্ট ফেজ', চন্ডীওয়ালা রচিত 'অ্যাট্ দ্য ফিট অফ বাপু' এবং শ্রীমতী মনু রচিত 'লাস্ট গ্লিম্প্সেস অফ বাপু' থেকেও অনেক উপাদান পেয়েছি।

মদনলালের প্রতিহিংসা
'পুলিসের হাতে ধরা পড়ার আগেই গান্ধীকে আমাদের পেতে হবে'।
যেন দ্বিতীয়বার ক্রুশবিদ্ধ হলেন যীশু

গান্ধীজীর দুজন হত্যাকারী নাথুরাম এবং নারায়ন আপ্তের ফাঁসি হয় ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং নাটের গুরু সাভারকরের মৃত্যু হয় ১৯৬৬ সালে। দিব্যি নিজের ঘরের খাটে শুয়ে মরতে পেরেছেন সাভারকর। সুতরাং এইগ্রন্থ লেখার সময় যখন তথ্য সংগ্রহ এবং গবেষণা চলছে তখন অন্য ষড়যন্ত্রীরা সবাই জীবিত। এদের মধ্যে মদনলাল, বিষ্ণু কার্কারে এবং গোপাল গড়্সের হাজতবাস শেষ হয়ে গেছে। অতএব তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে এদের সকলের সংগেই বিস্তারিত আলোচনা করতে আমাদের কোন অসুবিধা হয়নি। গোপাল এবং বিষ্ণু কারকারেকে সঙ্গে নিয়ে আমরা দিল্লি এসে বিভিন্ন জায়গাগুলি যেমন পুরনো রেল স্টেশনের রিটায়ারিং রুম, বিড়লা মন্দির এবং চত্বর, মন্দিরের পিছনের ঝোপঝাড়ের পাঁদাড়টা, যেখানে গুলি ছোড়ার অনুশীলন করা হতো, ওদের সঙ্গে নিয়ে আমরা ঘুরেছি। সবশেষে দেখেছি সেই অকুস্থলটি যেখানে গান্ধীজীকে হত্যা করা হয়। ওরা আমাদের নিয়ে পুণাতেও গেছে এবং 'হিন্দুরাষ্ট্র' পত্রিকার অফিস, ছাপাখানা যেমন দেখিয়েছে, তেমনি পুণার সহযোগীদের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। মারাঠি ভাষায় গোপালের লেখা নাথুরামের জীবনীগ্রন্থের

www.pathagar.com

একটা কপি সে আমাদের দেখতে দিয়েছে।

গান্ধীজীর হত্যাচক্রান্তের তদন্তকাজের সঙ্গে জড়িত দুই পুলিস অফিসার নাগরওয়ালা এবং ডি ডব্লু মেহ্রার সঙ্গেও আমাদের বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তাছাড়া তাঁর নিজস্ব কেস্ ফইলটিও নাগরওয়ালা আমাদের দেখতে দিয়েছেন তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে। তদন্তের ব্যাপারে দিল্লির পুলিস অফিসারদের গড়িমসির সাক্ষ্য দিয়েছেন পরিচয় প্রকাশে অনাগ্রাহী অন্য এক অফিসারও। দিল্লির নেহরু লাইব্রেরির অধ্যক্ষরাও আমাদের সাহায্য করেছেন প্রভূতভাবে। বিচারের সময় নাথুরামের আবেগপূর্ণ জবানবন্দির পূর্ণ বয়ানটি তাঁরা দেখতে দিয়েছিলেন। তখন দেশের নিরাপত্তার স্বার্থেই এই গুরুত্বপূর্ণ নথিটি জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি। উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতেই গান্ধী হত্যাচক্রান্ত এবং গয়ং গচ্ছ তদন্তের ছবিটি আঁকা হয়েছে।

গান্ধীজীর পাকিস্তান সফরের পরিকল্পনা এবং এই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি জহা গীর প্যাটেল, ডাক্তার সুশীলা নায়ার এবং প্যারেলাল নায়ারের সঙ্গে আলোচনা করে। তাঁর শেষ কটি কর্মময় দিনের বৃত্তান্তের উপকরণও পেয়েছি এঁদের সঙ্গে আলোচনা করে। তাছাড়া গুরুচরণ সিং এবং মনিবেন প্যাটেলও, যিনি তাঁর পিতার সঙ্গেই সেই সর্বশেষ আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলেন, আমাদের অনেক তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। যে গ্রন্থগুলির সাহায্য নিয়েছি সেগুলি যথাক্রমে 'দ্য লাস্ট ফেজ', 'এ্যাট দ্য ফিট অফ বাপু' এবং 'লাস্ট গ্লিম্প্সেস অফ বাপু।' গান্ধীজীর অন্ত্যোষ্টি অনুষ্ঠানের বিবরণ রচনায় সাহায্য করেছেন স্বয়ং মাউন্টব্যাটেন, প্যারেলাল, এ সি জন্সন্, জেনারেল রয় বুচার, জেনারেল চৌধুরী, এলিজাবেথ কলিন্স, ফীল্ড মার্শাল ম্যানেকশ' ও আরও অনেকে। তাছাড়া সমকালীন সংবাদপত্রের প্রতিবেদন এবং 'দ্য লাস্ট ফেজ' ও 'মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন' নামক গ্রন্থদুটি থেকেও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আহৃত হয়েছে।

শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু পরিবেশিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে গান্ধীজীর চিতাভস্ম নিমজ্জনের ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাছাড়া আর একটি বই থেকেও এই বিবরণটি সংগ্রহ করেছি। সেটি হলো শীআন (Sheean) রচিত 'লীড কাইন্ডলি লাইট।'

www.pathagar.com

বিশ্বের অগণিত পাঠকের কাছে ভারতবর্ষকে জনপ্রিয় করেছে এই বই। ভারতের চিরন্তন সঙ্গীত এই বই। উজ্জ্বল মিছিলের মতন এর দৃশ্যগুলি আমাদের চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়।

—টাইম ম্যাগাজীন, নিউ ইয়র্ক

অন্য কোন গ্রন্থ দিয়ে এর অভাব পূরণ হয় না

লা মঁদ, প্যারিস

এক অনবদ্য সাহিত্যকীর্তি

—এ· বি· সি, মাদ্রিদ

৬০০ পাতার এক এপিক গ্রন্থবিশেষ

কুরিয়ার ডি· লা সিয়ারী, মিলান

সংস্কারবিহীন এক মহান ও প্রেরণাদীপ্ত কীর্তি এই বই

ন্যাশন্যাল অবজারভার, ওয়াশিংটন

এই চমৎকার বইটি পড়ে ভারতাত্মাকে উপলব্ধি করা যায়
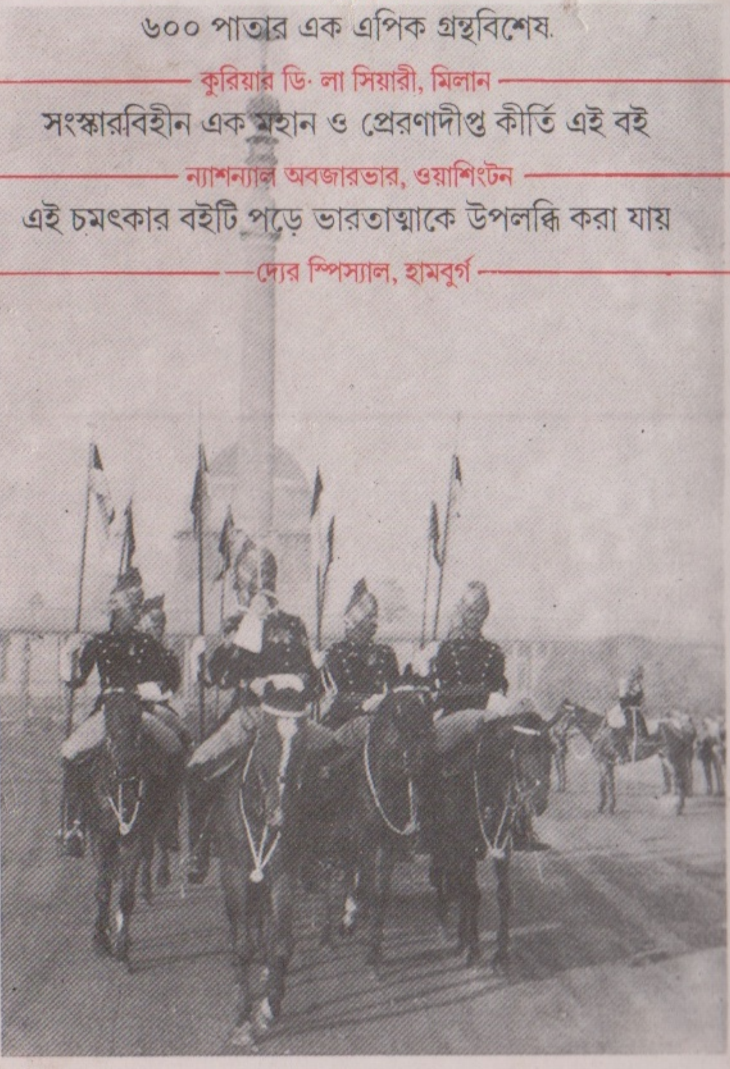
—দ্যের স্পিস্যাল, হামবুর্গ